JPPLIER/PROD/PKG. QUANTITY

ষাণ্মাসিক সূচী

বৈশাখ—আশ্বিন ১৩৫৩

শনিবারের চিঠি
১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৩

গণ-সংযোগ

আমি সাক্ষাৎভাবে কখনও কংগ্রেসের সেবা করি নি, তা সত্ত্বেও কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করার জন্য আপনারা আমাকে কেন ডেকেছেন জানি না। হয়তো আমি নিজেকে জাতীয়তাবাদী ব'লে মনে করি ব'লেই আপনাদের নিমন্ত্রণ। আজ আপনাদের প্রদত্ত সুযোগ লাভ ক'রে আমি কেমন ক'রে সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে জাতীয়তাবাদে এসে পৌঁছেছি তার কাহিনী বলব।

কোনদিনই দেশের জনসাধারণের সেবা করব, এমন চিন্তা আমার মধ্যে ছিল না। মাস্টারি করি, সংসারযাত্রা ভালভাবে চালানোর জন্য অর্থোপার্জন করি, অর্থ সঞ্চয়েরও চেষ্টা করি; কিন্তু তার বাইরে আমার মন আর যেত না। কিন্তু ১৯৩৫ সালে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পর হঠাৎ আইন-সভার নির্বাচনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা হ'ল। আমাদের সম্প্রদায় থেকে অপর যিনি পদপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন, তিনি যথেষ্ট সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রচার করতে লাগলেন। আমিও সাম্প্রদায়িকতা দ্বিগুণ উৎসাহে প্রচার করতে লাগলাম এবং ফলে ভোটাধিক্যে আমারই জয়লাভ হ'ল। আপনারা এ কথা ভাববেন না যে, হঠাৎ খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের স্বার্থের সম্বন্ধে আমি অসাধারণ উৎসাহী হয়ে উঠেছিলাম; আসল ব্যাপার ইলেক্‌শনে জেতার ওটি এক কৌশল ছিল। কিন্তু নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর ক্রমশ আমার দৃষ্টি প্রসারিত হতে লাগল। নিখিল-ভারতের খ্রীষ্টান সম্মেলন আমাকে একজন ভাল মক্কেল ঠাউরে সভাপতির আসন দিলেন, এবং তারই অধিবেশনে আমাদের মনে হ'ল যে, শুধু বছরে একবার ক'রে মিটিঙের দ্বারা কিছু হয় না, সম্মেলনকে জীবন্ত ভাব বজায় রাখতে হ'লে সারা বৎসর ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী কাজ করা প্রয়োজন।

আমিও সমস্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ শুরু করলাম। গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেখি, ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সেবা করার লোক কদাচিৎ পাওয়া যায়। বেশির ভাগ আন্দোলনই শহরের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবু এখানে ওখানে যতটুকু বা কাজ হয়, তাও দেখি খদ্দর-পরা দু-চারজন যুবক কোন হরিজন উন্নয়নের প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে, খাদি-উৎপাদনের জন্য আশ্রম স্থাপনা ক'রে সামান্যভাবে চেষ্টা করছে। দেখে ক্রমশ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমার কৌতূহল এবং অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের দারিদ্র্যের সম্বন্ধেও আমার চোখ খুলে যেতে লাগল, এবং আমি দেখলাম, এই দারিদ্র্য কোন সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য নয়, ভারতের গ্রামবাসী মাত্রকেই সমানভাবে ভোগ করতে হয়। এই দারিদ্র্য

যে কি রকম, তা আপনারা শহরে ব'সে কখনও অনুমান করতে পারবেন না। গোদাবরী নদী যেখানে সমুদ্রে পড়েছে, তার নিকটে এক গ্রামে একটি খ্রীষ্টান পরিবারের মধ্যে ছিলাম। সকালে উঠে দেখি, গ্রামের অনেকে এক রকম জাল নিয়ে রওনা হয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, জাল হয়তো মাছ ধরার জন্য। তার পর দেখা গেল, গ্রামের লোকেরা মাঠের মধ্যে এক-একটা ঝোপের চারিদিকে জাল ঘিরে লাঠি-সোঁটা নিয়ে তাড়া দিতে লাগল এবং মাটির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে ফেললে। মাটিতে বড় বড় ইঁদুরের বাসা ছিল, সেই ইঁদুর শিকার করলে; এবং ইঁদুরের গর্ত থেকে সঞ্চিত ধান সংগ্রহ করতে লাগল। সে ধান মাটির গর্তে থেকে থেকে সবুজ হয়ে গেছে, তবু শুনলাম, সেই ধান কেঁড়ে চাল ক'রে গ্রামের লোক খাবে। মাছ মাংস দারিদ্র্যের জন্য সংগ্রহ করতে পারে না ব'লে এই ইঁদুরের মাংসই এদের একমাত্র আমিষ আহার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এলাহাবাদের কয়েক মাইল দূরে একবার টাঙায় চ'ড়ে গ্রামে যাচ্ছি; পথে যাবার সময়ে দেখলাম, উৎসাহভরে গ্রামের মেয়েরা ঘোড়ার বিষ্ঠা সংগ্রহ করছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়তো জ্বালাবার জন্যে ঘুঁটে করবে। পরে শুনলাম, তা নয়। বিষ্ঠার মধ্যে কিছু কিছু ছোলা থেকে যায়; সেইগুলি ধুয়ে মানুষে আহার করার জন্য সঞ্চয় করছে।

এই হ'ল ভারতবর্ষ, এবং এই তার দারিদ্র্যের রূপ। এখানে হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান ব'লে কোনও ভেদাভেদ দেখতে পাই নি, এবং এদের স্বার্থের মধ্যেও কোনও তারতম্য খুঁজে পাই নি। এদের সেবার কাজ কংগ্রেস নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন ব'লে আমার মনে কংগ্রেসের প্রতি অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পায়। ভারতবর্ষে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের সময়ে যে-সকল কর্মচেষ্টা চলেছিল, আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছি। ক্রমে কংগ্রেসের আদর্শের কর্ণধার মহাত্মা গান্ধীকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানবার আমার আগ্রহ হয়। ১৯৪১ সালে যথেষ্ট সুযোগও পেয়ে গেলাম। নিখিল-ভারত খ্রীষ্টান-সম্মেলনের পক্ষ থেকে গান্ধীজীর সঙ্গে কোনও বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ আমাদের হয় এবং সেই সময়ে সেবাগ্রামে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম। ওয়ার্ধায় পৌঁছে প্রথমেই সাক্ষাৎ হ'ল লাটসাহেবের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে পদপ্রার্থী আমার জনৈক প্রাক্তন ছাত্রের সঙ্গে। আমরা ডাকবাংলা থেকে সেবাগ্রামে গান্ধীজীর কাছে পৌঁছে তাঁকে পুনরায় দেখতে পেলাম।

গান্ধীজীর খাওয়া-দাওয়ার খরচের সম্বন্ধে পূর্বে অনেক গুজব শুনেছিলাম। তিনি নাকি অসম্ভব রকমদামী খাবার খান, ফলের রসেই অনেক টাকা নাকি খরচ হয়ে যায়! আমরা যে সময়ে পৌঁছাই; তখন গান্ধীজীর খাবার সময়। কৌতূহল চরিতার্থ করার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করলাম; কিন্তু দেখলাম, দুধ, শশা, দুটো বেদানার রসই শুধু তিনি খেলেন। কথাবার্তার পর, খাওয়া সেরে গান্ধীজীর বেড়াবার সময়। পথে দেখলাম,

দুজন চাষী পর পর কাছে এসে গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। একজনের খাজনার জন্ত এক জোড়া বলদ নাকি তার পরদিন নিলাম হয়ে যাবে, সে গান্ধীজীর কাছে এসেছে, জমিদারকে ব'লে তিনি যেন আরও ১৫ দিনের সময়ের ব্যবস্থা ক'রে দেন, তারই মধ্যে সে খাজনা শোধ ক'রে দেবে। গান্ধীজী তাকে তিরস্কার ক'রে সেই ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। আর একজন লোকের অভিযোগ—সেবাগ্রামে ডিস্‌পেন্‌সারি থেকে যে ঔষধ বিতরণ করা হয়, সেটি ভাল নয়। গান্ধীজী যদি ব'লে দেন, তা হ'লে আসল ভাল ওষুধ পাওয়া যাবে। গান্ধীজী তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি যখন কিছুতেই ছাড়ে না, তখন মহাদেব দেশাইকে হেসে বললেন, একে যেন খাঁটি ওষুধ দেওয়া হয়, তুমি তার ব্যবস্থা ক'রো।

আমার সেইদিনের অভিজ্ঞতায় মনে হ'ল, গান্ধীজী এমন একজন লোক, যাঁর কাছে ভাইসরয়ের মন্ত্রীপরিষদের লোকও চাকরির ব্যাপারে আশীর্বাদ নিতে আসে, আবার সামান্ত দরিদ্রতম লোকও মানুষের মতন সমানে সমানে অভাব অভিযোগ আবদার জানাতে পারে। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব। গুজরাটে গ্রামের মধ্যে ঘুরে সর্দার বল্লভভাইয়ের অসাধারণ প্রভাবের প্রমাণ পেয়েছিলাম। জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারি যে, তিনি গ্রামের প্রতি লোকের সঙ্গে মেশেন, তাদের নাম জানেন, প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে সাংসারিক সুখদুঃখের সকল সংবাদ নেন। এবং এ শুধু পোশাকীভাবে নয়। গ্রামের লোকের সুখদুঃখের সঙ্গে তিনি এমন নিবিড়ভাবে নিজেকে এক করেছেন যে, তারা তাঁকে নেতৃস্থানীয় ভাবলেও সকলের চেয়ে আপন জন ব'লে ভাবতে পারে।

এইখানেই কংগ্রেসের সেবার সার্থকতা দেখা যায়। কংগ্রেসের নেতাগণ অথবা কর্মীরা গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে মিশে তাদের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ ব'লে গ্রহণ করবার ব্রত গ্রহণ করলে তবেই সত্যকার কংগ্রেসের স্বাধীনতার বাণী গ্রামের প্রতি মানুষের কাছে পৌঁছবে। বিলাতের মজুরের সঙ্গে ভারতবর্ষের চাষী-মজুরদের আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে। তারা গরিব হ'লেও সপ্তাহে একবার ফুটবল ম্যাচ দেখে এবং গ্রামোফোনের একখানা ক'রে অন্তত রেকর্ড কেনে; তাদের কথা স্বতন্ত্র। আর আমাদের দেশের সাধারণ লোকের অবস্থা এমনই হয়েছে যে, উঁচুতে ব'সে আমাদের কিছু করা অসম্ভব। আমাদেরই নামতে হবে, দারিদ্র্যে তাদের নিকটবর্তী হতে হবে। তবেই আমরা তাদের সঙ্গে নিয়ে আবার জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে উন্নতিসাধন করতে পারব। আমাদের প্রয়োজন গ্রামের লোককে তোলা নয়, নিজেদের ভেঙে সমপর্যায়ে নামানো। না হ'লে কংগ্রেসের আদর্শের শব্দও তাদের কানে পৌঁছবে না। কংগ্রেসসেবীগণ এই অভিজ্ঞতালব্ধ কথাটির প্রতি বিশেষভাবে অনুধাবন করবেন।

আর গ্রামের মধ্যে, সাধারণ মানুষের আচারে ব্যবহারে সাম্প্রদায়িকতা যে নাই, এ

কথা আমি জোর ক'রেই আজ বলতে পারি। মারাঠা দেশে একবার রেলে চ'ড়ে থার্ডক্লাসে যাচ্ছি। অতি জীর্ণ পোশাক পরা, চেহারায় গাঁজাখোরের মত একটি মুসলমান যুবক আমাদের কামরায় এসে বসল। একটি মারাঠী পরিবারও কিছুক্ষণ পরে এসে উপস্থিত হলেন। পূর্বের লোকটি সামান্য কারণে ওই পরিবারের সঙ্গে কলহ করার ফলে প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম হ'ল; আমরা কয়েকজন মিলে উভয় পক্ষকে নিরস্ত করলাম। কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর সেই যুবকটি আমার কাছে খাবার জন্য কিছু পয়সা চাইলে; আমিও পরবর্তী ইষ্টিশানে খাবার কিনে দেব বললাম। ইতিমধ্যে দেখি মারাঠী ভদ্রলোকটি স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিজের ছোট মেয়ের জন্য কয়েকখানা রুটি রেখে, বাকি সমস্ত রুটি ওই ক্ষুধার্ত যুবকটিকে দিয়ে দিলেন। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা কোথায়? মানুষে মানুষে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদিনের আচরণে যে ব্যবহার করে, তা সাম্প্রদায়িকতার বিষের দ্বারা কখনই জর্জরিত হয় নি।

আর একবার থার্ডক্লাসে রেলে চ'ড়ে যাচ্ছি, এমন সময়ে সীমান্তপ্রদেশের একজন মুসলমান সৈনিকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তাদের দেশের নানা গল্পের পর যুদ্ধের অভিজ্ঞতার সম্বন্ধেও তাকে জিজ্ঞাসা করি। উত্তর আফ্রিকায় তখন জার্মান জেনারেল রোমেলের তাড়নায় আমাদের বর্তমান লাটসাহেব পেছিয়ে আসছেন। সৈনিকটি সেখানকার যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার কথা আমায় বললে। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম যে, সেই সেনাদলে অফিসারদের মধ্যে একজন বাঙালী, একজন মাদ্রাজী আছেন। ইংরেজ অফিসারের থেকে এঁদের কোন প্রভেদ আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় সৈনিকটি বললে, বাবু, এ বিষয়ে কোনই তফাত নেই। অফিসারগণ সকলেই খেয়ে-দেয়ে সমানভাবে সুখে থাকেন, টেলিফোনে দূর থেকে নির্দেশ দেন এবং আমরাই তো যুদ্ধ করি। এর মধ্যে আর বাঙালী, মাদ্রাজী, হিন্দু মুসলমান প্রভেদ কোথায়?

সৈনিকটি আরও একটি আশ্চর্য কথা বললে। তাদের গ্রামে পরিবারে পরিবারে বংশানুক্রমে শত্রুতা কায়েম আছে। হয়তো একজন খুন হ'ল, তখন অপর পরিবারেরও একজনকে হত্যা করা চাই, এবং এই ব্যাপার যুগের পর যুগ গ্রামের মধ্যে চলতে থাকে। সৈনিকটি বললে, সেখানে আমরা পরস্পরকে হত্যা করি, কারণ উভয়ে উভয়ের শত্রু, দুশমন ব'লে। কিন্তু দেখুন আশ্চর্যের ব্যাপার, জার্মান একজন সৈনিক আমার দুশমন নয়, তবু অফিসার হুকুম দিলেন, তাকে গুলি কর। জার্মানির অফিসারও আমাকে হত্যা করার জন্য এমন একজন সৈনিককে অর্ডার দিলেন, যার সঙ্গে জীবনে আমার কখনও সাক্ষাৎ হয় নি এবং যে কোনদিন আমার শত্রু নয়। আশ্চর্য ব্যাপার, মানুষ কেমন ক'রে পরস্পরকে হত্যা করছে!

সৈনিকটির উপরোক্ত কথা শুনে আমার মনে হ'ল, সাধারণ লোকের মধ্যে অহিংসার

বাণী আজ প্রয়োজনের তাগিদে কতদূর পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। মানুষ মানুষের শত্রু নয়, এই সংবাদ গ্রামে গ্রামান্তরে প্রবেশ ক'রে দরিদ্রতম নরনারীর কাছে কংগ্রেসের কর্মীরা যখন পৌঁছে দিতে পারবেন, তখনই তাঁদের সেবা সার্থক হবে, ব্রতের উদ্‌যাপন হবে। জীবনের গভীরতম এই ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে স্বার্থের অনৈক্য থাকতে পারে না। সেখানে সকল জাতি সমান, তাদের দুঃখ সমান, দুঃখমোচনের প্রয়োজনও একান্তভাবে সমান। আপনারা কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে এই সেবাব্রতে সার্থক হয়ে উঠুন—আজ জীবনের অপরাহ্ণে আমি এই প্রার্থনাই করি।

শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

১৯২০-র কাছাকাছি নন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনে এসে ছবি আঁকা শেখার আবহাওয়া তৈরি করতে বসলেন। ইস্কুল খোলেন নি, কারণ ঘণ্টা-ক্লাস নন্দলাল নিজেই চিরকাল এড়িয়ে চলেছেন, ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে সেটা চাপাতে চান নি।

ঐ সময় নন্দলালের ছাত্রেরা—তরুণ সহকর্মী বললেই ঠিক হ'ত—যে স্বাধীনতা পেয়েছিলেন, সে কথা শুনলে প্যারিসের ছন্নছাড়া আর্টিষ্টরাও ভিরমি যাবেন। যে যা খুশি এঁকেছে, যে কোন কায়দায় এঁকেছে; নন্দলাল বাধা তো দেনই নি, এমন কি ছোকরা আর্টিষ্ট যখন খেয়ালের-হাওয়া-লাগা পাগলের-উঠে-জাগা ছবি এঁকেছে, তখন তিনি বিরক্ত না হয়ে বরঞ্চ বোঝবার চেষ্টা করেছেন, পাগলা এরকম ধারা আঁকলে কেন? যাচ্ছেতাই আঁকছে, না যা ইচ্ছে তাই আঁকছে, সেইটে ছিল তাঁর কাছে বড় প্রশ্ন। যাচ্ছেতাই তো সকলেই আঁকতে পারে, কিন্তু পাগলা যেদিন যা ইচ্ছে ঠিক তাই আঁকতে পারবে, সেদিনই সে পাগলামি-প্রতিভার ভাগ-করা লাইন পেরিয়ে সত্যিকার স্রষ্টিকর্তা হবে।

কিন্তু ১৯২০-র শান্তিনিকেতনিয়ারা কি জানত, তারা কি আঁকতে চায়, কি আঁকছে?

সে সময়ের কথা ভাবতে গেলে অবাক লাগে। সাহিত্যের দিক দিয়ে বাংলা দেশ তখন অনেক এগিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তখন তামাম দুনিয়ার তসলীম পেয়েছেন। আমাদের সামাজিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের সুখদুঃখ কবিতা নাটক নভেলের ভিতর দিয়ে কোন্ ঐতিহ্য নিয়ে কোন্ গদ্যরীতিতে কোন্ কাব্যধারায় প্রকাশ পাবে, সে নিয়ে আমাদের মনে তখন আর কোনও সন্দেহ ছিল না। কারণ এসব প্রশ্ন উঠেছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, টেকচাঁদ, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ তার ফৈসালা ততদিনে ক'রে ফেলেছেন। আর দেখবার কিছু

নেই। চিন্তা অনুভূতি থাকলেই হ'ল, ভাষা তৈরি, শৈলীর বাহার মহৎ, বেছে নিলেই হ'ল, লিখলেই হ'ল।

১৯২০-র চিত্রকরদের মন আর হৃদয় গড়া হয়েছিল সাহিত্যরস দিয়ে। তারা পড়ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা, শোনাচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের গান, আর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসই তাদের চিনিয়েছিল রুশ উপন্যাস, ফরাসী ছোটগল্প, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান নাটক। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে তখন রলাঁর 'জ্যাঁ ক্রিস্তফ' আর বয়েরের 'বিরাট ক্ষুধা' আসর জমিয়ে বসেছে। ছোকরাদের তন্দ্রায় রঙিন স্বপ্ন—ছবিতে জ্যাঁ ক্রিস্তফের স্বপ্ন দেখাবে, নব প্রমিথিয়ুস সৃষ্টি করবে, মোগল ছবির শুকনো কাগজে প্রমিথিয়ুসের আনা আগুন ধরিয়ে নূতন দেওয়ালি জ্বালাবে।

এইটেই ছিল তাদের ট্র্যাজেডি।

প্যারিসে যার চিত্রকলার দিকে ঝোঁক, সে সাহিত্য নিয়ে প'ড়ে থাকে না। দুই ছবির মাঝখানে সে যখন ফুরসৎ পায়, তখন ছোটে লুভ্রে, ম্যুজেগিমেতে। ওস্তাদদের ছবি দেখে এক দিকে যেমন সাহস পায় এগিয়ে চলার, অন্য দিকে তেমনই বুঝতে পারে তার দৌড় কতদূর, তার তীরের পাল্লা কতটা। অভাবনীয়কে সে রঙে-রেখায় ভাবনার জালে ধরে, অসম্ভবকে বাস্তব করার নেশা তার দুদিনেই কেটে যায়।

এখানে একটা জিনিস পরিষ্কার ক'রে দেওয়া ভাল। কবিতার বিষয়বস্তু রঙে রেখায় প্রকাশ করার দুরাশার কথা এখানে উঠছে না। সে চেষ্টাও যে কেউ কেউ করেন নি তা নয়—অসিত হালদার তাই করেছিলেন, তাঁর ছবি যেন রবীন্দ্রনাথের গানে সঙ্গত-মেলানো তবলা—কিন্তু ১৯২০-র কলাভবনে যাঁরা তালিম পাচ্ছিলেন, তাঁরা সবাই মনে মনে বীণকার, কোন ওস্তাদের তবলচী হওয়ার কল্পনাতেও তাঁদের অপমান বোধ হ'ত। ছবিতে আঁকার মত জিনিসই তাঁরা আঁকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এটা ঠিক সজ্ঞানে স্পষ্ট মনে বুঝতে পারেন নি যে, একশত বৎসরের মাথার-ঘাম-পায়ে-ফেলা দেশ-জোড়া মেহন্নতে গদ্যে পদ্যে যা সম্ভব হয়েছে, কুড়ি-বৎসরের ছিটে-ফোঁটা চেষ্টার উপর নির্ভর ক'রে অত বড় বড় ইমারত তৈরি করা যায় না।

তার উপর আর একটা উৎপাত ছিল। কলাভবন পত্তনের পূর্বেকার চিত্রকরদের অধিকাংশই ছবি এঁকেছেন শহরে ব'সে। খোলা মাঠের মাঝখানে ছাড়া পেলে যে ধরণীমাতা তাকে কোলে টেনে নেন, শিশু যে তখন জানা-অজানাতে মনে মনে মায়ের ছবিই আঁকে, সেটাও বুঝতে পারেন নি। শিল্পীদের বয়েস কাঁচা, বীরভূমের মাটি নাড়ীতে দিলে টান, খেজুর আর তালগাছের রস দিয়েছে তাদের তাতিয়ে।

শিল্পীদের মনে তখন অহরহ প্রশ্ন, খানিকটে সজ্ঞানে খানিকটে অবচেতনায়, কি

ক'রে আঁকব, কোন্ কায়দায় আঁকব? টেকনিক কোথায় পাব, শৈলীর সন্ধান কোথায়, কোন্ ভাষায় কথাটি ঠিক ঠিক বলতে পারব।

এদিকে পড়ছে জ্যাঁ ক্রিস্তফ, ওদিকে আবহাওয়া ননকো-অপারেশনে টৈটম্বুর। সেটানিক এড়ুকেশন, স্লেভ মেন্টালিটি তখন সকলেরই বুকে না হোক মুখে তো বটেই— বিলিতি কায়দা নেব না, বিলিতি অনুকরণ করব না, না, না। নিতান্তই যদি দিশী ভাষা খুঁজে না পান, অজন্তা মোগলের আকাশে যদি উড়তে না পারেন, তবে যাবেন বরঞ্চ অচিনা চীনার কাছে, বরঞ্চ সবাই মিলে জাপানের কাছে যা পান।

অথচ কলাভবনের লাইব্রেরি ভর্তি সেজান, রেনোয়া, মাতিস, পিকাসোতে। শিল্পীর মনে থেকে থেকে কেমন যেন মনে হয়, এযুগের দ্বন্দ্বানুভূতি বুঝিবা এই ভাষাতেই বলা চলে, চীনাতে না, জাপানীতে না।

এ দ্বন্দ্ব ধীরেনকৃষ্ণ, রমেন্দ্রনাথ, বিনায়ক শিবরাম মাসোজী, রামকিঙ্করকে কতটা আন্দোলিত করেছিল, সে কথা আজ আলোচনা করব না। এঁদের প্রত্যেকের আপন আপন বৈশিষ্ট্য আছে। আপন আপন নৌকায় কেউ গুণ টানছেন, কেউ পাল তুলছেন, কেউ বা দরে ম'জে চক্কর খাচ্ছেন।

কিন্তু সকলেই স্বীকার করবেন, বিনোদবিহারী আপন নৌকায় দেশ-বিদেশের হরেকরকম মাল বোঝাই করেছেন; বোঝাই করার সময় মাত্র একটি বিষয়ে লক্ষ্য করেছেন, সেটি এই যে, সে মাল সরেস কি না, আর তাঁর নৌকায় ধরবে কি না। নৌকাখানা খাঁটি দিশী মহাজনী নৌকা। আকারে বৃহৎ, গতি খানদানি।

হরেকরকম শৈলী যে বিনোদবিহারী দিলদরিয়া মেজাজে আপন ক'রে নিতে পেরেছেন, তার প্রধান কারণ বিনোদবিহারীর মনের উপর, হৃদয়ের ভিতর ছেলেবেলায় জোর ছাপ দেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাস্তিক উদার বনবিহারী। তাঁর লেখা 'শনিবারের চিঠি'র অনেকেই পড়েছেন, সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর জগাই-মার্কা লড়াই, জেহাদ-মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে তাঁর ইনকিলাব দেখে অনেকেই স্তম্ভিত হয়েছেন, আমরা তো দস্তুরমত ভয় পেতুম।

অগ্রজের কাছ থেকে পাওয়া দৃষ্টিভঙ্গী ও সর্বানুভূতির দিকে স্পর্শকাতর হৃদয় দিয়ে বিনোদবিহারী মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর তামাম দুনিয়ার প্রাচীন অর্বাচীন সর্বপ্রকার চিত্র, ভাস্কর্য, স্থপতি পর্যবেক্ষণ করেছেন, জারক রস দিয়ে হজম ক'রে নিজস্ব ক'রে নিয়েছেন। বিনোদবিহারীর কাছে অজন্তা বলুন, মোগল বলুন, রেনেসাঁস বলুন, চীনা বলুন, জাপানী বলুন, সর্বপ্রকার রসবস্তু মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; ভাল আর মন্দ, দেশ বা কাল হিসাবে নয়, বিষয়বস্তু বা শৈলী সম্বন্ধে কোন প্রাক্‌বিচার নিয়ে নয়।

তাই বিনোদবিহারীর উপর একদল ক্রিটিক খাপ্পা। তাঁর ছবিতে নাকি বিলিতি প্রভাব। হা হরি, বিলিতি প্রভাব!

যদি বলি, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যের কবি নন, তবে কেমনধারা শোনায়? ব্যাসের মত মহাকাব্য রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন? কালিদাসের মত কাব্য, শকুন্তলের ন্যায় নাট্য? মেঘদূতের মত একটানা গীতিকাব্য? বাণের ন্যায় কাহিনী? রবীন্দ্রনাথের কবিতার ঐতিহ্য তো ভারতবর্ষে নেই, সে তো শেলি-কীটসের ছাঁচে ঢালাই, তাঁর 'ডাকঘর' তো মেটেরলিঙ্কের, তাঁর মুক্তধারা রক্তকরবী তো মৃচ্ছকটিক বা শকুন্তলের মত নয়; আর গল্প-উপন্যাসের ছাঁচ যে দিশী নয় সে নিয়ে কি এক লহমা তর্ক করা যায়? একমাত্র গান। তাই হ'ল বাউল, ভাটিয়ালি, পদকীর্তন মেশানো খাঁটি বাঙালী মাল।

তবু তো রবীন্দ্রনাথ ভারতীয়, খাঁটি ভারতীয়, ন-সিকে ভারতীয়। কালিদাস যদি এ যুগে জন্মাতেন, যদি এ যুগের তরুণতরুণীর ভাবজগৎ, চিন্তাজগতের একজন হতেন, অর্থাৎ এ যুগের বিদগ্ধজন হতেন, তা হ'লে তিনি কি তামাম দুনিয়ার হরেকরকম ছাঁচ কাজে লাগাতেন না? না, সে পুরনা বোতলে নয়া মদ ঢালতেন? বোতল চৌচির হ'ত, আমাদের আশা ভরসাও হাজারচির হত।

মোদ্দা কথা, যে-রস ঢালা হচ্ছে সেটি কি? আমাদের সেটা সইবে কি? পুরনো আমেজ থাকবে, অথচ নয়া নেশা। দুঃখশোক নূতন ধরনের, আশা-নিরাশা নূতন ধরনের, দুনিয়ার দিকে চোখ মেলে তাকাচ্ছি নূতন ধরনে, বিদেশীর কাছে যে কানমলা খাচ্ছি সেটা ভয়ঙ্কর নূতন ধরনের। সে দুঃখশোক ভুলতে হবে অজন্তা মাল দিয়ে! অত পুরনা জিনিস চাঙ্গা রাখবার কায়দা তো রসিক ফরাসীসও জানে না।

মোদ্দা কথা, বিনোদবিহারীর রস দিশী রস। তিনশো বা দুহাজার বৎসরের ছায়ায় সেটাকে হিম ঠাণ্ডা ক'রে ফেলা হয় নি। আজকের রৌদ্রবাতাস থেকে সে তার প্রাণ নিয়েছে, আজকের দিনের যে-রসিক বিশ্বসাহিত্য প'ড়ে সুখ পান, বাচবিচার করেন না, কোন্‌টা দিশী কোন্‌টা বিদেশী, যাঁর সাহিত্য পড়ার জন্য এক চোখ, ছবি দেখার জন্য আর একটা চোখ নয়, তিনি বুঝবেন বিনোদবিহারী কি অপূর্ব প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাঁর রসসৃষ্টিতে।

তালবনের শান্ত ঋজু ধৈর্য, সূর্যমুখীর সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ, নয়নতারার সদাসোহাগী কাঠামো, আমলকি পাতার কিরকির শব্দ, নৌকাসারির ঘেঁষাঘেঁষি, আশেপাশের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে যাওয়া প্রাচীন পুলের দহরম-মহরম, খোয়াইয়ের গৈরিক বর্ণবিন্যাসে বেপরোয়া বৈরাগ্য, কাশের উদ্ধত মুষ্টি সপ্রকাশ হয়েছে, ঠিক সেই ভাষাতে সেই শৈলীতে, যেটা যখন মানায়। সব-কিছুর পিছনে রয়েছে কবির অসীম কৌতূহল আর সহৃদয় বৈরাগ্য।

বিলিতি ছন্দ আছে কেউ অস্বীকার করবে না; রবীন্দ্রনাথ যে-রকম বিলিতি।

"টেকচাঁদ"

ঋণ-ইজারা ও যুদ্ধজয়

এ যুদ্ধে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি বহু দিকে বাড়িবার সুযোগ পাইয়াছে। বিজ্ঞান এক দিকে যেমন মানুষকে বাঁচাইবার জন্য নানা ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছে, তেমনই এমন মারাত্মক মারণাস্ত্রও পূর্বে কখনও আবিষ্কার হয় নাই। একটু ভাবিয়া দেখিলে বর্তমান সভ্যতার গতি কোন্ দিকে বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু এই ধ্বংসপথের যাত্রী বর্তমান সভ্যতাকে রক্ষা করিবার যত চেষ্টা হইতেছে, ততই মনে হইতেছে, যেন ইহা মরণের পথেই চলিয়াছে। হিটলার গিয়াছে, কিন্তু পাশব বল পরাজিত হয় নাই। বড় বড় সভ্য জাতি পশু-শক্তি অর্জন করিতে বদ্ধপরিকর। এই ধ্বংসের কার্যে যে যতটা সফলতা অর্জন করিয়াছে, সেই যেন ততটা বড় হইয়াছে। আজ আণবিক বোমা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে, কে ইহা দখলে রাখিবে! ইহার উপরেও আরও কোন ধ্বংসাস্ত্র সম্ভব কি না বিশ্বপ্রেমিক সর্বহারাদের বন্ধু রুশরাষ্ট্র তাহার সাধনায় ব্যস্ত। বিশ্বব্যাপী সভ্যতা একই পথে চলিয়াছে, আর সে পথ হইতেছে আত্মহত্যার পথ।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরে যখন জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিল, তখন ইংলণ্ড ও ফরাসীদেশ নিতান্ত কর্তব্যের প্রেরণায় জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ইংলণ্ডের তোষণনীতি জার্মানিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আর অগ্রসর হইতে পারিল না। অথচ এই দুই দেশ যুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ফরাসী যতটা ছিল, ইংরেজ তাহাও নহে। ফলে যাহা হয় তাহাই হইল, ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি একের পর আর একটি জার্মান-করতলগত হইতে লাগিল। জার্মানি ভিতরে ভিতরে এতটা শক্তি অর্জন করিয়াছে, পূর্বে কেহ তাহা ধারণাও করিতে পারে নাই। ১৯৪০ সালের জুন মাসে যখন ফরাসীর পতন হয়, তখন সঙ্গিন অবস্থা। সমস্ত ইউরোপ জার্মানির করতলগত। ফরাসীর পতনের কিছু পূর্বে ইটালিও জার্মানির সহিত যোগ দিল।

যুদ্ধ টাকার খেলা ছাড়া আর কিছু নহে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, টাকাই লড়াইয়ের হাড়মাস (money is the sinews of war)! দেনদার হিসাবে ইংরেজের সুনাম পৃথিবীতে সর্বত্র। প্রথম মহাযুদ্ধের দেনা ইংলণ্ড কখনও অস্বীকার করে নাই, যদিও অবস্থার ফেরে তাহাকে কেবল কিস্তিবন্দী করিয়া দেনা পরিশোধ করিতে হইয়াছে। যখন এবারের যুদ্ধ বাধিল, তখনও পূর্বের দেনা সকলের ঘাড়ে। কাজে কাজেই আমেরিকাকে সাবধানে নগদে (cash and carry) যুদ্ধের যাবতীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে হইতেছিল। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের সহানুভূতি নিশ্চয়ই ইংরেজ-ফরাসীর দিকে ছিল, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা মার্কিন জাতি কখনও ভুলিতে পারে না। কারণ তাহাদের অনেক টাকা ইউরোপের বাজারে মারা গিয়াছিল। ইংরেজ গবর্মেণ্ট সমস্ত সাম্রাজ্যের আর্থিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া এবং মার্কিন জাতির

নিকট নাগরিকগণের যে কোন পাওনা সংগ্রহ দ্বারা মার্কিন জাতির সমর-সরবরাহের আর্থিক দাবি মিটাইতে লাগিল। যুদ্ধকালে ইংলণ্ডের নিজের শিল্প পঙ্গু ও রপ্তানি ব্যাহত, রাজস্বের আয় সংকীর্ণ, ঋণ করিয়া অর্থাগমেরও একটা সীমা আছে—এই নানা অসুবিধার মধ্যেও বিচক্ষণ এই ব্রিটিশ জাতি ১৯৪০ সনের শেষ পর্যন্ত মার্কিন দেশের সহিত নগদে কারবার চালাইল। তখন জার্মান ইউবোটের দৌরাত্ম্যে আটলাণ্টিক মহাসাগর মথিত হইতেছে এবং সরবরাহ নানা ভাবে বাধা পাইতে লাগিল। আমেরিকা দেখিল, এভাবে চলিলে মিত্রপক্ষের যুদ্ধজয় সম্ভব নহে; পরন্তু যেরূপে জার্মান ইউবোট মার্কিন জাহাজ আক্রমণ ও ধ্বংস করিতেছে, তাহাতে আমেরিকাও নিরাপদ নহে। সুতরাং মিত্রশক্তি যাহাতে অবাধে সরবরাহ পায়, তাহার জন্ত মার্কিনকে ব্যবস্থা করিতে হইল। আমেরিকা তখন কাগজে-কলমে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, মিত্রপক্ষে যুদ্ধের মাল যোগান দিলেও যুদ্ধে কোন পক্ষে যোগ দেয় নাই। ১৯৪১ সনের ১১ই মার্চ আমেরিকার কংগ্রেস ঋণ-ইজারা আইন পাস করিল এবং ইহার বলে অবাধে যুদ্ধের সরবরাহ পাঠানো সম্ভব হইল। কেহ যেন না মনে করেন যে, এই আইন দ্বারা দানের ব্যবস্থা হইল। সেরূপ কিছুই হইল না, নগদ কারবারের পরিবর্তে ধার দেওয়া মঞ্জুর হইল। অধমর্ণকে আপাতত নগদে পরিশোধ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইল মাত্র। পরস্পরে চুক্তি করিয়া স্থির হইল যে, এই ঋণের বদলে অধমর্ণ নানা ভাবে সাহায্য করিবে ও পরিশোধের চেষ্টা করিবে। অবশ্য এই আইন অনুযায়ী কেবল যে সকল দ্রব্যাদি বাজারে অপ্রাপ্য এবং যুদ্ধের জন্যই দরকার, সেই সকলের সরবরাহের ব্যবস্থা হইল মাত্র। ক্রমে ক্রমে প্রায় সকল দ্রব্যই দুর্মূল্য হইয়া পড়িল, সুতরাং শেষ পর্যন্ত প্রায় সকল দ্রব্যই ঋণ-ইজারার তালিকা-ভুক্ত হইল।

১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা নিজেই যুদ্ধে লিপ্ত হইল। তখন হইতে এই ঋণ-ইজারা সরবরাহ বিরাট আকার ধারণ করিল। মিত্রপক্ষের প্রত্যেক দেশই এই সাহায্য পাইবার অধিকারী হইল। আমেরিকার আত্মরক্ষার জন্য মিত্রপক্ষের প্রত্যেক জাতিকেই এই সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন। সে যেভাবে পারিবে, ইহা পরিশোধ করিবে এবং ইহার ব্যবস্থা ও শর্তাদি স্থির করিবেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নিজে। এই ঋণ-ইজারার লেন-দেন দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যেই হইতে পারিবে। এত প্রেমের সহিত আইনটা পাস হইলেও ইহাতে নগদ পরিশোধের কথাও বাদ পড়ে নাই। তবে কারবার ডান হাত বাঁ হাতে হইবে না, রহিয়া সহিয়া হইবে—ইহাই ব্যবস্থা হইল। ঋণ-ইজারার সাহায্যের এই সুবিধার জন্যই ইউরোপ ও এশিয়ায় মিত্রশক্তি জয়ী হইতে পারিয়াছে। ইরানের ভিতর দিয়া সাহায্য রুশ দেশে পৌঁছিয়াছিল বলিয়া জার্মানদের গতি রোধ

হইয়াছিল এবং পরে তাহাদিগকে পরাজিত করা সম্ভব হইয়াছিল। বিমানপথে কোটি কোটি টাকার জিনিস ভারত হইতে চীনে গিয়াছিল, তাই মহাচীনের মৃত্যু হয় নাই।

১৯৪৪ সনের ২৩এ আগষ্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসের নিকট ঋণ-ইজারার সাহায্যের যে হিসাব পেশ করেন তাহা হইতেই বুঝা যায়, এই বিরাট ব্যবস্থার জন্যই যুদ্ধজয় সম্ভব হইয়াছিল। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট বলেন যে, আমরা যুদ্ধকালের ব্যবহারের জন্য এ পর্যন্ত ঋণ-ইজারা শর্তে ছোট বড় নানা রকমের ১৪০০ জলযান দিয়াছি। * * * মিত্রশক্তিকে ঋণ-ইজারা শর্তে ত্রিশ হাজার বিমান দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া তাহারা সাত হাজার বিমান নগদ দামে কিনিয়াছে। আমাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বিমান আছে। ঋণ-ইজারা বিমান-সরবরাহ খুব বেশি মনে হইলেও ইহা আমাদের মোট উৎপাদনের পনরো ভাগ মাত্র। আমরা আমাদের মিত্রদের ছাব্বিশ হাজার নয় শত ঋণ-ইজারা ট্যাঙ্ক এবং ছয় লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছয় শত নানা রকমের মোটর-গাড়ি সরবরাহ করিয়াছি। ঋণ-ইজারা সাহায্যের একশত ভাগের সাতানব্বই ভাগই যাইতেছে আমাদের প্রধান মিত্রশক্তি ব্রিটিশ, রুশ ও চীনের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের মোট যুদ্ধজয়ের একশত ভাগের পনরো ভাগ মাত্র ঋণ-ইজারা সাহায্যে ব্যয়িত হইতেছে।

পরে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, ঋণ-ইজারার ব্যবস্থা দ্বারা আমেরিকা ভবিষ্যতে খুবই লাভবান হইবে, তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়িবে, বিশেষভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য। ঋণ-ইজারার দ্বারা যুদ্ধজয় হইলেও ইহাই শেষলাভ নহে, এইবারে পৃথিবীর বাণিজ্য মার্কিনের করতলগত হইবে। তাহারই পূর্বাভাষ চারিদিকে দেখা যাইতেছে।

ওয়াশিংটনের গত ৩০এ আগষ্টের (১৯৪৫) খবরে জানা যায় যে, মিত্রপক্ষের মোট ঋণ-ইজারার দেনা ৪২০২ কোটি ডলার। ইহার শতকরা ৪২ ভাগ ইংলণ্ডের ও ২৮ ভাগ রুশিয়ার দেনা। শতকরা ১৩ ভাগ গিয়াছে আফ্রিকায় এবং ১২ ভাগ গিয়াছে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে। অবশ্য এই বিরাট ঋণ-ইজারা দ্রব্য-সরবরাহের বদলে আমেরিকা অনেক সাহায্য পাইয়াছে। ১৯৪৫ সনের ১লা এপ্রিল পর্যন্ত ঋণ-ইজারা সম্পর্কে এই ফেরত সাহায্যের পরিমাণ ৫৬০ কোটি ডলার এবং ইংলণ্ডই ইহার মোটা অংশ বহন করিয়াছে।

ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশকে যথেষ্ট সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং জাপানের বিরুদ্ধে চীনকেও বিরাট সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য যে বিরাট পুঞ্জীভূত মালপত্র স্থলপথে চীনের ভিতর দিয়া জাপান আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রাখা

হইয়াছে, তাহা যুদ্ধ থামিয়া যাইবার দরুন অন্ত কাজে লাগিবে। চীনকে যে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে (১৯৪৫ সনের জুন পর্যন্ত), তাহার মূল্য ২৯ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার।

ভারতবর্ষকে ১৯৪৫ সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত ২০৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ডলার মূল্যের সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। এই সাহায্যের জন্ত ব্রহ্মদেশে ও প্রাচ্যে জয় সম্ভব হইয়াছে। ভারতের জন্ত যুদ্ধের কলকব্জাই আসিয়াছে ৪৭ কোটি ১০ লক্ষ ডলার মূল্যের অর্থাৎ মোট সাহায্যের শতকরা ২৩ ভাগ। অবশ্য ভারতবর্ষও এই সাহায্যের বদলে ৫১ কোটি ৬৭ লক্ষ ১৩ হাজার ডলার মূল্যের দ্রব্যাদি দিয়াছে, যাহার জন্য আমেরিকা কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছে। ভারতবর্ষ আমেরিকার সৈন্তগণকে ৬২ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড খাদ্য সরবরাহ করিয়াছে, যাহার ডলার মূল্য ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৭ হাজার।

ইউরোপে যুদ্ধ থামিবার কিছু পরেই ঋণ-ইজারার শর্তে রুশিয়ার সহিত কারবার বন্ধ হয়। কিন্তু ইহাতে সোভিয়েট কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। পৃথিবীর বাজারের ধারী কারবারে সোভিয়েটের স্থান নাই। অতবড় তিনটি (শেষেরটার মাঝামাঝি যুদ্ধ আরম্ভ হয়) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রুশজাতি নগদে চালাইয়াছে। না খাইয়া কাঁচামাল সরবরাহ করিতে হইয়াছে তবে আমেরিকা ও জার্মানি প্রভৃতি জাতির নিকট হইতে বাণিজ্য-বিনিময় সাহায্য পাইয়াছে। নিতান্ত বর্তমান যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধ, যাহার জয়ে আমেরিকার স্বার্থ জড়িত, এজন্য অন্তান্ত মিত্রশক্তির সহিত সোভিয়েটও ঋণ-ইজারার সুবিধা পায়। অবশ্য এই সাহায্য না পাইলে এবং পূর্ব রণাঙ্গণে সোভিয়েট বিজয়ী না হইলে এই মহাযুদ্ধের গতি কি হইত বলা শক্ত। এখন হইতে রুশিয়ার সহিত কারবার চলিবে নগদে।

কিন্তু রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান যখন ঋণ-ইজারার অন্তিম ঘোষণা করিলেন, তখন ইংলণ্ডে হৈচৈ পড়িয়া গেল। কারণ ঋণ-ইজারার ব্যবস্থা নূতন ধরনের এবং যুদ্ধকালীন হইলেও ইঙ্গ-মার্কিন লেন-দেন সম্পর্ক এরূপ ক্ষণভঙ্গুর হইবে, ইংলণ্ড তাহা আশা করে নাই। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ইংরেজ এক পর্যায়ভুক্ত ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। অথচ মার্কিনরা আইনত যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে আর ঋণ-ইজারা চালাইতে পারে না। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ইংলণ্ড ও যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতিসমূহের প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেও ঋণ-ইজারার সাহায্য চালু রাখায় তাঁহার আইনগত অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। ইংরেজপক্ষে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ও লর্ড কেইন্‌স্‌ তদ্বির চালাইতেছেন, যাহাতে ইঙ্গ-মার্কিন লেন-দেন সম্পর্ক বজায় থাকে। ইতিমধ্যে শুনা গিয়াছিল, বার্ষিক শতকরা ২½ সুদে মার্কিন ৩০ বৎসরের মেয়াদে মোটা ধার দিতে প্রস্তুত। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইংলণ্ডকে আবার নূতন করিয়া মোটা দেনা ঘাড়ে লইতে হইবে। গত যুদ্ধের পরে লেন-দেনের ব্যাপার যাহা

দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে আর এ বিষয়ে কাহারও রুচি নাই। রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান সত্যই বলিয়াছিলেন যে, ঋণ-ইজারার দেনা শোধ দিতে বলিলে এখনই আবার যুদ্ধ বাধিবে, এবারে মিত্রদের নিজেদের মধ্যে। সুতরাং কাহাকেও বিপদে ফেলা আমেরিকার ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে হয় না। আবার আমেরিকা কেবল অর্থের সহিত প্রেম বিলাইবে বর্তমানকালের রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনীতিতে এরূপ কোন নজির পাওয়া যায় না। হয়তো ঋণ ইজারার বাকি পাওনা আমেরিকা এই বলিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে, যেন ইহা তাহার নিজেরই যুদ্ধব্যয়। তাহাও যতটা সম্ভব উসুল করিয়া। ইতিমধ্যেই প্রত্যেক দেশের নিকট হইতে বেশ একটা অংশ ফেরত ঋণ-ইজারা হিসাবে (Reverse Lend-Lease) পাওয়া গিয়াছে। গত ২৬এ আগষ্টের খবরে জানা যায়, ঋণ-ইজারা শর্তে ইংলণ্ডের মোট দেনা ৩১৯ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ড, ইহার মধ্যে ইংলণ্ড ৮৩ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ডের দ্রব্যাদি ফেরত ঋণ-ইজারা বাবদে দিয়াছে। সুতরাং এখনও দেনা ২১৮ কোটি ৭৬ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড পরিশোধনীয়। ঋণ-ইজারার বাদবাকি মাল মাত্র বিক্রয় বা ফেরত লইবার জন্য মার্কিন ব্যাপারী ইরান শেষ করিয়াই ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং ঋণ আদায় সম্পর্কে মার্কিন জাতির উৎসাহের তারিফ না করিয়া থাকা যায় না।

এই ঋণ-ইজারা শুরু হওয়ায় ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল (Master Agreement) তাহার অন্যতম শর্ত এই যে, যেরূপ পরস্পরের সহযোগিতায় যুদ্ধ পরিচালিত হইবে, যুদ্ধোত্তরকালেও সেইরূপ সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। যাহাতে আন্তর্জাতিক শুল্কের বাধা ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত না করে, তাহা করিতে হইবে। পরস্পরের এই চুক্তি অবলম্বন করিয়াই ১৯৪১ সনের ১২ আগষ্ট রুজভেল্ট-চার্চিল যে যুক্ত ঘোষণা করেন, তাহাই বিখ্যাত আটলান্টিক চার্টার বা সনদ। যুদ্ধ জয় হইয়াছে, ঋণ-ইজারার মেয়াদ শেষ হইয়াছে, এখন যুদ্ধোত্তরকালে মার্কিনবাসীরা বলিতেছে যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্বাণিজ্যে যে পরস্পরের সুবিধা আছে (Imperial Preference), তাহা তুলিয়া দেওয়া উচিত। অথচ আমেরিকা নিজে শুল্ক প্রাচীরের অন্তরালে যে নিজের শিল্পবাণিজ্য রক্ষা করিতেছে, সে সম্পর্কে কাহারও বলিবার সাহস নাই। কারণ বর্তমান জগতে আমেরিকা উত্তমর্ণ আর সকল জাতিই দেনদার। মার্কিণ জাতি অস্ত্রবলেও কাবুলীওয়ালার স্থান গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ শক্তি রাখে। তবে মার্কিন জাতি ভদ্র ভাষা ব্যবহার করে, ইহাই সান্ত্বনা।

আজ সমস্ত পৃথিবী এক-দেশ হইতে চলিয়াছে। মিত্রশক্তির জয়ের অর্থ পৃথিবীর কয়েকটি জাতি অর্থাৎ আমেরিকা ইংলণ্ড ফরাসী রুশিয়া চীন ও সেই সঙ্গে অন্যান্য নগণ্য জাতির জয়। এক কথায় সম্মিলিত জাতিসমূহের জয়। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় মার্কিন,

ইংলণ্ড, ও অন্যদিকে সোভিয়েটে (?) যুক্তশক্তির জয়। চীন ও ফরাসী বিশেষভাবে ঐ সকল জাতির অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য জাতির অবস্থা আরও নগণ্য। কেবল দলে ভারী করিবার জন্য এবং ইঙ্গ-মার্কিন প্রাধান্য ও শোষণ অব্যাহত রাখিবার জন্য দলে ভারী করা হইয়াছে মাত্র। সোভিয়েট অবস্থার ফেরে মূল আদর্শ হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। স্বদেশে সে সাম্যবাদী হইলেও বিশ্বরাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদীর সহায়ক। তাহার পররাষ্ট্রনীতিকে সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ বলা চলে। কিন্তু ইহা নিছক পুঁজিপতিদের সাম্রাজ্যবাদ হইতে পৃথক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কুড়ি বৎসরের জন্য ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি এই নূতন সোভিয়েট-সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম নিদর্শন। অবশ্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এই সকল চুক্তির মূল্য কতকাল স্থায়ী কিছুই বলা যায় না। এই সেদিন যে ত্রিশ বৎসরের জন্য চীন-সোভিয়েট চুক্তি হইল, তাহাও এক বৎসরের নোটিসে বাতিল হইতে পারে। সম্মিলিত জাতি-সংঘের বড় বড় বুলি সত্ত্বেও ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না যে নূতন করিয়া আবার সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ব্যবসাপদ্ধতি চালু হইতে চলিয়াছে। কিন্তু যে জগৎ এই মহাযুদ্ধের আলোড়নে জাগিয়াছে, সে ঘুমাইয়া পড়িবে না। পৃথিবীর পরাধীন জাতিসমূহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদীর হাত-বদলের ভিতর দিয়া মুক্তির আলো দেখিয়াছে। সে আলো হইতে তাহাকে আর পরধীনতার পুরাতন অন্ধকারে লইয়া যাওয়া চলিবে না। তাই অত্যাচারী ও সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুদে ওলন্দাজ-সরকার এখন জাপমুক্ত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করিতেছে। ইংরেজ জাতি সাম্রাজ্যের পরাধীন জাতি সকলকে নকল স্বায়ত্তশাসনে ভুলাইয়া রাখিতে চায়। স্বাধীনতার সার বস্তু (Substance of Independence) দিতে একেবারেই নারাজ, কিন্তু কোন চেষ্টাই স্বাধীনতার আদর্শ হইতে পরাধীন দেশগুলিকে বিচ্যুত করিতে পারিবে না; কারণ তাহারা এই মহাযুদ্ধের সঙ্কটকালে যে স্বাধীনতার বাণী শুনিয়াছে ও প্রতিশ্রুতি পাইয়াছে, যুদ্ধজয়ের শেষে তাহার বাস্তব মূর্তি দেখিতে চায়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বিপুল ধরার দুর্গম পথে পথে
তুমিই রয়েছ সহস্র রূপ ধরি,
আমারে চালায়ে লইতেছ কোনমতে
তাই বার বার তোমারে প্রণাম করি।

দিনের ঝলক রাতের তমসা মাঝে
ভাষাহীন আশা-আশ্বাস তব বাজে,
আলো নিবে যায় তিমির-ভ্রান্ত সাঁঝে
সমুখে দীর্ঘ ভয়ার্ত বিভাবরী,—
তখনি তোমার তারা-ঝলমল রথে
তুমি জেগে ওঠ, ক্লান্ত নয়ন 'পরি।

কত বার বার ক্ষণ-কুয়াশার মোহে
তুমি যে রয়েছ সে কথা গিয়েছি ভুলে,
কত বার বার সুরভির সমারোহে
গাঢ় অনুরাগে চাপিয়া ধরেছি ফুলে।
ফুলের আড়ালে তোমার সম্ভাবনা
হারাইয়া গেছে, হায় রে অন্যমনা,
পারি নি ধরিতে সূক্ষ্মের ব্যঞ্জনা
পরশলোলুপ কামনা করেছি স্থূলে ;
যেটুকু পেয়েছি শুধু তারি আগ্রহে
কে দিল তাহারে দেখি নাই চোখ খুলে।

এমনি করিয়া কেটে গেল বহু দিন,
কত যে কাটিবে হিসাব কে রাখে তার,
আমি দেখিয়াছি সুরপ্রগল্‌ভ বীণ,
দেখি নি কাহার পরশে কাঁপিছে তার।
সে পরশখানি বিরাজে ভুবনময়,
বিশ্বাস নাই, শুধু আছে সংশয়
ঘুমের মাঝারে জননীর বরাভয়
করে অনুভব শিশুরাই অনিবার—
শিশুর মতন নহি আমি স্নেহলীন
সংশয়-মূঢ় তাই মোর হাহাকার।

অনেক দুঃখ পেয়েছি জীবনভোর,
ভাণ্ডারে তব জানি জানি আছে ক্ষমা,

দৃঢ় করিতেছ প্রতিদিন মায়াডোর,
যা করিবে দান সকলি করিছ জমা।
এ ভরসা মনে নাহি থাকে অহরহ,
লোভী মন কয়, যাহা পায় কেড়ে লহ,
সুমুখে তোমায় দুর্গম কালীদহ,
দিবস-অন্তে অমাবস্যার অমা—
ভাবি না কো তুমি চির-আশ্রয় মোর,
কভু বা বন্ধু, কভু প্রিয়া মনোরমা।

আঘাতে আঘাতে আমারে জাগায়ে রাখো,
বন্ধু, তোমার সেই গাঢ় ভালবাসা,
আঘাতের ছলে তুমি কাছে কাছে থাকো,
ব্যথিত জনের প্রতিদিন বাড়ে আশা।
জানি একদিন সবখানি দেবে ধরা,
সুন্দরতর হবে এ বসুন্ধরা,
বিশ্বাস আছে তাই কিছু নাই ত্বরা,
শুধু জানি তব প্রেম যে সর্বনাশা—
সুখসম্পদে যদি আজ মোরে ঢাকো,
সবই নেবে টেনে বন্যা সে কূল-ভাসা।

তুমি অনুখন স্মরণে থাকো না মম,
তাই ভুল হয়, মরি যে বিপথে ঘুরে,
'আমি আমি' মোর গাঢ় অহমিকা-তম
'তুমি'রে আমার ঢেকেছে চিত্তপুরে।
হঠাৎ চমকে ভাঙিবে সে মোহ ঘোর,
বুঝিব কে তুমি, আমি কতটুকু মোর,
নিমেষে ছিঁড়িবে 'আমি'র বাঁধন-ডোর
'তুমি' সুর হয়ে বাজিবে হৃদয় জুড়ে,
যে তুমি আড়ালে তাহারেই নমোনমঃ
যে তুমি নিকটে কবে সে মিলাবে দূরে!

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

ছেলেবেলায় একবার অজ্ঞান ক'রে আমার পায়ের তলা থেকে ট্যাংরা মাছের কাঁটা বের করা হয়েছিল। ক্লোরোফর্মের মাঝের অবস্থার মতন বেশ একটা সুখদায়ক নেশায় মাথাটা রিমঝিম করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। আমি অনুভব করতে লাগলুম, রাজকুমারীর নাক দিয়ে ভকভক ক'রে একটা সুগন্ধ গরম হাওয়া আমার মুখের ওপরে এসে পড়ছে। কিছুক্ষণ—কতক্ষণ, সে সময়ের হিসাব দিতে পারব না, তারপরে আর কিছু মনে নেই।

ঘুমের মধ্যে মনে হতে লাগল, কে যেন আমার ডান হাতখানা ধ'রে মোচড় দিচ্ছে। যন্ত্রণা বাড়তে বাড়তে ঘুমটা ছুটে গেল। মনে হতে লাগল, দেহের ওপর যেন দশ মণের একটা তুলোর বস্তা চাপানো। চোখ চেয়ে দেখি, ঘরটা আধা-অন্ধকার, দূরে জানলার একটা পাল্লা খোলা রয়েছে, রাজকুমারীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে আদুড় গায়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে আমি প'ড়ে রয়েছি, আমার ডান হাতখানা তার গলার নীচে, আর তার একটা হাত আমার গলার ওপরে আড়াআড়িভাবে প'ড়ে রয়েছে। অনেক কায়দা-কসরৎ ক'রে তার গলার তলা থেকে হাতখানা বের ক'রে নিতেই তার ঘুম ভেঙে গেল।

তাড়াতাড়ি পায়ের তলা থেকে লেপটা টেনে নিয়ে উভয়কে চাপা দিয়ে তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে রাজকুমারী বললে, গোপাল, ঘুম ভাঙল ?

আমি বললুম, হ্যাঁ, সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে।

রাজকুমারী উঠে পড়ল। আমিও উঠে নিজেদের ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, পরিতোষ তখনও এপাশ-ওপাশ করছে।

দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে পরিতোষের সঙ্গে আমার অভিনব অভিজ্ঞতার কথা আলোচনা করছি, এমন সময় 'গোপাল' ব'লে রাজকুমারী ঘরে এসে ঢুকল। তাকে দেখেই মনে হ'ল, সে স্নানে চলেছে। বগলে একটা পুঁটুলি ও হাতে সেই কমণ্ডলু। বললে, চল গোপাল, স্নান ক'রে আসি।

প্রস্তাবটা শুনে তো আমার পায়ের নখ থেকে আরম্ভ ক'রে মাথার চুল অবধি শিউরে উঠল। কি সর্বনাশ! এখন স্নান! মনে মনে জপ শুরু ক'রে দিলুম, জয় জয় বিশ্বনাথ! দেখো বাবা, শেষ অবধি রক্ষে ক'রো।

আমতা-আমতা ক'রে বললুম, নাঃ, সন্ধ্যের সময় স্নান করা আমার অভ্যেস নেই, অসুখ হয়ে যাবে।

গুরুমা সে কথা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, না না, কিছু হবে না, গঙ্গা নাইলে কখনও অসুখ করে! নাও নাও, উঠে পড়।

পরিতোষ বললে, বেশ তো, চ না, গঙ্গা নেয়ে আসা যাক।

গুরুমা বললেন, না বন্ধু, তুমি বাড়ি থাক। চল গোপাল, ছেলেমানুষি করে না, ওঠ।

পরিতোষ গুরুমার সঙ্গে আমড়াগাছি জুড়ে দিলে, যা না, যা না, কি হয়েছে? গুরুমা যখন বলছেন, তখন কিছু হবে না।

হায় রে আমার বরাত! মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে সন্ধ্যাবেলায় গঙ্গাস্নান! হোক না সে কাশীধামের গঙ্গা! বিশ্বনাথ, এবার তোমার ওপরেও যে ভক্তি ছুটে যায় বাবা!

চোখে জল এসে গিয়েছিল। গুরুমা চোখের জল দেখে এগিয়ে এসে আমাকে আদর ক'রে ক'রে বলতে আরম্ভ করলেন, গোপাল আমার সত্যিকারের গোপাল। শীতকালে চানের নাম শুনে চোখে জল এসে গিয়েছে। কিছু ভয় নেই, আমি তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দোব, কিছু শীত লাগবে না। এই দেখ, তোমার কাপড় নিয়েছি।

দেখলুম, গুরুমার বগলদাবায় আমার ধুতিখানাও পাট করা রয়েছে, যেখানা সকালে স্নান ক'রে ছেড়ে দিয়েছিলুম।

গুরুমা আমাকে এমন আদর করতে লাগলেন যে, আমার লজ্জা করতে লাগল।

শেষকালে উঠতেই হ'ল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। দুপুরে ঘেমেছি, সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান ক'রে ঠাণ্ডা হতে হবে, উপায় নেই। র‍্যাপারখানা গায়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম।

বাড়ির খুব কাছেই গঙ্গা। দু-চারটে গলি পার হয়ে এসেই একটা বড় অজানা ঘাটে এসে উপস্থিত হলুম। ঘাটে নরনারীর অন্ত নেই, কিন্তু আশ্চর্য রকমের নিস্তব্ধ। অনেকে ঘাটের চাতালে ব'সে আছে, কেউ নিঃশব্দে মালা জপছে। দু-একজন স্ত্রীলোক আমাকে দেখিয়ে গুরুমাকে জিজ্ঞাসা করলে, ছেলেটি কে?

গুরুমা জবাব দিলেন, এ একটি ছেলে, আমার আপনার লোক!

যাই হোক, বলিদানের পাঁঠার মতন কাঁপতে কাঁপতে ঘাটের দীর্ঘ

সোপানাবলী অতিক্রম ক'রে তো উত্তরবাহিনীর সম্মুখীন হওয়া গেল। অন্ধকার বেশ ঘোর হয়ে আসা সত্ত্বেও পুণ্য-কামী ও কামিনীদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। গুরুমা 'এস গোপাল' ব'লে জলে নেমে পড়লেন। আমি মরিয়া হয়ে জামা ও র‍্যাপারখানা সিঁড়িতে ছেড়ে তাঁর পিছু পিছু জলে নেমে উপরি উপরি তিন-চারটে ডুব মেরে কাঁপতে কাঁপতে ঘাটে গিয়ে উঠলুম। সিঁড়িতে গুরুমার গামছা ছিল, তাই দিয়ে বেশ ক'রে মাথা, গা, হাত, পা মুছে কাপড় ছেড়ে জামা গায়ে দিয়ে র‍্যাপার জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। সে সময় স্নান করাটাকে ততখানি সাংঘাতিক মনে করেছিলুম, দেখলুম, ব্যাপারটা ততখানি সাংঘাতিক নয়। বরঞ্চ বেশ ভালই লাগতে লাগল। গুরুমা ধীরে-সুস্থে স্নান সেরে আমার হাত থেকে গামছা নিয়ে জলে দাঁড়িয়েই মাথা মুছলেন, তারপরে ঘাটে উঠে আমার ছাড়া কাপড়খানা কেচে নিংড়ে আমার হাতে দিলেন, তারপরে শাড়ি ছেড়ে নতুন শাড়ি প'রে ছাড়া শাড়িখানা কেচে আমার হাতে দিয়ে এক কমণ্ডলু জল ভ'রে নামাবলীখানা গায়ে দিয়ে আমাকে বললেন, চল।

চলতে চলতে এক জায়গায় এসে বললেন, গোপাল, তুই বাড়ি যা, আমায় কয়েক জায়গায় জল দিতে হবে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি আসছি।

বাড়িতে ফিরে দেখি, পরিতোষ রসিয়ার মায়ের সঙ্গে সশব্দে গল্প জুড়ে দিয়েছে, উভয়ের উচ্চহাস্যে বাড়ি একেবারে জমজমাট।

শুনলুম, বাজার থেকে তিন পয়সার ভাং আনিয়ে দুজনে খেয়েছে, বেশ ফুর্তিতেই তাদের সন্ধ্যাটি কাটছে।

আমি আসবার কিছুক্ষণ পরে রসিয়ার মা উঠে গিয়ে কাপড়গুলো শুকোতে দিলে। তারপরে উনুনে আগুন দিয়ে ময়দা মাখতে ব'সে গেল।

পরিতোষের সঙ্গে ব'সে ব'সে আকাশে প্রাসাদ তৈরি করছি, এমন সময় গুরুমা বাড়ি ফিরলেন। আমরা ঘরে ব'সে শুনলুম, তিনি রসিয়ার মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার গোপাল ফিরেছে?

রসিয়ার মা কি বিড়বিড় ক'রে বললে, শুনতে পেলুম না। তারপরে ও-ঘর রান্নার আওয়াজ হতে লাগল।

ঘণ্টা দুয়েক পরে খাবার ডাক পড়ল। গুরুমার ঘরে গিয়ে দেখলুম, একখানা আসনে তিনি বসেছেন আর দুখানা আসন খালি। আমরা ঢুকতেই তিনি

বললেন, বন্ধু, ব'সে পড়, আর রাত ক'রে কি হবে? গোপাল, তুমি এখানে ব'স। এই ব'লে তাঁর পাশের আসনটি আমাকে দেখিয়ে দিলেন।

খাওয়া শেষ হতে সাড়ে নটা বেজে গেল। রাজকুমারীর ঘরে একটা বড় ঘড়ি ছিল, সেটা আধ ঘণ্টা অন্তর ব'লেই চলতে লাগল, চলেছে দিন, চলেছে রাত।

মুখ-টুখ ধুয়ে নিজেদের ঘরে এসে ঘুম লাগাবার ব্যবস্থা করছি, এমন সময় মাঝের দরজা খুলে নিজের ঘর থেকেই রাজকুমারী ডাক দিলে, গোপাল!

যাই।—ব'লে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে তার ঘরে ঢুকতেই মাঝের দরজাটায় সে হুড়কো দিয়ে দিলে।

দেখলুম, রসিয়ার মা এঁটো বাসন তুলে ঘর নিকিয়ে দিয়ে গিয়েছে। নিবন্ত উনুনে একটা বড় ডেক্‌চি চড়ানো, তাতে জল সোঁ-সোঁ করছে। আমাকে খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসতে ব'লে সে উনুন থেকে গরম জল নামিয়ে ঘরের কোণ থেকে একটা আধ-ভরা বালতি এনে ঠাণ্ডা জলে গরম জল মিশিয়ে আমার পা ধুতে আরম্ভ ক'রে দিলে। আমি হাঁ-হাঁ ক'রে আপত্তি করতেই আমার পায়ে ছোট্ট একটি চাপড় মেরে বললে, চুপ কর্।

পা মুছিয়ে দেবার পর বললে, এবার পা তুলে বিছানায় উঠে ভাল ক'রে ব'স্।

আমি বিছানায় উঠে বসতেই রাজকুমারী দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিজে পা ধুতে বসল। প্রায় সাড়ে দশটা অবধি বেশ ক'রে হাঁটু অবধি ধুয়ে পা মুছে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল, আমি পায়ের কাছে ব'সে রইলুম।

রাজকুমারী গল্প করতে লাগল, গোপাল, খেয়ে পেট ভরেছে তো? রাত্রিবেলা বাড়িতে কি খেতে? কে রান্না করত? এখানে কেমন লাগছে? বন্ধুর কেমন লাগছে? বন্ধুর কথা শুনে আমায় ফেলে পালিও না যেন!

এমন সময় রসিয়াকি মায়ি কি বলতে বলতে দরজাটা ফাঁক করতেই রাজকুমারী হাঁ-হাঁ ক'রে চীৎকার করতে করতে বিছানায় উঠে ব'সে তাকে বললে, যা যা, ঘরে ঢুকিস নি যেন, ঘরে গোপাল রয়েছে জানিস না?

রসিয়ার মা তাড়াতাড়ি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েই বললে, গা টেপাবে না?

রাজকুমারী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, না না, তুই খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়্‌গে যা।

এই কথাগুলো ব'লেই সে দুই হাতে মাথা মুখ ঢেকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। রসিয়ার মাম্মি কি ব'লে চ'লে গেল, রাজকুমারী কোনও জবাবই দিলে না।

একটু পরেই ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে রাত্রি এগারোটা বাজল; কিন্তু মনে হতে লাগল, যেন রাত্রি দুটো বাজল। চারদিকে থমথম করছে। কোথাও কোন শব্দ নেই, শুধু ঘরের ঘড়িটা একটানা টকটক আওয়াজ ক'রে চলেছে। ঘরের এক কোণে পিলসুজের ওপর রেড়ির তেলের প্রদীপ মেঝের খানিকটা আলোকিত করেছে, কিন্তু খাটের ওপরে আলো-আঁধারে মেশা স্নিগ্ধ বিভা। বই পড়া যায় না বটে, কিন্তু সব কিছুই দেখা যায়। চারদিকের সমস্ত বস্তুই ধীর স্থির, মধ্যে মধ্যে দীপশিখাটাও নিষ্কম্প হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু আমার মগজের মধ্যে একটার পর একটা চিন্তার কম্পন ঢেউ খেলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল, কাল রাত্রে ভবিষ্যতের চিন্তায় দুই বন্ধুতে আকুল হয়ে উঠেছিলুম। কোথায় থাকব, কোথায় শোব, কোথায় খাব, এই ভাবনায় সারারাত্রি ঘুমুতে পারি নি—কিন্তু আমাদের অগোচরে বিশ্বনাথ কি মনোরম ব্যবস্থাই ক'রে রেখেছিলেন! ভাবতে ভাবতে মন দিশাহারা হয়ে যেতে লাগল। কে এ রাজকুমারী! এর কোন পরিচয়ই আমার জানা নেই, অথচ আমার সমস্তই সে জানে। আজ সকালে পর্যন্ত যার অস্তিত্ব আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল, এই মুহূর্তে সে-ই আমার পরম বন্ধু। এর চেয়ে বড় বিস্ময় আমার জীবনে ইতিপূর্বে আর আসে নি।

চোখ বুজে বিশ্বনাথকে অজস্র ধন্যবাদ জানাতে লাগলুম। কৃতজ্ঞতায় মাথা একেবারে নুয়ে পড়ল নীচের দিকে। চোখ চেয়েই দেখি, রাজকুমারীর ধপধপে সুডৌল পা দুখানি নিস্পন্দ হয়ে প'ড়ে আছে সামনে।

বিশ্বনাথের চরণতল থেকে একবারে রাজকুমারীর পদতলে উন্নীত হয়েই মনটা এক অভিনব আনন্দরসে আপ্লুত হয়ে গেল। পা—যাকে মানবদেহের একটা অতি তুচ্ছ অঙ্গ ব'লে এতদিন মনে করেছি, তারই আকর্ষণে আমি যেন অভিভূত হয়ে পড়তে লাগলুম। পদসেবা করবার একটা দারুণ বাসনার সঙ্গে আমার মজ্জাগত ভদ্রতা ও সামাজিকতার লড়াই শুরু হয়ে গেল বুকের মধ্যে। শেষকালে আমার সমস্ত মনোবৃত্তিকে হারিয়ে দিয়ে পদসেবাই জয়যুক্ত হ'ল। কাঁপতে কাঁপতে একখানা হাত তার পায়ের ওপরে রাখলুম।

রাজকুমারী যেন এতক্ষণ এরই প্রতীক্ষা করছিল। পায়ে হাত পড়া মাত্র

শতদলের মতন পা দুখানি আমার কোলের ওপর তুলে দিয়ে মৃদু পদসংজ্ঞায় ইঙ্গিত করলেন, নির্ভয়ে চরণসেবায় মন দিতে পার।

রাত্রি প্রায় বারোটার সময় ছুটি পেয়ে নিজেদের ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম। রাজকুমারী মাঝের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে।

অকস্মাৎ এই আশাতীত ভাগ্যপরিবর্তনে আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম বটে, কিন্তু দিন দুয়েকের মধ্যেই আমাদের এই অদ্ভুত জীবনযাত্রা সরল ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল। তার কারণ, রাজকুমারীর ব্যবহারের মধ্যে এমন একটা অমায়িকতা, আপনার ক'রে নেবার এমন একটা মিষ্টি কৌশল ছিল যে, দিন দুই যেতে না যেতেই মনে হতে লাগল যে, এ আমাদের অতি আপনার জন। এতদিন যেন বিদেশে কোথায় প'ড়ে ছিলুম, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছি। বর্তমানকে এমন মধুময় ও ভবিষ্যৎকে সে এমন রঙিন ক'রে তুলত যে আর কি বলব! শুধু তাই নয়, সংসারের সমস্ত কাজে, এমন কি দেনা-পাওনার কাজে পর্যন্ত সে আমাদের এমন কর্তৃত্ব দিত যে, মধ্যে মধ্যে আত্মহারা হয়ে মনে হ'ত, সে-ই বুঝি আমাদের আশ্রিতা।

একদিন রাজকুমারী পরিতোষকে বললে, বন্ধু, তোমার তেতলার ভাড়াটে যে আজ তিন মাস ভাড়া দিচ্ছে না, আসছে মাসে যে টেক্স দিতে হবে, কোথা থেকে দেবে শুনি?

তেতলার যে ভাড়াটেকে রাজকুমারী তাগাদা দিতে বললে, এখানে এসে অবধি তাকে দেখছি। বিধবা সে, ঘাড় অবধি কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, রঙ উজ্জ্বল শ্যাম, দীর্ঘ দেহ, মুখে সর্বদা একটা প্রসন্নতা বিরাজ করছে। একটি সাত-আট বছরের মেয়ে আছে তার। অল্প বয়সেই বিধবা হয়ে কাশীবাস করতে এসেছে, এখন বয়স তার ত্রিশ হবে। বাড়ির অবস্থা খারাপ নয়। সেখানে বড় বড় ভাশুরপোরা আছে, তাদের বিবিধ অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কাশীতে এসে বিশ্বনাথের চরণে আত্মসমর্পণ করেছে। ভাশুরপোদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট, সে প্রায় তারই সমবয়সী; সে-ই মাসে মাসে নিয়মিত টাকা পাঠায়। মাঝে মাঝে দু-তিন-চার মাস কিছুই আসে না, তারপরে একেবারে তিন-চারশো টাকা এসে উপস্থিত হয়। অবস্থা তার ভালই, তবুও মাঝে মাঝে ভাড়া ফেলে রাখে, নইলে লোকটি বড় ভাল। তার নাম

হচ্ছে জয়া। ভাড়াটে হ'লেও রাজকুমারীর সঙ্গে তার বড় ভাব, ঠাট্টাঠুট্টিও চলে ; রাজকুমারী তাকে 'জয়ি' ব'লে ডাকে।

পরিতোষ বললে, চ তো স্থব্‌রে, আমার সঙ্গে তেতলায়, কেমন ভাড়া দিচ্ছে না একবার দেখি !

রাজকুমারী বাধা দিয়ে বললে, না না, গোপালকে নিয়ে যেও না, তুমিই যাও।

পরিতোষ তিন লাফে তেতলায়ে চ'লে গেল।

ঘণ্টা খানেক বাদে সে নীচে নেমে এসে বললে, ওবেলা সব ভাড়া চুকিয়ে দেবে বলেছে।

সেদিন দুপুরবেলাতেই আবার পরিতোষ তাগাদায় ওপরে উঠল, সন্ধ্যেবেলা আমার স্নান করতে যাবার কিছু আগে সে নেমে এল।

স্নান ক'রে ফিরে এসে রসিয়ার মার মুখে শুনলুম, ভাং-টাং টেনে সে আবার তাগাদায় গিয়েছে।

রাত্রিবেলা রাজকুমারী বাড়ি ফেরবার পর সে নেমে এসে বললে, আজ আর ভাড়া দিতে পারলে না। কোনও ভয় নেই ; ও ঠিক দিয়ে দেবে, বেশ ভাল লোক।

আমি একটু ঠাট্টা করতেই রাজকুমারী বললে, না না বন্ধু, গোপালের কথা শুনো না। দিনরাত লেগে থেকো, মাগী ভারি বজ্জাত, ও মুখের মিষ্টি কথায় ভুলো না, পয়সার আণ্ডিল মাগী, কিন্তু কিছুতেই বের করতে চায় না।

রাজকুমারীর নির্দেশ পরিতোষ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে আরম্ভ করলে। অর্থাৎ দিনরাত্রি জয়াগিন্নীকে তাগাদা দিতে লাগল। অচিরেই বিশ্বনাথ তার এই বিপুল অধ্যবসায়ের ফল হাতে হাতে দিয়ে দিলেন ; কারণ দিন তিনেক বাদেই একদিন রাত-দুপুরে ঘরে শুতে এসে দেখি, পরিতোষ বিছানায় নেই। বাইরে গিয়েছে মনে ক'রে তার অপেক্ষা করতে লাগলুম, কিন্তু রাত্রি দেড়টার পরও সে ফিরল না দেখে বুঝে নিলুম, তাগাদার ফল ফলেছে।

দিনগুলি বেড়ে কাটতে লাগল। সত্যি কথা বলতে কি, এমন নিরঙ্কুশ শান্তিময় দিন আমার জীবনে আর আসে নি। স্কুলের তাড়া নেই, বাবার ভয় নেই, পরীক্ষার বিভীষিকা নেই, অথচ ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শুধু দুটো বছর কোনও রকমে কাটাতে পারলে হয়। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মুখটুখ

ধুয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে দুজনে মিলে দশাশ্বমেধ ঘাটে যাই। পরিতোষ ও রাজকুমারী স্নান করে, আমি স্নান করি না, কারণ সান্ধ্যস্নান আমার বাধ্যতামূলক। রাজকুমারী তার ভিজে শাড়ি ও গামছা আমাদের হাতে দিয়ে চ'লে যায় মন্দিরে। আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটের বাজার থেকে তরি-তরকারি ও যেদিন যা প্রয়োজন, তা কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে রসিয়ার মার হাতে সেগুলো জিম্মে ক'রে দিয়ে রাত্রের বাসি লুচি, তরকারি ও ক্ষীর দিয়ে জলযোগ করি। জলযোগান্তে পরিতোষ ওপরে চ'লে যায় ভাড়ার তাগাদায়, কারণ ভাড়া তখনও আদায় হয় নি। আমি শুয়ে শুয়ে বিছানা মাপতে থাকি। রাজকুমারী ফিরে এলে গল্প ক'রে তার রান্নায় সাহায্য করি। খাবার একটু আগেই পরিতোষ নেমে আসে। আহারান্তে পান-টান না খেয়েই আবার চ'লে যায় তাগাদা করতে, আর আমি কোনদিন সম্মোহিত আর কোনদিন বা মোহিত হয়ে রাজকুমারীর কুসুমপেলব আলিঙ্গনের মধ্যে আত্মহারা হয়ে ভাসতে ভাসতে চ'লে যাই ভাব-যমুনার তরঙ্গ বেয়ে।

সন্ধ্যের সময় রাজকুমারীর সঙ্গে গঙ্গাস্নান ক'রে একলা বাড়ি চ'লে আসি, রাজকুমারী চ'লে যায় শিবের মাথায় জল ঢালতে। ফিরে এসে দেখি, পরিতোষ আর রসিয়ার মায়ি ভাঁড়ে ক'রে ভাঙের শরবত খাচ্ছে, ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝতে পারি, জয়াগিন্নীর কাছেও একটি বড় ভাঁড় পৌঁছে গেছে। ভাং খেয়েই সে তাগাদায় চ'লে যায় তেতলায়, রাজকুমারীর বাড়ি ফেরবার আগেই নেমে আসে। রাত্রে আহারাদির পর পরিতোষ চ'লে যায় জয়াগিন্নীর কাছে, বলে, তার মেয়েকে এ বি সি ডি শিখিয়ে সেখানেই শুয়ে পড়ি।

আর আমি? আমি রাত্রি বারোটা অবধি রাজকুমারীর অঙ্গসংবাহন করি: প্রতি রাত্রেই নতুন অভিজ্ঞতা! কোন রাত্রে মনে হয়, দু-হাতে চামেলী-ফুল দলন করছি; আবার কোন রাত্রে মনে হয়, যেন কেতকীকুসুম চয়ন করছি। কোনদিন সে কাঁদতে থাকে, কি আকুলতা সে ক্রন্দনে, অতি করুণ সে কান্না! কোনদিন বা দমকা চাপা হাসির আওয়াজে চমকে উঠি। কোন-দিন সে ভাঙা গলায় 'গোপাল' নাম জপ করতে থাকে। কখনও বা ঘামতে ঘামতে দেহ পাথরের মতন ঠাণ্ডা ও নিস্পন্দ হয়ে যায়; ভয় হতে থাকে; মনে হয়, দেহে বুঝি প্রাণ নেই। ধাক্কা দিয়ে দিয়ে সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনি। বিচিত্র সে অভিজ্ঞতা!

মানুষ মাত্রেই, সে নারী হোক বা পুরুষই হোক, ভালবাসার শক্তি তার সহজাত, কিন্তু ভালবাসা প্রকাশ করবার শক্তি, সে দেবদুর্লভ। ঠিক রসিক ও কবিতে যে পার্থক্য।

সে এক অভিনব শক্তি, যার আকর্ষণের আবর্তে পড়লে প্রতি প্রভাত, দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা, রাত্রি, জীবনের প্রতি মুহূর্ত মনে হতে থাকবে, এত সুখ, এত আনন্দ এর আগে আর কখনও পাই নি। আকাশ ও ধরণীতল, পশু পক্ষী লতা কীট ও নরনারী, চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা—প্রকৃতির যেখানে যা কিছু আছে, তারা যে কত সুন্দর, তারা যে কত আপনার, সকলের সঙ্গে একত্ববোধে যে কি আনন্দ, কোনও ভাষাতেই সে অনুভূতির বর্ণনা করা যায় না।

সে এক অদ্ভুত শক্তি, যার স্পর্শে মন থেকে বয়সের তারতম্য ঘুচে যায়, সুন্দর কুৎসিতের ভেদাভেদ মুছে যায়। আঁখি মেলে যখনই তাকে দেখি, মনে হয়, এই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। যতক্ষণ সে কাছে থাকে, ততক্ষণ মনে হয়, আমি যেন তার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছি; যতক্ষণ সে কাছে থাকে না, ততক্ষণ তারই চিন্তায় নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে আত্মহারা হই; আবার তারই আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে নিজের অস্তিত্ববোধ ফিরে আসে—সন্তানের আবির্ভাবে নারীর অন্তরে যেমন জননীত্বের বোধ জাগে।

সে যেন নিত্যই নতুন, প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তনশীলা। কখনও মমতাময়ী, কখনও কঠিনা, কখনও মোহিনী কখনও জননী, কখনও রূপসী কখনও প্রেয়সী, কখনও দাসী কখনও মহীয়সী—নিত্য নতুন, প্রতি মুহূর্তেই নতুন। মাধুর্যের বিশাল মহাসাগরের তরঙ্গাঘাতে মুহূর্তে মুহূর্তে নব নব ফেনপুঞ্জ উঠছে, আবার সেই সাগরের জলেই তা মিলিয়ে যাচ্ছে। অদ্ভুত সে অভিজ্ঞতা!

রাজকুমারী ছিল সেই নারী, ভালবাসা প্রকাশ করবার গুপ্তবিদ্যায় সে ছিল ওস্তাদ। সে ছিল সেই কবি, পূর্বজন্মের পুণ্যফল ব্যতিরেকে যার কাব্য উপভোগ করা যায় না।

দিনগুলি যে কি রকম কাটছিল, বোধ হয় তার আর বিশদ বর্ণনা করতে হবে না। এরই মধ্যে দুই বন্ধুতে মিলে মাঝে মাঝে এদিক সেদিক—একেবারে চৌক অবধি ঘুরে আসি। পরামর্শ ক'রে ঠিক করা গেছে, কাপড়ের ব্যবসা করাই ঠিক হবে। দু-বছর পরে হ'লেও দোকানটা কোথায় ফাঁদা যেতে পারে, এখন থেকেই তার স্থান ঠিক ক'রে রাখি। বড় দোকান ফাঁদতে হবে। নানা জায়গায় ব্র্যাঞ্চ

খুলতে হবে। রাজকুমারী বলেছে, যত টাকা লাগে দেবে। পরিতোষ একদিন অত্যন্ত সহজভাবে স্বীকার করলে, জয়া-গিন্নীও তাকে ওই রকমই একটা আশ্বাস দিয়েছে। অস্থিরকেও আনিয়ে নিতে হবে। আমি, পরিতোষ ও অস্থির এই তিনজনে সমান অংশীদার হব, হৈ-হৈ ক'রে আমাদের ব্যবসা চলবে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। এই সব কথা জানিয়ে অস্থিরকে একখানা চিঠি লিখ্‌ব-লিখ্‌ব করছিলুম, কিন্তু পরিতোষ বাধা দিয়ে বললে, এখন দিনকতক যাক।

আমি ঠিক করলুম, একদিন রাজকুমারীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তারপরে অস্থিরকে চ'লে আসতে লেখা যাবে, এখন তাড়াতাড়ি করবার কোন দরকার নেই।

বাদশা হারুণ-অল-রশিদ আবুল হাসানকে এক দিনের জন্যে রাজত্ব দিয়ে কেড়ে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু রাজত্বের বিনিময়ে আবুল হাসান পেয়েছিল রওশন আরাকে, সেও এক রাজ্য! আমার বাদশা এ-জীবনে আমাকে বহুবার রাজত্ব দান করেছেন; অকৃতজ্ঞতা করব না, সঙ্গে সঙ্গে ভাল ভাল রাজকুমারীও পেয়েছিলুম। কিন্তু রাজত্ব কেড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারই তিনি রাজকুমারীকেও কেড়ে নিয়েছেন।

জয়া-গিন্নীর সঙ্গে পরিতোষের পরিচয় হবার বোধ হয় দিন পনেরোর মধ্যেই একদিন সকালবেলা তার ছোট ভাশুরপো হৈ-হৈ ক'রে এসে হাজির হ'ল, সঙ্গে আট-দশটি মোক্ষকামী বিধবা। তাঁরা তীর্থ করতে বেরিয়েছেন, চার ধাম তীর্থ করবেন—অর্থাৎ উত্তরে কেদার-বদরী, দক্ষিণে কন্যাকুমারী ও রামেশ্বর, পূবে কামাখ্যা, পশ্চিমে দ্বারকা শেষ ক'রে পুরুষোত্তমে গিয়ে মাথা মুড়িয়ে যে যার আস্তানায় ফিরে যাবেন। এত বড় পুণ্যকার্যে বিধবা ছোট কাকীকে বাদ দিতে তার মন চায় না ব'লেই তাকে নিতে আসা হয়েছে।

সংবাদটি শুনে তো পরিতোষ বেচারী একেবারে দ'মে গেল। জয়া-গিন্নী গুরুমার অবর্তমানে একবার আমাদের ঘরে এসে কত আদর ক'রে তাকে বুঝিয়ে গেল, মাস ছয়েকের মধ্যেই সে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে, ছ-মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

বোধ হয় দিন দুই পরে তারা চ'লে গেল। যাবার সময় বাকি ঘরভাড়া ও আগাম ছ-মাসের ভাড়া দিয়ে নিজের ঘর দুখানি বাঙাল-মার জিম্মেতে রেখে গেল।

জয়া-গিন্নী চ'লে যাবার বোধ হয় দিন-দশেক পরে একদিন সকালবেলা স্নান সেরে রাজকুমারী বললে, গোপাল, আজ আমার ফিরতে একটু দেরি হবে রসিয়ার মায়িকে ব'লো, ঘণ্টাখানেক পরে যেন উনুনে আগুন দেয়।

রাজকুমারী চ'লে গেল মন্দিরের দিকে, আমরা বাড়িমুখো রওনা হলুম পথের মাঝে প্রতিদিনই একটা উঁচু রোয়াকে জনকয়েক লোককে ব'সে আড্ডা দিতে দেখতুম। রাজকুমারী প্রতিদিনই আমাদের সেই রাস্তাটুকু পার ক'রে দিয়ে একটা গলি দিয়ে অন্য পথে চ'লে যেত, আর আমরা বাড়ির দিকে চ'লে যেতুম। এই রোয়াকটার সামনে দিয়ে যখন আমরা যেতুম, তখন সেই লোকগুলো হুমড়ি খেয়ে আমাদের দেখতে থাকত আর নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি ক'রে চেঁচিয়ে অর্থাৎ আমাদের শুনিয়ে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিত।

সেদিন এই রোয়াকটা পার হয়ে বোধ হয় দশ পাও অগ্রসর হই নি, এমন সময় পেছন থেকে ভাঙা গলায় কে যেন ডাকলে, ওহে ছোকরারা!

আমরা ফিরে দাঁড়াতেই দেখি, একটা ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা লোক, বোধ হয় মাসখানেক দাড়ি কামানো হয় নি, লিকলিকে রোগা, আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

লোকটাকে রোজই দেখি, তাদের হাসি প্রতিদিনই পিঠে এসে বিঁধতে থাকে, সুযোগ পেলে ওই হাসিকে একদিন কান্নায় বিগলিত করবার একটা প্রবল বাসনাও মনের মধ্যে উদ্যত হয়ে আছে; তার ওপরে কলকাতার ভদ্রসমাজে ছোকরা কথাটা সে সময় ছিল অত্যন্ত অভদ্র উক্তি। ওহে ছোকরা— ব'লে আমাদের কেউ ডাকলে নির্ঘাত সেখানে মারামারি বেধে যেত।

একে সেই ছোকরা ডাক, তার ওপরে আহ্বানকারীর সেই অপরূপ চেহারা, তার ওপরে প্রতিদিনকার সেই হ্যা-হ্যা হাসির ইতিহাস, এই সব মিলিয়ে মনের মধ্যে হাঙ্গামা বাধাবার একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা লাফালাফি করতে শুরু ক'রে দিলে।

ফিরে দাঁড়িয়েই আমি বললুম, কি বলছ?

লোকটা ধমকের সুরে বললে, বলি, এসই না এদিকে।

পরিতোষ বললে, দরকার থাকে তো এখানে এসেই বল না। তোমার চাকর নাকি যে ডাকলেই যেতে হবে?

পরিতোষটাকে চিরকাল ভয়তরাসে ব'লেই জানতুম। দেখলুম, জয়া-গিন্নি

কদিনেই তাকে মানুষ ক'রে তুলেছে। আমাদের তরফ থেকে উত্তরের সুর শুনে, তারা দু-তিনজন টপটপ ক'রে রোয়াক থেকে নেমে আমাদের কাছে এগিয়ে এল।

ঝাঁকড়া-চুলো জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়ি কোথায় হে?

লোকগুলো কাছে আসতেই ভকভক ক'রে গাঁজার গন্ধ বেরুতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলুম, কেন বল দিকিন?

দরকার আছে।

আমাদের বাড়ি কলকাতায়। তোমার বাড়ি কোথায় বল তো?

লোকটা সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে, লক্ষ্মীমণি কে হয় তোমাদের?

কে লক্ষ্মীমণি?

দু-বেলা দেখছি, তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আর লক্ষ্মীমণিকে চেনো না যাদু!

গুরুমার কথা বলছ?

হ্যাঁ হ্যাঁ।

উনি আমাদের গুরুমা হন।

কথাটা শুনেই লোকগুলো হো-হো ক'রে হেসে উঠল, আবার খানিকটা গাঁজার গন্ধ পেলুম। হাসি থামিয়ে একজন আর একজনকে বললে, ওহে, বদ্যিনাথকে খবর দাও, তার মাসী এবার জোড়া-ছোঁড়া পাকড়াও করেছে।

একজন লোক রোয়াক থেকে লাফিয়ে প'ড়ে ছুটল বদ্যিনাথকে খবর দিতে।

সরু গলি হ'লেও ইতিমধ্যে কয়েকজন বাঙালী বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল মজা দেখতে। দেখলুম, একজন বিরাটদেহ ফোঁটাতিলকধারী পাণ্ডাগোছের লোকও দাঁড়িয়ে শুনছে আমাদের বাগ্‌যুদ্ধ।

ইতিমধ্যে ঝাঁকড়া-চুলো একেবারে আমার ওপর প'ড়ে শাসাতে লাগল, দেখ যাদু, তোমাদের ও কলকাতার চালাকি এখানে চলবে না, বুঝলে? এ কাশী, এখানে চালাকি করলে—। এই ব'লে অশ্লীল ভাষায় একটা গালাগালি দিলে।

তখন রাস্তায় বেশ লোক দাঁড়িয়ে গেছে।

অনেকদিন একাধারে মাধুর্যরসের চর্চা ক'রে মন থেকে হাঙ্গামা-হুজ্জতের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণটা আমার একরকম মুছেই গিয়েছিল। এতদিন

পরে আকস্মিক এই আহ্বানে মঙ্গল-দেবতা একেবারে মাথায় চ'ড়ে বসলেন। বিদেশ-বিভুঁই, বন্ধুবান্ধব কেউ নেই, একটা হাঙ্গামা হ'লে বাঁচাবে কে—এই সব ভেবে এতক্ষণ সংযমই অভ্যাস করছিলুম। কিন্তু ঝাঁকড়া-চুলোর মুখে ওই গালাগালি শুনে একেবারে জ্ঞান হারিয়ে ফেললুম। আমার হাতে রাজকুমারীর ভিজে শাড়িখানা ছিল, আমি চীৎকার ক'রে উঠলুম, পরিতোষ, ধর্ তো এটা।

আমার কথা শেষ হবার আগেই পরিতোষ ঝাঁকড়া-চুলোর কানপাটায় এমন একটি চপেটাঘাত ঝাড়লে যে, লোকটা ঘুরতে ঘুরতে একটা বাড়ির দেওয়ালে গিয়ে দড়াম ক'রে প'ড়ে গেল।

একটা হৈ-হৈ ব্যাপার শুরু হয়ে গেল। ঝাঁকড়া-চুলোর বন্ধুরা টপাটপ রক থেকে লাফিয়ে প'ড়ে মারমুখো হয়ে আমাদের দিকে তেড়ে এল। আমরাও তৈরি। দু-এক হাত ঘুষোঘুষিও হয়ে গেল, এমন সময় সেই পাণ্ডাগোছের ষণ্ডা লোকটি মাঝে প'ড়ে আমাদের তারিফ করতে লাগল, সাবাস বেটা—সাবাস। তারপরে অপর পক্ষকে ধিক্কার দিয়ে বললে, লজ্জা করে না এইটুকু বাচ্চা ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করতে! রাস্তায় স্ত্রী পুরুষ যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল, তারা সকলেই ওদের ধিক্কার দিতে আরম্ভ ক'রে দিলে। এমন সময় যে লোকটা বদ্যিনাথকে খবর দিতে গিয়েছিল, সে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে বললে, বদ্যিনাথ বাড়িতে নেই।

বললুম, বদ্যিনাথ এলে পাঠিয়ে দিও, আমাদের মাথা একেবারে কেটে নিয়ে যাবে 'খন।

বাড়িতে এসে রসিয়ার মায়িকে রাজকুমারীর শাড়ি ও গামছা দিয়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে খাটের ওপরে বসেছি, এমন সময় বাঙাল-মা উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি দাদু, লোকগুলোর সঙ্গে কি হাঙ্গামা লাগিয়েছিলে?

রাজকুমারীর বাড়িতে দোতলা ও তেতালা মিলিয়ে আট-দশ ঘর ভাড়াটে থাকত, সকলেই বিধবা। শুধু সে বাড়ি কেন, আশপাশের প্রায় সব বাড়িতেই দেখতুম, প্রায় ঘরে ঘরেই বিধবা ভাড়াটে। সকলেই তারা বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে কাশীবাস করতে এসেছে, কেউ স্বেচ্ছায়, কেউ বা বাধ্য হয়ে। এদের মধ্যে অনেকেরই দেশে খেয়ে প'রে স্বচ্ছন্দে থাকবার মতো সঙ্গতি ছিল, কিন্তু আত্মীয়দের ভাঁওতায় তারা জেনেছে, তাদের কিছুই নেই

এরা কাশীতে এসেছে জীবনটুকু কোন রকমে কাটিয়ে দিয়ে এইখানেই মরবে এই আশায়। পূর্বজন্মের অনেক পাপের ফলে এ জন্মে বৈধব্য ভোগ করতে হ'ল, আর যেন জন্ম না হয়, আর যেন বিধবা হতে না হয়।

আহার্য তাদের নামমাত্র। বেলা তৃতীয় প্রহরে ভাতের সঙ্গে ডাল, কুমড়ো-বেগুন-সেদ্ধ; কারুর ভাগ্যে খই, বাতাসা; কারুর ভাগ্যে কিছুই নেই। এদের মধ্যে কেউ কেউ ভাগ্যবতী, কারণ তাদের বাড়ি থেকে তিন টাকা পাঁচ টাকা, কারুর বা দশ টাকা আসে, প্রথম প্রথম মাসে মাসেই আসত, এখন কখনও কখনও। সে টাকা কেউ বা দয়াপরবশ হয়ে পাঠায়, কেউ তাদেরই সম্পত্তির অংশ থেকে পাঠায়, কিন্তু প্রতিবারই টাকা পাঠাবার সময় তাদের মনে হয়, মাগী আর কতকাল বাঁচবে, কতকাল আর এই ভাবে টাকা পাঠাতে পারা যায়!

এদের মধ্যে অনেকেই কেউ বা কোনও তীর্থযাত্রী পরিবারে দু-বেলা রেঁধে, কেউ বা কাঁথা সেলাই ক'রে, কেউ বা বড়ি দিয়ে মাঝে মাঝে কিছু রোজগার করে। বছরে দুখানা কি তিনখানা থান, মাসে আট আনা এক টাকা থেকে তিন টাকা ঘর ভাড়া যোগাড় করতেই হবে। মধ্যে মধ্যে নানা প্রদেশের রাজা-মহারাজা এসে বিধবাদের কম্বল বিতরণ করে, তারই কখনো একখানা পাওয়া যায়, তাই দিয়ে কাশীর দুর্জয় শীত নিবারিত হয়। র‍্যাপার কিংবা শাল যার আছে, সে ভাগ্যবতী।

সংসারে তাদের আপনার কেউ নেই, তারাও কারুর নয়। বাইরের ঘটনাবলী, সে যতই উত্তেজক বা চাঞ্চল্যকর হোক না, এদের জীবনে তা কোনও রেখাপাতই করে না। জীবন-মৃত্যু কিছুর প্রতিই তাদের বিরাগও নেই, কোন আকর্ষণও নেই। বৈচিত্র্যহীন তরঙ্গহীন জীবনপ্রবাহ স্থিরভাবে ব'য়ে চলেছে মরণ-সাগরের পানে।

ধর্মকর্মের কোনও স্পষ্ট ধারণা তাদের নেই (কারই বা আছে!)— অথচ প্রায় প্রত্যেকেই একটা না একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে চলে। ধর্মের নামে যে কোন লোক যা বলে, তাই তাদের কাছে সাময়িক সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। বিচার করবার শিক্ষা, শক্তি বা ধৈর্যও তাদের নেই।

এরা কাশীতে এসেছে মরবে ব'লে, কারণ এখানে মরলে আর জন্মাতে

হবে না; কিন্তু নিত্য শত শিবের মাথায় জল ঢালে, শিবের মত স্বামী পাবে বলে। কোনও ঘটনাই তাদের মনে চাঞ্চল্য জাগায় না, কারণ তারা জানে, এমন কোন ঘটনাই ঘটতে পারে না, যার দ্বারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। এই সত্যই তাদের কাছে একমাত্র সত্য। এরই পায়ে আত্মসমর্পণ ক'রে তারা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। যত দেরিই হোক, একদিন না একদিন বিশ্বনাথ দেখা দেবেনই মহেশ্বরের রূপ ধ'রে। অতি করুণ সে আত্মসমর্পণ! মৃত্যুদণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তি ফাঁসির দড়ির কাছে যেমন ক'রে আত্মসমর্পণ করে।

এদের মধ্যে কেউ বা কখনও হয়তো পাথেয়স্বরূপ কারুকে পায় সঙ্গীরূপে। কিন্তু হায়! নারীর সাহচর্যে এলেই অধিকাংশ সুবোধ পুরুষের মন থেকে ভদ্রতার খোলস ঝ'রে প'ড়ে যায়। আবার এক অভিনব দুর্বিপাকের আবর্তে তাকে ফেলে দিয়ে সে ব্যক্তি স'রে পড়ে। অথবা কোনও সত্যিকারের ভদ্রলোক আমরণ একত্রেই জীবন কাটিয়ে দেয়, সকলের কাছে ঘৃণ্য হয়েও সে নারী নিজে ধন্য হয়। সবাই তাকে গালাগালি দেয়, ঈর্ষ্যার মেঘ থেকে নিন্দার বজ্র বর্ষিত হয়।

আগে যে বাঙাল-মার কথা উল্লেখ করেছি, তিনি এই বাড়িরই তেতলায় বাস করতেন। বয়স আশি পার হয়ে গেলেও বেশ শক্ত-সমর্থ ছিলেন। পূর্ববঙ্গের কোন এক পল্লীগ্রামে ছিল তাঁর পিত্রালয়, শৈশবেই পিতৃহীন হয়েছিলেন। বাপের কথা মনে নেই, বিধবা মার একমাত্র সন্তান, আদরেই মানুষ হচ্ছিলেন। এর বেশি বাপের বাড়ির কথা আর স্মরণ নেই।

বাঙাল-মার জীবন-কথা তাঁর নিজের জবানিতেই বলি।

ছ-সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়ে মাকে ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি চ'লে গেলুম। সেখানে তারা অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বড় দালান-বাড়ি তিনমহলা, জমি-জমা চাকর-দাসী জনমজুর, জমজমে সংসার। গোলাভরা ধান, গোয়াল-ভরা গাই-বলদ। সংসারে শ্বশুর নেই, চারটি ভাই একেবারে রাম-লক্ষ্মণ, আমি হচ্ছি ছোট বউ। শাশুড়ী বুকে তুলে নিয়ে নিজের সন্তানের মতন মানুষ করতে লাগলেন। কোন কষ্ট নেই, দুঃখ নেই, শুধু মধ্যে মধ্যে মার জন্যে মন কেমন করতে থাকে, তাই কান্নাকাটি করি। শাশুড়ী মাঝে মাঝে মাকে আনিয়ে বাড়িতে রাখেন, আনন্দে দিন কাটে।

তারপরে এল যৌবন। সিঞ্চলে সূর্যোদয়ের মতন মর্মাচলের শিখরে শিখরে

অনুরাগের ছোপ একটু একটু ক'রে লাগতে আরম্ভ করেছে মাত্র, এমনই এক দিনে মা এসে তাঁর জামাইকে ধরলেন, বাবা, আমার তো ছেলে নেই ; তুমিই আমার ছেলে, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, ছেলের কাজ কর। একটা বিধবার সেখানে থাকতে কতই বা খরচ হবে! মাসে তিনটে টাকা হ'লেই আমার চ'লে যাবে।

মা ছিলেন ভালমানুষ। এজন্যে আমার শ্বশুরবাড়ির সকলেই, ভাশুরেরা পর্যন্ত তাঁকে পছন্দ করতেন। মার ছিল অল্প বয়েস, আমার বড় ননদ মার চেয়ে বয়েসে বড় ছিল। শাশুড়ী মাকে মেয়ের মতন যত্ন করতেন, এলে ছাড়তে চাইতেন না।

ভাশুরেরা সব ভাইয়ে মিলে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলেন, সরকারী তহবিল থেকে মাসে পাঁচ টাকা ক'রে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, আর আমার স্বামী গিয়ে তাঁকে কাশীতে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

তখন নৌকো চ'ড়ে কাশী যাওয়া হ'ত।

ভাশুরেরা তাঁদের মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে এলেন, মার অনুমতি বিনা কিছুই হবার জো নেই। শাশুড়ী ছেলেদের মুখে সব শুনে বললেন, আমিও কাশীবাসী হব।

বাড়িতে হৈ-হৈ প'ড়ে গেল। মার কাশী যাওয়া সে তো চাট্টিখানি কথা নয়! সবাই তাঁকে মানা করতে লাগল, ভাশুরেরা আমার স্বামীর নাম ক'রে বলতে লাগলেন, ওর ছেলেপিলের মুখ দেখে তার পরে যেও। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা, কাশীবাসী হবেনই।

অগত্যা বন্দোবস্ত শুরু হ'ল। ঠিক হ'ল, আমার বড় ও মেজো ভাশুর, আমার বড় জা, শাশুড়ী ও মা যাবেন। মাকে ও শাশুড়ীকে সেখানে স্থিতি করিয়ে দিয়ে দুই ভাশুর ফিরে আসবেন বড় জাকে নিয়ে, সে প্রায় ছ-মাসের ধাক্কা।

বাইরে সব বন্দোবস্ত চলেছে। শুভযাত্রার বোধ হয় আর মাসখানেক দেরি আছে। শাশুড়ী প্রতিদিনই সন্ধ্যের সময়, কোনদিন কোন বউকে, কোনদিন কোন ছেলেকে ডেকে উপদেশ দেন। আমাকে দিনরাত বলেন, মা লক্ষ্মী, তুমি এ সংসারে সবার শেষে এসেছ, শেষ অবধি দেখো, যেন আমার

শ্বশুরের সংসার না ভেঙে যায়। আমার স্বামীকে কোন উপদেশ দিতে গেলে তিনি কোন কথা কানে না তুলে মাকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে থাকেন।

এমনই দিন চলেছে, এমন সময় চৈত্র মাসের প্রথমেই ওলাউঠা হয়ে তিন দিনের দিন আমার স্বামী মারা গেলেন।

তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা কালবৈশাখীর ঝড় বুকে ভ'রে নিয়ে আমাদের নৌকো তিনটি বিধবাকে নিয়ে কাশীর দিকে ভেসে চলল, সঙ্গে রইলেন মেজো ভাশুর।

কাশীতে এসে পৌছেছিলুম ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগে (অর্থাৎ আজ থেকে এক শতাব্দীরও পূর্বে)। মা, শাশুড়ী ও আমি তিনটি বিধবা—তখনকার দিনে মাসে দু-টাকায় একজন বিধবার রাণীর হালে চ'লে যেত। আর আজ পাঁচ টাকাতেও চলে না।

এখানে এসে কত ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামীই দেখলুম, সে সবার ইতিহাস বলতে গেলে এমন একটা মহাভারত হয়ে যাবে।

বাড়ি থেকে মাসে মাসে নিয়মিত টাকা আসতে লাগল। আমাদের তিনটি বিধবার কোন কষ্টই ছিল না। বছর দশেক এই ভাবে স্বচ্ছন্দে কাটবার পর আমার শাশুড়ী মাস ছয়েক আমাশায় ভুগে ভুগে কাশীতে দেহরক্ষা করলেন, আমার বয়েস তখন ছাব্বিশ, মার বয়েস বেয়াল্লিশ।

তখন আমার বড় মেজো দুই ভাশুর গত হয়েছেন, একমাত্র ছোট ভাশুর জীবিত।

শাশুড়ীর অসুখ করা থেকে আরম্ভ ক'রে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা নিয়মিত বাড়িতে খবর পাঠিয়েছিলুম, মাঝে মাঝে ছোট ভাশুর জবাবও দিতেন ; কিন্তু সেখান থেকে মাকে কেউ দেখতে আসে নি। শাশুড়ীর শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে যাবার পর মেজো ভাশুরের এক ছেলে আমাকে ও মাকে গালাগালি দিয়ে এক দীর্ঘ পত্র লিখে জানালে যে, আমরা তার পিতামহীকে বিনা চিকিৎসায় মেরে ফেলেছি।

মা ওদের চিঠি প'ড়েই বললেন, ব্যস্, আর ওরা খরচপত্র পাঠাবে না ব'লে মনে হচ্ছে, এবার তা হ'লে কাজকর্মের যোগাড় করতে হয়।

মার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফ'লে গেল। সেই থেকে তারা আর আমাদের

কোনও খোঁজই নেয় নি, টাকাকড়িও আর পাঠায় নি। অনেক চিঠি লিখেছিলুম, কিন্তু তার কোনও জবাবই পাই নি।

সেই থেকে দুই মা-বেটীতে কখনও লোকের বাড়িতে রান্নার কাজ ক'রে, জাঁতা ভেঙে, কাঁথা সেলাই ক'রে, বড়ি দিয়ে দুজনের পেট সুখে দুঃখে চালিয়ে নিতে লাগলুম। দেখতে দেখতে কাশীর কত পরিবর্তনই হ'ল, কত লোক এল গেল, আমরা দুটি বিধবা অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে চললুম। একমাত্র ভাবনা, আমাদের মধ্যে কে আগে যায়, কে প'ড়ে থাকে। যে আগে যাবে, সেই বেঁচে যাবে। শেষকালে মা-ই আগে চ'লে গেল, সেও আজ পঁচিশ-তিরিশ বছর হবে।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

উপনিষদ

প্রথম খণ্ড

কেন

মনকে নিবিষ্ট করে কোন্ সে চালক
প্রাণকে চালিত করে কোন্ কর্ণধার
কাহার ইচ্ছায় মোরা বাক্য বলিতেছি
চক্ষু দেখে কর্ণ শোনে প্রেরণায় কার ॥ ১ ॥

কর্ণের কর্ণ তিনি মনের মানস
বাক্যের বাক্য তিনি প্রাণের পরাণ
চক্ষুর চক্ষু তিনি জ্ঞানীগণ তাই
এই লোক ত্যাগ করি অমরত্ব পান ॥ ২ ॥

চক্ষু যায় না সেথা বাক্য যায় না
মন সেথা গমন না করে
জানি না কেমন তাহা, জানি না কেমনে
জানাব অপরে ॥ ৩ ॥

জানার বাহিরে তিনি, অথচ আবার
অজানাও নন
শুনিয়াছি বলেছেন পূর্বাচার্যগণ ॥ ৪ ॥

বাক্যের অতীত যিনি অনির্বচনীয়
বাক্যেরে করেন যিনি বাক্‌শক্তিমান
তিনিই পরমব্রহ্ম নিশ্চয় জানিও
নয় তাহা লোকে যার করে গুণগান ॥ ৫ ॥

মন দিয়া যাঁরে লোকে ধরিতে না পারে
যিনি নিজে মনকেই মনন করান
তিনিই পরমব্রহ্ম জান বারে বারে
নয় তাহা লোকে যার করে গুণগান ॥ ৬ ॥

চক্ষু দিয়া যাঁরে দেখা নাহি যায় কভু
চক্ষুরে করেন যিনি নিজে দৃষ্টিদান
তিনিই পরমব্রহ্ম জানিও নিশ্চয়
নয় তাহা লোকে যার করে গুণগান ॥ ৭ ॥

কর্ণ দিয়া যাঁরে কভু নাহি যায় শোনা
কর্ণকে নিজেই যিনি শ্রবণ করান
তিনিই পরমব্রহ্ম জানিও কেবল
নয় তাহা লোকে যার করে গুণগান ॥ ৮ ॥

ঘ্রাণে যার অনুভূতি নাহি মিলে কভু
নাসাকে নিজেই যিনি করান আঘ্রাণ
তিনিই পরমব্রহ্ম জানিও নিশ্চয়
নয় তাহা লোকে যার করে গুণগান ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছি আমি, যদি মনে কর
অল্পই জানিয়াছ তবে

দেবতার মাঝে তার যেটুকু প্রকাশ
তা-ও বল কতটুকু হবে।
বিচারের অপেক্ষায় আছি—
মনে হয় আমি জানিয়াছি ॥ ১ ॥

জেনেছি উত্তমরূপে নহে সত্য তাহা
জানি না যে তা-ও সত্য নহে
জানি না অথচ জানি, এ জ্ঞান যাঁদের
তাঁহাদেরই ব্রহ্মবিৎ কহে ॥ ২ ॥

'পাই নাই' ভাবে যারা পেয়েছে তারাই
'পেয়েছি' ভেবেছে যারা তারা পায় নাই।
ব্রহ্মের ঠিকানা
অজানার জানা তিনি জানার অজানা ॥ ৩ ॥

প্রত্যক্ষদর্শীই দেখে অমরত্ব জানে সে কোথায়
আত্মবলে বীর্য লভি বিদ্যাবলে অমরত্ব পায় ॥ ৪ ॥

ইহজন্মে কেহ যদি জেনে থাকে তাঁরে পায় সত্য পথ
না জানিলে বিনষ্টি মহৎ
সর্বভূতে তাঁরে হেরি ত্যজি এই লোক
সাধু নিজে হন ব্রহ্মবৎ ॥ ৫ ॥

ক্রমশ
"বনফুল"

বন্ধন-মুক্তি

কাজের জোয়ালে বাঁধা পড়ে যেই জন,
এই ধরণীতে সেই তো ভাগ্যবান—
আশ্রয় খুঁজে মরে মানুষের মন,
কর্ম-স্বরূপে ধরা দেন ভগবান।

বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট

লৌকিকতার লট্‌খটি

আপনারা তো আমায় খুব গাল পাড়েন যে, আমার মত চয্যুণ্ডে, হাড়-কিপ্‌টে, অ-সামাজিক লোক কখনও দেখেন নি, কিন্তু জিগ্যেস করি, জগতে আমার মত অবস্থার লোকের কোন খোঁজ-খবর কখনও রেখেছেন কি ?

আপনাদের কাছে যেটা অতি তুচ্ছ, আমার কাছে যে তার চেয়ে বড় ঝঞ্ঝাট আর কিছু নেই মশাই। আপনাদের মত অবস্থা হ'লে আমিও খুব হেসে-খেলে নেচে-কুঁদে কাটাতে পারতুম, কিন্তু তা তো আর নয়। যে পোড়াকপাল তাতেই আমি যাল, বাড়িতে সংসারটির হাল ধরবার তো আর কেউ নেই, তাই চাপের চোটে নাল ভাঙতে শুরু করেছি।

নিত্যি নতুন ঝঞ্ঝাট, কোথা থেকে কি করি বলুন তো? একে বাজারের এই অবস্থা, তার ওপর লোক-লৌকিকতার লটখটিতে যে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। মাঝে মাঝে মনে হয়, চটি প'রে গুটিগুটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে প'ড়ে সোজা তিব্বতের কোন গুহায় ঢুকে পড়ি, আর সংসারে থেকে কাজ নেই। এত সামাজিক ক্রিয়া-কলাপ পালন ক'রে ভদ্রতা বজায় রাখা সোজা কথা! জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত চলেছেই, এ কি রে বাবা! —কোথাও কমা, সেমিকোলন পর্য্যন্ত নেই, দাঁড়ি তো দূরের কথা।

মশাই, সেজো বউমার ন'কাকীর মেজো পিসীমার সেজো জায়ের ছোট মেয়ের ভাত—বাড়িসুদ্ধ্‌ নেমন্তন্ন, দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষ ক'রে চেঁচালে কি হয়, ঠিক দশ মণ চিনি, বারো মণ ময়দা সবই দেখলুম যোগাড় হয়ে গেল। সেখানে হ'ল বাড়ির নেমন্তন্ন। কোন্‌ সুবাদে যে আমরা কুটুম তা জানি না, তবু ভদ্রতা বজায় রাখতে যেতে হবে, কিন্তু আমার যে প্রাণ যায়! বড়লোকের বাড়ি, একটা ঘটার ভাতের নেমন্তন্ন, অতএব তাঁদের ছেলেকে একটা বড় দেখে রূপোর চুষিকাঠি না দিলে মান থাকে না, তাই দাও।

আমি তবু বললুম, আমার মত অবস্থার লোকের অত চাল দেখানো ভাল দেখায় না, বরং গঙ্গার ঘাট থেকে একটা কাঠের ঝুমঝুমি কিনে দিয়ে আসি।

এই একেবারে সব আমায় মারতে এল। গিন্নী বললেন, তোমার মত অসভ্য আমি দুটি দেখি নি—লোককে ওই রকম কেউ দেয়? তোমার জন্তে আত্মীয়-কুটুমের কাছে পর্য্যন্ত আমার মুখ পুড়বে।

আমি তবু বললুম, আহা, সেটা তো বরাবরই পুড়ে আছে, তার তো আর কিছু ফেরানো যাবে না, অতএব চিন্তার কি আছে? কিন্তু সে কথা শোনে কে?

বাড়ির সব্বাই একমত হ'য়ে বললেন যে, থাক্, ওঁর আর কাঠের ঝুমঝুমি নিয়ে সেখানে হাজিরা দিয়ে কাজ নেই, উনি বাড়িতেই থাকুন।— তাদের নেমন্তন্ন করাই ঘাট হয়েছে! বচনের চোটে চট ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ত্রিলোচন স্যাকরার দোকান থেকে আঠারো টাকা বারো আনা দিয়ে, মশাই, একটা ফং্ফং্ রূপোর চুষিকাঠি কিনে নিয়ে এলুম।

আপনাদের পরমেশ্বর জানেন, কি ক'রে কথাটা চাউর হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তিন-তিনটে ভাতের নেমন্তন্ন। আমিও ক্রমাগত চুষিকাঠি কিনতে শুরু করলুম। এখন বাজিসুদ্ধ ছেলেকে চুষিকাঠি বিলিয়ে নিজের বুড়ো আঙুল চুষছি।

যাক বাবা, ভাত গেল, এল বউ-ভাত। তার ফলে আমি একদম কুপোকাত! সারারাত চোখে ঘুম নেই, কেবল ভাবছি, আমি গেছি! তিনটি আত্মীয়ের ছেলে আর দুটি বন্ধুর ছেলে এই কেলেঙ্কারি ক'রে ব'সে আছেন।

আচ্ছা, এ সব বজ্জাতি ছাড়া কি বলুন তো? আমাকে এসবের জন্তে নেমন্তন্ন করা কেন? স্রেফ জব্দ করব—এই তো? কই, মেয়ের বিয়ের সময় তো কেউ বলে না বাবা, যত বউ-ভাত কি আমার কপালে?

তাও দু-চার জায়গায় চোখ কান বুজে খেয়ে-দেয়ে স'রে পড়লুম, কিন্তু এত সুখ বেশিদিন কপালে সইবে কেন?

এক জায়গায় কি রকম খামকা আক্কেল-সেলামি দিতে হ'ল শুনুন, আর লোকের আক্কেলটাও ভাবুন। ঠিক নীচে, খেয়ে-দেয়ে নামবার সিঁড়ির মোড়টিতে কনেকে বসিয়ে রেখে দিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে যে পালাব, তার জো কি? সেখানে সেলামি না দিয়ে যাওয়া যায়?

গেল। কনের মুখে খুব একগাল হাসি দেখলুম, কিন্তু ভদ্র-মহিলা যদি আমার মুখের দিকটিতে একবার ভাল ক'রে চেয়ে দেখতেন, তা হ'লে যা দিয়েছিলুম তা বোধ হয় আমার হাতেই ফিরিয়ে দিতেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাইরে বেরিয়ে, এলুম, কারণ এর তো আর কোন চারা নেই!

এর চেয়ে দেখলুম আর এক বাড়ির লোক খুব খলিফে! মশাই, খেয়ে-দেয়ে একতলায় নেমে গেছি, এমন সময় কর্ত্তা পাকড়ে ধরলেন, বউমা দেখেছেন তো?

বরাতের ভোগ! থতমত খেয়ে হঠাৎ ব'লে ফেললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, দিব্যি হয়েছে, ওই সিঁড়ির পাশের ঘরটায় ব'সে তো?

তিনি একেবারে এক গাল হেসে ব'লে উঠলেন, আরে, না না, সে তো আমার

মেজো শালী, বউমা নীচে। ব'লেই আমার হাতটা ধ'রে হিড়হিড় ক'রে এক রকম টানতে টানতে বউমার সামনে হাজির ক'রে দিলেন।

পকেটে মাত্র ছটি টাকার একখানি নোট। মনে করুন, শ্যামবাজারে থাকি, খেতে গেছি বালিগঞ্জে, সেইটি ভাঙিয়ে ফেরবার ইচ্ছে, তা আশীর্ব্বাদেতেই হয়ে গেল।

বউ দেখব কি, মাথা তখন বাঁইবাঁই ক'রে ঘুরছে!

লাষ্ট ট্রাম বেরিয়ে গেছে, রাত তিনটের সময় 'হটতাং হটতাং' করতে করতে বাড়ি ফিরে এলুম

গিন্নী দেখি ঠায় জেগে ব'সে আছেন, ঘরে ঢুকতে শুধু একবার গম্ভীর চালে ব'লে উঠলেন, কটা বাজল? আজকাল নেমন্তন্ন কি লোকে সারারাত ধ'রে খাওয়ায়?

জবাবে বলিই বা কি, একেবারে মৌন থাকাই সুবিধেজনক ব'লে চুপ ক'রে রইলুম। এর পর এক হপ্তা ছেলেপুলে মারফৎ স্বামী-স্ত্রীর ডায়লগ চলতে লাগল।

ওঁদের বউমা এলেন, কিন্তু আমায় যে শ্রীমুখপঙ্কজখানি প্রথম দেখালেন, তার জেরটা কি রকম চলল, একবার ভেবে দেখুন। বাপ রে বাপ, কি ঝঞ্ঝাট!

এর পরই গিন্নীর মাসতুতো কোন্ এক বোনের আইবুড়ো-ভাত, তাতে তাঁদের কাপড় আর মিষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। কত সস্তায় সারা যেতে পারে দয়া ক'রে একবার কাগজ-কলমটা নিয়ে বসুন তো, আর সঙ্গে সঙ্গে আর একটা হিসেব করবেন, আমার এক দাদাশ্বশুরের বুড়ো মাসতুতো ভাই সম্প্রতি স্বর্গারোহণ করেছেন খবর পাওয়া গেছে, সেখান থেকেও ছেরাদ্দর নেমন্তন্ন করতে আসবে শুনলুম, সেও আত্মীয়তা বজায় রাখতে গেলে কিছু পাঠাতে হবে, তারও খরচটা ওর সঙ্গে যোগ ক'রে দেখুন যে, সংসারে লোক-লৌকিকতা রাখাটাকে আমি সাধে ঝঞ্ঝাট বলি কি না!

তবু আপনাদের জন্মোৎসব, জয়ন্তী-উৎসব, বিদায়োৎসব, নৃত্যোৎসব, প্রেমোৎসব প্রভৃতি মোচ্ছবের কথা বললুম না, কারণ আপিসে, আড্ডায়, সভায় এসব ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পোয়াতে দেহ প্রায় খোয়াতে বসেছি; সব সত্যি কথা লিখতে গেলে দোয়াতের কালি ফুরিয়ে যাবে, সে আবার আর এক ঝঞ্ঝাট।

শ্রীবিরূপাক্ষ

স্মৃতি

অনেক দিনের অনেক দূরের একটি তারার কথা,
আমার মনের আকাশ ঘিরে জ্বলছে সারা দিন—
অনেক কথায় মাঝে যেন একটু নীরবতা
আজকে হঠাৎ মুখর হয়ে বাজায় চিত্তবীণ।

পলাতক

কোন দিকেই কিছু হ'ল না। যুদ্ধের বাজারে কেরানীগিরি অবশ্য সস্তা ছিল, কিন্তু সস্তা ব'লেই নিতে ইচ্ছে হ'ল না। এদিকে সদ্যোবিবাহিতা স্ত্রী না খেয়ে পল্লীগ্রামে থাকতে রাজি নয়, শহরে আসবেই। আর আসবেই বা না কেন? আমি যদি আলস্য-বিলাসে সর্বজনরঞ্জন কেরানীগিরি না করি, তার জন্যে সে কষ্ট পাবে কেন? আমার অসাধারণ হওয়ার প্রচেষ্টার দাম সে দেবে কেন? তার চেয়ে বিয়ে না করলেই হ'ত। সাধারণ মানুষের অত অসাধারণ হওয়ার চেষ্টা না করাই ভাল। স্ত্রীর এই সব অকাট্য যুক্তি। স্ত্রীর যুক্তি অর্থাৎ স্ত্রীসাধারণের যুক্তি সাংসারিকতার মানদণ্ডে সব সময়েই প্রতিবাদের উর্ধ্বে। শেষ পর্যন্ত বললে কি, অত যদি কেরানীভীতি, তবে আমার মত সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করলে কেন?

সে যে সাধারণ মেয়ে, এই কথা সে অনায়াসে স্বীকার করলে। আমি শুনে অবাক। আমি যে কিছু নই, এ কথা বলা কি সহজ? রাত্রে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যে কিছুই নও, এ তুমি সত্যিই স্বীকার কর?

কেন করব না? রমা নাম ব'লেই কি নিজেকে লক্ষ্মী মনে করব নাকি?

না, তা বলছি না। তবে তুমি যে লক্ষ্মী নও, এ কথাটা জাহির করবার সাহস পেলে কোথা থেকে?

জাহির তো করছি না। শুধু সত্যিটা স্বীকার ক'রে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছি। অসাধারণকে, জানই তো, মেয়েরা নামিয়ে সাধারণ ক'রে নিয়ে আসে; তাই বলছি, সময় থাকতে কেরানীগিরি কর।

স্ত্রী দেখছি আমাকে কেরানীগিরি ছাড়া আর কিছুর উপযুক্ত মনে করে না।

বললাম, দেখ, কলকাতা আমি তোমাকে এক মাসের মধ্যেই নিয়ে যাব। কথাটা ব'লে হৃত পৌরুষ যেন একটু উদ্ধৃত হ'ল ব'লে মনে হ'ল। একটু অপেক্ষা ক'রে কথায় শেষ-স্পর্শ দিলাম, কিন্তু আমার কাজে তোমাকে সাহায্য করতে হবে। কলকাতা যাবে অথচ পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মত শুধু আমার উপর নির্ভরই করবে, সাহায্য করবে না, তা হবে না। রমা ন্যাকা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, কাজটা কি শুনি? প্রশ্নে অবিশ্বাস, কথায় এ অবিশ্বাস দূর করা যাবে না। কাজ দেখলে তখন বিশ্বাস করতে পথ পাবে না। মেয়েরা পুরুষদের সামর্থ্যে, প্রমাণ না পেলে, বিশ্বাস করে না। অবশ্য একবার বিশ্বাস করলে আর টলে না।

তাই উত্তর আর দিলাম না।

রমা সন্দিগ্ধ কৌতূহলে আবার প্রশ্ন করলে, বলি, কাজটা কি? আমি নিরুত্তর। ওর সন্দেহে আমার রাগ হচ্ছে।

বাঁ হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে নিজের গরজে চুমু খেয়ে আবার প্রশ্ন করলে, বলই না কাজটা ?

আমি বললাম, ভাগ্যিস আগে ব'লে ফেলি নি ; তা হ'লে তো এ লাভটা হ'ত না।

লাভ না হয় আবার হবে, বেশি ক'রেই হবে। আগে গোপন কথাটা ব'লে ফেল।

পরের দিন দুপুরবেলা। বেলা তিনটের কলকাতার যাবার ট্রেন। রমা আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে একদা-বিখ্যাত দত্তদের পুকুরে মাধ্যাহ্নিক শ্রান্তি দূর করতে যাচ্ছে। আমি বলেছিলাম, এই কুচি-কাঁকড়া ভরা কাদার মধ্যে না ডুবে বাড়িতে জল তুলে স্নান কর না কেন ? ও বললে, ওই বুড়ো পুকুরটাকে ভীষণ ভালবাসি যে। ওকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করি, কিছু বলে না। তারপর ঘড়া কাঁখে নিয়ে ঝিকে চ'লে যেতে ব'লে গমনোন্মুখ হয়ে বললে, কুয়ো থেকে একঘড়া জল তুলে কি ক'রে ঢালব ঠিক করতে করতেই জল ফুরিয়ে যায়।

আমি বাইরের ঘরে চৌকির উপর একটা মাদুর পেতে বসতে বসতে বললাম, সাধারণ মেয়ের মত কথাগুলো শোনাচ্ছে না কিন্তু।

রমা পিছন ফিরে একটু দূর থেকে উত্তর দিলে, কি ক'রে শোনাবে বল ? কথাগুলো যে মুখস্থ করেছি।

রমা চ'লে যেতেই দ্বিপ্রহরের শূন্যতা পেয়ে বসল আমাকে। বাইরের ঘরের সামনেই শেয়ালকাঁটার বন, তাতে হলদে ফুল ফুটেছে বসন্তের সমারোহে। শুনেছি নাকি শেয়ালকাঁটার শিকড় বসন্তরোগের প্রতিষেধক। রমাকে বলেছিলাম ; ও যায় নি। আকন্দ ফুল ফুটেছে থোকা থোকা, ও মাথায় পরে আঠা ঝরিয়ে। মাঠ পীতাভ ঘাসে ভরা। গরুতে খেয়ে খেয়ে বসন্তের স্পর্শ লাভ করতেই দেয় নি ঘাসগুলোকে। তাদের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে ধুলো উড়ছে, এসে লাগছে আমার গায়ে। সে ধূলিময় হাওয়া ঈষদুষ্ণ ঘুঘুর ডাকের মত সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে। বড় একা লাগছে ; রোদের নেশা লেগেছে প্রকৃতির ; তাই পড়েছে ঝিমিয়ে। আমার মনের মাদকতার উপর দিয়ে ঘুঘুর বিবাগী ডাক ব'য়ে গেল।

কতক্ষণ হ'ল রমা গিয়েছে।

যদি ডুবে যায় রমা পুকুরে, যদি ম'রে যায় ! ছি, এ কি ভাবছি ! তবু ভাবনার দুয়ারে আগল লাগাই কেমন ক'রে ? যদি ও ম'রে যায় ! তা হ'লে এই কলকাতা যাওয়ার দায় থাকে না, এই আমার অসাধারণত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে এত বেগও পেতে হয় না। জীবনটা ভারি সহজ হয়ে আসে। একটু চেষ্টা ক'রে টিকে থাকলেই একদিন না একদিন আমার স্থান হয়ে যাবে অসাধারণদের মাঝখানে। নিজেকে যার তার কাছে যে কোনও দামে বিকিয়ে দেবার রূপোপজীবন থেকে রেহাই পাই তা হ'লে।

চারিদিক থেকে হাওয়ায় আমের মুকুল ঝ'রে পায়ে এসে পড়ছে। প্রকৃতিতে বসন্তের পুনরাবৃত্তি কত সহজ, কত সাবলীল! আর মানুষ এত কষ্ট ক'রেও এক মরণ ছাড়া শান্তির বা সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে পায় না। আমি তাই রমার মরণ কামনা করছি। আমার সঙ্গে ওর বিয়ে না হয়ে আর কারও সঙ্গে হ'লে, হয় স্বামীকে দিয়ে কণ্ট্রোলের দোকান খুলিয়ে দুধে-মাছে এতদিন বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠত, আর নয় তো কেরানীপ্রিয়া হয়ে সারা সপ্তাহের ক্লান্তি আর কামনার পরে শনিবারে ম্যাটিনীতে কথাচিত্র দেখে দেশের অবস্থার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠত; এই দেশে এত অভাব, তবু সিনেমায় কি ভিড়!

আমার সামনে ওই তৃণহীন মাঠে ঝরা-পাতার ভিড়—উড়ে চ'লে যাচ্ছে ওরা বৎসরান্তে পুনরুজ্জীবনের আশায়। একটা ঘেয়ো কুকুরের ঘা ঠোকরাচ্ছে একটা কাক। কুকুরটা নিরুপায়ে সহ্য করছে। অনেক কাক বহুদিন থেকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিনা।

নলি নলি হাত, পেটটা জালার মত একটা ছেলে কাকটাকে লক্ষ্য ক'রে মারলে এক ঢিল; সেটা লাগল কুকুরটার গায়ে; কাক অবশ্য উড়ল, কিন্তু ঢিলের আঘাতে কেঁউ-কেঁউ ক'রে উঠল কুকুরটা। ছেলেটা হি-হি ক'রে হেসে উঠে আর একটা ঢিল ছুঁড়ল। কুকুরটা নীরব। হয়তো ভাবলে যন্ত্রণার প্রকাশে আনন্দ পে ছেলেটা আবার ঢিল ছুঁড়বে। লোকে বলে, শিশু দেবতার তুল্য। তবু প্রবৃত্তির অকুণ্ঠ প্রকাশে শিশু নির্লজ্জ। পিঁপড়ে টিপে মারা থেকে আরম্ভ ক'রে কামড়ানো পর্যন্ত সবই শিশুর দেবসুলভ। সেই দেবশিশু একটা কঞ্চি দিয়ে কুকুরটাকে খুঁচিয়ে দিয়ে তিড়িং-বিড়িং ক'রে লাফাতে লাফাতে চ'লে গেল মনের খুশিতে। এত বেলায় দাঁতন করতে করতে গ্রামের শখের যাত্রাদলের নবীন নায়ক স্নান করতে চলেছে। বেলা বারোটায় উঠেও তার সময় কাটতে চায় না, আর আমার কলকাতা যাবার তাড়া।

দুপুরের রোদ চুঁইয়ে আলস্য ঝরছে। কাঠ-চাঁপার ফুলগুলি নুয়ে পড়েছে। সামনের প্রান্তরটা একেবারে খাঁ-খাঁ করছে। আমার বাইরের ঘর এই শূন্যতার যেন কেন্দ্র, কর্মহীন আকুলতার ভারে অর্ধমৃত। সিমেণ্ট-ওঠা মেঝে, লোনা-ধরা দেওয়াল, ঝুরঝুর ক'রে বালি-খ'সে-পড়া ছাদ, এই সবের মাঝখানে ভাঙা চৌকিতে আমি আসীন রমার অপেক্ষায়।

কিসে একটা কামড়াল পায়ে। যাক, এত কর্মহীনতার মাঝখানে পোকাটা তবু একটা কাজ করলে—আমাকে কামড়ালে। কিন্তু বেশ জ্বলছে যে! ছারপোকা ব'লে আর চুপ ক'রে ব'সে থাকা গেল না। লাফিয়ে উঠে চৌকিটা উল্টে ফেলে দেখি, একটা কাঁকড়া-বিছে। পায়ের চটি খুলে জীবটিকে হত্যা করলাম। তারপর হয়ে উঠলাম

যন্ত্রণায় অস্থির। ওলটাতে গিয়ে চৌকিটার একখানা পায়া ভেঙে যেতে মাটিতেই শুতে হ'ল। বাইরে থেকে এক ঝলক শুষ্ক গরম হাওয়া আমাকে ঘিরে নৃত্য ক'রে চ'লে গেল। দ্বিপ্রহরের প্রকৃতির এই ভীতিপ্রদ শূন্যতা বাংলা দেশের খাবি-খাওয়া পল্লীগ্রামগুলোর রন্ধ্রে রন্ধ্রে আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা বিস্তার করছে। কেন রমা এখনও আসছে না? তবে সে কি পুকুরে ডুবে গেল নাকি? একটু আইওডিন পায়ে না লাগালেই নয়। অসহ্য জ্বালা করছে দষ্ট স্থানটা। সামনে দিয়ে একটা পরিচিত অপরিচিত লোক যায় না যে তাকে বলি, অমুকদের বাড়ি থেকে একটু আইওডিন চেয়ে আন, কি পুকুর-ঘাট থেকে রমাকে ডেকে আন।

কি, হ'ল কি, অমন করছ কেন? পিছন ফিরে দেখি, রমা দাঁড়িয়ে হাসছে।

রমা সুন্দরী; তবু গা জ্ব'লে গেল তার হাসি দেখে। বললাম, কাঁকড়া-বিছেয় কামড়েছে, একটু আইওডিন লাগাতে হবে।

আইওডিনে কিছু হবে না।—ব'লে আমার হাত ধ'রে ভিতরে নিয়ে গিয়ে কি গাছের পাতা কয়েকটা বেটে লাগিয়ে দিলে আমার পায়ে। যন্ত্রণায় পাতাটার আর পরিচয় নেওয়া হ'ল না।

আমাকে শুশ্রূষা করতে করতেই রমা নিজেও ব'লে উঠল, স্নান করতে করতেই শরীরটা কেমন খারাপ করতে লাগল। বোধ হয় জ্বর আসবে।

প্রকৃতির বাসন্তিক উচ্ছ্বাস সহ্য করতে না পেরে রমা শয্যাশায়ী হ'ল। সিঁদুরের মত ছোট ছোট ফোটে ভ'রে গেল তার সারা দেহ। আমি অনভিজ্ঞ। পাড়ার পিসীকে ডেকে দেখালাম। তিনি সাত হাত লাফিয়ে তিনবার বুক্কর কপালে ঠেকিয়ে ব'লে গেলেন, আসল হয়েছে বাবা, রক্ষে হওয়া শক্ত।

আসল বসন্ত হয়েছে রমার। আমি একা, সারাজীবন শুধু অসাধারণ হবার স্বপ্নই দেখেছি, রোগে শুশ্রূষা করতে শিখি নি। ভীত চোখ মেলে আমার দিকে তাকালে সে, সে চোখে গভীর নির্ভরতা। জল চাইলে; দিলাম। খেয়ে বললে, গলায় বড় ব্যথা। বললাম, তোমার মাকে একটা তার করব?

না; সৎ-মেয়ের সেবা করতে মা আসবে না।

সেই সিঁদুর-বরণ ফোটগুলি বড় বড় গুটিকায় পরিণত হ'ল; চোখ গেল বুজে। সারা মুখ ফুলে গিয়েছে; কথা বলছে খুব কম। আমি একা ব'সে আছি রাত জেগে, দেখছি, রমার সুন্দর দেহে রোগের বীভৎস উল্লাস। নাকটা হয়তো খ'সে যাবে; চোখ হয়ে যাবে কানা। তার উপর বাঁচলেও সারা মুখে রোগের প্রতিহিংসার চিহ্ন বেঁচে থাকবে, ও নিজেই নিজের মুখ দেখে নিজেকেই ধিক্কার দেবে। হয়তো ভাববে, কেনই বা সৌন্দর্য আসে দেহে আর কেনই বা এমনই আকস্মিক নিষ্ঠুরতায় সঙ্গে চ'লে যায়!

প্রকৃতিতে ঋতুতে ঋতুতে ফিরে আসে সুন্দর বসন্ত, সৃষ্টির গ্লানিহীন সহজ প্রাচুর্য, আর মানুষ যা হারায় তা কি আর কিছুতেই পায় না; শুধু ক্লিষ্ট হয় স্মৃতিতে! মানুষ মানুষ হয়ে, উচ্চতম, শ্রেষ্ঠতম জীব ব'লে নিজেকে প্রচার ক'রে শেষে কিনা প্রকৃতিকে হিংসা করে, বলে, কেন আমার প্রকৃতির মত পুনরুজ্জীবন হয় না, কেন ওই পেয়ারাগাছটার মত আমি ফুলে ফুলে ভ'রে উঠতে পারি না!

রমা ডেকে উঠল, ওগো!

আমি তার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে বললাম, কি বলছ?

কেমন সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

মাথায় বাতাস করতে লাগলাম।

চারিদিকের স্তব্ধতা, গন্ধভারাতুর রাতের বাতাস, বাসন্তিক জ্যোৎস্না বাইরে সৃষ্টি করেছে মায়ালোক, মনে হচ্ছে, সারারাত জুড়ে কে এক লাবণ্যোচ্ছল মায়াবিনী ব'সে আছে মুখে আঙুল দিয়ে, আর তাকে ঘিরে মেতে উঠেছে এই প্রগল্ভ আলো, বাতাস, গন্ধ। কোকিলের ডাকে চকিত হয়ে রমা জিজ্ঞাসা করলে, কে ও?

আমি বললাম, কেউ না, পাখী।

রমা আমার কথায় কান না দিয়ে আবার প্রশ্ন করলে, কে ডাকলে অমন ক'রে আমাকে? আমি যাব।

আমি তাকে জোর ক'রে শুইয়ে রাখবার চেষ্টা করতেই সে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠল, বললে, আমাকে ধ'রে রাখছে, যেতে দিচ্ছে না; তুমি নিয়ে যাও, নিয়ে যাও আমাকে··· ওঃ, বড় জ্বালা!

আমার চোখ থেকে জল পড়ল রমার কপালে। সে ব'লে উঠল, স্নান করব, স্নান।

মাথাটা ধুইয়ে দেওয়ার দরকার। কুয়ো থেকে জল তুলে আনবার জন্যে বাইরে উঠোনে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, জীবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস; কোথায় রোগীর ঘর—ভয় নিরাশা অসহায়তায় ভরা, আর কোথায় এই সব-কিছুকে প্লাবিত করা লাবণ্যের ঢেউ! এমন রাত্রি জীবনে তো আর আসে নি! সেই পেটসর্বস্ব ছেলেটা, সেই ঘেয়ো কুকুর, সেই কাঁকড়া-বিছে, সেই নিঃসঙ্গ ঘুঘু সবই নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে এই প্লাবনে। আর আমি শুধু বাইরে প'ড়ে রয়েছি অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে। লেবুফুলের গন্ধের আস্তরণ নেমে আসছে পৃথিবীর উপর। মাথার উপর চাঁদ, কুয়োতে নিজের ছায়া দেখা যায়। কুয়োর চারিদিকে সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে; রোগীর ঘরের উষ্ণতা আর সহ্য হয় না। রমার অদ্ভুত কষ্ট তো এই মদালসা ধরণী স্বীকার করছে না! আমিই বা কেন তাকে সেবা করতে গিয়ে, তাকে বাঁচিয়ে নিজের সমস্ত সম্ভাবনাকে নষ্ট করি? মানবতার দিক থেকে ওকে সেবা করা উচিত। কিন্তু এই সৌন্দর্যকে জীবনে উপলব্ধি ক'রে তাকে

রূপ যদি দিতে চাই আমার প্রচেষ্টায়, তা হ'লে রমাকে বলি দিতেই বা ক্ষতি কি? একজন সাধারণ নারীকে বাঁচাতে গিয়ে আমি নিজের বৃহত্তর সার্থকতাকে কেন বলি দেব—আমার সাহিত্য, আমার দেশ, আমার সব কিছু? ও তো শিকলের মত আমার পায়ে লেগে থাকবে, আর মাসের শেষে টাকার তাগাদায় কেরানীগিরি আমায় করতেই হবে। কিন্তু 'কে বলিতে পারে তোমার ললাটে লিখা কোন্ সাধনার অদৃশ্য জয়টিকা!' কেন প্রতি পদে পদে রমার সুখদুঃখ, কষ্ট, স্বাচ্ছন্দ্য আমাকে ব্যাহত করবে? ও আমাকে কেন নীচে নামিয়ে আনবে? ওর রোগের জন্য তো আমি দায়ী নই। যে সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবনের মূল্য দেয় না, সেই রাষ্ট্রই দায়ী এই রোগের জন্যে। সেই রাষ্ট্রকে বিষমুক্ত করতে হবে, সেই পঙ্গু সমাজকে করতে হবে প্রাণবান। আমার কি বিয়ে ক'রে কেরানীগিরি করলে চলে? এই রাত্রির ভরা সৌন্দর্য উপভোগ করবার অবকাশ বা প্রবৃত্তি আজকে এই সারা পল্লীর কোন জনের মনে নেই। কেন? তারা ক্লান্ত, তারা অবসন্ন, তারা কোনরকমে বাঁচতে ব্যস্ত। তাই রাত্রে তারা শুধু ঘুমোয়, শুধু ঘুমোয়। আর এই রাত্রি ডেকে ডেকে ফিরে যায় সৌন্দর্য-পিপাসুকে। আমিও তো ওইরকম হয়ে যাব। আমিও ম'রে যাব। কেন এই মরণের বীজ নিজে হাতে রোপণ করলাম? প্রেম করেছিলাম? বেশ তো; তাতে কি এসে যায়? যদি বিবাহ-বিহীন প্রেম রমা স্বীকার না করত তো আদর্শের খাতিরে তাকে আমি উপেক্ষা করতাম। তবে কেন ব্যক্তির দায়িত্ব কাঁধে চাপিয়ে আমার জীবনের কাজ পঙ্গু করি? রমার মত কত মেয়ের তো অপচয় হচ্ছে এই দুর্ভাগা দেশে। সেই অপচয়ের মূল উৎপাটন করতে গিয়ে যদি আরও দুই-একজনের অপচয় অনিবার্য হয় তো কি করা যাবে? ভুল করেছি আমি। সেই ভুলের সংশোধন আমি করবই। ওকে ফেলে কলকাতায় পালাব। ও ফিরে যাবে বাপের বাড়ি; সেখানে দুঃখে কষ্টে সহজ জীবন ওর কোনরকমে কেটে যাবেই। যেটুকু বিশেষ দুঃখ পাবে, সে বাংলা দেশে বহু মেয়েই বিনা কারণে পেয়ে থাকে। এর কষ্টের তবু একটা কারণ থাকবে। তারপর ও যদি আমার জন্যে প্রতীক্ষা ক'রেই থাকে দীর্ঘদিন, তখন আমার কাজ-শেষে ওকে সত্যি ক'রেই গ্রহণ করব। তখনও পৃথিবী থাকবে এমনই সুন্দর, ভাঁটফুলের গন্ধ এমনিই ঝ'রে পড়বে, জ্যোৎস্নার মোহ একটুও কমবে না। তখন বরং তাকে পরিপূর্ণতর ক'রে গ্রহণ করতে পারব জীবনে।

আর ও যদি ম'রেই যায়? এই রোগে তো এ গ্রামে অনেকেই গেল। রমাও যদি চ'লে যায় আমাকে মুক্ত ক'রে দিয়ে? বাঁচবার আশা আছে কেউ তো বলছে না। এখন তো প্রলাপ বকছে। এতক্ষণে জ্ঞানটুকুও লুপ্ত হয়েছে বোধ হয়। আমি পালালে জানতেও পারবে না।

তা হ'লে শেষ সময়টুকু পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রেই যাই না কেন? যদি বেঁচে যায়!

এই হতচেতনার মাঝখানে, এই জ্যোৎস্নার আবরণের তলা দিয়ে, নিশীথের আবছায়ায়, বসন্তের গন্ধ-সাগরের তীর দিয়ে চ'লে যাব বহুদূরে আমার কাজের মাঝখানে।

কানে আসছে রমার আর্তনাদ, কাতর আহ্বান। ওকে এমনই অসহায় ফেলে পালাব?

কিন্তু থেকেই বা করব কি, শুধু নিজেকে শৃঙ্খলিত করা ছাড়া?

যদি বেঁচে আর কাউকে ভালবেসে সুখী হয় তো হোক। আমার সঙ্গে সারাজীবন কেন ব্যর্থকামনায় বেঁচে থাকবে?

এখন পালালে পালানোর কষ্টটা ওকে বাজবে না। সেও একটা মস্ত লাভ।

সুটকেস থেকে কয়েকটা টাকা নিয়ে সদর দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। মনে হ'ল, যেন রমার আর্তনাদ আমাকে আকুল হয়ে ডাকছে।

ষ্টেশনে এসে কলকাতাগামী এক গাড়িতে চ'ড়ে ব'সে ভাবলাম, কিন্তু ঠিক কি এখন করতে যাচ্ছি?

শ্রীশীতাংশু মৈত্র

আদর্শ পত্নী

এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে—আদর্শ পত্নী। অর্থাৎ কোন্ কোন্ গুণের অধিকারিণী হ'লে সে নারীকে আদর্শ পত্নী বলা যেতে পারে, অথবা আদর্শ পত্নী হওয়া আদৌ সম্ভব কি না! অবশ্য এ কথা আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, সব জিনিসেরই আদর্শের মাপকাঠি এত উচ্চ যে, সেখানে পৌঁছানো মানুষের সাধ্যাতীত। মানুষ যে দিন আদর্শ অবধি পৌঁছবে, সেদিন হয় আদর্শটা আর আদর্শ থাকবে না, আর না হয় যিনি সেই আদর্শ অবধি পৌঁছেছেন তিনি আর মানুষ থাকবেন না। জগতের নর-নারী আবহমান কাল থেকে আদর্শকে লক্ষ্য ক'রে চলেছে, যে লক্ষ্যস্থানের যত নিকটে পৌঁছেছে, সে-ই জনসাধারণের তত বেশি শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করেছে। আলোচনার গোড়াতেই এই স্বতঃসিদ্ধের কথা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

'আদর্শ পত্নীর' কথার পিছনে আর একটি জীব উঁকি দিচ্ছেন তাকে অস্বীকার করা চলবে না। কারণ পত্নী কথাটি উত্থাপিত হ'লেই সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন উঠবে—পত্নী? কার পত্নী? অর্থাৎ কিনা স্বামীর পত্নী। বেশি কথা না বাড়িয়ে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ধরুন, নলিনী মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। লেখাপড়া জানে, যোগেশের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, দু-একটি সন্তানাদিও হয়েছে, রন্ধনকার্যে অতিশয় নিপুণা। বাড়ির চাকর-বাকর থেকে আরম্ভ ক'রে শ্বশুর-শাশুড়ী, দেওর-ননদ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পাড়ার

ছেলে-বুড়ো, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই বলে, ও-বাড়ির নলিনীর মত মেয়ে দেখা যায় না; কিন্তু তার স্বামী বন্ধুমহলে বলে, দূর ভাই, এ জীবন বৃথাই গেল। স্ত্রীর সঙ্গে যার বনিবনা হয় না, তার কিসের জীবন? এই নলিনী দুনিয়ার সকলের প্রশংসাভাজন হ'লেও কি তাকে আমরা আদর্শ স্ত্রী বলতে পারব? কখনই নয়। নলিনী আদর্শ পুত্রবধূ, আদর্শ জননী ও গৃহিণী, আদর্শ রাঁধুনী ও প্রতিবেশিনী হ'লেও আদর্শ পত্নী নয়। পূর্বপক্ষ হয়তো বলবেন যে, নলিনীর স্বামী যোগেশের নিশ্চয় কিছু দোষ আছে। আমি বলছি, নলিনীর স্বামীর কিছু কেন, সম্পূর্ণই দোষ। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—আদর্শ পত্নী, আদর্শ স্বামী নয়। স্বামীকে যখন সে সুখী করতে পারে নি, তখন সব গুণ থাকা সত্ত্বেও তাকে আদর্শ পত্নী বলা চলতে পারে না।

এর পরই যে প্রশ্নটা উঠতে পারে, সেটা হচ্ছে, তা হ'লে আদর্শ পত্নী হওয়া আদৌ সম্ভব কি না! আমি বলব, কেবলমাত্র পত্নীর গুণেই আদর্শ পত্নী হওয়া সম্ভব নয়, যার পত্নী তারও এমন কিছু গুণ থাকা দরকার যার দ্বারা সে নিজের পত্নীকে আদর্শ পত্নী ব'লে মনে করতে পারে। কারণ আমার মতে স্বামী যদি নিজের পত্নীকে আদর্শপত্নী ব'লে মনে করে, তা হ'লে দুনিয়ার লোক তাকে যতই নিন্দা করুক না কেন, সেই সত্যিকারের আদর্শ পত্নী। আমি লোকটা প্রবন্ধকার নই, কখনও-সখনও গল্পগাছা লিখে থাকি মাত্র। সংসারে যা ঘটে তাই দেখি এবং চোখ মেলে দেখি, তাই আমার চিন্তার এবং সেই অভিজ্ঞতার ওপরেই কোন তর্কবিতর্কের সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আদর্শ পত্নী আমি জীবনে যে দু-একটি দেখেছি, তারই গল্প আপনাদের কাছে করছি।

অনেকদিন আগে আমি একবার জুতোর কারবার করেছিলুম। কারখানায় অনেকগুলি মুচি কারিগর ছিল। সে সময়ের তুলনায় এরা এক-একজনে মাসে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা উপায় করত। কিন্তু কারিগরদের যা হয়ে থাকে, পয়সা হাতে পেলেই নেশা-টেশা হৈ-হুল্লোড় ক'রে দুদিনে সব উড়িয়ে দিত। তাতে হ'ত কি, তাদের ফুর্তির ক'দিন কারখানা বন্ধ তো থাকতই, তা ছাড়া দুদিন যেতে না যেতেই তাদের স্ত্রীরা আমায় এসে ধরত। বলত, কিছু আগাম দেন, নইলে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে না খেয়ে মরব। কারিগরদের মধ্যে বিফন মুচি ছিল সব চাইতে ভাল কারিগর, তার হাতের কাজ ভাল ব'লে তাকে মজুরিও দিতে হ'ত বেশি। কিন্তু তার মহৎ দোষ ছিল এই যে, সে একবার নেশা করতে আরম্ভ করলে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলত। এইরকম একবার টাকা পাবার পর পাঁচ-সাতদিন কারখানায় অনুপস্থিত হওয়ায় আমি একদিন বিকেল-বেলায় বিফনের বাড়ি গিয়ে হাজির হলুম তাকে ধরবার জন্যে। তার স্ত্রী বললে, বিফন ক'দিন থেকে দিবারাত্রি মদ্যপান করছে। আমি নাকি মদ খাবার জন্যে টাকা দিয়ে

বলেছি, তুই এত খাটিস, যা, দিন কতক দিনভোর ফুর্তি ক'রে নিয়ে আবার পুরো উদ্যমে কাজে লাগিস। বিফনের স্ত্রী আমাকে মিনতি ক'রে বলতে লাগল, এবার যা করেছিস তা করেছিস, ওকে এমন ক'রে আর মদ খাবার জন্যে টাকা দিস নে বাবা। ও তোর ওখানে কাজ করে, ও তোর ছেলের মতন। এই রকম ক'রে মদ খেয়ে খেয়ে ও কোন্‌দিন ম'রে যাবে, দু-তিনটে বাচ্চা নিয়ে তখন আমি কি করব? বলতে বলতে বিফন-জায়া কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে। আমি তাকে বললুম, আরে মেয়ে, তুই কি পাগল হয়েছিস! কারিগরদের কামাইয়ের ঠেলায় এমনিতেই আমার কারবার পটল তোলবার উপক্রম হয়েছে, তার ওপরে আমি দেব টাকা মদ খাবার জন্যে? তা হ'লেই হয়েছে আর কি! আমার কথা শুনে বিফন-জায়ার অশ্রু তখনই শুকিয়ে গেল। সে বললে, তবে ও টাকা পেলে কোথা থেকে? আমি বললুম, সেদিন যে মজুরির পাওনা সাড়ে বাইশ টাকা নিয়ে এসেছে; তাই ওড়াচ্ছে, এটা বুঝতে পারছ না! আমার কথা শোনা মাত্র তুবড়ির মতন ঠেলে উঠে সে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ব্যাপার কি দেখবার জন্যে আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। ঘরের এক কোণে চাটাইয়ের ওপর বিফন নেশার ঘোরে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে ছিল। তার মাথায় ছিল লম্বা বাবরী চুল। বিফন-জায়া তার সেই লম্বা চুল মুঠো ক'রে ধ'রে হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে একেবারে বাইরে এনে ফেললে। অতর্কিতে ওইভাবে আক্রান্ত বিফন তো হকচকিয়ে গেল। তারপরে মুখ তুলে আমায় দেখে সে আরও ভড়কে গেল। ওদিকে বিফনের স্ত্রী কোথা থেকে এক চেলাকাঠ সংগ্রহ ক'রে এনে অভিনিবেশ সহকারে স্বামী-সংশোধন কার্যে প্রবৃত্ত হ'ল। বিফন তো তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল, গেলুম—মলুম, আজ আমার শেষ দিন। বাবু, আমাকে বাঁচা, নইলে ও মেরে ফেলবে। দেখতে দেখতে তার মাথা ও শরীরের তিন-চার জায়গা কেটে রক্ত বেরুতে লাগল, কিন্তু বিফন-জায়ার বিরাম নেই—সে সমানে পতি-দেবতাকে পিটে চলতে লাগল।

বলতে কি, এতখানি শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে ইতিপূর্বে আর দেখি নি। তারপরে একটা জোয়ান পুরুষকে একজন স্ত্রীলোক এমনভাবে প্রহার করছে আর সেই পুরুষ তাকে উল্টে প্রহার না দিয়ে অসহায়ভাবে চীৎকার ক'রেই চলেছে, এই দৃশ্যে আমার পৌরুষ আহত হ'ল। আমি বিফনের স্ত্রীকে বললুম, এই, ওকে ওরকম ক'রে মেরো না বলছি। আমার কথা শুনে ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতন তিড়িং ক'রে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বললে, কি বলছিস! তারপর জোরে জোরে বার কয়েক নিশ্বাস টেনে নিয়ে বললে, যা যা, তোকে আর আত্তি দেখাতে হবে না। কথাটা শেষ ক'রে মুহূর্তমাত্র গৌণ না ক'রে পূর্বের মতন চেলাকাঠ দিয়ে স্বামীর অঙ্গসেবায় মনঃসংযোগ করলে। আমি রেগে-মেগে সেখান থেকে চ'লে এলুম।

দিন তিনেক বাদে বোধ হয় অঙ্গের বেদনা একটু মন্দা পড়ায় বিফন মুচি কাজে এসে যোগ দিলে। আমার সঙ্গে কাজকর্ম নিয়ে কথা বলতে লাগল, কিন্তু তার মুখ দেখলে মনে হয় না যে, অমন একটা ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। শেষকালে আমিই থাকতে না পেরে বললুম, বিফন, তুই ওই বউটাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে কর্, তোর বিয়ের সব খরচ আমি দেব। ওই রকম সাঙ্ঘাতিক মেয়েমানুষকে ঘরে রাখতে আছে, কোন্‌দিন তোকে মেরে ফেলবে! ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখেছি বাবা, কিন্তু স্বামীকে এমন ক'রে ঠেঙায়—এ কথা শুনি নি আজ পর্যন্ত, দেখা তো দূরের কথা। দূর ক'রে দে ওকে।

বিফন অত্যন্ত লজ্জিতভাবে আমাকে বললে, বাবু, তুই কি পাগল হয়েছিস! ওই বউ আছে ব'লে আমি বেঁচে আছি, আমার ছেলেপুলে বেঁচে আছে। ও না থাকলে আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ম'রে যাব। তুই জানিস না যে, ও কত ভাল। ওর ওপরে রাগ করিস নে বাবা। তুই আমার মালিক, ও তোর মেয়ে আছে।

সেদিন বিফনের মুখে এই কথা শুনে আমি সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। বিফন-পত্নীর ও বিফন দুজনের ওপরেই শ্রদ্ধা হয়েছিল।

বিফনের স্ত্রীকে আপনারা কি বলবেন? সমাজের চোখে সে যাই হোক না কেন বিফনের কাছে ছিল সে আদর্শ পত্নী।

আগেই বলছি, আদর্শ পত্নীর কোন বিশেষ মাপকাঠি নেই। এমন কতগুলো নির্দিষ্ট গুণের নাম করা যায় না, যা থাকলেই আদর্শ পত্নী হওয়া সম্ভব হতে পারে, অবশ্য একটি গুণ ছাড়া। সেটি হচ্ছে স্বামীর মনোরঞ্জন করা। যে স্ত্রী স্বামীর মনোরঞ্জন করতে পারে, অর্থাৎ যার স্বামী অকুণ্ঠিতচিত্তে বলতে পারে, আমার স্ত্রীর মত স্ত্রী হয় না অথবা আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমি সুখী, সে-ই আদর্শ পত্নী। আদর্শ পত্নীর অবশ্য মাপকাঠি নেই। এ কথা যে শুধু আমি বলছি, তা নয়। আমি জন্মাবার হাজার হাজার বছর আগে নাট্যকার রাজশেখর তাঁর প্রাকৃত ভাষায় লিখিত নাটক 'কর্পূরমঞ্জরী'তে লিখেছিলেন—সা ঘরিণী যা পদিং রঞ্জেদী—সে-ই হচ্ছে আদর্শ ঘরণী যে পতির মনোরঞ্জন করতে পারে। এ সম্বন্ধে মহাজনদের লিখিত আরও অনেক বাক্য বলা যেতে পারে, বাহুল্যভয়ে তা উদ্ধৃত করলুম না।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

পদচিহ্ন

তেরো

রাধাকান্ত নিজের দিনলিপি অর্থাৎ ডায়েরি লিখছিলেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। দেখলেই বোঝা যায়, হৃদয়াবেগ অস্বাভাবিক রকমে প্রবল হয়ে উঠেছে। তিনি লিখছিলেন, "শাস্ত্রে নানা মত বিদ্যমান আছে। শাস্ত্রকারেরা কেহ বলেন ভাগ্যই শ্রেষ্ঠ, কেহ বলেন পৌরুষ শ্রেষ্ঠ, কেহ বলেন দৈববল শ্রেষ্ঠ, কেহ বলেন ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, কেহ বলেন কালই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, সেই শ্রেষ্ঠ। আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি, কালই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, সেই শ্রেষ্ঠ। কেহ বলিতে পারেন, কাল এবং ধর্ম্ম দুইয়ে অভেদাত্মা, উভয়ের মধ্যে প্রভেদ নাই। কিন্তু শাস্ত্রমতে কলিযুগের অধিপতি কলি ধর্ম্মের বিরোধী। মহাভারতে, দেখিতে পাই, দ্বাপরের শেষে রাজা জন্মেজয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কলি বৃষরূপী ধর্ম্মকে পীড়ন করিতেছে। কলিযুগে ধর্ম্ম মাত্র একপাদ অবশিষ্ট। বৃষরূপী ধর্ম্ম তিনপাদ হারাইয়া একপদের উপর কোনমতে দাঁড়াইয়া আছে; কলি সেই পদটিকেও চূর্ণবিচূর্ণ করিতে সচেষ্ট। সুতরাং কলিরূপী বর্ত্তমান কাল সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী। ধর্ম্মসম্মত সর্ব্ববিধ সনাতন বস্তু এবং সত্য এ যুগে বিনষ্ট এবং মিথ্যা হইবে। নতুবা আমার গৃহে এমন ঘটিবে কেন? আমার জ্ঞানমতে আমি সর্ব্ববিধ ধর্ম্মাচার পালন করিয়া চলিতেছি। অথচ কলিধর্ম্ম কোন্ পথে আমার গৃহে প্রবেশ করিল? শাস্ত্রে আছে, 'অনশনের তুল্য তপস্যা নাই, ভার্য্যা সদৃশ মিত্র নাই, পুত্রের তুল্য মিত্র নাই, পুত্রের তুল্য প্রিয় নাই, ভ্রাতার তুল্য বন্ধু নাই, মাতার তুল্য গুরু নাই।' আমার ভার্য্যা সর্ব্বগুণান্বিতা, কদাচ তাহাকে কোন অন্যায় করিতে দেখি নাই, সে অকস্মাৎ আমার বিরোধী হইবে কেন? আমার মতের বিরুদ্ধে সে একটা ভ্রষ্টা শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীলোক—বৃত্তিতে দাসী তাহার পক্ষাবলম্বন করিবে কেন? কলিযুগের ধর্ম্মই এই। লোকে সতত দুর্ম্মতিসম্পন্ন হইবে, শিষ্য গুরুকে, ভার্য্যা স্বামীকে, পুত্র পিতা-মাতাকে দুর্ব্বাক্য-বিষে সতত অবমাননা করিবে। খল, পিশুন, দাম্ভিক এবং মাৎসর্য্যশালী লোকে সাধুগণের অবমাননা করিবে। উচ্চ ব্যক্তিগণ অধম হইয়া যাইবে, অধমেরা উচ্চতাপ্রাপ্ত হইবে। এই হইল কলিধর্ম্ম।"

ষোড়শীকে নিয়ে আবার একদফা মতান্তর ঘটেছে রাধাকান্ত এবং কাশীর বউয়ের মধ্যে। গোড়া থেকেই রাধাকান্ত ষোড়শীকে আশ্রয় দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। কাশীর বউ তর্কযুদ্ধে পরাস্ত ক'রে রাধাকান্তের সকল আপত্তি নাকচ ক'রে দিয়েছিলেন। রাধাকান্ত সেদিন তাঁকে মুখরা ব'লে মৃদু তিরস্কার ক'রেও আশ্রয় দিয়েছিলেন ষোড়শীকে। এ ক্ষেত্রে তাঁর উদারতা কতখানি এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার দম্ভ বা গৌরবলিপ্সা কতখানি, সে কথা সঠিক ক'রে বলা যায় না, তবে ছিল দুটোই। তবু তিনি অন্তরে অন্তরে প্রসন্ন ছিলেন না।

ষোড়শীর উপর। চটুল চপল এই বালবিধবাটিকে দেখে তিনি শিউরে উঠছিলেন। স্বাভাবিক নিয়মে জৈবিক ভাললাগার বিরুদ্ধে তাঁর বুদ্ধিগত উপলব্ধি বার বার সতর্ক হয়ে উঠেছিল। অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য নিয়ে মেয়েটির চটুলতা চপলতাকে শাসন ক'রে একটি সহজ পবিত্র সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাই তিনি করছিলেন। গৌরীকান্তকে আদর-যত্ন করা দেখে মন তাঁর নরম হয়েই আসছিল। হঠাৎ সেদিন তাঁর চোখে পড়ল, ষোড়শী কিশোরের পা ধুইয়ে দিচ্ছে। ব্যাপারটা তাঁর ভাল লাগে নাই।

কাশীর বউকে ডেকে কথাটা তিনি বলেছিলেন, এ প্রশ্রয় তুমি দিও না।

কিশোর সম্পর্কে কাশীর বউয়ের বিশ্বাস অগাধ; তিনি হেসে বলেছিলেন, না না, কিশোর সেরকম ছেলে নয়।

রাধাকান্ত বলেছিলেন, দেবতারও মোহ আসে কাশীর বউ; কিশোর তো রক্তমাংসের মানুষ। তা ছাড়া পৃথিবীতে মানুষের বিশ্বাস যাই হোক, শাস্ত্রের নির্দ্দেশ তার চেয়ে বড়। সেই হ'ল সত্য, ধ্রুব। শাস্ত্রে বলে, নারী আর পুরুষ এদের স্বাভাবিক সম্পর্কটাই হ'ল—ঘি আর আগুনের মত। পরস্পর থেকে নিরাপদ ব্যবধানেই থাকা নিরাপদ। এমন কি যুবতী কন্যার সঙ্গে পিতার একাসনে বসা, যুবক পুত্রের সঙ্গে মায়ের এক শয্যায় শয়নে পর্য্যন্ত শাস্ত্রের নিষেধ আছে।

কাশীর বউ স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, শাস্ত্র আমি পড়ি নি, তবে আমার মনে হচ্ছে, শাস্ত্র ভাল ক'রে তুমিও পড় নি, পড়লেও ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা কর নি।

রাধাকান্তের দৃষ্টি অস্বাভাবিক রূঢ়তায় কঠোর হয়ে উঠছিল, তিনি আত্মসম্বরণের চেষ্টা করছিলেন। কথার উত্তর তিনি সঙ্গে সঙ্গেই দিলেন না।

কাশীর বউ স্বামীর দৃষ্টিকে ভয় করলেন না, একটু হেসে বললেন, রাগ ক'রো না, ভেবে দেখো তুমি। ও নির্দ্দেশটা সেই সব মানুষের জন্যে, যাদের মধ্যে পশুস্বভাবটা হ'ল প্রবল। ষোড়শী তোমার পা ধুইয়ে দিলে, এমন কি গায়ে যদি তেলও দিয়ে দেয়, তবে আমার মনে কোন সন্দেহ হবে না।

রাধাকান্ত বললেন, কিন্তু আমি তা কোনদিন নোব না। তা ছাড়া কিশোর হয়তো পশু নয়, কিন্তু ষোড়শীর পরিচয় তো ভাল নয়। তার মধ্যে পশুস্বভাব যে প্রবল, সে কথা তো নতুন ক'রে প্রমাণ করার দরকার হবে না।

প্রমাণে আর লোকমুখের অপবাদে তফাত আছে। ষোড়শীকে লোকে যা মনে করে, তা আমি মনে করি না।

অর্থাৎ?

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে কাশীর বউ বললেন, এই নবগ্রামের ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে

যে সব অল্পবয়সী বিধবা আছে, কুলীনের ঘরের মেয়ে যারা স্বামীর ঘর পায় নি, এমন মেয়েদের সঙ্গে যোড়শীর আচার-ব্যবহারের কোন তফাত দেখতে পাই নি আমি। বরং দীনভাবে আছে ব'লে অনেকটা বেশি শান্ত। স্নেহের সঙ্গে শিক্ষা দিলে, ও ভাল হবে ব'লেই আমার বিশ্বাস।

রাধাকান্ত আর সহ্য করতে পারেন নাই, কঠোরভাবে বলেছিলেন, কাশীর বউ, দোষ তোমার নয়, দোষ এই কলিযুগের কালমাহাত্ম্যের। কলির ধর্ম্মই হ'ল, স্ত্রীকে সে স্বামীর বিরুদ্ধচারিণী করবে, পুত্রকে পিতামাতার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করাবে। যাক তর্ক আমি আর করব না, তোমাকে আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত সদুপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য, দিলাম। মানা, না মানা তোমার ইচ্ছা।

তিনি আর দাঁড়ান নাই, চ'লে যাচ্ছিলেন। কাশীর বউ ডাকলেন, দাঁড়াও।

না। তর্ক আমি করব না।

তর্ক নয়। তর্ক তোমার সঙ্গে করব আমি কোন্ অধিকারে?

রাধাকান্ত ঘুরে দাঁড়ালেন। বললেন, তর্ক করে মানুষ দুই অধিকারে। এক, স্থির-বিশ্বাসের অধিকার; আর এক, দম্ভের অধিকার। শেষেরটা হ'ল গায়ের জোরে অন্যের অধিকারে প্রবেশের মত অনধিকার-প্রবেশ। এর একটা অবশ্যই আছে তোমার, নইলে এতক্ষণ তর্ক করলে কি ক'রে?

কাশীর বউ একটু চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বললেন, এ বাড়িতেই আমার প্রবেশের অধিকার তোমার অধিকারের জোরে। তোমার সঙ্গে তর্ক করা আমার উচিত নয়।

তর্ক ছেড়ে এইবার তুমি ঝগড়া করতে শুরু করলে কাশীর বউ।

না। কাশীর বউ হাসলেন। হেসে বললেন, না। তর্কও নয়, ঝগড়াও নয়, আমি জানতে চাইছি তোমার হুকুম। যোড়শীকে কি যেতে ব'লে দেব?

রাধাকান্ত চিন্তিত হলেন। আশ্রয় দিয়ে তাকে এইটুকু কারণে তাড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক ন্যায় এবং ধর্ম্মসম্মত হবে ব'লে কিছুতেই মনে করতে পারলেন না।

কাশীর বউ বললেন, যা বলবে, তাই করব আমি।

রাধাকান্ত বললেন, তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলি নি আমি। আমি বলেছি, প্রশ্রয়ের কথা।

* * *

তাড়িয়ে দিলেই ভাল হ'ত।

গ্রামের মধ্যে যোড়শীকে আশ্রয় দেওয়ার সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল। কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ল, সেদিনের ওই মিটিঙের গণ্ডগোলে।

মিটিং হ'ল না। হতে পারল না।

উনিশ শো পাঁচ সাল পার হয়ে উনিশ শো ছ সাল চলছে। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য ক'রে দেশে স্বদেশীর সাড়া জাগার সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের নজর চুরি-ডাকাতির দিকটা ছেড়ে মিটিং-প্রসেশনের দিকে বেশি পড়েছে। আগে থানার সমুখের রাস্তার উপর দিয়ে বাবরি চুল, দুশমনি চেহারা, লম্বা লাঠি নিয়ে কেউ গেলে, কনষ্টেবল তার সন্ধান নিত, এখন মোটা স্বদেশী মিলের কি তাঁতের কাপড়-জামা প'রে কোন অল্পবয়সী ভদ্রসন্তান গেলে তার খবর নিতে হয়; নাম-ধাম খাতায় লিখতে হয়। দু ধরনের লোক যদি একসঙ্গে দেখা যায় রাস্তার উপর, তবে আগে খবর নিতে হয় ভদ্রলোকের ছেলেটির, তাতে যদি লাঠিধারী দুশমনি চেহারার লোকটি পেরিয়ে চ'লে যায় তাতে ক্ষতি বোধ করেন না থানা-অফিসার। এই সময়ে জমিদার প্রজাকে চাবুক মেরেছেন এই তুচ্ছ ঘটনাটিকে অবলম্বন ক'রে এখানকার লোকেরা সমবেত হবে, মিটিং করবে, গরম গরম বক্তৃতা করবে, এমন গুরুতর ঘটনা কিছুতেই ঘটতে দিতে পারেন না থানা-অফিসার। উপর থেকে কড়া হুকুম আছে, প্রতিটি মিটিঙের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, তার রিপোর্ট পাঠাতে হবে। শোকসভা, ফেয়ারওয়েল সভা এবং সরকারী কর্ম্মচারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কোন সভা ছাড়া, এই ধরনের সভা হ'লেই উপর থেকে কৈফিয়ৎ তলব হয়—কেন এমন সভা সংঘটিত হ'ল তোমার এলাকায়? দারোগা জানকী গুহ দুঁদে অফিসার, প্রচুর মদ খান, পান চিবোন আর গড়গড়া টানেন এবং ক্রমাগত থু-থু ক'রে পানের কুটি ফেলেন। অভিজ্ঞ লোকেরা বলে, থু-থু ক'রে তিনি পানের কুটি ফেলেন না, ওটা তাঁর অতিরিক্ত-মদ্যপান-সঞ্জাত একটা অভ্যাস।

মিটিঙের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল গ্রামপ্রান্তে একটা মাঠে। এ মিটিঙের জন্য গ্রামের মধ্যে স্থান পাওয়া যায় নাই। জায়গাটুকু পুরাণ-বর্ণিত কাশীধামের মত। হিন্দু-পল্লী ও মুসলমান-পল্লীর মধ্যে খানিকটা প্রান্তরের মত স্থান, তারই মধ্যে ঢিপির মত উঁচু বিঘা চারেক জায়গা; ঢিপিটাকে বলে—ঠাকুর-ঢিপি। এখানকার ঠাকুরবংশীয় মুসলমান জমিদারেরা এই স্থানটুকু সর্ব্বসাধারণকে দান ক'রে গিয়েছেন। বিজয়া দশমীর দিন হিন্দু-মুসলমান-পল্লীর এই সংযোগস্থলটুকুর উপর দুর্গাপ্রতিমা নামানো হয়, মহরমের তাজিয়া নিয়ে হিন্দু-পল্লীতে প্রবেশের আগে এইখানে নামানো হয়। পূর্ব্বকালে এখানে হাট বসত। সে হাট এখন বসে চণ্ডীমায়ের এলাকায়। এই জায়গাটুকুর মালিক নির্দ্দিষ্ট না থাকার জন্য হাটের তোলা নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে, সেই গণ্ডগোলের জন্য বর্ত্তমান হিন্দু জমিদারেরা হাট তুলে চণ্ডীতলায় বসিয়েছেন।

মধ্যে মধ্যে আশ্রয়হীন দরিদ্রেরা এসে এখানে চালা তুলে বসবাসের চেষ্টা করে; কিন্তু এই ঢিপিটা এমনই অনুর্ব্বর যে, একটা লাউলতা, কি কুমড়োলতা, কি দুটো

শাকপাতাও জন্মায় না, সেই হেতু তারা কিছুদিনের মধ্যেই খাজনা না-লাগার সুবিধা অগ্রাহ্য ক'রেও উঠে চ'লে যায়।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর কিশোর মণি দত্তের পরামর্শে এই স্থানটিই মিটিঙের জন্য নির্দিষ্ট করেছিল। তরুণ কিশোর অবশ্য এতখানি ভাবতে পারে নাই, ভেবেছিল মণি দত্ত। ভাববার মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বয়সও কিশোরের হয় নাই। জমিদারের প্রবল প্রতাপের কথা তার কাছে কাহিনী নয়, চোখে সে দেখেছে; দূর-দূরান্তর গ্রামের মানুষদের এখানে এসে জোড়-হাত ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকতে দেখেছে; জমিদারের পাইক-চাপরাসীদের চাষী প্রজা ধ'রে আনতে দেখেছে, হুকুম অনুযায়ী কখনও দেখেছে চাপরাসীরা চাষীদের পিছনে, গরু-ছাগলের পালের পিছনে উদ্যত-প্যাচন-লাঠি রাখালের মত 'ডাকিয়ে' আনছে, কখনও দেখেছে হাতে ধ'রে আনছে আসামীর মত, দু-এক ক্ষেত্রে গলায় গামছা বেঁধে আনতেও দেখেছে। জরিমানা শাস্তি অতি সাধারণ কথা, ও কথা শুনে জমিদার অন্যায় করেছে এই মানসিকতাও বোধ হয় নষ্ট হয়ে গিয়েছে, ওটা যে অন্যায়, এ কথা মনেই হয় না; মধ্যে মধ্যে জুতো মারার কথাও শুনেছে, কাছারির থামের সঙ্গে বাঁধার কথাও শুনেছে, চাপরাসীদের কান ম'লে দেওয়ার কথাও শুনেছে। জমিদারের পা ধ'রে প্রজাদের কাঁদতেও শুনেছে। তাদের বলতে শুনেছে, জমিদার মা-বাপ, জমিদার রাজা। জমিদারের ভূস্বামী নামও সে জানে; হক হুকুম, উর্দ্ধ অধঃ এই কথাগুলোও যে দলিল-দস্তাবেজে লেখা হয়, তাও সে শুনেছে। কিন্তু তার আসল মূল্য যে কতখানি, কোম্পানির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলে জমিদারের আইন সঙ্গত স্বত্ব অনুযায়ী অধিকার যে কতখানি, কর্ম্মজীবনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে সে জানবার মত বয়স কিশোরের হয় নাই। প্রজার জোতজমার বাইরের সমস্ত জমি জমিদারের; ক্ষেত খামার, খাল বিল, জঙ্গল পতিত সমস্ত জমিতে জমিদারের খাস স্বত্ব। স্বর্ণবাবু গ্রামের জমিদারের মধ্যে মোটা অংশীদার। তিনি চাপরাসী পাঠিয়ে মিটিং ভেঙে দেবেন।

চাপরাসী পাঠিয়ে মিটিং ভেঙে দেবেন? স্বপ্নবিভোর কিশোর হেসে বলেছিল, কত চাপরাসী আছে স্বর্ণবাবুর?

মণি দত্ত হেসে বলেছিল, কিশোরবাবু, ওরা মার খেয়ে ফিরে গেলে, ফৌজদারিতে আমরাই বিপদে পড়ব। স্বর্ণবাবু বলবেন, আমার জমিতে তারা অনধিকার প্রবেশ করেছিল। তা ছাড়া থানায় খবর দিয়ে এক শো চুয়াল্লিশ ধারাও জারি করাতে পারেন।

কাকার বেতের দাগ তখনও কিশোরের পিঠ থেকে মিলিয়ে যায় নি, ছেঁড়া জামার ঘেঁষ লেগে তখনও মধ্যে মধ্যে জ্বালা ক'রে উঠছিল; যোড়শীর সেবায় সে খানিকটা

সান্ত্বনা পেয়েছিল, রাধাকান্ত ঠাকুরদার স্ত্রী কাশীর দিদির উৎসাহে মনে সে বল পেয়েছিল ; তার নিজের তরুণ মনের স্বপ্ন, পৃথিবীর সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে মথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার কল্পনা, এ পর্য্যন্ত অটুট ছিল। তাই, ওই মার খাওয়ার পরও মাথা উঁচু ক'রে গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে এসে মণি দত্তের কাছে মিটিং করবার জন্ত দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মণি দত্তের কাছে স্বর্ণবাবুর অধিকারের সীমা-পরিসীমার বিরাটত্ব এবং বিপুলত্ব জেনে সে যেন খানিকটা দ'মে গেল।

মণি দত্ত বললে, ভাবনা নাই, ওই ঠাকুর-ঢিপিতে আমরা মিটিং করব। ওই জায়গাটা হ'ল একেবারে সর্ব্বসাধারণের জায়গা। এখানকার মিয়াসাহেব ঠাকুরবংশের নানকার—মানে নাখরাজ ছিল, মুখে হ'লেও ওটা তাঁরা দান ক'রে গিয়েছেন এখানকার সর্ব্বসাধারণকে।

অমূল্য-ভূপতির বিরোধী দল বেনেপাড়ার ছেলেরা চেষ্টা-চরিত্র ক'রে দু-তিনখানা চেয়ারও সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। মণি দত্ত আর কিশোর গেল গোপীচন্দ্রের বড় ছেলে কীর্ত্তিচন্দ্রের কাছে, তাঁকে প্রেসিডেণ্ট হতে হবে।

কীর্ত্তিচন্দ্র দুর্দ্দান্তপ্রকৃতির লোক। ধনসম্পদে এ অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও এখানকার সর্ব্বময় শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠার দাবি তাঁর বাপ গোপীচন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশি, ক্ষোভও তাঁর অনেক তীব্র। গোপীচন্দ্র প্রথম জীবনে দরিদ্র ছিলেন, সেকালে তিনি দরিদ্রের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুযায়ী স্বর্ণবাবু এবং অন্যান্য গ্রামের অন্যান্য প্রধানদের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন ; ক্ষোভহীন অন্তরে বিনা প্রতিবাদে জন্মগত ভাগ্যফল বিধাতার বিধান ব'লেই মেনে নিয়েছিলেন এবং এঁদের অনেক অনুগ্রহও সেদিন সকৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করেছিলেন ; তাই তাঁর আজকের দাবি যতই হোক, সে দাবি কীর্ত্তিচন্দ্র অপেক্ষা নম্র। তা ছাড়া প্রকৃতিতেও গোপীচন্দ্র কীর্ত্তিচন্দ্র অপেক্ষা স্বতন্ত্র। গোপীচন্দ্রের প্রকৃতি সত্যই মধুর, সার্থকতাপূর্ণ কর্ম্ম ও কীর্ত্তি তাঁর সে প্রকৃতিকে উদার ক'রে তুলেছে। কিন্তু ধনীর পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র স্বতন্ত্র পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানুষ হয়েছেন, শৈশব থেকে ধনের প্রাচুর্য্য তাঁকে যেমন দাম্ভিক এবং প্রমত্ত ক'রে তুলেছে, তেমনই শৈশব থেকেই পিতার অন্তরের প্রতিষ্ঠার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চনার নম্র ক্ষোভের বিষ তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই তীব্র হয়ে উঠেছে।

কীর্ত্তিচন্দ্রের মধ্যে মধ্যে মনে হয়—।

সে ভীষণ কল্পনা।

একদিন উত্তেজনার মুখে তিনি রাধাকান্তের সম্মুখে কথাটা ব'লে ফেলেছিলেন। দাম্ভিক উগ্র হ'লেও কীর্ত্তিচন্দ্র অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ; উপযুক্ত শিক্ষা পেলে এবং তাঁর জীবনের সঠিক ক্ষেত্র পেলে তিনি প্রতিভা ব'লে পরিগণিত হতে পারতেন ; উত্তেজনার

মুখেও তিনি রাধাকান্তের সম্মুখে সমগ্র গ্রামের সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেন নাই। স্বর্ণবাবু সম্বন্ধে তাঁর আক্রোশ-জ্বালাময় কল্পনার কথা বলেছিলেন।

রাধাকান্তও বুদ্ধিমান লোক, তার উপর তাঁর জীবনের মর্য্যাদাজ্ঞান বড় প্রবল। তিনি সমস্ত বুঝেও উগ্রভাবে প্রতিবাদ করেন নাই বা ধিকার দেন নাই। মর্য্যাদার সঙ্গে বলেছিলেন, ও কথা মুখে উচ্চারণ করতে নাই।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি কীর্ত্তিচন্দ্র প্রসঙ্গ মুহূর্ত্তে পাল্টে দিয়ে হেসে বলেছিলেন, ওটা কথার কথা বলছিলাম ঠাকুরদা।

রাধাকান্ত বলেছিলেন, প্রিয় বাক্য মিথ্যা হ'লেও প্রাণে শান্তি দেয় ভাই। আবার সাধনা করলে মিথ্যাই সত্য হয়ে ওঠে। ঘটনাটি তিনি দিনলিপিতে লিখে রেখেছেন।

এই কীর্ত্তিচন্দ্রের এক দিক। অন্য একটা দিকও তাঁর আছে। জীবনে শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেন নাই, লেখাপড়া শেখেন নাই, কিন্তু পৈতৃক বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে নিজের অকিঞ্চিৎকরত্ব এবং ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করেছেন, কথাবার্ত্তা বলতে গিয়ে অপ্রতিভ হয়েছেন, তাই তিনি জীবনের প্রকাশ্য ক্ষেত্রে অত্যন্ত সঙ্কুচিত, কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত লাজুক। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে গোপীচন্দ্রের আদর্শ সত্ত্বেও অসাধুতা অবশ্যম্ভাবীরূপে আলোর পিছনে অন্ধকারের মত আছেই; গোপীচন্দ্রকে ব্যথিত চিত্তে তাকে স্বীকার করতে হয়েছে; কীর্ত্তিচন্দ্র তাঁর প্রবৃত্তি অনুযায়ী তাকেই পুষ্ট ক'রে তুলতে চেষ্টা করেন; ফলে অসাধুতার পূজারী কীর্ত্তিচন্দ্র যে কোন আদর্শবাদকে ভয় করেন।

কিশোর এবং মণি দত্ত কীর্ত্তিচন্দ্রের কাছে আসতেই তিনি প্রথমটা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। বললেন, সভাপতিত্ব করতে আমি পারব না। আমি—। বার কয়েক ঢোক গিলে বললেন, বক্তৃতা আমার অভ্যেস নেই।

কিশোর বললে, বক্তৃতা আপনাকে করতে হবে না।

কীর্ত্তিচন্দ্র কল্পনা করলেন, সমবেত জনসাধারণের সামনে তিনি চেয়ারে ব'সে আছেন। কিশোর বক্তৃতা করছে। আবার একবার মন উৎসাহিত হয়ে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার তিনি সঙ্কুচিত হলেন। কাতারে কাতারে সমবেত লোকের দৃষ্টি তাঁর উপর নিবদ্ধ হয়েছে। অন্যায়ের প্রতিবাদে তিনি অগ্রণী হয়েছেন। নিজের বহু অন্যায় মনে প'ড়ে গেল; ভাবীকালে বহু অন্যায়ের কল্পনা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। তা ছাড়া বাবার নিষেধের কথাও মনে পড়ল। গোপীচন্দ্র বলেছেন, এতে যোগ দিও না। প্রকাশ্যভাবে সভা ক'রে স্বর্ণকে অপদস্থ করাটা ভাল হবে না বাবা। পদ তোমারও আছে, আর স্খলন—পদ যাদের আছে তাদেরই হয়। সংসারে

একটা কথা আছে, "একদিন দাদার হাট, একদিন দিদির হাট।" তাই দাদা দিদিতে মনোমালিন্য যতই থাক্, প্রকাশ্যে বনিয়ে চলা ভাল।

কীর্ত্তিচন্দ্র কথাটা অস্বীকার করতে পারেন নাই ; তবুও তাঁর মত ছিল, প্রকাশ্যে যোগ না দিয়ে গোপনে উৎসাহিত করতে ক্ষতি কি ? তাই তিনি বলেছিলেন, না, ওতে যোগ দেব না। সভায় যাব না আমরা। তবে—

'তবে' শব্দটির অর্থ বুঝতে গোপীচন্দ্রের বিলম্ব হয় নাই। তিনি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে নিজের সংসঙ্কল্পকে দৃঢ় ক'রে নিলেন। গোপনে অন্তরালে থেকে এই সব সাধারণ মানুষদের উৎসাহিত ক'রে স্বর্ণবাবুকে অপদস্থ করার সুযোগ তাঁকেও প্রলুব্ধ যে না করছিল, এমন নয় ; রাত্রির অন্ধকারে গর্ত্তের পাশে অসতর্ক পথিককে দংশনোদ্যত সাপের মত অন্তরের ক্ষোভ এই সুযোগে বার বার মুখ বাড়াতে চাইছিল ; কিন্তু তাঁর সৎপ্রবৃত্তি—এই কাল-অনুযায়ী সামাজিক শীলতা এ প্রবৃত্তিকে বাধা দিল। এই দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছুক্ষণ কাটিয়ে তিনি ক্ষোভকে জয় করলেন ; তারপর বললেন, না। এ কাজ করলে ধর্ম্ম অসন্তুষ্ট হবেন কীর্ত্তি। ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়, স্বর্ণেরও হয়েছে। এ ভুলের সুযোগ নিয়ে কোন কাজ তুমি ক'রো না। আমি বারণ করছি। বার বার বারণ করছি।

আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বলেছিলেন, আমি কুঠি যাচ্ছি। আমি থাকব না, থাকতে পাব না, সেই আমার ভয়। আমার অনুপস্থিতিতে এমন কোন কাজ তুমি ক'রো না।

পিতৃভক্তি সংসারে সমাজে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ; সব ছেলেই অল্পবিস্তর বাপকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে ; বাপ কীর্ত্তিমান অথবা সম্পদশালী হ'লে পিতৃপরিচয়ধন্য অথবা ভোগবিলাসতৃপ্ত পুত্রের সে শ্রদ্ধা ভালবাসা স্বাভাবিকভাবেই গাঢ়তায় এবং পরিমাণে বেড়ে যায়। কীর্ত্তিচন্দ্র গোপীচন্দ্রকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করেন ; তিনি মেনে নিয়েছিলেন তাঁর কথা। কিন্তু কীর্ত্তিচন্দ্র কীর্ত্তিচন্দ্র, গোপীচন্দ্রের অনুপস্থিতির প্রতিটি দিনের সুযোগে তিনি বিস্মৃত হচ্ছিলেন পিতার কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি। বিপরীত যুক্তিতর্কের উখো দিয়ে ঘ'ষে ঘ'ষে প্রতিশ্রুতি-পিণ্ডটিকে ক্রমশ বিন্দুতে পরিণত ক'রে আনছিলেন। আইনের ফাঁক দিয়ে আইন-কর্ত্তাদের ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসার যে কূটবুদ্ধির আনন্দ, সেই আনন্দে তিনি ক্রমশ মেতে উঠছিলেন। তাই তিনি রঙলালের ছেলের কাছে অপরকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন, রঙলালের ছেলের যত টাকার প্রয়োজন হয় তিনি দেবেন। আর জানিয়েছিলেন কিশোরের পরিচয়। এমন সত্যনিষ্ঠ-যুবক এ নবগ্রামে আর নাই। কোন প্রলোভনে, কোন ভয়ে তার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বার হবে না। অর্থাৎ কিশোরই এ মামলার একমাত্র সাক্ষী ; সে কখনও মিথ্যা বলবে না।

গোপগ্রামের সদগোপ অধিবাসীদের মজলিসে এ নিয়ে আলোচনা চলছে। উত্তেজনা খুবই প্রবল। কিন্তু তবু তারা অগ্রসর হতে সাহস করছে না। আলোচনা শেষ হয় প্রবল উত্তেজনার মধ্যে, স্থির হয়, কালই অগ্রসর হতে হবে, নবীন সদরে যাবে মামলা দায়ের করবার জন্ম। মজলিস ভাঙে, যে যার বাড়ি ফিরে যায়, ধীরে ধীরে উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে আসে, জমিদারের প্রতাপ, জমিদারের স্বত্ব অধিকার মনে পড়ে। মনে পড়ে এর পূর্ব্বে অনুরূপ ঘটনাবলীর কথা, কতজন সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে, কতবার এমনই বিরোধ ক'রে শেষ পর্য্যন্ত দাঁতে কুটো নিয়ে মাথা হেঁট ক'রে তাদেরই উপযাচক হয়ে মিটমাট করতে হয়েছে; মনে পড়ে প্রবাদবাক্য—পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয়, মাথা ঠুকে পাথর ভাঙতে গেলে মাথাই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। জমিদার পাথর। রাত্রির ঘুম দুঃস্বপ্নে ভ'রে যায়। ভোরে উঠেই বিপত্তিনিবারণকারী মধুসূদনের নাম স্মরণ করতে করতে ছুটে যায় রঙলালের বাড়ি। দেখতে পায়, রঙলাল নবীনকে নিয়ে দাওয়ার উপর ব'সে আছে, সেও ভাবছে। আশ্বস্ত হয় মনে মনে। রঙলাল অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে নিজে থেকেই বলে, সাতপাঁচ ভাবছি ভাই।

তা বটে। ভাবনার কথাই বটে।

হ্যাঁ। যা করতে হবে অগ্যপচ্চাৎ (অগ্রপশ্চাৎ) ভেবেই করা উচিত। শেষে পস্তাতে না হয়। অপমানের ওপর অপমান মাথায় ক'রে আনতে না হয়।

মনিহারপুরের গাঙ্গুলীদের মেজোবাবু দাঙ্গার সময় একজনকে গুলি ক'রে মেরেই ফেললে। মেরে ফেলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে গেল সদরে, ম্যাজেষ্টারের সঙ্গে শ্যাকাণ্ড-ম্যাকাণ্ড (শেকহাণ্ড) ক'রে, বাস্, মামলা ভিতেই ফাঁসিয়ে দিলে। পুলিশের মুখ বন্ধ ক'রে দিলে টাকা দিয়ে। ব'লে দিলে, ঘটনার দিনে মেজোবাবু ছিল সদরে। তার সাক্ষী আছে জজ ম্যাজেষ্টার।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রঙলাল হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে ব'লে ওঠে, হে ভগবান, হে পভু (প্রভু), বিচার ক'রো তুমি, ইয়ের বিচার ক'রো। দীনদরিদ্রের সহায় রাজা লয়, একমাত্র তুমি।

নবীন নীরবে কাঁদতে কাঁদতে উঠে যায়।

রঙলাল ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে ছেলের উপর। বলে, তোদের আর কি বল্? জোয়ান বয়েস, তার ওপর এ কালের ছেলে। নিজের বুকে দুটো চাপড় মেরে ভেঙিয়ে বলে, গরম—রক্ত গরম হয়েই আছে। হারামজাদী নষ্ট দুষ্টু মেয়ের ওই পরিণামই বটে। গিয়েছে বেশ হয়েছে। তা না, তাল ঠুকে লড়ুয়ে মেড়ার মত গোঁ গোঁ ক'রে ছুটে গেলি তাদের গাঁ পর্য্যন্ত। কথায় আছে বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা। তা এ তো হ'ল জমিদার। তাদের গাঁ চড়াও হয়ে মারামারি করতে গেলে মার তো খাবিই রে বাপু। এখন কাঁদলে কি হবে?

হ্যাঁ। নিশ্চয়। এ তোমার একশো বার ন্যায্য কথা। আমাদের গাঁয়ে এসে মেয়ে যেত, তাতে যদি আমরা ছুটে গিয়ে না পড়তাম, তবে কথা বটে। বলতে পারত।

রঙলাল বলে, আমরাও তো এককালে জোয়ান ছিলাম রে বাপু! এমন তো ছিলাম না। নায়েবের সঙ্গে ঝগড়া হ'ল। জোয়ান বয়েস, উঠলাম রুখে। তারপর বাবা এসে বললে, মুখ্যু কোথাকার, বয়েস কত নায়েববাবুর ভাব্ দেখি? তু জাতে সদগোপ, উনি বাম্ভন সে কথা ভাব্ দেখি! লে, ধর্ পায়ে। বললে, বিদ্ধ বাম্ভন যদি মনে মনে শাপশাপান্ত করে, তবে যে কেটে ম'রে যাবি হতভাগা। তাই বলব কি, মন ছিল না, মনে হছিল (হচ্ছিল) মাথাটা কাটা গেল আমার, তা তাই ব'লে কি বাবার কথা অমান্ত করতে পারি? তখুনি ধরলাম পায়ে।

দিনের দিন নবীনের উত্তাপও ক'মে আসছে। পিঠে বেতের দাগগুলো প্রথমে লালচে ছিল, তারপর নীলাভ, অর্থাৎ কালসিটে হয়ে উঠেছিলে, দিনের দিন কালসিটেও ফিকে হয়ে আসছে।

কিশোরের এই মিটিঙের কল্পনাকেই সে শেষ আশ্রয়—একমাত্র সান্ত্বনাস্থল ব'লে আঁকড়ে ধরেছিল।

নবীন কীর্ত্তিচন্দ্রের উৎসাহে উৎসাহিত হবার সুযোগ পায় নাই। পারিপার্শ্বিক তাকে নিরুৎসাহিত করেছে। কীর্ত্তিচন্দ্রের দূতের কথায় নির্ব্বাক হয়ে উদাস-দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছে। এ সংবাদ কীর্ত্তিচন্দ্রকে খানিকটা বিরূপ ক'রে তুলেছিল।

কুটিল কীর্ত্তিচন্দ্রের চরিত্র। জটিল পারিপার্শ্বিক। স্বর্ণবাবুর উপর আক্রোশ, নবীনের উপরেও বিরূপতা, পিতার নিষেধ, তাঁর উপদেশ, নিজের গোপন ষড়যন্ত্রের প্রবৃত্তি, সভায় বহুজনের সম্মুখে সম্মানের আসন, নিজের অক্ষমতা, আদর্শহীনতা, সমস্ত কিছু জড়িয়ে সে এক জটিলতর অবস্থার মধ্যে পড়লেন কীর্ত্তিচন্দ্র। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নিজের অক্ষমতা এবং আদর্শহীনতার গোপন লজ্জা বড় হয়ে উঠল। তাঁর সাহস হ'ল না জনসাধারণের সম্মুখে আদর্শবাদীর ভূমিকা নিয়ে দাঁড়াতে, তিনি হাঁপিয়ে উঠে অবশেষে বললেন, ওসবে আমি নাই কিশোর। ও আমি পারব না। বাবা নিষেধ করেছেন।

তারপর বললেন, মামলা-মকদ্দমা করলে অবশ্য—। একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, তাও বাবার নিষেধ আছে। প্রকাশ্যে সাহায্য করতে পারব না আমি। তবে সে ব্যবস্থা করব। রঙলাল মামলা চায় না শুনেছি। তা নবীনই যদি মামলা করে, তাতে আমি টাকা যা লাগে দোব। হ্যাণ্ডনোটেই দোব। সুদ লেখা থাকলেও নোব না। যতদিনে পারে শোধ করবে, ধীরে ধীরে শোধ করবে।

কিশোর মণিকে নিয়ে চ'লে এসেছিল।

কীর্ত্তিচন্দ্রের ওখান থেকে গিয়েছিল রাধাকান্তের কাছে। রাধাকান্ত এক কথায় বলেছিলেন, যোড়শীকে যখন আশ্রয় দিয়েছি কিশোর, তখন বুঝতে পারছ, আমার চোখে যদি এটা ন্যায় মনে হ'ত, তবে তোমার কথায় রাজি অবশ্যই হতাম। আমার মনে হয়, এটা তোমরা অন্যায় করছ।

কিশোর আহত হয়েছিল। বলেছিল, অন্যায় বলছেন আপনি?

হ্যাঁ, অন্যায়।

মণি দত্ত এ গ্রামের সকল অবস্থাশালী ব্রাহ্মণ-বংশীয়দের বিরোধী, সকলকেই সে অমান্য করতে চেষ্টা করে, মনে মনে অবজ্ঞাও করে; কিন্তু রাধাকান্তকে মানতে হয়, মনে মনে অবজ্ঞা করতে গেলে নিজের কাছেই নিজে লজ্জা পায়, কারণ যুক্তিতর্কে রাধাকান্ত বার বার নিজের পক্ষেই ন্যায় প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হয়েছেন। আজ মণি দত্ত রাধাকান্তের এই কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠল। এই প্রতিবাদকে রাধাকান্ত অন্যায় বলছেন? অর্থাৎ তিনি স্বর্ণবাবুর উৎপীড়ন সহ্য করাকেই ন্যায় বলছেন! অর্থাৎ স্বর্ণবাবুর এই উৎপীড়ন তা হ'লে ন্যায়সঙ্গত! অত্যন্ত বিনয় ক'রে প্রশ্ন করার ভঙ্গীর মধ্যে শ্লেষ চমৎকার ফুটে ওঠে; অতি বিনীত সেই ভঙ্গীতে সে বললে, অন্যায় বলছেন, তার কারণটা জানতে পারি বাবু?

কারণ?

হ্যাঁ। কি কারণে অন্যায় বলছেন, মানে দু-কলম ইংরেজী বাংলা পড়া বিদ্যে তো আমাদের! আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল রাধাকান্তের; সমস্ত উক্তির মধ্যে ব্যক্তি শব্দের প্রয়োগটি ব্যঙ্গ-শ্লেষকে অতিমাত্রায় শাণিত ক'রে তুলেছিল। তিনি চকিতের জন্য রূঢ় দৃষ্টিতে মণি দত্তের দিকে না তাকিয়ে পারলেন না, তারপর মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, স্বর্ণের অন্যায় আমি সমর্থন করি না। কিন্তু এই ধরনের প্রতিবাদ-সভার রেওয়াজ হ'লে সমাজের সমূহ অকল্যাণ হবে। একেই আজ সমাজের সমস্ত শৃঙ্খলাই প্রায় নষ্ট হয়েছে, এতে সমূলে ধ্বংস হবে। কেউ আর কাউকে মানবে না। তোমরা আমাকে মার্জ্জনা কর, এ আমি পারব না।

মণি দত্ত বললে, কিছু মনে করবেন না, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম-ত্যাগী পরশুরামকে ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র দমন করেছিলেন। রথে বশিষ্ঠ ছিলেন, তিনি কোন প্রতিবাদ করেন নি।

রাধাকান্ত হেসে বললেন, মণি, স্বর্ণ পরশুরাম নয়, তুমি রামচন্দ্র না।

হেসে মণি বললে, আপনি কিন্তু বশিষ্ঠ।

একটু স্তব্ধ থেকে নিজেকে সংযত ক'রে রাধাকান্ত বললেন, এত বড় গৌরব তুমি যখন আমাকে দিলে মণি, তখন তোমাকে আমি ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র পদবী দিচ্ছি। যে

দিন উপযুক্ত হয়ে আসবে, সেদিন তোমাকে আমি নিজে থেকে ব্রাহ্মণত্ব দোব। আজ তুমি ন্যায়ের খাতিরে আস নি, এসেছ প্রতিহিংসার তাড়নায়। যাক, ও কথা থাক্। তোমাদের সভার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমরা বরং অন্য লোক দেখ। আমার মনে হয় মণি, তুমিই সভাপতি হতে পার।

কিশোর বললে, তাই হবে। আপনিই সভাপতি হবেন দত্তমশায়।

আমি? শঙ্কায় বিচলিত হ'ল মণি দত্ত। সভাপতি হবে সে?

হ্যাঁ, আপনি। চলুন। হনহন ক'রে চলতে আরম্ভ করলে কিশোর। তার জেদ বেড়ে চলেছে।

একটু আস্তে চলুন কিশোরবাবু। দাঁড়ান।

মণি দত্ত কিশোরের সঙ্গ ধ'রে বললে, ষোড়শী রাধাকান্তবাবুর বাড়িতে আছে?

হ্যাঁ।

রাধাকান্তবাবুর এ সমস্ত দোষ আর নাই ব'লেই জানতাম। তা—

তীব্রস্বরে বাধা দিয়ে কিশোর বললে, ছি!

মানে?

আমিই ষোড়শীকে অমূল্য-ভূপতির হাত থেকে ছাড়িয়ে ঠাকরুণদিদির আশ্রয়ে রেখে দিয়েছি। তা না হ'লে সেই দিনই ষোড়শীর চরম দুর্গতি হয়ে যেত।

আমার বাড়ি নিয়ে গেলেই পারতেন।

মণি দত্তের দিকে তাকিয়ে কিশোর বললে, ষোড়শী যেতে চায় নি। বলেছিল কি জানেন?

কি?

বলেছিল, আপনার চোখের চাউনি তার ভাল লাগে না।

মণি বললে, নষ্ট দুষ্টু মেয়েদের ঢঙই আলাদা।

থাক্ ওসব কথা। একটু তাড়াতাড়ি চলুন।

পথ প্রায় জনশূন্য। লোকজন সব এতক্ষণে গিয়ে ঠাকুর-ঢিপিতে জমায়েৎ হয়েছে। হনহন ক'রে চলল তারা।

ঠাকুর-ঢিপি জনশূন্য। দারোগা গুহবাবু ঘোড়ায় চেপে দাঁড়িয়ে আছেন। জন কয়েক কনষ্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। খালি চেয়ারটা প'ড়ে রয়েছে, সেটা দাবি করবার পর্য্যন্ত কেউ নাই। মণি দত্ত থমকে দাঁড়াল। কিশোর বিস্মিত দৃষ্টিতে মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল।

গুহ হেসে বললে, ইয়া। ব'লেই ফু ক'রে পানের কুটি ফেললেন, আবার আরম্ভ করলেন, অ্যাট লাষ্ট, ফুঃ, ইউ হ্যাভ কাম, ফুঃ! ফুঃ! ফুঃ। কাম হিয়ার।

কিশোর গিয়ে দাঁড়াল।

গুহ বললেন, মিটিং হবে না। ফুঃ! ফুঃ! সব বেটাকে আমি শাসিয়ে দিয়েছি। ফুঃ ফুঃ! ইউ সি, গো হোম। ফুঃ ফুঃ। হঠাৎ পথের দিকে মুখ ফিরিয়ে গুহ ব'লে উঠলেন, আরে, আরে, হোয়্যার ইজ মণি দত্ত?

কনষ্টেবলরা চেয়ে ছিল এই দিকে, কিশোরের দিকে। এই অবসরে মণি রাস্তার ওপারের পল্লীটার একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

গুহ কিশোরকে বললেন, যাও, বাড়ি যাও। বাট আই মাষ্ট হ্যাভ দ্যাট ডাটা—মণি ডাটা। আই মাষ্ট হ্যাভ হিম। এই সিপাহী, চলো তো থানামে। ওহি দত্তকো বোলানে হোগা।

কিশোর স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল ঠাকুর-ঢিপির উপর শূন্য চেয়ারখানার দিকে চেয়ে। সমস্ত অপরাহ্নবেলাটা কেটে গেল তার সেইখানে। প্রান্তরের মত হিন্দু ও মুসলমান পল্লীর মধ্যে খানিকটা স্থান। দু-চারজন মানুষ মধ্যে মধ্যে দেখা যাচ্ছে—যাচ্ছে, আসছে। দূরে পল্লীপ্রান্তে গাছপালার ফাঁকে কখনও কখনও কয়েকজন এসে দাঁড়াচ্ছে, কিছুক্ষণ এই দিকে তাকিয়ে কিছু বলছে, আবার চ'লে যাচ্ছে। কেউ এক পা এগিয়ে আসতে সাহস করলে না। সন্ধ্যা হয়ে এল। কিশোর তখনও সেইখানে ব'সে রইল। কৃষ্ণপক্ষ। অন্ধকার গাঢ় হতে লাগল পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে। হঠাৎ একজন কেউ এল।

কে?—প্রশ্ন করলে কিশোর।

লোকটি উত্তর না দিয়ে চেয়ারখানা মাথায় তুলে প্রায় ছুটতে আরম্ভ করলে। কিশোর বুঝলে, যার চেয়ার তারই কোন লোক। ভয়ে উত্তর দিলে না। বুকখানা তার হতাশায় ভেঙে পড়ল। বাড়িতে কাকা খড়্গহস্ত হয়ে আছেন। সে স্থিরই করেছে, বাড়িতে আর যাবে না। গ্রামের লোক ভয়ে ঘরে ঢুকেছে। ব্যর্থতার বেদনায় তার চোখে জল এল। ব'সে থাকতে থাকতে তার মনে প'ড়ে গেল, রবীন্দ্রনাথের কবিতা। সে নিজে কবিতা লেখে, সে কবি। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা সে মুখস্থ করেছে। অস্ফুটস্বরে সে আবৃত্তি করলে—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়,
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর—

রাধাকান্ত নিজের ডায়েরিতে কলির কলিধর্ম্মের কথা লিখছিলেন—"কলিতে ব্রহ্মহত্যা নিত্যকর্ম্ম হইবে। ব্রাহ্মণকে প্রণাম না করা শূদ্রের পক্ষে গৌরবজনক পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া মনে হইবে। এবং যেহেতু সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্মান না করাই তাহার বধ—সেইহেতু ব্রহ্মহত্যা নিত্যকর্ম্ম হইবে। শাস্ত্র না জানিয়া শাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়াও ব্রহ্মহত্যা। এ কর্ম্মও নিত্যকর্ম্ম হইবে কলিকালে। আজ মণি দত্ত আমাকে অসম্মান করিয়া, আমাকে শাস্ত্রোপদেশ দিয়া আমাকে হত্যা করিয়া গেল। ইহা আমার পক্ষে মৃত্যুতুল্য। হে শঙ্কর দেবাদিদেব মহাদেব, আশুতোষ।…"

ঠাকুরদা রয়েছেন নাকি?

কে? চকিত হয়ে রাধাকান্ত উঠে দাঁড়ালেন। কীর্ত্তিচন্দ্রের কণ্ঠস্বর।

সামান্য ব্যক্তিকে গলার আওয়াজে চেনা যায় না ঠাকুরদা।—হাসতে হাসতে কীর্ত্তিচন্দ্র এসে বারান্দায় উঠলেন। তাঁর সঙ্গে আরও কেউ রয়েছে। রাধাকান্ত মর্য্যাদার সঙ্গে আহ্বান ক'রে বললেন, এস, এস ভাই, এস। আমাকে কিন্তু তুমি অন্যায় আক্রমণ করলে।

কেন?

কণ্ঠস্বর চেনাটা পরিচয়ের ব্যাপার। দৈববাণী হ'লে, আকাশ থেকে বাণী আসে ব'লে দৈববাণী ব'লে ধরা যায়, কিন্তু পরিচয়ের অভাবে, কোন্ দেবতা বললেন, সেটা ধরা যায় না। সে অপরাধ তো মানুষের নয়, দেবতাদের সঙ্গে কণ্ঠস্বর চিনতে পারার মত ঘনিষ্ঠ পরিচয় করার সাধ্য কোথায় মানুষের? এস, ব'স। সঙ্গে?

আমি অমরচন্দ্র। ভাল আছেন? কীর্ত্তিচন্দ্রকে পাশ কাটিয়ে সামনে এসে রাধাকান্তকে প্রণাম করলেন, রাধাকান্তের মতই বলিষ্ঠ বিশালদেহ কান্তিমান যুবক। রাধাকান্তেরই প্রায় সমবয়সী। কীর্ত্তিচন্দ্রের মাসতুতো ভাই অমরচন্দ্র। নিতান্ত দরিদ্রের সন্তান। নবগ্রাম থেকে মাইল বিশেক দূরে বাড়ি। গোপীচন্দ্রই বাল্যকালে অমরচন্দ্রকে লেখাপড়া শিখতে সাহায্য করেছিলেন। এম. এ. পাস ক'রে সুদূর এলাহাবাদে কলেজে প্রফেসারি করেন। রাধাকান্ত বিশেষ শ্রদ্ধা করেন অমরচন্দ্রকে, কিন্তু একটু দূরে দূরে থাকেন। কারণ অমরচন্দ্র মতে একেবারে সাহেবী মতের মানুষ। সেসব মতের সঙ্গে রাধাকান্তের মত মেলে না। তাই তর্কের ক্ষেত্র উপস্থিত হ'লেই তিনি চুপ ক'রে যান।

রাধাকান্ত কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণামের উত্তরে প্রতি নমস্কার ক'রে সাদরে সসম্ভ্রমে বললেন, কবে এলেন? ভাল আছেন? বসুন, বসুন।

অমরচন্দ্র কীর্ত্তিচন্দ্র বসলেন। অমরচন্দ্র বললেন, মেসোমশায় চিঠি লিখেছিলেন, এখানে হাই-ইস্কুল প্রতিষ্ঠার সংকল্প জানিয়ে। লিখেছিলেন, এ কাজে তোমার সাহায্য চাই; তুমি ছুটি নাও কিছুদিনের। তাঁর আদেশ আর এমন একটা ভাল কাজ—

রাধাকান্ত বললেন, পুণ্যকর্ম্ম তাতে আর সন্দেহ কি ?

কীর্ত্তিচন্দ্র হেসে বললেন, ঠাকুরদার কাছে, ব্যাকরণদোষ হবার উপায় নাই। গুরুচণ্ডালী চলবে না।

রাধাকান্ত বললেন, আবার মিথ্যে দোষ দিচ্ছ ভাই। গুরুচণ্ডালী দোষ এ কালে না ক'রে উপায় আছে ? কে যে ব্রাহ্মণ, কে যে চণ্ডাল, এ চেনাই তো এক সমস্যা।

এবার কীর্ত্তিচন্দ্র গুম হয়ে গেলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝলেন, রাধাকান্ত চণ্ডাল বললেন তাঁকেই। অমরচন্দ্র চঞ্চল হয়ে উঠলেন, শঙ্কিত হলেন, পাছে আরও অপ্রিয় কিছু ঘটে। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, আমি ছুটির দরখাস্ত আগেই করেছিলাম, হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম চ'লে আসবার জন্য। এখন আয়োজন সব প্রস্তুত। চার দিন পরে ইস্কুলের ফাউণ্ডেশন ষ্টোন লেয়িং হবে। কালেক্টার আসছেন।

দিনটা শুভ বটে তো ? পঞ্জিকা দেখা হয়েছে ?

হ্যাঁ। সাহেব বলেন, আরও দুদিন পর, কিন্তু দিন ভাল নয় ব'লে, চাপাচাপি করায় রাজি হলেন। অবশ্য দিনক্ষণের উপর আমারও আস্থা নাই। তবে মেসোমশাই মানেন।

দেশও মানে।

হ্যাঁ। তবে আপনি যাই বলুন, অনেক কুসংস্কার ঘোচানো দরকার হয়েছে।

রাধাকান্ত চুপ ক'রে গেলেন। দেখতে পেলেন, তর্ক যেন ঘরের কোণে কোণে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে কীর্ত্তিচন্দ্র বললেন, আপনাকে একটা কথা বলব।

একটা কেন, একশোটা বল। রাধাকান্ত হাসলেন।

চলুন না একটু বাইরে।

অমরচন্দ্র উঠলেন, বললেন, আমারই গরম বোধ হচ্ছে, আমিই একটু বাইরে দাঁড়াই।

তিনি বাইরে যেতেই কীর্ত্তিচন্দ্র বললেন, মানে, শুনলাম, আজ কে যেন বললে কথাটা—

হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন রাধাকান্ত, বললেন, ভনিতাতেই এত খোঁড়াচ্ছ কেন ? ব'লেই ফেল না।

মানে, সেই মেয়েটিকে আপনি ঘরে ঠাঁই দিয়েছেন ?

মৃদু হেসে রাধাকান্ত বললেন, মেয়েটিকে চেন নাকি তুমি ?

না, মানে শুনেছি। দাঁতে ক'রে নখ কাটতে লাগলেন কীর্ত্তিচন্দ্র। এটা তাঁর একটা অভ্যাস।

রাধাকান্ত নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অমরচন্দ্রের কাছে দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে লেন, হরি হরি, এই তোমার গোপন কথা! হ্যাঁ, নিরাশ্রয়া মেয়ে এসে আশ্রয় াইলে আমার স্ত্রীর কাছে, আমার স্ত্রী আশ্রয় দিয়েছেন। বাড়িতে রয়েছে। ঝিকে াকরকেও আমরা পুত্রকন্যার মত দেখি, কন্যার মতই রয়েছে আমার বাড়িতে।

মরিয়া হয়ে কীর্ত্তিচন্দ্র বললেন, লোকে কিন্তু নিন্দা করছে আপনার।

আমাকে বাঁচিয়ে নিন্দাটা তুমি গ্রহণ করতে চাও? অবশ্য চন্দ্রের কলঙ্ক ভূষণ।

অমরচন্দ্র কথাটা চাপা দিয়ে বললেন, আজ তবে চলি। মোট কথা, আপনার াহায্য আমাদের চাই। ম্যানেজিং কমিটিতে থাকতে হবে আপনাকে।

রাধাকান্ত ফিরে এসে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। হাতের কাছেই ছিল একখানা রাণ। সেখানা খুলে পড়লেন। আবার বন্ধ ক'রে রেখে দিলেন। ডায়েরি খুলে াখলেন। আশুতোষের কাছে নিজের প্রার্থনাটুকু লিখলেন প্রথমে। যখন আরম্ভ রেছিলেন, তখন তাঁর প্রার্থনা ছিল—হে আশুতোষ, এই মৃত্যুতুল্য অপমান সকল ়কে তুমি আমাকে রক্ষা কর। কিন্তু এখন লিখলেন—"হে আশুতোষ, সম্মুখে আবার ়সমস্যা। এ সমস্যায় তুমি আমার কর্ত্তব্য নির্দেশ কর। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ব্যক্তি 'পরের কীর্ত্তি লোপ করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী'। গোপীচন্দ্র স্বর্গের পিতার র্ত্তি লোপে উদ্যত হইয়াছে। আবার শাস্ত্রে রহিয়াছে, 'পুণ্যকীর্ত্তি করিতে প্রবৃত্ত ক্তির সহিত বিরোধ করিয়া বা সাহায্য না করিয়া যে ব্যক্তি পুণ্যকীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠায় াঘাত জন্মায়, সে ব্যক্তিও ব্রহ্মঘাতী, ব্রহ্মদ্বেষী। গোপীচন্দ্র যে কীর্ত্তি করিতে উদ্যত, মহা পুণ্যকীর্ত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার কর্ত্তব্য কি?"

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টিল গোয়িং—

চেয়ে চেয়ে দেখি আপনার অন্তরে,
জং ধরিয়াছে সেথা বহু যন্তরে।
তবু সুদিনের অভ্যাসবশে
সিক্ত হইয়া আপনার রসে
চলিছে যন্ত্র, মনে হয় যেন
চলে তাহা মন্তরে।

সংবাদ-সাহিত্য

আশা ও আশঙ্কায় দোলায়িত অবস্থায় আমরা শুভ নববর্ষে অর্থাৎ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে প্রবেশ করিলাম; আশা—স্বাধীনতার, আশঙ্কা—গৃহভেদের; আশা—ভারতবাসী হিসাবে, আশঙ্কা—বাঙালী হিসাবে। এই আশা ও আশঙ্কা রূপ আলো-ছায়ার পটভূমিকায় নিরন্ধ্র নিশীথ তমিস্রার মত ঘোর আতঙ্কের একটি অনড় যবনিকা নববাৎসরিক অভিনয়ের সূত্রপাতেই দর্শকরূপী আমাদের, অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সমাজের, বিভীষিকার উদ্রেক করিতেছে ইহা দুর্ভিক্ষের ছায়ামাত্র নয়, দুর্ভিক্ষের নিরেট কায়াস্বরূপে ইতিমধ্যে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতেছে। নিরন্নের মৃত্যুসংবাদ দৈনিক-পত্রিকার পৃষ্ঠা দিনে দিনে অধিকতর কলঙ্কিত করিতেছে, "চাট্টি খেতে দাও মা" নিতান্ত একক ধ্বনি হইতে সমবেত আর্তনাদে ধীরে ধীরে রূপায়িত হইতেছে এই মৃত্যুভয়ভীত জাতির কাছে স্বাধীনতা-পরাধীনতা কংগ্রেস-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জিন্নাস্তান-সাভারকরস্থান আম্বেদকর-বিক্রয়কর সমান অর্থ বহন করে অর্থাৎ সমান নিরর্থক; সরকারী লঙ্গরখানা এবং কংগ্রেসী লঙ্গরখানা মারোয়াড়ী হিন্দুর বদান্যতা এবং ব্যক্তিগত বাঙালীগৃহস্থ-বদান্যতা এই হবু পাকিস্তানের প্রজারা এই সকলের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও আস্থা স্থাপন করিয়া থাকে, হিন্দুর কবরখানায় এবং মুসলমানের শ্মশানে যাইতে সেই চরম মুহূর্তে কোনও অনিচ্ছাই প্রকাশ পায় না, ভিক্ষালব্ধ গ্রুয়েলের সর্বসমতলকারী মহিমায় সম্মুখে পাক এবং না-পাক একাকার হইয়া যায়। জগন্নাথদেবের সেই সর্বসমতলকারী রোলার চঞ্চল হইয়াছে। তাহারই গুরুগুরুধ্বনি এই নববর্ষের প্রারম্ভে শুনিতে পাইতেছি। অতএব মাভৈঃ বাঙালী হিন্দুমুসলমান, তোমরা কিরণশঙ্কর-সুরাবর্দীর তোয়াক্কা করিও না, প্রেক্ষাগৃহে গান্ধী অথবা জিন্না কে বসিয়া তোমাদের তারিফ করিতেছে তাহা দেখিতে গিয়া তোমাদের অভিনয় মাটি করিও না, তিনটি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারী গোলাপফুল চিরবসন্তের দেশ কাশ্মীরের গুলমার্গ আলোকিত করিয়া চিরদিন ফুটিয়া থাকুক—তোমরা এই ভাবী কারবালায় এখন হইতেই হাসান-হোসেন প্র্যাকটিস করিতে থাক, দুর্ভিক্ষ বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া বাঁচিয়া থাকার কবিতা লিখিয়া আত্মবিনোদন কর। দুই সমান হতভাগ্যকে—অন্ধ এবং খঞ্জকে এই দুর্দিনে যাহারা তফাত করিতে চাহিতেছে, জানিয়া রাখ, তাহারা তোমাদের কেউ নয়, দরিদ্রকে লইয়া এই

়ান্তিক রসিকতা তাহাদের বিলাসমাত্র, বাংলা দেশকে তাহারা ভালবাসে না, ঙালী জাতিকে তাহারা ভালবাসে না, বাংলা ভাষাকে তাহারা ভালবাসে না।

* * *

বন্ধুবর অনুযোগ করিলেন, বর্ষারম্ভের "স্বাগতম্" একটু বেশি নৈরাশ্যব্যঞ্জক য়া পড়িতেছে—যেন আশা করিবার অনেক কিছু আছে! কিছু নাই, কিছু ই। এক দিকে ইংরেজ বণিক-শাসকদের নেপথ্যবিধান, অন্য দিকে দশীয় বণিক-শোষকদের পথ্যবিধান বা গ্রুয়েল-ব্যবস্থা বাঙালী জাতির স্তিত্বের মর্মমূলে এমন সুকঠোর আঘাত হানিতেছে যে, এখন কোনও রকমে কয়া থাকাটাই হইল আসল সমস্যা, পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের প্রশ্নই এখন ান্তর। গলা-কাটা অবস্থায় টেরির বাহার লইয়া খিটিমিটিটা শোভন নয়।

তবে এই প্রসঙ্গে বাংলা দেশের মুসলমান ভাইদের প্রতি একটি সুগোপন রোধ আছে। তাঁহারা সংবাদটা নিশ্চয়ই অবগত হইয়াছেন যে, এই মেণ্টারী যাত্রায় ভারতবর্ষে পাকিস্তান-হিন্দুস্থান-বিভেদ সুনিশ্চিত এবং লা দেশ খাস পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবে অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার- । কেন্দ্রীয় হিন্দুস্থান-গবর্মেণ্টের নিকট হইতে আপৎকালে এই পাকিস্তানী লা দেশ কিছুই দাবিদাওয়া করিবে না বা করিতে পারিবে না। এদিকে বীর খাদ্যব্যবস্থার যে গুরুতর বিচার দৈনিক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় রোত্তর ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিতেছে, তদ্দারাই আমরা অবগত হইতেছি যে, পৃথিবী কঠিন অন্নাভাবের সম্মুখীন হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থা নতম। সর্বাপেক্ষা শোচনীয় হইবে বাংলা দেশের অবস্থা। ১৩৫৩ সালে মন্বন্তর আসিতেছে, ১৩৫০ সালের মন্বন্তর তাহার তুলনায় কিছু নয়। ০-এর মন্বন্তরে আমরা কি দেখিয়াছি? বাংলা দেশের পক্ষে স্থানীয় শস্য প্ত নয়, বাহিরের সাহায্য ব্যতিরেকে বাংলা দেশের কোটি মানুষের মৃত্যু বার্য ছিল। বাহিরের এই সাহায্য আসিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে মারোয়াড়ী, হিন্দুমহাসভা, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি একান্ত হিন্দু ষ্ঠানগুলি মারফত ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে। বাংলা দেশে মুসলমান- াধিক্য সত্ত্বেও মুসলিম লীগ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষপ্রতিরোধকল্পে হাফ-এ-লীগও র হয় নাই। স্বয়ং কোয়াদে-আজম জিন্না, যতদূর স্মরণ হইতেছে, মাত্র শতটি টাকা উপুড়হস্ত হইয়াছিলেন। মুসলিমসংখ্যাগরিষ্ঠ স্থলে স্বভাবতই

মুসলমানের মৃত্যু-আধিক্য ঘটিবে এবং ঘটিয়াছিলও তাহাই। বেসরকারী হিসাবে ৭০ লক্ষের মধ্যে ৫০ লক্ষের কাছাকাছি মুসলমান। এই হিসাব স্মরণে রাখিয়া আমরা বাংলা দেশের মুসলমান ভাইদের কাছে এই অনুরোধ করিতেছি, যেন তাঁহারা অন্তত এই দুর্বৎসরটাতে পাকিস্তান দাবি না করেন। ক্যালকাটা-করাচী করিডর লইয়াও পাকিস্তানকে যে গ্রিফ্ পাকিস্তান বাঁচাইতে পারিবে না, তাহা বুঝিতে হইলে মক্তবী বিদ্যাই যথেষ্ট। সুতরাং এ বছরের ঝক্কিটাও বেতমিজদের লইতে দিন; এই ভাবী পাকিস্তানকে ভাণ্ডাইয়া উহারা অনেক মজা লুটিয়াছে এবং এখনও লুটিতেছে। পাকিস্তান হইয়া গেলে এই মহামন্বন্তর-বৎসরে প্রায়শ্চিত্ত করিবার সুযোগ উহারা পাইবে না। তবে গত মন্বন্তরে পাকিস্তানী ধনভাণ্ডার যদি জুৎমত পরিপুষ্ট হইয়া থাকে তবে স্বতন্ত্র কথা, আমাদের গোপন অনুরোধ আমরা তাহা হইলে প্রত্যাহার করিতেছি; পাকিস্তানী দিল্‌ও হয়তো এবারে অনেকখানি প্রশস্ত হইয়াছে!

সুতরাং জনাব জিন্না নিজেকে অভারতীয় প্রতিপন্ন করিয়া ভারতীয় প্রতিযোগিতা-খেলায় "হেডস আই উইন, টেল্‌স ইউ লুজ" বলিয়া যত খুশি নৃত্য করিতে থাকুন, বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলমান বাঙালীদের এ বৎসরে একমাত্র পথ হইতেছে মহাত্মাজীর পথ—লেট আস্ প্রে—এস, আমরা প্রার্থনা করি।

"মানব-পরিবারকে ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় করিবার জন্য প্রার্থনার শক্তিই সবচেয়ে কার্য্যকর প্রার্থনার বলে কাহারও যদি ভগবানের সহিত ঐক্যবোধ জাগে, তবে তো তিনি সকলকেই নিজের মত দেখিবেন। তখন উচ্চনীচ ভেদ থাকিবে না। অন্ধ ও তামিল দেশের মধ্যে, কর্ণাটক ও মালাবারের মধ্যে আজ ভাষা লইয়া যে তুচ্ছ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা সংকীর্ণ প্রাদেশিক স্বার্থপরতা এ সকল কিছুই থাকিবে না। তখন স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-পার্শী-খ্রীষ্টান-শিখের মধ্যে ঘৃণা ও ভেদ আর থাকিবে না সেইরূপ বিভিন্ন দলের মধ্যে বা একই দলভুক্ত বিভিন্ন লোকের মধ্যে ব্যক্তিগত সুবিধা ব ক্ষমতা লইয়া কাড়াকাড়িও থাকিবে না।"—হরিজন পত্রিকা, ৩ মার্চ ১৯৪৬

আপাতত এই বৎসরে প্রার্থনায় ইহার অধিক সুফল আমাদের কাম্য নহে এইটুকু হইলেই আমাদের কাজ চলিবে। এস হিন্দু-মুসলমান ভাই সকল আমরা সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করি।

প্রার্থনার পর আর পলিটিক্স চলে না, মন তখন ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া যায়, প্রেম-রসে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। ধর্মাবলম্বী বা ভাষাভাষীর সংখ্যা ধরিয়া মাটিতে দাগ কাটার তখন আর প্রবৃত্তি থাকে না, আহার্যের বরাদ্দ এক সেরকে কাটিয়া দশ ছটাক করিয়া দিলে তখন বেদনাবোধ হয় না, পরনের কৌপীন-সংগ্রহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঝড়-জল-রৌদ-বৃষ্টি-গুঁতাগুঁতি-ঠেলাঠেলির তাড়না সহ্য করিয়া শেষাশেষি বিফলমনোরথ হইলেও তখন খুন চাপিয়া যায় না, এক টাকার মাল দশ টাকায় চালাইবার ব্ল্যাকমার্কেটী প্রবৃত্তিও তখন সাধু ও সাধারণ বলিয়া জ্ঞান হয় এবং আমরা অবলীলাক্রমে পথে ঘাটে রেল-স্টেশনে ট্রেনে হোটেলে হাসপাতালে ঘুষ দিয়া একটু ব্যক্তিগত সুবিধা আদায় করিয়া নিজের গালে চড় মারিতে মারিতে শিশির ভাদুড়ী ভঙ্গীতে বলি না—

"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

এই প্রার্থনার বলেই আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে হাসি এবং হাসিতে হাসিতে কাঁদি, সম্মুখে ভোজ্যবস্তু প্রসারিত থাকিলেও তৎপ্রতি লঙ্গিং লিঙ্গারিং লুক প্রেরণ করিতে করিতে টুপ করিয়া মরিয়া যাই, মা-বোনকে বেইজ্জত করিলে খবরের কাগজ মারফৎ প্রার্থনা করিয়া আমরা সিনেমায় 'সোনার সংসার' দেখিতে ছুটি। এই প্রার্থনার ফল অপরিসীম, এস ভাই সকল, আমরা সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করি। শুভ নববর্ষে ওইটুকুমাত্র করিবার অধিকার আমাদের আছে।

* * *

এস, আমরা প্রার্থনা করি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পক্ক পনস ফলের মত ভারত-বৃক্ষের বোঁটা হইতে অকস্মাৎ খসিয়া পড়ুক এবং পড়িয়া ছ্যাৎরাইয়া যাক; প্রার্থনা করি, কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইবার মত হিংস্র শৃগাল-বৃত্তি যেন আমাদের না ঘটে; প্রার্থনা করি, জনাব জিন্না মক্কায় হজ করিতে গিয়া সেখানে খিলাফৎ লাভ করিয়া সুখে রাজত্ব করিতে থাকুন; প্রার্থনা করি, ডক্টর আম্বেদকর বিশুদ্ধ বৈদিক মতে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া বর্ণ-হিন্দুর গৌরব দেহে মনে অনুভব করিতে থাকুন; প্রার্থনা করি, হিমালয়-পদাশ্রিত তেরাই হইতে দীর্ঘগুম্ফ-শ্মশ্রুশোভিত সুভাষচন্দ্র অকস্মাৎ গড়ের মাঠে আবির্ভূত হইয়া মনুমেণ্টের

তলায় বজ্রগম্ভীরনির্ঘোষে "জয় হিন্দ্" উচ্চারণ করিয়া আমাদিগকে সচকিত পুলকিত করিয়া দিন, অথবা তাঁহার তিরোভাব ঘটিলে আমাদের ঘরে ঘরে সন্তানরূপে তাঁহার আবির্ভাব হউক। প্রার্থনার কি অন্ত আছে? এস হিন্দু-মুসলমান ভাই সকল, আমরা স্ব-স্ব রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে সাধ্যমত প্রার্থনা করিতে থাকি।

—

প্রার্থনায় যাঁহারা জুৎ করিতে পারিবেন না, তাঁহারা সাহিত্য করিবেন—ইহাও শাস্ত্রীয় বিধান। সেখানেও রুচি এবং প্রবৃত্তি প্রধান, তাই দলাদলি মারামারির আশঙ্কা আছে। যেমন ধরুন, বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক মোহাম্মদী'তে মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার সাহেব 'মানুষের নবী' সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া "মেয়েমানুষের হবি"কে রূঢ় আঘাত করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন—

কোরআন ও হাদিছের বিধান মতে সভ্য মানুষ হিসাবে পুরুষের লজ্জাস্থান হইতেছে নাভী হইতে হাঁটু পর্যন্ত এবং স্বাধীনা ও বালেগা নারীর লজ্জাস্থান মুখ, হাতের কবজি, পায়ের পাতা বাদে সমস্ত শরীর। এই লজ্জাস্থান বা ছতরে-আওরত ঢাকা ফরজ বা স্বয়ং আল্লার হুকুম। ছতরে-আওরত অনাবৃত থাকিলে নামাজ জায়েজ হইবে না এবং স্বেচ্ছায় ইহা খুলিয়া রাখিলে গোনাহগার হইতে হইবে। পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্য দিয়া সুরুচি, শালীনতা-বোধ ও পবিত্র মনোভাবের দ্যোতনা ফুটাইয়া তোলাই সভ্য মানুষের পরিচয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়—একদিকে নৈতিক-মেরুদণ্ডহীন পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য জৌলুষ, অন্যদিকে পৌত্তলিকতাময় নারী-কেন্দ্রিক হিন্দু-সভ্যতার চাপ,—এই উভয় স্রোতের দোলায় পড়িয়া মোছলমান শিক্ষিতা মেয়েরা হাবুডুবু খাইতেছে। নারীর যৌবনদীপ্ত দেহ-লাবণ্যের প্রতি যুবক পুরুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকবেই। এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ত ভণ্ডামী, নয় পুরুষত্বের বৈকল্য। সুতরাং পিতা বা সহোদর ভাই প্রভৃতি নিকটতম আত্মীয় ছাড়া অন্য পুরুষের সাক্ষাতে ঘরে বা বাহিরে চলাফেরা করিবার সময় নারীর দেহ-সৌন্দর্য ঢাকিয়া চলিবার জন্য পবিত্র কোরআনে কঠোর আদেশ রহিয়াছে। প্রগতিবাদিনী আধুনিকা অমোছলমান মেয়েরা রূপ-যৌবনের যে উচ্ছৃঙ্খল প্রদর্শনী খুলিয়া পথে ঘাটে যুবক-মন কলুষিত করিয়া বেড়ায়, পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক উহাকে 'অসভ্য ও মূর্খ নারীর রূপ-যৌবন দেখাইবার চপল মনোভাব' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর নারীরা শয়তানের জীবন্ত ছবি।

এইরূপ বিতর্কমূলক সাহিত্য আমরা চাই না। অথবা ধরুন, গত ২৯ চৈত্র সংখ্যা 'মিল্লাতে' যে নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় সাহিত্য বাহির হইয়াছে—

বাস্তবিকই পরম যুগসন্ধিক্ষণ আসিয়াছে আজ হিন্দু মুসলমানের জাতীয় জীবনে। এই সুবর্ণ সুযোগের ফায়দা যদি ভারতের দুই বিরাট জাতি—হিন্দু ও মুসলমান উঠাইতে না পারে তাহলে দীর্ঘদিন দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, পুঁজিপতি, চোরাবাজার এবং মুনাফাখোরদের অর্থে পুষ্ট শক্তিমদমত্ত কংগ্রেস ফ্যাসিষ্টসুলভ মনোবৃত্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া এই সুবর্ণ সুযোগের অপব্যবহার করিতে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের ধারক ও বাহকদের আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ বীভৎস রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; উগ্র লালসায় কংগ্রেস এতখানি উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, দশ কোটী লোকের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী—ন্যায্য অধিকারকে পদদলিত করিয়া, মুসলমান জাতিকে ডিঙ্গাইয়া তাদের লোভাতুর হস্ত বৃটিশ মিশনের পদতলে প্রসারিত করিয়াছে। আফসোস, নির্বোধ কংগ্রেস জানে না, ঐ লোলুপ হস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর 'পাদপদ্মের' প্রতি প্রসারিত করার পরিণাম আপাতঃমধুর হইলেও ভবিষ্যৎ তার কত ভয়াবহ! কিন্তু এখনও সময় আছে। প্রভুর 'পাদপদ্ম' হইতে হস্ত উঠাইয়া আনিয়া মুসলমানের পাকিস্তানের দাবী মানিয়া লইয়া কংগ্রেস যদি এখনও তার হস্ত মুসলিম লীগের প্রতি প্রসারিত করে তাহলে চল্লিশ কোটী মানবসন্তানের গোলামীর শৃঙ্খল এই মুহূর্ত্তে চূর্ণ হইয়া যাইবে। লালসাজর্জরিত কংগ্রেসের শুভবুদ্ধি কি কিছুতেই জাগিবে না? মুসলমান জাতিকে দাস জাতিতে রূপান্তরিত করার হাস্যকর দুঃসাহসে মাতিয়া কংগ্রেস কি নিপীড়িত, শোষিত ও দারিদ্র্য-পীড়িত ভারতবাসীকে আরও নির্মম দুর্গতির অতলতলেই শুধু ডুবাইয়া মারিবে? ফ্যাসিবাদের মাদকতা হইতে কংগ্রেসের উদ্ধারের কি কোন পন্থাই কাহারও জানা নাই?

তাহাও আমাদের কাম্য নয়। সাহিত্যে ইহা পাকিস্তান-হিন্দুস্থান-দ্বন্দ্বের সামিল, সুতরাং সর্বজনগ্রাহ্য নয়। অথচ সাহিত্যের সর্বপ্রথম গুণ হইতেছে, সর্বজনগ্রাহ্যতা।

* * *

আমরা চাই নিরেট নির্দ্বন্দ্ব নির্ভেজাল সাহিত্য, যাহার কিঞ্চিৎ নমুনা বহুকষ্টে ওই 'মাসিক মোহাম্মদী' হইতেই সংগ্রহ করিয়াছি। পড়িয়া দেখুন—

স্তব্ধ চরাচর। নদীর তরংগেও আর তেমন কোনো আভাষ নাই। তরংগহীন নিথর সব! যে দর্শক-অন্তর রাত্রির এই অবগুণ্ঠনহীন নগ্ন রূপ দেখিতে পাইলো, তাহার বিস্ময় রাখিবার কোনো সম্বল নাই। সমস্ত অন্তর নির্বুঢ় প্রশান্ত হইয়া উঠে। আকাশে

অন্ধকার। দৃষ্টি ফিরাইয়া পশ্চাতে ফেলিয়া-আসা অন্ধকারের স্তূপ দেখা যায়। সমুখে যুগ হইতে যুগান্তর পর্যন্ত সেই একই রূপহীন বর্ণহীন অপরূপ পরম রহস্যময় শব্দমুখর রাত্রির রূপবৈচিত্র্য-সৌষ্ঠব কতো বেশি ক্ষিপ্র। উজ্জ্বলও। চারপাশে হাত বাড়াইলে পৃথিবীর নৈকট্য অনুভব করা যায়! আশ্চর্য বোধ হয়।—অন্ধকারেই বুঝি পৃথিবী বড়ো-বেশি কাছাকাছি আসিয়া পড়ে। এই অনুভূতিও নূতন। তাই, পরম বিস্ময়ে মনও নিস্তব্ধ অভিভূত, কেমন বিবাগী হইয়া উঠে। যদি উর্ধ্বে দৃষ্টি ফিরানো যায়, তাহা হইলে মনের গভীরতা আরো বিস্ময়জনকভাবে প্রসারিত হইতেছে—সহসা মনে হয়। অদ্ভুত পরিস্থিতি। রাত্রির একটানা অন্ধকারে মানুষের অন্তর এক ভাব হইতে আরে প্রলম্বিত। —কখনো নিস্তব্ধ সে-অন্তর; কখনো অঢেল উল্লাসে প্রতি বায়ু কোণ-সমেত অত্যুগ্র তৎপর।

* * *

এ তো গেল নকল। ইহা অপেক্ষাও খাঁটি আসল সাহিত্য আছে, যাহাকে সাহিত্য-absolute বা কেবল-সাহিত্য বলা যাইতে পারে। বস্তুটি কলম-চারায় এ দেশে আসিয়াছে বটে, কিন্তু নির্ভেজালরূপে এখনও প্রতিভাত হয় নাই। পাশ্চাত্যদেশ এখনও এ বিষয়ে মৌলিকতার দাবি করিতে পারে। এবং মৌলিক বস্তু মাত্রেই যে উত্তম তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এতকাল এ দেশে যে সকল কেবল-সাহিত্য দেখিয়া চমকিত হইয়াছি এবং এখনও চিরনূতন অথচ চিরপুরাতন জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) দাশ ও অমিয় চক্রবর্তী থাকিয়া থাকিয়া যাহা আমাদের পরিবেশন করিতেছেন, তাহা এখনও টিনাধারশাসিত বৈদেশিক মৎস্য অথবা ফলবৎ আমাদের রসনার আনন্দবিধান করিতেছে মাত্র, স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত তারটি লাগাইতে পারিতেছে না। সেটির জন্য এখনও আমাদিগকে সাগরপারে ধাওয়া করিতে হইতেছে। সেখানে আছেন স্পেণ্ডার, নিকারয়োকার, জয়েস, অডেন, স্টার্লিং, স্যাণ্ডবার্গ এবং আরও অনেকে।

মহাকবি অডেন তাঁহার The Orators পুস্তকে লিখিয়াছেন, "Lo, I a skull show you, exuded from dyke when no pick was by pressure of bulbs." ভাব ও অনুভূতির ঐশ্বর্যে ঠাসা কথাগুলি; কিন্তু কোন অর্থের বালাই নাই। অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রে গতানুগতিক পন্থায় কলম চালাইয়া যে সকল নকৃশা-কাটা বা প্যাটার্ন সৃষ্টি করা হয়, এ বাণী সে দোষদুষ্ট নয়। শুনিয়া যাহার মনে যে ভাবের সঞ্চার হইবে, সে তাহা লইয়া বিনা বাধায়

মশগুল থাকিতে পারিবে। সাহিত্যের পরম শত্রু যে emotional directive অর্থাৎ ভাবের হুকুমত, ইহাতে তাহার কোন চিহ্নমাত্র নাই। হাসিতে চাও হাস, কাঁদিতে চাও কাঁদ, উদ্‌বুদ্ধ হইতে চাও, রাস্তা খোলা। কি মুক্তি, কি স্বাধীনতার প্রবাহ!

* * *

প্রথমে পড়িয়া মনে হইল পিজিন ইংলিশ। তার পরেই বুঝিলাম, শুধু পিজিন ইংলিশ নহে, কনফুশিয়াসের কথিত পিজিন ইংলিশ। অর্থাৎ ইহার মধ্যে যে দৃষ্টি নিহিত রহিয়াছে, তাহা চ্যাং চুং অথবা ল্যাংএর মগজলব্ধ হইতে পারে না। জুতা, রেশম অথবা চাউল বিক্রয় করা বুদ্ধিতে এ হইতে পারে না। সুতরাং পিজিন ইংলিশের Philosophical extreme বা রেডিওর ভাষায় দার্শনিক চরমে পৌছিয়া কন্‌ফুশিয়াসের চেহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে আমার বেশি সময় লাগিল না।

* * *

সে তো হইল, কিন্তু কথাগুলি বলিয়া মহাকবি কি ভাবিলেন! অর্থাৎ ভাবিয়া তো বলেন নাই, বলিয়া তৎপরে ভাবিয়াছেন। যেমন কিনা কোন কোন চিত্রকর ছবি আঁকিয়া তৎপরে ভাবিয়া দেখেন, কি আঁকিয়াছেন, তেমনই লেখক বা কবি বাণী উচ্চারণান্তে ভাবের আবির্ভাব অপেক্ষা করিবার অধিকার রাখেন। মুক্তি ও স্বাধীনতার আবহাওয়ায় এ অধিকারটুকু সাহিত্যিক মাত্রেরই অবশ্যগ্রাহ্য দাবি বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। Skull exuded from dyke—হলাণ্ডের উর্বর ক্ষেত্রে dyke বা বাঁধ অথবা ভূতত্ত্বের পাথরের বা কয়লার dyke—সরস কষিত skull বা জমাট নিরেট skull যাহাই হউক তাহা স্ফুরিত, অস্ফুরিত হইয়া দুনিয়ায় দেখা দিয়াছে। Skull দেখিয়া ভীত হইতে চান হউন, স্তম্ভিত সচকিত হইতেও পারেন, পুলকিত হইতে ইচ্ছা হয় তাহাতেও বাধা নাই। Pick এবং pressure of bulbs—এও ডচ বা ওলন্দাজ রসে নিমজ্জিত, উপভোগ্য "আবার খাবো"-জাতীয় মহাপিষ্টক। Tulip-এর bulb বা বীজগ্রন্থি হইলেও ডচ, ইলেকট্রিক বাল্‌ব হইলেও ওলন্দাজরা সে বাল্‌বের জন্যও প্রসিদ্ধ। Pick মানে চয়ন করাও হইতে পারে বা উর্বর ক্ষেত্রে pick বা গাঁইথি চালানোও বা না হইবে কেন? গাঁইথির

সহিত টিউলিপ হইলে ভালই চলে, টিউলিপ চয়ন করাও রীতিবিরুদ্ধ নহে। গাঁইথি ও ইলেকট্রিক বাল্‌ব একত্র হইলে আলো হইতে অন্ধকারে যাইবার সম্ভাবনা ঘটিবে ; কিন্তু তাহাতেই বা বাধা কি ? যেখানে একটা নরমুণ্ড বা নরকপাল স্বতঃস্ফুরিত হইয়া বাঁধের পাথরের বা কয়লার বক্ষভেদ করিয়া আবির্ভূত হইতেছে, সেখানে pressure of bulbs গাঁইথির দ্বারা সংহত হইলেই মঙ্গল। অবশ্য skull-এর সহিত পূর্বসংযুক্ত body-র তালাস করিলে টিউলিপের চাষে তাহার সদ্ব্যবহার হইয়াছে জানিলে পাঠকের সদ্ব্যয়বৃত্তি পরিপুষ্টি লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

*　　　　*　　　　*

সকলের মাথা বোধ হয় ধরিয়া উঠিতেছে! একান্তই স্বাভাবিক। ওই skull'টি ঠিক করিয়া ধরিতে হইলে সমাংস মাথাগুলি যে কিছু কিছু ধরিবে, ইহা poetic justice বা কবিতার প্রতিহিংসা।

*　　　　*　　　　*

Inspiration বা প্রেরণা শুনা যায় আধুনিক প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠান নহে। কথিত আছে যে, রাবণ প্রেরণার তাড়নায় সীতা-হরণ করিয়াছিলেন ও লক্ষ্মণের দ্বারা সূর্পণখার নাসিকাকর্তনও আকস্মিক আবেগপ্রসূত অপকর্ম। এই inspiration বা প্রেরণার ইতিহাস, স্বভাব, স্বরূপ প্রভৃতি বিচার ও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মানবসভ্যতার এক-একটা সন্ধিক্ষণে মহামানবদিগের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার হয় ও তাহা হইতে রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাননিচয় internal combustion engine-এর piston-এর ন্যায় উৎক্ষিপ্ত বা প্রক্ষিপ্ত হইয়া গতিশীল হয়—প্রগতি তাহারই অপর এক নাম।

*　　　　*　　　　*

বর্তমানে ভারতবর্ষে বহু মহামানবের আবির্ভাব হইয়াছে। এই যে বহু মুনি সমাগম, ইহা ডিমক্রাসির যুগে ভগবানের বহু দেহে অবতার হইয়া আগমন, না অর্থাভাবে অর্থ inflation-এর ন্যায় মহামানবের অভাবেরই একটা লক্ষণ, ইহা বিচার করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া মাথা চুলকাইতেছি, এমন সময় গোপালদা sun spot-এর মত উন্মুক্ত দ্বারপথ কালো করিয়া দেখা দিলেন। বলিলেন, দশমহাবিদ্যা, ten commandments, খালি দশ। কেন রে বাপু দশ কেন ? এ কি decimal-এর অঙ্ক পেয়েছ যে, সব দশ ?

আমি বলিলাম, কেন এগারো হ'লেই তো হয়। বলুন না একাদ মহাবিদ্যা—চুরিবিদ্যা ও একাদশ commandment—Thou shalt not b found out.

গোপাল বলিলেন, ইয়াকি মেরে একটা বড় বিষয়কে ছোট ক'রো ন আসল কথা হ'ল, দশ। মানুষের মনের মধ্যে দশ একটা গভীর কথ ডেসিম্যাল মুদ্রা হ'লে খুব ভাল হয়। শুধু একশো সেণ্টে এক টাকা নয়। দ সেণ্টে এক আনা। দশ আনায় এক টাকা। এর পরে দশ দিনে হপ্তা, দ হপ্তায় মাস আর দশ মাসে বছর—১০০০ দিনে বছর। ভেবে দেখ, দলে দে ডেসিম্যালের ধাক্কায় সকলের বয়স ক'মে তরুণ-তরুণীতে দুনিয়া ছেয়ে যাবে ৩৬৫০০ দিনের একশো বছরের বুড়োবুড়ীর মাত্র ৩৬ বছর বয়স হবে। ৫ বছরে হবে মাত্র আঠারো। আরও ঘোঁট পাকাতে চাও তো দেখ, দ সেকেণ্ডে মিনিট, ১০০ মিনিটে ঘণ্টা, দশ ঘণ্টায় দিন, দশ ছটাকে সের···

আমি বলিলাম, আরে, সে তো অনেক আগেই মুদীরা ক'রে ফেলেছে।

গোপালদা চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন, ইয়াকি রাখ। দশ ছটাকে সে দশ সেরে মণ, র‍্যাশন কত কমে হবে ভাব, দশ ইঞ্চিতে গজ, এক হাজার গ মাইল, পৃথিবীটা বেড়ে যাবে এক কথায়, দশ ফোঁটায় ড্রাম, দশ ড্রামে আউন্স দশ আউন্সে পাঁট—ভাব, ভাব—

বলিলাম, ভাবছি তো। দশটায় ডজন বা দশটায় কুড়ি, দশ ডজনে গ্রোস স্কোয়ার মানে দশ গুণ, কিউব মানে ১০০ গুণ। গোপালদা, কি হয়েছে বলু তো? আসল কথাটা খুলে বলুন। দশ দশ ক'রে শেষে দশাপ্রাপ্তি হবে যে।

গোপালদা একটু গম্ভীর হইয়া দুলিতে দুলিতে বলিলেন, কথাটা হচ্ছে একটা সাচ্চা পাক্কা আবেগ না থাকলে কোন কিছু হয় না, বুঝেছ? এই যে সব কথা চলছে—হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, ওসবে কিছু হবে না। এমন একটা স্থান বানাও, যাতে সকলে তৎক্ষণাৎ সায় দেবে। যে যেটা পায় না, সে সেইটা চায়। পাকিস্তান হ'লেই মুসলমান বলবে, হিন্দুস্থানে থাকব কেন? যেহেতু অপরের স্থান। হিন্দু বলবে পাকিস্তানে যাব। কেন? ওই কারণ+মুরগী। ওসব চলবে না। সবাই মিলে তো আর রাজা হওয় যায় না, ও রকম নতুন রাজ্যে কার লাভ? প্রজা থাকলে তবে না লাভ; সবাই রাজা আর সবাই প্রজা! খুব বুদ্ধি বার করেছে! ও চলবে না

আমি বলছি, ভারতবর্ষকে সখীস্থান ব'লে ডিক্লেয়ার করা হোক। বান্ধবী, দিদি, ওসবে তেমন আর জমে না। সখীস্থান কর, একটা প্রাচীন সভ্যতার গন্ধও থাকবে, ধর্মভাবও থাকবে, আর একেবারে আধুনিক। এর সব ডিটেল ভেবে ফেল, দেখবে সবাই রাজি হয়ে যাবে। পাঞ্জাবীগুলো সব্বার আগে।

—

শুনা গিয়াছে বোম্বাইয়ের 'টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা ও তাহার সকল ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি, অপরাপর সম্পত্তি ও কারবার মারোয়াড়ী ধনিক দালমিয়া ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। আরও শোনা যায়, ভারতের অপর সকল ইংরেজ-চালিত খবরের কাগজগুলিও অন্যান্য ভারতীয় ধনিকদিগের হাতে যাইবে শীঘ্রই। কথা হইতেছে এই যে, ইংরেজ ব্যবসাদারের কাগজ ভারতীয় ব্যবসাদারের হস্তগত হইবে ইহা স্বাভাবিক; কারণ, ব্যবসা, খবরের কাগজ, রাজনীতি এসকল একই প্রচেষ্টার বিভিন্ন অভিব্যক্তি। ব্যবসার ধাক্কায় রাজনীতি চলে না, রাজনীতির ধাক্কায় ব্যবসা চলে, এ প্রশ্নটা ডিম হইতে হাঁস হয়, না হাঁস হইতে ডিম হয়—এই প্রশ্নেরই মত। উত্তর—উভয় হইতেই উভয় হয়। খবরের কাগজ চালানো ও সেই সঙ্গে খবর সৃজন, শোধন, সরবরাহ ও সংহার, এ হইল ব্যবসা ও রাজকার্য সুসম্পন্ন করিবার প্রধান অস্ত্র। জনসাধারণকে যাহা ইচ্ছা, যথা ইচ্ছা সমঝানো, বুঝানো বা ভুলানো একমাত্র খবর-বিতরণ একচেটিয়া করিয়া লইলে সম্ভব হয়। এবং প্রেসকে হস্তগত করা একটা এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান উপায়। এখন বুঝিতে হইবে যে, ভারতের Big business বা ধনরাজদিগের ইচ্ছা তাঁহারা নিজেরা কিছু পাঠ করিয়া ভুল বুঝিবার ভয় না থাকিলেও, জনসাধারণকে ভুল বুঝাইবার অস্ত্র তাঁহাদের করায়ত্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহার পর অল-ইণ্ডিয়া রেডিও এবং জনমনের উপর প্রভাবশালী সকলপ্রকার ধর্ম, অধর্ম বা অন্য অন্য ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলিকে হাতের মুঠির মধ্যে আনিতে পারিলেই যে কোন নিষ্প্রয়োজন বস্তুকে বাজারে যথা ইচ্ছা মূল্যে বিক্রয় করিতে আর কোন বাধা থাকিবে না। শুধু তাহাই নহে; যে কোন মূল্যে যাহা কিছু ক্রয় করিতে পারা, যে কোন দেশের মাল আমদানি হ্রাস বা বৃদ্ধি ও অপর সকল অর্থঘটিত বিলিব্যবস্থার একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া থাকা, এই সবই জনগণের সোনার কাটি রূপার কাটি হাতে থাকিলে তবে সম্ভব হয়। ভারতে স্বরাজ ও ভারতীয় মানবের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী সমাগতপ্রায়

নিখিল-ভারত-রবীন্দ্রনাথ-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

আগামী ৮ই মে (২৫শে বৈশাখ) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম-বার্ষিকী। এই দিবস যতই নিকটবর্তী হইতেছে, ততই আমাদের একথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে যে, জাতীয় কবির নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধিত রহিয়া গিয়াছে। কবিগুরুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে প্রতিষ্ঠিত অর্থভাণ্ডারে গত ১৫ই মার্চ পর্যন্ত মাত্র ১২১৯১১৬৷/১০ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। নিখিল-ভারত-রবীন্দ্রনাথ-স্মৃতিরক্ষা-সমিতির পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার পক্ষে এই অর্থ আদৌ যথেষ্ট নহে।

এযাবৎ যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, উহা আশানুরূপ নহে। অধিকাংশ সাহায্যই দরিদ্র জনসাধারণের সামান্য সামান্য দানে সংগৃহীত হইয়াছে। এমনকি, দুই আনা, এক আনা চাঁদাও তন্মধ্যে আছে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নদের নিকট হইতে এখন পর্যন্ত তেমন উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যায় নাই। যদি অর্থাভাববশত আমরা যথোপযুক্তভাবে কবিগুরুর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে উহা গভীর পরিতাপের বিষয় হইবে। কবিগুরুর আগামী জন্ম-দিবসের পূর্বে ২৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করাই আমাদের সংকল্প। সকলের সহযোগিতা পাইলে ঐ পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব বলিয়া এখনও আমরা আশা করি। এই মহান্ উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হইতে পারে, তৎকল্পে মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিবার জন্য আমরা দেশবাসীর নিকট পুনরায় আবেদন জানাইতেছি।

সমস্ত দান নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে :—

সাধারণ সম্পাদক, নিখিল-ভারত-রবীন্দ্রনাথ-স্মৃতিরক্ষা-সমিতি, ৬।৩নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা অথবা ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম অধ্যায়ে বহুলোক মুখোশ পরিয়া গা-ঢাকা দিয়া এ বিরাট জনসমুদ্রে ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাইতে আরম্ভ করিবেন। ভারত মহানাট্যকে ডিটেকটিভ উপন্যাস বলিলেও এখন ভুল হইবে না। কারণ, অতঃপর ভারতের স্বাধীনতা কে চুরি করিল, নবযুগের প্রেরণায় মৃতদেহ অবলোকনে হত্যাকারী কে প্রভৃতি প্রশ্নই পাঠক বা দর্শকের চিত্ত আলোড়িত করিতে থাকিবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে যে সকল সাহিত্য-সাধক বাংলা-সাহিত্যের নির্মাণে গঠনে ও প্রসারে আত্মনিবেদন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে তাঁহাদের জীবনী ও রচনাবলীর তালিকা সঙ্কলন করিয়া বাংলা-সাহিত্যের যে অপরিসীম উপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন, তাহা আজ সর্বজনস্বীকৃত ও গ্রাহ্য হইয়াছে। সুখের বিষয়, বহুবিধ দৈহিক বাধা সত্ত্বেও শুধু মাতৃভাষার প্রতি অনন্যসাধারণ নিষ্ঠার জোরে ব্রজেন্দ্রবাবু থামিয়া যান নাই। তাঁহার সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ভাণ্ডার দিনে দিনে পূর্ণ হইয়া বাংলা সাহিত্যের একটি প্রামাণিক ইতিহাস রচনার সুযোগ ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখককে দান করিতেছে। সম্প্রতি চরিত-মালার চতুর্থ সম্মিলিত খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডের বিষয়—ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র দাস, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, রাজকৃষ্ণ রায়, মনোমোহন বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী ও আনন্দচন্দ্র মিত্র এই নয়জন। শরৎচন্দ্রের জীবনীটি তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এত প্রয়োজনীয় তথ্য আর কেহ একত্র সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এই মহা কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আধুনিক সাহিত্যিক সমাজ ব্রজেন-বাবুর নিকট চিরঋণী হইয়া থাকিবেন। তাঁহাদের দায় তিনি সযত্নে উদ্ধার করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৮শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩

দেশ-নায়ক

[ঋষি-কবির অপ্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাণী]

সুভাষচন্দ্র,

বাঙালী কবি আমি, বাংলা দেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলা দেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাঁড়ে তালের মিল নেই। দুর্ভাগ্য যাদের বুদ্ধিকে অধিকার করে, জীর্ণ দেহে রোগের মতো, তাদের পেয়ে বসে ভেদবুদ্ধি; কাছের লোককে তারা দূরে ফেলে আপনকে করে পর, শ্রদ্ধেয়কে করে অসম্মান, স্বপক্ষকে পিছন থেকে করতে থাকে বলহীন; যোগ্যতার জন্য সম্মানের বেদী স্থাপন করে যখন স্বজাতিকে বিশ্বের দৃষ্টিসম্মুখে ঊর্ধ্বে তুলে ধ'রে মান বাঁচাতে হবে তখন সেই বেদীর ভিত্তিতে ঈর্ষান্বিতের আত্মঘাতক মূঢ়তা নিন্দার ছিদ্র খনন করতে থাকে, নিজের প্রতি বিদ্বেষ ক'রে শত্রুপক্ষের স্পর্ধাকে প্রবল ক'রে তোলে।

বাহিরের আঘাতে যখন দেহে ক্ষত বিস্তার করতে থাকে তখন নাড়ীর ভিতরকার সমস্ত প্রসুপ্ত বিষ জেগে উঠে সংঘাতিকতাকে এগিয়ে আনে। অন্তর-বাহিরের চক্রান্তে অবসাদগ্রস্ত মন নিজেকে নিরাময় করবার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করতে পারে না। এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা, তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করে নি;

তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম ক'রে ইতিহাসের দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি ক'রে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য ব'লে মানোনি। তোমার এই চারিত্র শক্তিকেই বাংলা দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

নানা কারণে আত্মীয় ও পরের হাতে বাংলা দেশ যত কিছু সুযোগ থেকে বঞ্চিত, ভাগ্যের সেই বিড়ম্বনাকেই সে আপন পৌরুষের আকর্ষণে ভাগ্যের আশীর্বাদে পরিণত ক'রে তুলবে, এই চাই। আপাতপরাভবকে অস্বীকার করার যে বল জাগ্রত হয়, সেই স্পর্ধিত বলই তাকে নিয়ে যাবে জয়ের পথে। আজ চারিদিকেই দেখতে পাই বাংলা দেশের অকরুণ অদৃষ্ট তাকে প্রশ্রয় দিতে বিমুখ, এই বিমুখতাকে অবজ্ঞা করেই সে যদি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারে আত্মরক্ষার দুর্গ বানাবার উপকরণ আছে আপন চরিত্রের মধ্যেই; বাধ্য হয়ে যদি সেই উপকরণকে রুদ্ধ ভাণ্ডারের তালা ভেঙে সে উদ্ধার করতে পারে তবেই সে বাঁচবে। হিংস্র-দুঃসময়ের পিঠের উপরে চড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হোতে হবে, এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পারবে তুমি, এই আশা করে তোমাকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করি।

দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে দুর্গম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবই যদি আমরা মিলতে পারি। আমাদের সকলের চেয়ে দুরূহ সমস্যা এইখানেই। কিন্তু কেন বলব "যদি", কেন প্রকাশ করব সংশয়। মিলতেই হবে, কেননা দেশকে বাঁচতেই হবে। বাঙালী অদৃষ্টকর্তৃক অপমানিত হয়ে মরবে না এই আশাকে সমস্ত দেশে তুমি জাগিয়ে তোলো, সাংঘাতিক মার খেয়েও বাঙালী মারের উপরে মাথা তুলবে। তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাংলার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন ক'রে আনবে সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে—অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালী আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আসন প্রস্তুত। বাঙালীর পরস্পরবিরোধের সমাধান হোক তোমার মধ্যে আত্মসংশয়ের নিরসন হোক তোমার মধ্যে, হীনতা লজ্জিত, ও দীনতা ধিকৃত হোক তোমার আদর্শে, জয়ে পরাজয়ে আপন আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখার দ্বারা তোমার মর্যাদা সে রক্ষা করুক।

বাঙালী নৈয়ায়িক, বাঙালী অতি সূক্ষ্ম যুক্তিতে বিতর্ক করে, কর্ম উদ্যোগের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বিপরীত পক্ষ নিয়ে বন্ধ্যা বুদ্ধির গর্বে প্রতিবাদ করতে তার অদ্ভুত আনন্দ, সমগ্র দৃষ্টির চেয়ে রন্ধ্রসন্ধানের ভাঙন লাগানো দৃষ্টিতে তার ঔৎসুক্য, ভুলে যায় এই তার্কিকতা নিষ্কর্মা বুদ্ধির নিষ্ফল শৌখিনতামাত্র। আজ প্রয়োজন হয়েছে

তর্কের নয়, স্বতউদ্যত ইচ্ছার। বাঙালীর সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে নেতৃত্ব পদে, এই ইচ্ছা তোমাকে সৃষ্টি ক'রে তুলুক তোমার মহৎ দায়িত্বে। সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় ক'রে আবির্ভূত হোক সমগ্র দেশের আত্মস্বরূপ।

বাংলা দেশের ইচ্ছার মূর্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গকলেবর দ্বিখণ্ডিত করবার জন্তে সমুদ্যত খড়্গকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বহুবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙালী সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করা সম্ভব কি না এ নিয়ে সেদিন সে বিজ্ঞের মতো তর্ক করে নি, বিচার করে নি, কেবল সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা করেছিল।

তার পরবর্তী কালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভ রূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্তে আলো নিয়েই জন্মেছিল, ভুল ক'রে আগুন লাগাল, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে ক'রে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীর হৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখি নি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণ নিবেদন, আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মতো প্রমাণ ক'রে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তারুণ্যের যে হৃদয়বিদারক প্রমাদ দেখা দিয়েছিল তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসীলেপন করুক তবু কি কালো করতে পেরেছে তার অন্তর্নিহিত তেজস্ক্রিয়তাকে।

আমরা দেশের দৌর্বল্যের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু যেখানে পেয়েছি তার প্রবলতার পরিচয় সেইখানেই আমাদের আশা প্রচ্ছন্ন ভূগর্ভে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করছে। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ প্রাণবান ও ফলবান করবার ভার নিতে হবে তোমাকে; বাঙালীর স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর ক'রে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত ক'রে নব বসন্তে তার নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃত্ব গ্রহণ কর তুমি।

বলতে পার, এত বড় কাজ কোনও একজনের পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে না। সে কথা সত্য। বহু লোকের দ্বারা বিচ্ছিন্নভাবেও সাধ্য হবে না। একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোকে এক হ'তে পারলে তবেই হবে অসাধ্য সাধন। যাঁরা দেশের যথার্থ স্বাভাবিক প্রতিনিধি তাঁরা কখনই একলা নন। তাঁরা সর্বজনীন সর্বকালে তাঁদের অধিকার। তাঁরা বর্তমানের গিরিচূড়ায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রথম সূর্যোদয়ের

অরুণাভাসকে প্রথম প্রণতির অর্ঘ্যদান করেন। সেই কথা মনে রেখে আমি আজ তোমাকে বাংলা দেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে।

এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে বাংলা দেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই অথবা সেই মহাত্মার প্রতিযোগী আসন স্থাপন করতে চাই রাষ্ট্রধর্মে যিনি পৃথিবীতে নূতন যুগের উদ্বোধন করেছেন ভারতবর্ষকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্যে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলনযজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে। তোমার সাধনায় বাংলা দেশের সেই আত্মাহুতি ষোড়শোপচারে সত্য হোক, ওজস্বী হোক, তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলা দেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে মনে তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্য-রূপে বাংলা দেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্বাদ ক'রে বিদায় নেব এই জেনে যে দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূর্য-প্রণাম

জানি, মাটির তারার প্রণাম-রচনা মুছে যাবে মাটিতেই।
ধূলার প্রদীপে যে শিখা জ্বালাই,
সে কি হে আকাশে যায়?
আমার তরু তো আগুন-পিয়াসী:
তরী করা তাকে দায়—

হে অসীম! তবু রৌদ্রে তোমার পুড়িতে তো বাধা নাই;
জানি, বসন্তে চঞ্চল হবে শ্মশানও আমার এই—
ওহে নীল! যদি বারেক তোমার অলখ-পরশ পাই।

ও মহাআঁখি তো ঘুরিয়া চলেছে
দিবস-নিশীথময়।
যত দূরে থাকি, মাটির তারকা—
তোমারি তো স্বাক্ষরে
লেখা এ জীবন ;
স্বপন আমার যা-কিছু ঘেরিয়া রয়—
পৃথিবীর পথে রাগ রেখে যাওয়া অমর রৌদ্রকরে,
সে কি হে, সে কি হে তোমারি রচনা নয় ?

সে কোন্ লীলায়—দূরের পথিক !
নাকি খেলাছলে নাকি ভুলে দিক ?
কেন এই কালো মাটির মেলায়
তমসার উপকূলে :
এসেছিলে স্নেহে দুলে ?
তুমি যে ধরার নয়—
এ কথা ছিল না ধরণীর মনে :
তাই হ'ল পরাজয়।
তবু তো এখনো নয়ন ভ'রয়া দেখি,
আজো তোমাকে তুলে ওঠে মাটি এ কি !
ক্ষণে ক্ষণে আনমনে—
সে কোন্ গানের রাঙা রিনিঠিনি
বেজে ওঠে বনে বনে।
দিগন্ত মেলে রাখে,
রামধনুকের রঙিন আলোয় কুসুমের বিছানাকে।
বল, ব'লে দাও—
মিছে নাকি সবই মিছে—
তুফান তোমার জাগে না, জাগে না
এ দোলার পিছে পিছে ?
ওহে ধ্যানস্থ ! ওহে অতন্দ্র !
হে দূর আলোকচারী !
দীপে তো তোমার আরতি হবে না—
জ্বলিতে তো তবু পারি !

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী

বিবর্তন

সেজদা যে এই রকম একটা কাণ্ড করিয়া বসিতে পারে, তাহা আমার ধারণার বাইরে তো ছিলই, (আমার ধারণাশক্তি সম্বন্ধে অবশ্য কাহারও উচ্চধারণা থাকিবার কথা নহে, উহা আমার অল্প বয়সেরই সমানুপাতিক হইবে তো!) এমন কি সেজদারও বিস্ময়ের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেজদার কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে, তাঁহার গান্ধীভক্তি ও স্বদেশীপ্রীতি সুস্পষ্ট ছিল।

বছর ষোল আগের কথা।

একুশ সনের অসহযোগ আন্দোলনের শেষ রেশটুকু অনেক নির্যাতন ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও নিজের ভাস্বরতাকে ম্লান হইতে দেয় নাই। না দিবারই কথা। কারণ ঐতিহাসিক ঘটনাসংঘাতের ফলে মানুষের সমাজজীবনে যে প্রগতিশীল প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা অমর। অত্যাচার আর উৎপীড়ন তাহাকে মন্দগতি করিতে পারে না। বরঞ্চ তাহার মন্দীভূত গতিবেগকে নূতন শক্তিসঞ্চয়ে সাহায্যই করে। ইহাই শোষিত ও অত্যাচারিতের মুক্তিসংগ্রামের চলার পথের রিলে-হাউস। যাহা বলিতেছিলাম।

১৯৩১ সনের প্রথম দিকের সত্যাগ্রহ-আন্দোলন। আমার সেজদাও তাহাতে যোগ দিয়াছেন। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের বাড়িতে ক্ষুদ্র সংঘর্ষের একটি কুরুক্ষেত্র বাধিয়াছে। বাড়ির প্রত্যেকের বিচারে সাব্যস্ত হইল, সেজদা আন্দোলনে যোগ দিয়া অপরাধ করিয়াছে। এই রায়ের অনুকূলে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কারণ অবশ্য দর্শাইল, যাহা ক্রমানুযায়ী লিপিবদ্ধ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়,—নিম্নমধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে স্বদেশী করা সাজে না, কারণ বাড়ির সমবেত আর্থিক উন্নতিবিধানের বিপক্ষে তাহাদের কারাবরণ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন করে। বিশেষ করিয়া পাঠ্যাবস্থায় স্বদেশী করা নৈতিক অপরাধ, যেহেতু ছাত্রদের নাকি অধ্যয়নই একমাত্র তপস্যা। সর্বোপরি যাহারা অন্যের আশ্রয়ে থাকিয়া অধ্যয়ন করে, এবং তদুপরি আশ্রয়দাতা যদি আবার সদাশয় সরকার বাহাদুরের স্নেহভাজন হন, তবে তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া স্বদেশী করিলে নাকি আশ্রয়দাতার সরকার-স্নেহের ভাগে টান পড়ে। সুতরাং আশ্রয়দাতার এরূপ ক্ষতি করা সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সেজদার ক্ষেত্রে সবগুলি কারণই প্রযোজ্য, কেবল প্রথমটি ছাড়া, যেহেতু সেজদা তখনও অর্থোপার্জন করে না। সেজদা বেচারাকে সপ্তাধিক রথী বেষ্টিত হইয়া তিরস্কার-বাণে জর্জরিত হইতে দেখিয়া আমি মনে মনে সমবেদনা বোধ করিলাম। যদিও আমার তাহা করার কথা নহে। কারণ বাড়ির সকলের স্নেহভাজন বলিয়া আমি কখনও সেজদার শাসন হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই! কিন্তু সর্বশেষ বাবার প্রশ্নের উত্তরে সেজদা যাহা বলিল, তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারার বয়স আমার না হইলেও, বাবার ক্রুদ্ধ মুখভাব লক্ষ্য করিয়া একটা বিশেষ অপ্রীতিকর দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া মায়ের অঞ্চলাশ্রয়ী হইলাম। জবাবটা ছিল এইরূপ—যাহাদের পরিবারে একাধিক যুবক সন্তান আছে, তাহাদের প্রত্যেক বাড়ি হইতে অন্তত

একজন করিয়া সন্তান দেশমাতার বলির জন্য উৎসর্গ করা উচিত। আপনার তো চার ছেলে, একজন না হয় উৎসর্গই করিলেন। ইহার পর যাহা হইল, না লিখিতে হইলেই ভাল ছিল। মা কেবল অশ্রুবিসর্জন করিতেছিলেন। অনেক বাগ্ব্যয়ের পর মা সেজদাকে তাঁহার পদস্পর্শ করাইয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, সেজদা আর ওপথে যাইবে না। সু(?)যুক্তি দিয়া বুঝাইলেন, গরিবের জন্য ওসব নহে।

সেজদার তখনকার মানসিক অবস্থা এখন কল্পনা করিতে পারি; কিন্তু বর্তমান স্ত্রীপুত্রপরিবারজর্জরিত সেজদার মধ্যে তখনকার সেজদাকে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

পরবর্তী ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। কি করিয়া যেন সেজদার দণ্ড শুধু হাজতবাসই হইয়াছিল।

* * *

অনেক বছর পরে, ১৯৪৬ সনের পটভূমিকা।

ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের, উপর দিয়া অনেক ঝড়ই বহিয়া গিয়াছে, মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রোগ, বন্যা আরও কত কি! মোট কথা বোধ হয় এটুকু বলিলেই হইবে যে, বাঙালী জাতি যে এখনও বাঁচিয়া আছে, ইহাই আশ্চর্য। আরও আশ্চর্য, এত নির্যাতন সত্ত্বেও বিবর্তনশীল ঐতিহাসিক মুক্তিসংগ্রামের শক্তিবৃদ্ধি।

২১এ নভেম্বর। কলিকাতায় নেতাজীর আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের বন্দীদের উপর অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত একটি শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রাকে পুলিস বাধা দেয়; এবং সৈন্যশক্তি সাহায্যে নিরস্ত্র শোভাযাত্রাকে গুলিবিদ্ধ করিয়াও নিরস্ত করিতে সক্ষম হয় না। সমগ্র দেশে তুমুল আন্দোলন ও চাঞ্চল্য। সর্বত্রই এক অবস্থা। মুক্তি-সংগ্রামের শক্তির প্রবলতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পূর্বেকার আন্দোলনগুলি ম্রিয়মাণ হইতে বসিয়াছে। পূর্বে লাঠির আঘাতেই জনতা ছত্রভঙ্গ হইত, এখন লাঠি ও টিয়ার গ্যাসের স্থান লইয়াছে মেশিনগান। তবুও নিরস্ত্র শোভাযাত্রীদের আত্মিকশক্তির নিকট তাহাকে হার মানিতে হয়।

সেদিন বড়দার জ্যেষ্ঠপুত্র স্বাপা অনেক রাত পর্যন্তও বাড়ি ফিরিল না দেখিয়া আমরা চিন্তিত হইয়া সম্ভব অসম্ভব সবরকম খোঁজই করিয়া হতাশ হইয়া বাড়ি ফিরিলাম। আমার মায়ের নিকট অনুসন্ধানের নিষ্ফলতা বিবৃত করা সত্ত্বেও তাঁহাকে বিচলিত দেখা গেল না। স্বাপা তাহার ঠাকুরমার খুবই আদরের। কাজেই আমি একটু আশ্চর্য না হইয়া পারিলাম না। বাড়িসুদ্ধ থমথমে ভাব। আমরা ভ্রাতৃচতুষ্টয় বসিয়া পড়িলাম, হাতে মাথা রাখিয়া, না, মাথায় হাত দিয়া, বুঝিতে পারি নাই। শুনিলাম, পাশের ঘরে আমার মাতৃদেবী ক্রন্দনরতা জ্যেষ্ঠপুত্রবধূকে প্রবোধবাক্য কহিতেছেন, বিপদে ধৈর্য হারালে চলবে কেন? কোনও খোঁজ পাওয়া যাবেই। আর স্বাপা তো ছোট ছেলে নয়, হয়তো

বন্ধুবান্ধব কারও বাড়ি গিয়ে থাকবে। এসে পড়বে। তা ছাড়া, আমরা এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারি নি যে, ওর মৃত্যুকল্পনা ক'রে আগে থেকেই—

এই কথা শেষ না করিতে দিয়া ন্যাপার মা মাতৃসুলভ শক্তিসহকারে চীৎকার করিয়া আমার মার মুখ চাপিয়া বলিলেন, মা, তুমি অমন কথা মুখে আনলে কি ক'রে? তুমিও তো মা! আমার মা জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমিও মা। তাই ব'লে কি হয়েছে, মৃত্যু যদি হয়েই থাকে, এমন মৃত্যুতে কাঁদবার অবকাশ কোথায়? এ যে ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু! মহিমময়! যে কোনও মায়ের কাম্য হওয়া উচিত। আমার ন্যাপার মতন কত ছেলে আজ তাদের মার কোল খালি ক'রে গেছে।—বলিতে বলিতেই চোখ অশ্রুসজল ও গলার স্বর ভারি হইয়া আসিল। আবার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু আমরা অত্যাচারের এমন অধ্যায়ে এসে পড়েছি, যখন এমন মৃত্যুকে দুর্বিষহ মনে না ক'রে প্রত্যেক মার বরণীয় মনে করা উচিত। মানুষ আর কত সইবে—সইবারও তো সীমা আছে! তিলে তিলে মরার চেয়ে এ মরণই ভাল।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই পায়ে ব্যাণ্ডেজবদ্ধ অবস্থায় ন্যাপা আসিয়া প্রবেশ করিল।

সকলেই তাহাকে ঘিরিয়া ভাড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। মা আসিয়া ন্যাপাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। মার ঈদৃশ আচরণে, বাবার ন্যাপাকে ভর্ৎসনা করিবার বাসনা অন্তরেই রহিয়া গেল। ন্যাপা যাহা বিবৃত করিল, তাহার সংক্ষিপ্তসার এই যে, শোভাযাত্রায় ন্যাপাও ছিল এবং উহার বাঁ পায়ে গুলির সামান্য চোট লাগে। ওর এক সহপাঠী বন্ধু তাদের বাড়িতে উহাকে লইয়া যায় এবং নিজের ডাক্তার কাকাকে দিয়া চিকিৎসা করায়। আঘাত সামান্যই, কোনও ভয়ের কারণ নাই। বিবৃতির পর সেজদা ন্যাপাকে ছোট ছেলের মতন কোলে তুলিয়া লইলেন। সেজদার চোখে দুই ফোঁটা জল।

অনেক বছর আগেকারে কথা আমার স্মরণপথে উদিত হইল। সেজদার সেদিনকার ভাগ্যের সঙ্গে অদ্যকার ন্যাপার ভাগ্যের একটা তুলনামূলক হিসাব করিয়া ফেলিলাম। আমাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা তেমন কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই—অভাবই বেশি অনুভূত হয়। তবে বৃদ্ধির মধ্যে আমাদের ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের ডজনাধিক পুত্রকন্যা, আর অভাবের মধ্যে পিতৃদেব।

কিন্তু সময়ের কি পরিবর্তন! একই কারণে সেদিন সেজদার লাভ হইয়াছিল অশেষ তিরস্কার আর গ্লানিকর লাঞ্ছনা; আর আজ ন্যাপার ভাগ্যে প্রশংসা ও পুরস্কার! এক কথায় ক্ষুদ্রপটভূমিতে ন্যাপা আজ হিরো। আমার মার সেইদিনের সেজদাকে প্রতিজ্ঞা করানো এবং আজ ন্যাপার মাকে সান্ত্বনাদানের মধ্যে কত পরিবর্তন! অথচ একই মানুষ, শুধু কয়েকটা বছরের ব্যবধান।

এই বিবর্তনটুকুই মুক্তি-সংগ্রামের কয়েক বছরের হিসাব-নিকাশে লাভের কোঠায় অঙ্কসংখ্যা। অপ্রতিহত ইহার গতি।

শ্রীমাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

শব্দের অপপ্রয়োগ

নিয়ম সাধারণের জন্য এবং তাহারা নিয়মের অধীন। কিন্তু যাহারা অসাধারণ, নিয়ম তাহাদেরই অধীন হয়। ভাষার বেলাও এ কথা প্রযোজ্য। তাই সংস্কৃতে আর্ষপ্রয়োগের এত ছড়াছড়ি। ভুল যখন ঋষিদেরও হয়, তখন সাধারণ মানুষের তো হইবেই। কিন্তু সে ভুলও কিরূপে অলক্ষিতে যে ভাষার দরবারে আসন দখল করিয়া বসে, তাহাই আশ্চর্য। তাহারা সংখ্যায়ও নগণ্য নয়। উহাদের মধ্যে কতকগুলির জন্মই ভুলের মধ্যে, আবার কতকগুলি ভুল অর্থে প্রচলিত। অভিধানে ও ব্যাকরণে ব্যাকরণ-দুষ্ট কিন্তু বহু-প্রচলিত কয়েকটি শব্দের তালিকা আছে।

যে সব শব্দের জন্ম ভুলের মধ্যে তাহাদের উদাহরণ—

১। মৃণ্ময়—এই শব্দটি বিদ্বৎসমাজে এরূপ অবাধ প্রচার ও প্রচলন লাভ করিয়াছে যে, ভুল বলিলেই অনেকে চমকাইয়া উঠিবেন। কিন্তু বাস্তবিক এটি ভুল। কারণ 'পদান্ত 'দন্ত্য ন' 'মূর্ধন্য ণ' হয় না। যেমন নর শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন 'নরাণ' না হইয়া 'নরান্' হয়।

২। ক্রোড়পত্তি—ক্রোড় ও ক্রোরের পার্থক্য না জানার জন্য এরূপ ভুল প্রয়োগ চলিতেছে। কারণ 'ক্রোড়' অর্থ কোল, বক্ষ ; কিন্তু ক্রোর অর্থ কোটি।

৩। আবশ্যকীয়—এটি একটি বহুলপ্রচারিত শব্দ। কিন্তু ভুল। কারণ আবশ্যক নিজে বিশেষণ, কাজেই তাহার আর বিশেষণ চলে না।

৪। সিঞ্চন—সাহিত্যক্ষেত্রে বাবিসিঞ্চন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আধুনিকতম সাহিত্যিক পর্যন্ত সকলেই করিয়াছেন, কিন্তু সিচ্ ধাতু অনট করিলে 'সেচন' হয়, সিঞ্চন শব্দটা ভুল।

৫। মনান্তর ও মনোহর—এই অশুদ্ধ রূপই বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং শুদ্ধ বলিয়া পরিচিত। আশুতোষ দেবের 'বাংলা অভিধানে'ও এই শব্দ দুইটি আছে। অথচ এই দুইটি শব্দই অশুদ্ধ এবং ব্যাকরণ-বিরোধী। ব্যাকরণ-সম্মত পদ মনোন্তর ও মনহর।

৬। অধীতব্য—কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিতকেও এই শব্দ ব্যবহার করিতে দেখা যায়। অথচ শুদ্ধ রূপ অধ্যেতব্য। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের 'বাংলা ভাষা ও বানান' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৭। নিশিকান্ত—যদি বলি যে নিশিকান্ত নামধারী যত লোক আছেন তাঁহাদের সকলের নাম বদলাইয়া নিশাকান্ত করিতে হইবে, তাহা হইলে কথাটা হয়তো কেহই গ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু শুদ্ধ রূপ বাস্তবিকই 'নিশাকান্ত', নিশিকান্ত ভুল।

৮। নিশির শিশির—মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" এই কবিতাটির সহিত বাল্যজীবনে পরিচয় ঘটে নাই, এমন লোক বিরল। "পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির" সকলেরই মুখস্থ। কিন্তু "নিশির শিশির" ভুল ; শুদ্ধ প্রয়োগ "নিশার শিশির"।

৯। আরম্ভ—লেখার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত সবটাই ভুল, এই কথা শুনিলে সকলেই চমকাইয়া উঠিবেন। কিন্তু ইহা চমকাইবার কথা নয়। কারণ 'আরম্ভ' অশুদ্ধ প্রয়োগ, শুদ্ধ পদ "আরব্ধ"। এবং 'শেষ' ভুল অর্থে প্রয়োগ, শুদ্ধ অর্থ "বাকি"।

১০। পর্য্যটক—একটি বহুলপ্রচলিত কিন্তু অশুদ্ধ শব্দ, শুদ্ধ পদ 'পর্য্যাটক'।

যে সব শব্দ ভুল অর্থে প্রচলিত তাহাদের উদাহরণ—

১। আত্মম্ভরী—সংস্কৃতে অর্থ পেটুক; কিন্তু বাংলায় অর্থ দাম্ভিক, অহঙ্কারী।

২। বিমর্ষ—সংস্কৃতে অর্থ বিচার, বিবেচনা (বিশেষ্য); বাংলা অর্থ বিষণ্ণ, দুঃখিত (বিশেষণ)।

৩। আয়াস—সংস্কৃতে অর্থ শ্রান্তি, খেদ, শ্রম, যত্ন; বাংলায় অর্থ আরাম, বিরাম (আরবী আয়েস শব্দের সঙ্গে গোল পাকাইয়া গিয়াছে)।

৪। কোদণ্ড—সংস্কৃতে অর্থ ধনুক; বাংলায় অর্থ কোদালী।

"ষড়রিপু হইল কোদণ্ড স্বরূপ
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ।"

৫। নির্ঘাৎ—সংস্কৃতে অর্থ বজ্র; বাংলায় অর্থ নিশ্চয়।

৬। সুতরাং—সংস্কৃতে অর্থ অত্যন্ত; কিন্তু বাংলায় অর্থ অতএব।

৭। গোপ—সংস্কৃতে অর্থ রক্ষক; কিন্তু বাংলায় অর্থ গোয়ালা।

৮। রাগ—সংস্কৃতে অর্থ অনুরাগ; কিন্তু বাংলায় অর্থ ক্রোধ।

৯। নয়—সংস্কৃতে অর্থ ন্যায্য; কিন্তু বাংলায় অর্থ নহে।

ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি শব্দ আছে, যাহাদের চেহারা সংস্কৃতের মত, কিন্তু আদপে সংস্কৃত নয়। যেমন—

১। গাভী—আকারে সংস্কৃত, সংস্কৃতে প্রয়োগও আছে,—যেমন 'অভক্ষ্যং ভক্ষয়েৎ গাভী', অথচ শব্দটি মোটেই সংস্কৃত নয়।

২। মিনতি—এই শব্দটির রূপ দেখিয়া সংস্কৃত মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা বাংলা। হিন্দী মিন্‌তি হইতে ইহার জন্ম।

৩। কাণ্ডারী—এই শব্দটি আকারে সংস্কৃত, কাণ্ডারিন্ শব্দ সংস্কৃতে কোন কোন পণ্ডিত ব্যবহারও করেন, কিন্তু শব্দটা খাঁটি বাংলা।

৪। গল্প—এই শব্দটি রূপে সংস্কৃত, কিন্তু বাস্তবিক সংস্কৃত নহে।

৫। উপন্যাস—এই শব্দটি বাংলা-ভাষায় সৃষ্টি। সংস্কৃতে উপন্যাস অর্থ অসত্য বা অলঙ্কৃত বচনবিন্যাস।*

শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞ

* এইরূপ ভুলের তালিকা কেহ পাঠাইলে আমরা সাদরে প্রকাশিত করিব।—স. শ. চি.

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের অপরিমেয় কবি-প্রতিভা তাঁর শিল্পী-প্রতিভার উপর ছায়াবিস্তার করে নি, এ যেন আর এক স্বতন্ত্র রবীন্দ্রনাথ। রসেটি কবিতাও লিখেছেন, ছবিও এঁকেছেন, কিন্তু কাব্যের ছাপ বহু ক্ষেত্রে চিত্রের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। যে কথায় কবিতা লিখেছেন, সেই কথায় ছবিও এঁকেছেন; সহজেই মনে হয়েছে, কবির আঁকা ছবি, তাই একটু বেশি কাব্যিক। চিত্র ও কাব্য স্বতন্ত্র ধরনের শিল্প; একের যা অলঙ্কার, অপরের তা বোঝা! রবীন্দ্রনাথের মত কবির নিকট থেকে এইটুকুই বরং আশঙ্কা করা যেত যে, হয়তো তাঁর সীমারেখা থাকবে না, হয়তো তাঁর কাব্যের প্রচণ্ড আবেগ চিত্র-শিল্পকে আপ্লুত ক'রে দেবে। কিন্তু পরিমিত সংযম দ্বারা তাঁর চিত্রকলায় তিনি নিজের সাধ্যকে সার্থক ক'রে তুলেছেন। যে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সম্পদ নিয়ে তিনি কবিতায় ছত্রবিন্যাস করেছেন, তাকে সম্বল ক'রে চিত্রের বর্ণবিন্যাস করেন নি। তাই, তাঁর ছবি ছবি ব'লেই সার্থক হয়েছে, কবিতার চিত্র-প্রলাপ ব'লে চিত্রিত হয় নি। একই মানুষ কলম নিয়ে এক, তুলি নিয়ে তিনি আর এক।

জীবদ্দশায় চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে আমরা মান দিই নি। অনধিকারচর্চা ব'লে তাঁর শিল্পকে অবজ্ঞা করেছি, উপহাস করেছি। আর যাঁরা তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা ও মমতাবশত একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি, শিশুর সরলতা আরোপ ক'রে তাঁর শিল্পকে একটা মহিমা প্রদান করার ক্ষীণ চেষ্টা করেছেন। এ প্রশংসা শিল্পীকে খর্ব করেছে। শিল্পে শিশুমনের স্থান নেই, শিল্প অভিজ্ঞতার নির্যাস। শিল্পের সরলতা অন্য ধরনের; সহজভাবে নেওয়া এবং সহজভাবে দেওয়া। ইংরেজীতে যাকে 'সিম্প্লিসিটি' বলে রবীন্দ্রনাথের চিত্রে তারই আভাস আছে, ছেলেমানুষি প্রশ্রয় পায় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিত্রের ধরন-ধারণ এত বিচিত্র, এত অভিনব যে, অদ্ভুত ব'লে মনে হয়। এই অদ্ভুত জিনিসটাকে মানুষ নতুন নতুন গ্রহণ করতে পারে না। কেউ বিস্মিত হয়ে ভাবে, না জানি কি; আর দল বিরক্ত হয়ে বলে, জানি না কি! এ দুয়ের কোনটাই যাচাইয়ের পথ নয়। ছবি চিরাচরিত প্রথায়, কি অভিনব প্রথায় অঙ্কিত, এটা চিত্র-শিল্পের বাইরের আভরণ। ছবির আসল পরিচয় তার প্রাণের পরিচয়। সাহিত্যে এই জিনিসটা লোকের চোখে পড়ে বেশি। কোন্ লেখা কতটা গতিবান, কতটা সজীব, তাই নিয়ে তার অস্তিত্ব নির্ধারিত হয়। ছবির ধরন-ধারণ ও ঢঙ নিয়ে রবীন্দ্রশিল্পে নানা তর্ক-বিতর্কের অবকাশ আছে। বিভিন্ন রুচি নিয়ে মানুষ তাকে বিভিন্ন উপায়ে কাটা-ছেঁড়া ক'রে গ্রহণ করতে বা বর্জন করতে পারে। কিন্তু আচমকা নতুন জিনিস ব'লে যত বিষয়ে যত সন্দেহ ও যত পরাজয়ই ঘটুক না কেন, তাঁর ছবি স্তিমিত নয়, প্রাণের

রসে পরিপূর্ণ। এই আসল জায়গাটিতেই তাঁর আসল জয়। এই সজীবতার দিক দিয়ে দেখলে তাঁর শিল্পকে রেম্‌ব্রাণ্টের শিল্পের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে; যদিও চিত্রের বাহ্যিক আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

রবীন্দ্রনাথের চিত্র তাঁর জীবনের উদ্বৃত্ত ধন; কিন্তু সে এত প্রচুর যে, তা দিয়ে আরও একটি পাত্র পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কাব্যের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স হয়েছিল, তিনি সম্পূর্ণ, তিনি প্রবীণ পিতামহ। কিন্তু চিত্রচর্চায় তিনি অবনীন্দ্র-নন্দলালের পরবর্তী কালের, প্রায় আমাদের সমসাময়িক। কিন্তু তাঁর বলিষ্ঠ পৌরুষ ও অপরিসীম অভিজ্ঞতাজনিত এই চিত্রশিল্প এত প্রকাণ্ড ও অগ্রগামী যে, সশ্রদ্ধায় ও সবিনয়ে এ আমাদের অনুশীলনের বস্তু। মাঝে মাঝে শিল্পের গতি এক-একটা জায়গায় এসে অকস্মাৎ থেমে যায়। তাকে পুনরায় চালনা করবার জন্য নতুন প্রতিভা নতুন শক্তির প্রয়োজন হয়। যতদিন তা না হয়, ততদিন পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে; এবং চিত্রে অকারণ ভাবুকতা, অকারণ কোমলতা ও ললিত-বাসন এসে প্রাণের পথকে পঙ্কিল ক'রে তোলে। সবচেয়ে সুন্দর হ'ল জীবন, কিন্তু এই জীবনকে পিছনে রেখে যখন কারিগরিই প্রধান হয়ে সামনে এগিয়ে আসে, তখন সে শিল্পকর্মে বাহাদুরি থাকলেও প্রাণ থাকে না। অবনীন্দ্রনাথের পরে আমরা অধিকাংশই এমনিতর জাতিচ্যুত হয়ে পড়েছিলাম। আজ দেখি, আমাদের আরম্ভের আগেই চিত্রকর-রবীন্দ্রনাথ সে-বিদ্রোহ শুরু ক'রে দিয়েছেন; শিল্পে নির্বীর্যের অধিকার নেই। রবীন্দ্রনাথের বহু সার্থক ও বহু ব্যর্থ চিত্রের ভিতর এই প্রাণের মন্ত্র ভবিষ্যৎকে আর একবার পথ দেখাবে।

টেকনিকের দিক দিয়ে ছবিকে খণ্ড ক'রে বিচার করা ক্রিটিকদের একটা রেওয়াজ। ছবির ভিতর টেকনিকের আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই, ছবির সঙ্গেই ও চলে। যে ছবি ভাল হয়, বরং তার টেকনিকের কথা মনেই পড়ে না; ফুঁ দিলে বাঁশি বাজে, কিন্তু সুরের মাঝে ফুৎকারকে খুঁজে বেড়ায় কে? টেকনিক আর্টিস্টের জিনিস, দর্শকের ভাববার বিষয় নয়। তবু চলতি প্রথায় টেকনিককে স্বতন্ত্র ক'রে দেখলে, রবীন্দ্রনাথের টেকনিক একদিকে যেমন অভিনব, আর একদিকে পুরাতন ট্র্যাডিশনের সঙ্গে তেমনই নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত, কুল-শীল-হীন স্বয়ম্ভু নয়। টেকনিকের শালীনতায় রবীন্দ্রনাথ বড় ঘরের ছেলে। তাঁর ছবিতে এর চেয়ে আরও এক বড় জিনিস আছে, সে তাঁর রুচি। এই রুচি এত সূক্ষ্ম এত পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর যে, তাঁর বিফল চিত্রগুলিকেও বাঁচিয়ে রেখেছে। রুচির মাধুর্য সংযমে। সৌন্দর্যবোধে মানুষের রুচিবিকাশের দুটি বিপরীত পথ আছে। এক প্রাচুর্য, আর একটি একান্ত। যেখানে যা একান্ত প্রয়োজন কেবল তারই স্থান রয়েছে রবীন্দ্র-নাথের প্রতিটি চিত্রে। কোন ছবিতে একত্রে বহু বিষয়ের ভীড় নেই, তাই কোন গোলযোগেরও অবকাশ নেই। এই কারণে, তাঁর ছবিতে কোথাও কোন বক্র পন্থা

অবলম্বিত হয় নি, যা এঁকেছেন তা একেবারে সোজাসুজি। শিল্পীর আত্মসংযত এই ঋজু প্রকাশভঙ্গী তাঁর চিত্রকে সর্ববিষয়ে 'সিম্প্‌ল' ক'রে তুলেছে। তাঁর রুচি সবচেয়ে সার্থক হয়েছে রঙের বেলায়। রঙ তাঁর ছবির রূপের কাণ্ডারী। রবীন্দ্রনাথের ছবির রঙ একটা ঐশ্বর্য। রঙেরই বিভিন্ন ব্যঞ্জনা তাঁর ছবিকে কখনও রোমান্টিক করেছে, কখনও মিষ্টিক করেছে। তাঁর চোখ যে কতখানি রূপে-বাঁধা, এইখানে মেলে তাঁর পরিচয়। রঙেরই সুষমা তাঁর শিল্পকে বেশি মহিমান্বিত করেছে, ছবিকে বেশি সজীব করেছে রঙেরই দৃঢ়তা। মহৎ শিল্পের ভিতর যে গাম্ভীর্য থাকে, রঙের ব্যবহারেই তিনি তার আবহাওয়া সৃজন করেছেন। ঘন গভীর রঙের 'ব্যাক গ্রাউণ্ড' তারই মাঝে আলোর রঙে বক্তব্যকে ফুটিয়ে তোলা—এই হ'ল রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছবির মনোহারিতা। এ একটা ষ্টাইল। রেম্‌ব্রাণ্টের ছিল এই ষ্টাইল, ঘনঘোর দৃশ্যপটের নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে মৃদু আলোর উদ্ভাসিত অবয়বের একটুখানি কলরব।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রে শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের সমস্ত গুণপনা লক্ষিত হয়। রুচি, রঙ, ভাব সর্ববিষয়েই তিনি জ্যোতিষ্মান। কিন্তু একটিমাত্র ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ পরাজিত। সে তাঁর ড্রইং। রঙের পরিপূর্ণতা দিয়ে তিনি ছবির গুণ বাড়িয়েছেন, দোষও ঢেকেছেন, কিন্তু ড্রইং-এর স্বল্পতাকে শুধু চেপে রাখতে পারে নি তাঁর কোন কিছুই। আজকাল বুদ্ধিচর্চার দিনে শিল্পকে 'অ্যাবষ্ট্রাক্ট' ক'রে তোলা একটা আধুনিকতার বিলাস। এতে বিস্ময় অর্জন করা যায় অসাধারণ ব'লে। কিন্তু এই বিলাস-ব্যসন তাঁকে স্পর্শ করে নি, তবু তাঁর ছবিকে 'অ্যাবষ্ট্রাক্ট' ব'লে অবিহিত করা হয়। প্রকৃত শিল্পের ভিতর দুর্বোধ্য ও 'অ্যাবষ্ট্রাক্ট' জিনিসের মর্যাদা নেই। বস্তু কথার চেয়ে প্রাণের কথাই শিল্পের আসল কথা, রস এইখানেই। এই প্রাণের কথা দিয়েই ভরা রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলি। কতটা পেরেছেন, কতটা পারেন নি, এ নিয়ে বিচার-বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু তাঁর ছবি 'অ্যাবষ্ট্রাক্ট', কথা ব'লে সম্মান দেওয়ার ছলে তাঁর শিল্পকে অসাবধানে খাটো করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের ছবির ভাব বা ধ্যান-ধারণার ভিতর কোন জটিলতা নেই, কিন্তু তাঁর ছবিকে দুর্বোধ্য করেছে ড্রইং-এর দুর্বলতা। মন যা আঁকতে চেয়েছে, হাত তা আঁকতে পারে নি। ড্রইং-এর বেলায় নিপুণতার অভাবে মনেতে হাতেতে অধিকাংশ চিত্রেই একটা যুদ্ধের চিহ্ন প'ড়ে আছে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের ছবি দুর্বোধ্য হয়ে গেছে, এবং যা দুর্বোধ্য তাকেই সচরাচর অ্যাবষ্ট্রাক্ট ব'লে থাকি। তাঁর অঙ্কিত অবয়ব কোথাও প্রকৃতিগত হয় নি, সাদা-মাটা রেখায় আকৃতিটা বর্ণিত হয়েছে মাত্র। এতে শাস্ত্রগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে যথেষ্ট, কিন্তু এত অভাব সত্ত্বেও ছবির মূর্তিগুলির গতি-ভঙ্গী, নড়া-চড়া এবং সর্বোপরি স্বচ্ছন্দ ভাবটুকু ব্যাহত হয় নি। ড্রইং-এ ভুল থাকলেও তাই রসে কম পড়ে নি কোথাও। এই ভুল ড্রইং-এও আর একটা সদ্‌গুণ রক্ষা করেছেন তিনি; ছবির ফিগারগুলির ভিতরের কাঠামো আলগা নয়, এই দৃঢ়তাই ড্রইং-এর প্রাণ। কিন্তু এই সব গুণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁর অঙ্কিত আকৃতি পূর্ণ পরিণতি না পাওয়ায় শোভার অভাবে মানুষের চোখে লাগে না। ছবি চোখে দেখার শিল্প। আগে সে চোখকে খুশি করে, তবে দেউড়ি পেরিয়ে অন্দরমহলে যাবার পথ পায়।

রিয়ালিষ্টিক দৃষ্টি দিয়ে তাঁর ড্রইংকে নাকচ করা সহজ, কিন্তু তাঁর অমুস্থত ড্রইং-এর যে একটি বিশেষ রীতি-নীতি আছে, তাকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। স্বকীয়তার দিক দিয়ে এখানে খুশি আছে, কিন্তু যথেচ্ছাচারিতা নেই। যে ছবি যে ধরন নিয়ে এঁকেছেন, তার ভিতর তার মাত্রাটুকু সম্পূর্ণ বজায় রেখে চলেছেন, আগাগোড়া একটা ছন্দমিল তাঁর ছবিকে সুসংযত ও সুবিনীত করেছে। মানুষ বা পশুপক্ষীকে আঁকতে গিয়ে নানাভাবে অদ্ভুত ক'রে ফেলেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই রূপের হের-ফের প্রাণের ঐকান্তিকতার
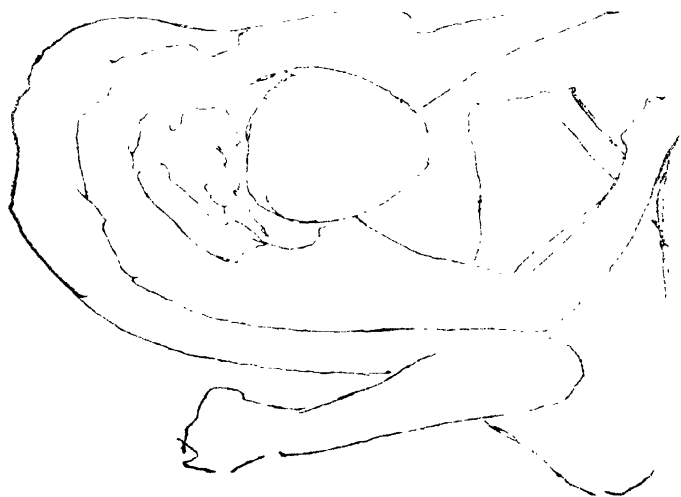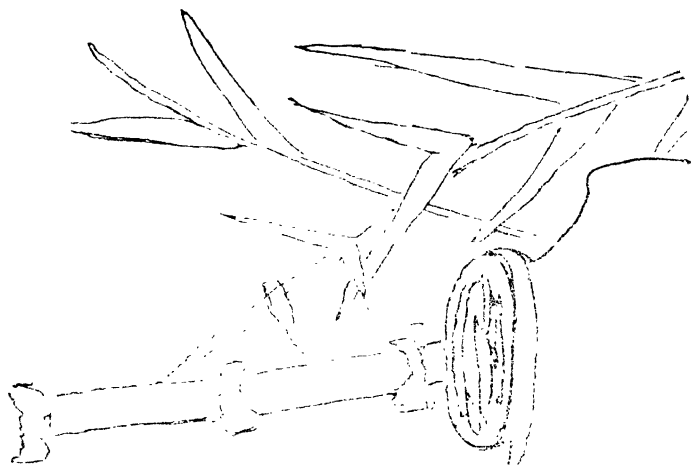
সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত যে, এরা আজগুবি, কিন্তু মিথ্যে নয়। রিয়ালিষ্টিক বনিয়াদির ওপর যদি এমনটি ঘটাতেন, তা হ'লে তাল ভঙ্গ হ'ত, এবং অপরাধ ব'লে পরিগণিত হ'ত। কিন্তু ড্রইং-এ নিজের সীমা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সচেতন ছিলেন ব'লে প্রচলিত অঙ্কন-প্রণালীর ওপর নিজের স্বকীয়তার জুলুম চালান নি। ড্রইংএর রাজ্যে তিনি একলা পথিক, তাঁর পুরানো সম্বল কিছু ছিল না, কিন্তু নিজের থেকে নতুন যা দিয়েছেন তা যেমন প্রাণ-ঢালা তেমনই নির্মল। নিজের স্বভাবের দিক দিয়ে তাঁর ড্রইংকে স্বাভাবিক করেছেন, প্রকৃতির স্বভাব রক্ষা করেন নি।

ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীতে চিত্রকলা একদা পথ চলতে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। সেই হ'ল আজকের দিনের আধুনিকতার সূত্রপাত। ইতিহাসের প্রতিটি যুগই আধুনিক, যদি তার ভিতর প্রাণের নতুন সাড়া থাকে। শিল্পে একই রসকে মানুষ আদিকাল থেকে সম্ভোগ ক'রে আসছে, কেবল বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মানুষ তাকে মাঝে মাঝে নতুন ক'রে নেয়। এই বিভিন্ন ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধ পরিণতি এক-একটি ইজ্‌ম্। এই ইজ্‌ম্ শিল্পীকে রক্ষা করে, লালন করে, আবার বিনাশও করে। গুটিপোকা নিজের প্রয়োজনে চারিদিকে আবরণ তৈরি ক'রে নেয়, সময় হ'লে সে আবরণ ছিন্ন ক'রে বেরিয়েও যেতে পারে। কিন্তু তা না হয়ে শিল্পী যখন ইজ্‌ম্-এর জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ে, তখনই হয় সঙ্কট; শিল্পের চেয়ে শিল্পের ব্যাখ্যাই হয়ে ওঠে বড়, এবং ব্যাখ্যা হয় তখন শিল্পীর আত্মরক্ষার ব্যূহ। বর্তমান যুগ একটা ইজ্‌ম্-এর যুগ। বিভিন্ন পরীক্ষার ভিতর দিয়ে শিল্পীরা অন্বেষণ করছেন নিজেদের প্রতিষ্ঠার পথ। কেউ পেয়েছেন, কেউবা পান নি খুঁজে। বিজ্ঞানের সহায়তায় মানুষের কাছে বুদ্ধি হয়েছে আজ বড়। কিন্তু বুদ্ধি মানুষের মাত্র আধখানা মনুষ্যত্ব, আর আধখানা হৃদয়; সর্বক্ষেত্রে সে আজ অনাদৃত। শিল্পের ব্যাপারেও চলেছে মানুষের বুদ্ধির হানাহানি, রসবোধ রূপজ্ঞান আশ্রয় নিয়েছে থিওরিতে, ইন্‌টেলিজেন্সের চিকনাই ঠিকরে পড়ছে বেশি। প্যাঁচ ক'ষে, তাল ঠুকে কে কত নতুন পথ তৈরি করতে পারে, নতুন কায়দা দিয়ে চমক লাগাতে পারে, কোন্ কৌশলে বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করতে পারে, আধুনিক শিল্পের প্রতিভাসম্পন্ন মন্ত্রগুরু যাঁরা, এই নিয়ে তাঁদের জল্পনা-কল্পনা, এই নিয়েই তাঁদের জয়-পরাজয়। খুব সাবধানতার সঙ্গে আজ বিচার করবার সময় এসেছে, পশ্চিমের যুগপ্রবর্তনকারী চিত্রকর যাঁরা, তাঁরাও আমাদের হাতে শিল্পের নামে যা দিয়ে গেলেন, তা আর্ট, না আর্টিফিসিয়াল! রবীন্দ্রনাথের চিত্রে এই জাতীয় কোন কৃত্রিমতা বা ভান নেই। তাঁর ছবির ভালমন্দ, ভুলভ্রান্তি সমস্ত কিছুর ভিতর নিষ্ঠাশীলতার এমন একটা সৌরভ বিদ্যমান যে তাঁর প্রকাশভঙ্গীকে বিনম্রদান করেছে। এই নম্রতা তাঁর চিত্রশিল্পকে চলার চেয়ে বেশি ধুলো উড়তে দেয় নি। ত্রুটিকে ত্রুটি ব'লেই মেনে ধরেছেন, ব্যাখ্যা দিয়ে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা নেই। তাঁর চিত্র তাঁর

স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের জন্য একটা ইজ্‌ম-এ পরিণত হয়েছে, কিন্তু ইজ্‌ম তাঁকে পরিচালিত করতে পারে নি।

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শিল্পী নিজেকে উন্মীলিত ক'রে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের শিল্প তাঁর জীবনের 'ফ্যাশান' নয়, 'হবি'ও নয়, এ তাঁর জীবন-মন্থন অমৃত। চিত্র রচনায় রবীন্দ্রনাথ যত্ন, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা নিজের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এর কোথাও এতটুকু অবহেলা নেই। চিত্রশিল্পের জন্য এই যে শ্রদ্ধা ও শ্রম, চিত্রকরের কাছে এ অবশ্যপালনীয় ধর্ম। এই ধর্মপথ শিল্পীকে ক্রমশ আত্মপ্রকাশে সহায়তা করে। আত্মপ্রকাশের চেয়ে আরও বেশি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রে, সে তাঁর আত্মনিবেদন। ভক্তি দিয়ে, দরদ দিয়ে তিনি তাঁর চিত্রকে ভালমন্দ, ত্রুটিবিচ্যুতি—এ সকলের উর্ধ্বে নিয়ে গেছেন। শিল্পী হিসাবে যাঁরা বড়, এই তাঁদের মহত্তম পরিচয়।

আদিম মানবের রচিত শিল্পকর্মের কিছু কিছু চিহ্ন যা পাওয়া গেছে, তাতে তাদের বুদ্ধি ও হাত উভয়ই ছিল স্থূল। কিন্তু তাদের কাজকে আমরা অনাদর করি নি, শিল্প ব'লেই স্বীকার ক'রে নিয়েছি। প্রাণের আবেগ ছিল তাদের একমাত্র সম্বল, এ ছাড়া আর কোন সম্পদ ছিল না। মনে যে একাগ্র আবেগ জাগে তাকে নিয়ে যাহোক একটা কিছু করাই শিল্পের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের ভিতর কতটা ধ্বনিত হয়েছে, তার সত্যাসত্য তাঁর ছবিতেই চিত্রিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পকে সহসা আমরা গ্রহণ করতে রাজি হই নি। তাঁর শিল্পকে জাতে তোলা হবে কি না, এ নিয়ে বহু সংশয় বাকি রইল। নতুনকে মানুষ সচরাচর সন্দেহ ক'রে থাকে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু রবীন্দ্রশিল্প নতুন নয়, পুরানোও নয়; যে চিরন্তন প্রবৃত্তি মানুষের শিল্পপ্রেরণাকে সঞ্চালিত করে, এ শুধু সেই প্রাণবন্ত অনুভূতির সদ্যস্ফূট প্রকাশভঙ্গী, একটা নবযুগের আগমন-সংকেত। নিজের জীবনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পকে চরম পরিণতির পথে তুলে দিতে পারেন নি। তাঁর অসম্পূর্ণ শিল্পে যাত্রার নির্দেশ এসেছে, পৌঁছনোর আদেশ আসে নি। এ শিল্প, খান থেকে সবে-পাওয়া রুদ্ধজ্যোতি হীরকখণ্ড, শুধু কেটে-কুটে তার স্বরূপকে চিনে নিতে বাকি। মহৎ শিল্পের সমস্ত প্রকরণ তাঁর মধ্যে পুঞ্জীভূত রয়েছে, নেই শুধু অঙ্কণের নিপুণতা। যে নিপুণতা রবীন্দ্রনাথ বার্ধক্যের বাধায় সম্ভব ক'রে তুলতে পারেন নি, ভবিষ্যতের শিল্পীরা সেই অপূর্ণতাকে পূর্ণ ক'রে নেবে। শিল্পকলায় যে পৌরুষ দান ক'রে অকারণ কোমলতা ও প্রতিমুহূর্তের ভঙ্গুরতা থেকে জাতীয় শিল্পকে উদ্ধারের পথ দেখিয়ে গেলেন, তাঁর সে কীর্তি যত সামান্যই হউক, একদা তিনি চিত্রকর অবনীন্দ্র-নন্দলালের সঙ্গে জাতীয় শিল্পী ব'লে স্বীকৃত হবেন। শিল্পজগতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব আকস্মিক নয়, তাঁকে আমাদের প্রয়োজন ছিল। ইজ্‌মের বাহ্যিক মোহ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, এবার শিল্পীরা চাইছে সহজ হতে।

শ্রীসুনীলকুমার পাল

পূরবী

এবার সময় হ'ল,—পৃথিবীর রাত্রি-মেয়ের
শীতল হাওয়ায় স্নান শেষ হ'ল,—ছড়াল আঁধার
নিবিড় চুলের রাশি—তরলিত ঢেউয়ের চূড়ায়
গিরিগুহা পাদমূলে, ক্রমে ক্রমে তরুর শিখরে।
উড়ে-চলা পাখীসম দুটি ভুরু আকাশসীমায়
একটি চাঁদের টিপে—লাল টিপে—হ'ল সুশোভন,...
এখন তারার দেশে পৃথিবীর গানেরা উধাও—
কাছে ব'সে এ সময়ে একটি সুখের গান গাও।—

একটি সুখের গান......গাওয়া সে কি এতই কঠিন ?
কঠিন যদিবা হয় পৃথিবীর দিনের আলোয়,
আমরা এখন আছি রজনীর নিবিড় প্রহরে,
যে সময়ে প্রাণায়ন চুপি চুপি বন্ধ্যা ধুলোয়।
আঁধারে একটু আরো কাছে এসে সহজে শোনাও—
একটি সুখের গান,—হৃদয়ের অকুল আশার
একটি মধুর সুর অকারণ এ ভালবাসার,...
দিনের জগতে যদি কাছে এসে দূরে চ'লে যাও—
দিনের গ্রন্থি যদি বাঁধে ভুরি কাঁদা ও হাসার,
রাতের মৃদুল সুরে একটি সুখের গান গাও।

২

এমন ব্যথিত মনে যাবার সময় যদি হ'ল,
তোমার জীবন থেকে একটি সুখের কথা ব'লো।...
যে কথা ছড়ায় জোরে আকাশের লালে ও সবুজে,
যে কথা পাতার সুরে পাখীরাও শোনে চোখ বুজে,
যে কথা নানান রঙে লেখা থাকে ফুলেদের বুকে,
শিশির-ছোঁয়ায় যার ঘাসেরাও গদগদ সুখে।...
বেদনায় মেঘে মেঘে হ'ল যদি আকাশ ঘোরালো,
তোমার জীবন থেকে একটি সুখের দীপ জ্বালো।

তোমার সুখের কথা সমুন্নত ভ্রূযুগের তলে
নীল-বহ্নির মত জ্বলে যেন নয়ন-যুগলে…
আমি শুধু পড়ি তাই বিমুগ্ধ এ হৃদয়-লিখায়,
প্রাণের প্রদীপ যদি ছুঁয়ে যাও জ্বলবে শিখায়।…
জ্বলবে শিখায় দেহ বৈদেহী সে কামনা সীতার,
প্রাণ-রসায়ন হবে অকারণ মরণভীতার,
নব-জন্মের কথা সুর পাবে নতুন গানের,
প্রতিদান ফিরে পাব ভুলে-যাওয়া হৃদয়-দানের।…
এমন ব্যথিত হয়ে যাবার সময় যদি এল
তোমার জীবন থেকে একটি সুখের দীপ জ্বেলো।

উমা দেবী

হুঁশিয়ার

অসহায়-বুকে সঙিন-খোঁচার রক্ত-ফিনিকে আকাশ লাল,
সন্ধ্যা-আকাশে আগুন লেগেছে বুঝি!
প্রলয়-ছন্দে গভীর মন্দ্রে ধরণীর বুকে রুদ্রতাল
হারানো দীপক-রাগিণী ফিরিছে খুঁজি।
স্নেহহারা আর গেহহারা আর ঠাঁইহারা যত পথিক দল
বৈতালিকের নব সুর-সন্ধানী
অমাবস্যায় কোজাগরী গায়!—প্লাবনের সোনা জোয়ার-জল
ক্ষীরসমুদ্রে গরল মিশায় আনি।
কুবেরের সুখশয়নেতে সুখস্বপ্নাকাশের আলোক ঢাকি
দুঃস্বপনের গরুড় মেলেছে পাখা,
নাচের আসরে তাল কেটে কাঁদে সুধাপায়ী যত স্বর্গ-সাকী,
পিছল মঞ্চ নরের রক্ত-মাখা!
সঙ্কট নয়—নব সংকেত;—প্রলয়ের মেঘে ঝিলিক হানে,
মানুষ-শিকারী! হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার!
বিদ্যুৎ নয়—চিতাগ্নি তব;—আপন গোপন মৃত্যুবাণে
মরণ-শয়ন রচিছ চমৎকার!

শ্রীসুবোধ রায়

চিন্তাধারা

শোকাবহ ঘটনাও তার বেদনা হারিয়ে ফেলে যদি আমরা আর্টের সত্যভূমি হতে তাকে কৃত্রিম অভিনয়ের ভূমিতে নামিয়ে আনি। আবার যাকে আমরা অতি তুচ্ছ ঘটনা ব'লে মনে করি, যার মধ্যে আমরা জীবন-রহস্যের কোনরূপই দেখতে পাই না, তার মধ্যেও বিরাট ট্র্যাজেডির রূপ ফুটে ওঠে চক্ষুষ্মান আর্টিষ্টের কাছে।

* * *

রাজনীতি এক অদ্ভুত ব্যাপার, সকল হিসাবের বাইরে। নইলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সোভিয়েট রাশিয়াকে ঠেকাইবার জন্য জার্মানিকে বাড়িতে দিয়া এখন জার্মানির সঙ্গে লড়িতেছে সোভিয়েট রাশিয়ার মিত্র হয়ে! রাশিয়া ছিল সকল পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের অধীশ্বরদের নিকট অপাংক্তেয়, এখন সেই রাশিয়াই তাহাদের পরম মিত্র। এদিকে চীনে সোভিয়েট প্রাদুর্ভাব আটকাবার জন্য সকল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি জাপানকে লেলাইয়া দিল চীনের দিকে, এখন চীনই হইল তাহাদের মিত্রপক্ষ, জাপান হইল শত্রু। এ কি কূটনীতির কুটিল গতি, না ভাগ্যের পরিহাস!

* * *

শিক্ষা বলতে আমা ঠিক কি বুঝি? শিক্ষা কত রকমের হতে পারে? বৃত্তি বা জীবিকা উপায়ের জন্য শিক্ষা। জ্ঞানলাভ বা বিভিন্ন তথ্য সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্য শিক্ষা। সামাজিক ও পারিবারিক জীবন সুখ সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে যাপনের জন্য শিক্ষা, তার জন্য স্কুল কলেজের পুঁথিগত বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। আবার পুঁথিগত বিদ্যালাভ ক'রেও আমাদের যুবকেরা সুখ ও স্বাস্থ্যের জীবন যাপনের art and science কিছুই জানে না। পরিবারে ও সমাজে তারা misfit. This is the greatest drawback or tragedy of our present education বর্তমানকালে social ideal ও political ideal এর সংঘর্ষ শিক্ষার অর্থ ও শিক্ষার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবি উপস্থিত করেছে।

* * *

মোহ ও মায়াগ্রস্ত জীব বলিয়াই আমাদের জীবনে ধর্মের প্রয়োজন এত বেশি। আদিম যুগে মানুষ প্রকৃতির কাছে পরাস্ত হইয়া বাত্যায় বিধ্বস্ত, অগ্নিতে দগ্ধ, সূর্য দ্বারা তাপিত হইয়া সর্বত্র করজোড়ে মাথা নত করিত। মৃত্যুভয়, রিপুর তাড়না, অভাবের জ্বালা সর্বাপেক্ষা বেশি বলিয়া আমরা বাসনা হইতে, মৃত্যুভয় হইতে মুক্তি চাই, বাসনা পূরণ করিতে চাই ভগবানের হাত ধরিয়া, তাঁহার খোশামুদি করিয়া। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শিশু সংস্কারমুক্ত, মোহ ও মায়াহীন। Mamma what is fear, জিজ্ঞাসা

করিতে পারে, তাই তাহাদের ভগবানের দরকার হয় না। তাহারা সহজমুক্ত, সহজবীর। ধর্ম করিয়াও আমরা ক্লীব, ভীরু, মৃত্যুভয়ভীত। আমাদের মত ধার্মিক না হইয়াও, গুরুজী ও স্বামীজী আশ্রয় না করিয়াও উহারা মায়া-মোহ-ভয়-ভাবনাহীন কর্মী। জীবনকে ইহারা সত্যই পদ্মপত্রে জলের মত গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। ভোগের সময় বীরের মত, ক্ষত্রিয়ের মত ভোগ করে, মৃত্যুর ডাক আসিলে অকাতরে ঝাঁপাইয়া পড়ে, বাঁচিবে কি মরিবে ফিরিয়া দেখে না। অথচ তাহার জন্য চিরজীবন ভীরুতা, নীচতা, লাভ ঢাকিবার ব্যর্থ চেষ্টায় গুরুজী স্বামীজী ও মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্রয় তাহাদের লইতে হয় না।

* * *

ঈর্ষা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার জ্বালা ও দহন হইতে যদি আমাদের মুক্তি না থাকে, তবে জ্ঞাতি প্রতিবেশী ও স্বজাতির বিরুদ্ধে তা পোষণ না করিয়া আমরা আমাদের প্রকৃত শত্রুর উপর তাহাদের পরিচালনা করিয়া দিব না কেন? পরাধীন জাতির লক্ষণই এই, সে স্বজাতির বা আপন জনের সামান্য উন্নতিতে জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু দেশের পরাধীনতার গ্লানি, অপমান, দারিদ্র্য তাহাকে স্পর্শ করে না। এই অপমান ও গ্লানির মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াই সে উচ্ছিষ্টের জন্য কাড়াকাড়ি করে, এবং তাই লইয়া প্রতিবেশীর নিকট জয়ের গৌরব করে ও পরাজয়ের প্রতিহিংসা লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু এই অপমানবোধ, এই পরাজয়ের প্রতিহিংসা-পরায়ণতার জ্বালা যদি আমরা প্রকৃত শত্রু সম্বন্ধে অনুভব করিতে পারিতাম, তবে আর আমাদের এ দুরবস্থা হয় না।

* * *

সেদিন বর্ষার একটানা বারিপাতের ভিজা আবহাওয়ার মধ্যে মনের ভিতরেও যখন একটা গুমট ও বৈরাগ্য বাসা বাঁধিয়া বসিয়াছে, এবং কি যে চাই এবং কি যে করি কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না, অথচ কি যেন একটা অতৃপ্ত বাসনার তীক্ষ্ণ ছুরিকা মনের কোন কোণে কেবলই খোঁচাইতেছে, এমনই সময় দুই বন্ধু আসিয়া হাজির।

প্রথম সম্ভাষণাদির পর এক বন্ধু প্রশ্ন করিলেন, পিতামাতার প্রতি সন্তানের কোন কর্তব্য আছে কি না? এ সম্বন্ধে তোমার মত আমরা জানতে চাই। গৃহে গৃহে আমাদের ছেলেরা আজ আমাদের প্রতি ও স্ব স্ব গৃহের প্রতি যে প্রকার দায়িত্বহীন আচরণ করছে, যে প্রকার অবিবেচনা এমন কি নির্মমতা দেখাচ্ছে, তার অধিকার তারা কোথায় পাচ্ছে? তারা পরের বাগানের মাটি কোপাতে পারে, বন্ধুবান্ধবীদের ফরমাশ খাটবার জন্য সারাদিন রোদে জলে ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু বাড়িতে অসুস্থ পিতামাতার দিক তাকিয়ে দেখবার অবসরটুকুও তাদের হয় না। কিন্তু তাই ব'লে পিতামাতার ওপর তাদের আর্থিক দাবি বিন্দুমাত্রও শিথিল করতে প্রস্তুত নয়। এ দাবি পূরণ করতে

তাদের পিতামাতা বাধ্য। কিন্তু তার বিনিময়ে তাদের পক্ষ থেকে তাদের কিছুই করণীয় নাই। এই যে মনোবৃত্তি আজ এক দল তরুণের মনে অগোচরে বাসা বেঁধেছে, এর মূল কোথায়?

আপনাদের প্রশ্নের গোড়ার কথা হচ্ছে, সামাজিক জীবনে, এমন কি পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের মধ্যেও reciprocity থাকাই হ'ল রীতি ও ধর্ম। এক দিকে অধিকার বা right থাকলেও অন্য দিকে একটা কর্তব্য বা obligation থাকা চাই। সন্তানকে যখন আমরা ভরণপোষণ ক'রে মানুষ ক'রে তুলছি, তখন তার বিনিময়ে আমরা তার কাছ থেকে সেবা ও সাহায্য পাবার অধিকারী। আর ছেলেরাও যখন আমাদের কাছে সব কিছু পেয়েছে, তখন তাদেরও কর্তব্য প্রতিদানে সাধ্যমত পিতা ও মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ও তাদের সেবাযত্ন করা। এই তো হ'ল পিতামাতার দাবির গোড়ার কথা। কিন্তু তারও একটা উত্তর আজ উপস্থিত হয়েছে—এই উত্তর কেউ চিন্তা ক'রে তৈরি করে নি; সামাজিক বিবর্তনের মধ্য থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে অলক্ষ্যে এই জবাব কাজ করতে শুরু করেছে। জীবনের লক্ষ্যহীনতা, ব্যর্থতা আজ তরুণদের মনে এই নিরাশার প্রশ্ন তুলেছে, কি দরকার ছিল আমাদের এ জীবনে? কেন আমরা জন্মালাম? কেন আমাদের আনা হ'ল? এ দিক দিয়ে ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, ধার তারা করতে চায় নি, সুতরাং ধার শোধের দায়িত্বও তাদের নয়। আমরা নিজের ভিতরকার তাগিদে তাদের ধার দিয়েছি ব'লেই কি তাদের কাছে সে ধার আজ ফেরত চাইতে পারি?

* * *

পরাধীন জাতির হীনতা নীচতা শঠতার যেটুকু বাকি ছিল, এই যুদ্ধের আবহাওয়ায় তাহার ষোলো কলা পূর্ণ হইল। এমনই এদেশে জনসাধারণের নিকট সরকারী পেয়াদার পর্যন্ত কোনও কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজন নাই, তারপর যুদ্ধের কল্যাণে শাসনের নামে গণতন্ত্রের শেষ pretention-এর পর্দাটুকু আজ সম্মুখ হইতে সরিয়া গিয়াছে। স্বৈরাচারের যে দুর্দমনীয় স্বভাব আজ অভ্যাসে পরিণত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল, সাধ্য কি ইহার ধাক্কা হইতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বৎসর পরেও আমরা মুক্তিলাভ করি!

* * *

Inscrutable are the ways of Providence—বিধাতাপুরুষের কার্য-প্রণালী বা কর্মপন্থা দুর্বোধ্য, দুজ্ঞেয়, দুরধিগম্য (দুষ্প্রবেশ্য) ইহা বহুদিনের পুরাতন প্রচলিত কথা। ইহাকেই আমরা অন্যভাবে বিধাতার লীলা বলিয়া থাকি। এই লীলা যদিও আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য, তথাপি ইহার মূলে একটি বড় সূত্র বা নিয়ম কাজ করিতেছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, আলো ও ছায়ার মত

ভাল মন্দ এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে মিশিয়া আছে যে, মানুষ নানারকম ফন্দি-ফিকির করিয়াও অন্ধকারকে বাদ দিয়া শুধু আলোটুকু গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিলেও তাহারই ফাঁকে ঠিক আঁধারও আপন স্থানটুকু কাড়িয়া লইয়াছে। সারটুকু খাইয়া খোসাটুকু অপরকে দিবার ব্যবস্থা করিলেও অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হইয়া সবটুকুর মমতা পরিত্যাগ করিয়া খোসার ঔষধ বাধ্য হইয়া খাইতে হইতেছে।

* * *

Pure reason and rationalism এর উপর সমাজ ও রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠা করার অর্থ শুধু brain-কে স্বীকার করিয়া heart কে অস্বীকার করা। Evolution-কে কোনই স্থান না দেওয়া। তাহা কি সম্ভব, না স্বাভাবিক? French Revolution-এ এ চেষ্টা হইয়াছিল? কিন্তু পরিণামে তাহা কি দাঁড়াইল? Russian Revolution or Communism কি শেষ পর্যন্ত তার লক্ষ্য ঠিক রাখিতে পারিবে? তাহার বিঘোষিত নীতি অনুসরণ ও কার্যে পরিণত করিতে পারিবে?

* * *

সভ্যতাকে কে প্রবর্দ্ধিত করেছে? ধর্ম, তরবারি—না কে?

* * *

আমরা ছোকরাদের বুঝি না, ওরা আমাদের বোঝে না। রাগ করি, কিন্তু তলিয়ে কারণ খুঁজলে আমরা যে Feudalism-এ মানুষ, তা ওরা দেখে নি। পুত্র পিতা বা গুরুকে মানে না, মেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল, নিজ ইচ্ছায় বিয়ে করে, ছোকরারা অবোধ্য ভাষায় ও জঘন্য ভঙ্গীতে গল্প লেখে, আমরা রাগ করি। তারা বিস্মিত হয় সবটায়ই; অনেক মূর্খের যে একটা অকারণ মূর্খতার স্পর্ধা আছে, তা হয়তো নয়।

* * *

নিমন্ত্রণে ছুটিয়া যাইয়া আসন পরিগ্রহণ করা, ঠেলাঠেলি করিয়া উচ্চাসন গ্রহণ করা, রূঢ় ও অদ্ভুত আচরণ, ছোটবেলা হইতে ছোট কাজ অভ্যাস করিয়া জীবনসংগ্রামে ইহারা জয়ী হইতে চায়। আমাদের শিক্ষা ও আদর্শ ছিল অন্যরূপ। এখন এই আদর্শে ছোট ব্যাপারে যেমন পশ্চাতে থাকিতে হইবে, বড় ব্যাপারেও তাহাই। ইহা কি Survival of the fittest-এর নবতম রূপ?

* * *

What is democracy, Fascism, and Socialism? They do not represent merely certain well-defined social political and economic constitution and structure but certain different characters and types of men.

•

পৃথিবীর সব দেশ আজ জাতীয় পরিকল্পনায় ইহাই অর্থ করিতেছে যে, Food for all, clothing for all, education for all, free health service for all, old age unemployment, maternity, children's allowance for all, ইত্যাদির guarantee by the state. আমরা এই issue-টা আশ্চর্য রকমে avoid করিয়া যাইতেছি। ইহার কারণ কি? The people do not exist, they have no voice, and those who have voice—"we", who are we?

* * *

মানুষের Evolution-টা কোন দিকে যাইতেছে? Materialism-এর heartlessness-এর সঙ্গে India-র spiritualism-এর নিষ্কাম কর্মবাদের মধ্যে তফাত কোন্‌খানে এবং কতটুকু? দুঃখে ও সুখে যে ব্যক্তি সমভাবে অবিচলিত থাকে, রাগ-ভয়-ক্রোধ-বিরহিত যে, তাহার পক্ষে কোমল হৃদয়বৃত্তি পোষণ করিবার অবকাশ বা অধিকারই বা কোথায়? ভদ্রতা ও অভদ্রতা, শিষ্টাচার ও অশিষ্টাচার সকল রকম convention-এর তিনি ঊর্ধ্বে। হৃদয়বৃত্তিকে স্থান দিতে তিনি পারেন না। জ্ঞান-মার্গ বা ভক্তিমার্গ এই দুই পথের যদি এই একই ফল হয়, তবে এই যুগে জ্ঞানমার্গেই মানুষ অগ্রসর হইতেছে। এই জ্ঞান বা বিজ্ঞানমার্গ কোন্ পথ নির্দেশ করে? আত্মরক্ষার পথ? এই আত্মরক্ষার পথে ভক্তি বা আধ্যাত্মতত্ত্বের স্থান নাই—স্থান আছে শুধু বিজ্ঞান ও যুক্তির (Logic-এর) ইহার মধ্যে কোন social convention বা sentiment-এর স্থান নাই।

কিন্তু বিশ্বব্যাপী লড়াই হইতে হৃদয়বৃত্তির অভাব হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন তো পাইতেছি না! সত্য, উহা উচ্চমনোবৃত্তি নহে, অত্যন্ত জঘন্য হৃদয়বৃত্তি—যে হৃদয়বৃত্তি, ঘৃণা, হিংসা দল বাঁধিয়া হত্যার কামনাকে উজ্জীবিত ও উত্তেজিত করে। কিন্তু হৃদয়বৃত্তি তো বটে! উহাও কি যুক্তির বা বিজ্ঞানেরই নির্বিকার অভিব্যক্তি বা বিকাশ? না, উহা বিকাশ নহে, বিকার! সেইজন্যই কম্যুনিজ্‌মের দাওয়াই দরকার।

* * *

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মের আদর্শ মানব-সমাজের জন্য প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সংসারে থাকিয়া তাহা সাধন করিবার ক্ষেত্র নির্দেশ করিতে পারেন নাই। Communism, private property বিলোপ করিয়া মানুষের চিত্তকে বিত্তহীন করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত ভাবাদর্শে আমরা এতকাল চেষ্টা করিয়া কয়জন পৌঁছিতে পারিয়াছি? ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির বিলোপ-সাধনের প্রস্তাব করিয়া সমাজতন্ত্রীরা যদি

নিষ্কাম কর্মসাধনার সিদ্ধিলাভের সেই সহজ পথটি নির্দেশ করিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদের ক্ষুণ্ণ না হইয়া উল্লসিত হইবার কথা, তা ছাড়া আধুনিক জগতে ভাব-প্রধান সদ্‌গুণবিশিষ্ট……

* * *

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বাধীনতা ও গোপনীয়তা এই যুদ্ধে উৎপাটিত ও উন্মোচিত হইয়াছে সর্বাঙ্গীণভাবে, তারপর যেটুকু গোপনীয়তা ও স্বাধীনতা ছিল তাহাও তো গেল।

* * *

সুখদুঃখময় কিংবা আনন্দ ও বিষাদময় সত্যকে রসমণ্ডিত করিয়া দেখিতে পারেন সত্যদ্রষ্টা কবি। বৈজ্ঞানিক তাহাকে দেখেন ঘাঁটাঘাঁটি কাটাছেঁড়া করিয়া তাহার নিরেট স্বরূপকে। কবি তাহাকে আবিষ্কার করেন নিশ্চেষ্ট আনন্দের ভিতর দিয়া ও প্রকাশ করেন বাক্‌বিভূতি, ছন্দঝংকার, ও সুরসঙ্গীতের দ্বারা। বৈজ্ঞানিক তাকে আবিষ্কার করেন শ্রমসাধ্য তথ্য সংগ্রহ ও তাহার নিপুণ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা। দুইজনই সত্যদ্রষ্টা, কিন্তু একজন ইহাকে রসে উত্তীর্ণ করিয়া দেখেন ও প্রকাশ করেন, অপরে তাহা বড় একটা করেন না।…

সত্যকে রসমণ্ডিত করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার লোকের অভাব নিগুর্ণ মনুষ্য-সমাজে হইবে না। কবি দেখেন spirit world-এর সত্য। বৈজ্ঞানিক দেখেন matter world-এর সত্য। কবি দেখেন সমগ্রকে একত্র করিয়া, বৈজ্ঞানিক খণ্ড খণ্ড করিয়া। আনন্দ ও কল্পনা দুই প্রকার দর্শনেই প্রয়োজন হয়।…

গীতার শ্রীকৃষ্ণ মার্কসের পূর্বগামী হিসাবে revolution-এ বিশ্বাসী ছিলেন। সেইজন্যই জ্ঞাতিহত্যা ও নরহত্যার যুদ্ধে প্রবোচিত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। Sree Krishna in one sense was the greatest revolutionary of the world though he put a spiritual garb on the whole thing and Marx put a materialistic cover. But in ultimate analysis both live together and intertwine or interpenetrate each other.

* * *

মেয়েদের লইয়া মত্ত হইয়া মদ খাইয়া ধূমপান করিয়া নাচিয়া উড়িয়া ছুটাছুটি করিয়া অপরকে মারিয়া পরের রাজ্য অপহরণ ও লুণ্ঠন করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়ের নেশায় মাতিয়া অকস্মাৎ মরণকে ভয়ঙ্কররূপে বরণ করা পাশ্চাত্য সভ্যতা এক দিকে আর অন্য দিকে আমরা? শেষ পর্যন্ত কে বাঁচিবে ও জিতিবে?

Gandhiji still represents Indian Politics and freedom idea through truth and spirituality which is as poles asunder from western ideal. India stands absolutely alone in her peculiar and magnificent stand. World is divided into two opposite forces. India alone represents one side. The rest represents the other side. What will be the ultimate decision—is the question to be answered.

* * *

সুখ আছে বলিয়াই দুঃখানুভূতি আছে। যদি সুখের মুখ জীবনে কেহ না দেখিয়া থাকে, তবে দুঃখ কি জিনিস সে বুঝিবে কি? জীবন তখন একটা সুখ-দুঃখের অতীত নির্জীব শূন্যতায় ভরিয়া যাইবে, পশুপক্ষী প্রাণীর যে চেতনা ও জ্ঞান আছে তাহা হইতেও সেই মনুষ্য বঞ্চিত হইবে। তাই আজ আমরা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোককে যে প্রত্যহ নীরবে অনাহারে গৃহহীন, বস্ত্রহীন, আবরণহীন মৃত্যুর দিকে প্রিয়তম আত্মজনের হাত ধরিয়া নীরবে অগ্রসর হইতে দেখিতেছি, তাহার পশ্চাতে বঞ্চিত জীবনের মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়াবহ অনুভূতিহীনতাই দায়ী নহে?

* * *

সুখে দুঃখে, বিরহে মিলনে, আলো আঁধারে মিলাইয়া ভগবান এমন এক অদ্ভুত জগৎ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন যে, আমি একটা লইব, আর একটা লইব না; একটি গ্রহণ করিব, অপরটি বর্জন করিব, তাহা হইবার উপায় নাই। দুইটিকেই গ্রহণ করিতে হইবে। Life Insurance Company's different Schemes. তবে দুইটিকে বাদ দিয়া যদি অতীন্দ্রিয় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া সুখদুঃখের অতীত হইতে পার, তবে তাহাকে আর মনুষ্য জীবন বলিব না। কেহ বলিবে "মুক্ত পুরুষ", আমি বলিব "জীবন্মৃত", মৃত্যুর সামিলই হইবে তাহা। যদিও ভক্ত ও তাপসরা ইহাকেই বলিবেন, চির বা নিত্য আনন্দের অবস্থা।

* * *

ইংলণ্ড হইয়াছে বিষয়ক্ষেত্রে চিরপ্রবীণ। ইহার মধ্যে তরুণের স্বপ্ন, আকাশ-স্পর্শী স্পর্ধা কিছুই বাহিরে দেখিতে পাইবে না।

* * *

God giveth food to the birds, but throweth it not to their nests.

অনাথগোপাল সেন

অণিমা

অণিমা, তোমার গভীর সে চোখ-চাওয়া
আজকের দিনে মনে পড়ে বার বার,
সাগর-দেশের অতল সে বুক থেকে
এসেছিলে তুমি কোন্ সে অজানা দিনে !
অণিমা, তোমার দৃষ্টির মায়া
মনে পড়ে বার বার ।

বিদ্যাসাগর-কলেজের সেই ক্ষীণ-পরিসর ঘরে
তোমার সে ছবি—হঠাৎ-জাগাল
ভাল-লাগা এক ক্ষণ ।
কলেজে তোমায় চিনত সবাই,
আমি তো দেখেছি শুধু—
কলেজের সেই ভাল-লাগা দিনে
তোমারে দেখেছি আমি ।

অণিমা, তোমার চোখে কেন ভাসে
অকারণ-জাগা মায়া ?
তুমি যেন আছ ছন্দের মাঝে
আচম্বিতের যতি ।
বিংশ শতকে দেখেছি তোমায়,
তবু মানি বিস্ময় ।

অণিমা, তোমারে মনে পড়ে বার বার ।
তোমার হাসিটি কি জানি কেমন,
ভাষা তার নাহি জানি,
তবু সে যে আনে আভাস কিসের যেন,
তোমার হাসিটি দোলা দেয় অকারণ !

অণিমা, তোমায় দেখেছি যখন ভিড়ে,
তোমার সে চোখে কিসের রুক্ষ ছায়া!
হাসিটি তোমার ধারালো ছুরির রেখা।
সেদিন ভেবেছি মনে—
সাগর-দেশের সাগরিকা মেয়ে
মরুপথে থেমে আছে।

আনমনা ব'সে ভেবেছ যখন
দেখেছি তোমারে আমি,
চিন্তার ছায়া ঘনায়েছে দুই চোখে—
শতাব্দীর এ অন্ধ জীবন যেন
ফুটিয়া উঠেছে তোমার দৃষ্টিপথে।
ক্লান্তি তোমায় নিবারে দু হাত দিয়ে,
শ্রান্তি তোমারে বাধা দেয় পথমাঝে,
চেয়েছ শুধুই বিদ্রূপভরা চোখে,
বিংশ শতক থেমে গেছে বিস্ময়ে।

রাত হয়ে এল চেয়ে কি দেখেছ তুমি?
মেঘলা আঁধার নিঝুম নিষুতি রাত—
অণিমা তোমার পথ যে দীর্ঘতর
হতেছে শুধুই—
দেখ নি কি তুমি চেয়ে?
"পথ জনহীন আধারে বিলীন"
বাজে জীবনের সকরুণ বীণ—
শোন নি কি কান পেতে?

অণিমা, তোমার চোখে ফুটে ওঠে
অজানিত কোন্ ছায়া—
দৃষ্টি তোমার নিবদ্ধ দূরপানে!

শ্রীআরতি রায়

বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট

যুগের তাড়া—তাড়ার যুগ

এ যুগে জন্মগ্রহণ করাটাই বোধ হয় আমার ভুল হয়ে গেছে, কারণ কিছুতেই আমি সামলে উঠতে পারছি না। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে শুনলুম, সবাই বলছেন যে, যুগ এগিয়ে চলেছে আর আমি থপথপ ক'রে কচ্ছপের মত চলেছি ব'লেই আমার নাকি আর ঝঞ্ঝাটের শেষ নেই! দোষ যুগের নয়, আমার। এ যুগ ঘোড়দৌড়ের যুগ, যারাই লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে ছুটছে, তাদেরই শেষ পর্যন্ত জিত।

আচ্ছা, আর কত ছুটব বলতে পারেন? জীবন-যাত্রা কায়ক্লেশে চালাবার জন্যে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তো দৌড়-ঝাঁপের অন্ত নেই, এর ওপরও গতি বাড়াতে গেলে তো গেছি। ধীরে-সুস্থে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে চলা কি একেবারে সংসার থেকে উঠে গেল?

দেখছি, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে তাই। মানে আমি যদি একটু ধীরে-সুস্থে চলতে চাই, অমনই দেখি আমার আশপাশের লোকেরা তার চার গুণ জোরে চলতে শুরু করেছে।

বাজারে এক টাকা পাঁচ সিকে ক'রে কুচ্‌চিংড়ির সের হাঁকলে। টেনে-বুনে প্রায় চোদ্দ আনায় নামিয়ে এনেছি, হঠাৎ এক বাবু দৌড়ে এসে পাঁচ সিকে ক'রেই সের পাঁচেক চিংড়ি নিয়ে চ'লে গেলেন। থলি হাতে আমি ভ্যাবাগঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে, মেছোর মেজাজ গেল বেঁকে, ফের দর করতে যেতেই সে খিঁচিয়ে ব'লে উঠল, বউনির সময় বেশি বকবেন না, বারোটা আন্দাজ আসবেন, যদি কিছু থাকে চোদ্দ আনায় দোব 'খন।

বুঝলুম, পয়সার দৌড় না থাকলে সাত-সকালে দৌড়ে এসেও বাজার করা চলে না।

রেশনের দোকান সাড়ে আটটায় খোলে, আমি এক ঘণ্টা আগে বেরিয়ে প'ড়ে ভাবলুম যে, আমিই বোধ হয় লাইনের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াব—ও হরি, সেখানে গিয়ে তো আমার চক্ষুস্থির! আমার আগে একান্নজন দাঁড়িয়ে, তার মধ্যে আবার কেউ কেউ দাঁতন করছেন। আমায় হন্তদন্ত হয়ে সেখানে হাজির হতে দেখেই, সবাই একটু ট্যারাভাবে দেখে নিয়ে মুখ টিপে হেসে উঠলেন। শুনলুম, সর্বাগ্রের ব্যক্তিটি ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে সেখানে খাড়া আছেন। তবু আপনারা বলেন যে, বাঙালীর ধৈর্য নেই, সাধনা নেই। হুঁঃ!

ট্রেনে চেপে বিদেশ যাব, গাড়ির সময়ের দু-ঘণ্টা আগে গিয়ে প্ল্যাটফরমের দরজায় দাঁড়িয়ে রইলুম। যখন ষ্টেশনে গাড়িটি ঢুকল, তখন তার ভেতর ঢোকে কার বাবার সাধ্যি! গাড়ি ভর্তি! শুনলুম, এঁরা নাকি কৌশলে কি রকম তাকতুক ক'রে লাইনের মধ্যিখানে গিয়ে আগে থেকে উঠে ব'সে আছেন। আমার আর অগত্যা যাওয়া হ'ল না।

ছুটির দিনে ভাবলুম একটু বায়োস্কোপে যাব, দিন তিনেক আগে টিকিট কিনে রাখি, কিন্তু সে সৌভাগ্য হ'ল না। শুনলুম, আমি যাবার আগে ভাল ভাল সিটগুলো টিকিট-বাবুদের ভাবের লোকেদের কাছে পাচার হয়ে গেছে, আসল দিনে দশ আনার টিকিট পাঁচ সিকে দিয়ে কেনা যেতে পারে।

দেখলুম, এত লোকের সঙ্গে সত্যিই পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। দুঃখের কথা বলব কি মশাই, একটি বিদিকিচ্ছিরি-গোছের মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে কি রকম একটু সহানুভূতি জেগে উঠল, ভাবলুম, আহা, বেচারীর যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয়, কেউ এর ব্যথা হয়তো বোঝে নি, কারুর নজরেও পড়ে নি; কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলুম, আমার আগে তার দুঃখে ব্যথিত হয়ে একুশজন ইতিমধ্যে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছে, জন-পাঁচেক আফিং খেয়ে হাসপাতালে শুষছে।

সবাই যে এত তাড়াতাড়ি সমস্ত কাজ কি ক'রে চুকিয়ে-বুকিয়ে ফেলছে, এ একটা আশ্চর্য ব্যাপার! তাই ঘরে বাইরে আমারও তাড়া খেতে খেতে প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম। বন্ধুবান্ধবের কাছে দুঃখ নিবেদন করতে গেলুম, তাঁরা ব'লে উঠলেন, কি করবে বল, এ যুগ তাড়ার যুগ, মেড়ার মত প'ড়ে থাকলে চোট খাবে বইকি।

সেটা কি আর আমিও মর্মে মর্মে বুঝছি না? তা না হ'লে দেখুন না, ছেলেপুলেদের এ বছরের পুরোনো কেতাব আর পরের বছরে চলে না। সব নতুন চাই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় মেয়েরা কাপড় বদলাচ্ছে, তা যোগানো চাই। কিন্তু কোত্থেকে এত করি?

এই তো সেদিন পুঁটির বিয়ের সময় কতকগুলো ছাপা সিল্কের শাড়ি এনে দিলুম, তার দু-মাস গেল না এসে বলে, ম্যাগো, ও কি আবার সব শাড়ি! এখন জর্জেট ছাড়া কোথাও কেউ বেরুতে পারে?

আচ্ছা বাবা, জর্জেটই হবে। কিছু পয়সা জমিয়ে ধারধোর ক'রে, বহু পাতালপুরী ঘুরে পূজোর সময় তাই কিনে নিয়ে এলুম মশাই, কিন্তু তার ফল হ'ল এই যে, তার শাশুড়ী ঠাকরুণ ক্ষীরমোহনের থালাটা উজোড় ক'রে নিয়ে ঝিয়ের মারফৎ কাপড়খানি ফেরত দিয়ে ব'লে পাঠালেন, মিন্সের কি চোখ নেই? আশপাশে পাঁচজন মেয়েছেলে কি প'রে বেড়াচ্ছে তাও কি দেখে নি? আজকাল বেনারসী ছাড়া কেউ কিছু পরে?

বুঝুন, মেয়েরা কে কি প'রে বেড়াচ্ছে আমি এখন তাই দেখে বেড়াই! তারপর ভাবছেন এতেও রক্ষে আছে? যখনই বেনারসী নিয়ে আসব, তখনই হয়তো শুনব এখন আকাশী রঙের হাসিখুশী শাড়ির রেওয়াজ হয়ে গেছে, তা ছাড়া আর কেউ কিছু পরছেই না।

বাড়িতে অবশ্য বেয়ান ঠাকরুণের কাপড় ফেরত পাঠানোটা কেউ সুচক্ষে দেখলেন না, কিন্তু তা হ'লেও মেয়েদের বৈঠকে ঠিক হয়ে গেল, আমার পছন্দটাই বড় সেকেলে।

মোদ্দা কথা, আমি ফ্যাশান জানি না, সেইটে হ'ল আমার এ যুগে সবচেয়ে বড় অপরাধ। গুষ্টিবর্গের রেশনের বন্দোবস্ত ক'রে আবার ফ্যাশান না জানলে আমি যে সংসারের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য, এটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। মানে, সবাই আমায় ঠেসান দিয়ে কথা শুনিয়ে যাবেন, আমি নির্বিকার বুদ্ধদেব হয়ে ব'সে থাকব, এই হ'লেই সংসারের ভাল হয় আর কি।

গিন্নী বলেন, সত্যি বাপু, তোমার ঠিক চোখ নেই।

এই পিত্তি-জ্বলুনি বচন শুনে আমিও চ'টে-ম'টে ব'লে উঠি, না, তা নেই, নাক আছে তো? একদিন তাই-বরাবর সিধে রাস্তা দেখে দু চোখ যেদিকে যায়, সেই দিকে বেরিয়ে পড়ব। দেখুন দেখি আপদ!

আজকের জিনিস কালকেই পুরোনো হয়ে গেল?—এ আবার কোন্ দিশি কথা! তা নয়, সব কিছুতে যে তাড়া। চলতে হবে তাড়াতাড়ি, ট্রামে উঠতে হবে পড়ি কি মরি ক'রে, মিটিঙে যেতে হবে দৌড়োদৌড়ি ক'রে, আসতে হবে হুড়োমুড়ি ক'রে লোকের পা মাড়িয়ে, নাড়ীভুঁড়ি ছিটকিয়ে দিয়ে, বন্ধুত্ব হবে দু মিনিটে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার সে বন্ধুত্ব জন্মের মত ঘোচাতে হবে, সব বিষয়ে মত প্রকাশ করতে পাঁচ সেকেণ্ডের বেশি দেরি হবে না, একখানা বড় বই পড়তে মিনিট পনেরোরও কম সময় লাগবে, চরকির মত একবার এখানে একবার ওখানে অকারণে পাক খেতে হবে, তা না হ'লে কেউ স্মার্ট বলবে না, আজ যা পোশাক-আসাক কেনা হ'ল তিন দিন পরেই তা বাতিল করতে হবে, তা না হ'লেই পেছিয়ে গেলেন, আর সংসারে আপনার দাম নেই। এ কি মুশকিল বলুন তো?

তার ফলে হচ্ছে কি, ছেলেদের আজ স্যাণ্ডেল কিনে দিলুম, কাল আনতে হবে গ্রেশিয়ান, পরশু নিউকাট, তরশু কাবলে। তা না হ'লে তাঁরা বাইরে হাঁটতে পারবেন না, পায়ের লজ্জায় মাথা কাটা পড়বে। কি ঝঞ্ঝাট ভেবে দেখুন!

মাঝে মাঝে যখন পেরে উঠি না, তখন ভাবি, চীৎকার ক'রে ব'লে উঠি, ওরে তোদের পায়ে কি আমি মাথা খুঁড়ে মরব?

কিন্তু তা বললেই কি তারা শুনবে ভাবছেন!—আমাকেই হয়তো মাড়িয়ে দিয়ে চ'লে যাবে।

ছেলেমেয়েদের কোন দিকে এখন দেখবার সময় কখন? সব যে ছুটছে। আমি এই বয়সে তাদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে কখনও যেতে পারি? অথচ ধীরে ধীরে আমাকেও তো যেতে হবে?

আপনারা হয়তো বলবেন, আহা, তোমার অত রাগ হচ্ছে কেন? কিন্তু এই সব কাণ্ডর পরও অনুরাগটা থাকবে কি ক'রে বলুন তো?

মশাই, এই বছর কয়েক আগে মাকড়ির চলন ছিল। তারপর ক্রমাগত দেখছি, ইকড়ি-মিকড়ি-চাম-চিকড়ি যে কত রকম-ফের হয়ে গেল, তা দেখে তো অবাক মেরে যেতে হয়।

কি ব্যাপার? না প্যাটার্ন বদলাচ্ছে। বাবকোসের মত কতকদিন কানচাপা মাকড়ি হ'ল। তারপরই দেখি, ও মশাই, তিন মাস পরে দুই কানে দুই শিকে ঝুলছে, তার দু মাস কাটতে না কাটতে দেখি, ইয়া গোল্লা চাকা আর তাতে গোটাকতক ডবল লাগানো। শুনলুম, ফ্যাশান! ভদ্রসমাজে নেমন্তন্নবাড়ি পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে তো? অতএব নাও—তুমি স্যাকরার বাণী দিয়ে মর! রোজ তো আর তোমায় সোনা কিনতে হচ্ছে না?

না, কিনতে তো কিছুই হচ্ছে না, কারণ আমি যে সবার কেনা গোলাম হয়ে আছি কিনা? আমি হাড়ভাজা হয়ে পয়সার যোগাড় করি, আর তোমরা দিনরাত প্যাটার্ন বদলাও! কিন্তু চাপে প'ড়ে আমার প্যাটার্নও যে বে-প্যাটার্ন হয়ে আসছে সে-দিকটা তো কেউ দেখছ না?

পুরোনো কোন জিনিস কি ধীরে-সুস্থে এখন একটু থিতুতে পারবে ভাবছেন? অবিরত এত বদল দেখে আমি তো ক্রমশ শঙ্কিত হয়ে উঠছি মশাই, ঝঞ্ঝাটের গোড়াই তো সেইখানে।

এ কি রে বাবা! আজকের জিনিস কালকেই ভাল লাগে না? আর্ধেক জায়গায় তাই শুনি, খবরের কাগজপত্রেও প্রায় দেখি, অধিকাংশ স্ত্রীর তাই স্বামী সহ্য হচ্ছে না, স্বামীদেরও কাছে দু-চারদিন পরেই স্ত্রীরা হয়ে উঠছেন অসহ্য, ফলে তালাক্ আইন পাস করাবার জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন—হয়তো তা হয়েও যাবে।

কিন্তু তাও দেখুন বরাত এমন যে, সেটা পাস হ'লেও আমার বা আমার গিন্নীর তাতে কোন কাজ হবে না। সেখানেও তো আমার দেরি হয়ে গেল।

গোপলা ম্যালেরিয়ায় পঞ্চত্ব পাবার পর কুইনিন আবিষ্কৃত হ'লে গোপলার মা যেমন স-খেদে বলেছিল, সেই কুইনিন বেরুল, তবু সেটা গোপলা বেঁচে থাকতে বেরুলি নি বাবা! আমার দশাও হ'ল তাই, বুঝছেন না!

সংসারে এসে তাড়া খেলুম, ঝঞ্ঝাট পোয়ালুম, কিন্তু তার সুফলটা আর ভোগ করতে পারলুম না, এই আর কি!

এইটেকেই তো শাস্ত্রে বলেছে কর্মফল আর আমরা বলছি ঝঞ্ঝাট!

শ্রীবিরূপাক্ষ

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

বাঙাল-মা এই বাড়িরই তেতলায় বাস করতেন। কাশীর ছোট-বড় সব বাঙালী মাত্রেই বাঙাল-মাকে চিনত, তিনিও প্রায় সকলেরই নাড়ীনক্ষত্র অবধি জানতেন। জয়া-গিন্নীর ঘর দুখানার পাশে তেতলায় ছোট্ট এক-খানা ঘর ছিল, তার পাশেই ছাত। এই ঘরখানা রাজকুমারী বাঙাল-মাকে বিনা ভাড়ায় থাকতে দিয়েছিল। জয়া-গিন্নী তাঁকে খেতে-পরতে দিত, তার বদলে তিনি তাদের রান্না করতেন, তার মেয়ের তদারক করতেন, মোট কথা, তার সমস্ত সংসারটাই তিনি দেখতেন। কোন্ রাত থাকতে উঠে একটা বড় বালতি নিয়ে তিনি গোবর সংগ্রহ করতে বেরুতেন। বেলা দশটার মধ্যে প্রায় মাইল পাঁচ-সাত ঘুরে তিন বালতি গোবর এনে উঠোনের এক কোণে জমা করতেন। দু-তিন দিন পরে পরে সেই গোবর ছাতে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘুঁটে দিতেন, জয়া-গিন্নীর ইন্ধনের খরচ লাগত না। আমরা দেখতুম, বাড়িসুদ্ধ লোক যখন যার প্রয়োজন, তাল তাল গোবর নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করছে, কিন্তু কোনদিন বাঙাল-মার মুখে এজন্যে একটু ক্ষীণ আপত্তিও শুনি নি। জয়া-গিন্নী তীর্থে যাবার আগে ঘর-দোর দেখবার ভার তাঁরই ওপর দিয়ে গিয়েছিল। এই ক-মাসের খরচও দিয়ে যেতে সে ভোলে নি।

বাঙাল-মা আমাদের ওপরে ডেকে নিয়ে গিয়ে জয়া-গিন্নীর ঘরে বসিয়ে বলতে লাগলেন, ও লোকগুলো ভাল নয়, সব নেশাখোর। আর ওই যে বদ্যিনাথ, যাকে ওরা ডাকতে গিয়েছিল, সে একটা সাংঘাতিক লোক। কত বউ-ঝির সর্বনাশ যে সে করেছে, কত যে মানুষ হত্যা করেছে, তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। সে লোকটা লক্ষ্মীমণির বোনপো হয়।

তার সঙ্গে ঝগড়া করতে বাঙাল-মা আমাদের পই-পই ক'রে বারণ ক'রে দিলেন।

আমরা নীচে নেমে এসে পরামর্শ করতে লাগলুম, কি করা যায়! কোথা থেকে যে কি হ'ল কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। কে বদ্যিনাথ? কোনও জন্মে তাকে চোখে পর্যন্ত দেখি নি, সে কেন আমাদের এত বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল? হায় ভগবান! দু-দিনের জন্যেও কি তুমি শান্তি দেবে না?

বক্তিনাথের বুড়ো আঙুলটা মুচড়ে দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু সে ছিল শক্তিশালী, আমি এক হাত দিয়ে তার আঙুলটা নাড়াতেও পারলুম না। শেষকালে উপায়ান্তর না দেখে তার বুড়ো আঙুলটা কামড়ে ধরলুম। সে অন্য হাত দিয়ে আমার মুখে ঘুষো মারতে আরম্ভ ক'রে দিলে, আমার নাক দিয়ে দরদর ক'রে রক্ত ছুটতে লাগল। বাঙাল-মা ও রসিয়ার মা তারস্বরে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে। আমি প্রাণপণ ক'রে আঙুল কামড়িয়েছি। তার মাংস কেটে দাঁত ব'সে যাচ্ছে বুঝতে পারছি, সংকল্প যে হাত না ছাড়লে ব্যাটাকে নির্ঘাত একলব্য ক'রে ছাড়ব, এমন সময় পরিতোষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার কোঁচাটা ধ'রে ফর্‌র্‌র্‌র্‌ ক'রে টেনে ধুতিখানা খুলে নিলে।

আচমকা অধমাঙ্গ বস্ত্রশূন্য হওয়ায় বক্তিনাথ মুহূর্তের জন্যে হকচকিয়ে গেল। চারদিকে মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে, তারা সবাই তাকে সাক্ষাৎ যমের মতন ভয় করে, তাদের সামনে এতবড় বেইজ্জত! সে চট ক'রে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে কাঁধ থেকে পাট-করা র‍্যাপারটা টেনে নিয়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পাট খুলে পরবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি আর কালবিলম্ব না ক'রে তার তলপেটে মারলুম এক লাথি। 'উ উ' আওয়াজ ক'রে একবার ঘুরপাক খেয়ে সে মাটিতে ব'সে পড়ল। আমি দৌড়ে গিয়ে কুয়োর ধারের লোটাখানা তুলে নিয়ে তার মাথা টিপ করছি, এমন সময় তড়াক ক'রে উঠে সে আমার দিকে দৌড়ে আসতে লাগল। লোটাটা ছুঁড়ি আর কি, ঠিক সেই সময় একটা বড় গোবরের তাল তার মুখের ওপর এসে পড়ল।

বক্তিনাথ যে ভাবে দুই চোখ পাকিয়ে হিংস্র জানোয়ারের মত মুখ হাঁ ক'রে দাঁত বের ক'রে আমার দিকে তেড়ে আসছিল, তাকে দেখে মনে হয়েছিল যে, লোটার আঘাতে যদি তাকে সাংঘাতিকভাবে কাবু না করতে পারি, তা হ'লে মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু জয় বাবা বিশ্বনাথ—যাঁর দয়ায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, অতি দুঃখের দিনেও সাড়ে তিন টাকা খরচ ক'রে সেদিন যাঁর পূজো দিয়েছি! তিনি যে বাঙাল-মার গোবর্ধনগিরির মধ্যে ইন্দ্রজিতের শক্তিশেল লুকিয়ে রেখেছিলেন, কে তা জানত! আর অব্যর্থ বন্ধু পরিতোষের সন্ধান!—বক্তিনাথের চক্ষু ও মুখগহ্বর পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

গোবরের তালটা পড়তেই বক্তিনাথ চোখের যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে দুই হাত চোখে দিয়ে বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরতে আরম্ভ ক'রে দিলে। পরিতোষ সেই তালে এক লাফে এগিয়ে গিয়ে তার কোমর থেকে র‍্যাপারটা টেনে নিয়ে একেবারে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিলে।

রসিয়ার মা, বাঙাল-মা ও বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেরা আর্তনাদ করতে লাগল। ইতিমধ্যে আমি একতাল গোবর বক্তিনাথের মুখে মারতেই সে চোখের যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে কবন্ধের মতন উঠোনময় দুই হাতে শূন্য আলিঙ্গন ক'রে ছুটোছুটি করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। রসিয়ার মায়ি কোথা থেকে একখানা গামছা এনে বক্তিনাথের হাতে দিতেই সে সেখানা কোমরে জড়িয়ে মাটিতে ব'সে পড়ল। ঠিক সেই সময় কমণ্ডলু-হস্তে রণক্ষেত্রে গুরুমার আবির্ভাব।

তখন উঠোনময় গোবরের ছড়াছড়ি, বক্তিনাথ চলতি বাংলায় চীৎকার ক'রে জানাচ্ছে যে, অচিরভবিষ্যতেই আমাদের স্থানবিশেষে আশ্রয় নিতে হবে। রসিয়ার মা, বাঙাল-মা ও বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটের দল সকলেই সশব্দে এই গজকচ্ছপের যুদ্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করছে, আমার নাক দিয়ে তখনও টপটপ ক'রে রক্ত পড়ছে।

গুরুমা শান্ত দৃষ্টিতে চারদিক দেখে কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কি ব্যাপার বক্তিনাথ?

বক্তিনাথ কোমরে গামছা জড়াতে জড়াতে দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, এ ছোঁড়া দুটো কে জিজ্ঞাসা করি?

গুরুমা তার কথার কোন জবাব না দিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, গোপাল, এ কি, তোমায় মেরেছে?

তারপর বক্তিনাথের দিকে ফিরে বললেন, কেন মেরেছ তুমি একে? তোমার কি ক্ষতি করেছে এ?

বক্তিনাথ এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে গুরুমাকে বলতে লাগল, তুমি কোথা থেকে এ ছোঁড়া দুটোকে নিয়ে এসে বাড়িতে রেখেছ, নিন্দেয় আমার পথ চলা দায় হয়েছে—

বক্তিনাথ আরও কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গুরুমা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, আমি ছোঁড়া ধরি কি বুড়ো ধরি, তাতে তোমারই বা কি আর তোমার বাবারই

বা কি? আমার যা খুশি আমি তাই করব, সেজন্যে কি তোমার কাছে জবাবদিহি হতে হবে?

আমাকে তো সমাজে বাস করতে হয়!

কে তোমাকে সমাজে বাস করতে বারণ করেছে? আমার সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কিসের? আমার মাকে তো তোমরা বেশ্যা বল, তার পয়সা আর তার বাড়ি ছেড়ে দাও তা হ'লে। বেশ্যার অন্ন খেয়ে সমাজে বাস করছ কি ক'রে জিজ্ঞাসা করি?

বদ্যিনাথ একেবারে চুপ।

গুরুমা বললেন, যাও, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। গুণ্ডামি ক'রো কাশীর রাস্তায়, এদের সঙ্গে গুণ্ডামি করতে এসে মজা বুঝতে পেরেছ তো? এরা জাত সাপের বাচ্চা।

বদ্যিনাথ সাপের মতন নিশ্বাস ছেড়ে বললে, আচ্ছা, কেমন জাত সাপের বাচ্চা আমিও বুঝে নেব—আমার নাম বদ্যিনাথ।

গুরুমা বললেন, যা বোঝবার এ বাড়ির বাইরে বুঝো, এখানে ঢুকে ফের যদি হাঙ্গামা কর তো বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব। জান তো আমাকে, আমার নাম লক্ষ্মীমণি।

গুরুমার কথার কোনও জবাব না দিয়ে গামছার এক খুঁট দিয়ে চোখ-মুখের গোবর পরিষ্কার করতে করতে বদ্যিনাথ বললে, আমার ধুতি, র‍্যাপার কোথায়?

রসিয়ার মা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, কুয়োর মধ্যে।

বদ্যিনাথ বোধ হয় সাংঘাতিক একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় রসিয়ার মা বললে, তুমি বাড়ি যাও, আমি তোমার ধুতি, গায়ের চাদর পৌঁছে দিয়ে আসব।

বদ্যিনাথ আর কোনও কথা না ব'লে দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল। দু কদম গিয়ে আবার ফিরে এসে আমাদের বললে, রাস্তায় বেরিও।

লোকটা চ'লে গেল। গুরুমা একবার চারদিক দেখে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, আমাদের সঙ্গে কোনও কথা বললেন না। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলুম, কমণ্ডলুটা যথাস্থানে রেখে নামাবলীখানা গা থেকে খুলে বিছানার ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপর দরজাটা বন্ধ ক'রে সশব্দে খিল লাগিয়ে দিলেন।

বাঙাল-মা ও বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেরা যে যার ঘরে ফিরে গেল। রসিয়ার মা উঠোন মুক্ত ক'রে কাঁটাওয়ালা ডেকে নিয়ে এসে বদ্যিনাথের ধুতি ও র‍্যাপার তুলে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে চ'লে গেল। আমরা স্নান ক'রে গোবর-মুক্ত হয়ে ঘরে এসে বসলুম। রসিয়ার মা বদ্যিনাথের বাড়ি থেকে ফিরে এসে উনুনে আগুন দিয়ে গুরুমার দোরগোড়ায় উনুন রেখে বাড়িতে নাইতে খেতে চ'লে গেল।

আমার নাক দিয়ে রক্ত-পড়া বন্ধ হয়ে গেল বটে, কিন্তু দেখতে দেখতে নাকটা ফুলে ঢোল হয়ে উঠল। বাড়িটা সেদিন অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় থমথম করতে লাগল। ভাড়াটেরা যে-যার রান্না-খাওয়া শেষ ক'রে ফেললে। উঠোনে আমাদের তোলা-উনুন জ্ব'লে জ্ব'লে নিবে গেল। আমরা দুজনে পাশাপাশি শুয়ে, কিন্তু কারুর মুখে কোনও কথা নেই। উত্তেজনার পর অবসাদে দুজনেরই শরীর ও মন ক্লান্তিতে অবসন্ন। অবশেষে দুজনেই পাশবালিশ জড়িয়ে শুয়ে পড়লুম।

রসিয়ার মার গলার আওয়াজে যখন ঘুম ভাঙল, তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ঘুম ভাঙতেই মনে হ'তে লাগল, যেন ভোর হয়ে গিয়েছে।

গুরু-মা তখনও দরজা খোলেন নি। ঘণ্টাখানেক ধ'রে ডাকাডাকি ক'রে কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

চৌকে গিয়ে দুজনে দু-ভাঁড় সিদ্ধি খাওয়া গেল। সারাদিন পেটে ভাত পড়ে নি। একটা খাবারের দোকান থেকে পুরি-কচৌড়ি খেয়ে বিশ্বনাথ দর্শন ক'রে ঘণ্টা-দুয়েক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে অবসাদটা কাটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন আটটা বেজে গিয়েছে।

গুরুমা তখনও দরজা খোলেন নি। দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা মারতে শুরু ক'রে দিলুম। চেঁচিয়ে বললুম, দরজা না খুললে কোতোয়ালকে খবর দেব, তারা এসে দরজা ভেঙে ফেলবে। কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দই পেলুম না, আমরা নিজেদের ঘরে গিয়ে অন্ধকারে ব'সে রইলুম, কারণ গুরুমার ঘরে তেল থাকে, তাই আমাদের ঘরে প্রদীপ জ্বলে নি।

রাত্রি ভোর হ'ল। রসিয়ার মার কাছে শুনলুম, গুরুমা নাকি শেষরাত্রির দিকে একবার মিনিট পাঁচেকের জন্যে দরজা খুলে বেরিয়েছিলেন। আমরা মুখ-টুখ ধুয়ে খানিকক্ষণ দরজা-ধাক্কাধাক্কি করলুম, কিন্তু ভেতর থেকে কোনও সাড়াই পেলুম না।

ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে দাঁড়াতে লাগল। কাল সারাদিন গুরুমা জলগ্রহণ করেন নি, আজও সারাদিন তেমনিই কাটল। সমস্তদিন ধ'রে দরজা-ধাক্কাধাক্কি ক'রে কোনও সাড়া না পেয়ে সন্ধ্যের সময় বেরিয়ে গিয়ে আমরা বাজার থেকে খাবার খেয়ে এলুম। সেদিন পরিতোষ বললে, যাবার সময় জয়া-গিন্নী তাকে কুড়িটা টাকা দিয়ে গেছে।

বাড়িতে ফিরে এসে বিছানার ওপরে দুজনে মুখোমুখি হয়ে ব'সে রইলুম। কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। ঘণ্টাখানেক এই ভাবে কাটবার পর বাঙাল-মা উঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি দাদারা, অন্ধকারে ব'সে কি করছ? চল, ওপরে গিয়ে বসি।

বাঙাল-মার সঙ্গে ওপরে উঠে গেলুম। প্রদীপ জ্বালিয়ে আমাদের দুজনকে তাঁর দু-পাশে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

বললুম, বাজার থেকে কিছু খাবার কিনে খেয়েছি।

বাঙাল-মা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ফিসফিস ক'রে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেনাল মাগী দরজা খুলেছিল?

ঘাড় নেড়ে জানালুম, না।

বাঙাল-মা বললেন, তোরা বাড়ি থেকে না গেলে ও দরজা খুলবে না।

বাঙাল-মা অতি মৃদুস্বরে বললেন বটে, কিন্তু কথাগুলোর গুরুত্ব এত বেশি যে, পরিতোষ—যে কানে শুনতে পায় না,—সেও চমকে উঠে বললে, সে কি!

বাঙাল-মা দয়ার্দ্রকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ দাদু, তাই তো মনে হচ্ছে। তোমরা তো আর প্রথম নয়, এই কাণ্ডই তো দেখে আসছি বরাবর।

আমরা আর কথা কইতে পারলুম না। বাঙাল-মা গোটা দু-তিন মোটা কাঁথা এনে আমাদের দুজনের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে নিজে মাঝখানে বসলেন। সেই দয়াবতী নারী—সারাজীবন দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করতেই যাঁর জীবন কেটেছে—আমাদের মনে যে কি ঝড় উঠেছে, তা বুঝতে পেরে আশ্বাস দিতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, কোনও ভয় নেই দাদু, ভগবান আছেন, তিনি তোদের রক্ষা করবেন। একবার ভেবে দেখ্, সহায়সম্পদহীনা বিধবা আমি এই নির্বান্ধব দেশে সারা জীবনটাই তো কাটিয়ে দিলুম, সুখে দুঃখে কেটে তো গেল।

পরিতোষ বললে, বোধ হয় ওর বোনপোকে আমরা মেরেছি ব'লে চ'টে গিয়েছে।

বাঙাল-মা একটা ঘৃণার "হুঁ" উচ্চারণ ক'রে বললেন, ওর চোদ্দ পুরুষের বোনপো। না না, ও মাগীর চিরকেলে স্বভাবই ওই রকম। আমি তো ওকে আজ নতুন দেখছি না।

বাঙাল-মা রাজকুমারীর ইতিহাস বলতে লাগলেন।—

অনেক—অনেকদিন আগে এই বাড়িতে শাহু মশায় নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। ঢাকা অঞ্চলে বাড়ি ছিল, নিজের বড় কারবারও ছিল। ছেলে ছিল না, একমাত্র মেয়ে, সেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রেখেছিলেন। সে সময় ঢাকার দিকে প্রতি বছরই কলেরার মড়ক লাগত। একবার ওই ব্যামোয় একসঙ্গে স্ত্রী ও জামাই মারা যাওয়ায় শাহু মশায় ব্যবসাপত্র তুলে·সব বেচে পুঁজিপাটা ও মেয়ে নিয়ে এলেন কাশীবাস করবেন ব'লে। এখানে এসে খানতিনেক বাড়ি কিনে ভাড়াটে ব'সিয়ে নিজে এই বাড়িটাতে বাস করতে লাগলেন। শাহু মশায় জাতিতে ছিলেন গন্ধবণিক। তাঁর মতন সচ্চরিত্র লোক এখানে বাঙালীদের মধ্যে খুব কমই ছিল। কত ব্রাহ্মণের ছেলে তাঁর পায়ের ধুলো নিত, তার ঠিকানা নেই।

স্বামীজী অর্থাৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামী তখনও বেঁচে। শাহু মশায় গিয়ে তাঁর শিষ্য হলেন। মেয়ের নাম ছিল তরঙ্গিণী। কিছু দিন যেতে না যেতে শাহু মশায় তরঙ্গিণীকে নিয়ে স্বামীজীর কাছে যেতে আরম্ভ করলেন। মাস কয়েক বাদেই শুনলুম, তরঙ্গিণীও তাঁর শিষ্যা হয়েছে, অথচ কাশীতে এসে অবধি আমরা শুনতুম, স্বামীজী কারুকেই শিষ্য কিংবা শিষ্যা করেন না।

বাপে-বেটীতে গেরুয়া প'রে সাধনভজন আরম্ভ ক'রে দিলে। একদিন দুদিন অন্তর খায়, সারাদিনরাত দরজা বন্ধ ক'রে ঘরে ব'সে সাধনভজন করে।

তরঙ্গিণীর নানা রকম বিভূতি দেখা দিতে লাগল। যাকে যা বলে, তাই ফ'লে যায়। কাশীসুদ্ধ মেয়েমদ্দ সেই গন্ধবণিকের মেয়ের পায়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল। ইতিমধ্যে র'টে গেল, স্বামীজী নাকি ব'লে দিয়েছেন, তরঙ্গিণী এই জন্মেই সিদ্ধিলাভ করবে, সেই সঙ্গে এ কথাও র'টে গেল যে, শাহু মশায়েরও সিদ্ধিলাভ হবে, তবে এখনও দেরি আছে। তাঁর নাকি এ জন্ম ছাড়া আরও দুবার জন্মাতে হবে, তবে মুক্তিলাভ হবে।

তরঙ্গিণীর অনেক রকম বিভূতি থাকা সত্ত্বেও অনেক লোক মনে মনে তার বাবা শাহু মশায়কেই ভক্তিশ্রদ্ধা করত বেশি। তারা মনে করত যে,

তিনি মেয়ের চাইতে অনেক উঁচুতে উঠে গেছেন ব'লেই বিভূতি-টিভূতিগুলো চেপে রেখে দিয়েছেন; কিন্তু মুক্তি পেতে দেরি আছে শুনেই তাঁর প্রতি ভক্তির মাত্রা লোকের মনে একেবারে ক'মে গেল, রাজ্যসুদ্ধ লোক এসে পড়ল তরঙ্গিণীর পায়ে।

যশের মজাই এমন, তরঙ্গিণীও মনে করতে লাগল যে, সে তার বাপের চাইতে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। তারা যখন প্রথম কাশীতে আসে, তখন শাহু মশায় বলতেন যে, তাঁর মেয়ে সতেরো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল; কিন্তু তরঙ্গিণী এখন বলতে লাগল যে, স্বামী যখন মারা যায়, তখন তার মাত্র আট বছর বয়স ছিল, অর্থাৎ সে আজন্ম ব্রহ্মচারিণী।

মেয়ের হালচাল দেখে বাপের মনেও প্রতিযোগিতার ঈর্ষা অঙ্কুরিত হতে লাগল। তিনি দিনরাত সাধনভজনের দিকে মন দিলেন। এক-একবার এমনও হয়েছে যে, সাত দিন তিনি দরজা বন্ধ ক'রে থেকেছেন। তিন জন্মের কর্মফল এক জন্মে কাটিয়ে উঠতে পারা যায় কি না, তারই মহলা চলতে লাগল।

তারপর একদিন, ওই লক্ষ্মীমণি এখন যে ঘরে থাকে, সেই ঘরের দরজা ভেঙে দেখা গেল, মাথার শির ছিঁড়ে শাহু মশায়ের মৃত্যু হয়েছে।

শহরময় বাঙালীদের মধ্যে হৈ-হৈ প'ড়ে গেল। তরঙ্গিণী চন্দনকাঠ দিয়ে বাপের শব দাহ করলে।

বাপের শ্রাদ্ধশান্তি সমারোহের সঙ্গে হয়ে যাবার পর তরঙ্গিণী একদিন তার শিষ্য-টিষ্য নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। কিন্তু মহাপুরুষদের চেনা মুশকিল, সেদিন সকলের সামনেই তিনি তরঙ্গিণীকে ব'লে দিলেন, কে তুই? তোকে তো চিনতে পারছি না।

তরঙ্গিণী কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমার বাবা মারা গিয়েছেন—

কিন্তু স্বামীজী তাকে গ্রাহ্যই করলেন না।

শিষ্য-শিষ্যা ও অনুগতদের সামনে এই ভাবে অপমানিতা হয়ে তরঙ্গিণী গেল মহা চ'টে, সেও সকলের সামনেই স্বামীজীকে যাচ্ছে-তাই ক'রে গালাগালি দিতে দিতে সেখান থেকে চ'লে এল। সেদিন স্বামীজীকে তাঁর এক ভক্ত খাওয়াচ্ছিল। তিনি তরঙ্গিণীর কথার কোন জবাব না দিয়ে নিজের মনে খেয়ে যেতে লাগলেন।

তরঙ্গিণী তো রেগে-মেগে সেখান থেকে চ'লে এল। তার সাধনভজন

চুলোয় গেল, বাড়িতে লোক এলেই সবার কাছে স্বামীজীকে গালাগালি দেওয়াই হ'ল তার একমাত্র কর্ম।

কিছুদিন এমনই চলল। তারপর একদিন আপনা থেকেই তার বাড়িতে এক সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন। অদ্ভুত ছিলেন এই সন্ন্যাসী আর অদ্ভুত ছিল তাঁর শক্তি! তিনি ছিলেন বাঙালী; কিন্তু কোথায় বাড়ি, কার শিষ্য তা আমরা কেউ জানতে পারি নি। হঠাৎ কোথা থেকে একদিন তরঙ্গিণীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, বেটী, আমি তোকে দীক্ষা দেব।

তরঙ্গিণী ছিল অতিশয় দাম্ভিকা, কিন্তু সন্ন্যাসীর কথা শুনে সে তখুনি একেবারে তাঁর পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে বললে, বাবা, আমায় রক্ষে কর।

এই সন্ন্যাসী তরঙ্গিণীকে নতুন ক'রে দীক্ষা দিলেন। সারারাত্রি সন্ন্যাসী একটা ঘর বন্ধ ক'রে তরঙ্গিণীকে কি সব শেখাত। অনেকে ওদের নামে অপবাদও রটাতে লাগল; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এই সন্ন্যাসীর আওতায় আসার পর তরঙ্গিণীর শক্তি দশগুণ বেড়ে গেল।

বাঙাল-মা ব'লে চললেন, এই সন্ন্যেসীকে আমি দেখেছি, আমায় তিনি বড় স্নেহ করতেন। আমায় বলতেন, তুইও যোগিনী, তবে নিজেকে চিনতে পারিস নি।

আমার মা কিন্তু, মুখে কিছু না বললেও, বেশ বুঝতে পারতুম, তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করাটা তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না।

এই সন্ন্যাসী ছিলেন তান্ত্রিক। তিনি কখনও থাকতেন কামাখ্যায়, কখনও বা হাজারিবাগের জঙ্গলে ছিন্নমস্তার মন্দিরে, কখনও কাশীতে, কখনও বা চ'লে যেতেন হিমালয়ে, যেখানে তাঁর গুরু থাকতেন। কখনও রেলে চড়তেন না, যেখানে যাবার দরকার হাওয়ায় উড়ে চ'লে যেতেন।

এতক্ষণ চলছিল মন্দ নয়, কিন্তু বাতাসে চ'ড়ে ঘোরাফেরার কথা শুনে আমাদের হাসি পেল; কারণ কোনও অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে যথোচিত লবণসহযোগে গ্রহণ করাই আমাদের সংস্কারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার ওপরে আমাদের গোষ্ঠীপতি মহাত্মা রামমোহন প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন যে, দুর্বলাধিকারীগণের পক্ষে মূর্তিপূজাই প্রশস্ত। এই স্বতঃসিদ্ধ অনুসারে মূর্তিপূজকদের আমরা দুর্বলাধিকারী ব'লেই জ্ঞান করতুম এবং সেই সঙ্গে নিরাকার সগুণ ব্রহ্মোপাসকদের বংশধর হওয়ার ফলে নিজেরাও যে

এক-একটি সবল-অধিকারী—এ জ্ঞানও ছিল টনটনে। এ হেন সবল-অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও চলতে ফিরতে রাহাখরচ দিতে দিতে আমাদের প্রাণান্ত হতে হয়, আর কোথাকার কে একজন মূর্তিপূজক তান্ত্রিক দুর্বলাধিকারী—সে কিনা হাওয়ায় চ'ড়ে বিনা পয়সায় ঘোরাফেরা করে, এত বড় গুলিটি গিলতে গলায় বেধে গেল। একটু শ্লেষের সঙ্গে হেসে জিজ্ঞাসা করলুম, খুব গাঁজা-টাঁজা টানতেন বুঝি?

বাঙাল-মা বললে, গাঁজা খেতে তো কখনও দেখি নি, তবে দিনরাত কারণ চলত।

তা হ'লে সাঁতার কেটে যাতায়াত করতেন বলুন।

এতক্ষণে বাঙাল-মা আমাদের রসিকতা বুঝতে পেরে জিভ কেটে বললেন; দাদু, মহাপুরুষদের নিয়ে অমন ঠাট্টা করতে নেই, ওতে অমঙ্গল হয়। আমার কথা বিশ্বাস না হয় তো ওই রসিয়ার মাকে জিজ্ঞাসা করিস। ও সেই তরঙ্গিণীর আমলের ঝি, ওর চোখের সামনেই সে সব ঘটনা ঘটেছে।

একদিন, শীতকাল, রাত্রি বারোটা অবধি আমরা সন্ন্যেসীর কাছে ব'সে আছি, তিনি আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন আর মড়ার খুলিতে কারণ ঢেলে ঢেলে খাচ্ছেন, এমন সময় আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ব'লে উঠলেন, কি হয়েছে? অ্যাঁ, অসুখ? বাঁচবে না? আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, কোনও ভয় নেই।

সেদিন রাত্রি গভীর হয়ে পড়ায় তরঙ্গিণী আমাদের বাড়ি যেতে দিলে না; আমরা সন্ন্যাসীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সারারাত্রি সবাই মিলে বাকি রাতটুকু জেগে জেগেই কাটিয়ে দিলুম। সন্ন্যাসী দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাতি নিবিয়ে দিলেন। অতি প্রত্যুষে তিনি ও তরঙ্গিণী দুজনে গঙ্গা নাইতে যেতেন। সেদিন আমরা ঠিক করলুম, তাঁদের সঙ্গে গঙ্গাস্নান ক'রে যে যার বাড়ি চ'লে যাব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সকালবেলা উঠে দেখা গেল, ঘরের মধ্যে সন্ন্যাসী নেই। প্রায় তিন মাস বাদে একদিন 'কালী কালী' ব'লে চীৎকার করতে করতে কোথা থেকে সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন।

আর একবার, আমার মা মারা যাবার অনেক পরে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বাবা, আমার শ্বশুরবাড়ির খবরাখবর জানতে ইচ্ছে করে, অনেক কাল সেখানকার কোনও সংবাদ পাই নি।

তিনি বললেন, আচ্ছা, কাল আসিস, ব'লে দেব।

পরদিন সকালবেলা তাঁর কাছে যাওয়া মাত্র তিনি বললেন, ওরে, তোর ছোট ভাগুরের যক্ষ্মা হয়েছে, সে আর বাঁচবে না, মাসখানেকের মধ্যেই মারা যাবে।

পরে জানতে পেরেছিলুম, তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

সন্ন্যাসীর সব ভাল ছিল, কিন্তু ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর নাম শুনলেই বলতেন, ও ব্যাটার পেটসর্বস্ব! কিছু বিভূতি-টিভূতি আছে এই যা—না হ'লে ও কিছুই নয়।

বেশ চলছিল, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে তরঙ্গিণীর দোতলার একখানা ঘর ভাড়া করলে। ব্রাহ্মণের কোনও কুলে কেউ ছিল না, স্ত্রী কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছে, সঙ্গে একটি বছর আষ্টেকের মেয়ে।

সন্ন্যেসী তখন এখানে ছিলেন না। মাসকয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব ব'লে কোথায় চ'লে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণের নাম ছিল যদু মুকুটী। অতি সাত্ত্বিক লোক, দু-বেলা গঙ্গাস্নান, পূজা-অর্চনাতেই দিন কাটে—ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি তরঙ্গিণীর পাদোদক খেতেন। শুধু তাই নয়, চাকরের মতন তার সেবা করতেন।

বছর দুয়েক এই ভাবে কাটল, কিন্তু সন্ন্যাসীর দর্শন নেই। তরঙ্গিণীই যোগাড়যন্ত্র ক'রে নিজের টাকা খরচ ক'রে মুকুটী মশায়ের মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলে। সেই মেয়েরই ছেলে ওই বদ্যিনাথ, যে আজ সকালে তোদের সঙ্গে মারামারি করতে এসেছিল।

আরও প্রায় বছর দুই এই ভাবে চলল, তখনও সন্ন্যাসীর দেখা নেই। তরঙ্গিণী কিন্তু বলত, গুরুদেব নিশ্চয়ই আসবেন, মরবার আগে তাঁর সঙ্গে আর একবার দেখা হবেই। তার যশ দিনে দিনে বেড়েই চলল, এমন সময় শোনা গেল যে, সে মৌনব্রত অবলম্বন করেছে, কারুর সঙ্গে দেখা করবে না, কিছুকাল নির্জন-সাধনা করবে। একেবারে সিদ্ধ না হ'লে আর লোকালয়ে মুখ দেখাবে না।

তরঙ্গিণী আর কারুর সঙ্গে দেখা করে না। তার ঘরে কারুর ঢোকবার হুকুম নেই, এক যদু ঠাকুর ছাড়া। আমরা রোজই আসি আর নীচে থেকেই তার সংবাদ নিয়ে চ'লে যাই, তার ওপরে আমাদের শ্রদ্ধার মাত্রা দিনে দিনে বেড়েই চলল। তারপর গ্রীষ্মের এক রাত্রিশেষে ছাদের ওপরে সারারাত

এপাশ ওপাশ ক'রে ক'রে প্রতিবেশীদের চোখে সবে একটু তন্দ্রার ঘোর লেগেছে মাত্র, এমন সময় সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের চীৎকারে তরঙ্গিণীর সিদ্ধাই-লাভের সংবাদ মহল্লাময় ঘোষিত হতে লাগল। কৌতূহলী প্রতিবেশিনীরা চমকে বিছানায় উঠে বসল, তারপর সবাই ছুটল তার বাড়ির দিকে। সবাই এসে দেখলে, তরঙ্গিণীর ঘরের দরজার চৌকাঠে মুকুটী মশায় গালে হাত দিয়ে উদাসভাবে ব'সে আছেন। ঘরের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখা গেল, মেনকার পাশে শকুন্তলার মতন তরঙ্গিণীর পাশে একটি শিশুকন্যা প'ড়ে আছে একরাশ জুঁইফুলের মতন।

সকাল হতে না হতে কাশীময় ঢি-ঢি প'ড়ে গেল—সকলের মুখেই ছি-ছি! সবাই বলতে লাগল, সন্ন্যাসিনীর এমন পতনের নজির নাকি মহাভারতেও নেই, মুকুটীর মতন পাষণ্ড সংসারে দুর্লভ।

আমরা তিন-চারটি বিধবা ছাড়া আর সকলেই তরঙ্গিণীকে পরিত্যাগ করলে। সে আমার গুরু হ'লেও ছিল আমার বন্ধু। এতখানি বয়স হ'ল আমার, কিন্তু তার মতন মেয়ে আমি আর দুটি দেখি নি।

তরঙ্গিণী কিন্তু আর বিছানা থেকে উঠল না। সন্তান হবার আগে থাকতেই তার অসুখ করেছিল, সন্তান জন্মাবার পর সে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। পুরো একটি বছর ভুগে ভুগে অস্থিচর্মসার হয়ে যায় যায় এমন অবস্থা, সেই সময় হঠাৎ একদিন 'কালী কালী' চীৎকার করতে করতে সন্ন্যাসী কোথা থেকে এসে হাজির হলেন। আমাদের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি বললেন, বেশ হয়েছে, এই তো চাই।—ব'লে তার ঘরে ঢুকলেন।

তরঙ্গিণী পাশ ফিরতে পারত না, সে তবুও উঠে গুরুদেবের পায়ের ধুলো নিয়ে একেবারে এলিয়ে পড়ল। সন্ন্যাসী তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, কিছু ভয় নেই মা, নির্ভয়ে চ'লে যা।

তরঙ্গিণী আবার উঠে মেয়েটিকে সন্ন্যাসীর কোলে তুলে দিয়ে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়— আর তার জ্ঞান হ'ল না। চব্বিশ ঘণ্টা অজ্ঞান হয়ে থেকে সে চ'লে গেল।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

কুইট ইণ্ডিয়া

আমরা যদি সরি,
তোমাদের এই আরজি শুনে 'কুইটিণ্ডিয়া' করি,
—তোমরাই যে মরবে।

আমরা গেলেই, তুর্কী, তাতার,
নেপাল, চীন, আর ইউ. এস. এস. আর.
আসবে ছুটি, ধরবে টুঁটি, মারবে, কোতল করবে।
—তোমরা তাতে ডরবে।

তোমাদের তো নেই বমারু, চড়বে কিসে?
গান-গৃনেডে হাত পাকে নি, লড়বে কিসে?
আক্রমণে রক্ষা করা,—কে করিবে? কোন্ ঢঙে?
আমরা যেমন করেছিলাম বর্মা-মালয়-হঙকঙে?
আমরা যদি পালাই,
সিভিল ওয়ার জ্বলবে দেশে, থাকবে সেটা জ্বালাই।
—তোমরা তাতে পুড়বে।

গ্রামে গ্রামে ধর্ষণ খুন,
গোলায় গোলায় লুঠ বা আগুন—
ঘটবে নিতুই। এবং পাঠান হিঁদুর মাথা খুড়বে।
—তোমরা মাথা খুঁড়বে।

কাহারপাড়া-মেদনীপুরে রটল যাহা,
বম্বে-ঢাকা-চাটগাঁ জুড়ে ঘটল যাহা,
ঠিক তেমনটি ঘটতে পারে জেলায় জেলায়, দেখবে কে?
এস পি. ডি., এম. সবাই গেলে রায়ট-রিপোর্ট লিখবে কে?
আমরা আছি, কারণ,
তোমাদের সব ভায়ে ভায়ে মিলন হওয়া বারণ।
—শাস্ত্রে নাকি মানা।

ইহুদি-হিঁদু-কৃশ্চিয়ানে,
জৈন-চামার-মুসলমানে,
খায় কি বল এক টেবিলে শোর, গরু আর চানা?
—খায় না, সে তো জানা।

পিকপকেট আর পকেট-ভারী মিলাক তো দিল,
ধর্ষিতা আর বলাৎকারী করুক তো মিল,
করুক তো মিল দেশের যত দোস্ত এবং দুশমনে ;
রাজ্য ছেড়ে যাচ্ছি চ'লে এই নিমেষে খুশ মনে।
যেতেই তো চাই। তাই তো আমি মিল ঘটাবার চেষ্টাতে।
মিল ঘটিলে কিন্তু বিপদ !
ছাড়ব তখন সি-এন-সি-পদ।
দেখবে তখন রক্ত-নদী বইবে সারা দেশটাতে।
তাই ব'লে ভাই, যেই যা বলুক, মিল ক'রো না শেষটাতে।

"ববর'

পদচিহ্ন

(পূর্বানুবৃত্তি)

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির আকাশ। অসংখ্য কোটি নক্ষত্রমালায় ঝলমল আকাশ। প্রায় মধ্যস্থলে ছায়াপথ। সেই দিকে চেয়ে তখনও ব'সে ছিল কিশোর। ব্যর্থতার ক্ষোভের উগ্রতা ক্রমশ উদাসীনতায় পরিবর্তিত হচ্ছিল। উদাস চিত্তে সে ওই আকাশের দিকে চেয়ে ছিল। সে স্থির করেছে, এখান থেকে সে চ'লে যাবে। সবচেয়ে বড় আঘাত বড় হতাশা তার কাছে—মণি দত্তের পলায়ন নয়, এখানকার লোকেদের পুলিসের ভয়ে দরজা বন্ধ ক'রে থাকা নয়, কীর্তিচন্দ্রের এবং রাধাকান্তের প্রত্যাখান নয় ; সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার আঘাত পেয়েছে সে অন্য স্থান থেকে। সে নিজে উদ্যোগী হয়ে একটি গোপন প্রতিষ্ঠান গড়েছিল। সে প্রতিষ্ঠানটির কাজ দুঃস্থ ভদ্রজনের সেবা এবং দূর মাঠে জঙ্গলের মধ্যে দেহচর্চা। সভ্যেরা সকলেই ভদ্রসন্তান। সকলেই তার প্রায় সমবয়সী। কেউ কেউ ইস্কুলে পড়ে, তারা অবশ্য গ্রামে নাই, অধিকাংশই সদর শহরে—জেলা ইস্কুলে পড়ে, বোডিঙে থাকে ; অন্য সকলে সদ্য লেখাপড়া ছেড়ে ঘরেই ব'সে থাকে। তাদের মধ্যে সরকার-বংশীয় বংশলোচনের পুত্র শূলপাণি আছে, জ্ঞাতিপুত্র উরু অর্থাৎ ওড়ম্বাপদ আছে, কিশোরের নিজের জ্ঞাতিভাই মঙ্গল আছে, আরও অনেকে আছে, আর তাদের মধ্যে আছে গোপীচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র পবিত্র। নবগ্রামে প্রবীণ এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মধ্যে গানবাজনার সমাদর আছে, এটি কলাবিদ্যা হিসাবে অভিজাতজনোচিত ব'লে স্বীকৃত,—বংশলোচন সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুগায়ক, রাধাকান্ত বাদ্যযন্ত্রে সুনিপুণ ব্যক্তি ;

স্বর্ণবাবু গোপীচন্দ্র এঁরা সঙ্গীত বোঝেন এবং স্থানীয় ওস্তাদদের বৃত্তি দেন, উৎসাহিত করেন। সাধারণ লোকেরাও গান-বাজনা মোটামুটি বোঝে, দু-চারজন গাইতে পারে, বাজাতে পারে অনেকেই; লেখাপড়া ছাড়ার পরই নবগ্রামের সমাজে আর একটা শিক্ষার পর্ব্ব আসে; গানবাজনা শিক্ষাপর্ব্ব। এটা এই কালের সামাজিক রেওয়াজ। একমাত্র রাধাকান্তের বড় ভাই শ্যামাকান্ত ওসবের ধার ধারেন না। তিনি বলেন, Let the birds sing—পাখীরা গান করুক। পক্ষীধর্ম্ম ওটা। তাঁর ছেলে মহাদেব গান ভালবাসে কি না বোঝা যায় না। সে মদ নিয়েই মত্ত।

অমূল্য ভূপতি পর্য্যন্ত গানবাজনার চেষ্টা করে। গন্ধবণিক-পল্লীতেও সঙ্গীতের আসর বসে। সাহা-পল্লীতে বসে। ধীবর-পল্লীতে বসে; বাউড়ী পল্লীতেও বসে। সঙ্গীতের আসর দু শ্রেণীর; ধর্ম্ম-সঙ্গীতের আসর আগে প্রধান ছিল—এখন সে আসরের পরিধি এবং সমারোহ ক'মে এসেছে, সে আসর একমাত্র নামসংকীর্ত্তনের দলেই আবদ্ধ। এখন রেওয়াজ বাড়ছে বৈঠকী সঙ্গীতের। বাঁয়া, তবলা, পাখোয়াজ, তানপুরা, সেতার, নিয়ে বাবুদের আসর বসে। সাধারণের সম্বল শুধু বাঁয়া আর তবলা। কিন্তু সকল আসরকে অতিক্রম ক'রে এই তরুণ দলের গানের আসর জেঁকে উঠেছিল। গোপীচন্দ্রের ছোট ছেলে পবিত্র এবং কিশোরের জ্ঞাতিপুত্র মঙ্গলের কল্যাণে আড়ম্বর এবং আয়োজন সেখানে প্রচুর। পবিত্র কিনেছে একটা হারমোনিয়াম, মঙ্গল এনেছে বেহালা। একটা গ্রামোফোনের অর্ডারও গিয়েছে। সুকণ্ঠ কিশোরের সেখানে ছিল বিপুল সমাদর। কিশোরই ছিল সেখানকার মধ্যমণি। সে যেদিন আসরে বসত, সেদিন আসরের চারিপাশে জনতা জ'মে যেত। সকালে আসর বসত, মধ্যাহ্নে একবার খাওয়া-দাওয়ার জন্ম অল্পক্ষণের ছেদ দিয়ে আবার সকলে এসে জমত, সে আসর চলত মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত। সন্ধ্যায় আসর বসলে পরদিন প্রভাতের সূর্য্যোদয়ে সে আসর শেষ হত। গোপীচন্দ্রের ছোট ছেলে পবিত্র এবং কিশোরের জ্ঞাতিভাই মঙ্গল একজন ওস্তাদও রেখেছে, কণ্ঠস্বর ভাল নয়, তারা বাজনা শেখে। বংশলোচনের পুত্র শূলপাণি গাঁজা ধরেছে, অন্যেরা গাঁজায় আসক্ত না হ'লেও মধ্যে মধ্যে খায়, মঙ্গল এবং পবিত্রের মদ্যপ্রীতি দেখা দিয়েছে। কিশোর এতে ব্যথা পেত, আপত্তি করত। মঙ্গল পবিত্র অন্তরালে কিশোরকে ব্যঙ্গ ক'রে বলত বিবেকানন্দ। অকস্মাৎ একটি ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে এদের নিয়ে কিশোর একটি প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুললে। একদা সংবাদ এল যে, ক্রোশখানেক দূরবর্ত্তী তটনপুরের প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশীয় চৌধুরী-পরিবার আজ কয়েকদিন অনাহারে আছে। চৌধুরীরা এককালে জমিদার ছিলেন। এই সংবাদ শুনে গানের আসর নিষ্প্রভ স্তব্ধ হয়ে গেল। সকলেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। কিশোর একদৃষ্টে চেয়ে রইল ঘরের একটা কোণের দিকে। তারপর হঠাৎ সে হাত পাতলে পবিত্রের সম্মুখে, ভিক্ষে দাও ভাই কিছু। আমি ভিক্ষে চাইছি।

ভিক্ষে ?

হ্যাঁ। সকলের কাছেই ভিক্ষে চাইছি আমি।

ভিক্ষা সংগৃহীত হ'ল। তার পর কিশোর প্রস্তাব করলে প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলার এ প্রতিষ্ঠানের নাম এবং কার্য্যকলাপ সভ্যরা ছাড়া কেউ জানবে না। নামকরণ হ'ল—সমাজ-সেবক-সমিতি। সমাজের সেবা, বিশেষ ক'রে দুঃস্থ সম্ভ্রান্ত পরিবারদের গোপনে সাহায্য করা হবে এর কাজ। সে কাজ করতে হবে গোপনে, দুঃস্থ হ'লেও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মর্য্যাদা হানি না-ক'রে, প্রাতঃস্মরণীয় হাজি মহম্মদ মহসীনের মত রাত্রির অন্ধকারে তাঁদের ঘরে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। অথবা রাধাকান্ত-শ্যামাকান্তের পূর্ব্বপুরুষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হবে। তাঁরা দুঃস্থ ভদ্রজনের জ্ঞাতি-কুটুম্বের নাম ক'রে তত্ত্ব পাঠাতেন। তত্ত্ববাহক সন্দেশ কাপড় টাকা নিয়ে পৌঁছে দিয়ে বলত, আপনার কুটুমেরা পাঠালছে মাশায়।

বঙ্গভঙ্গের অন্দোলনের পর, তারই সঙ্গে সে যোগ করেছিল শক্তিচর্চ্চার ব্যবস্থা। দূর মাঠে জঙ্গলের মধ্যে কুস্তি, লাঠিখেলা, তীরধনুকের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। নেশাও সকলে ত্যাগ করেছে এই সময় থেকে। ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নের কাজলও কিশোর তাদের চোখে পরিয়ে দিয়েছে। দলে সভ্যও বেড়েছে কয়েকজন। সকলেই অবশ্য সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। কিশোরের সবচেয়ে বড় আঘাত এসেছে এদের কাছ থেকে। প্রথম থেকেই এরা এটাকে সুচক্ষে দেখে নাই। তারা সকলেই নিষেধ করেছিল। কিন্তু কিশোর ভেবেছিল, সভার সময় তারা অবশ্যই আসবে। সভার সাফল্যের পর সকলেই এর মূল্য বুঝবে। কিন্তু এই ব্যর্থতার পর সন্ধ্যার পর অন্ধকারের মধ্যে তারা এসে ব্যঙ্গ ক'রে গিয়েছে তাকে।

বেণে আর চাষা—এদের মাথায় তুললে আর নামবে না। ভাল হয়েছে। মিটিং যে হয় নাই, সে ভাল হয়েছে।

শূলপাণি ব্যঙ্গ ক'রে মণি দত্তের পলায়নের ভঙ্গী অভিনয় ক'রে দেখিয়েছে; কৌতুকে হাততালি দিয়ে হেসেছে আর বলেছে, হনুমানের পালানো দেখেছিস মাঠের ওপর দিয়ে? খানিকটা যায় আর একবার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে পিছন ফিরে চেয়ে দেখে মানুষ দেখে আবার ছুট।

পবিত্র বলেছিল, নে, উঠে আয়, আর মন-খারাপ ক'রে ব'সে থাকতে হবে না।

কিশোর যায় নাই। তারা চ'লে গিয়েছে হাসতে হাসতে। হতাশায় সে উদাসীন চিত্তে চেয়ে আকাশের দিকে। অভিমানে ক্ষোভে সে স্থির করেছে, চ'লে যাবে সে এখান থেকে চিরদিনের মত।

কিশোর চাচা !

কে ?

আমি গো চাচা, এবারত হাজী।

হাজী এবারত, এবারত-চাচা! কিশোর তাকিয়ে দেখলে, অন্ধকারের মধ্যে বিশালকায় এবারত-চাচা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

উঠ বাপ। ঘরকে যাও।

হ্যাঁ, যাই।

মনে তুমার দুখ হয়েছে বাপু, আমি বুঝতে পারছি। অন্তরে বড়ই লেগেছে। কি করবে বাপ, বল? যে কাম মানুষের লয়, সেই কামে তুমি হাত দিয়েছিলে। বাপ, ই কাম রাজা পারবে না, মানুষ পারবে না। খোদাতায়লা জেগে রয়েছেন, তিনি দেখছেন, এ বিচার তিনি করবেন। তবে হ্যাঁ, মরদের বাচ্চা মরদ বটে তুমি! একটু চুপ ক'রে থেকে এবারত আবার বললে, বাপ, ছেলেকালে রাখালি করেছি, জোয়ানিতে মজুর খেটেছি। খোদাতায়লা দেহে তাগদ দিয়েছিলেন, আল্লারসুল ভাল মতি দিয়েছিলেন, খেটে-খুটে পতিত কেটে জমি করলাম, আল্লারসুলের দয়ায় হজ ক'রে এলাম, আজ আমি হাজী। লোকে আমাকে খাতির করে। কিন্তুক পুরানো কথা মনে আছে, ভুলি নাই। ইয়ারা এমনই বটে বাপ। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। কি করবে বল? গেল জন্মের ফল সব।

কিশোর উঠল। এই লোকটার সান্ত্বনায় সে শান্তি পেল। অনির্ব্বচনীয় শান্তিতে তার মন ভ'রে গেল। সে হেসে বললে, সেইটি বল চাচা একবার।

কোন্‌টি ?

সেই, আমরা মুসলমা—ন, আমরা এ—ত ব ড়; তোমরা হিঁদু, তোমরা এতটুকু।

বিশালদেহ এবারত এই ব'লে হিন্দুর ছেলেদের ছোট পুতুলের মত বুকে তুলে নেয়।

এবারত আজ হাসলে। বললে, বাপ, আজ উ বুলতে ভাল লাগছে না। আজ কি বুলতে মন হচ্ছে জান? তোমরা জমি—দা—র, তোমরা এ—ত ব—ড়; আমরা গরিব, আমরা এতটুকু।

থানাতে স্বর্ণবাবু আর গুহ দারোগা ব'সে রয়েছেন। রাস্তার উপর স্বর্ণবাবুর টমটম দাঁড়িয়ে। দুজনে উচ্চহাস্য করছেন। টেবিলের উপর লণ্ঠন জ্বলছে। পাশে ওটা কি? মদের বোতল। কিছুদিন আগে গুহ দারোগা একজন আসামীর নাকের ভিতর গাড়ুর নল ভ'রে দিয়েছিল। লোকটা জখম হয়ে পড়েছিল। আসামীটি স্বর্ণবাবুর প্রজা, জাতিতে বাগদী। গ্রাম থেকে গুহের বিরুদ্ধে বেনামী দরখাস্ত হয়েছিল। স্বর্ণবাবু বাগদী প্রজাটিকে দিয়েই দারোগার দোষ অস্বীকার করিয়েছিলেন।

খানা পার হয়েই মোদক-পল্লী। তারপর গন্ধবণিক-পল্লী। কৃষ্ণ মোদকের দোকানে ভিয়ান চলছে। কৃষ্ণ মোদক হিসাব মেলাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে কথা হচ্ছে—এই কথা, এই মিটিঙের কথা।

কৃষ্ণ মোদক বলছে, কিশোরকে বেত ওর কাকা মারে নাই, মেরেছে স্বর্ণবাবু। লাজের কথা ঢাকবার জন্তে বলছে। দেখিস, আমি ব'লে দিলাম।

চুপ কর। কেশোরবাবু—

কৃষ্ণ বললে, বিক্‌কিরি (বিক্রি) আজ এত কম কেনে রে—দশ টাকা ভরল না?

গৌর ময়রার দোকানে গৌর হিসাব করছে, নিতাই রামায়ণ পড়ছে। কয়েকজন শুনছে। কয়েকজন গল্প করছে।

এই এই, কেশোরবাবু—

ওরা চট ক'রে আলোর দমটা কমিয়ে দিলে।

বেনে-পল্লীতেও ওই আলোচনা। এখানে আলোচনাটা তীব্র। ছোকরারা সগৌরবে, কে কেমন ভাবে সুকৌশলে দারোগা-পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে স'রে এসেছে, সেই আলোচনা চলছে। এক জায়গায় আইনের তর্ক চলছে, দারোগা এই সভা কোন্ আইনে বন্ধ করলে? কি তার একতিয়ার?

কিশোরকে দেখবামাত্র তাদের আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। কেউ আলো কমিয়ে অন্ধকার ক'রে দিলে, অনেকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। গন্ধবণিক-পল্লীর মজলিসের মধ্যে মণি কোথাও নাই

মণি দত্ত তখনই চ'লে গিয়েছে মামদপুর ষ্টেশনের বাজারে তার দোকানে। সেখান থেকে সদরে যাবার তার অভিপ্রায় আছে। উকিলদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কালেক্টার এবং এস. পি.র সঙ্গে সে দেখা করবে।

গন্ধবণিক-পল্লীর ঠিক মাঝখানে, বাজারের প্রধান শড়ক থেকে বেরিয়ে গিয়েছে ব্রাহ্মণ-জমিদার-পল্লীর পথ। প্রথমেই মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-পল্লী—কুলীনপাড়া। এখানে পুরুষেরা অধিকাংশই বিদেশবাসী চাকুরে, যারা আছে, তারা নিরীহ। এখানে আলোচনা স্তিমিত। সজ্ঞানে কাশী গিয়েছিলেন কৃষ্ণ চাটুজ্জে; তাঁর দাওয়ার উপর মজলিস বসেছে পাড়ার মেয়েদের। কৃষ্ণ চাটুজ্জের ভাইঝি কানু গান গাইছে। কানু নিজে গান রচনা করে। কানু আজ গাইছে—

কি মিটিং করলি কিশোরী!
বাজারপাড়ায় প'ড়ে গেল ঘরে খিল-দেবার হুড়োহুড়ি!
গলি গলি পালাইল দত্তদের মণি,
মাঝ ডেঙাতে রইল প'ড়ে কাঠের চেয়ারখানি—
হায় কেমন ক'রে সেখান ঘরে আনি?

* * *

রাধাকান্তের বাড়ির পাশে রাস্তার উপর প্রচণ্ড গণ্ডগোল। ভূপতি অমূল্য প্রচুর মদ্যপান ক'রে রাধাকান্তকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করছে।

শা—লা সাধু! শাস্তর! শাস্তর! শালা শাস্তর আওড়ায়! শা—লা খানকীকে বাড়িতে রেখেছে ঝি ক'রে! শালী খানকী! শালী কসবী! ওই শালী চাষানী! ওই গোয়ালপাড়ার চাষানী! শালী ষোড়শী! শালী ভুবনেশ্বরী আমার! মহাবিদ্যা! হুঁ হুঁ বাবা! ছিন্নমস্তা ক'রে দোব!

ষোড়শীর সন্ধান তারা পেয়েছে। মণি দত্ত যে সংবাদটুকু শুনে গিয়েছিল রাধাকান্তের কাছে, সেটুকু সমগ্র গ্রামময় এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

রাধাকান্ত আপনার বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মূর্ত্তির মত। অমূল্য এবং ভূপতির পিছনে সরকারী চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়িয়ে আছেন অমূল্যের মা জগদ্ধাত্রী দেবী। তিনি দুটি হাত জোড় ক'রে বলছেন, রাধাকান্ত ভাই, তুমি আমাকে গালাগাল দাও, একগাছা ঝাঁটা নিয়ে আমার কপালে মার, আমার গর্ভে মার। ভাই রে, আমাকে তুমি মৃত্যুর উপায় ব'লে দাও। হে নারায়ণ, হে মা দুর্গা, আমার মরণ হোক মা! সর্পাঘাতে হোক, বজ্রাঘাতে হোক, যাতে হোক, আমার জীবনের শেষ কর মা! ওই পাপ সন্তানকেও শেষ কর মা!

হঠাৎ বাড়ির এদিকের দরজা থেকে কে ডাকলে, রাধাকান্তদা! রাধাকান্তদা!

কে?

আমি স্বর্ণ। সঙ্গে দারোগাবাবু আছেন। কিন্তু গোলমাল কিসের ওদিকে? চণ্ডীমণ্ডপে?

যাচ্ছি।

গোলমালটা কিসের?

কিছু না। ও অমূল্য ভূপতি মদ খেয়েছে একটু।

স্বর্ণবাবুর কণ্ঠস্বরের সাড়ায় চণ্ডীমণ্ডপ স্তব্ধ হয়ে গেল। অমূল্য ভূপতি চ'লে গেল। খানিকটা স'রে গিয়ে দূরে একটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে আবার গালাগাল শুরু করলে।

স্বর্ণবাবু বললেন, তোমার কাছে একটি জিনিস চাইতে এসেছি। একা আমি নয়, দারোগাবাবু সমেত।

হেসে রাধাকান্ত বললেন, বল, কি জিনিস?

আগে বল, দেবে?

অদেয় না হ'লে দোব।

আমি বলছি। ফুঃ। রাধাকান্তবাবু ইজ এ গুড ম্যান। ফুঃ—ফুঃ—ফুঃ। ও ইয়েস, ভেরি গুড ম্যান। ফুঃ। আমি বলছি। মাই ডিয়ার রাধাকান্তবাবু—

থামুন আপনি দারোগাবাবু, আমি বলছি। রাধাকান্তের হাত দুটি চেপে ধ'রে স্বর্ণবাবু বললেন, একা ভোগ করবে দাদা? আমাদের বঞ্চিত ক'রে? আজকের মত আমাদের দাও।

পিছিয়ে এলেন রাধাকান্তবাবু, দুর্গা দুর্গা দুর্গা! বুঝতে পেরেছেন রাধাকান্তবাবু।

স্বর্ণবাবু বললেন, যোড়শীকে। আজকের মত। তোমার জিনিস তোমারই থাকবে। আজ আমরা আনন্দ করছি। একটু 'কারণ'ও হবে। তোমাকে চক্রধর হয়ে বসতে হবে। ওকে সঙ্গে ক'রে তুমি এস।

রাধাকান্ত বললেন, স্বর্ণ, মেয়েটি আমার আশ্রিতা, সে আমার বাড়িতে দাসী হয়ে রয়েছে। আমাকে 'বাবা' বলে, আমি তাকে কন্যার মত দেখি।

আরে রাখ তোমার কন্যে, রাখ তোমার বাবা।

স্বর্ণ!—প্রচণ্ড ক্রোধে উচ্চ কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলেন রাধাকান্তবাবু।

চমকে উঠলেন স্বর্ণবাবু; দারোগাবাবুও চমকে ব'সে উঠলেন, মাই গড!

স্বর্ণ কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে গোঁফে বারকয়েক তা দিয়ে বললেন, হুঁ। আচ্ছা। নমস্কার রাধাকান্তদা। আসুন দারোগাবাবু।

রাধাকান্ত দরজা বন্ধ করছিলেন। হঠাৎ পিছনে কেউ এসে—কে আর হবে—কাশীর বউ এসে দাঁড়ালেন। দরজার হুড়কোটা টেনে নিয়ে রাধাকান্ত বললেন, তুমি আবার নেমে এলে কেন?

আমি বেরিয়ে যাব।

চমকে উঠলেন রাধাকান্ত। কে? যোড়শী?

হ্যাঁ বাবা। আমি। যোড়শীর মাথার অবগুণ্ঠন খ'সে গিয়েছে। রাধাকান্তের হাতের লণ্ঠনের আলো তার মুখের উপর পড়েছে পরিপূর্ণভাবে। তার দৃষ্টি লজ্জাহীন, কুণ্ঠাহীন, ভয়লেশহীন। রাধাকান্তের পায়ে প্রণাম ক'রে সে বললে, দরজা খুলে দেন বাবা, আমি যাই।

কোথায় যাবে?

যাব—। কয়েক মুহূর্ত সে চুপ ক'রে রইল, তারপর বললে, বলতে লজ্জা হচ্ছে বাবা। আমি—

রাধাকান্ত দরজা খুলে দিলেন। যোড়শী বললে, আমি বর্দ্ধমান যাব।

বর্দ্ধমান?

হ্যাঁ। সেখানে শুনেছি বেশ্যারা থাকে। অনেক টাকা তারা রোজকার করে। বড় বড় বংশের বাবুরা সেখানে তাদের পায়ে গড়াগড়ি যায়, পায়ে ধরে।

রাধাকান্ত এক মুহূর্ত্তে আবেগে অভিভূত হয়ে গেলেন, বললেন, ফিরে আয় মা, ফিরে আয় ষোড়শী।

না বাবা, না। না।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটা সাদা কিছু দ্রুততম গতিতে অগ্রসর হয়ে গেল, পিছনের অন্ধকার স্তর যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিধিতে স্থূলতর হয়ে রাধাকান্তের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে তাকে অদৃশ্য ক'রে দিয়ে আপনার মধ্যে আবরিত ক'রে নিলে।

* * *

রাধাকান্ত নিজের ডায়েরিতে লিখলেন, কুলত্যাগিনী হইয়া ঘর হইতে চলিয়া অনেকেই যায়। গোপনে যায়। প্রভাতে প্রচার হয়। কিন্তু এমন উন্মাদিনীর মত যাওয়া—এই নূতন। উর্ব্বশীর অভিশাপ অর্জ্জুনের উপর ফলবতী হইয়াছিল। ষোড়শী কাহাকেও অভিসম্পাৎ দিয়া গেল কি না জানি না, তবে দিয়া থাকিলে সে অভিশাপ যে ফলবতী হইবে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। এ কথা আমি কাশীর বউকেও বলিব না। কারণ ষোড়শীর দৃষ্টান্ত নারী-সমাজের পক্ষে শুভ নয়। ষোড়শীর কথাতে একটা উপমা মনে আসিতেছে। এমন ধরনের মেয়েকে লইয়া মাটির ভাঁটার মত লোফালুফি চলে, অবশেষে ফেলিয়া দেয়, তখন পায়ে পায়ে গড়াইয়া চলে। এ যেন একটা মাটির ভাঁটা জীবন্ত হইয়া উল্কার মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

আরও একটি উল্কাপিণ্ড নবগ্রাম থেকে ছিটকে বার হয়ে গেল। নবগ্রাম যে গতিতে ঘুরছে চলছে, তার অপেক্ষা অধিক গতি সঞ্চয় করার ফলে তাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হ'ল। কিশোরও চ'লে গেল।

সে প্রথম এসে দাঁড়াল গ্রামপ্রান্তে স্বর্ণবাবুর বাগানের ধারে। চমকে উঠল সে। বারান্দায় আলো জ্বলছে। উলঙ্গ হয়ে প'ড়ে আছে নিকষের মত কালো একটি তরুণী মেয়ে, মেয়েটার ভ্রমরের মত কোঁকড়ানো চুল এলিয়ে ঝুলে পড়েছে দাওয়া থেকে মাটির দিকে। অজ্ঞানের মত প'ড়ে আছে। অর্দ্ধ-উলঙ্গ দারোগা প'ড়ে আছে এক দিকে, স্বর্ণবাবু এক দিকে।

দ্রুত সে স্থান অতিক্রম ক'রে সে এসে দাঁড়াল ইস্কুলের বনিয়াদের ধারে। সেখান থেকে আরও একটু এসে আবার দাঁড়াল। ফিরে চাইলে। আবার দ্রুতবেগে চলল।

পরদিন আবার নূতন বার্ত্তার কোলাহল উঠল গ্রামে। ইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে। লোকে বললে, নবগ্রাম সাতরঙের গেরাম। একটা না একটা লেগেই আছে।

পাল-পার্ব্বণ, পূজা-সমারোহ, অন্নপ্রাশন, বিয়ে, ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম নবগ্রামে বাবুদের ছেলের পৈতে, শ্রাদ্ধ, প্রবীণ লোকের জ্ঞানগঙ্গাযাত্রা, এসব রঙ্গে এখানকার মানুষ বিস্মিত হয় না ; এসব রঙ্গে ভূরিভোজন হয়, ভাগবৎপাঠ, রামায়ণগান, কীর্ত্তনে পালা-গান, যাত্রাভিনয় হয়, বিয়ে-সাদীতে খ্যামটা-নাচ হয় ; লোকে পেট ভ'রে ভালমন্দ খায় রাত্রি জেগে উৎসব দেখে। মাঘী পূর্ণিমায় চণ্ডীমায়ের বিশেষ পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে, সেখানে এই সব উৎসব ছাড়াও কবিগান হয়, ঝুমুর-নাচ আসে, মুসলমানদের জন্ত মেরাচিন, লেটোর নাচ হয়। এ ছাড়া বাউড়ী ডোম হাড়ী এদের রঙ্গ আছে গাজনে, ধরম-পূজোয়, মনসা-পূজোয়, ভাঁজো-পরবে, ঘেঁটু-পূজোয়, এসব রঙ্গে তারা মদ খায় নাচে গায় ; গ্রামের ভদ্র-শূদ্রেরা ওদের পাড়ায় যায় না, ওরাই দল বেঁধে এসে নাচগান শুনিয়ে যায় পাড়ায় পাড়ায়। মুসলমানেরা এখানে সংখ্যায় অল্প এবং আজকাল, প্রাচীন মির্‌য়া-বংশের সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়ার পর থেকে, নিতান্তই অবজ্ঞাত। ওদের পর্ব্বপার্ব্বণের ঢেউ ওদের পল্লীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, কেবল মহরমের সময় সে ঢেউ পাড়া পার হয়ে গোটা গ্রামে সাড়া জাগায়। ছোটবড় তাজিয়া নিয়ে, বাজনা বাজিয়ে হাসান-হোসেনের নামের ধ্বনি তুলে গ্রামের সকল পাড়া প্রদক্ষিণ ক'রে, স্থানে স্থানে তাজিয়া নামিয়ে লাঠিখেলা দেখায়। মধ্যে মধ্যে গাইয়ে-বাজিয়ে ওস্তাদ আসে, স্বর্ণবাবুর বাড়ি, রাধাকান্তের বাড়ি, গোপীচন্দ্রের বাড়ি, বংশলোচনের বাড়ি জলসার আসর বসে, বাবুপাড়ার আসর শেষ হ'লে, গন্ধবণিক পাড়ার আসর বসে, সেও এক রঙ্গ। এ ছাড়া আছে বৈষয়িক রঙ্গ—দাঙ্গা, ফৌজদারী, দেওয়ানী নানাবিধ মামলা ; এর বিরাম নাই, চলছেই চলছেই চলছেই। এ রঙ্গের আসর এখন জমজমাট। গোপীচন্দ্র এবং স্বর্ণবাবুর মধ্যে তুমুল ব্যাপার চলছে। এক বৎসরের মধ্যে চারটে দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে। অবশ্য দাঙ্গাগুলির আর আগেকার মত রঙ নাই, রক্তারক্তি প্রায় হয় না ; পুলিস এসে এক শো চুয়াল্লিশ ধারা জারি ক'রে যায়। তারপর চলে মামলা। এদিক দিয়ে স্বর্ণবাবুরই জিতপাল্লা চলেছে। গ্রামের লোকেদের কতক স্বর্ণবাবুর দিকে, কতক গোপীচন্দ্রের দিকে, কতক নিরপেক্ষ। সাধারণ মধ্যবিত্তেরা —চাকুরে ব্রাহ্মণ থেকে বণিক, মোদক, সাহা, গড়াই এরা সকলেই অন্তরে অন্তরে গোপীচন্দ্রের জয়কামনা করে। গোপীচন্দ্র আজ ধনী হ'লেও কিছুকাল আগেও নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন, আজও সকলে তাঁকে আপনাদের একজন মনে করে। স্বর্ণবাবুর জ্ঞাতিবর্গ স্বর্ণবাবুর পক্ষে আছে, আরও আছে অভিজাত বংশের কেউ কেউ। নিরপেক্ষদের অধিকাংশই হাড়ী ডোম বাউড়ী, তারা এক দিকে গোপীচন্দ্রের সম্পদের প্রাচুর্যে আকৃষ্ট, অন্য দিকে স্বর্ণবাবুর পৈতৃক আমলের প্রতিষ্ঠার প্রতাপে ভীত ত্রস্ত। পশুর মত তারা সভয় বিস্ময়ে দূরে দাঁড়িয়ে এ বিবাদ দেখে। স্থানীয় মুসলমানেরাও নিরপেক্ষ। ইসলাম-ধর্ম্মের কল্যাণে তারা মানসিকতায় মর্য্যাদাবোধে স্থানীয় বণিক সাহা এদের সমকক্ষ হ'লেও

আর্থিক অবস্থায় অত্যন্ত দুর্বল, তারাও বাধ্য হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখে। সাত রঙ্গ কেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব করলে নবগ্রামে শত রঙ্গের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা যায়। পুরুষানুক্রমে চ'লে আসছে রঙ্গগু'ল। কিন্তু ইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনার রঙ্গ এখানে নূতন। ইস্কুল হবে—এ সংবাদের রঙ্গ এমন ক'রে মানুষকে আলোড়িত করে নি, বিস্মিত করে নি।

ইস্কুলের বাড়ির ভিত কাটা হয়েছে; সেইখানে চাঁদোয়া খাটানো হ'ল; বাঁশের খুঁটিগুলিতে দেবদারুর পাতা বেঁধে, রঙিন কাগজের শিকল জড়িয়ে সুশোভিত করা হ'ল; সদর শহর থেকে, মহকুমা শহর থেকে রাজকর্মচারীরা এলেন; উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ীরা এলেন; কলকাতা থেকে এলেন গোপীচন্দ্রের ব্যবসায়ের অংশীদার, বন্ধু, কর্মচারীর দল। বিলিতী হোটেলের ঝকঝকে তকমা আঁটা, পাগড়ি পোশাক পরা বয় বাবুর্চি এল চায়ের আসর সাজাতে। মাঠের মধ্যে তাঁবু পড়ল। কলকাতা থেকে আরও আসছে লক্ষ্ণৌয়ের দুজন বাঈ। ম্যাজিস্ট্রেট মামুদ সাহেব বিলেত-ফেরত আই. সি. এস., বাইরে খাঁটি সাহেব, ঘরেও তাই, বিস্তু ফরাসি, আতর এবং বাঈজীর গান এ তিনের নেশায় তিনি খাঁটি আমির। সাহেবের শখের কথা জেনেই বাঈজীর গানের ব্যবস্থা করেছেন গোপীচন্দ্র। এ ছাড়া আরও আয়োজন হচ্ছে, এইজন্য গান বাঁধা হয়েছে, সেই গান গেয়ে অভ্যাস করা চলছে।

জয় রা-জপুরুষ, প্রভু প্রতিপা-লক, রা-জ মহিমাময় হে
দেশে দুষ্ট দমনে তথা শিষ্ট পালনে, জয় জয় তব জয় হে।
দয়ার-সাগর তুমি দয়াল-ভূপ হে
জলহীন গ্রামে প্রদানিলে কত কূপ হে
ধরি শাসনদণ্ড শিবত্রিশূলরূপ হে কর দুষ্টজনে ক্ষয় হে।
আজিকে হেথায় দয়া ক'রে তুমি এসে হে
অবিদ্যা-রাক্ষসীরে নাশি ধরিয়া কেশে হে—
আহা বিদ্যাদেবীরে স্থাপিছ এই দেশে হে একি নব অরুণোদয় হে।

গানটি রচনা করেছেন কলকাতা থেকে সমাগত গোপীচন্দ্রের এক আত্মীয়, তিনিও কয়লার ব্যবসায়ী এবং কবি। তিনি নিজে পবিত্র মঙ্গল এদের আসরে ব'সে জোর রিহার্সাল চালাচ্ছেন।

এ ছাড়া আরও আছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজের হাতে গাঁথনি করবেন। রূপোর কর্নি তৈরি হয়েছে। ইট আসছে নাকি বিলাত থেকে। কেউ বলছে, বিলাত থেকে নয়, কলকাতা থেকে। গোলাপজলে নাকি মসলা মাখা হবে। একটা বোতলে এই বছরের গিনি টাকা আধুলি সিকি দুয়ানি পয়সা পুরে দেওয়া হবে, তার সঙ্গে একখানা

কাগজ থাকবে, সেই কাগজে লেখা থাকবে সাহেবের নাম ও গোপীচন্দ্রবাবুর নাম। বোতলটার মুখ বন্ধ ক'রে গালামোহর এঁটে ইস্কুলের ভিতের তলায় পুঁতে দেওয়া হবে।

শত রঙ্গের গ্রাম নবগ্রামেও এ রঙ্গ নূতন। গৃহারম্ভ গৃহপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, পঞ্চদেবতার পূজার্চ্চনা হয়, গ্রাম-দেবতাদের পূজা দেয়, যাগযজ্ঞও করায় অনেকে, পুরোহিত আসে মন্ত্র পড়ে আহুতি দেয়; অনেক গৃহস্থ ব্রাহ্মণ-ভোজনও করায়, কিন্তু সে রঙ্গের রঙ ফিকে হয়ে গিয়েছে, ওতে আর দেখবার কিছু নাই। এ রঙের আয়োজন-পর্ব্ব থেকেই আবালবৃদ্ধবনিতা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছে দিনটির জন্য।

এরই সমারোহের মধ্যে কিশোরের গ্রামত্যাগের সংবাদ চাপা প'ড়ে গিয়েছে। অমূল্য ভূপতি পর্য্যন্ত আর ষোড়শী সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করছে না। লক্ষ্ণৌয়ের অধিবাসিনী গায়িকা দুজনের রূপকল্পনায় তারা ব্যস্ত। সমস্ত গ্রামটাই ব্যস্ত। এখানে মাঘী-পূর্ণিমায় চণ্ডীতলায় মেলা হয়, পূর্ণিমার তিন-চার দিন আগে থেকেই সেখানে মজুর লাগে, জায়গা পরিষ্কার করে, দোকানীরা এসে দোকানের চালার কাঠামো বাঁধে, শামিয়ানা খাটানোর জন্য বাঁশ পোঁতা হয়,—এ সময় গ্রামের বয়স্ক লোকেরা ওদিকে যায় না; কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের দল প্রথম দিন থেকেই ওখানে গিয়ে ভিড় জমায়। ইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনার যে আয়োজন গোপীচন্দ্র করেছেন, তার সমারোহ এবং অভিনবত্বের কাছে এখানকার সমস্ত অঞ্চলটার আবালবৃদ্ধবনিতা যেন ছেলেমানুষ হয়ে উঠেছে। দলে দলে লোক আসছে, দেখে যাচ্ছে।

গোপীচন্দ্র নিজে এখানে আসন গেড়ে বসেছেন। মিস্ত্রীশালার জন্য বাঁশে খড়ে যে চালাটা তৈরি হয়েছে, যেখানে সালেবেগ মের্জ্জা এবং ইমারৎ-সরকারের আড্ডা ছিল সেই চালায় তাঁর আসর পড়েছে। আরও কয়েকটা চালা দ্রুতবেগে তৈরি করার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রায় শেষ হয়ে এল। একটা চালায় পড়বে অমরচন্দ্রের আসর। অমরচন্দ্রের হাতেই প্রায় সব ব্যবস্থার ভার। প্রফেসার মানুষ, এসব ব্যাপারের হালহদিস নিয়ম-কানুন তাঁর চেয়ে আর ভাল জানবে কে? অমরচন্দ্র শুধু শিক্ষিত মানুষই নন, কর্ম্মিৎ-কর্ম্মা লোকও বটেন। শক্তিশালী দেহ, উন্নত শিক্ষিত মন, তাঁর প্রতি ব্যবস্থাটির মধ্যেই ফুটে উঠছে এমন একটি সুকুমার রুচি ও রূপের পরিচয়—যা শুধু লোককে সুন্দর ব'লে মুগ্ধই করে না, অভিনব ব'লে প্রতিটি লোকের মনে বিস্ময়েরও উদ্রেক করে। অমরচন্দ্রের প্রভাব স্থানটির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে; একটা কথা ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে এখানে; সালেবেগ মের্জ্জা পর্য্যন্ত কথাটা বার বার বলছে। মজুর-মজুরনীদের কাজের তাগিদ দেবার প্রয়োজনে রয়েছে, সেই তাগিদ দিয়ে সে বলছে, দৈত্যের মত খাটতে হবে, জিনের মত খাটতে হবে।

অমরচন্দ্র বলেন, জায়েণ্ট—জায়েণ্টের মত খাটতে হবে।

কথাটা শুনে মের্জ্জা সবিস্ময়ে অমরচন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে থেকেছিল। অমরচন্দ্র বুঝিয়ে বলেছিলেন, মের্জ্জা সাহেব, মানুষের খাটনিতে কতটুকু হয়? জায়েণ্ট মানে দৈত্য, দৈত্যের মত খাটতে হবে, জিনের মত খাটতে হবে।

কথাটা বড় মনে ধরেছে মের্জ্জার। দৈত্যের মত জিনের মত না খাটলে এত বড় সমারোহের কাজ কখনই সম্পন্ন হতে পারে না। নিজের আসরে ব'সে গোপীচন্দ্রও কথাটা ভাবছিলেন। অমরচন্দ্র সত্য কথা বলেছে। কিন্তু মানুষকে দৈত্যের শক্তিতে শক্তিমান ক'রে তুলতে হ'লে মুখের কথায় কিছু হবে না। অমরচন্দ্র উৎসাহবাক্য ব'লে চলেছেন, সালেবেগ তাগিদ দিচ্ছে, কীর্ত্তিচন্দ্র বেত নিয়ে ঘুরছেন। চাবুক মেরে স্বর্ণবাবু সম্প্রতি একটা কাণ্ড করার পর তিনি বেত কাউকে মারেন নাই, কিন্তু আস্ফালন ক'রে চলেছেন। তবু কাজের গতি মনের মত বেগে অগ্রসর হচ্ছে না। গোপীচন্দ্রের পাশে ব'সে বংশলোচন ক্রমাগত বাক্‌চাতুর্য্য প্রকাশ ক'রে চলেছেন।

বন্দোবস্ত—বন্দোবস্ত হ'ল আসল জিনিস। কাজের বিলি-ব্যবস্থা। এক-একজন লোককে এক-একটি কাজের ভার দিতে হবে। এত বড় রাজসূয় যজ্ঞটায় যুধিষ্ঠির যজ্ঞস্থলে আসনে ব'সে খালাস।

টমটমটা এসে থামল ঠিক এই সময়ে চালার সামনে। টমটম থেকে নামলেন কীর্ত্তিচন্দ্র। বংশলোচন বললেন, কি হে ভায়া, এই এতক্ষণে ঘুম ভাঙল নাকি? নাতবউয়ের মুখচন্দ্র দেখে—

হেসে বাধা দিয়ে কীর্ত্তিচন্দ্র বললেন, পা মচকে গিয়ে বেদনায় কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। হেঁটে আসতেও পারলাম না।

ওই হ'ল হে! নাতবউয়ের মুখ দেখে বিশ্বসংসার ভুলে চলতে গিয়ে পা মচকে ফেলেছ।

অমরচন্দ্র এসে দাঁড়ালেন; বললেন, একজন কাউকে ষ্টেশনে পাঠাতে হবে। দুখানা টেলিগ্রাম ক'রে আসবে। গাড়ি নিয়েই চ'লে যাক। পবিত্রই চ'লে যাক বরং।

টেলিগেরাম?

হ্যাঁ। ভাইসচ্যান্সেলারের কোন মেসেজ এখনও পেলাম না। আপিসে একখানা টেলিগ্রাম করতে হবে, কেউ যাবে আমার বন্ধু প্রফেসার গুপ্তের কাছে, তিনি নিজে ভাইসচ্যান্সেলারের কাছে গিয়ে মেসেজ লিখিয়ে তার হাতে দিয়ে দেবেন। আর একখানায় প্রফেসার গুপ্তকে ওই কথা জানাতে হবে।

কীর্ত্তিচন্দ্র সহিসকে বললেন, যা তুই, পবিত্রকে নিয়ে আয় এখুনি। বলবি, টেলিগ্রাম করতে যেতে হবে, তৈরি হয়ে আসুন।

অমরচন্দ্র কীর্ত্তিচন্দ্রকে বললেন, তোমার এত দেরি? কাজকর্ম্ম কি ক'রে হবে?

আমার পা মচকে একটু ফ্যাসাদ বাধিয়েছে।

পা মচকে? সর্ব্বনাশ! Cure it at once—যেমন ক'রে হোক সারিয়ে ফেল। ডাক্তারকে ডাক। গুলার্ডস লোশন লাগাও। এখন এদিকে এস।

গোপীচন্দ্র এতক্ষণে কথা বললেন।—একটু দাঁড়াও। সালেবেগকে একবার ডাক।

সালেবেগ ছুটতে ছুটতে এল।

গোপীচন্দ্র বললেন, কাজ এগুচ্ছে না। অথচ সময়ও হাতে নাই। এক কাজ কর, মজুরদের চার পয়সা, মজুরনীদের দু পয়সা, ছুতোরমিস্ত্রীর দু আনা, রাজমিস্ত্রীর দু আনা মজুরি বাড়িয়ে দাও। খাটতে হবে এক ঘণ্টা বেশি।

বংশলোচন প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন, নিজস্ব ভঙ্গীতে ধমকের সঙ্গে উপদেশ দেওয়ার সুরে ব'লে উঠলেন, থাম হে বাপু! করছ কি তুমি? বলি, মানুষের শক্তির তো একটা সীমা আছে, না নাই? বেশি মজুরি পেলে সেটা বাড়বে নাকি? তোমার পয়সা আছে দিতে অবশ্য পার। কিন্তু আমরা—আমরা কি করব?

গোপীচন্দ্র হাসলেন।

বংশলোচন বললেন, হাসছ কি হে বাপু? দশ পয়সা ছিল তিন পহরের মজুরি, তুমি করলে তিন আনা, তিন আনাকে করলে চৌদ্দ পয়সা, আবার চার পয়সা বাড়িয়ে সাড়ে চার আনা করছ।

গোপীচন্দ্র আবার একটু হাসলেন। বললেন, উপায় কি বলুন? স্বর্ণভূষণ ওদিকে 'তুরকডাঙ্গায়' জমি কাটাতে আরম্ভ করেছে, নদীর ধারে বাঁধ আরম্ভ করেছে। আজই প্রায় পঞ্চাশজন মজুর আসে নাই।

মরেছে, মরেছে, এইবার মরেছে। এইবার লোকটা কোলা-ব্যাঙের মত ফুলতে গিয়ে ফেটে ম'রে যাবে। হরি হরি হরি! নারায়ণ হে। বংশলোচন একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, কিন্তু তুমিও একটু সাবধান হবে গোপীচন্দ্র। অর্থাৎ আয় ব্যয় বেশ হিসেব ক'রে করবে। লক্ষ্মী বাঁধা থাকেন হিসেবে, বুঝেছ? হিসেবের গিঁঠ আলগা হ'লেই, খোলা কৌটোর কর্পূরের মত অন্তর্দ্ধান হন—গজভুক্ত কপিত্থবৎ, বুঝলে?

স্বর্ণবাবুর টমটম এসে দাঁড়াল। টমটম থেকে নামলেন স্বর্ণবাবু।

বংশলোচন একেবারে শতমুখ হয়ে উঠলেন। আরে বাপ রে বাপ রে! অহো ভাগ্য, অহো ভাগ্য! আসুন আসুন, মহাভাগ আসুন! কই, আপনার সঙ্গীটি কই? রাধাকান্ত? কানাই বলাই দুই ভাই, ব্যাঙ মারে ঠুইঠাই!

স্বর্ণবাবু কোন কথা বলবার আগেই গোপীচন্দ্র বংশলোচনের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, এস, এস ভাই। এত বড় কাজ, তোমাদের কাজ, তোমরা এসে না দাঁড়ালে, আমার একার সাধ্য কি?

স্বর্ণবাবু হাসলেন, বললেন, লচুকাকা আপনার একাই এক শো গোপীচন্দ্র। এ রাজসূয় যজ্ঞে উনিই আপনার জনার্দ্দন।

আর তুমি? দুর্য্যোধন নাকি?

যা বল। শুধু শিশুপাল হতে চাই না। মানে, মরতে কে চায়, বল? একটু থেমে আবার স্বর্ণভূষণ বললেন, বিশেষ তুমি জনার্দ্দন হ'লে, তোমার চক্রে মাথা কাটা গেলে ম'রেও সুখ পাব না লচুকাকা।

গোপীচন্দ্র বললেন, না না না। তুমি আমার ধনঞ্জয়। এ যদি রাজসূয়ই হয় ভাই, তবে তোমার বলেই তা সম্পন্ন হবে। এস, সব দেখাই।

ওই যে, রাধাকান্ত আসছেন! বংশীবদন, গোপকুলপতি! মরি মরি মরি, চলন দেখ! বংশলোচন কণ্ঠস্বর উচ্চ ক'রে রাধাকান্তকে ডেকে বললেন, বলি ওহে, একটু পা চালিয়ে এস।

রাধাকান্ত পদব্রজেই আসছিলেন, পায়ে-হাঁটা পথ ধ'রে। বংশলোচনের চোখেই আগে পড়েছিলেন তিনি। রাধাকান্ত আসতেই গোপীচন্দ্র তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানালেন। সম্পর্কে তিনি গোপীচন্দ্রের মামা। বললেন, আসুন মামা। আমি বাঁচলাম। আপনারা না এলে, আমার একার কি সাধ্য বলুন? আমি উপলক্ষ্য হ'লেও এ তো সর্ব্বসাধারণের কাজ।

বংশলোচন বললেন, তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে হেলে দুলে আয় রে চাঁদের ক-ণা! মরি মরি মরি! চলতে শিখেছিলে বটে বাবা!

রাধাকান্ত বংশলোচনের কথার কোন উত্তর দিলেন না। গোপীচন্দ্রকে বললেন, হ্যাঁ, অপরাধ স্বীকার করতে হবে। তবে কি জানেন, এসব যজ্ঞে আসন গ্রহণ করবার মত যোগ্যতা আমাদের নাই। সেই নিয়েই মনে দ্বিধা হচ্ছিল। আজ দ্বিধাকে জয় করলাম। চলুন, কি করতে হবে বলুন।

বংশলোচন মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, স্বর্ণবাবু কথার উত্তর দিয়ে যে আঘাত তাঁকে করেছিলেন, রাধাকান্তের নিরুত্তরতার উপেক্ষা তার চেয়ে শত গুণ বেশি আঘাত করলে তাঁকে। তিনি হঠাৎ ব'লে উঠলেন, বলি হ্যাঁ হে রাধাকান্ত, শুনলাম নাকি গোপপল্লীর এক সদগোপবালা কুলত্যাগ ক'রে তোমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে! মানে যে মেয়েটিকে নিয়ে এত কাণ্ড হয়ে গেল!

রাধাকান্ত তাঁর দিকে ফিরে এবার বললেন, হ্যাঁ লচুকাকা, মেয়েটি আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। আমার স্ত্রীকে মা বলত, আমাকে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বংশলোচন বললেন, তোমাকে বাবা বলত। হ্যাঁ, তারপর?

রাধাকান্ত বললেন, অক্ষম পিতামাতার লজ্জাই আমাদের সার হয়েছে লচুকাকা,

মেয়েটিকে রক্ষা করতে পারলাম না। মেয়েটির উপর যাদের কুদৃষ্টি ছিল, তারা আমার বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে গালাগাল আরম্ভ করলে, আমাকে গালাগাল করতে লাগল। দু পহর রাত্রিতে আমাকে ডেকে কেউ বললে, ওকে বার ক'রে আমার হাতে দাও। তোমার মতই, কন্যা ও পিত'—এই সম্বন্ধের উপর কটাক্ষ ক'রে কুটিল সমালোচনা করতেও ছাড়লে না। আমার যদি বা সহ্য হ'ল বা হ'ত, মেয়েটির কিন্তু সে সহ্য হ'ল না। গভীর রাত্রে, আমার পাশ কাটিয়ে, বাড়ি থেকে চ'লে গেল। আমার মুখের উপর ব'লে গেল, আমি বর্দ্ধমান চললাম, বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করব। শুনেছি, ধনী জমিদারেরা তাদের পায়ে গড়াগড়ি যান, পায়ে ধরেন।

বল কি?

হ্যাঁ লচুকাকা, দুটি পায়ে আলতা প'রে সে বর্দ্ধমানে ব'সে আছে। এই গ্রামের ধনী জমিদারদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছে। ইচ্ছে হ'লে দেখে আসতে পার।

সমস্ত আবহাওয়াটা যেন থমথমে হয়ে উঠেছিল। রাধাকান্তই সে আবহাওয়াকে কাটিয়ে দিয়ে বললেন, চলুন, দেখি সব কোথায় কি ব্যবস্থা হচ্ছে।

আসুন।

গোপীচন্দ্র সকলকে নিয়ে অগ্রসর হলেন।

সালেবেগ হেসে বললে সরকারকে, বাবুরা সব আমাদের সিঁদুরে আম। বাইরেটি একারে রাঙা টুকটুক করছে, ভিতরটি একারে জোঁদা টক। বাইরের বাতচিত্ত শুনে কে বলবে যে, ইয়ারা বাগে পেলে এ উয়ার গলায় ছুরি দিতে পারে, উ ইয়ার মাথার ডাঙস মারতে পারে। তবে হ্যাঁ, লচুবাবু আমাদের রসিক আদমী আছেন।

সরকার বললে, এ দিক দিয়ে আমাদের মনিহারপুরের গাঙুলী বাবুরা। আজও পর্য্যন্ত তো কেউ আগে নমস্কার করতে পারলে না, কথা বলতে পারলে না, গাঙুলী বাবুদিকে। এই স্বর্ণবাবুর মায়ের ছাদ্দের (শ্রাদ্ধের) সময়, বুঝলে মিয়াসাহেব, তিন ভাই এলেন হাতীতে চড়ে; হাতীতে এল বটে, কিন্তু নামল গাঁ ঢুকবার আগে; জুতো খুলে খালি-পায়ে হেঁটে এলেন স্বর্ণবাবুর বাড়ি। অথচ স্বর্ণবাবুর সঙ্গে চরম ঝগড়া মহালের সীমানা নিয়ে। স্বর্ণবাবু ওদের পাইকের গালে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছিলন একবার, পাইকটা সীমানা চড়াও করতে এসেছিল। খবর পেয়ে গাঙুলীবাবুদের লাঠিয়াল এসে স্বর্ণবাবুর গমস্তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে পাছাতে কল্কে পুড়িয়ে ছাপ দিয়ে দিয়েছিল। বুঝেচ?

উনিশ শো পাঁচ-ছয় সাল। সে সময় এই ছিল সামাজিক রীতি। সমাজের প্রধান ছিলেন অভিজাত-বংশীয়েরা; তাঁরা জমিদার-শ্রেণী। দশশালা বন্দোবস্তের ফলে চঞ্চলা লক্ষ্মীর পায়ে বেড়ি না হোক, চরণাভরণের ওজন বেড়েছিল। তাঁর চলাফেরার গতি

হয়ে পড়েছিল মন্থর। ফলে বংশানুক্রমিক সম্পদের সঙ্গে বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠা ও বৈষয়িক বিরোধেরও অন্ত ছিল না। সমাজের কল্যাণ-কামনাতেই তাঁরা সামাজিক প্রধান হিসাবে, এই বিরোধকে সামাজিক ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখবার চেষ্টাতেই এ রীতির প্রচলন করেছিলেন। রীতির মূল সন্ধান করলে কপটতাই আত্মপ্রকাশ করবে, কিন্তু সমাজের কল্যাণে এ রীতিতে তাঁরা অকপটভাবে বিশ্বাস করতেন। ফলও কিছু হয়েছিল। বীজে বিষ থাকলেও বর্ণে গন্ধে ফুলের রূপ হয়েছিল অপরূপ; কিন্তু সে ফুল যে ফলে পূর্ণতা লাভ করত, স্বাভাবিক পরিণতিতে তার সঙ্গে বীজের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বকাল থেকেই এ রীতি প্রচলিত, রাজসূয়ের আসরে পাণ্ডব কৌরব মিলনের যে ফুল ফুটেছিল, কুরুক্ষেত্র সেই ফুলেরই ফল।

নবগ্রামে হাই-ইংলিশ স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনার উৎসবকে রাজসূয়ের সমারোহের সঙ্গে তুলনা করা অবশ্য অসম্ভব মনে হতে পারে, শুদ্ধমাত্র খরচের নজিরই তার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ; কিন্তু আরব্য উপন্যাসের গল্পের আকাশে মাথা-ছোঁয়া দৈত্য আর বোতলের মধ্যে বদ্ধ দৈত্য যদি এক হয়, তবে এ দুটি উৎসবকেও পরস্পরের সঙ্গে তুলনীয় বলা যেতে পারে। দুয়েরই কর্ম্মফল এক। নবগ্রামে এমন অভিনব উৎসব আর কখনও হয় নাই। এত সমারোহও কখনও হয় নাই। এমন জনসমাগমও কখনও হয় নাই। পল্লীগ্রামে বড় উৎসব-সমারোহের বিরাটত্ব বর্ণনার চরম ভাষা হ'ল, "চেলেতে হাল ছাড়লে, জেলেতে জাল ছাড়লে, কুমোরে চাক ছাড়লে, ঢেকোতে ঢাক ছাড়লে, তাঁতীতে মাকু ছাড়লে, নাপিতে ক্ষুর ছাড়লে, বদ্যি (বৈদ্য) রোগী ছাড়লে, পোয়াতী পো ছাড়লে, বাসী ঘরে ঝাঁটা পড়ল না, শয়নঘরের 'শিড়' (শয্যা) উঠল না, উঠোনে 'ছোঁচ' পড়ল না (নিকানো হ'ল না), উনোনে আঁচ পড়ল না; মেয়ে পুরুষ, ছেলে বুড়ো 'দে-দুয়োরী' (প্রতি ঘরের) ছুটল।" এ উৎসবেও তাই হ'ল বলা যায়। আশপাশের গ্রামের লোকেরা ভিড় ক'রে দেখতে এল। সত্য সত্যই সে দিন অনেক চাষীর হাল বন্ধ থাকল। সেখমপুর গ্রামের কয়েকজন কুম্ভকার এসেছিল, তাদের 'চাক' বন্ধ থাকল। ডেপুটি, সাবডেপুটি, সাবজজ, মুন্সেফ, পেশকার, নাজির, উকিল, মোক্তার, জমিদার, ব্যবসায়ী, কয়েকটি ইস্কুলের হেডমাষ্টার নিয়ে জেলার সম্ভ্রান্ত লোকের সে এক বিরাট সভা। আসেন নাই কেবল জজসাহেব। কলকাতার ব্যবসায়ী এবং গোপীচন্দ্রের ব্যবসায়ের কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুজন সাহেব ছিলেন। গ্রামের সকলেই গিয়েছিলেন। সামাজিক রীতির সঙ্গে সভার আসরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্ব হেতু তাঁদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক ক'রে তুলেছিল। গোপীচন্দ্র কালো সার্জ্জের চোগা-চাপকান, সাদা সিল্কের প্যান্ট, মাথায় কালো পাগড়ি প'রে বসলেন; দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন মানুষটিকে এই পোশাকে সমস্ত সভার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং মনোহারিত্বে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছিল।

কীর্ত্তিচন্দ্রও এই পোশাক পরেছেন; ছোট ছেলে পবিত্র চাপকান পরে নাই, পেণ্টালুন কোট টাই-এর সঙ্গে মাথায় পাগড়ি পরেছে। অমরচন্দ্রের পোশাক খাঁটি সাহেবী, তিনি হ্যাট মাথায় দিয়েছেন। বিরাট জনতা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করছিল। থানার কনষ্টেব্‌ল, চৌকিদার, জমাদার এরা সে গণ্ডগোল সংহত করবার চেষ্টায় ঘুরছে, তাদের সঙ্গে ঘুরছে পবিত্রের সঙ্গীর'—মঙ্গল, শূলপানি, ভড়ম্বা, ওদের সঙ্গে অমূল্য ভূপতিও আছে। ওরা দুজনে মধ্যে মধ্যে মৃদুস্বরে গোপীচন্দ্রকে গালাগালও দিচ্ছে আবার গোলমাল থামাবারও চেষ্টা করছে। দু-চারজনকে ধাক্কাও দিচ্ছে। সমগ্র জনসমাজ দেখতে পেলে আজ গোপীচন্দ্রের বিরাট রূপের যথার্থ মহিমা। তিনি যে এতবড় মানুষ এ কথা লোকে ভাবতে পারে নাই। ডেপুটি, মুনসেফ, উকিল কয়েকজন থেকে আরম্ভ করে, স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত বক্তৃতা ক'রে বললেন, নবগ্রামের বহু তপস্যার ফলে, এখানকার অধিবাসীদের অসীম সৌভাগ্যের বলেই গোপীচন্দ্রের মত কীর্ত্তিমান সৌভাগ্যবান ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে এখানে। গোপীচন্দ্রের এ কীর্ত্তি অক্ষয় কীর্ত্তি। নবগ্রাম সে কীর্ত্তিকে বক্ষে ধারণ ক'রে গৌরবান্বিতা হ'ল। আরও অনেক কীর্ত্তিই নবগ্রাম তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করে এবং সে প্রত্যাশা অচিরে পরিপূর্ণ হবে। কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি, কীর্ত্তিবলে গোপীচন্দ্র নবগ্রামে অমরত্ব লাভ করলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এসব কথার সঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বললেন, সরকারকে তিনি গোপীচন্দ্রের এই কীর্ত্তিপ্রীতির কথা জানাবেন। গ্রামের লোকেদের কাছে জানালেন, গ্রাম্য ঝগড়া, ক্ষুদ্র ঈর্ষা দ্বেষ পরিত্যাগ ক'রে গোপীচন্দ্রের নেতৃত্বে গ্রামের উন্নতিতে তাঁদের যত্নবান হওয়া উচিত। আজকাল বাংলা দেশে ইয়ংমেনদের মধ্যে একটা হুজুগপ্রিয়তা দেখা যাচ্ছে। 'বণ্ডেমাটরম্' চীৎকার ক'রে বিলিতী কাপড় পুড়িয়ে সরকারের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ প্রচারের হুজুগ তুলেছে এই নূতন ইস্কুলে শিক্ষায় এবং গোপীচন্দ্রের নেতৃত্বে আপনাদের মত রাজভক্ত জমিদারদের উপদেশ ও শাসনের ফলে আমি আশা করি সে সব হুজুগ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

গোপীচন্দ্রের তরফ থেকে বক্তৃতা দিলেন অমরচন্দ্র তাঁর বক্তৃতা এঁদের থেকে স্বতন্ত্র। গোপীচন্দ্রের তরফ থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বার বার ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, কীর্ত্তি স্থাপনের অভিপ্রায় সকল মানুষের মনেই থাকে। কিন্তু অভিপ্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্য্যে পরিণত হয় না। পুরোহিত ভিন্ন যেমন যজ্ঞ হয় না, উৎসাহদাতা সহৃদয় রাজপুরুষের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্নও তেমনই কীর্ত্তির অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হয় না। আমাদের অভিপ্রায়ও এই মহিমান্বিত হৃদয়বান রাজপুরুষের উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন কার্য্যে পরিণত হ'ত না। আমাদের সাধ্য কতটুকু! সর্ব্বদেবময়ো রাজা; রাজা হলেন সকল দেব-অংশ-সম্ভূত; রাজপুরুষের মধ্যেও তাঁর সেই মহিমার অংশ রয়েছে।

তিনি যখন অনুকূল এবং প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে আমাদের অভয় দিয়েছেন, তখন আমাদের ভয় কি? আমরা সকলে এক হয়ে বিবাদ বিসম্বাদ ভুলে আরও অনেক কাজ করতে পারব। আজ আমরাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ জাতি। অশিক্ষা, কুসংস্কার এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন নিমজ্জিত, আত্মকলহে অহরহ মগ্ন এবং মত্ত। পশু অপেক্ষাও অধম হয়েছি আমরা। দেশ বিদেশ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত মন নিয়ে কুসংস্কার বর্জ্জন ক'রে উন্নতির শিখরদেশে আরোহণ করছে, তখন আমরা টিকি আন্দোলিত ক'রে পঞ্জিকা খুলে তিথি নক্ষত্র গ্রহস্পর্শ মঘা অশ্লেষা অঘা বারবেলা কালবেলা, যোগিনী দিক্‌শূল প্রভৃতির বিচারের কচকচি ক'রে চুপচাপ ব'সে আছি। আজ বেগুন খেতে আছে কি না, কাল মূলো খাওয়া নিষিদ্ধ কি না, এই বিচারে ব্যস্ত। ইংরেজকে ছুঁয়ে আমরা স্নান করি, বিদ্যাশিক্ষার জন্য কেউ বিলাত গেলে তাকে আমরা পতিত করি। পৃথিবী এবং সূর্য্যের মধ্যে চন্দ্র এসে পড়ে সূর্য্যে ছায়া পড়লে, সূর্য্য এবং চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী এসে পড়ে চন্দ্রে ছায়া পড়লে, বিশ্বাস করি রাহু এসে হাঁ ক'রে গিলে ফেলছে, সূর্য্যকে চন্দ্রকে। এমন কি যে মানুষ মরছে, তাকে আমরা মরবার জন্য, ঘর থেকে বাইরে টেনে এনে তুলসীতলায় শুইয়ে দিয়ে, তার কানে চীৎকার ক'রে বলি—হরি বল, তুমি মরছ। কাউকে কাউকে ঠেলে পাঠিয়ে দিই গঙ্গাতীরে কিংবা কাশীতে। আঁতুড়ের ছেলে ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মরে, আমরা বলি—পেঁচোয় পেয়েছে। আমাদের বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য, শ্যাওড়াগাছে পেত্নী, অন্য গাছে ভূত থাকে—অশিক্ষা কুশিক্ষার ভূত। এসব থেকে মুক্ত হবার জন্য আজ আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন শিক্ষার। নূতন ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আমাদের। পৃথিবীর মধ্যে ইংরাজই আজ শ্রেষ্ঠ জাতি। এতবড় যে ফরাসী জাত, সে পর্য্যন্ত তার কাছে পরাভূত হয়েছে। তাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করেছে। আমাদের চরম অধঃপতনের সময়, বিধাতা যে সেই ইংরেজকেই ভারতের সিংহাসন দান করেছেন, এর জন্য আমরা বিধাতাকে ধন্যবাদ দিই। ইংরেজের কল্যাণেই আমরা রেলওয়ে পেয়েছি, টেলিগ্রাফ পেয়েছি, ডাক্তারী শাস্ত্র পেয়েছি, মুদ্রাযন্ত্র পেয়েছি। ইংরেজের কাছে আমাদের অনেক শিখতে হবে। আমাদের অনেক কিছু করবার আছে। শান্তিপূর্ণ ইংরেজ রাজত্বের কল্যাণে একে একে, সে সব করতে পারব আমরা।

গোপীচন্দ্র এই সময় উঠে অমরচন্দ্রের কানে কানে কয়েকটি কথা বললেন।

অমরচন্দ্র আবার বললেন, ইস্কুল হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আমরা বোর্ডিং হাউস স্থাপনা করব এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও স্থাপন করব। এ বিষয়ে আমরা মহামান্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের কৃপাদৃষ্টি ভিক্ষা করি, সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

সাধুবাদে সমস্ত সভা ভ'রে গেল। সভা শেষ হ'ল। এর পর পান ভোজন।

স্থানীয় ভদ্রলোকেরা সাহেবী হোটেলের বাবুর্চ্চিদের ব্যবস্থায় কেউ খেলেন না। সেখানে বসলেন ডেপুটি, সাবডেপুটি, মুনসেফ এবং উকিলেরা কেউ কেউ। কলকাতার ব্যবসায়ীরা সকলেই সেখানে বসলেন। সাবজজবাবু স্থানীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেশী ব্যবস্থায় জলখাবার চায়ের আসরে এলেন। স্বর্ণবাবু আজ অত্যন্ত ক্লীব। তিনিও বসলেন। বংশলোচন বিলিব্যবস্থা করছিলেন। রাধাকান্ত সাবজজবাবুর পাশে বসলেন, কিন্তু খেলেন না। বললেন, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সান্ধ্যকৃত্য না সেরে তো—। একটু হাসলেন।

গোপীচন্দ্র ঠিক এই সময়ে এলেন সেখানে। অতিথিদের আপ্যায়নের প্রয়োজন আছে, সে কথা তিনি ভুলেন নাই। সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন।

দূরে চাষীরা দাঁড়িয়ে দেখছিল। সন্ধ্যার পর বাঈনাচের আসর বসবে। সে দেখে তবে তারা যাবে।

এবারত হাজী সালেবেগকে বললে, সরকার থেকে গোপীবাবুকে ই ঠেনের (এ ঠাঁইয়ের) রাজা খেতাব দিবে, এখুনি মালুম হচ্ছে মেরজা।

হাঁ। খোদা যাকে রাজা করে, সরকার তাকে রাজা ব'লে মানবে না কেনে, কও? আলবৎ খেতাব দিবে।

* * *

রাধাকান্ত বাঈনাচ দেখতে গেলেন না। বাড়িতে ব'সে নিজের ডায়েরি খুলে আজকার বিবরণ শেষ ক'রে লিখলেন, নবগ্রাম দশমহাবিদ্যার মত এক হতে আর এক রূপ গ্রহণ করছে। গোপীচন্দ্রের সেবায় মা বোধ হয় ভুবনেশ্বরী রূপ গ্রহণ করছেন। শেষ রূপ 'কমলা-রূপ' কবে কার সেবায় গ্রহণ করবেন কে জানে?

তিনি উঠে এসে দাঁড়ালেন বাইরের বারান্দায়। অন্ধকার সমস্ত। গ্রাম নিস্তব্ধ। কোলাহল ভেসে আসছে গোপীচন্দ্রের কীর্ত্তিস্থল ওই প্রান্তর থেকে। হাসলেন তিনি। মা মুখ ফেরালেন আজ। এর পর গ্রামের কলরব ওখানে ভেসে গিয়ে নিস্তব্ধতার মধ্যে জীবনের সাড়া তুলবে না। ওখানকার সাড়া এসেই এখানকার স্তিমিত পল্লীর মানুষদের অভয় দেবে। যুগ চ'লে যাবে। আবারও পরিবর্ত্তন ঘটবে। কে ঘটাবে? তিনি থাকবেন না। তাঁর বংশ। তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে আবার হাসলেন। মায়া! বংশের মায়া!

জীবন-যুদ্ধে পরাজিত রাধাকান্ত মায়াবাদের আশ্রয়ে সান্ত্বনা খুঁজতে লাগলেন অন্ধকারের দিকে চেয়ে। হঠাৎ আবার একটা কলরব ভেসে এল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ফিরে এলেন। ডায়েরি খুলে লিখলেন—

"মৃত্যুর রূপ অন্ধকার। শাস্ত্রেও বলিয়া থাকে, মনে মনে যুক্তির দ্বারাও তাই অনুভব

রি। কারণ মৃত্যুর অন্যতম লক্ষণ দৃষ্টিশক্তির বিলুপ্তি। মৃত্যুর স্পর্শ গাঢ়তম হিমবৎ। রণ মৃত্যুর লক্ষণে দেহ হিমবৎ শীতল হইয়া যায়।

রাত্রির রূপ অন্ধকার, তাহার স্পর্শ শীতল, রাত্রির শেষ যামে সে স্পর্শ স্পষ্ট হইয়া ঠে। চণ্ডীর মধ্যে আছে, কালরাত্রিরূপে মহাশক্তি মহিষাসুরকে মৃত্যুর অব্যবহিত র্বে দেখা দিয়াছিলেন। তবে কি—? মৃত্যুর কায়া না হোক, রাত্রি মৃত্যুর ছায়া। ত্যু সম্ভবত দিনান্তে পৃথিবীর শিয়রে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহার ছায়া পড়ে পৃথিবীর উপর। ই রাত্রি। আজ রাত্রিকে কাঁপিতে দেখিলাম। অন্যে দেখিয়াছে কি না জানি না, মি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। শব্দতরঙ্গ হয়া গেল। রাত্রি কম্পিত হইল। ছায়া কাঁপিল। ছায়া যখন কাঁপিল, তখন নিশ্চয় য়াও কাঁপিয়াছে। জীবনের জয়ধ্বনিতে মৃত্যু কি কম্পিত হয়?

ভাবপ্রবণ রাধাকান্ত ভাবাবেগের এই বিচিত্র সান্ত্বনাকে অবলম্বন ক'রে সমস্ত রাত্রি ব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন।

কাশীর বউ বললেন, শোবে না?

না। একটু চিন্তা কর'ছি।

কি?

একটু চুপ ক'রে থেকে কাশীর বউ বললেন, একটা কাজ করবে?

কি?

এখানে একটা মেয়েদের ইস্কুল আর একটা লাইব্রেরি কর। একা না হয়, দশজনে দা ক'রে কর।

———

ক্রমশ—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

দীর্ঘসূত্রীর প্রার্থনা (নূতন দ্বিতীয় ভাগ হইতে)

কর্মে আমার ভয় কর দূর সব কাজে তুমি এনে দাও সুর
যা কিছু আমার করণীয় যেন সময়ে করিতে পারি,
ফেলে রেখে কাজ তারি ভাবনায় সময় যেন না বৃথা ব'হে যায়
মনে দাও বল ফেলে-রাখা কাজ এক এক ক'রে সারি।
জীবনের বহু বিচিত্র সুখ ক্ষণ-আলস্যে হয়ে ওঠে দুখ
বহু মানুষের বহু অভিশাপ জমেছে স্কন্ধে মম—
হিসাবনিকাশ চুকাইতে চাই নাহি ভয় পরে পাই বা না পাই
যেটুকু পেয়েছি তারি আনন্দে দেবতারে নমোনমঃ।
যেতে চাই শুধে সকলের ঋণ হাল্‌কা হইতে চাহি প্রতিদিন
বহুদিনকার সঞ্চয়-ভার পথেই নামাতে চাই;
আজ বুঝিতেছি অতীতের ক্ষুধা হরণ করিছে আজিকার সুধা
যেদিকে নেহারি আমার বসুধা পুড়ে পুড়ে হয় ছাই।

সংবাদ-সাহিত্য

"পঁচিশে বৈশাখ। যিনি স্মরণাতীতলোকে গিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি।

মিথ্যা মোদের ভয় গো বন্ধু, মিথ্যা মোদের ভয়,
চাঁদের স্মৃতি জ্যোৎস্না হয়ে ভাসছে ভুবনময়।
তোমার স্মৃতি হয়ে সুরের কণা
আকাশ জুড়ে চলছে এঁকে গানের আলিপনা।
সুর কি কভু হারায় গেলে আঁখির অন্তরালে,
কাছের বাঁশি সপ্তভুবন ছাইছে কালে কালে।
মিথ্যা মোদের ভয়—
মনের ভাষা বইছে, কবি, তোমার পরিচয়।

পূর্ণিমার চাঁদ যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ আত্মহারা ছিলাম। নিখিল চরাচর রজত-জ্যোৎস্নাধারায় হাসিয়া উঠিয়াছিল। কুসুমের সুগন্ধ, পাখীর গান, পাহাড়, পর্বত, নদী, বন, তড়াগ, পল্বল, সরোবর তরঙ্গ-চাঁদের স্পর্শে প্রত্যক্ষ বাস্তবরূপেই প্রতিভাত হইয়াছিল দৃষ্টিহীনের দৃষ্টিতে। মায়ের ভালবাসা, বন্ধুর প্রীতি, প্রণয়ীর প্রণয় কিছুই আর অগোচর ছিল না।

সহসা আকাশের চাঁদ অন্তর্হিত হইল, গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল আমাদের ভুবন। মনে হইল, সর্বস্ব হারাইলাম। প্রায় সম্বিৎহারা হইলাম।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম, চাঁদ নাই, তবু ভূমণ্ডল উদ্ভাসিত। অপূর্ব আশ্বাসে চিত্ত ভরিয়া গেল।

মৃত্যুর জাদুস্পর্শে বিশেষ হইয়াছে সাধারণ, সাময়িক চিরন্তন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; কয়েকজনের একান্ত ব্যক্তিগত সকলের নিতান্ত আপন হইয়া উঠিয়াছে। কাছে গেলে উত্তাপ গায়ে লাগিত, ঝলসিয়া যাইতাম, দগ্ধ হইতাম, এখন উত্তাপহীন আলোকে নিত্যস্নান করিতেছি। আকাশের চাঁদ আমাদের আঙিনার ফাঁদে ধরা দিয়াছে। চাঁদের জয় হউক।..."

* * *

গোপালদা বলিলেন, কাকে ভ্যাংচাচ্ছ, ঠিক ধরতে পারছি না; ভঙ্গীটা যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে। কিন্তু এ বাপু, তোমাদের তারিখের নিরিখ পার হওয়া জিনিস। আমিও একটা লিখেছি, শুনবে?

ঘাড় নাড়িলাম। গোপালদা একটা চিরকুট বাহির করিয়া পড়িলেন—

যেখানে সাগর ছিল ধূ-ধূ মরু ঠাঁই নিল
সেখানে রচিব পিরামিড,

আমরা করেছি পণ, আমরা কয়েক জন ;
হ'ল ফাণ্ড, হবে ট্রাষ্টডীড্।
সাগর-তরঙ্গ স্মরি চোরাবালি ভিত্তি'পরি
গড়ি স্মৃতি ত্রিকোণ-পাথরে,
কবে সে রসিক এসে পাথরের তলদেশে
খুঁজে পাবে তরঙ্গ আথরে !
মৃত এ সমাধি-পুরে বলাকা কি যাবে উড়ে,
ভাসিবে সোনার তরীখানি
মরুভূর তপ্ত বুকে প্রশ্ন কে রাখিবে টুকে—
কোথা গেল সাতকোটি প্রাণী ?
দিয়ে তেরো লক্ষ কড়ি কারা দৃঢ় পণ করি
একদা রচিল মরীচিকা—
স্ফিংক্সের বোবা চোখে ভিন্নভাষাভাষী লোকে
পড়িবে কি এ সূত্রের টীকা !

বলিলাম, থাক্ গোপালদা, অতদূরে দৃষ্টি চলে না। কাছাকাছি আসুন। গোপালদা বলিলেন, তথাস্তু।

—

গোপালদা বলিলেন, কাছাকাছি মানে পাকিস্তান। বহুৎ আচ্ছা, সদ্য গঙ্গাস্নান সেরে আসছি, জমবে ভাল। তোমাদের সিমলা ত্রিদলীয় বৈঠক তো ফেঁসে গেল। জেনেশুনে ওই অপয়া জায়গাটাই আবার যখন ওরা বেছে নিলে, তখনই বুঝেছিলাম, মতলব ভাল নয় ওদের। যা হোক, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। আমার তো ভয়ই হয়েছিল, কংগ্রেসও বুঝিবা শেষ পর্যন্ত জিন্নার দুই-জাতিতত্ত্বের আবদারকে মেনে নেয়। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, "জাগে নব ভারতের জনতা, এক জাতি এক প্রাণ একতা"—এই তত্ত্বের উপর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত. সুতরাং জনাব জিন্না যতদিন না পৃথক-জাতীয়ত্বের ধুয়া ছাড়ছেন, ততদিন তাঁর সঙ্গে কোনও বাৎচিৎই হতে পারে না। এ কথাটা এত সহজ যে, এ নিয়ে কেন এত কথাকাটাকাটি, জল্পনাকল্পনা, মারামারি চলছে সেইটেই আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তোমাদের দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকীয় স্তম্ভে বঙ্গভঙ্গ ভারতবিভেদ ইত্যাদি নিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি কান্না আর হা-হুতাশ দুবেলা পড়তে পড়তে এক এক সময় মনে সন্দেহ জাগে, বুঝিবা দুই-জাতিতত্ত্বের কথাটাই ঠিক—না হ'লে এত বুদ্ধিমান পণ্ডিত লোকে এক কথায় মামলা ডিসমিস না ক'রে এ নিয়ে এত মাথাই বা ঘামায় কেন ! মতলব যা আছে ইংরেজ তো তা করবেই, তোমাদের

সুদ্ধ জড়িয়ে যে করতে চায়, সেইটেই হচ্ছে ওদের বুদ্ধির বাহাদুরি। লবন-আইন, বিক্রয়-কর, ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট ইত্যাদির মত ভারতে হিন্দু-মুসলমানভেদ ওরা ছলে বলে কৌশলে বজায় রেখেই যাবে। তোমরা বাপু ওর মধ্যে গিয়ে শুদ্ধুক সময় আর শক্তি নষ্ট ক'রে মরছ কেন? এই আলোচনার আস্কারা দিয়ে দিয়েই তো একটা ভিত্তিহীন অসার কথাকে তোমরা এতখানি বাড়িয়ে তুলেছ। ভারতবাসীর কল্যাণের পক্ষে কথা মাত্র একটি, যা কংগ্রেসের প্রধান কথা। ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় প্রদেশ ইত্যাদিতে বিভক্ত হ'লেও মূলত এক দেশ, ভারতবাসী এক জাতি এবং সমস্ত ভারতবাসীর স্বার্থ এক এবং অভিন্ন, এবং তা শোষক শাসক ইংরেজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ থেকে পৃথক।

আমি বলিলাম, গোপালদা, সবই তো বুঝছি, কিন্তু মুসলিম লীগ যে দশ কোটি ভারতীয় মুসলমানের স্বার্থরক্ষার দাবি নিয়ে জোর গলায় বলতে আরম্ভ করেছে, তারা স্বতন্ত্র জাতি, তাদের রুচি সংস্কার আচার ব্যবহার মায় চিন্তাধারা পর্যন্ত ভারতবহির্ভূত, এবং—

গোপালদা আমাকে মাঝপথে থামাইয়া বলিয়া উঠিলেন, সেই কথাই বল, বলতে আরম্ভ করেছে। এটা হ'ল স্বার্থের কথা, রাগের কথা, মতলবের কথা, শুধু লীগ কেন, এই স্বার্থের তাগিদে আমাদের ডক্টর আম্বেদকর এবং জয়পাল সিংও তো এই ধুয়ো ধরেছেন। কিন্তু যে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই সর্বনাশা তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে, তার প্রতিষ্ঠাতা সার্ সৈয়দ আহমদ খাঁ এই প্রসঙ্গে কি বলেছেন, তা কি স্মরণে আছে কারও? মুসলমানদের মধ্যে বিপরীত বুদ্ধি জাগছে দেখেই তিনি তাঁদের সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন—

Do you not inhabit the same land?...Remember that the words Hindu and Mahomedan are only meant for religious distinction—otherwise all persons, whether Hindu or Mahomedan even the Christians who reside in this country, are all in this particular respect belonging to one and the same nation.—*Eminent Mussalmans* পৃ. ৩২

ধর্মের ভিত্তিতে পৃথিবীতে কখনও কোথাও জাতি নির্ধারিত হয় নি, ব্রিটিশ জাতির মধ্যেও অনেকে মুসলমানধর্মাবলম্বী, রুশিয়া ও চীনেও মুসলমানের অভাব নেই, কিন্তু তাঁরা ব্রিটিশ, রুশ এবং চীনা জাতির অন্তর্ভুক্ত মুসলমান সম্প্রদায় মাত্র। পোড়া ভারতবর্ষেই কি শুধু ধর্মভেদে জাতিভেদ গ'ড়ে উঠবে? অভিধান খুলেই দেখ Nation শব্দের কি অর্থ দিচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই *Chambers*, *Concise Oxford* হ'লেই চলবে। চেম্বার্স বলছেন, "A body of people born of the same stock; the people inhabiting the same country, or under the same government." অক্সফোর্ড কনসাইজ বলছেন, "Distinct race or people having common

descent, language, history, or political institutions." ধর্মের কথা তো বাপু, কোথাও নেই। আর তা থাকবেই বা কেমন ক'রে? তা হ'লে তো আমাদের ঘরে ঘরেই নেশানের ছড়াছড়ি দেখা যেত। আমি শাক্ত, দাদা বৈষ্ণব; বড় গৌড়ীয় মঠী, মেজো শ্রীঅরবিন্দী, সেজো রামকৃষ্ণী, ন সৎসঙ্গী, ফুল দয়ানন্দী, রাঙা পাগল হরনাথী এবং ছোট নদের নিমাই়ী—এমন বাড়ির তো অভাব নেই। রামবাগানের দত্ত পরিবারে হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান তো আছেই, হয়তো মুসলমানও আছে, তা হ'লে কি বলব রামবাগান দত্ত-পরিবার চার নেশানে বিভক্ত? কমন ষ্টক ও কমন ডিসেন্ট তো কেউই অস্বীকার করে না, তবে ভিন্ন নেশান হতে চাও কেন? অভিধানেই যে মানা। যশোহরের গ্রামে গাঙ্গুলী পরিবারকেই ধর। পীরিলি বামুন বংশ, গোঁড়া মতে ছোঁয়াটে মুসলমান, করণ-কারণ হয়েছে বড় বড় ঘরে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরঘরেও এঁরা কলা খেয়েছেন। হঠাৎ এঁদের মধ্যে একজন একদা পুরোপুরি কলমা প'ড়ে বসলেন, তাঁরই বংশধর কালক্রমে মৌলানা হলেন, খাঁ হলেন। হলেন তো হলেন, কিন্তু তিনি ভিন্নজাতি হয়ে উঠলেন কোন্ গুণে? পিঁয়াজ রসুন গরু—কোনটাই আজকাল একান্ত গুণ নয়, কারণ বহু কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তানকেও প্রয়োজনমত এসবের সদ্গতি করতে দেখেছি; কলমা-নামাজের মধ্যেও এই নেশানত্ব নেই, কারণ আমি জানি বহু মুসলমান নামাজের ধার দিয়েও চলেন না। ভাষা বলেন এক, খিস্তি করেন এক, ঘুষ নেন এক ফিকিরে, বজ্জাতি করেন এক প্রথায়, তাড়া খেলে ছুটে পালান এক পদ্ধতিতে। আর পাজামা চাপকান? কম্যুনিষ্ট দাদাদের কৃপায় তাও হয়ে উঠেছে অবিশেষ, সামান্য। আইনত ও ধর্মত নেশানত্ব ফলাবার কি উপায় আছে? তাই বলছিলাম, এই অ্যাবসার্ড আবদারকে হিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে যদি গোড়াগুড়িই হেসে উড়িয়ে দেওয়া হ'ত, তা হ'লে বস্তুটি এতখানি বাড় বাড়তে পেত না। অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন শুধু হিন্দুরাই দেখে নি, ভারতের মুসলমানরাও দেখেছে, খ্রীষ্টিয়ানরাও দেখেছে, ফর্দি ও আদিবাসী হিন্দুরা সেদিনকার ছেলে ব'লে না দেখতেও পারে। আজকেই হঠাৎ পাকিস্তান হিন্দুস্থান ভাগ হয়ে যাবে? হ'লেই হ'ল!

দেখিলাম, দাদা চটিয়াছেন, তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিলাম, তবু সমস্যা তো একটা দাঁড়িয়েছে গোপালদা, এর সমাধানও প্রয়োজন।

গোপালদা উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, সে তো হাতের কাছেই রয়েছে, এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে কংগ্রেস, যা ভারতের হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান সকলের চেষ্টায় গত একষট্টি বছরে গ'ড়ে উঠেছে, কংগ্রেস অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথাই চিন্তা করেছে, একদিনের জন্যেও ধর্মসম্প্রদায় বা প্রদেশগত পার্থক্যকে আমল দেয় নি। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যের চিন্তাও যে এই বিংশ শতাব্দীতে চলতে পারে, তা শুধু

ভারতবর্ষেই দেখা গেল। যারা এই পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে দেশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করছে তারা শুধু মূর্খ নয়, বদমাস। এই কয়েকজন দুষ্টবুদ্ধি লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থ জাতির স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে কখনই পারবে না, পারবে না, পারবে না। সুতরাং সিমলায় যাই ঘটুক, ভয় পেয়ো না। আমার দুঃখ এই, সর্ববিধ স্বাধীন চিন্তার আকর ইংলণ্ডের লোকেরাও এই ধর্মের ভিত্তিতে জাতিগঠনের পাগলামিকে নিছক স্বার্থের খাতিরে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। আজ যে সার্ ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ হিন্দু-মুসলমান মতান্তরের ওজুহাতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিতে এসেও দিতে পারছেন না, তিনিই ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ অক্টোবর তারিখে পার্লামেণ্টের বক্তৃতায় কি বলেছিলেন, তা তো দেখেছ। তিনি বলেছিলেন—

"লর্ড প্রিভিসীল এই যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের জন্য ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক কোন সন্তোষজনক গবর্মেণ্ট গঠন করা শক্ত। কিন্তু আমার মনে হয়, ইহা কোনও যুক্তিই নয়। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, পোল্যাণ্ড সম্বন্ধেও তাহা বলা চলিত, কারণ সেখানে রুশ ইহুদী জার্মান ও পোলিশরা রহিয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়া সম্বন্ধেও সে কথা বলা যায়, কারণ সুদেতেন, চেক ও শ্লোভাক সম্প্রদায়ের লোকের সেখানে বসবাস। লর্ড প্রিভিসীলের যুক্তি মানিতে গেলে একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে তাহার ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে বঞ্চিত করিতে হয়।...আপনারা যদি গণতন্ত্র স্বীকার করেন, যদি কোন গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতিকে রূপ দিবার ইচ্ছা আপনাদের থাকে তাহা হইলে আপনাদিগকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিলব্ধ ফলাফল স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং আপনাদের মনঃপূত হউক আর না হউক বর্তমান মুহূর্তে ব্রিটিশ ভারতে কংগ্রেসকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ-দলরূপে মানিয়া লইতে হইবে।"

শ্রীমান হেবো প্রাভাতিক সংবাদপত্রগুলি সম্মুখের টেবিলে রাখিয়া গেল। উত্তেজিত গোপালদা সেগুলির পাতা আলগাভাবে উল্টাইতে লাগিলেন, আমি চা ও রুটি-মাখনের ব্যবস্থা করিতে ভিতরে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তাজ্জব ব্যাপার, গোপালদা একা একাই আনন্দে ডগমগ হইয়া উঠিয়াছেন। আমি আসিতেই বলিলেন, এইখানটা পড়। চেঁচিয়ে পড় না হে। পড়িলাম—

"সিমলা, ১৩ই মে—বোম্বাইয়ের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ব্লিৎসে' প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে, মিঃ এম. এ. জিন্না ও লীগ হাইকমাণ্ডের নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খান, আবদুল মোত্তিন চৌধুরী, চৌধুরী খালিকুজ্জমান, নবাব সিদ্দিক ও এইচ. এস. সুহ্রাউর্দির মধ্যে সম্প্রীতি আর বজায় থাকিতেছে না। লীগ হাইকমাণ্ড মিঃ জিন্নার হুকুমের বিদ্রোহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিমলা বৈঠকে যোগদানের জন্য তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছেন, পাকিস্তানের প্রশ্ন লইয়া

ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশনের উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রস্তাবিত চরমপত্র প্রত্যাহারে তাঁহাকে বাধ্য করিয়াছেন এবং তাঁহাকে পদত্যাগপত্র দাখিলের মুখে আনিয়া ফেলিয়াছেন। পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। মিঃ জিন্না যদি সিমলা বৈঠকের পর পদত্যাগ না করেন তবে নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খানকে মুস্লিম লীগের আগামী বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্বের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ করা হইবে। 'ব্লিৎস্' জানিতে পারিয়াছেন যে, এই গণ্ডগোলের পরিণতি হইবে রাজনীতি হইতে মিঃ জিন্নার বিদায়গ্রহণ।"

গোপালদার অট্টহাস্যে আমার বৈঠকখানা-ঘরটি কাঁপিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এ হতেই হবে ভায়া, এখনও চন্দ্রসূর্য উঠছে। ভারতবর্ষের সব মুসলমানই তো আর মতলববাজ নয়, পাগলও নয়। অখণ্ড ভারতবর্ষে অভারতীয় হয়ে সবাই থাকতে চাইবে কেন? তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার, সমস্যার সমাধান আপনা থেকেই হয়ে আসছে।

গৃহিণী মাখন-জ্যাম-মাখানো কয়েক খণ্ড রুটি ও দুই কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিলেন। গোপালদা জ্যাম-মাখানো রুটিগুলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, বউমা, চুলের পেষ্ট লাগাও নি তো?

গৃহিণী থতমত খাইতেই গোপালদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, কালকের কাগজ পড় নি বুঝি? জার্মানির বৈজ্ঞানিকেরা যুদ্ধে হেরে দরিদ্র জনসাধারণের স্বাস্থ্য বজায় রাখবার জন্যে চুল থেকে এক রকম মহাভিটামিনবান খাদ্য প্রস্তুত করেছেন। ভিটামিন খেতে তো রাজি আছি, কিন্তু হিন্দু চুল, মুসলমান চুল, পাঞ্জাবী চুল বিহারী চুল, বাঙালী চুল তফাত করব কি ক'রে, এই ভেবে মহা ধাঁধায় প'ড়ে গেছি। তোমাদেরও পরিপাটি কেশপ্রসাধনের দিন বোধ হয় শেষ হয়ে এল।

গৃহিণী জবাব না দিয়া স্মিতহাস্যে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া প্রশ্ন করিলাম, আচ্ছা গোপালদা, এই হিন্দু-মুসলমান পাকিস্তান-হিন্দুস্থান সমস্যা নিয়ে একটা সুচিন্তিত বই লিখে ফেললে হয় না?

গোপালদা বাধা দিয়া বলিলেন, লেখালেখি অনেক হয়েছে ভায়া, এখন প্রয়োজন হয়েছে প্র্যাকটিকাল অ্যাপ্লিকেশনের। বাংলাতে অবিশ্যি বই বেশি নেই—এক রেজাউল করীম সাহেবের 'পাকিস্থানের বিচার'। আরও দু-চারখানা থাকতে পারে, হদিশ পাই নি। কিন্তু ইংরেজীতে যা বই বেরিয়েছে, নামের তালিকা দিলেই পাগল হয়ে যাবে। শুনবে? শোন তবে।

প্রথম নাম করতে হবে লাহোর ফরমান কলেজের ইসলামিক হিষ্ট্রির অধ্যাপক Wilfred Cantwell Smith-এর Modern Islam in India, চমৎকার বই, বহু তথ্যের খনি এই বইখানি। তার পর পড় রাজেন্দ্রপ্রসাদের India Divided,

তথ্যসংগ্রহের দিক থেকে অমূল্য। তার পর বেণীপ্রসাদের The Hindu-Muslim Questions, অশোক মেহতা ও অচ্যুত পটবর্ধনের The Communal Triangle, El Hamza-র Pakistan—A Nation, F. K. Khan Durrani-র The Meaning of Pakistan, "A Punjabi"-লিখিত Confederacy of India, J. N. Farquher-এর Modern Religious Movements in India, L. Bevan Jones-এর The People of the Mosque, Nawab Wazir Yar Jang Bahadur সম্পাদিত The Pakistan Issue, Clifford Manshardt-এর The Hindu-Muslim Problem in India, Mohammad Noman-এর Muslim India, Yusuf Meherally-র A Trip to Pakistan, S. R. Sharma-র The Crescent in India, B. G. Kaushik-এর The House that Jinnah built, Kailash Chandra-র Tragedy of Jinnah, S. M. Datar-এর Hindus and Muslims, রাধাকুমুদ মুখুজ্জের A new approach to the Communal Problem, Sh. Muhammad Ashrof সম্পাদিত Letters of Iqbal to Jinnah, বেণীপ্রসাদের Communal Settlement, "A Hindu Nationalist"-লিখিত Gandhi-Muslim Conspiracy, Rezaul Karim-এর For India and Islam ও Pakistan Examined, দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইমস কর্তৃক প্রকাশিত Gandhi-Jinnah Talks, M. A. Jinnah-র Some Recent Speeches and Writings, Ahmad Jamiluddin-এর The Indian Constitutional Tangle, B. R. Ambedkar-এর Thoughts on Pakistan, অতুলানন্দ চক্রবর্তীর Hindus and Musalmans of India, M. N. Dalal-এর Whither Minorities, Indra Prakash-এর The History of Hindu Mahasabha, Abdul Latif-এর The Muslim Problem in India, Bakar Ali Mirza-র The Hindu-Muslim Problem, রাজেন্দ্রপ্রসাদের Pakistan, W. W. Hunter-এর The Indian Musalmans, Wilson-এর Modern Movements among Moslems, Syed Ahmed-এর On the Present State of Indian Politics, Mustafa Khan-এর An Apology for the New Light, Khuda Bukhsh-এর Essays : Indian and Islamic, Sir Ahmed Hussain-এর Notes on Islam, Syed Ameer Ali-র The Spirit of Islam, W. Wilson Cash-এর The Moslem World in Revolution, The Aga Khan-এর India in Transition, Maulana

Muhammad Ali-র The Religion of Islam, Ramnandan Chowdhury-র Muslim Renaissance and the Muslim League : A search after Truth—কত নাম করব ? এ ছাড়া, আমির আলী, ইকবাল, তুরাবি, ফজলুল্লা খাঁয়ে অনেক বই আছে। সবগুলি হজম ক'রে যদি কেউ এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় একটি বই লেখেন তা হ'লে ভাল হয়। দেখ না চেষ্টা ক'রে।

কহিলাম, গোপালদা, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের সন্ধান না করাই ভাল শেষে কি—

গোপালদা বলিলেন, তা বটে। তা হ'লে থাক্।

—

হিন্দু দুই প্রকার। জাতহিন্দু ও ফর্দিহিন্দু। জাতহিন্দু অর্থাৎ যাহাদের জাত আছে। ফর্দি অর্থে সেই হিন্দুদিগকে বুঝায় যাহারা ইংরেজের রচিত ফর্দ অনুযায়ী হিন্দু হইয়াও এবং জাত থাকিয়াও পৃথক ও জাতিচ্যুত। ইংরেজ বাণিজ্য করিয়া দোকান চালাইয়া দুনিয়ায় বড় হইয়াছে। তাহার পক্ষে একই গাঁটের মালকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া ১নং ও ২নং বলিয়া চালাইয়া দেওয়া স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য। শুনিয়াছি, কোন কোন মাড়োয়ারী দোকানদার একই মূল্যের এক ডজন গেঞ্জি পাইকারী দরে ক্রয় করিয়া আনিয়া তিনটি থাকে সাজাইয়া "বঢ়িয়া, আওর বঢ়িয়া ও বহুৎ বঢ়িয়া" নাম দিয়া উড়িষ্যা-দেশবাসীদিগকে ইচ্ছামত উৎকৃষ্ট অথবা নিকৃষ্ট গেঞ্জি বিক্রয় করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। ইংরেজ ভারতের পোলিটিকাল বাজারে এইরূপে একই দেশের মানুষগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া, ক্রয়বিক্রয় করিয়া, বাণিজ্যধর্ম পালন করে। জাতহিন্দু, ফর্দিহিন্দু ও মোছলেম এই তিন ভাগের মধ্যে বর্তমানে জাতহিন্দু=বঢ়িয়া, ফর্দিহিন্দু=আওর বঢ়িয়া, এবং মোছলেম=বহুৎ বঢ়িয়া। অর্থাৎ জাতহিন্দুর মূল্য ফর্দি হইতে সস্তা ও মোছলেমের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক। এই নীতির সপক্ষে ইংরেজ বলে, এ দেশের মানুষ বড় অজ্ঞ ও নিরক্ষর, তদুপরি গরিব। অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে অজ্ঞ, নিরক্ষর ও গরিবদিগকে সাহায্য করিয়া উপরে তুলিতে হইবে। সুতরাং অজ্ঞ, নিরক্ষর ও গরিবদিগকে অথবা তাহাদের জাতভাইদিগকে ভাল করিয়া উচ্চ স্থানে বসাইয়া দিলেই এ দেশের সকল অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য দূর হইয়া যাইবে। কথাটা ইউক্লীডের জ্যামিতি অপেক্ষাও সরল ও সহজবোধ্য। রাম, শ্যাম, রহমান, রসিক ও পিল্লুর মস্তকে জ্ঞান-বুদ্ধি এবং পকেটে অর্থ উদ্গম করাইবার সহজ রাস্তা কি ? না, তাহাদের জাতভাই হৃদয়, জনার্দন, রহিম করিম এবং গুল্লুর রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠা সুগঠিত করা ও তাহাদের ন্যায্য ও অন্যায্য উপায়ে অর্থ উপার্জন করিবার বিভিন্ন সুবিধা করিয়া দেওয়া। আসলে কি হইবে ? না, রাম, শ্যাম, রহমান

প্রভৃতি অশিক্ষিত গরিব লোকেরা ঠিক পূর্বের অবস্থায়ই পড়িয়া থাকিবে ; শুধু কয়েকটি অর্ধমূর্খ ও অবস্থাপন্ন লোক অকস্মাৎ আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া ইংরেজপ্রীতিতে হাবুডুবু খাইতে থাকিবে। আর কি হইবে? আর পূর্বে যাহারা ওই সকল উচ্চপদ ও অর্থের অধিকারী ছিল, সেই সকল উচ্চশিক্ষিত ও কর্মকুশল ব্যক্তি এই নূতন "পলিসি"র ধাক্কায় গড়াইয়া নিচে গিয়া পড়িবে। উচ্চশিক্ষিত ও কর্মকুশল লোকগুলার উপর এ অত্যাচার কেন করা হইবে? তাহা বুঝিতে কিছু মুশকিল নাই। ইহারা অথবা ইহাদের জাতভাইরা ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে এবং ইহাদের কথঞ্চিৎ নিচে না নামাইলে ইংরেজগৌরবের হানি ঘটিতে থাকিবে। এমন কি যদি ইংরেজকে এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেও হয় তো যাত্রার পূর্বাহ্ণে ইহাদের একটা বিদায়-পদাঘাত (পার্টিং কিক্) করিয়া যাইতে পারিলে মনটা কিছু খুশি থাকিবে।

সুতরাং জাতহিন্দুদের ভোটের, চাকুরির, কণ্ট্রাক্টরির অথবা ব্যবসাগত সুবিধা মিলিবার সম্ভাবনা বিশেষ নাই। কারণ শুধু যে ইংরেজ তাহাদের প্রেমে পাগল তাহা নহে, ফদি ও মোছলেম জাতীয় বঙ্গবাসীরাই বা এ সুবর্ণসুযোগ ছাড়িবেন কেন? এ পৃথিবীতে নিজের সুবিধা হইবার একমাত্র পথ হইতেছে অপর কাহারও অসুবিধা ঘটাইয়া দেওয়া। কাহারও লাভ হইতে হইলে অপর কাহারও ক্ষতি হওয়া প্রয়োজন। কারণ সুবিধা ও লাভের ভাণ্ডারে যতটা মাল মজুদ থাকে, তাহার কোন অংশ কাহাকেও দিতে হইলে অপর কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া দেওয়া সম্ভব নহে। ভাণ্ডারে রক্ষিত সুখসুবিধার পরিমাণ পূর্বনির্দিষ্ট—বাড়ে কমে না। সুতরাং জাতহিন্দুদের ছাঁটিয়া বাদ না দিলে ফদি ও মোছলেমদিগকে খুশি করা সম্ভব নহে।

এই ইংরেজী গণিতে অবশ্য অনেকগুলি গলদ আছে। প্রথমত সুখসুবিধা কোথা হইতে জন্মলাভ করে তাহা ইংরেজ পূর্ণরূপে জানে না, এবং দ্বিতীয়ত, সুবিধা ও লাভের ভাণ্ডারে ইংরেজের অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও বহু নূতন মাল বোঝাই করিয়া ও সেই নূতন মাল ভোগ করিয়া জাতহিন্দুরা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুখে জীবনযাপন করিতে পারেন। ইহা করিতে হইলে তাহাদের চাকুরি ও সরকারী কণ্ট্রাক্টরির আশা ত্যাগ করিয়া জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ও নূতন নূতন ক্ষেত্রে নিজেদের কর্মশক্তি ও কল্পনা-কৌশল নিযুক্ত করিয়া নব নব উপায়ে ঐশ্বর্য, যশ ও প্রতিপত্তি আহরণ করিতে হইবে। বাংলার প্রধান মন্ত্রী সুরাউর্দি সাহেব বলিয়াছেন যে, তিনি বাংলার মানুষের সকল দুঃখ দূর করিবার জন্য একটা মগজ-গুদাম (ব্রেন ট্রাষ্ট) খুলিবেন। সেই গুদামে বাংলা ও বাংলার বাহির হইতে বিভিন্ন আকার ও প্রকারের মগজ সংগ্রহ করিয়া রাখা হইবে ও তৎসাহায্যে বাংলার সকল দুঃখ দূর করা হইবে। মগজ কোথায় পাওয়া যায় তাহা অবশ্য তিনি ভাল করিয়াই জানেন। মগজের বাজার ও তাহার তেজি-মন্দি তাঁহা

অপেক্ষা ভাল করিয়া আর কে বুঝে? কিন্তু মগজও নানান প্রকারের হয়। কোন কোন মগজ শুধু আহরণ বা অপহরণ কার্যে পারগ হয়, কোন-কোনটা আবার উদ্ভাবনা ও উৎপাদন বিষয়ে পারদর্শী। মগজ যে কাহার আছে তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে হইলেও মগজের প্রয়োজন হয়। বাহ্যিক লক্ষণ বিচার করিয়া মগজ নির্ণয় করা যাইতে পারে; কিন্তু মগজের বাহ্যিক লক্ষণ কি কি, তাহা জ্ঞাত না থাকিলে, অথবা গায়ের জোরে যে কোন লক্ষণকে মগজের লক্ষণ বলিয়া প্রমাণ করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সে কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। মগজগুণসম্পন্ন মস্তিষ্কবানরা নিশ্চয়ই কিছু কিছু মাসহারা বা বৃত্তির অধিকারী হইবেন। ঐখানেই হইবে মুশকিল। অর্থের গন্ধ ছড়াইলেই মক্ষিকাকুল আকুল হইয়া সুরাউর্দির সুধাভাণ্ডের দিকে পক্ষবিস্তার করিয়া ধাবমান হইবে। তখনই লাগিবে গোলযোগ। একশত ভাগের মধ্যে ৬০ ভাগ মগজ মোছলেম-মস্তকে থাকা দরকার হইবে ও বাকি ৪০ ভাগের মধ্যে কিছুটা কর্দি ও কিছুটা জাতহিন্দুর খুলিতে। ভগবানের দপ্তরে মগজের ভাগবাঁটোয়ারা ঠিক ওই হিসাবে হয় নাই, সুতরাং প্রধান মন্ত্রী সাহেবের গুদামে ঘিলুর সহিত গোময়ের সংমিশ্রণ ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক। এই কথাটি তাহা হইলে শীঘ্রই আর একটি আরব্য উপন্যাসের উপকথা বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

এখন জাতহিন্দুরা কি করিবে, তাহা স্থির করা প্রয়োজন। 'আনন্দমঠে'র যুগ হইতে আজ অবধি বাঙালীর জাতীয়তা ও সংস্কৃতি-কল্পনার মূলে রহিয়াছে ইংরেজ-দলিত বাংলার জাতহিন্দুদের উদ্ভাবনা, কর্ম ও ত্যাগ-শক্তি। অবশ্য নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের জন্মকালে বা যৌবনে বাঙালী নিজেকে বাংলা-মায়ের সন্তান বলিয়াই জানিত এবং সকল বাঙালীই সে জাগরণের যুগে নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ ও শক্তি অনুযায়ী ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কেহ জাতি বা ধর্মের দোহাই দিয়া কিছু চায় নাই বা কিছু হইতে বঞ্চিত হয় নাই। স্বদেশীর যুগে দলে দলে হিন্দু যুবকদিগকে নেতা লিয়াকত হোসেনের পিছনে ঘুরিতেও দেখিয়াছি, আবার ব্রাহ্মণকে অপর জাতির নেতার পদধূলি গ্রহণ করিতেও দেখিয়াছি। এখন যে কথা বলিতেছি তাহা কর্দি ও মোছলেম বাঙালীর বিরুদ্ধতাবাদের কথা নহে; তাঁহারা একজাতির আদর্শ ত্যাগ করিয়া চলিতে চাহেন, চলুন ও সুখে থাকুন; এ কথা ইংরেজ-দলিত জাতহিন্দুদিগের আত্মরক্ষার কথা। যে সকল জাতহিন্দু একজাতিবাদে বিশ্বাস করেন না, এ কথা তাঁহাদের জন্যও নহে। এক কথায় আমাদের এই আলোচনায় জাতহিন্দু বলিতে আমরা সেই সকল বাঙালীকেই বুঝি, যাঁহারা জাতিধর্মনির্বিশেষে শুধু বাঙালী, এবং বাঙালী ছাড়া আর কিছু নহেন। অর্থাৎ বহু মুসলমানও এই বাঙালীমহলে রহিয়াছেন ও থাকিবেন। বাঙালী জাতহিন্দু ইংরেজের চক্ষে তাহারাই, যাহারা জাতীয়তা

ও বাংলার সংস্কৃতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ইংরেজের আধিপত্য দূর করিবার জন্য বিগত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া রাষ্ট্র, বাণিজ্য, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইংরেজকে হটাইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। সামাজিক হিসাবে তাহাদের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির অন্তর্গত। বস্তুত তাহাদের মধ্যে মুসলমান ও তথাকথিত শেডিউল্‌ড্‌কাষ্টের লোকও অনেক ছিল। ইংরেজ অধিকাংশকে আঘাত করিবার উদ্দেশ্যেই জাতহিন্দু নামটির সৃজন করিয়াছে, কিন্তু তাহার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের সহিত কোন ঝগড়া নাই। বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থসন্তান ইংরেজের নেকনজরে থাকিয়া দেশের দাসত্ব-শৃঙ্খল অটুট রাখিবার জন্য ইংরেজের সহায়তা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। কিন্তু রাজনীতির গড়পড়তা হিসাবে জাতহিন্দুরা ইংরেজ-বিরোধের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন ও তাঁহাদের জীবনযাত্রার র‍্যাশন লাঘব করিয়া শায়েস্তা করিবার ব্যবস্থার প্রধান অস্ত্র এই নবজাতিভেদ।

প্রধানত ইহা ইংরেজের প্রতিহিংসা ও শত্রুদমন আকাঙ্ক্ষাসম্ভূত; কিন্তু ইহার মধ্যে ইংরেজের চিরন্তন রাজ্যশাসনে ভেদনীতির প্রেরণাও যথেষ্ট মাত্রায় বর্তমান আছে। বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ভারতবাসীরা যদি পরস্পরের সহিত মিলিত না থাকে তাহা হইলে ভারতে ইংরেজপ্রভুত্ব চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে। কাগজে কলমে ভারত স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী হইলেও, ইংরেজ ভারতবর্ষে নিরপেক্ষ শুভানুধ্যায়ীর মুখোশ পরিয়া বিরাজ করিতে থাকিবে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে নিজ স্বার্থ সিদ্ধি করিতে পারিবে। সুতরাং বাঙালীর উচিত, সে চেষ্টা যাহাতে ফলবান না হয় তাহার ব্যবস্থা করা। কোন একটি নূতন ব্যবস্থায় যাহাদের লাভ হয়, তাহারা সহজে সে ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতে চায় না। সে ব্যবস্থার শেষ পরিণতি কি, তাহা বুঝিবার মত দূরদর্শিতাও আপাত-লাভের মোহে অভিভূত মানুষের থাকে না। সুতরাং বাংলার বেশির ভাগ মোছলেম ও ফর্দিহিন্দু ইংরেজের এ ব্যবস্থা মানিয়া চলিবেন, এমন কি চলিতেছেন। এ অবস্থায় শুধু অধিকসংখ্যক জাতহিন্দু ও তাহাদের সহিত কিছু মুসলমান ও অপর হিন্দুরা এ ক্রূরনীতি দূর করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। তাহা করিতে হইলে যে প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা এই—

আধুনিক একটা জাতির অর্থনৈতিক ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের উত্তমরূপে দেখিয়া-শুনিয়া একটা তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। এই জন্য দেশ-বিদেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া বিচক্ষণ লোকের সাহায্যে কার্য সুসম্পন্ন করা দরকার। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের শুধু বর্ণনা নহে, তাহার বিজ্ঞানের ও গঠনপ্রণালীর দিকটাও দেখা আবশ্যক। অতঃপর যে যে নূতন কর্মপ্রতিষ্ঠান বাংলায় স্থান পাইতে পারে, সেই সেই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই উপায়ে সহস্র

সহস্র বাঙালী রাজনৈতিক আখড়ায় নামিয়া লম্ফঝম্ফ না করিয়াই নিজেদের কর্মশক্তির আশ্রয়েই অনায়াসে জীবন কাটাইতে পারিবে ও দেশের মোট ঐশ্বর্য ইহাতে বৃদ্ধি-লাভ করিবে। সরকারী চাকুরি বা কণ্ট্রাক্ট খুঁজিয়া ও তাহা লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ঘরোয়া বিবাদ করিয়া জাতীয় জীবন বিষময় করিয়া না তুলিয়া, যাহারা বাঙালী নামের গৌরব অক্ষত রাখিতে চান, তাঁহাদের উচিত হইবে, সরকারী কাজ ও কণ্ট্রাক্টের পথ বর্জন করিয়া অপর দিকে অগ্রসর হইয়া ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন সুগঠিত করিয়া তোলা। একটা জাতির জীবন নির্বাহের জন্য সহস্র সহস্র বিভিন্ন দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। সে সকল দ্রব্য কৃষিজাত হইতে পারে অথবা তাহার উৎপাদনের জন্য পশুপালন, বৃক্ষ-রোপণ, বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন, কিংবা যান্ত্রিক প্রচেষ্টার চরমে যাইতে হইতে পারে। আসল কথা এই যে, ভারতে এখনও শত সহস্র অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ভারতীয়েরা করেন নাই। শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দলাদলি করিয়াই বহু লোকের সময় নষ্ট হইতেছে, অর্থও অপব্যয় হইতেছে। যে সকল বাঙালী রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আজ লাঞ্ছিত ও যাহারা বাঙালীর একতা রক্ষা করিতে উৎসুক, তাঁহাদের উচিত অবিলম্বে রাষ্ট্রীয় আখড়া ছাড়িয়া অপর কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া। শেষ অবধি ইহাতেই মঙ্গল।

জাতহিন্দু ও অপর বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেষ-যুদ্ধ করিয়া নিজেদের ও জাতির অবনতিটা আরও প্রকট করিয়া তুলিতে না চান, তাঁহারা একত্র হইয়া সংগঠিতভাবে চেষ্টা করুন রাজনীতি-বর্জিত অপরাপর ক্ষেত্রে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে। হাল, কোদাল, ছেনি, হাতুড়ি, টেষ্টটিউব ও কলকব্জার সাহায্যে অগ্রগামী হউন। চাকুরি, ঝগড়া, শঠতা ও প্রবঞ্চনার অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া কর্মশক্তির উপর নির্ভর করুন। এদিকে অনেকে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া রহিয়াছেন; তাঁহাদের অনুসরণ করুন। নূতন নূতন পথ চিনিয়া লইয়া আগুয়ান হউন।

বাংলা দেশে কংগ্রেসের চারণ-কবি নজরুল ইসলামকে বৈদেশিক সরকারের হাতে নানাবিধ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার কয়েকখানি লোকপ্রিয় সঙ্গীতের বইয়ের বাজেয়াপ্তি এই নিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। সুখের বিষয়, সম্প্রতি তাঁহার 'বিষের বাঁশী' ও 'চন্দ্রবিন্দু' রাহুমুক্ত হইয়াছে এবং ১২।১ সারেঙ্গ লেন কলিকাতা নুরলাইব্রেরি হইতে মঈনউদ্দীন হোসয়ন সাহেব বই দুইখানি বিশেষ যত্নের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকগুলি প্রসিদ্ধ স্বদেশী গান আমরা আবার ফিরিয়া পাইলাম।

আরও কতকগুলি মূল্যবান পুস্তক অত্যল্পকালের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া আমাদের জাতীয় সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। তন্মধ্যে কংগ্রেস-সাহিত্য সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ীর (পি. সি. এল.) চিত্রে গান্ধী-জীবনী 'সত্যের সন্ধানে' দি বুক হাউস

হইতে ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখুজ্জের Congress and the Masses, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি হইতে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ঘোষের 'Nataji Subhas Chandra', সাহিত্যিকা হইতে শ্রীনির্মলকুমার বসুর 'গান্ধীজী কি চান', সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বাংলার নারী-জাগরণ', বেঙ্গল পাবলিশার্স হইতে সুভাষচন্দ্রের 'দিল্লী চলো', শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্তীর 'আগষ্ট বিপ্লব—বাংলা ও আসাম', পদ্মা পাবলিকেশনস্ লিমিটেড হইতে ইউসুফ মেহেরআলির 'The Modern World', সরস্বতী লাইব্রেরি হইতে ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখুজ্জের 'Indians in British Industries' ও রাধাকমল মুখুজ্জের 'বিশাল বাংলা', দি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং লিমিটেড হইতে শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষের 'অহিংসা ও গান্ধী', প্রসন্নকুমার পাল কর্তৃক প্রকাশিত সুভাষচন্দ্রের 'বাংলার মা ও বোনেদের প্রতি', গণবাণী পাবলিশিং হাউস হইতে শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার দাশগুপ্তের 'Pakistan and Self-Determination' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত 'Hindustan Year Book 1946'ও একখানি অতি সুন্দর রেফারেন্স বহি হইয়াছে।

বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামীর 'সংস্কৃত সাহিত্যের কথা' একটি সুলিখিত বই। সুবিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিৎ ইউসুফ-প্রণীত 'মনোবাসনা ও মনোবিকার' একখানি সুখপাঠ্য বই। এতদ্ব্যতীত নাম করা যাইতে পারে—কংগ্রেস-সাহিত্য-সংঘ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু সম্পাদিত 'স্বদেশী গান'; বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সংসদ হইতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি—১। আমাদের কংগ্রেস ২। চরকার বিপ্লবীরূপ ৩। গ্রামীন সংস্কৃতি ৪। সত্যাগ্রহ সাধনা ও অভিযান ৫। August Rebellion Vindicated ৬। গ্রামের আর্থিক বিষয়ে প্রশ্নাবলী ৭। Gandhiji's Theory of Trusteeship; হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দের 'বুনিয়াদী শিক্ষা ও বাংলাদেশের বিবরণ' এবং পরাগ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অজিতশঙ্কর দের 'Quit India Explained'।

গত তিন চার মাস 'শনিবারের চিঠি' অসময়ে প্রকাশিত হওয়াতে আমাদের সহৃদয় গ্রাহকদের যে অসুবিধা ঘটিয়াছে তজ্জন্য আমরা লজ্জিত। সময়ে প্রকাশের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি, বাংলা মাসের সাত তারিখের মধ্যে যাহাতে সকলেই কাগজ পান, সে বিষয়ে আমরা অবহিত হইতেছি। মফস্বলের গ্রাহকেরা ১০ তারিখের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে পত্রাঘাত করিবেন।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী

[শরৎচন্দ্র জীবদ্দশায় আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে যে-সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলি তাঁহার জীবনীর অমূল্য উপকরণ। এই সকল পত্র অবিলম্বে সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমরা 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' পুস্তকে তাঁহার অনেকগুলি পত্র প্রকাশ করিয়াছি। এই পুস্তক-প্রকাশের পর আরও অনেকগুলি পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে; সেগুলি ক্রমশঃ 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে লিখিত শরৎচন্দ্রের পত্রগুলি মুদ্রিত করা যাইতেছে। মূল পত্রগুলি দেখিতে ও ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে দিয়া দিলীপবাবু আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

পানিত্রাস পোষ্ট, গ্রাম সামতা-বেড়, হাবড়া জেলা

মণ্টুরাম, তোমার বই এবং ছোট্ট চিঠিখানি পেলাম। কাল দিনে রেতে বইখানি পড়ে শেষ ক'রলাম। চমৎকার লাগ্‌লো। তবে দু'একটা ত্রুটিও আছে। ভারতের বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ের মধ্যে আমার নাম না দেখতে পেয়ে কিছু ক্ষুণ্ণ হোলাম। তবে নিশ্চয় জানি এ তোমার ইচ্ছাকৃত নয়, অনবধানতাবশতই হয়ে গেছে, এবং ভবিষ্যতে এ ভ্রম যে তুমি শুধ্‌রে দেবে তাতেও আমার লেশমাত্র সংশয় নেই। ওটা দিয়ো, ভুলো না। রায় বাহাদুর মজুমদার মশায়ের রাঙা জবা মুটো মুটো মুটোর উল্লেখ কই? ওটাও চাই। কারণ, তিনিও ক্ষুণ্ণ হয়েছেন বলেই আমার বিশ্বাস। এ তো গেল বইয়ের ত্রুটির কথা, একটা মত-ভেদের বিষয়ও আছে। তুমি পূজনীয় রবিবাবুর একটা উক্তি তুলে দিয়েছ যে "আমরা সর্ব্বসাধারণকে অশ্রদ্ধা করি বলেই তাদের চিঁড়ে মুড়কির বরাদ্দ করি বাইরের প্রাঙ্গণে আর সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কথাটা শুনতে ভালো এবং যিনি লেখেন তাঁরও মানসিক ঔদার্য্য এবং নিরপেক্ষতাও প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু আসলে এতবড় ভুল বাক্যও আর নেই। শিক্ষা সভ্যতা এবং কালচারের জন্য সন্দেশই চাই, চিঁড়ে মুড়কি খাওয়াবার চেষ্টা করলে তারা পেট কামড়ানিতে সারা হয়। আর সর্ব্বসাধারণ মানেই ছোটলোক। তারা চিঁড়ে মুড়কিতেই thrive করে। একটা concrete দৃষ্টান্ত নাও। সাধারণ মানে ছোটলোক, —ও ছোটলোক। এই —র পয়সা হওয়ায় ও তোমাদের মত দু চারজনের প্রশ্রয় পাওয়ায় আজকাল তারা 3rd class ছেড়ে 2nd class compartmentএ উঠতে আরম্ভ করেছে। (1st classএ সাহেবের ভয়ে ওঠে না এই যা কতক রক্ষে) আচ্ছা, কোন compartmentএ জন দুই তিন —কে ঘণ্টা ৩.৪ ঢুকিয়ে রাখবার পরে আর সাধ্য নাই কারও যে সে ঘর ব্যবহার করে। হাতে মাটির জন্যে এক ঝুড়ি মাটি থেকে সুরু করে ছোলাসেদ্ধ, পকোড়া, থুথু, পয়ার এবং হেগে মুতে এমন কাণ্ড করে রেখে বেরিয়ে যাবে

যে সে দৃশ্য যে দেখেচে সে আর ভুলবে না। আসল কথা, অন্দরে শোবার ঘরে বসে সন্দেশ ভোজন করার যোগ্যতা আগে অর্জ্জন করা চাই। নইলে অন্দরের দোর খোলা পেয়ে একবার তারা হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করে ঢুকে পড়লে আমরা আর বাঁচবো না। অতএব এরূপ অশ্রদ্ধেয় বাক্য আর কখনো বোলো না।

তোমার concertএ যেতে পারিনি শরীর একটু অসুস্থ ছিল বলে। আরও একটা হেতু এই যে, মেদিনীপুরের বারো আনা মানুষই কৈবর্ত্ত। তাদের সাহায্য করা এবং অর্থের অপব্যবহার করা এক কথা। দ্বিতীয় হেতু, প্রতি বৎসরেই কোথাও-না-কোথাও বন্যা হবেই। হতে বাধ্য। Govt. তার কোন উপায় করে না করবে না। এ হয়েছে দেশের উপরে একটা স্থায়ী tax. এমন কোরে বছর বছর বন্যাপীড়িতের সাহায্য করার সার্থকতা কি? Govt.কে তারা একটা কথা জোর করে বলবে না, এক কোদাল মাটি কেটে রেলের রাস্তা ভেঙে যে জল বার করে দেবে তা দেবে না, পাছে সাহেবরা ধরে জেলে দেয়। তারা জানে কলকাতার ভদ্র লোকের মহাকর্ত্তব্য হচ্চে তাদের খাওয়া পরা দেওয়া যেহেতু তাদের ঘরে দোরে জল উঠেছে। তাছাড়া পদ্মার চরে —রা কেন ঘর বেঁধে বাস করে জানো? শুধু এই জন্যে যে বর্ষায় তাদের ঘর দোর ভেসে গেলেই পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রলোকদের টাকা দিতে হবে। শুধু out of malice এবং spite তারা গিয়ে ঐ রকম ভয়ানক যায়গায় বাস করেছে। এ ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আমি নিশ্চয় জানি এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার কোনপ্রকার মতভেদ হবার আশঙ্কা নেই। কারণ, তুমি বুদ্ধিমান, যা সত্যিকথা তা বুঝবেই।

তুমি বিলেত যাচ্ছো খবরের কাগজে দেখলাম। আশীর্ব্বাদ করি তোমার যাত্রা নির্ব্বিঘ্ন হোক্, উদ্দেশ্য সফল হোক্। আমার বয়স হয়েছে, ফিরে এসে যদি আর দেখা না হয় এই কথাটি মনে রেখো আমি চিরদিন তোমার শুভকামনা করে গেছি।

আশা করি তোমার কুশল। ইতি ২২শে ভাদ্র ১৩৩৩

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—আগামী ৩১শে ভাদ্র আমার বয়স পঞ্চাশ হবে। ১লা আশ্বিন যাবো কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে।

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট, জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

মন্টু, তোমার চিঠি এবং টিকিট দুইই পেয়েছি। Concertএ যাবার সময় ছিল না, কারণ, চিঠি যখন পেলাম তখন যাবার উপায় নেই। কিন্তু ভারি ইচ্ছে ছিল বৃহস্পতিবারে তোমার বিদায় উৎসবে যোগ দেবার। কিন্তু এদিকে B. N. Ry. ট্রাইক, গাড়ী নেই বললেই হয়। যাও বা আছে ৭।৮ ঘণ্টার কমে হাবড়ায় পৌঁছয় না। আ-

নাই-ই গেলাম। চোখের দেখা শোনার এমনিই কি দরকার? এখান থেকেই সমস্ত মন দিয়ে আশীর্ব্বাদ করচি তোমার পথ যেন নির্ব্বিঘ্ন হয়, তোমার যাওয়া যেন সার্থক হয়।

আমি বিশেষ ভাল নেই, দেহটা নিয়তই ক্ষীণ এবং অপটু হয়ে আসচে। তবু আশা আছে তুমি ফিরে এলে আবার দেখা হবে। তোমার দুখানি বইই বড় মন দিয়ে পড়েছি। মনের পরশের শেষটি বড় মধুর। বুকের দরদ দিয়ে যে সংসারটা দেখতে শিখেচে তার লেখার ভিতরে যে কত ব্যথা, কত আনন্দ সঞ্চিত হয়ে ওঠে এ বইখানি পড়লে তা' জানা যায়।

তুমি সদাই ব্যস্ত, তোমার সময় কম; কিন্তু এবার ফিরে এসে তোমাকে লেখার দিকে একটু মন দিতে হবে। রচনার যে শিল্প বল, কৌশল বল, টেক্‌নিক বল—এই বস্তুটা যা আছে তা আর একটুখানি যত্ন নিয়ে তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে। কেবল লেখাই ত নয় ভাই, না-লেখার বিদ্যেটাও যে শিখতে হয়। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয় যে কথা শতমুখে বলতে চায়, তাই শান্ত সংযত হয়ে একটুখানি গভীর ইঙ্গিতেই সম্পূর্ণ হয়ে আসে। মাঝে মাঝে এ চেতনা তোমার এসেছে, আবার মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয়েছ। অর্থাৎ, পাঠকের দল এমনি কুড়ে যে তারা শত যোজন সিঁড়ি ভেঙে স্বর্গে যেতেও চায় না যদি একটুখানি মাত্র ডিগবাজী খেয়ে নরকে গিয়েও পৌঁছতে পারে। এই হদিসটুকুই মনে রাখা রচনার সবচেয়ে বড় কৌশল।

আমার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ রইল। ইতি ৬ই ফাল্গুন ১৩৩৩

তোমাদের

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতা বেড়, পানিত্রাস পোষ্ট, জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

মণ্টু, তোমার চিঠি পেয়ে যে কত আনন্দ পেলাম তা তোমাকেও জানানো শক্ত। তুমি যে আমাকে শ্রদ্ধা কর, ভালবাসো এও যদি না বুঝবো ত বুঝবো সংসারে কি?

তোমার বিদায় অভিনন্দনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মুখে কি কি হয়েছিল সব শুনেছি। তুমি বিদেশে যাচ্ছো, কিন্তু একটু শীঘ্র করে ফিরে এসো। তুমি কাছাকাছি নেই মনে হলে কষ্ট হয়।

মনের পরশের শেষ অংশ অর্থাৎ তৃতীয় অংশটা যে আমার কত ভাল লেগেছিল তা বলতে পারিনে। সত্যকার ব্যথা ও দুঃখের মধ্য দিয়ে সমস্ত পৃথিবীময় মানুষে যে মানুষের কত আপনার এই কথাটি কত সহজেই না তোমার বইয়ের শেষটুকুতে ফুটে উঠেছে। তাই আমার কেবলি মনে হয়েছিল তুমি বুঝি কার যথার্থ জীবনের দুঃখের

কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করে গেছ। কিন্তু এই লিপিবদ্ধ করার প্রণালীটি তোমাকে আর একটুখানি যত্ন নিয়ে শিখতে হবে। তোমার বাবাকে আমি জানতাম না, তাঁর অন্তরঙ্গদের মুখে শুনি তাঁর মানুষের বেদনা বোঝবার অনুভূতি খুব বড় রকমের ছিল। এইটি হয়ত তুমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছ। তোমাকে এই বস্তুটিকে মনের মধ্যে দিবারাত্রি লালন করে পূর্ণ মানুষ করে তুল্‌তে হবে। তবেই ত হবে।

বেশ, আমার চিঠির মধ্যে থেকে যা ইচ্ছে তুমি প্রকাশ করতে পারো। অনুমতি দিলাম।

তুমি আমার অতিশয় স্নেহের জিনিস। আজ বলে নয়, অনেক দিন থেকে। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমার বাড়ীতে এসে হৈ হৈ করে লুচি খেয়ে যেতে, তখন থেকে।

তোমাকে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি এ জীবনে তুমি সফল হও, নীরোগ হও, দীর্ঘজীবী হও। ১৩ই ফাল্গুন '৩৩।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট, জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, কতদিন থেকে তোমার চিঠির জবাব দিতে পারি নি। না জানি কত রাগই তুমি কোরেছ। সেদিন তোমাদের থিয়েটার রোডের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। কিন্তু না ছিলে তুমি, না ছিলেন তোমার মাতুল তকু। সাহেবের বাড়ী, অপেক্ষা করা রীতিবিরুদ্ধ কি না স্থির হোলো না। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি পাকা লোক। দালালি কাজে সাহেবের বাড়ীতে তাঁর যাতায়াত আছে। তিনি বললেন card রেখে যাওয়াই etiquette.—হাঁ করে বসে থাক্‌লে এরা রাগ করে। কিন্তু card না থাকায় আমরা নিঃশব্দে ফিরে এলাম।

কালও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার দুধারার অনেক জায়গা আর একবার পড়ে গেলাম। বাস্তবিকই বইখানি ভালো। অবহেলা কোরে যেমন-তেমন ভাবে পড়ে যাবার জিনিস নয়, মন দিয়ে পড়বার মতই বই। কিন্তু জানো ত আজকাল প্রশংসাপত্রের দাম নেই। কারণ, কথার দাম যাঁদের আছে তাঁরা নিজেরাই তার অমর্য্যাদা করেন। তাই সহজে আমি কথা কইনে। কিন্তু আমার কথায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের সকলকেই বলি মণ্টুর এ বইখানি যেন তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে আদ্যোপান্ত একবার পড়ে দেখেন। আমার নিজের তো পেশাই এই, তবুও এতে এমন ঢের কথা আছে যা আমিও ইতিপূর্ব্বে চিন্তা করে দেখি নি।

ভারতবর্ষে [জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫] তোমার চাকর গল্পটা পড়লাম। গল্পের দিক দিয়ে এ তেমন

ভালো হয় নি, কিন্তু একটা জিনিস দেখ্‌চি তোমার চমৎকার develop করে উঠ্‌ছে সে তোমার dialogue। গল্প লেখবার কৌশল অথবা পদ্ধতি এবং এই dialogueএর দ্বারা,—তোমার লেখায় যেদিন এ দুটোর একটা মিল হয়ে উঠ্‌বে সেদিন তুমি সত্যিই বড় সাহিত্যিক হবে। একটা কথা ভুলো না মণ্টু। লেখার মধ্যে লিখে যাওয়াও যেমন শক্ত, লেখার মধ্যে না লিখে থেমে থাকাও তেমনি শক্ত। কিন্তু এ বস্তুটা কাউকে শেখানো যায় না আপনি শিখ্‌তে হয়। আমি নিশ্চয় জানি এ শিখে নিতে তোমার বাধ্‌বে না। আজ তোমাকে যারা বিদ্রূপ করে, তারাই একদিন প্রকাশ্যে না হোক্ মনে মনেও এ সত্য স্বীকার করবে। আমাদের যাবার দিন নিকটবর্ত্তী হয়ে আস্‌চে, আমরা হয়ত এ চোখে দেখে যেতে পাবো না, কিন্তু ততদিন পরেও আমাকে যদি তোমার মনে থাকে তো আমার এই কথাটা তোমার স্মরণ হবে।

আ—র প্রবন্ধগুলো পড়লাম। ছেলেমানুষের লেখা,—এর ভাল মন্দ এখনো বিচার করবার সময় আসে নি। বয়সের সঙ্গে আড়ম্বরের আতিশয্যগুলো কেটে গেলে লেখা হয়ত এর ভালোই হবে। ছেলে বয়সের একটা মস্ত দোষ এই যে অনেক-বই-পড়ার অভিমানটা এদের পেয়ে বসে। তাই নিজের লেখার মধ্যে নিজের কিছুই থাকে না, থাকে শুধু মুখস্ত-করা পরের কথা। থাকে কারণে-অকারণে যেখানে-সেখানে গুঁজে দেওয়া বিদ্যের বাচালতা। মেয়েটিকে তুমি অতো দ্রুতবেগে লিখ্‌তে বারণ কোরো। লেখার দ্রুতগতি কেরাণীর qualification—লেখকের নয়। এ কথা ভোলা উচিত নয়। অল্প বয়সে গল্প লেখা ভালো, কবিতা লেখা আরো ভালো, কিন্তু সমালোচনা লিখতে যাওয়া অন্যায়। তা' উপন্যাসের ওপরেই হোক্, বা নারীর ওপরেই হোক্।

"শরৎচন্দ্র ও গল্‌সওয়ার্দ্দি" প্রবন্ধ পড়লাম। গল্‌সওয়ার্দ্দি নামটাই শুধু শুনেচি তাঁর কোন বই আমি পড়ি নি। সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোথায় আমার মিল কোথায় গরমিল কিছুই জানি নি। প্রবন্ধের মধ্যে আমার সুখ্যাতি আছে আর আছে গল্‌সওয়ার্দ্দির রাশি রাশি কোটেশন্। তার থেকে কোন অর্থই আমার আদায় হোলো না। এইটুকুই বুঝ্‌লাম আশালতা তাঁর বই পড়েচেন এবং গলসওয়ার্দ্দি ভদ্রলোক যেই হোন্ অনেক ভালো ভালো বচন দিয়ে গেছেন। এবং সে সব পড়লে জ্ঞান জন্মায়।

মেয়েটি যে জীবনে সুখী নয় একথা শুনে ক্লেশ বোধ হয়। কিন্তু এ সমাজে মেয়ে-জন্মের এম্‌নি অভিশাপ যে এর থেকে নিষ্কৃতিরও পথ নেই। মেয়েটির লেখা পোড়ে মনে হয় ভারি বুদ্ধিমতী। কিন্তু জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তু পাওয়া যায় তার নাম অভিজ্ঞতা। শুধু বই প'ড়ে একে পাওয়া যায় না, এবং না পাওয়া পর্য্যন্ত জানাও যায় না এর মূল্য কত। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা উচিত যে অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা প্রভৃতি কেবল শক্তি দেয়ই না, শক্তি হরণও করে। তাই বয়স কম থাক্‌তেই কতকগুলো কাজ

সেরে নেওয়া উচিত। এই যেমন গল্প লেখা। আমি অনেক সময়ে দেখেছি কম বয়সে যা লেখা যায় তার অনেক অংশই আবার বয়স বাড়লে লেখা যায় না। তখন বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ও সঙ্কোচে বাধে। মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না ক্রিটিক্‌ও থাকে। বয়সের সঙ্গে এই ক্রিটিকটিই বাড়তে থাকে। তাই বেশি বয়সে লেখক যখন লিখতে চায় ক্রিটিকটি প্রতি হাতে তার হাত চেপে ধরতে থাকে। সে লেখা জ্ঞান বিদ্যে বুদ্ধির দিক দিয়ে যত বড়ই হয়ে উঠুক রসের দিক দিয়ে তার তেমনি ক্রটি ঘট্‌তে থাকে। তাই আমার বিশ্বাস যৌবন উত্তীর্ণ করে দিয়ে যে ব্যক্তি রস-সৃষ্টির আয়োজন করে সে ভুল করে। মানুষের একটা বয়স আছেই যার পরে কাব্য বলো উপন্যাস বলো আর লেখা উচিত নয়। রিটায়ার করাই কর্ত্তব্য। বুড়ো বয়সটা হচ্চে মানুষকে দুঃখ দেবার বয়স, মানুষকে আনন্দ দেবার অভিনয় করা তখন বৃথা।

সেদিন বার্ট্রাণ্ড রসেলের An Outline of Philosophy বইখানি পড়লাম। এ বইখানি শক্ত, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতির বিশেষ জ্ঞান না থাকলে সকল কথা ভালো বোঝা যায় না, বুঝতেও পারি নি। কিন্তু মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় মানুষটির সরলতা দেখলে, এবং অনভিজ্ঞ মানুষকে সোজা করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা দেখে। আনাড়ি লোকদের ওপর এঁর অশেষ করুণা। আহা! এ বেচারারা দুটো কথা বুঝুক,—সত্যিকার এই ইচ্ছেটুকু যেন এঁর লেখার ছত্রে ছত্রে অনুভব করা যায়। ভাবি, যাঁরা বাস্তবিকই পণ্ডিত, জ্ঞানী তাঁদের লেখার সঙ্গে ফোক্কড়দের লেখার কতই না প্রভেদ। এটা কতই না স্পষ্ট হয়ে ওঠে এঁর লেখার পাশাপাশি H. G. Wellsএর লেখা পড়লে! এর কেবলই চেষ্টা বড় বড় কথা শুধু চালাকি আর ফুক্কুড়ি করে মেরে দেবো। রসেলের On Education বইটা কিনে এনেচি। ভাবচি কাল পোড়ব। আসচে বছরে যদি বিলেতে যাই শুধু এই লোকটিকে একবার দেখে আসবার জন্যেই যাব।

সেদিন জন কয়েক ছেলে এসে তোমার মনের পরশের ভারি সুখ্যাতি করছিলো। তারা বলে এ বইটির সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলাম তা বাস্তবিক সত্য। শুনে বড় খুসি হয়েছিলাম।

মায়া কেমন আছে? এখন তুমি কোথায় আছো ঠিক না জানার দরুণ তোমার মামার বাড়ীর ঠিকানাতেই চিঠি দিলাম। আশা করি পাবে। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।

[আষাঢ় ১৩৩৫] শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Autographএর খাতাটা নিজে গিয়ে একদিন দিয়ে আসবো। হারাই নি,—আছে। মালিককে জানিয়ে দিয়ো।

ক্রমশ

উপনিষদ

কেন

তৃতীয় খণ্ড

ব্রহ্মই জয় করিয়াছিলেন দেবতা লাগি
ব্রহ্ম-বিজয়ে দেবতারা হ'ল মহিমাময়
দেবতা ভাবিল এ মহিমা বুঝি আমাদেরই
এ বিজয় বুঝি আমাদেরই জয় ॥ ১ ॥

ব্রহ্ম তখন ব্যাপার বুঝিয়া মূর্ত হলেন
দেবতারা তবু চিনিল না তাঁরে, বুঝিল না তাঁর লক্ষ্য কি
ভাবিল এ কি এ! যক্ষ কি? ॥ ২ ॥

অগ্নিকে তারা কহিল ডাকিয়া, "হে জাতবেদ,
দেখিয়া এস ত ব্যাপারটা কি
যক্ষ অথবা কি বস্তু"
"তথাস্তু" ॥ ৩ ॥

অগ্নি গেলেন তাঁহার নিকটে
শুধালেন তিনি, "কে তুমি কহ"
"আমি জাতবেদা, আহুতিবহ" ॥ ৪ ॥

"কোন্ গুণে তুমি শক্তিধারী"
"এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে পোড়াতে পারি" ॥ ৫ ॥

"পোড়াও তবে"—সামান্য তৃণ রাখিলেন।তিনি সমুখে তার
তৃণের নিকটে গমন করিয়া
মহা উৎসাহে তেজ বিতরিয়া
অবশেষে হায় মানিয়া হার
ফিরিয়া আসিয়া অগ্নি কহেন সকলকে
"বুঝিতে নারিনু যক্ষ কে" ॥ ৬ ॥

বায়ুকে তখন কহিল তাহারা—"হে বায়ু, তুমি
দেখিয়া এস তো ব্যাপারটা কি
যক্ষ অথবা কি বস্তু"
"তথাস্তু" ॥ ৭ ॥

বায়ুও গেলেন তাঁহার নিকটে
শুধালেন তিনি—"কে তুমি কহ"
"আমি বায়ু আমি গন্ধবহ" ॥ ৮ ॥

"কোন্ গুণে তুমি শক্তিধারী"
"এই পৃথিবীর যাহা কিছু আছে লইতে পারি" ॥ ৯ ॥

"লও তো দেখি"—সামান্য তৃণ রাখিলেন তিনি সমুখে তার
তৃণের নিকটে গমন করিয়া
মহা উৎসাহে তেজ বিতরিয়া
অবশেষে হায় মানিয়া হার
ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন তিনি সকলকে
"বুঝিতে নারিনু যক্ষ কে" ॥ ১০ ॥

ইন্দ্রকে তারা কহিল ডাকিয়া, "হে মঘবন
দেখিয়া এস তো ব্যাপারটা কি
যক্ষ অথবা কি বস্তু"
"তথাস্তু"
কিন্তু ইন্দ্র গেলেন যখন
অন্তর্হিত ব্রহ্ম তখন ॥ ১১ ॥

সেই আকাশেই এসেছে তখন অতি সুশোভনা উমা
স্বর্ণকান্তি আকাশে উদ্ভাসিয়া
"এই যক্ষ কে জানেন কি"—ইন্দ্র তাঁহারে
জিজ্ঞাসিলেন গিয়া ॥ ১২ ॥

চতুর্থ খণ্ড

উমা কহিলেন—"ব্রহ্ম ইনি
ইঁহারই বিজয়ে তোমরা মহিমাময়"
ইন্দ্র তখন লাভ করিলেন ব্রহ্মের পরিচয় ॥ ১ ॥

অগ্নি বায়ু ও ইন্দ্র যে হেতু সর্বপ্রথমে ঘনিষ্ঠভাবে
লভিয়াছিলেন ব্রহ্মকে
শ্রেষ্ঠ তাঁহারা দেবলোকে ॥ ২ ॥

ইন্দ্র যে হেতু সর্বপ্রথমে ঘনিষ্ঠভাবে চিনিয়াছিলেন ব্রহ্মকে
দেব-রাজ তিনি দেবলোকে ॥ ৩ ॥

ব্রহ্ম-বিষয়ে এই দৈব উপদেশ
বিদ্যুৎ চমক তিনি, আঁখির নিমেষ ॥ ৪ ॥

আধ্যাত্মিক উপদেশ এই
মন যেন তাঁরই দিকে যায় ক্ষণে ক্ষণে
বারম্বার সঙ্কল্পে স্মরণে
লাভ যেন করে তাঁহাকেই ॥ ৫ ॥

সর্বময়—নাম* তিনি—এইরূপে করা চাই তাঁর উপাসনা
এইরূপে যে তাঁহারে উপাসনা করে সকলের বাঞ্ছিত সে জনা ॥৬॥

"ভগবন, উপনিষদের কথা শোনাও আমারে"
"উপনিষদেরই কথা বলিলাম এই
ব্রহ্ম-বিষয়েই
এই তো কহিনু বারে বারে ॥ ৭ ॥

* মূলে আছে তদ্বনং নাম [তদ্বনং = তৎ+বনম্] বন্ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্ত হওয়া, অন্য অর্থ আছে না জানি না। অনেকে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন সম্ভজনীয়। কথাটি দুর্বোধ্য মনে ায় সর্বময় কথাটি ব্যবহার করিয়াছি।

তপ, দম, কর্ম জেন তাঁহার চরণ
চতুর্বেদ সর্ব অঙ্গ সত্য আয়তন ॥ ৮ ॥

এরূপে ব্রহ্মকে যিনি বুঝিতে পারেন
সর্বপাপ করিয়া স্থালন
শ্রেষ্ঠ অনন্ত স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হন তিনি
প্রতিষ্ঠিত হন" ॥ ৯ ॥

ক্রমশ

"বনফুল"

গঠনকর্মপদ্ধতি

কিছুদিন পূর্বে 'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়িতেছিলাম। পড়িতেছিলাম, কমলাকান্ত দেখিলেন বঙ্গ-প্রতিমা অতল জলে নিমজ্জিত হইয়া গেল, কমলাকান্ত আকুল চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

"দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্তকাল-সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল। অন্ধকারে সেই তরঙ্গসংকুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল। তখন যুক্তকরে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি!"

আজ মনে হইতেছে, কমলাকান্তের আকুল চীৎকারের দিন শেষ হইয়াছে। মনে হইতেছে, আজ যেন সেই দুঃস্বপ্নের অবসান হইতে চলিয়াছে, কে যেন বলিতেছে যে, সেই উত্তাল জল দুই ভাগ করিয়া নিমজ্জিত বঙ্গ-প্রতিমা আবার ভাসিয়া উঠিবে, দশ দিক আলোয় ঝলমল করিতে থাকিবে, আমরা আবার সম্মিলিত কণ্ঠে বজ্রস্বরে বলিতে পারিব, অবলা কেন মা এত বলে!

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবিচ্ছেদ ও বঙ্গভঙ্গের যে গভীর ছায়া আমাদের উপর ঝুলিতেছিল তাহার অবসান হয় নাই। বস্তুত তাহা হওয়া সম্ভব ছিল না, কেন না সাম্রাজ্যবাদ স্বেচ্ছায় ভাল পথে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবে, ইহা ইতিহাসে লেখে না।

কিন্তু তবু বলিব, সেই ঘন অন্ধকারের ছায়া আমাদের উপর পড়িতে থাকিলেও আলোর সন্ধান পাইতেছি। সে আলো সরকারী মহল হইতে আসিতেছে না, সে আলো জাগ্রত জনশক্তির বিচ্ছুরিত তেজে জ্বলিয়া উঠিতেছে।

ইহা রোমাঞ্চকর কল্পনা বা সুখস্বপ্ন নহে ; চারপাশে উদ্দাম জনসমুদ্রের যে গভীর কলরোল শুনিতেছি তাহাতে বোঝা যাইতেছে যে, এই তরঙ্গ থামাইবার নহে। দিকে দিকে মুক্তির আহ্বান পৌঁছিয়াছে, সেই আহ্বানে জনসাধারণ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে, তাহাদের আর সুবোধ বালকের মত ঘরে ফেরানো যাইবে না। আইনের ভয় রক্তচক্ষুর ভয়, এমন কি প্রাণের ভয়ও তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। চীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, ভারতবর্ষে, এমন কি সেদিন কলিকাতার রাজপথে তরুণ ছাত্রেরা সে কথা নিশ্চিন্তভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

অথচ ভয় এবং সম্ভ্রমই হইল রাজ্যশাসনের ভিত্তি, বিশেষত পরের দেশশাসনের তাহাই হইল গোড়ার কথা। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র রাজা সর্বদা জালের আড়ালে থাকিত, লোকে তাহাকে দেখিলে তাহার মহিমা খর্ব হইয়া যাইবে। তেমনই সাম্রাজ্যবাদের মজাই এই যে, তাহার সম্ভ্রমটাই সর্বস্ব ; প্রথম যুগে তাহার যে ক্ষমতা থাকে, শেষে বনেদীবংশের মত তাহা অন্তঃসারশূন্য হইয়া যায়। বাহিরে যে পরিমাণ মর্যাদা থাকে ভিতরে সে পরিমাণ ক্ষমতা থাকে না।

অবশ্য সাম্রাজ্যবাদ তাহার অন্তিম দিনের দিকে আগাইয়া চলিলেও এখনও একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়ে নাই। সেইজন্য যেখানে সম্ভব, সে তাহার মরণকামড় দিতে ত্রুটি করিতেছে না। বর্মা-বিজয়ের পর আবার তাহাদের পুরাতন অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা হইতেছে, জাভায় ব্রিটিশ কামান জাহাজ এরোপ্লেন জাভাবাসীদের দেশপ্রেমের চরম মূল্য আদায় করিতেছে, যাহারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতের ভিতরে ও বাহিরে লড়াই করিয়াছিল তাহাদের শাস্তি দিতেছে, আর তাহাদের মুক্তিকামী নিরীহ ছাত্রদের নবযৌবনের স্বপ্নকে গুলির আঘাতে ভাঙিয়া কলিকাতার রাজপথ রক্তরঞ্জিত করিয়াছে।

কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, এই উত্তাল তরঙ্গকে ফেরানো যাইবে না। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার বিচারকালে একবার বলিয়াছিলেন যে, বর্তমান ক্ষেত্রে তিনি যে আসামী হইয়াছেন তাহার অর্থ দাঁড়ায়—আজ ব্রিটিশ সরকার সমস্ত ভারতবর্ষকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে চাহেন। কিন্তু ভারতের মুক্তিপিপাসু কোটি কোটি নরনারীকে এইভাবে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইবার চেষ্টায় সফল হওয়া মদগর্বিত সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেও সম্ভব নহে। তাহার কারণ বর্তমান আইন-আদালতই আর সর্বোচ্চ শক্তির আধার নয়, স্বাধীনতা ও সুখশান্তির যে আদিম আকাঙ্ক্ষা জনমনকে উদ্বেল করিয়া তুলিতেছে ইতিহাস তাহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ভবিষ্যৎ সেইভাবেই গড়িয়া উঠিবে।

সেইজন্যই আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। এক দিকে যেমন জনশক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তেমনই অন্য দিকে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এমন এক যুগসন্ধি উপস্থিত, যে সময় স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারত

ত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে আমাদের দুই দিক দিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

প্রথমত সাম্রাজ্যবাদ এখনও যায় নাই। তাহার সম্পূর্ণ ধ্বংসের জন্য এই উদ্বেল জনশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করিয়া শেষ আঘাত হানিতে হইবে, সেজন্য প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু ইহাও আর বড় সমস্যা নহে। পণ্ডিত নেহরু কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় সিনেট হলে বলিয়াছেন যে, ইতিহাসের পটভূমিকায় দেখিতে গেলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইতিমধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে, যদিও বাহ্যত তাহা এখনও ঠিক আছে। ইহা আমাদের সব চেয়ে বড় সাম্প্রতিক সমস্যা হইতে পারে, কিন্তু এখন তাহার পরের কথাও ভাবিবার সময় আসিয়াছে। ভবিষ্যতে আমরা কি ভাবে রাষ্ট্রগঠন করিব তাহার কাঠামোটা মোটামুটি পরিষ্কার হওয়া দরকার, সেই ভবিষ্যতের রাষ্ট্রের সাধনা শুরু করিবার সময় আসিয়াছে।

এই কারণে আমাদের জাতীয় জীবনে আমরা এতকাল যে উপায়ে যে দৃষ্টিভঙ্গীতে সাধনা ও সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছি, তাহা আর ভবিষ্যতে চলিবে কি না, সে সম্বন্ধে চিন্তা জাগিয়াছে। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, আমাদের কর্মধারা দ্বিবিধ খাতে প্রবাহিত হইয়াছে: যখন আমাদের জাতীয়তাবোধ প্রথম জাগরিত হইল, তখন আমরা এক দিকে বিদেশী আক্রমণের হাত হইতে নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা করিতে ব্যাকুল হইলাম। অন্য দিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিলাম, যাহাতে তাহারা সাম্রাজ্যবাদের গর্বে আমাদের দেশকে অপমান ও উপেক্ষা না করিতে পারে।

স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে মন্ত্র ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এই; তিনি লিখিয়াছেন, "ইংরেজের সহিত সংঘর্ষ আমাদের অন্তরে যে একটি উত্তাপ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে তদ্দ্বারা আমাদের মুমূর্ষু জীবনীশক্তি পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিতেছে; আমাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের যে সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা অন্ধ ও জড়বৎ হইয়া অবস্থান করিতেছিল তাহারা নতুন আলোকে পুনরায় আপনাকে চিনিতে পারিতেছে···দীর্ঘ প্রলয়রাত্রির অবসানে অরুণোদয়ে যেন আমরা আমাদেরই দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছি··আমাদের মনে যে একটা ধিক্‌কারের প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেই আমাদিগকে আমাদের নিজেদের দিকে পুনরায় সবলে নিক্ষেপ করিয়াছে।"

সেইজন্য সরকারের সহিত আমাদের যেটুকু সম্পর্ক তাহা বিরোধের সম্পর্ক, তাহা সংগ্রামের ও সংঘর্ষের সম্পর্ক, সে সম্পর্ক নেতিমূলক। আমরা তোমাদের চাই না, তোমাদের রাজ্যশাসন-সুশৃঙ্খলা চাই না, তোমাদের দয়াদাক্ষিণ্য চাই না—এই না-না-রবই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। আর আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হইবার সঙ্গে

সঙ্গে আমরা শুধু মৌখিক তর্জনগর্জন না করিয়া অসহযোগ ও আন্দোলন করিয়া সেই প্রতিবাদকে বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছি এবং অনেকাংশে সফল হইয়াছি। আজ জনসমুদ্র এমন জোয়ারের বেগে টলমল করিতেছে যে, আমাদের নেতারাও সংযমের উপদেশ দিতে বাধ্য হইতেছেন।

অপর দিকে আমরা যাহা চাই, তাহার সঙ্গে সরকারের কোন সম্পর্ক ছিল না। সরকার দুই-একটা বাঁধ করিয়াছেন কি রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছেন, ইহা তো গরু মারিয়া জুতাদান। সুতরাং আমরা যাহা চাই, তাহা সরকারকে বাদ দিয়াই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি, চেষ্টা করিয়াছি যাহাতে আমাদের আহত ক্ষত-বিক্ষত সমাজশরীরে নিজেরাই প্রলেপ দিতে পারি, সেই শরীরকে পুষ্ট ও শক্তিমান করিয়া তুলিতে পারি।

স্বদেশী সমাজের মূল কথা ইহাই। রবীন্দ্রনাথ সেদিন এই কথাটাই বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রশাসনের কর্তা যিনিই হোন-না কেন, আমাদের মর্মস্থল আমাদের সমাজে এবং সেই সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিলে যিনিই রাজা হোন-না কেন, আমাদের কিছু যায় আসে না।

স্বদেশী আমলের পর আমাদের সমাজগঠনে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু মূল কাঠামোকে আমরা এখনও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি নাই। এক দিকে আমরা এখনও বলিতেছি, চাই না এবং তাহা আরও সজোরে সবলে বলিতেছি, যাহা এতদিন স্পষ্ট বলিতে পারি নাই আজ তাহাই সতেজ উদাত্ত কণ্ঠে বলিতেছি, কুইট ইণ্ডিয়া। তেমনই অন্য দিকে আমাদের যাহা প্রয়োজন তাহা রাষ্ট্রকে বাদ দিয়াই গড়িবার চেষ্টা করিয়াছি, আমাদের গঠনমূলক কার্য-পদ্ধতির মধ্যে রাষ্ট্রের স্থান একেবারেই নাই।

এই মনোভঙ্গী আমরা আজও এড়াইতে পারি নাই, পারা সম্ভব নহে, কারণ এ দেশের রাষ্ট্র আমাদের রাষ্ট্র নহে। সেইজন্য এখন পর্যন্ত আমরা গঠনমূলক কার্যে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছি। যদি রাষ্ট্রের সাহায্য তাহাতে মেলে, ভাল, কিন্তু রাষ্ট্রের উপর প্রত্যাশা করিয়া আমাদের কোনও পরিকল্পনা নাই। এমন কি, অনেক সময় এমনও ঘটিয়াছে যে, রাষ্ট্রের সাহায্য মিলিলেও আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, আমাদের ভাইবোনের রক্তে কলঙ্কিত হাত হইতে দান গ্রহণ করিতে আমরা পারি নাই।

স্বদেশী আমলে ভাবাবেগের বন্যায় যাহার বীজটি মাত্র ভাসিয়া আসিয়াছিল, ক্রমে পলি পড়িতে সেই বীজটি ধীরে ধীরে বহু রূপে বহু দিকে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই যে সে-সময় কে যেন আমাদের সবলে নিজেদের দিকে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই দিন হইতে আমরা গঠনমূলক কার্যে নিজেদের উপরই নির্ভর করিতে শিখিলাম। স্বদেশী আমলে আন্দোলন মধ্যবিত্তসমাজকে অতিক্রম করিয়া সমাজের সমস্ত স্তরে পরিব্যাপ্তি হয় নাই।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই গোমুখী-ধারায় নানা জলপ্রবাহ মিশিয়া এখন তাহা প্রবল জলস্রোতে পরিণত হইয়া সাগরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছে, তাহার মেঘনাদ সাগরের গর্জনের মতই শোনাইতেছে।

আমাদের এই জয়যাত্রার পথপ্রদর্শক মহাত্মা গান্ধী। তাঁহার মধ্যে বর্তমান অবস্থার সুরটি যেরূপ নিখুঁতভাবে প্রতিরণন তুলিয়াছে, তাহা আর কখনও দেখা যায় নাই। সেইজন্য তাঁহার আন্দোলন যেমন জগতে এক অপূর্ব বিস্ময়, তাঁহার গঠনমূলক কার্যপদ্ধতিও জগতে এক অপূর্ব বস্তু। তাঁহার আন্দোলনের অপূর্ব দীপ্তির মূলে আছে অত্যন্ত গোড়ার কথাটা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে বলা। এ জগতে সর্বদা রফা করিয়া চলিতে হয়, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার খাদ মিশাল দিয়া চলিতে হয়, ইহাই জাগতিক নিয়ম। সেখানে যদি কেহ বলিয়া বসে যে, আমি নিছক সত্য ছাড়া কিছু বলিব না, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়ে। দিনের আলো যেমন প্রবাদবাক্যের পেঁচা সহিতে পারে না, তেমনই এই সত্যের দীপ্তি সহ্য করা সাধারণ জগতের পক্ষে সম্ভব নহে। আমাদের শাস্ত্রে বলে, সদা সত্য কথা বলিবে; অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাচরণ হইতেছে, সেখানে অনাহূত ভাবে স্বয়ং অগ্রসর হইয়াও সত্য কথা বলিবে। এমন কথা শাস্ত্রে বলেন নাই যে, মিথ্যা কথা কহিও না। তাহা হইলে তাহা শুধু বারণ হইত, আদেশ হইত না; কিন্তু সদা সত্য কথা বলিবে—ইহা আদেশ, সুতরাং আগ বাড়াইয়াও, অপ্রীতিভাজন হইয়াও সত্য বলিতে হইবে। যে লোক অত্যন্ত মামুলি অথচ অত্যন্ত কঠিন এই নীতিবাক্যটাকে কাজে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইল, লোকে দুই-চারদিন তাহাকে উপহাস করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহা দুই-চারদিনের বেশি নহে। মামুলি বলিয়াই তাহার অসাধারণ তেজে সকলে স্তম্ভিত হইয়া যায়। যাহা অত্যন্ত elemental, তাহা অত্যন্ত elemental বলিয়াই অসম্ভব শক্তিশালী।

কিন্তু সকল elemental সত্যের তেজ সমান নয়। ক্ষুধায় আহার দরকার, ইহা একটি মৌলিক সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া বাঘ যদি বলিয়া বসে যে, সে জঙ্গলের সমস্ত পশুই মারিয়া ফেলিবে—তাহা মৌলিকও বটে সত্যও বটে, কিন্তু তাহার তেজ তবু বেশি হইবে না। অবশ্য যে বাঘ মারিবার পূর্বে বৈষ্ণবী বিনয় করে না, সোজাসুজি মারিতে আসে, সে তাহার স্পর্ধার জোরে আমাদের সম্ভ্রম উদ্রেক করে বটে, কিন্তু প্রীতির উদ্রেক করে না। আমরা সেইজন্যই অনেক সময় বৈষ্ণবী-ব্যাঘ্র অ্যাটলী সাহেব অপেক্ষা নিছক ব্যাঘ্র চার্চিল সাহেবকে বেশি সম্ভ্রম করি, কিন্তু প্রীতির দাবি কেহই করিতে পারেন না।

কিন্তু যদি এমন কোনও মৌলিক সত্য দেখা যায়, যাহা শুধু মৌলিক সত্য নয়, তাহার মূল ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত, অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইলে তাহার তেজ কেহই সহ্য করিতে পারে না। আমি তোমার উপর অত্যাচার করিব—এ কথাও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে

আমি অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করিব—এই সত্যের জোর অপরটির চেয়ে বহু সহস্রগুণ বেশি।

সেইজন্য যখন গান্ধীজী বলিলেন যে, যে আইনে আমার দেশ পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেছে, সে আইনের রাজশক্তি থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে আইন আইন নয়, তখন সমস্ত দেশ অবাক্ বিস্ময়ে ভাবিল, এই সহজ কথাটা এমন স্পষ্টভাবে তো কেহই বলিতে পারে নাই! গান্ধীজী যখন লবণ আইন অমান্য করিবার জন্য ডাণ্ডীর পথে যাত্রা করিলেন, তখন সমস্ত দেশের আত্মা উদ্বেল হইয়া উঠিল। এমন যাত্রা ইতিপূর্বে কেহ করে নাই! গান্ধীজী যখন বলিলেন যে, আলাপ-আলোচনা আবার কি করিব, তোমরা এ দেশ ছাড়িয়া না গেলে এই ক্লেদপঙ্কের ও শোষণের অবসান হইবে না, তখন অনেকে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলেন যে, ইহাতে জাপানের সহায়তা করা হইবে; কিন্তু দেখিতে দেখিতে 'কুইট ইণ্ডিয়া' মহামন্ত্র এশিয়াময় ছড়াইয়া গেল, সমস্ত দেশ উত্তাল হইয়া উঠিল, কেন না এইটা সবচেয়ে সহজ এবং সত্য বলিয়াই তো এতদিন এই কথাটা কেহ বলিতে সাহস করে নাই। ইহার মধ্যে রাগ নাই, ক্ষোভ নাই, ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ নাই, জাপানীদের প্রতি প্রীতি নাই, কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন নাই, এ হইল বিশুদ্ধ সত্যকে অহিংসার মধ্য দিয়া কার্যে আচরণ করা, ইহার বিরোধিতা করিবার ক্ষমতা কাহার আছে!

সেইজন্যই এ আন্দোলন ভারতবর্ষেই নূতন নয়, জগতে নূতন। কিন্তু গান্ধীজীর গঠনমূলক কর্মপন্থাও কম বিপ্লবী নহে। তীব্রতম সংঘর্ষের মধ্যেও যে প্রেম গান্ধীজী সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন, সে প্রেম যে আরও বহুগুণে তাঁহার গঠনকার্যে প্রবাহিত হইবে ইহা স্বাভাবিক। সেইজন্য যেখানেই তিনি গঠনমূলক কার্যের কথা বলিয়াছেন সেখানেই তিনি বলিয়াছেন যে, বাধ্য হইয়া অধিকার দানের বদলে স্বেচ্ছায় দানই তাঁহার কাম্য, class-struggle এর পরিবর্তে trusteeship-এর থিয়োরিতেই তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী।

এই স্বপ্ন এ জগতে কোন দিন সফল হইবে কি না সন্দেহ। তাহার কারণ মানব-প্রকৃতি সে রকম নয়। ইতিহাসের শিক্ষা হইতেছে, মানুষ তীব্র সংঘর্ষ ছাড়া তাহার স্বার্থ ছাড়ে না, তাহা তাহার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তত্ত্ব হিসাবে বিশ্বাস না করিলেও আমরা কৌশলহিসাবে ইহা গ্রহণ করিয়াছি, কেন না যখন সমস্ত শক্তি বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে হইতেছে, তখন ভিতরে একতার দরকার। কিন্তু গান্ধীজীর কথা তাহা নহে। যাহা আমাদের policy, তাহা তাঁহার creed।

কিন্তু তাঁহার গঠনমূলক কার্যক্রমের ইহাও সবচেয়ে বড় কথা নহে। ইহার সবচেয়ে বড় কথা হইল, কেন ইহা policy হিসাবেও আমরা গ্রহণ করিলাম? আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, দেশের বর্তমান অবস্থায় ইহার চেয়ে সুবিধার কার্যক্রম আর হইতে

পারিত না,—ইহার মূল আমাদের দেশের অন্তরে নিহিত। কথাটি ভাল করিয়া বোঝা দরকার।

গান্ধীজী তাঁহার গঠনমূলক কার্যের আঠারোটি দফা নির্দেশ করিয়াছেন। দফাগুলি এইরূপ :—(১) সাম্প্রদায়িক ঐক্য (২) ছুৎমার্গ পরিহার (৩) মাদকতা বর্জন (৪) খাদি (৫) অন্যান্য গ্রাম-শিল্প (৬) গ্রামের স্বাস্থ্য (৭) নূতন বা বুনিয়াদী শিক্ষা (৮) বয়স্কদের শিক্ষা (৯) মহিলা-সমাজের উন্নতি (১০) স্বাস্থ্য ও শরীররক্ষা সম্বন্ধীয় জ্ঞান (১১) রাষ্ট্রভাষা প্রচার (১২) মাতৃভাষা প্রীতি (১৩) অর্থনৈতিক সাম্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা (১৪) কিষাণ (১৫) মজুর (১৬) আদিবাসী (১৭) কুষ্ঠ চিকিৎসা (১৮) ছাত্র।

এই আঠারো দফাকে কয়েকটি দলে সংহত করা যায়। (ক) প্রথমত, সামাজিক সংস্কার—সাম্প্রদায়িক ঐক্য, ছুৎমার্গ পরিহার, মাদকতা বর্জন ও মহিলা-সমাজের উন্নতি ইহার মধ্যে পড়ে; (খ) দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্য—৬ এবং ১০নং দফা ইহার মধ্যে পড়ে; (গ) শিক্ষা—ইহার মধ্যে ৭, ৮, ১১ এবং ১২নং দফাকে আনিতে পারা যায়; (ঘ) আর্থিক ব্যবস্থা—ইহার মধ্যে ৪, ৫ এবং ১৩নং দফা আসিয়া পড়ে। মোটামুটি বলিতে পারা যায় যে, এই কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে সামাজিক সংস্কার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আর্থিক ব্যবস্থা—এই কয়টি বিষয়ের উপর ঝোঁক পড়িয়াছে।

ইহার প্রত্যেকটি লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিব না। মোটামুটি ইহার দৃষ্টিভঙ্গীটাই আমাদের বিবেচ্য। যেমন, শিক্ষার কথাটা ধরা যাক। শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক বড় বড় কথাই শোনা যায়। গান্ধীজী সেসব কর্ণসুখকর কথা গ্রাহ্যও করেন নাই। তিনি এমন এক বুনিয়াদী শিক্ষার অবতারণা করিলেন, যাহাতে 'শিক্ষাতেই শিক্ষার শেষ'—এই মতাবলম্বীরা আঁতকাইয়া উঠিবেন, বলিবেন, শিক্ষার মস্তকচর্বণ হইল। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনাতেই আমরা এ যুগে প্রথম দেখিতে পাইতেছি যে, তাহাতে আমাদের সামাজিক পটভূমিকার এবং সমাজের দাবির সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আছে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষা-ব্যবস্থার আর্থিক দিকটিরও অতি সহজে সমাধানের বন্দোবস্ত আছে।* সার্জেণ্ট-পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গী ঠিক ইহার উলটা। কোথায় কতগুলি বাড়ি হইবে, কত মাহিনা হইবে, ইহা আজও আমাদের প্রধানতম সমস্যা নহে। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনার পিছনে যেন এই ধারণাই আছে যে, যত টাকাই লাগুক না কেন সরকারী রাজস্বখানা হইতে সে টাকা আসিবে। অবশ্য যেদিন আমাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আসিবে, সেদিন আমরা শুধু লম্বাচওড়া হিসাবের কথাই ভাবিব না, সেই সঙ্গে কত রকম শিক্ষার কথা ভাবিব, নানাবিধ বিজ্ঞানশিক্ষার কথা ভাবিব, শিল্পশিক্ষার কথা ভাবিব, চারুকলার কথা ভাবিব। কিন্তু যতদিন তাহার উপযুক্ত পরিবেশ না ঘটিতেছে, ততদিন অকারণ বড় বড় কথা ভাবিয়া লাভ কি? গান্ধীজীর পরিকল্পনায় ঠিক এই সব বড় বড় কথাই নাই।

এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা হইল, কি উপায়ে গ্রামের ছেলেদের অল্প খরচে লেখাপড়া এবং হাতের কাজ শিখাইয়া মানুষ করা যায়। গ্রামের ছেলেরা কি করিয়া পাঠ্যাবস্থাতেই অর্থসংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে এবং মিছামিছি শেক্‌স্পীয়র-বেকনের লাইন মুখস্থ না করিয়া আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থায় সংসারের দাবি ও শিক্ষার প্রয়োজনের চমৎকার সমন্বয় ঘটাইতে পারে তাহার পথনির্দেশ—তাঁহার পরিকল্পনায় আছে। ইহাতে একাধারে শুধু যে প্রকৃত মানুষ গড়িবার ব্যবস্থাই হইল তাহা নহে, সে ব্যবস্থার জন্ত রাষ্ট্রের শরণাপন্ন হইতে হইল না।

তেমনই অন্ত ব্যাপারেও এই রকম খুব সহজ অথচ অত্যন্ত সুস্থ এবং দৃঢ় মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, খাদি। গান্ধীজী বলিয়াছেন, "the Khadi mentality means decentralization of the production and distribution of the necessaries of life"। গান্ধীজী শুধু রাজনৈতিক প্রতীক হিসাবেই খাদিকে সীমাবদ্ধ রাখেন নাই, তিনি ইহাকে একটি অর্থনৈতিক কার্যক্রমের অঙ্গীভূত করিয়া জীবিকার উপায় হিসাবেও দেখিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় "It means a wholesale swadeshi mentality, a determination to find all the necessaries of life in India, and that too through the labour and intellect of the villagers. That means a reversal of the existing process." আমরা আজকাল যে ছবি দেখিয়া থাকি, এখানে সে ছবি নাই। আজকাল আমরা কি চাই? আমরা চাই, এক দিকে বড় বড় শহর, বড় বড় কলকারখানা গড়িয়া উঠুক, তাহার মালিক ব্যক্তিবিশেষ না হইয়া রাষ্ট্র হউক, চাষীমজুরের কষ্ট হইলে রাষ্ট্র তাহাদের সাহায্যে আসুক। কিন্তু খাদি-পরিকল্পনা তাহা নহে। গান্ধীজী স্পষ্টতই বলিতেছেন যে, ইহা বর্তমান ব্যবস্থার বিপরীত;—গান্ধীজীরই কথায় "That is to say that, instead of half a dozen cities of India and Great Britain living on the exploitation and the ruin of the 700,000 villages of India, the latter will be largely self-contained, and will voluntarily serve the cities of India and even the outside world in so far as it benefits both the parties."

রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া এইভাবে আমাদের অভাবমোচনের চেষ্টাই কুটিরশিল্প-প্রতিষ্ঠার গায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমন কি আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন গান্ধীজী দেখিয়াছেন,

* এ বিষয়ে পৌষ, ১৩৫২ সালের 'প্রবাসী'তে "শিক্ষা সংস্কার" প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

সেখানেও তিনি বলিয়াছেন, ইহা স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত হইবে, সরকারী আইন করিয়া ট্যাক্স বসাইয়া তাহা করিতে হইবে না।

গান্ধীজী স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে, এই সমস্ত ব্যাপার ছোট নহে, রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত তাহা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ দুইটি একই জিনিসের দুই দিক। গান্ধীজীর অনবদ্য ভাষায় বলিতে গেলে "Many people do many things, big and small, without connecting them with non-violence or independence. They have then their limited value as expected. The same man appearing as a civilian may be of no consequence, but appearing in his capacity as General he is a big personage, holding the lives of millions at his mercy. Similarly the Charkha in the hands of a poor widow brings a paltry pice to her. In the hands of a Jawaharlal it is an instrument of India's freedom ...For, my handling of Civil Disobedience without the constructive programme will be like a paralysed hand attempting to lift a spoon..." অর্থাৎ আমরা এখন যে সামাজিক রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায় আছি, তাহাতে যদি রাষ্ট্রনৈতিকক্ষেত্রে সরকারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ সংঘর্ষমূলক থাকে সেখানে যদি আমাদের না-না-না ছাড়া অন্য কিছু বলিবার না থাকে, তাহা হইলে যেখানে কিছু গড়িতে হইবে, যেখানে কিছু হাঁ বলিতে হইবে, সেখানে আমাদের স্বাবলম্বী হইতে হইবে এবং এমন পরিকল্পনা করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের সমাজের মর্মস্থলে আবার রস গিয়া পৌঁছায় এবং আমাদের সমাজ রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবে নূতন সঞ্জীবিত হইতে পারে। সংঘর্ষে শক্তি ব্যয় করিতে হইলে এইভাবে অন্য দিকে আমাদের শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। সেই কারণেই গান্ধীজীর পরিকল্পনায় গঠনমূলক কার্যক্রম এবং আন্দোলন পৃথক নহে, একই জিনিসের দুইটি দিক।

পূর্বে বলিয়াছি, দেশের বর্তমান অবস্থায় ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত এবং আশ্চর্য কার্যক্রম আর হইতে পারে না। যে সময় রাষ্ট্র আমাদের নহে, যে সময় আমাদের তনু মন প্রাণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে, সে সময় গান্ধীজী এমন একটি কার্যক্রম উপস্থিত করিলেন, যে কার্যক্রম রাষ্ট্রকে বাদ দিয়া চলিয়াছে অথচ আমাদের বর্তমান অবস্থায় যাহা এখনই কাজে পরিণত করা যায়। শুধু তাহাই নহে, ইহা কাজে পরিণত করিলে বর্তমান সমাজের মর্মস্থলে সঞ্জীবন রস প্রবেশ করাইতে পারা যায়; বস্তুত ও দুইটি আনুষঙ্গিক। একাধারে এতগুলি কাজ করিতে পারে—এ রকম কার্যক্রম আর দেখা যায় নাই।

কিন্তু তথাপি একটা বৃহৎ প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্তমান মুহূর্তে জগৎ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং সংগ্রাম করিতে করিতে আমরা যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, সে সময় আমাদের উপলব্ধি হইতেছে যে, স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ইংরেজকে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতেই হইবে, তাহা আজই হউক বা দুই দিন পরেই হউক। পূর্বেই বলিয়াছি যে, সেদিন পণ্ডিত জওহরলালও বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ-বিতাড়ন এখন তাঁহার মনে ছোট সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে, ব্রিটিশ-বিতাড়নের পর কি হইবে সে সম্বন্ধে ভাবিবার সময় আসিয়াছে। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবে তাহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ব্রিটিশ-বিতাড়নের পর কি হইবে, সে সম্বন্ধে সকলে চিন্তা করুন, তাহা লইয়া আলোচনা করা আপাতত আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কেবল একটি কথা বলিব। এ পর্যন্ত আমাদের গতি ও বিকাশের যে প্যাটার্ন ছিল, তাহা একেবারেই বদলাইয়া যাইবে। এ পর্যন্ত আমাদের সকল কার্যাকার্যের একটি কথা ছিল এই যে, আমাদের রাষ্ট্র আমাদের ছিল না; সেইজন্য আমরা বিরোধের বেলায় রাষ্ট্রকে স্মরণ করিয়াছি, বিকাশের বেলা নহে। সরকারকে শত্রুভাবে উপাসনা করিয়াছি, মিত্রের সন্ধান করিয়াছি আমাদের সমাজে—আমাদের গ্রামে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্তই বদলাইয়া যাইবে, উপাসনাপদ্ধতিও বদলাইয়া যাইবে। সুতরাং প্রশ্ন জাগিতেছে, যখন রাষ্ট্র আমাদের হইবে, তখনও কি আমরা রাষ্ট্রকে শত্রুভাবে উপাসনা করিব? তখন যে সমাজ, যে ঐতিহাসিক অবস্থা আসিবে, তাহাতে বর্তমান গঠনক্রম কি সম্পূর্ণ সমাজবিচ্যুত এবং অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইবে না?

এই প্রশ্ন উপস্থাপিত করিবার কারণ এই যে, ইহা আর ভবিষ্যতের কথা নয়, বর্তমানের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বা দাঁড়াইবে। সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর হইতে এখনও কিছু দেরি আছে বটে, কিন্তু আংশিক ক্ষমতা হস্তান্তর শুরু হইয়া গিয়াছে এবং শীঘ্রই তাহা আরও হইবে। ফলে, প্রদেশগুলিতে তো বটেই, কেন্দ্রেও কংগ্রেসকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের দায়িত্ব লইতে হইতে পারে।

সেই সঙ্গে অন্য দিকটাও বিবেচ্য। ঠিক এই সময়ই আমাদের দেশের উপর দিয়া যুদ্ধের যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে এবং তাহার বিষনিশ্বাসে দেশ যেরূপ মরুভূমি হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বে হয় নাই। এই অবসন্ন শোষণক্লিষ্ট নিষ্পিষ্ট দেশের পুনর্গঠনের দরকার এখন যেরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, পূর্বে সেরূপ হইয়াছে কি না সন্দেহ। সুতরাং এখন প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে এই: এক দিকে দেশ হাহাকার করিতেছে, অন্য দিকে যতই সীমাবদ্ধ হউক না কেন রাষ্ট্রক্ষমতা (এবং অর্থ ও রাষ্ট্রযন্ত্র) হাতে আসিতেছে—এ অবস্থায় রাষ্ট্রের সহায়তা আমরা করিব কি না, রাষ্ট্রের উপাসনা আমরা করিব কি না?

ইহার উত্তরে সকলেই অবশ্য বলিবেন, যতদিন আমাদের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা না আসে, ততদিন আমরা রাষ্ট্রের উপাসনা ততটুকু করিতে পারি, যতটুকু করিলে আমরা চরম সংগ্রামের জন্ত সঞ্চিত শক্তি ক্ষয় না করিয়াও দেশের সেবা করিতে পারি। ঠিক কথা, কিন্তু আমার প্রশ্ন তাহা নহে। যতদিন সম্পূর্ণ ক্ষমতা না হাতে আসে, ততদিন ছোট লাভের মোহে বড়কে ভুলিলে নিশ্চয়ই চলিবে না। কিন্তু যেখানে সেরূপ কোনও বিপদ নাই, সেখানে কি হইবে ?

আসল কথা, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলাইতে হইবে কি না ? আমাদের সংগ্রাম এবং আমাদের গঠনক্রম যে মূল কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেই কাঠামোটাই যখন অন্যরূপ হইতেছে, তখন আমাদের বিরোধ ও বিকাশের সমস্ত সমস্যাটাই অন্য আকার ধারণ করিবে। এতদিন যাহাকে শত্রুভাবে উপাসনা করিলাম, আজ যখন তাহাকে মিত্র ও সহায়ভাবে পাইব, তখন আমাদের কার্যক্রম কি হইবে ?

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'র প্রারম্ভিক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসু লিখিয়াছেন, "গান্ধীজী বলিবেন, ঠিক কথা। কিন্তু ধনোৎপাদনের উপাদানও অবশেষে রাষ্ট্রের অধিকারে থাকার চেয়ে আমি পঞ্চায়েতের অধিকারে রাখার পক্ষপাতী। রাষ্ট্র এবং পঞ্চায়েতের মূলে যে প্রভেদ আমি দেখিতে পাই, তাহা বলিতেছি। পঞ্চায়েতের হাতে মানুষ শুভবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া ক্ষমতা সঁপিয়া দেয়, শাসন করার অস্ত্র তাহার যৎসামান্য থাকে, মানুষকে রাজি করাইয়াই পঞ্চায়েত বেশির ভাগ কাজ আদায় করে। কিন্তু রাষ্ট্রের পীড়নের ক্ষমতা অসীম। যাঁহারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, তাঁহারা নিপীড়ন করিয়া বা শাসনের ভয় দেখাইয়াই কাজ হাঁসিল করিয়া লন। এই নিপীড়নেই আমার বিশেষ আপত্তি।...যে কেন্দ্রীকরণ অসমান শক্তিপুঞ্জের মধ্যে নিপীড়নের সাহায্যে গড়িয়া উঠে, তাহার চেয়ে ভয়াবহ বস্তু আর কিছু নাই। বিকেন্দ্রীকরণের রস দিয়াই তাহাকে জীর্ণ করিয়া মঙ্গলজনক পদার্থে পরিণত করা সম্ভব।"

এইখানেই আমার প্রশ্ন। যদি ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইবার পরও রাষ্ট্র ও সমাজে পার্থক্য বজায় রাখিতে হইল, তবে আর কি ক্ষমতা হস্তান্তর হইল ? বিকেন্দ্রীকরণে আপত্তি করিতেছি না। কিন্তু যদি কেন্দ্রীকরণেই আপত্তি থাকে, তাহা হইলে এমন রাষ্ট্র গঠিত হউক না কেন যাহার মধ্যে কেন্দ্রীকরণ থাকিবে না, যাহা বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু যখন আমাদের রাষ্ট্র গড়িবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের হাতে আসিবে, তখনও রাষ্ট্রকে মনের মত না গড়িয়া রাষ্ট্রের যাহা হয় হউক বলিয়া আমরা কাজের যন্ত্র স্বরূপে আর একটা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়িতে বসিব ?

আসলে ইহা কি আমাদের পুরাতন সংস্কারেরই জের নয় ? আমরা চিরদিন রাষ্ট্রকে সন্দেহের চোখে দেখিতে অভ্যস্ত, এতদিন পর্যন্ত গঠনকর্মে রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিশ্বাস না করিয়া

আলাদা একটি যন্ত্র গড়িবারই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু যখন রাষ্ট্রযন্ত্রকেই জনসাধারণের অধীনে রাখিতে আমরা সমর্থ হইব, রাষ্ট্রব্যবস্থা এমন করিয়া করিতে পারিব যে, কেন্দ্রীকরণ ও নিপীড়ন তাহার মধ্যে স্থান পাইবে না, তখন আমরা মনে প্রাণে রাষ্ট্রযন্ত্রকেই সুচারু করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার পাশাপাশি আবার একটি আলাদা ব্যবস্থায় শক্তির অপচয় করিব কেন?

একটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিতেছি। এখনও আমাদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা আসে নাই। প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে যে ক্ষমতা আসিয়াছে, তাহা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। এই অবস্থারই কথা ধরা যাক। বাংলা দেশে কংগ্রেস-মন্ত্রীসভা হইল, সে সময় দেশের পুনর্গঠনের জন্য তাঁহারা কিছু টাকাকড়ি পাইলেন। এ সময় যদি আমরা গঠনমূলক কর্মের সীমানা আমাদের বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ রাখি, তাহা হইলে ফল কি হইবে? এক দিকে আমরা চাঁদা ও ব্যক্তিগত সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের কর্মের সীমানা অত্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখিব, অন্যদিকে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডল নিঃস্বার্থ কর্মীদের সহায়তার বদলে মমতাহীন কর্মচারীদের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইবেন।

ইহার উত্তরে বলা চলে, কেন, এ ক্ষেত্রে কংগ্রেসকর্মীরা সরকারের সহায়তা করিলেই তো গোল মিটিয়া যায়। ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, ঐভাবে গোল মেটানো সম্ভব নয়। ইহা যদি কোনও সাময়িক বা স্থানীয় প্রশ্ন হইত (যেমন বন্যা, ভূমিকম্প) তাহা হইলে ঐ কথা বলা চলিত। কিন্তু যেখানে সমস্ত দেশের স্বার্থ জড়িত এবং প্রশ্নটাও সাময়িক নহে, সেখানে আলাদা হইয়া থাকার অর্থ হইল—সমস্ত দেশের লোকের নিকট হইতে আলাদা হইয়া থাকা। অর্থাৎ সমস্ত দেশের লোক যে যন্ত্র স্থাপনা করিল, কংগ্রেসকর্মীরা তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া রহিয়া নিজেদের একটি প্রতিষ্ঠান করিবার চেষ্টা করিলেন।

যদি ইহা ঘটে, তবে কংগ্রেসের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এ কথা আজ দৃঢ়ভাবে বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, ভবিষ্যৎকালে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেই হইবে, দুই নৌকায় পা দেওয়া চলিবে না। যদি বুঝি, ক্ষমতা আমাদের হাতে আসে নাই, তাহা হইলে এখনকার সংগ্রাম আরও তীব্রতর করিব, এখনকার গঠনকর্ম আরও দৃঢ়তর করিব। কিন্তু যদি বুঝি, ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়াছে, তখন সমস্ত রাষ্ট্রযন্ত্র দেশসেবায় না লাগাইয়া আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়িব, এ কথা স্ববিরোধী কথা।

এই কথাটার উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়াই জাতীয় পরিকল্পনা-কমিটি যে ধরনের পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহার মধ্যে রাষ্ট্রভীতি নাই, রাষ্ট্রকে খাটাইবার চেষ্টা আছে। যে যুগ শেষ হইয়া যাইতেছে গান্ধীজীর গঠনকর্ম-তাহার প্রতিচ্ছবি হইলেও যে যুগ আসিতেছে তাহার গোড়ার কথাটা যদি অন্য হয়, তবে তাহার কার্যক্রমের গোড়ার

কথাটাও অস্ত হইবে। গান্ধীজীর গঠনক্রম এবং জওহরলালের গঠনক্রমের মধ্যে সেইজন্য যুগান্তরের আভাস আছে, আগেরটি যেখানে আসিয়া থামিয়াছে পরেরটি তাহার পর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, মধ্যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর বদল হইয়াছে এইরূপ একটা অদৃশ্য assumption রহিয়াছে।

বিব্রত বিপন্ন বাংলা দেশের পক্ষে এই প্রশ্ন আজ সেইজন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা দেশে লোভ ও অকল্যাণের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহার পুনর্গঠনের প্রয়োজন খুবই বেশি। রিলিফের নামে কি অপব্যয় হয়, সে অভিজ্ঞতা দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের ভালভাবেই হইয়াছে। সুতরাং পুনর্গঠনের পরিকল্পনার সময় বাস্তব ও বলিষ্ঠ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই চলিতে হইবে, যাহাতে পরিকল্পনাটি আমাদের অভাব-অভিযোগ বাস্তবিকই দূর করিতে পারে। কিন্তু যদি সমাজের প্রতিবেশের সহিত পরিকল্পনার সামঞ্জস্য না থাকে, তবে সে পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না। আমরা যে সমাজে প্রবেশ করিতেছি, আমাদের গঠনকর্মক্রম তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই নির্ধারণ করিতে হইবে। বাংলা দেশ, বিশেষত বাংলার ছাত্রেরা, সেদিনও নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের বক্ষোরক্তে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, সংগ্রামের বেলায় তাহারা কাহারও পিছনে পড়িয়া নাই, গঠনকর্মেও তাহারা পিছাইয়া পড়িবে না ইহা নিশ্চিত। কিন্তু কি ভাবে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিলে এই অমিত যৌবনতেজ অকারণে ব্যয়িত হইবে না তাহা চিন্তা করার সময় আসিয়াছে, কেন না কোনও কার্যক্রমই তাহার সমাজকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না এবং সেখানে ভুল করিলে শক্তিক্ষয় অনিবার্য। আমরা যে যুগসন্ধিতে উপস্থিত, সে সময় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া এমন একটি কর্মক্রম নির্ধারিত হউক যাহাতে—বাংলার বুকফাটা তৃষ্ণায় যেন শুধু কয়েকবিন্দু বারিবর্ষণ না হয়, তাহার তৃষ্ণা সম্পূর্ণ মিটে।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

অন্য কোনখানে

মায়ার কথাটাই শেষ পর্যন্ত বড় বেশি ক'রে বুঝি বাজল।
বলেছিল একদিন স্মৃতিও, বুদ্ধ-পূর্ণিমার সেই মাঝ-রাত্রে।
শান্তা, মালতী, প্রীতি ওরা তো কেবল অকারণ পুনঃপৌনিকের বাড়তি সার।
মাড়িয়ে চ'লে গেছি ব্যর্থ ঝরা-পাতার স্তূপ।
মর্মর কাঁদন উঠেছে পেছনে।
তাকিয়েছিলুম কোনদিন?
কিন্তু এতবড় হোঁচট বুঝি আর লাগে নি।

এ ধাক্কা কল্লোল তুলল গিয়ে একেবারে ফুসফুসে।
নাচ লেগেছে আজ বুকের রক্তে।
স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি সে কোলাহল।
তবু তো এ পথ নয়।
নয়, তা জানি।
ভাসলুমও তাই আবার। কিন্তু? না, এইই বুঝি ভাল হয়েছে।
যায় যদি যাক!

চিরকালের লক্ষ্মীছাড়া বেদে আমি।
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াই পথে-প্রান্তরে।
বে-পরোয়া মিতালি আমার হাজার মানুষের সঙ্গে।
কুলি-কামিন-কামার-চামার-ধাঙড়।
এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত।
ভদ্রলোকের ছোঁয়াচে আসাটা দৈব-দুর্বিপাক।
তবু স্বভাব আমার ভালই।
সাঁ ক'রে একসময় কেটে উঠি মরসুমী পাখীর মত।
পৃথিবীটা শুনেছি গোলাকার।
তাই-ই হয়তো, আবেক পথের বাঁকে, আবার কখন দেখা হয়ে যায় কোন পূর্ব-পরিচিতের সঙ্গে।
পাশ কাটাতে পারলে ছাড়ি নে সুযোগ।
ডিটেকটিভের চোখ থাকে যাঁর, ধরা পড়লে বিনয়ের হাসি হাসি তাঁর কাছে।

মা অনুযোগ করেন ক্রমাগত, তিনি নাকি আমাকে ঠিক বুঝতে পারেন না! কেমন যেন অবাক লাগে তাঁর।
অবাক কি আমিই কিছু কম হই?
কেমন ক'রে বোঝাব তাঁকে, কেন এমন হলুম?
এখনও উনিশ-শতকের শেষাশেষির পুরোনো, তেলচিটে চাদরখানা অঙ্গে জড়িয়ে তর্জনী তুলে, নাক সিঁটকে, একপাশে স'রে দাঁড়িয়ে আছে আমার সংসার, তীব্রভাবে শুচিতা বাঁচিয়ে। তেতলার চিলেকোঠার ঘরে কাঁসর-ঘণ্টার টুংটাং আওয়াজে মসগুল হয়ে এখনও বেলকাঠের সিংহাসনে শুয়ে পাথরের লক্ষ্মীনারায়ণ আমাদের চালকলা চিবোন দৃষ্টিভোগে। গোয়ালে গরু আছে। কাক-কোকিল ডাকতে না ডাকতে শুচিস্নাত হয়ে ওঠে উঠোন গোময়ের চন্দন-চর্চায়।

দেখেছি তো, বেলা পুইয়ে যায় দিদিমার চণ্ডীপাঠ শেষ ক'রে উঠতে উঠতেই।

এদেরই দলের লোক তো আমিও ছিলুম।

এই রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, লোকাচার সংস্কারই তো ঠেকা দিয়ে দিয়ে উঁচু ক'রে তুলেছিল ক্রমশ আমার মাথাটাও।

তবু কেন এমন মনে হ'ল ?

কেমন ক'রে যে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলুম একেবারে বিশাল বাইরে, আমিও কি কিছু কম অবাক হই ভাবতে গেলে ?

সৌম্যের কথা মনে পড়ে।

সেই সময় সৌম্য যথেষ্ট করেছিল মার।

স্মৃতি আর সৌম্য। দুই ভাই-বোন।

দশ দিন গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে-বেড়ানোর পর, প্রকাশ্য দিবালোকে একদিন, সাব-পোষ্ট অফিসের সম্মুখে সাইকেল থেকে সবিনয়ে নামিয়ে দিলেন একজন গোয়েন্দা-পুলিস।

ইচ্ছে ক'রেই ধরা দিলুম। ধরা দেব ব'লেই বেরিয়েছিলুম।

না দিয়ে কি করব ? পেছনে এমন একজনও তখন আর ছিল না, যাকে নিয়ে আড়ালে-আবডালে আবার হতে পারত নতুন পথের শুরু।

মা বোধ হয় বুক আছড়ে শুয়ে পড়েছিলেন মাটিতে।

একমাত্র সন্তানের ফাটক হয়ে গেলে, সহ্য করতে পারে কোন্ বাঙালী মা ?

জেঠামশাইয়ের চৈতন্যধারী আভিজাত্যটা চিরকালই শুকনো আর ফোঁপরা।

তাই বোধ হয় ঘা-টা পড়েছিল আরও বেশি।

পরে শুনেছি, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি একটামাত্র শব্দ উদ্গীরণ ক'রে, কুলাঙ্গার।

কূল যখন ভেঙে আর জেলে চলেছি বরাবর, কুলাঙ্গার তো বটেই।

এ কূল থেকে ও কূল।

জ্বালিয়ে চলেছি যা কিছু ছেঁড়া আর পুরোনো।

কিন্তু সৌম্যের কাছে কৃতজ্ঞতা না জানালে, সে অগৌরবের গ্লানি ব'য়ে বেড়াতে হবে সারাজীবন। চিন্তায় আদর্শে পদ্ধতিতে কোথাও মিল ছিল না দুই বন্ধুতে।

যেখানেই আগলাতে গেছে ও দুই বাহু বাড়িয়ে, আমার দু হাত সেখানেই মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে ওর রক্ষণশীলতাকে নিষ্ঠুরভাবে।

কিন্তু হৃদয়ের বিনি-সুতোর মালাটায় তবু, কই, একটুও টান পড়ে নি কোথাও, এত

টানা-পোড়েনেও। মানুষ সৌম্য কত ভীরু আর দুর্বল, কিন্তু বন্ধু সৌম্যকে তো ভোলা যায়!

আমার বৃহন্নলা-জীবন ওর আশ্রয়েই তবু নিরিবিলিতে জিরুতে পেয়েছিল ওই দশটা দিনও।

বড় আদরেই রেখেছিল সৌম্য।

তারপর, যেদিন সেই বুক আছড়ে ভেঙে পড়ার দিন এল মার, দুই ভাই-বোনেই নাকি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে জড়িয়েও ধরেছিল মাকে, আমরা কি তোমার কেউ নই মা?

সে দান কেমন ক'রে ভুলি?

কিন্তু সেই রাত্রের স্মৃতিটা মুছে ফেলতে পারলেই বোধ হয় ভাল ছিল।

বুদ্ধ-পূর্ণিমার সেই রাত্রের আমার প্রণয়িনী স্মৃতির স্মৃতি!

রাত কত জানি নে।

একা পায়চারি করছিলুম ছাদে।

তেঁতুলের জঙ্গলে স্তব্ধ দগ্ধ চাঁদ।

পরিবেশ তৈরিই ছিল।

কোথায় একটা পাখীও ডাকছিল বুঝি চোখের কী অহেতুক ব্যথায়!

সিঁড়ির দিকে খুট ক'রে একটা শব্দে ফিরে তাকালুম সচকিতে।

কে যেন দাঁড়িয়ে পুতুলের মত!

কিন্তু পুতুলই প্রতিমা হ'ল। আগিয়ে যেতে আর হ'ল না।

বাঁধভাঙা অশ্রু নিয়ে বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে স্মৃতি: সমরদা, তুমি কি পাথর!

বোধ হয় তাই-ই।

অত চোখের জলের তোড়ের সুমুখেও ঠায় সেদিন দাঁড়িয়েছিলুম তো পাথরের থামের মতই। আমি জানতুম, সেদিনই নিযুক্তির পর, মেদিনীপুরের বন্যাপীড়িত এক সর্বহারা চাষী পরিবার অস্থায়ী আস্তানা পেতেছিল ওদের হারবাড়ির বারান্দায়।

ওরা টের পায় নি কেউই।

দুটো টলোমলো চোখ তুলে ধরল স্মৃতি আমার মুখের ওপর।

কাঁপা-কাঁপা রোমান্টিক গলা ওর: বল, সমরদা, অন্তত কিছু বল। কিছুই কি তোমার বলবার নেই?

হাত ধ'রে টান দিলুম সিঁড়ির দিকে, আছে। নীচে এস।

নিঃশব্দে উত্তীর্ণ হয়ে এলুম দুজনে মাঝের ঘর, দরদালান, উঠোন।

ওর হাত এখনও আমার হাতে।

কিন্তু সে বাঁধন কত যে পলকা, তারও মীমাংসা হয়ে গেল নিমেষে।

যেমনই খিল খুলেছি বাইরের, টান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও শক্ত কাঠের মত।

হাত থেকে হাতখানাও খুলে গেল সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই।

ভয় যেন চিরে বেরুল ওর গলা থেকে, এ কোথায় নিয়ে চলেছ আমায় ?

সেই চিরকালের অসুস্থমনা, সন্দেহবাদিনী বাঙালী মেয়ে।

এ আমি জানতুম।

তাই দরকারও হ'ল না আর।

থেমে বললুম, যেতে পার।

হাসি পায়, প্রেম !

এইটুকু ভরসা নেই যেখানে নির্বাচিত প্রিয়ের ওপর, সেখানের চোরাবালিতে উঠবে প্রেমের চক-মিলানো মীনামহল ?

প্রেমের না হবে ক্ষয় ? ফুঃ—

পরদিন সকালেই তো দেখেছি, এই স্মৃতিই কি ভাবেই না দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিলে সেই অসহায় দিশেহারা মানুষগুলোকে !

ঈশ্বর রক্ষা করেছিলেন। নয়তো সেই দুপুর-রাত্রেই হয়তো আশ্রয়চ্যুত হতে হ'ত ওদের।

সব খুলেই বলেছিলুম মায়াকে।

আগাগোড়া। ছড়ানো-ছিটানো, এলোমেলো, কুচি-কুচি বিক্ষিপ্ত ইতিহাসের সবটুকু। পথে-প্রান্তরের, হাটের মাঠের—ঈশ্বরের এই অপ্রিয় পুত্রের ছন্নছাড়া জীবনের কাহিনী। মেয়েদের প্রতি আমার অবিশ্বাসের উদারতাটুকু পর্যন্ত।

এমন কি, মালতীদিকেও তুলে ধরেছিলুম ওর চোখে।

ফ্রক-প্যাণ্টের আমল থেকে চেনাশুনো দুজনে।

চিরটা কাল তাঁকে দিদি ব'লে ডেকে এসেছি।

সেই মালতীদিও একদিন হৃদয় মেলে বসলেন কেমন ক'রে !

একটু অবাকই লাগে বোধ হয় শুনতে। কিন্তু জীবন বিচিত্র ! আজকের যা আশ্চর্য, কাল তাই দেখি কত সহজ। আজকের সহজ কাল আবার আশ্চর্য হয়ে দেখা দেয়। কে কোথায় কি রঙ পুষছে মনে, কজন কার খবর রাখে ? এবং বোধ হয় তাই-ই।

এক জায়গায় মাষ্টারি করছি তখন দুজনে।

দ্বিতীয়বার ঘানি ঘুরিয়ে আসবার পর সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে এই কাজটাই আপাতত কিছুদিনের জন্যে বেছে নিয়েছিলুম। যা হোক, তবু তো একটা ভাল কিছু!

শরীরটাও তখন বড় কাবু হয়ে পড়েছে নানানখানার মার খেয়ে খেয়ে।

পূর্বাপরের মত সেদিনও বেড়াতে গেছি ওঁর বাসায়।

ঝড় উঠল। বৃষ্টি নামল।

আর, আরেক মালতীদির নবজন্মও দেখলুম আমারই চোখের ওপর সব-কিছুকে ওলট-পালট ক'রে দিয়ে। গুটি ভেঙে প্রজাপতি। অবাক হয়ে বললুম, মালতীদি, আপনি?

এক হাতে মুখ চেপে ধ'রে বললেন, আপনি নয়, 'তুমি' বল।

সভ্য মানুষ হ'লে কি করতুম বলতে পারি নে।

কিন্তু হিসেবী বর্বরটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল অমনি ঝাঁ ক'রে।

প্রতিবাদ করলুম তীরের মত, আপনি ভুলে যাচ্ছেন মালতীদি, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। তাঁর উত্তরের মধ্যেও আবিলতা ছিল না এতটুকু; বেশ স্পষ্ট ক'রেই বললেন, আমিও যে তোমাকে কোনদিন অশ্রদ্ধা করি নি, সেই কথাটা বলবার জন্যেই যে আজ অপেক্ষা করছি কতকাল থেকে। আজ এমন অবকাশেও বলতে দেবে না এটুকু?

দাঁড়িয়ে উঠলুম চেয়ার থেকে: তার মানে?

মানে তোমার ওই দিশেহারা আদর্শকেই ভাল ক'রে জিজ্ঞেস কর। কতখানি প্রয়োজনে পড়লে মেয়েমানুষ নির্লজ্জ হয়ে ওঠে এতখানি, তা কি একবারও ভাবতে পার সমর? কেন তুমি আমাকে আকর্ষণ করছ এতদিন ধ'রে?

এতক্ষণে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেলুম মালতীদির মনের ভূতটাকে। সোজা নেমে এসে দাঁড়ালুম বাইরে।

হাসতে হাসতে ব'লে এলুম ওকে, ও-সব আকর্ষণ-টাকর্ষণ কিছু নয় মালতীদি। বাজে সেন্টিমেণ্ট ছেড়ে ঘর-সংসার করুন। আবার দেখবেন, বাঁধা পড়ছেন নতুন আকর্ষণে। সব ভুল, সব ভুল।

কানে এসেছিল একটিমাত্র কথাই, তুমি কি মানুষ, সমর!

দেবতা হবার পাগলামি তো কস্মিনকালেও ছিল না, মনুষ্যত্বের বালাইটুকুও যে নেই, তাও তো পড়া হ'ল বার বার।

স্মৃতি বলেছিল, আমি কি পাথর?

মালতীদি বললেন, আমি কি মানুষ?—আসলে বাচ্যার্থটা সেই অতি সনাতনী 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। শান্তা-প্রীতিদের কোনও কথাই তুলতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু অমানুষিকতাটা অতখানি উলঙ্গ হয়ে ফুটে উঠতে পারে কখনও লোকচক্ষে, এ কথা বোধ হয় কেউ-ই ভাবে নি। এখানেই বেড়াটা বোধ হয় একেবারে ভাঙল। মচকে দাঁড়িয়ে ছিল অনেকদিন থেকেই, এবার একাকার হ'ল ঘরে আর মাঠে।

মা আকুল হয়ে চেপে ধরলেন দু হাত, এ তুই কি করলি সমু! নিজের পায়ে নিজে কেউ কুড়ুল মারে এমন ক'রে? এ তো আমি কস্মিনকালেও কখনও শুনি নি! নিজের দিকটা আজও বুঝলি নে তুই এতটুকু? কি যে বলব তোকে, আমার শুধু মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে। শেষে নিজের প্রজা ক্ষেপালি নিজেরই বিরুদ্ধে?

দূর হতে দাঁড়িয়ে দেখলুম, আমার বংশীনগরের চার আনির জমিদারি-কাছারিটা তুবড়ির মত ফিনকি দিয়ে ফুটে শেষ হয়ে গেল সাঁওতাল-প্রজাদের ক্ষিপ্ত মশালের ডগায়। হতভাগারা যেন বিশ্ব-বিজয় ক'রে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হ'ল: হুই, দেইছি সব ছাই ক'রে। তু আমাদের রাজাবাবু। তু না বললে, উটি মুদের শত্তুর বটে যে, এ চিনতেই লারতাম।

ভাবলুম, একবার বলি, কার দফাটি রফা ক'রে এলি, তা যদি জানতিস হতভাগারা! কিন্তু ওরা জমিদার চিনেছিল জেঠামশাইকে, আর আমাকে চিনল ওদের নিজেদের লোক হিসেবে। বুঝিয়ে বললুম মাকে, ছেলের তোমার কোনও অকল্যাণ হবে না মা। তুমি কিছু ভয় ক'রো না। যেদিন আর সবাই আক্রমণ করবে আমাকে সব দিক থেকে, বুক দিয়ে যে আপন মানুষের দল এগিয়ে আসবে আমাকে ঠেকাবার জন্যে নিজেদের জান কবুল ক'রে, জেনো, সে ওই ওরাই। হ্যাঁ, ওই তোমার বুনো সাঁওতাল চাষীর দল। এই জেঠামশাইরাও নয়, আর তোমাদের মহামান্য সরকার বাহাদুরও নয়। সত্যিকারের ক্ষমতাশালী যারা, আমি কেবল তাদের দিকেই গেলুম। বুঝলে না সুবিধেটা দু-পক্ষেরই হ'ল? পরস্পর আমরা পরস্পরকে বাঁচাব। রূপটা অবশ্য একটু আলাদা হবে এই যা।

অত-শত বোঝবার দরকার করে না মার।

যা বুঝে এসেছেন তিনি এতকাল, সেই ঠুনকো সম্বল নিয়েই আরও একবার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করলেন তাঁর দানব পুত্রকে, ও আলাদা-টালাদায় আমার কোনও কাজ নেই সমর। এখনও সময় আছে। তুই আমাকে কথা দে। তুই নিজে থেকেই এর একটা বিহিত কর্। পথ তোকে একটা করতে হবেই।

কিন্তু পথ জেঠামশায়ই-ই ক'রে দিলেন সেইদিনই।

একেবারে খোলা, চওড়া, চড়াইয়ে-উৎরাইয়ে টানা অফুরন্ত পথ, যে পথে এখনও চলেছি ঠায়।

মাঝে মাঝে ক্বচিৎ একটুখানি কেবল ফিরতে হয় কখনও-সখনও।

মা ডাকে।

ওঃ! মার বাঁধনটা যদি না থাকত!

নার্সিসাস আমি।

নিজের খেয়ালের আয়নাতেই বিভোর হয়ে আছি নিজেকে নিয়ে, যা-মাত্র আছে আমার। কিন্তু রূপহীন, বিত্তহীন, লক্ষ্মীছাড়া বেহুইন কি ক'রে যে এত নারীর প্রেয় হয়ে উঠলুম নিজেরই অলক্ষ্যে, আজও হেঁয়ালি হয়ে গেল সেটা নিজের কাছে। কিন্তু এদের কেউ কি আমাকে ভালবেসেছিল কখনও সত্যি?

শুনেছি, মেয়েদের মনে একবার কেউ দাগ কাটলে সে নাকি আর আজন্ম মোছে না। ভাল কথা। দেখলুমও তা এই সেদিনই, সেই স্মৃতি আর মালতীদিকে—পতি, পুত্রে, মেদে, অলঙ্কারে আর অহঙ্কারে খাসা হাসতে হাসতে করুণা আর সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে গেল দুজনে আমার এই অর্থহীন যাযাবরতার প্রতি। আর আমার দিশেহারা আকর্ষণে কাঁপে না মালতীদির জীবন-তরী। তুমি কি মানুষ সমর?—মনে পড়ে।

প্রেম? বেঁচে আছি আমি ওদেরই অন্তরের নিভৃততম মণিকোঠায়? ঈশ্বর!

এ সময়ে যদি কেউ শ্মশানে মড়া নিয়ে যায় এ রাস্তা দিয়ে, তাদের সঙ্গে আমিও বুক ফাটিয়ে উল্লাসে খানিকক্ষণ চীৎকার করতে পারি, বল হরি হরি বোল—

তা ছাড়া ধনী বাপ-মায়ের একমাত্র চাঁদ-ধরা মেয়ে মায়া।

একটা সোফার ছাড়া আর কি আমি ওর চোখে?

সেইটুকুকেই কেবল আরও একটু বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছিলুম আমার নোংরামি আর অসামাজিক বর্বরতা প্রকাশ ক'রে, স্মৃতি-মালতীদের নির্লজ্জতাকে চওড়া ক'রে মেলে ধ'রে।

সাক্ষী আমার হৃদয়। চেয়েছি তীব্রভাবে বিষিয়ে তুলতে ওর মন, যাতে বীভৎস ঘৃণায় কেবল যেন একটা বর্বর ভিন্ন আর কিছু ভাবতে না শেখে আমাকে।

স্মৃতিদের দলে ফেলেও অবশ্য দেখতে চাই নি ওকে কোনদিনই।

বুদ্ধির একটা আলাদা জৌলুস অবশ্যই ওর চোখে-মুখে ছিল।

ছোটও করি নি, কিন্তু বড় ক'রে দেখতেও সাধ জাগে নি মনে কখনও।

কিন্তু এ-ও একদা শুনতে হ'ল, ও নাকি ভালবাসে এই বিশাল নিপীড়িত দেশকে, পলে পলে মর্মবেদনা অনুভব করে এই অজস্র মূক অসহায় পঙ্গুদের জন্যে?

কি বলব? শাড়ির চমক আর টয়লেটেই তো প্রতিদিন আমার কাছে তা সু-উচ্চারিত।

আরেকটু কেবল এলিয়ে দিলুম নিজেকে সোফার ওপর।

খাট থেকে ধাঁ ক'রে নেমে এসে দাঁড়াল ও মেঝের, বড় চুপ ক'রে রইলেন যে?

যেন শুনতেই পাই নি। তেমনই ভাবেই উত্তর দিলুম জানলাটার দিকে চেয়ে, এখান থেকে চাঁদ দেখতে আমার ভারি ভাল লাগে মায়া।

এক মিনিট চুপচাপ।

তারপর শুধু একটা মাত্র কথা শোনা গেল ওর গলা থেকে, ও। শুধু একটা মাত্র ছোট্ট 'ও'। আঘাত নিশ্চয়ই করেছি। কেন করব না? তা ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল?

যখনই ফাঁক পেয়েছি এতটুকু অসহায়তার, অতি নিপুণভাবে ব্যবহার করেছি সেটুকু সুযোগ।

কতদিনই দেখেছি, বেদনায় নীল হয়ে গেছে ওর মুখ।

ফিকে হাসির ওড়না টেনে সে কি প্রাণপণে নিজেকে আড়াল করবার উন্মুখ প্রযত্ন।

হৃদয় ওর ছিল, সে কথা অস্বীকার করতে পারি নে।

দেখেছিও সে হৃদয়ের অকুণ্ঠ সম্প্রসারণ।

বুকে কি আমারও বাজে নি? নিজেও তো কিছু কম লড়াই করি নি নিজের সঙ্গে!

তবু কি আশ্চর্য অভিনয়ই না ক'রে গেছি সুযোগ্য অন্ধের ভূমিকায়, ও যদি তার কিছুও জানত!

অত্যন্ত ক্লান্তভাবেই একদিন বললে, কিন্তু আপনি তো জানেন, আমার ক্ষমতা কতটুকু?

হা-হা ক'রে কাঠ-ফাটা হাসির তুফান ছুটিয়ে দিলুম তখুনি, দোহাই তোমার মায়া। আরও অনেকেই নিঃসন্দেহে প্রশংসা করবেন তোমার এই অকাট্য যুক্তিকে, কিন্তু এ অর্বাচীনকে রেহাই দাও দয়া ক'রে। ক্ষমতা-অক্ষমতার বিনয় প্রকাশের জন্ম তো সেখানেই, দায়িত্বের ঝক্কিটা যেখানে অনিবার্যভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে পথ। এটা বহু-অধীত পাতা, মায়া, এটাকে বর্জন কর।

তবু কিন্তু তেমনই স্থির হয়েই রইল ও, আমার চোখে চোখ রেখে।

তারপর একটু কেবল হাসলে, বেশ তো! আপনার পৌরুষের ন্যায্য প্রশংসাটুকু দিতে তো কোথাও কার্পণ্য হচ্ছে না আমার। কিন্তু আমি বলছিলুম, এত লোককে ভালবাসেন আপনি, এত চওড়া হৃদয় আপনার, সকলকেই এক মাপকাঠিতে বিচার করবার অনুদারতা থেকে কেন না মুক্ত দেখতে চাইব আপনাকে?

তবে কি পক্ষপাতিত্ব করতে বলছ?

আরেকটু বাঁকা হলুম আমি।

কিন্তু ওর যে ঋজুতার চেহারাটা চোখের ওপর ফুটে উঠল সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেও, তার জন্যে তো কোনদিনই প্রস্তুত ছিলুম না।

সেলাই থেকে মুখ না তুলেই জবাব দিলে ও তেমনই গলাতেই, ছিঃ ছিঃ! তা কেন করতে বলব আপনাকে! ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তির মর্যাদাবোধ সম্পর্কে আমি ভীষণ

সচেতন আর মেয়েদের দিক থেকে বলতে গেলে, মেয়েরা এ নির্লজ্জপনাকে আরও বেশি ঘৃণা করে সমরবাবু। তবে আপনার তাতে কতটুকুই বা এসে যায়? তাই না?

মায়া কাছে আসছে। একটু একটু ক'রে আবার এগিয়ে ধরছে নিজেকে মায়া, স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

তবু সেই বিশিষ্ট অন্ধকে আবার ঢিল ছুঁড়তে হ'ল অন্ধকারে, তাই-টা কি শুনতে পাই না?

মেয়েদের ঘৃণা বা শ্রদ্ধা পাওয়ার কথা বলছি। যে কোনও ব্যাপারেই। আপনার তাতে কি এসে যায়? বিশাল দেশ আপনার সঙ্গী, একা মাড়িয়ে চলেছেন অনেক বিপদ-আপদ, ঝড়-ঝঞ্ঝা। আপনার তো শুধু সুমুখ। আশে-পাশে কে পোড়া হৃদয় নিয়ে ছটফট ক'রে মরল কোথায়, সেদিকে আপনার তাকাতে গেলে কখনও চলে?

একবার শুধু একটুখানির জন্তে উত্তেজিত হতে দেখলুম এর পর। সেলাই থেকে এতক্ষণে মুখ তুলে তাকালে ও আমার দিকে। আচ্ছা, এত দম্ভ কেন আপনার বলতে পারেন? আপনার সঙ্গে পথ চলবার মত ক্ষমতা কি আর কারুরই ছিল না এই এত বড় দেশটার মধ্যে?

এসব তুমি কি বলছ, মায়া? এতক্ষণ বিব্রত বোধ করলুম নিজেকে ভয়ানক।

আবার ফিরে গেল ও ওর সেই সুপরিচিত স্নিগ্ধতায়।

ভয় নেই। বাড়িতে পেয়ে আপনাকে অপমান করবার সুযোগ গ্রহণ করছি না। আমি বলছি তাদেরই হয়ে, মাটির ঢেলার মত আছড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছেন যাদের এখানে-সেখানে। মেয়েদের মন আপনি কিছুই বোঝেন না, সমরবাবু।

অন্ধের ভূমিকায় অভিনয় করছি ব'লে অন্ধ যে আমি সত্যিই নই, একবার ডাক ছেড়ে বোঝাবার ইচ্ছে হ'ল ওকে রূঢ়ভাবে ঝাঁকান দিয়ে।

কিন্তু জ্ব'লে যাক পাথর ভেতরে ভেতরে, ছুঁতে দিলে তো চলবে না ওকে।

গাঢ়ভাবে অবরোধ ক'রে ধরলুম নিজেকে প্রাণপণে।

না, এ নয়। আমি বুঝি নে, কিছু বুঝি নে আমি। জন্ম-অবিশ্বাসী আমি। যে মহল খাড়া ক'রে তুলেছি সারা জীবনে, আজ এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ ক'রতে হবে তা তোমার কাছে এসে? তবে আমার এতকালের সাধনা?

বিশ্বাস করলুম। নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্তে উদগ্র হয়ে উঠেছি আমি। আমার ঘাড়েও ভূত চেপেছে সেন্টিমেন্টের।

মায়াই বললে ফের, আমিও দেখব সমরবাবু, যখন এই দম্ভ চুরমার হবে আপনার। এই যে সব-কিছুকে সেন্টিমেন্ট ব'লে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা, দেখব—। আর, কিছু মনে

করবেন না। আগুনটা আপনার নিঃসন্দেহে সত্যি, কিন্তু একদিন না একদিন মনে হতেই হবে আপনার, নিষ্ঠুরভাবে আত্মপ্রতারণা করছেন নিজের সঙ্গে।

বেশ দৃঢ়ভাবেই জবাব দিলুম সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্বাস করতে পারলে খুশিই হব মায়া। সেদিনের প্রতীক্ষায় থাকা যাক ততদিন। কিন্তু সে যাক। বহুলোকের কথাই তো এতক্ষণ বললে। স্মৃতি, মালতী, প্রীতি থেকে আমি, দেশ এবং সারা দেশের মানুষ। কিন্তু তোমার নিজের কথাটা কি, তা তো জানা হ'ল না এখনও!

এইবার বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়াল ও, বললে, আমি?

স্পষ্ট দেখলুম, ওর কম্পমান আত্মাটার কি দুরন্ত লাফালাফি, কিন্তু তবু—আমি যে অন্ধ, তাই হাঁ ক'রে চেয়ে রইলুম আবার মুখের দিকে।

অদ্ভুত নিরক্ত হয়ে গেল ওর অমন মুখের লাবণ্য।

টলতে টলতে এগিয়ে গেল নিমেষে বাইরের দিকে আমারই সুমুখ দিয়ে।

সারা গা ওর টলমল টলমল করছে তখন।

টেবিলের ওপর কোনমতে ফ্রেমে-আঁটা অর্ধ-সমাপ্ত রুমালটা রেখে দিয়ে দরজার কাছ থেকে একবার ঘুরে বললে, আমি? না, না, আমি কেন? আমার আবার কি বলবার আছে? এমনিই, আলোচনা-প্রসঙ্গে—। আচ্ছা, বসুন, আসছি এক্ষুনি। একটু চায়ের ব্যবস্থা ক'রে আসি, কেমন?

একটা জোর-করা ব্যর্থ হাসি-মুখ আমার দিকে একবার তুলে ধ'রে, নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল একেবারে।

বংশীনগরের চার আনির জমিদারি-কাছারির চিতাভস্মের মধ্যে জন্ম হয়েছিল একদা যে-মন্ত্রের; মার-খাওয়া, বেঁকে-যাওয়া, ঝুঁকে-পড়া বিশাল ভারতবর্ষের যে একখণ্ড বিদ্রোহী আত্মা সেদিন দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে টান দিয়েছিল আমায় বিশাল পথের বাঁকে! অপরিচিত হয়ে গেল যেখানে দাঁড়িয়ে আমার আজন্মকালের সকল পরিচিতের দল—মাঠের আলে, ফ্যাক্টরির চালায়, ধাঙড়-মেথরের বস্তিতে আর সাত লক্ষ গাঁয়ের আঁকাবাঁকা অরণ্যপথের মধ্যে দিয়ে, তারপর প'ড়ে নিয়েছি তো আমার সত্যিকারের ভাগ্যলিপি।

চল্লিশ কোটির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে যেখানে শুরু হ'ল নতুন পথের যাত্রা, হাসি পায়, কতটুকু মানে সেখানে মায়ের চোখের জলের, স্মৃতির থরথর রোমান্টিক গলার, মালতীদির নির্লজ্জ আত্মনিবেদনের আর মায়ার অনুচ্চারিত হৃদয়-বেদনার!

তবু প্রেম?

কিন্তু পথে-প্রান্তরে ছটফট ক'রে মরছে যেখানে সহস্র—ক্ষুধায়, জ্বালায়, দারিদ্র্যে,

দুর্ভাগ্যে আর বর্বর অত্যাচারের নাগপাশে, গেলই বা খাঁ-খাঁ ক'রে জ'লে সেখানে একটা-মাত্র হৃদয় অন্ধকার ঘরের কোণে। কতটুকু দাম এই একটা প্রাণের সেন্টিমেন্টের ক্ষুধার?

বলকে উঠুক ধানবনের সার-দেওয়া ইস্পাতী চাঁদ, পাতাল ফেঁড়ে জেগে উঠুক ওদিকে হাজার গাঁইতির হিংস্র জিজ্ঞাসা, গাঁয়ের আকাশ মন্দ্রিত ক'রে তুলুক কোটি কুম্ভকারের নয়া সুদর্শন, আমি তো সেইখানেই।

চা-টা কোনরকমে শেষ ক'রে উঠে দাঁড়ালুম চেয়ার থেকে, চলি তা হ'লে মায়া—

ব্যথা-ভরা হাসিমুখে নীরবে ঘাড় নাড়লে দোর ধ'রে দাঁড়িয়ে। সেই মুহূর্তে মনে হ'ল, মায়া সত্যিই সুন্দর—দেহে এবং মনে।

ঐশ্বর্যের ভ্যাম্‌পায়ার তখনও বোধ হয় সবটুকু প্রাণরস ওর শুষে নিতে পারে নি।

আসছেন তো কাল? সাগ্রহও একটু ফুটে উঠেছিল বইকি জিজ্ঞাসাটুকুর মধ্যে।

ঘাড় নেড়ে অঙ্গীকার ক'রে এলুম।

বুকের ভেতরটায় ধাক্কা লাগল বুঝি একবার ধাঁই ক'রে।

কিন্তু তাই বা কতটুকু?

তারপর থেকে কত কালই না চ'লে গেছে ওদের বাড়ির আকাশের ওপর দিয়ে, কিন্তু মায়া কি তেমনই ক'রে আর দোর ধ'রে দাঁড়িয়ে থেকেছে আমার জন্তে প্রতিটা দিন?

হয়তো দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নিশ্চয়ই জানি, তখন আর কোনও নতুন প্রাণের আনাগোনা শুরু। ওখানের কাজও ফুরিয়েছিল। সেদিনই ভোরের দিকে আমিও পাড়ি জমিয়েছিলুম আরেক জনপদের উদ্দেশে।

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী

রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল

বিদেশে অর্থোপার্জন ও বৈষয়িক উন্নতি করিয়া, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি রামমোহন রায় কলিকাতায় আগমন করেন এবং তখন হইতেই এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হন। ইহার কিছুদিন পরে—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জুন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় পিতৃব্যের বিষয়ে অংশ দাবি করিয়া কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের একুইটি বিভাগে একটি মামলা রুজু করেন; মামলা প্রায় আড়াই বৎসর চলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম এই মামলার নথিপত্র সংগ্রহ করেন এবং

প্রধানত সেই নথিপত্রের সাহায্যে রামমোহন রায়ের প্রথম জীবন সম্বন্ধে 'বঙ্গশ্রী (আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ১৩৪০) ও 'ক্যালকাটা রিভিয়ু (১৯৩৩-৩৪) পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধগুলি সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশের প্রায় চার-পাঁচ বৎসর পরে—১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার *Selections from Official Letters and Documents relating to the Life of Raja Rammohun Roy* নামে এক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় দা[illegible] করিয়াছেন যে, গ্রন্থমধ্যে রামমোহন রায়ের প্রথম জীবন সম্বন্ধে নূতন সংবাদগুলি তাঁহারা[illegible] সাহায্যে [illegible] "Most of the records printed in thi[s] volume have been brought to the notice of the public for th[e] first time."

সম্পাদকদ্বয়ের এই কথা সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের প্রশংসনীয় উদ্যমের জন্য এক শ্রেণীর লোক তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, চন্দ মজুমদার মহাশয়ের এই সুবৃহৎ গ্রন্থে রামমোহনের প্রথম জীবন সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত উপাদান ও সংবাদগুলির অতিরিক্ত একটিও নূতন দলিল বা সংবাদ নাই। শুধু তাহাই নয়, আশ্চর্য্যের কথা এই যে, উপরিউক্ত মামলায় প্রতিবাদী রামমোহন রায়ের নিজের স্বাক্ষরিত বিবৃতিটি উক্ত গ্রন্থে স্থান পায় নাই। আমাদের মতে, যাহা অবিসংবাদিরূপে রামমোহনের নিজের 'বিবৃতি' বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে তাহাই রামমোহন জীবনীর শ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হওয়া উচিত। ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত মামলায় রামমোহন নিজের স্বাক্ষরিত এই বিবৃতিটির সত্যতা সম্বন্ধে সর্ব্বাধিকরণে বেদান্ত হাতে লইয়া শপথ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত মামলা সংক্রান্ত সকল নথিপত্র দেখিবার ও নকল ইত্যাদি লইবার সম্পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও কেন যে চন্দ-মজুমদার তাঁহাদের গ্রন্থে রামমোহনের স্বাক্ষরিত ও শপথীকৃত বিবৃতিটিকে স্থান দেন নাই, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিবৃতিটি সুদীর্ঘ হইলেও রামমোহনের প্রথম জীবনের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য অমূল্য উপকরণ হিসাবে লোকচক্ষুর গোচরীভূত হওয়া উচিত মনে করিয়া আমরা ইহা সমগ্রভাবে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি। আমাদের অনুরোধ করিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে হাইকোর্ট হইতে গৃহীত রামমোহনের এই বিবৃতিটির certified copy সংগ্রহ করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় উহার প্রথমাংশ প্রকাশিত হইল।—সম্পাদক, শ. চি.

In the Supreme Court of Judicature at Fort William in Bengal In Equity.

The answer of Rammohun Roy the defendant to the Bill of Complaint of Govindpersaud Roy only son heir and legal personal representative of Juggomohun Roy deceased Complainant.

This defendant now and at all times hereafter saving and reserving to himself all and all manner of benefit and advantage of exception that may be had or taken to the many errors uncertainties and insufficiencies in the Complainants said Bill of Complaint contained for answer thereto or unto so much thereof as this defendant is advised is material or necessary for him to make answer unto he answering saith that altho the Complainant may be yet this defendant does not know that he is a Hindoo inhabitant of Calcutta and this defendant answering saith that Ramcaunt Roy the grandfather of the said Complainant was in his lifetime a Hindoo and resided for sometime at Nungoorparah in the pergunnah of Boyrah in the district of Burdwan in the province of Bengal and afterwards at Burdwan and in other places and that the said Ramcaunt Roy in his lifetime had three wives by the eldest of whom named Subhoodarrah Daby long since deceased he the said Ramcaunt Roy had no children and this defendant further answering saith that the said Ramcaunt Roy by his second wife named Tarriny Daby had two sons namely Juggomohun Roy the Complainants father who was the eldest son of the said Ramcaunt Roy and this defendant who admits himself to be an inhabitant of Calcutta and a person therefore subject to the jurisdiction of this Honourable Court And this defendant further answering admits that the said Ramcaunt Roy by his third and youngest wife named Rammoney Daby had one son called Ramlochan Roy the third and youngest son of the said Ramcaunt Roy And this defendant further answering saith that the said Ramcaunt Roy being in his lifetime seized and possessed of a considerable estate immoveable and moveable or real and personal on or about the time in the Complainants Bill of Complaint in that behalf mentioned did by a certain instrument in the Bengal language and character (a true translation of which is as this defendant believes annexed to the complainants said bill marked with the letter A and which said instrument was publickly executed by the said Ramcaunt Roy and duly registered by the Kazee of

Kissenagore in the province of Bengal a public officer in that behalf duly authorized.

Divide and allot among his three sons the said Juggomohun Roy this defendant and the said Ramlochun Roy the greater part of the immoveable or real estate of him the said Ramcaunt Roy as mentioned in the said instrument in writing of which shares so respectively allotted the said Juggomohun Roy Ramlochun Roy and this defendant respectively took possession under and by virtue of the said instrument of partition and that the said Ramcaunt Roy continued to possess so much of hia estate immoveable and moveable respectively as was not allotted to his said sons in and by the said instrument in writing And this defendant further answering saith that the said Ramlochun Roy shortly after the said partition separated himself from the other members of his said father's family and together with his said mother the said Rammoney Daby proceeded from the family house in which the said Ramlochun Roy and his mother had previously resided at Nungoorparah to a house and premises at Radanagur to a certain share of which the said Ramlochun Roy became entitled under the said instrument of partition and which had proviously belonged to his father the said Ramcaunt Roy and that the said Ramlochun Roy afterwards continued to reside principally at the place last mentioned until the period of his death which happened about the time in the Complainants Bill in that behalf mentioned and this defendant further answering denies that immediately or shortly or at any time after the said partition the said Ramcaunt Roy Juggomohun Roy and this defendant reunited or lived together as a Hindoo family or became again and were joint and undivided in food property and in all other respects until the death of said Ramcaunt Roy And this defendant further answering saith that the said Ramcaunt Roy departed this life on or about the month of Joystee in the Bengal year one thousand two hundred and ten Answering to parts of the months of May and June in the year of Christ one thousand eight hundred and three and so departed this life in a certain house at Burdwan, which in the said instrument of partition is described as the Burdwan lodging houses and which had thereby been reserved by him the said Ramcaunt Roy for his own use leaving him surviving his said three sons Juggomohun Roy Ramlochun Roy and this defendant and also leaving him surviving his said three widows namely Subboodarah Daby who is now dead and Tarraney Daby and Radamoney Daby who are still respectively living and this defendant further answering admits that the said Tarraney Daby and Rammoney Daby are not inhabi-

tants and that neither of them is an inhabitant of Calcutta or in any manner as this defendant believes subject to the jurisdiction of this Honourable Court and this defendant further answering denies that from the death of the said Ramcaunt Roy until the time of the death of the said Juggomohun Roy or at any time or times subsequent to the date of the aforesaid instrument of partition the said Juggomohun Roy and this defendant either lived or continued to live together or to form an undivided Hindoo family as stated in the Complainants Bill of Complaint for this defendant further answering saith that altho the said Juggomohun Roy and this defendant under and in virtue of the aforesaid instrument of partition and in the manner therein specified were joint owners of the house at Nungoorparah and so long as the said Juggomohun Roy was enabled to contribute his share did equally out of their respective funds defray the expenses of their said mother Tarraney Dabey and of the said Subboodarah Dabey during her lifetime who after the said partition respectively continued to reside in the last mentioned house and that although this defendant and the said Juggomohun Roy from the time of the said partition until about the year of Christ one thousand eight hundred and one when the said Juggomohun Roy became so much embarrassed in his circumstances that he could not contribute to the support of his said mother did from their respective and several earnings profits or funds equally defray the expence of providing food for the families of this defendant and of the said Juggomohun Roy, who were under the superintendance and management of their said mother Tarraney Dabey in the said house at Nungoorparah and in like manner paid the expence of all religious ceremonies which were performed by or under the direction of the said Tarraney Dabey yet this defendant saith that the said Juggomohun Roy and this defendant were in all other respects unconnected with each other and that the said Juggomohun Roy and this defendant had separate and distinct servants and establishments for the service accommodation and convenience of each other and of their respective families and were not supported or maintained out of any common stock or fund and that the said Juggomohun Roy and this defendant during the period herein last mentioned respectively paid their equal shares or proportions of the expences of the said Tarraney Dabey and also of the said Subboodarah Dabey during her lifetime and also of supplying the food and performing the ceremonies as aforesaid from and out of the income or profits received or realized by the said Juggomohun Roy and by this defendant respectively as aforesaid into the hands of certain Sircars or servants employed and paid by the said Tarraney Dabey when and as often as this defendant and

the said Juggomohun Roy during the period last mentioned were respectively required to pay the same and that this defendant and the said Juggomohun Roy did not at any time after the said partition otherwise than as aforesaid jointly contribute to defray the expences of themselves or of their mothers or of the said Subboodarah Dabey or of the families of the said Juggomohun Roy and of this defendant or of any or either of them And this defendant further answering admits that the said Juggomohun Roy departed this life in or about the month of Choit in the Bengal year one thousand two hundred and eighteen Answering as this defendant believes to parts of the months of March and April in the year of Christ one thousand eight hundred and twelve leaving him surviving the complianant his only son heir and legal personal representative and as such according to the laws usages and customs of the Hindoos entitled to the whole of the estate immoveable and moveable or real and personal which were or was of the said Juggomohun Roy at the time of his death. And this defendant further answering denies that after the making of the partition and allottment before mentioned the said Ramcaunt Roy with the joint monies and funds of himself and of the said Juggomohun Roy and this defendant either in the name of Gungadhur Ghose a confidential servant or in the name of any other person either for the joint benefit of himself of the said Juggomohun Roy and of this defendant or otherwise purchased a certain Talcok called or known by the name of Govindpore situate and being in the Pergunnah of Jahanabad in the Zillah of Burdwan and this defendant further answering denies that the said Ramcaunt Roy either in the name of his nephew one Ramtonoo Roy or in the name of any other person purchased either with the joint monies of him the said Ramcaunt Roy and of the said Juggomohun Roy and this defendant or otherwise either for the joint benefit of him the said Ramcaunt Roy and of the said Juggomohun Roy and this defendant or otherwise a certain other Talook called or known by the name of Rammissorpore situate and being in the pergunnah of Chunderconnah in the zillah last mentioned And this defendant further answering denies that the said Ramcaunt Roy having so purchased the said two several Talooks at a public sale of Government in the names of the said Gungadhur Ghose and Ramtonoo Roy or otherwise cause the said Gungadhur Ghose and Ramtonoo Roy to execute bills of sale thereof to this defendant either in trust or for the joint benefit of himself the said Ramcaunt Roy and of the said Juggomohun Roy and this defendant or in any other manner And this defendant further answering denies that the said Ramcaunt Roy caused the said two several Talooks to be transferred in the books of the Collector of

Burdwan or in any books of any other Collectors into the name of this defendant. And this defendant further answering denies that the said Ramcaunt Roy having purchased in the manner in the bill in that behalf mentioned or otherwise the said two several Talooks called Govindapore and Rammassorepore caused bills of sale thereof to be executed by this defendant to one Rajiblochun Roy or to any other person or that the said Ramcaunt Roy caused the said two several talooks to be transferred in the books of the Collector of Burdwan into the name of the said Rajiblochun Roy or that the several conveyances or transfers of the said Talooks in the Complainants bill in that behalf mentioned or any or either of them or any other conveyances or transfer of the said Talooks were or was made by the directions of the said Ramcaunt Roy or in trust for himself and for the said Juggemohun Roy and this defendant as in the Complainants bill is untruly alleged but this defendant further answering saith as the truth is that about two years and a half after the partition in the bill and herein before respectively mentioned and after the family of the said Ramcaunt Roy had become divided as aforesaid he this defendant with the proper monies of this defendant purchased for his own separate and exclusive use and benefit the several Talooks hereinbefore mentioned And this defendant further answering saith that on or about the thirtieth day of Assar in the Bengal year one thousand two hundred and six answering as this defendant believes to the month of July in the year of Christ one thousand seven hundred and ninetynine. This defendant purchased the said Talook situated and being at Govindpore from one Gungadhur Bose for the price or sum of Sicca Rupees Three thousand and one hundred and that on the same day and year last mentioned This defendant also purchased the said Talook situate and being at Rammissorepore from one Ramtonoo Roy for the price or sum of Sicca Rupees One thousand two hundred and fifty And this defendant further answering saith that afterwards and sometime in or about the year of Christ One thousand and eight hundred this defendant was about to proceed to Patna Benares and to other provinces remote from Calcutta, And considering the uncertainty of life and having at that time no child, this defendant was desirous that in the event of his death happening during his absence from Calcutta, one Gooroodass Mukherjee then an infant of the age of ten or eleven years and who was the only son of this defendant's sister should after this defendants death inherit or become entitled to the said two Talooks of Rammissorpore and Govindpore and that this defendant therefore as is usual amongst Hindoos caused a nominal transfer of the said two Talooks to be executed to the said Rajiblochun Roy

who was a confidential friend of this defendant in trust for the said Gooroodass Mukherjee And that this defendant at the same time received from the said Rajiblochun Roy a declaration in writing in the name of the said Gooroodass Muckerjee that the said two Talooks were held by the said Rajiblochun Roy in trust for the said Gooroodass Muckerjee in the event of the death of this defendant during his intended absence from Calcutta And this defendant further answering denies that any conveyance of the said two Talooks or either of them was made by this defendant in the manner stated by the Complainant in his Bill of Complaint or that any conveyance thereof was made other than that hereinbefore mentioned. [ক্রমশ]

আমাদের ঝঞ্ঝাট

[শ্রীযুক্ত বিরূপাক্ষ আমাদের ঘাড়ে মাসে মাসে তাঁহার ঝঞ্ঝাট চাপাইয়া ঘাড়টা অনেক শক্ত করিয়া আনিলেও তাঁহার উস্কানিতে অন্যেরা আমাদিগকে যে ঝঞ্ঝাটে ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহা জ্ঞাত হইলে সর্বঝঞ্ঝাটবিশারদ বিরূপাক্ষেরও অনুকম্পা হইবে। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু নামধেয় এক বেদজ্ঞ পণ্ডিত আমাদের সংস্কৃতজ্ঞানের অভাবের সুযোগ লইয়া এই ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করিয়াছেন। নিম্নে প্রকাশিত পত্রখানি হইতে এই ঝঞ্ঝাটের স্বরূপ পাঠকেরা কিছু উপলব্ধি করিবেন। শুধু উমা দেবী নন, আরও অনেকে আমাদের ঝঞ্ঝাট বৃদ্ধির জন্য অগ্রসর হইতেছেন, কিন্তু আমরা ঘরপোড়া গরুর মত সিঁদুরে মেঘ দেখিয়াই ভড়কাইতেছি। এই সব নকল ঝঞ্ঝাটের ফলে এবারে বিরূপাক্ষের আসল ঝঞ্ঝাট বাদ পড়িল। আগামী সংখ্যায় তাঁহার "আপনি" শীর্ষক ঝঞ্ঝাটে আমাদের ঝঞ্ঝাট চাপা পড়িলে আমরা বাঁচিব।—স. শ. চি.]

আপনার 'শনিবারের চিঠি'তে জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীঅনাথবন্ধু বেদজ্ঞ-লিখিত "শব্দের অপপ্রয়োগ" শীর্ষক প্রবন্ধে যে সকল শব্দের ভুল তালিকা (ভুল-শব্দের তালিকা নহে) প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বলা বাহুল্য, শব্দটি ভুল কি ভুল নহে, এ সম্বন্ধে তিনি সংস্কৃতের দোহাই পাড়িয়াছেন, অর্থাৎ সংস্কৃত-ব্যাকরণসম্মত সাধু-প্রয়োগের উপরই তিনি ভুলের বিচার করিয়াছেন, এবং বিচার করিতে গিয়া এমন কতকগুলি ভুল করিয়াছেন, যাহা সংস্কৃত-জানা ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। যেমন

(১) মৃণ্ময়। বেদজ্ঞ মহাশয়ের মতে মৃণ্ময় ভুল শব্দ, নির্ভুল শব্দ মৃন্ময়। মৃন্ময় শব্দটিই যে নির্ভুল ইহাতে কোনও সংশয় নাই। কিন্তু যখন তিনি মূর্দ্ধণ্য 'ণ' কেন হইবে না, ইহার

কারণ দেখাইতে গিয়া বলিয়াছেন, "কারণ পদান্ত 'দন্ত্য ন' 'মূর্ধণ্য ণ' হয় না। যেমন নর শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন 'নরাণ্' না হইয়া 'নরান্' হয়," তখনই ব্যাপারটি মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে; কেননা 'দন্ত্য ন' কেন 'মূর্দ্ধণ্য ণ' হইল না, ইহার জবাব দিতে গেলে বলিতে হয় যে, ওই স্থলে ণত্ববিধির কোন অবকাশই নাই। শব্দটির সংঘটনের স্তরগুলি দেখাইলেই বিষয়টি পরিষ্কার হইবে।

'মৃন্ময়' বলিতে আমরা বুঝি 'মাটির বিকারবিশেষ' অর্থাৎ মৃদো বিকারঃ। মৃন্ময়—

=মৃদ্+অস্+ময়ট্—"তস্য বিকারঃ (৪।৩।১৩৪) এই সূত্রের অনুবৃত্তিতে বিকারার্থে নিত্যং বৃদ্ধশরাদিভ্যঃ (৪।৩।১৪৪) সূত্রের দ্বারা ময়ট্ প্রত্যয়।

=মৃদ্+০+ময়ট্—সুপো ধাতুপ্রাতিপদিকয়োঃ (২।৪।৭১) সূত্রদ্বারা অস্-লোপ।

=মৃদ্+ময়—হলন্ত্যম্-সূত্র (১।৩।৩) দ্বারা ট-লোপ।

=মৃন্+ময়—যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বা (৮।৪।৪৫)

সূত্রের ব্যাখ্যায় ভট্টোজি দীক্ষিত-কর্তৃক উদ্ধৃত কাত্যায়নের ৫০১৭ নং বার্ত্তিক প্রত্যয়ে "ভাষায়াং নিত্যম্"—অনুসারে দ-এর অনুনাসিকত্ব। স্থানেঽন্তরতমঃ (১।১।৫০) সূত্রদ্বারা দন্ত্যবর্ণস্থলে দন্ত্য অনুনাসিক অর্থাৎ দ-স্থলে ন।

এখন কথা এই যে, ঋ-কারের পরবর্তী বলিয়া দন্ত্য 'ন' মূর্দ্ধণ্য 'ণ' হইবে কি না অর্থাৎ ণত্ব-বিধি এস্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা?—

রষাভ্যাং নো ণঃ সমানপদে (৮।৪।১) সূত্রানুসারে ঋ-পরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্দ্ধণ্য 'ণ' হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে তাহা হইবে না। কিন্তু তাহার কারণ বেদজ্ঞ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা নহে। কারণ অন্য। পূর্ব্বত্রাসিদ্ধম্ (৮।২।১) সূত্রানুসারে ৮।৪।৪৫ নং সূত্র (যরোঽনুনাসি°) ৮।৪।১ নং সূত্রের (রষাভ্যাং নো ণঃ°) প্রতি অসিদ্ধ অর্থাৎ ৮।৪।১ নং সূত্র যখন প্রয়োগ করিব তখন ধরিয়া লইতে হইবে যে, ৮।৪।৪৫ নং সূত্র নাই। সুতরাং ৮।৪।১ নং সূত্রের প্রয়োগোপযোগী ক্ষেত্রস্বরূপ 'দ'-এর 'ন'-ত্বই যখন আমরা পাইতেছি না, তখন তাহা ৮।৪।৪৫ নং সূত্রানুসারে মূর্ধণ্য 'ণ' হইবে কিনা, ইহা বিচার করিতে যাওয়া ব্যাকরণ-সম্বন্ধে অজ্ঞতা-প্রকাশমাত্র। এস্থলে ণত্ববিধিপ্রয়োগের কোন অবসরই নাই, কারণ, ণত্ববিধিপ্রয়োগকালে এস্থলে অনুনাসিকই নাই। উপরে উদ্ধৃত সূত্রগুলির সমস্তই পাণিনির।

(২) মনোহর—

শব্দটিকে ভুল বলিয়া বেদজ্ঞ মহাশয় মহাভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, মনান্তর ও মনোহর, এই দুইটি শব্দই অশুদ্ধ এবং ব্যাকরণ-বিরোধী। ব্যাকরণ-সম্মত পদ—মনহর। মনান্তর শব্দটি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, কেননা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে শব্দটি ভুল, কিন্তু বাংলায় শব্দটি চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু মনহর শব্দটি কোন্

ব্যাকরণ-অনুযায়ী শুদ্ধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, তাহা কি তিনি বলিয়া দিবেন? আমরা পড়িয়াছি, হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ—আমরা পাণিনি সূত্রানুসারে জানিয়াছি, মনোহর শব্দই ঠিক। শব্দ সংগঠনের প্রণালী দেখিলেই বুঝা যাইবে—

মনস্ শব্দ। মনোহর অর্থাৎ মনসো হরঃ।

= মনস্ + ঙস্ + হর

= মনস্ + ০ + হর (সুপো ধাতুপ্রাতিপদিকয়োঃ ২।৪।৭১)

= মনরু + হর—(সসজুষো রুঃ ৮ ২ ৬৬)

= মনর্ + হর—(উ-লোপ—প্রতিজ্ঞানুনাসিক্যাঃ পাণিনীয়াঃ)

= মনউ + হর—(হশি চ ৬।১।১১৪)

= মনো + হর—(আদ্‌গুণঃ ৬ ১ ৮৭)

= মনোহর।

(৩) আরম্ভ—

বেদজ্ঞ মহাশয়ের মতে লেখার আরম্ভ হইতে ইত্যাদি বাক্যে আরম্ভ শব্দের প্রয়োগ অশুদ্ধ, শুদ্ধ পদ আরব্ধ। অর্থাৎ কেহ যদি লেখেন, লেখার আরব্ধ হইতে ইত্যাদি, তাহা হইলে শব্দপ্রয়োগ শুদ্ধ হইবে। কিন্তু ইহা জানা উচিত আরম্ভ-শব্দ (আ+রভ্+ঘঞ+মুম্) মোটেই অশুদ্ধ নহে এবং লেখার আরম্ভ হইতে ইত্যাদি প্রয়োগও অশুদ্ধ নহে। কারণ, আরম্ভ-শব্দের অর্থ beginning আর আরব্ধ শব্দের অর্থ begun। আমরা কার্যারম্ভে বলিতে পারি অর্থাৎ কাজের শুরুতে, কিন্তু আরব্ধ কার্য বলিতে বোঝায় সেই কার্য যাহা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে আরম্ভ-শব্দের প্রয়োগ যে অশুদ্ধ নহে, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সংস্কৃতেও পাই—নৃত্যারম্ভে হরপশুপতেঃ, ইত্যাদি।

মম্মটের কাব্যপ্রকাশের সূচনাতেই আছে—

গ্রন্থারম্ভে বিঘ্ন-বিঘাতায়—ইত্যাদি। আরম্ভ শব্দের অর্থ টীকায় আছে—আদ্যকৃতিরূপস্য মুখ্যার্থস্য।

শেষ-শব্দটিও শুধুমাত্র বাকি-অর্থেই ব্যবহৃত নহে, towards the end—অর্থেও শেষ-শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়—যেমন—পঞ্চমোল্লাসশেষে ইত্যাদি।

(৪) আত্মম্ভরী—

বেদজ্ঞমহাশয় লিখিয়াছেন, "আত্মম্ভরী সংস্কৃতে অর্থ পেটুক"।—কুক্ষিম্ভরি উদরম্ভরি প্রভৃতি শব্দের মুখ্যার্থ পেটুক। কিন্তু আত্মম্ভরি শব্দটির অর্থ তাহা নহে। পাণিনির ৩.২।২৬ নং সূত্র ফলেগ্রহিরাত্মম্ভরিশ্চ—সূত্রানুসারে আত্মম্ভরি শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার অর্থ—আত্মানং বিভর্তি আত্মম্ভরিঃ।

অদ্বৈতসিদ্ধির মূলসূচীর একটি শ্লোকে এই অর্থে ব্যবহৃত আত্মম্ভরি শব্দের একটি সুষ্ঠু প্রয়োগ পাওয়া যায়।

বহুভির্বিহিতা বুধৈঃ পরার্থং বিজয়ন্তেঽমিতাবিস্তৃতা নিবন্ধাঃ।
মম তু শ্রম এষ নূনমাত্মম্ভরিতাং ভাবয়িতুং ভবিষ্যতীহ॥

মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত বালবোধিনী টীকায় শব্দটির অর্থ দেওয়া হইয়াছে—আত্মম্ভরিতাং—মন্নিষ্ঠাম্ অর্থবোধসম্পাত্তিম্। আরও একটি কথা, শব্দটি 'আত্মম্ভরী' নহে, 'আত্মম্ভরি' (হ্রস্ব-ইকারান্ত)।

(৫) নির্ঘাৎ—

বেদজ্ঞ মহাশয় লিখিয়াছেন, "নির্ঘাৎ সংস্কৃতে অর্থ বজ্র।" নির্ঘাৎ শব্দটি যে সংস্কৃত, সে সম্বন্ধে প্রমাণ উপস্থিত না করা পর্যন্ত আমরা শব্দটিকে সংস্কৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে রাজি নহি। অমর-কোষে বজ্রের প্রতিশব্দগুলির যে তালিকা আছে, যথা—

হ্লাদিনী বজ্রমস্ত্রী স্যাৎ কুলিশং ভিদুরং পবিঃ।
শতকোটিঃ স্বরুঃ শম্বো দম্ভোলিরশনির্দ্বয়োঃ॥

তাহাতেও নির্ঘাৎ শব্দ পাওয়া যায় না। সুতরাং বজ্র অর্থে নির্ঘাৎ শব্দকে গ্রহণ করিতে পারার পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ না দেখানো পর্যন্ত আমরা উহা গ্রহণ করিতে পারি না।

সংস্কৃতে নির্ঘাত বলিয়া একটি শব্দ পাওয়া যায়। শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্+হন+ঘঞ্=নির্ঘাত অর্থাৎ নিঃশেষে হনন। চণ্ডীতে আছে, নির্ঘাতনিঃস্বনো ঘোরো জ্যাস্বানবনীপতে॥ ৬॥৯।২৬ এ স্থলে নির্ঘাত শব্দের অর্থ বজ্র নহে।*

(৬) গোপ—

বেদজ্ঞ মহাশয় বলিয়াছেন, "গোপ সংস্কৃতে অর্থ রক্ষক, কিন্তু বাংলায় অর্থ গোয়ালা।" ইহাও যুক্তিযুক্ত হয় নাই। গাঃ পাতি ইতি গো+পা+কিপ্=গোপ, ইহাই এই শব্দের ব্যুৎপত্তি। গোয়ালা অর্থে সংস্কৃতে গোপশব্দের ভূরি ভূরি প্রয়োগ আছে, যথা—গোপবেশস্তু বিষ্ণোঃ, গোপবধূ—

রক্ষক হিসাবেও শব্দটির ব্যবহার আছে, তাহার ব্যুৎপত্তি,√গুপ, গোপায়তীতি গোপঃ (পচাদ্যচ্)।

* নির্ঘাত শব্দের অর্থ "শব্দমালা"য় আছে—

"বায়ুনাভিহতে বায়ৌ গগনাচ্চ পতত্যধঃ।
প্রচণ্ডঘোরনির্ঘোষো নির্ঘাত ইতি কথ্যতে॥"

"নির্ঘাতনিঃস্বনো"—ইত্যাদি শ্লোকে এই অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৭) রাগ—

বেদজ্ঞ মহাশয়ের মতে রাগ, সংস্কৃতে অর্থ অনুরাগ। কিন্তু সংস্কৃতে যে একটি শব্দের বহুবিধ অর্থ থাকিতে পারে এবং তাহার একটি অর্থ হয়তো অনুরাগ, ইহা লেখেন নাই।

প্রকৃতপক্ষে রাগশব্দের অর্থ রঞ্জনদ্রব্য, তেন রক্তং রাগাৎ, পাণিনি (৪।২।১) এবং আসক্তি বা রতি ইত্যাদি। সংস্কৃতে অনেক ক্ষেত্রেই অনুরাগ শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বন্যালোকে একটি শ্লোক আছে—

অনুরাগবতী সন্ধ্যা দিবসস্তৎপুরঃসরঃ। ইত্যাদি।

অনুরাগ শব্দের অর্থ টীকায় আছে, প্রেমবিশেষঃ। রূপগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুরাগের একটি স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সো'হনুরাগ ইতীর্যতে।

রাগ বা রতির একটি বিশেষ অবস্থাই অনুরাগ। বিরহও রাগ বা রতির একটি অবস্থা। কিন্তু রাগ বা রতি বলিতে আমরা যেমন কেবল বিরহ বুঝি না, সেইরূপ অনুরাগও বুঝি না। বাস্তবিকই আসক্তি বা রতিই রাগ-শব্দের অর্থ। রাগ বলিতে রঞ্জনদ্রব্যও যে বলা হয়, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে।

রাগেণ বালারুণকোমলেন।
অধরঃ কিসলয়রাগঃ
তবাস্মি গীতরাগেণ—
রাগপরিবাহিনী গীতি—

(৮) নয়—

বেদজ্ঞ মহাশয়ের মতে—"নয়—সংস্কৃতে অর্থ ন্যায্য; কিন্তু বাংলায় অর্থ নহে"।

আশ্চর্য এই যে, বিশেষ্য-বিশেষণজ্ঞানের অভাব এই উক্তিতে পরিস্ফুট। সুন্দর ও সৌন্দর্য যেমন একার্থক নহে, সেইরূপ নয় ও ন্যায্যও একার্থক নহে। 'নয়' শব্দের অর্থ নীতি, ন্যায় বিশেষ্য। ন্যায্য শব্দের অর্থ ন্যায়সম্মত বিশেষণ। তাহা ছাড়া এই 'নয়' হইতে নিষেধার্থক নয় বাংলায় আসে নাই।

(৯) উপন্যাস—

বেদজ্ঞ মহাশয় বলিয়াছেন, "উপন্যাস—এই শব্দটি বাংলা-ভাষার সৃষ্টি। সংস্কৃতে উপন্যাস অর্থ অসত্য বা অলঙ্কৃত বচনবিন্যাস"। এখানে বেদজ্ঞ মহাশয় দুইটি ভুল করিয়াছেন। প্রথমত উপন্যাস শব্দটি বাংলা ভাষার সৃষ্টি নহে, সংস্কৃত শব্দই বাংলায় ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র। দ্বিতীয়ত শব্দটির অসত্য বা অলঙ্কৃত বচন-বিন্যাস-রূপ

অর্থ তিনি কোথায় পাইলেন? অমরকোষে আছে—"উপন্যাসস্তু বাঙ্‌মুখম্।" এই অর্থে 'উপন্যাস' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—

চতুরো মধুরস্ত্বায়মুপন্যাসঃ—
পাবকঃ খলু এষ বচনোপন্যাসঃ—
শনৈকৈরলীকবচনোপন্যাসমালীজনঃ—ইত্যাদি

বেদজ্ঞ মহাশয় প্রবন্ধের গোড়াতেই বলিয়াছেন, "নিয়ম সাধারণের জন্য এবং তাহারা নিয়মের অধীন। কিন্তু যাহারা অসাধারণ, নিয়ম তাহাদেরই অধীন হয়। ভাষার বেলাও এ কথা প্রযোজ্য।" সম্ভবত এই নীতিবশতই সাধারণের অপাঠ্য "দুষ্পাঠ্য" বেদ যিনি জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে নিয়মকে অধীনস্থ করা অবলীলাক্রমে ঘটিয়া গিয়াছে। তবে বেদজ্ঞ মহাশয় যে বলিয়াছেন, 'সংস্কৃতে আর্ষ প্রয়োগের এত ছড়াছড়ি'—এই কথাটি মানিতে পারিতেছি না, কারণ, স্পষ্টই দেখিতেছি যে, আপনার কাগজের মারফতে বাংলাতেও আর্ষপ্রয়োগের ছড়াছড়ি হইতেছে।

উমা দেবী

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

তরঙ্গিণীর মৃত্যুর পর সন্ন্যাসী তার মেয়েটিকে কোলে ক'রে নীচে নেমে গিয়ে ওই ঘরটিতে আশ্রয় নিলে, যেখানে আজ লক্ষ্মীমণি থাকে। সন্ন্যাসীই ওর নাম দিয়েছিলেন লক্ষ্মীমণি। সন্ন্যাসী ওকে মানুষ করতে লাগলেন আর যত্ন মুকুটি দিনরাত, যে ঘরে তরঙ্গিণী মারা গিয়েছিল, সেই ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে সাধনা আরম্ভ ক'রে দিলেন। লোকে বলতে লাগল, তরঙ্গিণী অদ্ভুত স্ত্রীলোক ছিল, সন্ন্যাসীকে ক'রে গেল গৃহী আর গৃহস্থকে ক'রে গেল সন্ন্যাসী।

সেই থেকে সন্ন্যাসী এখানেই থেকে গেলেন। তিনি লক্ষ্মীমণিকে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন। মেয়েটার ছিল অদ্ভুত বুদ্ধি, পাঁচ বছর বয়সেই বাংলা লিখতে পড়তে শুরু ক'রে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, তখনই ও অনেক সংস্কৃত কবিতা মুখস্থ বলতে পারত—সন্ন্যেসীই ওকে শিখিয়েছিলেন।

লক্ষ্মীমণির যখন আট বছর বয়েস, তখন সন্ন্যেসী খুব ধুমধাম ক'রে তাকে দিলেন—সে তো সেদিনের কথা। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই ওর মধ্যে অদ্ভুত সব বিভূতি প্রকাশ পেতে লাগল। লোক দেখলেই ও ব'লে

দিতে পারত, কি তার নাম, কোথা থেকে আসছে, কোথায় তার বাড়ি ; তার সারা জীবনের ইতিহাস গড়গড় ক'রে বলতে থাকত। পুরোনো দিনের অনেকেই তখন ম'রে গিয়েছে, নতুন লোকের ভিড়ে আবার বাড়ির উঠোন দিনরাত ভর্তি হয়ে উঠতে লাগল—সকলেই নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চায়। বারো বছরের মেয়ে লক্ষ্মীমণির পায়ে কাশীসুদ্ধ লোক লুটিয়ে পড়তে আরম্ভ করলে।

এই সময় একদিন সন্ন্যাসী যদু মুকুটিকে ডেকে বললেন, আমি চললুম, আর আমি আসব না। লক্ষ্মীকে মানুষ ক'রে দিয়ে গেলুম—ওর বিয়ে দিস নি।

সন্ন্যাসী চ'লে গেলেন। মুকুটি মশায় আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। সেই থেকে ওই বারো বছরের মেয়ে ভাড়াটেদের তদারক, বাপের সেবা, সংসারের সব কিছুই দেখতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মাঝে মাঝে মুকুটি মশায়ের মেয়ে অর্থাৎ ওই বদ্যিনাথের মা এখানে সব তদারক করতে আসত বটে, কিন্তু লক্ষ্মীমণি তাকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিত। সেই বয়স থেকেই ওর এমন একটা ভারিক্কী চাল ছিল যে, বুড়োরা পর্যন্ত ওর কাছে ঘেঁষতে পারত না।

লক্ষ্মীমণির যখন প্রায় আঠারো বছর বয়েস, তখন ওর বাপ মুকুটি মশায় মারা গেলেন। ওরঙ্গিণী যাবার আগে কাশীর তিনখানা বাড়ি আর কেউ বা বলে চার, কেউ বা বলে পঁচাত্তর হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ মুকুটি মশায়কে লিখে দিয়ে গিয়েছিল। মুকুটি মশায় একখানা বাড়ি বদ্যিনাথের মাকে দিয়ে বাকি সমস্ত বিষয় লক্ষ্মীমণিকে দিয়ে গেলেন। সেই থেকে ও নিজে সমস্ত বিষয়-আশয় দেখছে, ও আপন মনে সাধনভজন ক'রে চলেছে। ওর সব ভাল, কিন্তু ওই এক দোষ—ওই এক দোষেই ওর সর্বনাশ করেছে। মাঝে মাঝে দেহজ্বালা ওকে বড় কাবু ক'রে ফেলে। সেই সময় রাস্তা থেকে এই তোদের মতন ছোট ছোট ছেলে ধ'রে নিয়ে এসে ওষুধস্বরূপ তাদের ব্যবহার করে, নইলে ওর মতন মেয়ে পৃথিবীতে দুটো মেলে না। এইজন্যে কাশীসুদ্ধ লোক ওর ওপরে চটা। তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর মন্ত্রশিষ্যার এ হেন বৈষ্ণবজনোচিত ব্যবহার লোকের সহ্য হয় না।

প্রায় এক-নাগাড়ে ঘণ্টা দেড়েক বকবক ক'রে বাঙাল-মা এবার চুপ করলেন। শীতের রাত্রি, কাশীর গলি একেবারে নিস্তব্ধ—মাঝে মাঝে কাছে

দূরে প্যাঁচার কর্কশ চীৎকার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের মুখে কোনও কথা নেই, মাঝে মাঝে পরিতোষ করুণ চোখে আমার ও বাঙাল-মার মুখের দিকে চাইছে। বাঙাল-মা এতক্ষণ ধ'রে যা বললেন, তা সবই সত্যি, আমাদের কাছে মিথ্যে বলবার তাঁর কি প্রয়োজন, কিন্তু তবুও কি জানি কেন, আমার মনে হ'তে লাগল—এতদিন যা হয়েছে তা হয়েছে, আমার সঙ্গে রাজকুমারী সে রকম ব্যবহার কখনও করবে না। যক্ষারোগে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—এ কথা সর্বজনবিদিত। তবুও যারই যক্ষা হয়, এমন কি চিকিৎসকেরও যক্ষা হ'লে সে মনে করে, অন্য সবার বেলা যাই হয়ে থাক্ না কেন, সে বেঁচে যাবে। সে রোগের লক্ষণই তাই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর আমি বাঙাল-মাকে বললুম, গুরুমা আমাদের বলেছে যে, তোরা আমার কাছ থেকে যেতে পাবি না। আমি তোদের ব্যবসা ক'রে দেব, তোরা এইখানেই থাক্, আমি তোদের ছাড়ব না।

আমার কথা শুনে বাঙাল মা খানিকটা হি-হি ক'রে হেসে নিয়ে বললেন, বাছা, জ্বর যত বেশি হয়, রুগী তত বেশি ভুল বকে। বিকারের ঘোরে মুখ দিয়ে যত কথা বেরোয়, তা কি বিশ্বাস করতে আছে?

রাত্রি প্রায় দশটার সময় আমরা তেতলা থেকে নীচে নেমে এলুম। আমাদের ঘরে ঢুকে দেখি, প্রদীপ জ্বলছে আর রসিয়ার মা আমাদের খাটের পাশে ব'সে ঢুলছে। আমরা ঘরে ঢুকতেই রসিয়া-মা চমকে উঠল, তারপর একটু গা-মোড়া ভেঙে আমাদের কাছে এসে নিম্নস্বরে বললে, তোমরা কাল চ'লে যাচ্ছ তো?

পরিতোষ জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

তোমরা না গেলে তো ও দরজাও খুলবে না, খাবেও না। লোকটা কি শেষে ম'রে যাবে?

পরিতোষ কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে, রাজকুমারী যাতে শুনতে পায় এমন উচ্চকণ্ঠে বললুম, হ্যাঁ, আমরা কাল সকালে চ'লে যাব। তোমার মনিবকে ব'লো যে, আমরা ভিখারী নই। সে-ই আমাদের পথ থেকে সেধে ডেকে নিয়ে এসেছিল। ভদ্রলোকের ছেলেদের ডেকে নিয়ে এসে চাকর দিয়ে এমন ক'রে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেবার কোনও দরকার ছিল না, আমাদের বললেই আমরা চ'লে যেতুম।

রসিয়ার মা জবাব দেবার আর কোনও কথা না পেয়ে গজগজ ক'রে কি বকতে বকতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমরা দুজন খাটের ওপরে উবু হয়ে ব'সে ভাবতে লাগলুম। পরিতোষ কি ভাবছিল জানি না, আমার মনের মধ্যে পুঞ্জে পুঞ্জে অভিমানের মেঘ ঘনিয়ে উঠতে লাগল। রাজকুমারীর প্রতিটি কথা, তার প্রতি অঙ্গভঙ্গী, এতদিন ধ'রে এত প্রতিজ্ঞা ও আশ্বাস, থাকবার জন্যে এত অনুনয় ও অনুরোধ, এত ভালবাসা—এ কি সব অভিনয়! তবুও কেন জানি না, মনে হতে লাগল, এ কখনও হতে পারে না, এ হবে না। এখুনি রাজকুমারী মাঝের দরজা খুলে ঘরের মধ্যে এসে আমাকে বলবে, গোপাল, এ কদিন বড় কষ্ট হয়েছে, না? কিন্তু আমার সমস্ত অনুমান ব্যর্থ ক'রে ও ঘরের ঘড়ি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে যেতে লাগল। শেষকালে পরিতোষ আমাকে ধাক্কা দিয়ে বললে, শুয়ে পড়, মিছে রাত জেগে কি হবে?

পরিতোষ শুয়ে পড়ল। আমিও খাট থেকে নেমে প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লুম।

শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু ঘুম কোথায়! অভিমানক্ষুব্ধ হৃদয় নিঙড়ে নিঙড়ে অশ্রুধারা গ'লে পড়তে লাগল বালিশের ওপর। তবু আশ্চর্য মানুষের মন! ওরই মধ্যে আশাকুহকিনী সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করলে, কোনও ভয় নেই, এত বড় বিশাল পৃথিবীর মধ্যে কোথাও কোনও না কোনও জায়গায় একদিন না একদিন বন্ধুর দেখা পাবেই পাবে, এই ক্ষতবিক্ষত অন্তরের সমস্ত সন্তাপ সে জুড়িয়ে দেবে।

হায়! তার দেখা কি কখনও পাব?

কাঁদতে কাঁদতে কোন্ সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম তা জানতেও পারি নি। ভোর হ'তে না হ'তে পরিতোষ ঠেলে তুলে দিলে। মুখ ধুয়ে আমরা নিজেদের কাপড়চোপড়গুলো পুঁটলি ক'রে বেঁধে নিলুম। রাজকুমারী আমাদের একজোড়া ক'রে ধুতি আর একখানা ক'রে টুইলের শার্ট কিনে দিয়েছিল। সেগুলোকে বিছানার ওপর রেখে দিয়ে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

তখন ভাড়াটেরা অথবা রসিয়ার মা কেউ ঘুম থেকে ওঠে নি। আমরা সোজা চ'লে যাচ্ছিলুম সদর-দরজার দিকে। যেতে যেতে দেখলুম, রাজকুমারীর

দরজা তেমনিই বন্ধ রয়েছে। চলতে চলতে হঠাৎ পরিতোষ ফিরে গিয়ে রাজকুমারীর দরজার চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে আমাকে বললে, যাবার আগে একটা প্রণাম ক'রে চল্।

আমি আর আপত্তি না ক'রে হাঁটু গেড়ে রাজকুমারীর ঘরের চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলুম। আমার চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল ঝরঝর ক'রে সেই চৌকাঠের ওপর ঝ'রে পড়ল। তারপরে উঠে নিঃশব্দে সদর-দরজা খুলে দুই বন্ধুতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

আজও কতদিন স্বপ্নে দেখি, রাজকুমারীর দরজা তেমনই বন্ধ রয়েছে আর তার চৌকাঠের ওপর আমার সেই অশ্রুজল টলটল করছে।

রাস্তায় তো বেরিয়ে পড়া গেল, কিন্তু যাই কোথায়? এতদিন পরে অতি দুঃখের দিনের বন্ধু গিরিধারীর কথা মনে পড়ল। দু-তিন ঘণ্টা এদিক সেদিক ঘুরে বেলা দশটা নাগাদ গিরিধারীর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। শুনলুম, সে বাড়িতে নেই, কে একজন ধনী মক্কেলকে আনতে ভোরবেলাতেই মোগলকা-সরাই চ'লে গিয়েছে, ফিরতে তিনটে চারটে বেজে যাবে।

সেখান থেকে বেরিয়ে গঙ্গাস্নান ক'রে একটা ময়রার দোকানে ঢুকে কিছু খেয়ে আবার গিরিধারীর বাড়িতে এসে ধুতিগুলো শুকোতে দিয়ে শুয়ে পড়লুম।

বেলা প্রায় চারটে নাগাদ গিরিধারী এসে হাজির হ'ল। সে তো এতদিন পরে আমাদের দেখে একেবারে অবাক! বললে, আমি মনে করলুম, তোরা কলকাতায় ফিরিয়ে গিয়েছিস; ভাবলুম, কি ভালই হ'ল, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়ে গেল।

আমরা গিরিধারীকে রাজকুমারীর কথা বলতেই সে চমকে উঠে বললে, ওরে বাবা! সেটা তো ডাইনী আছে রে! প্রাণ নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এসেছিস, তোদের ভাগ্য ভাল আছে। বাবা বিশ্বনাথ রক্ষা করিয়েছেন। জয় বাবা বিশ্বনাথ!

আমরা বললুম, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে দাদা, এবার আমাদের একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দাও।

গিরিধারী বললে, মুন্সী মাধোলালের দপ্তরে তোদের কাজ তো একরকম

ঠিকই হইয়েছিল সব, তোরাই কোথা গায়েব হোইয়ে গেলি তো হামি কি করবে বল্ ?

গিরিধারী আরও বললে, আজই সন্ধ্যের সময় এক বড়লোকের পরিবারবর্গকে নিয়ে তাকে 'বিন্দ্রাবন' যেতে হচ্ছে। দিল্লী আগ্রা সফর ক'রে কাশীতে ফিরে আসতে অন্তত পনেরো বিশ দিন লাগবে।

এ কথার আর কি উত্তর দেব। হয়তো আমাদের মুখ-চোখের করুণ অবস্থা দেখে গিরিধারীর অন্তরে দয়া হ'ল। সে আশ্বাস দিয়ে বললে, এ কটা দিন কোন রকমে কাটিয়ে দে, কাশীতে ফিরে হামি তোদের একটা না একটা ব্যবস্থা করিয়েই দেব, জয় বাবা বিশ্বনাথ !

নিরাশার ঘন অন্ধকারে একটুখানি আশার আলো পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। তাকে বললুম, পনেরো-বিশ দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে দাদা, আমাদের কাছে যে কয়েকটা টাকা আছে, তাতে একবেলা খেয়ে কোন রকমে কাটিয়ে দেব। শুধু রাতে যাতে এখানে শুতে পারি, তার একটু ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাও।

আমাদের কথা শুনে গিরিধারী হেসে বললে, এখানে শুবি তার আবার ব্যবস্থা কি করব রে ! এ তো তোদের নিজেরই বাড়ি আছে, বেপরোয়া শুয়ে পড়বি।

গিরিধারী তখুনি চ'লে গেল। বাজারে তার কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে। দেখলুম, সে বেশ খুশিই আছে। পুরোনো মালদার যজমানের গিন্নী বউ সব এসেছে, তাদের নিয়ে সফর করতে হবে, নগদে সোনাদানায় বেশ মোটা রকমের কিছু আশা আছে।

আমরা সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে বিশ্বনাথের পুজো দেখে বাজার থেকে কচৌড়ি-পুরি মেরে রাত্রি প্রায় নটার সময় গিরিধারীর বাড়িতে ফিরে এলুম। একটা ঠাকুরদালানের মতন জায়গা, থিলেনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে তেরপলের পর্দা দেওয়া—শীত আটকাবার জন্যে, খান দশ-পনেরো দড়ির খাটিয়া প'ড়ে আছে পাশাপাশি, বাকি জায়গাটা ফাঁকা। আমাদের পুঁটলিটাকে দু ভাগ ক'রে দুটো বালিশ ক'রে নিয়ে দুজনে দুটো খাটে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া গেল। কিন্তু ঘুম আর কিছুতেই আসে না। প্রথমত খাটলী একেবারে উপবাসী খটমলে ভরা, তার ওপরে মাসখানেক ধ'রে নিশ্চিন্ত আরামে

লেপ-চাপা দিয়ে গদিতে শুয়ে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল খারাপ। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের ঠেলায় বেনের পুঁটুলির মতন গড়াতে আরম্ভ করেছি, এমন সময় হৈ-হৈ ক'রে গিরিধারীদের একজন ছড়িদার বোধ হয় জন-পঞ্চাশেক বেহারী যাত্রী নিয়ে এসে হাজির হ'ল। ছড়িদার আমাদের ঠেলে তুলে দিয়ে বললে, কে তোমরা? বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

বললুম, আমরা গিরিধারী পাণ্ডার যজমান।

কিন্তু ছড়িদার বেটা কোনও কথাই শুনতে চায় না। তার সঙ্গে আরও তিন-চারজন স্ত্রী পুরুষ মিলে চীৎকার করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। প্রায় আধঘণ্টা-টাক চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি চলবার পর তারা আমাদের একরকম টেনে সেই দালান থেকে উঠোনে নামিয়ে দিয়ে ঝপ্‌ঝপ্‌ ক'রে তেরপলের পর্দাগুলো ফেলে গালগল্প শুরু ক'রে দিলে।

এইটুকু বয়সের মধ্যে আমার জীবনে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতাই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শীতকালের শেষরাত্রে পশ্চিমের মতন জায়গায় একেবারে আচ্ছাদনহীন আকাশের তলায় ব'সে রাত্রিযাপন এই প্রথম। সে যে কি অভিজ্ঞতা, তা শীতকাতর কলিকাতাবাসী ছাড়া অন্যের পক্ষে বোঝা হয়তো কিছু কঠিন হবে। পরিতোষ আমারই মতন শীতকাতর তো ছিলই, তার ওপর সে ছিল অস্বাভাবিক রকমের ঘুমকাতর।

কি আর করব! উঠোনের একধারে মাথা মুড়ি দিয়ে দুজনে থেবড়ে বসলুম। ঠাণ্ডায় একেবারে জ'মে যাওয়ার অবস্থা, ঘণ্টাখানেক সেইভাবে ব'সে থাকতে থাকতে পরিতোষের কানে এমন যন্ত্রণা শুরু হ'ল যে, সে ছোট ছেলের মতন চেঁচিয়ে কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলে। ঘরের মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট জন স্ত্রী পুরুষ বাতি জেলে ব'সে শুয়ে তামাক খাচ্ছে আর সশব্দে গল্পগুজব করছে, আর বাইরে দুটো লোক সেই শীতে ব'সে রয়েছে—তাদের মধ্যে একজন কানের যন্ত্রণায় তারস্বরে চীৎকার করছে, কিন্তু একজনও বাইরে এসে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না যে, তোমাদের কি হয়েছে?

যা হোক, কোনও রকমে কালরাত্রি প্রভাত হ'ল। গিরিধারীর বাড়ি ছেড়ে আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম। পরিতোষের কানের যন্ত্রণা একটু কমার সঙ্গে সঙ্গে আমার শুরু হ'ল দাঁতের যন্ত্রণা। রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় একটা চায়ের দোকান দেখে দুজনে দু কাপ চা খেয়ে আবার ঘুরতে

লাগলুম। কোতোয়ালির কাছে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকান দেখে ঢুকে পড়া গেল। ডাক্তার বাঙালী, বয়সও বেশি নয়। আমাদের রোগের অবস্থা ও কারণ শুনে ভেবে-চিন্তে এক ড্রাম ওষুধ দিলেন, দাম দু-আনা। সারাদিনে তিনবার ক'রে খেতে হবে, দুজনের একই ওষুধ।

হোমিওপ্যাথি, তুমি ধন্য! দু-আনার মধ্যে ডাক্তারের ফী ও ওষুধের দাম হয়ে গেল। ঐ সঙ্গে পথ্যের ব্যবস্থাটাও যদি ক'রে দিতে পার, তা হ'লে দশ বছরের মধ্যেই ভারতের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ ও ইস্কুলকে পাততাড়ি গুটিয়ে Quit India করতে হবে।

এক ফোঁটা ক'রে ওষুধ সেইখানেই খেয়ে আধঘণ্টা-টাক ব'সে থেকে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম। হোমিওপ্যাথিকে বিশ্বাস না থাকলেও সত্যি কথা বলতে কি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমার দাঁতের সেই অসহ্য যন্ত্রণা একেবারে ক'মে গেল। পরিতোষও বললে, তার কানের যন্ত্রণা অনেক কম পড়েছে।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ। রাত্রে কোথায় থাকব ঠিক নেই, ভোজনং যত্র-তত্র তো কদিন থেকেই শুরু হয়েছে। অথচ চার-পাঁচ দিন আগেই এই সব রাস্তায় কি নিশ্চিন্ত মনেই ঘুরে বেড়িয়েছি! পুরুষের ভাগ্য ও নারীর চরিত্র যে দেবতাও জানতে পারে না, এ সত্য আমাদের অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু নারীচরিত্রের সঙ্গে পুরুষের ভাগ্য যে কি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত, সেই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রে ভাগ্যবিধাতার পায়ে মনে মনে গড় করতে করতে রাজঘাট ইষ্টিশানে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল।

ইষ্টিশানে ব'সে ব'সে দুজনে পরামর্শ ক'রে ঠিক করা গেল, গিরিধারী যত-দিন না ফিরে আসে, ততদিন কাশীর বাইরে কোনও একটা ছোট শহরে গিয়ে আত্মগোপন করা যাক। সেখানে কোনও ধর্মশালায় একটি ঘরে থাকব, নিজেরাই রান্না ক'রে খাব। পনেরো-বিশ দিনে তাতে পাঁচ টাকার বেশি খরচ হবে না। বাড়ির গ্যাঁড়া-মারা টাকার দশটি টাকা তখনও অবশিষ্ট ছিল, তার ওপরে জয়া-গিন্নীর কুড়ি টাকা—একুনে ত্রিশটি টাকা তখনও আমাদের হাতে মজুত। এও ঠিক হ'ল, মাস-ছয়েক কোনও রকমে কাটাতে পারলে, ততদিনে জয়া-গিন্নী ফিরে আসবে, তখন আর কোনও ভাবনা থাকবে না। বড়লোক না হতে পারলেও সুখে খেয়ে-দেয়ে দুজনে কাশীতে কাটিয়ে দিতে

পারা যাবে। এই ঠিক ক'রে কাশীর কাছাকাছি একটা স্টেশনের টিকিট কেটে সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লুম।

বেলা প্রায় বারোটার সময় আমরা এক নতুন জায়গায় এসে পৌছলুম। ছোট্ট জনবিরল শহর, একদিন কিন্তু সে স্থান জনবহুল ছিল। চওড়া মাটির রাস্তা, দু-পাশে বড় বড় ভাঙা বাড়ি অতীত সমৃদ্ধের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। ইষ্টিশানের একটু দূরেই প্রকাণ্ড ধর্মশালা, রাজবাড়ির মতন ফটক, বোধ হয় তিনি শতাব্দী আগে তৈরি হয়েছিল। অসংখ্য ঘর, তার অধিকাংশই ভাঙা। উঠোনময় দেড় মানুষ সমান জঙ্গল হয়ে আছে। ধর্মশালার জীর্ণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে তার রক্ষকের চেহারাও তেমনই। তারা পুরুষানুক্রমে এই ধর্মশালা রক্ষা ক'রে আসছে, বছরে দশ টাকা মাইনে পেয়ে। আমরা পনেরো-বিশ দিন থাকতে চাই শুনে সে দার্শনিকের হাসি হেসে বললে, সারি জিন্দিগী এখানে থাকতে পার, কেউ তোমাদের মানা করবে না। ফটকের পাশেই তার থাকবার ঘরের সঙ্গে লাগা একটা ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললে, এই ঘরে থেকে যাও।

ঘরের মেঝে মাটির। লোকটা দুটো খাটিয়া এনে বললে, মাটিতে শুয়ো না। বিচ্ছুতে কেটে দিলে বড় তকলিফ হবে।

খাটিয়ার ভাড়া কত লাগবে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, যা খুশি দিও, তোমাদের অবস্থা তো আমারই মতন দেখছি।

বাজার থেকে চাল, ডাল, কাঠ, নুন, মসলা, ঘি, পেঁয়াজ, আলু, হাঁড়ি, সরা কিনে নিয়ে এসে খিচুড়ি চড়িয়ে দেওয়া গেল। বোধ হয় সর্বসমেত বারোটা পয়সা খরচ হয়েছিল। চারদিন বাদে চাল-ডাল পেটে পড়ায় মহাপ্রাণী একটু ঠাণ্ডা হলেন। বেলা প্রায় পাঁচটার সময় সেই যে শুয়ে পড়লুম, ঘুম ভাঙল পরদিন সকালবেলায়।

ঘুম থেকে উঠে সরাইয়ের কুয়ো থেকে নিজেরাই জল তুলে স্নান ক'রে এক এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেয়ে ঠিক করলুম, জায়গাটা একটু ঘুরে ফিরে দেখে দুপুরবেলা ভাত আর মাংস রাঁধা যাবে। আমাদের কাছে তালা ছিল না। কাজেই নিজেদের সম্বল পুঁটুলিটি বগলদাবা ক'রে বেরিয়ে পড়া গেল।

অতি দরিদ্র দেশ। রাস্তার দু-ধারে অধিকাংশ বাড়িই একতলা। মাঝে

মাঝে এক-একখানা বড় বাড়ি দেখা যায় বটে, কিন্তু সেগুলির অবস্থা আরও জীর্ণ, 'কোনমতে আছে পরাণ ধরিয়া'। রাস্তায় প্রায় এক হাঁটু ক'রে ধুলো, একখানা একা গেলে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়। মাঝে মাঝে এক-আধখানা আস্ত বাড়ি দেখা যায় বটে, কিন্তু সে খুবই কম। রাস্তায় ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছে, ধূলিধূসরিত তাদের দেহ, দেখে মনে হয়, সাত জন্মে স্নান করে না, দেহের বসনও তেমনই ময়লা ও শতচ্ছিন্ন। কিন্তু তবুও তারা সুস্থ এবং পুষ্ট।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা চওড়া ও অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার রাস্তায় এসে পৌঁছলুম। পরামর্শ করতে লাগলুম, কাশীতে চাকরি করলেও এখানেই একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে থাকা যাবে। এখানে ভাল খাসীর মাংসের সের চোদ্দ পয়সা। সকালবেলা চার পয়সার জিলিপি খেয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করা গেছে। ধরাতলে এমন স্বর্গও আছে, আমাদের কল্পনার অতীত ছিল।

চলতে চলতে রাস্তার ধারে এক জায়গায় দেখলুম, একটা দড়ির খাটিয়ার ওপরে আচিট্‌ ময়লা একখানা ভিজে ন্যাকড়া পেতে এক অতি বৃদ্ধা তার ওপরে ঘুঁটের মতন বড় বড় বড়ি দিচ্ছে।

দাঁড়িয়ে গেলুম মজা দেখতে। বুড়ীর যেমন চেহারা, তেমনই ময়লা কাপড় আর তার বড়ির রঙও তেমনই, কিন্তু কি তৃপ্তিদায়ক গন্ধ বেরুচ্ছিল সেই বড়ি থেকে, তা কি বলব! আমরা দাঁড়িয়ে বড়ি দেওয়া দেখছি আর আমাদের দেশের বড়ির সঙ্গে সেই বড়ির তুলনামূলক সমালোচনা করছি, এমন সময় বৃদ্ধা ঘাড় তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দেখে গজগজ ক'রে কি বকতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

বুড়ী বড়ি দিচ্ছে আর বকবক করছে, আমরা তখনও দাঁড়িয়ে আছি দেখে এবার সে খাটিয়া থেকে নেমে এসে চীৎকার ক'রে আমাদের গালাগালি দিতে আরম্ভ করলে। আমরা তো অবাক! কি হয়েছে, আমরা কি অপরাধ করেছি, কিছুই ঠিক করতে না পেরে যতই তাকে প্রশ্ন করি, ততই সে ক্রুদ্ধ হয়ে হাত নেড়ে অঙ্গভঙ্গী ক'রে গালাগালি দিতে থাকে। দেখতে দেখতে সেই জনবিরল রাস্তায় দু-চারজন লোকও দাঁড়াতে আরম্ভ করলে। কোথা থেকে একপাল ছেলে এসে জুটল। তারা বুড়ীকে কি একটা কথা বলামাত্র সে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে তাদের মারতে ছুটল।

বয়স্ক যারা, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের বললে, যাও বাবু, নিজেদের কাজে যাও, ও মাগীর মাথা খারাপ।

আমরা তো একেবারে হতভম্ব!

এই রকম হাঙ্গামা চলেছে, এমন সময় দূরে হাততালি ও চীৎকার শুনে আমরা ফিরে দেখি, সেখান থেকে একটু দূরে রাস্তার বিপরীত দিকের একটা একতলার ছাদে কতকগুলো লোক ঝুঁকে আমাদের দেখছে আর একজন জোরে হাততালি দিচ্ছে। আমরা তাদের দিকে ফিরতেই সেই লোকটা হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকতে লাগল। আমরা বুড়ীকে ছেড়ে সেই বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। লোকটা ওপর থেকে হেসে হেসে বললে, কি, বাংগালী তো?

আমরা তো অবাক! জিজ্ঞাসা করলুম, আমাদের বলছেন?

হাঁ হাঁ, তোমাদেরই বলছি। তোমরা বাংগালী তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তো সোজ্‌হা এই সিঁড়্‌হি দিয়ে উপ্‌রে চ'লে এস।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখলুম, বাঁ-পাশে একটা মইয়ের মতন খাড়া সিঁড়ি। ওপর থেকে একটা মোটা দড়ি ঝুলছে, সেটার ওপর ভর না করলে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়।

সিঁড়ি বেয়ে তো দুজনে কোন রকমে হেলে-দুলে ওপরে ওঠা গেল। একটা বড় ছাদ। রাস্তার ধারের পাঁচিল ঘেঁষে একখানা খাট পাতা, তার ওপরে সুন্দর কাজ করা একখানা শতরঞ্চির ওপরে ব'সে রয়েছে সেই ব্যক্তি, যে আমাদের ওপরে আসতে আহ্বান করেছিল। তার মাথায় একটা ছিটের রামপুরী টুপি, যার নাম আজ গান্ধী-টুপী। গায়ে ঢিলেহাতা মলমলের পাঞ্জাবির ওপরে পট্টুর দিশী ওয়েস্ট-কোট, বাংলা দেশে যার নাম আজ জওহর-কোট। লুঙ্গি পরা, কিন্তু বাঁ পা-টার প্রায় কুঁচকি অবধি তুলে রাখা হয়েছে। পা-টা এমন শুকনো ও দোমড়ানো যে, দেখে মনে হয়, যেন তার ওপর দিয়ে মিলিটারি লরি চ'লে গিয়েছে—ছুঁচ সুতো দিয়ে একটা সুতির ফতুয়া সেলাই ক'রে চলেছে বনবন ক'রে। হাত চলার সঙ্গে সঙ্গে অনর্গল ব'কে চলেছে। কথাবার্তার ধরন শুনলেই মনে হয়, বেশ মজলিসী লোক। বাঁ পাশে মাথা-সমান উঁচু একটা বাঁশের লাঠি প'ড়ে রয়েছে। শুকিয়ে হরতুকীর মতন চেহারা হয়ে গেলেও

তার বয়স ত্রিশের চাইতে বেশি ব'লে মনে হয় না। সে যে একদিন সুপুরুষ ছিল, তার চিহ্নও কিছু অবশিষ্ট রয়েছে সেই চেহারায়। এক পাশে একরাশ বিড়ি ও একটা দেশলাই। খাটের ওপরে ও নীচে নানা বয়সের বোধ হয় পনেরো-বিশ জন লোক, কেউ ব'সে, কেউ বা দাঁড়িয়ে।

আমরা ওপরে ওঠবার কিছুক্ষণ পরে একবার আমাদের দিকে বেশ হাসি হাসি মুখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বিশুদ্ধ বাংলায় সে জিজ্ঞাসা করলে, কি বাবা ; ঘর্‌সে ছুট্‌কেছো তো ? কোথায় ঘর ?

কলকাতায়।

ঘর্‌সে না ছুট্‌কে দুই বন্ধুতে সল্লা ক'রে যদি একটা তেজারৎ করতে তো কত ভাল হ'তো ?

এই মন্তব্য প্রকাশ ক'রে উপস্থিত বন্ধুদের উদ্দেশ্যে চোস্ত উর্দুতে সে বললে, এই হচ্ছে বাংগালীর রীত। কিছুতেই খুশি নয়। ঘরে ব'সে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছিল, মাথায় যে কি ভূত সওয়ার হ'ল, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে।

জিজ্ঞাসা করলে, নাম কি ?

নাম বললুম। সে বললে, ব'সো, দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবে ?

আমরা খাটের এক পাশে বসলুম। এতক্ষণে চারপাশের লোকদের ভাল ক'রে দেখবার অবসর হ'ল। দেখলুম, দু-একজন হিন্দু ছাড়া সকলেই মুসলমান। যার যখন প্রয়োজন হচ্ছে, সে উঠে এসে একটা বিড়ি ধরিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসছে।

গল্পগুজব চলেছে। তার কিছু বুঝতে পারছি, কিছু পারছি না। মধ্যে মধ্যে আমাদের সম্বন্ধেও কেউ কেউ মন্তব্য করছে। আমাদের আহ্বানকারী ঘাড় নীচু ক'রে বনবন ক'রে সেলাই ক'রে চলেছে, মাঝে মাঝে মুখ তুলে খানিকটা গড়গড় ক'রে কথা ব'লে আবার ঘাড় নীচু ক'রে সেলাইয়ে মন দিচ্ছে। আমরা চুপ ক'রে ব'সে আছি উজবুগের মতন। এমন সময়ে সেই সোজা সিঁড়ি বেয়ে আসরে একটি ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মাথায় জরিদার টুপি, কিন্তু সে জরি প্রায় কালো হয়ে এসেছে। দামী কিন্তু শতছিন্ন শেরওয়ানী অঙ্গে, তার ওপরে বোধ হয় পাঁচশো বছরের পুরোনো একটা পাট করা জামেয়ার, তার অবস্থাও তেমনই।

লোকটি আসরে উপস্থিত হওয়া-মাত্র সকলেই উঠে তাকে কুর্নিশ করলে। আমাদের আহ্বানকারী তাকে দেখে সেলাম ক'রে বললে, তশ্‌রিফ রাখিয়ে নবাব সাহেব।

তারপরে উর্দুতে দুজনের বাক্যালাপ শুরু হ'ল, তার কিছু বুঝলুম কিছু বুঝলুম না। নবাব সাহেব বললেন, ছোটে সাহেবের দুশ্‌মনের তবিয়ত দিন-বদিন যে খারাপই হতে চলেছে তা একবার দেহ্‌লীতে গিয়ে হকিম সাহেবকে দেখালে হয় না? বলেন তো, বাবুজীর কাছে প্রস্তাব করি।

ছোটে সাহেব সেলাইয়ের ফোঁড় তুলতে তুলতে মিষ্টি হেসে জবাব দিলে, নবাব সাহেব, আপনার বহুৎ মেহেরবানি, খোদা আপনার মঙ্গল করুন। আপনি আমায় ভালবাসেন, তাই এমন প্রস্তাব করছেন, কিন্তু মালাকুল-মওৎ যাকে টেনেছে, কোনও আদমজাদের সাধ্য নেই যে তাকে রক্ষা করে।

ছাদসুদ্ধ লোক সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, খোদা না করে, খোদা না করে ছোটে সাহেব, অ্যায়সা না কহিয়ে—

নবাব সাহেব ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন, তাপ আজকাল কত ডিকরি উঠছে?

ছোটে সাহেব উদাসভাবে বললেন, বগলে আর বাত্তি দিই না। সারাদিনই জর থাকে, সন্ধ্যেবেলা খুব বাড়ে, পরমাত্মার নাম করতে করতে শুয়ে পড়ি।

মিনিট দশ-পনেরো আদর-আপ্যায়নের পর নবাব সাহেব বিদায় নিলেন। যতক্ষণ তিনি ছিলেন, ততক্ষণ অন্য লোকগুলো সব চুপ ক'রে ছিল। তিনি চ'লে যেতেই আবার সকলে সমস্বরে কথা বলতে শুরু ক'রে দিলে। তারপরে বিড়ির তাড়া শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলে বিদায় নিয়ে চ'লে গেল।

সকলে চ'লে যাওয়ার পর লোকটি আমাদের বললে, তো শর্মাজী, রায়সাহেব, কি মতলোব? আমাদের বাড়িতে থাকবে?

বললুম, আপনি দয়া ক'রে আশ্রয় দিলেই থাকব।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, আরে, দয়া কিসের! কে কার ওপর দয়া করতে পারে ভাইয়া? আমাদের বাড়িতে কত বাংগালীর ছেলে এসে থাকল। দু-পাঁচ বছর রইল, তাদের ওপরে মায়া প'ড়ে গেল, তারপর একটু সুবিধা কোথাও বুঝলে বা বড়ে সাহেব—আমার

বড় ভাই কিছু গালিমন্দ করলে কি আর স'রে পড়ল। বলছি, তোমরা সে রকম স'রে পড়বে না তো?

পরিতোষ বললে, আমাদের তাড়িয়ে না দিলে কেন চ'লে যাব?

লোকটি আবার হেসে বললে, হামি কিংবা বহেনজী অর্থাৎ দিদিমণি তোমাদের কখনও চ'লে যেতে বলব না। আরে, বহেনজীর পাল্লায় পড়লে তো তোমাদের একেবারে জেহেলখানা হ'য়ে গেল। আর বাবুজী তো দেবতা, সে কখনও কোনও চাকরকেই কিছু বলে না তো তোমরা মেহমান আছ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর সে বললে, আমি তো ভাই, মরীজ আছি, সকালবেলা বিছানা থেকে উঠে এখানে এসে বসি, সারাদিন এমনই কেটে যায়, সন্ধ্যেবেলা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আপনার কি অসুখ?

একটু ম্লান হেসে বাঁ পা-টা দেখিয়ে দিয়ে সে বললে, এই পায়ের হাড়ে দিক্ হয়েছে।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলুম না। জিজ্ঞাসা করলুম, দিক্ কি?

ছোটে সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বললে, আরে যক্ষ্মা, যক্ষ্মা।

কথাটা যেন কি রকম লাগল। হাড়ে যক্ষ্মা, মাথায় কলেরা, জিভে অর্শ বা হাতে উরুস্তম্ভ এই সব অসামাজিক ব্যামোর রেওয়াজ আমাদের ছেলেবেলায় চলতি ছিল না। বললুম, হাড়ে আবার যক্ষ্মা হয় নাকি?

ছোটে সাহেব বললে, বাবুজী বলেছেন। বাবুজী বড় ডাক্তার, তোমরা ছেলেমানুষ, কিছুই জান না। সারাদিন যন্ত্রণার শেষ নেই, জ্বর লেগেই আছে। সন্‌ঝের সময় তাপ বাড়তে থাকে, সে সময় কেউ কাছে থাকে না। দিদিমণি তো সারা দিন ও রাত বাড়ির কাজ নিয়েই আছে। তবু বেচারা রোজ সে সময় এসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। তোমরা থাকলে সে সময় একটু কাছে ব'সে গল্পসল্প করলে ভাল লাগবে।

ছোটে সাহেবের কথার কি জবাব দোব তাই ভাবছি, এমন সময় একটা কাঁসার গেলাস হাতে নিয়ে ওই-দেশীয়া এক বৃদ্ধা ছাতে এসে হাজির হ'ল। বৃদ্ধা একটু এগিয়ে এসে তার নিজের ভাষায় বললে, কি রে ছোটে! কেমন আছিস?

ছোটে সাহেব কোনও কথা না ব'লে সেলাই থামিয়ে তার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে এক ঢোঁকে সবটা খেয়ে গেলাসটা আবার তার হাতে ফিরিয়ে দিলে। বৃদ্ধা গেলাসটা খাটের পায়ার কাছে রেখে সেই ময়লা পায়েই বিছানায় উঠে ব'সে ছোটে সাহেবের পিঠে আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে শুরু ক'রে কি আওড়াতে লাগল, আর ছোটে সাহেব ক্ষিপ্র হস্তে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলতে থাকল।

কিছুক্ষণ এই ভাবে নিঃশব্দে কাটবার পর বৃদ্ধা বললে, দিন ও রাত কি সেলাই করিস বল্ দিকিন! তোর বাপ কি তোকে জামা তৈরি ক'রে দেয় না, না তার পয়সার অভাব আছে?

ছোটে সাহেব হেসে হেসে জবাব দিলে, আহিয়া, আমি মরলে এই জামাটা পরিয়ে শ্মশানে পাঠিয়ে দিস। খবরদার, বাজারের কেনা জামা-টামা দিস নি যেন।

দেখতে দেখতে বৃদ্ধার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল, তারপরে নিঃশব্দে তার দুই তোবড়ানো গাল বেয়ে চোখের জল ঝ'রে পড়তে লাগল। ছোটে সাহেব সে দৃশ্য দেখতে পেলে না, কারণ বৃদ্ধা ব'সে ছিল তার পিঠের কাছে।

সেলাইয়ের আরও কয়েকটা ফোঁড় দিয়ে ছোটে সাহেব আমাদের বাংলায় বললে, এই যে মেয়েমানুষটা দেখছ, এ আমাদের ভাই বোন সবাইকে মানুষ করেছে। এ আমাকে মায়ের চাইতে বেশি ভালবাসে।

এতক্ষণে বৃদ্ধা আমাদের দিকে ফিরে ভাল ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, কারা এরা?

ছোটে সাহেব হাসতে হাসতে বললে, আরে দেখে বুঝতে পারছিস না, এরা বাড়ি থেকে ভেগেছে। এই রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে দেখে ডেকে নিয়ে এসেছি। এরা এখানেই থাকবে।

বৃদ্ধা কিছুই মন্তব্য করলে না। ছোটে সাহেব আরও কিছুক্ষণ সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে বললে, আহিয়া, এদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভাল ঘরের ছেলে এরা, এরা পালাবে না।

বৃদ্ধা এবার নিজের মনে খানিকক্ষণ কি গজ-গজ ক'রে ব'কে বললে, আরে দূর্, তুইও না যেমন, ও কারুকে বিশ্বাস নেই। লল্হিত ও সুদনের মতন ছেলে কটা হয়!

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

পদচিহ্ন

পনেরো

শত যজ্ঞের গ্রাম নবগ্রাম। ঢাকের শব্দে আকাশ পর্য্যন্ত যেন চমকে উঠছে। তার সঙ্গে ঢোল। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্ম্মরাজপূজা। পণ্ডিতেরা ব'লে থাকেন, বুদ্ধদেবের পূজা এটা। পঞ্জিকাতেও লেখে বুদ্ধপূর্ণিমা। এই পূজা এবং ব্রত পুরোপুরি সংস্কারবিহীন পতিতদের মধ্যে আবদ্ধ এ অঞ্চলে। জেলে, কৈবর্ত্ত, বাগদী, বাউড়ী, হাড়ী, ডোম এরাই এ পূজায় মাতামাতি করে। জেলেরাই ধর্ম্মরাজের 'দেবাংশী' অর্থাৎ পূজক। ভক্তদের মধ্যে বাউড়ীদের সংখ্যা বেশি। গ্রামের প্রান্তে জেলে ও বাউড়ী-পাড়ার পাশে ধর্ম্মরাজের করোগেট-টিনে ছাওয়া মাটির ঘর; ঘরের বারান্দায় একটা প্রকাণ্ড কাঠের ঘোড়া, ডুলির মতই একটা দোলা সম্বৎসর প'ড়ে থাকে; এই পূজোর সময় সেগুলিকে ধুয়ে মুছে যথাসম্ভব সাজানো হয়েছে, ধর্ম্মরাজের ঘরখানাকেও ঝাড়া হয়েছে, লাল মাটি দিয়ে নিকানো হয়েছে, সামনের আঙিনাটা চেঁচে-ছুলে নিকিয়ে তকতকে ক'রে তুলেছে, তার উপর বাঁশ পুঁতে খাটানো হয়েছে একখানা শামিয়ানা। শামিয়ানার তলায় পঁচিশখানা ঢাক বাজছে। রাঢ়ের ঢাক, প্রকাণ্ড তার আকার, তার উপরে কাক এবং বকের কর্কশ কালো ও চকচকে সাদা পালকে বাঁধা দেড় হাত দু হাত উঁচু একটা ফুস্কো ঝাঁটি, ঝাঁটিটার মাথায় অধোমুখী একগুচ্ছি চামর; দু হাতের বাঁখারির কাঠি যখন গুরগুর গুরগুর শব্দ তুলে ক্ষিপ্রগতিতে পড়ে ঢাকের উপর, তখন দূর থেকে শুনে মনে হয়, মেঘ ডাকছে; কাছে যারা থাকে তাদের বুকের মধ্যে ওই ধ্বনির প্রতিধ্বনি বাজতে থাকে, স্নায়ু-শিরাতে স্পন্দন তোলে; সঙ্গে সঙ্গে নাচে ঢাকের মাথায় ফুস্কো ঝাঁটিটার চামর এবং পালক। এসব ঢাক সাধারণ ঢাক নয়, অর্থাৎ বারো মাস পালেপার্ব্বণে যেসব ঢাকী অল্পস্বল্প মজুরিতে ট্যাং-ট্যাং ক'রে বাজনা বাজিয়ে নিয়ম রক্ষা করে, তাদের প্যানপ্যানে ছোট ঢাক নয়। এসব ঢাক যেমন প্রকাণ্ড তেমনই বাহার; ঢাকটার কাঠের খোলটা রঙিন ছিট দিয়ে মোড়া; ঢাকটার যে জায়গাটা পিঠের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে সেখানটায় রঙিন ছিটের উপরে বেশ চকচকে গোল চামড়া দেওয়া দু পাশের বেড়ের উপর সাদা ধবধবে চাদর দিয়ে পরিপাটী ক'রে মোড়া। বায়েন অর্থাৎ বাদ্যকরেরাও ওস্তাদ বাজিয়ে। সাজে পোশাকে যথাসম্ভব নিজেদের সম্ভ্রান্ত ক'রে এরা বায়নায় বার হয়। কাঁধে মখমলের কোরা চাদর, পরনে পরিষ্কার ধুতি, গলায় তুলসীর মালা, তেল-চকচকে মাথা, সবল সুস্থ দেহ, লম্বা-চওড়া চেহারা; মুখে ভদ্রজনোচিত ভাষা এই বায়েনের দলকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যায় না। পঁচিশখানা ঢাকের বাজনায় গ্রামের আকাশ চমকে উঠছে। আশ-পাশের গাছ থেকে পাখীরা ভয়ার্ত্ত কলরব ক'রে উড়ে গিয়েছে। আজ ত্রহস্পর্শ—দশমী

একাদশী এবং দ্বাদশী একসঙ্গে। কাল ত্রয়োদশী পরশু চতুর্দ্দশী এবং পূর্ণিমা একই সঙ্গে। আজ থেকে পূজার আরম্ভ। আজ সন্ধ্যায় ভক্তেরা মুক্তিস্নান ক'রে উত্তরী পরবে গলায়—মালার মত দু ফালি সাদা সুতার উত্তরী। ওরা বলে 'উতুরী'। ঘোড়াকে স্নান করানো হবে, গলায় মালা দেওয়া হবে। আগামী কাল সংযম। পরশু-দিন পূর্ণিমা তিথিতে ভক্তেরা ফুলের মালা প'রে, ফুলের মালার বেড় দেওয়া পূর্ণ ঘট মাথায় নিয়ে দলবদ্ধভাবে নাচতে নাচতে গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে ধর্ম্মতলায় ফিরবে, তারপর হবে বলিদান এবং হোম। বুদ্ধদেব অহিংসব্রতী ছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মরাজ হয়ে তাঁকে বলি গ্রহণ করতে হয়। হোমও হয় হিন্দুমতে। ডোমেরা ধর্ম্মরাজের নিত্য-পূজক হ'লেও এই পূজাটিতে পৌরোহিত্য করে ব্রাহ্মণে। দেবতা গরিব অস্পৃশ্যদের হ'লেও এর সেবায়েৎ গ্রামের জমিদার; জমিদারদের মধ্যে মিঞাসাহেবরা ছাড়া প্রায়ই উচ্চবর্ণের হিন্দু; অস্পৃশ্য জাতির জমিদার বাংলা দেশে কেউ নাই। এখানকার জমিদারেরা তো-বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ। বলি-হোমের সময় জমিদারের নগদী গোমস্তা হাজির থাকে; বলির পাঁঠা, হোমের ঘি, পুরোহিতের দক্ষিণা জমিদারের দেওয়া দেবত্র জমির খাজনা থেকে সরবরাহ হয়। বলির শেষে নগদী পাঁঠাটাকে ছাড়িয়ে পুরুত্ত পূজক দেবাংশী চৌকিদার এদের চারজনকে চারটে 'চরণ'বৃত্তি অর্থাৎ ঠ্যাং দিয়ে ধড়টা জমিদারের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসে। যেখানে জমিদার অনেক শরিকে বিভক্ত, সেখানে ধড়টাকে কেটে কুচিয়ে মাঝারি আলুর আকার থেকে ছোট কুমড়োর আকার পর্য্যন্ত দলা পাকিয়ে শরিকদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসে। জমিদারের সরকারী বলি ছাড়াও মানতের বলি আছে; ছাগল, ভেড়া, হাঁস বলি হয়। সবচেয়ে বড় পাঁঠার মাথাটা গোমস্তা নিয়ে বাড়ি চ'লে যায়। ছেত্তাদারের এতে প্রচণ্ড আপত্তি, কেন না সেই সবচেয়ে বড় মাথাটায় হকদার, কিন্তু গোমস্তার বিরুদ্ধে কথা বলবে কে? পুরুষানুক্রমে তারা ক্ষোভ পোষণ ক'রেও আসছে এবং হতাশার হাসি হেসে ব'লেও আসছে, 'বাঘে ধান খেলে তাড়ায় কে?' পূজার এই বলি-হোমের অংশটা ছাড়া কিন্তু বাকি অংশে সাধারণের অবাধ অধিকার। সে অংশটা হ'ল ধর্ম্মরাজের ভক্ত নির্ব্বাচন এবং পূজার সমারোহের দিকটা। ধর্ম্মরাজের উপবাস অস্পৃশ্যদের ঘরে ঘরে; ষোলো বৎসর বয়স হ'লেই ধর্ম্মরাজের উপবাস ওদের করতেই হবে। ধর্ম্মরাজ ছাড়া তরাবে কে? ধর্ম্মরাজ ছাড়া ওদের ত্রাণকর্ত্তা কেউ নাই। কালু ডোম ম'রে বেঁচেছে, তারপর সশরীরে স্বর্গে গিয়েছে। সেও কি যেমন তেমন যাওয়া? কালুকে রাজা বললেন, চল্ কালু, স্বর্গে চল্। চল্ স্বর্গবাস। কালু ব'লে, যাই, যদি পাই মদ মাস। সেই হুকুমই হয়ে গেল ধর্ম্মরাজের কৃপায়। এমন কি মদে-মাসে পূজা দেবারও অধিকার হয়ে গেল। হরিহর বায়েন ছিল, ধুমুল দিয়েছিল সে ধর্ম্মপূজায়। ধর্ম্মপূজায় পূবের সূর্য্যি পশ্চিমে উঠল; সেই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্ত তাকে

শূলে দেওয়ার হুকুম দিলে রাজার মন্ত্রী। শূলে চড়াতে যাওয়ামাত্র স্বর্গ থেকে রথ এসে হরিহর বায়েনকে তুলে নিয়ে গেল। ধর্ম্মের উপোস করলে 'মলে জীয়োয়', 'হারালে পায়', 'ব্যাধি ভাল হয়', 'অভাব দূর হয়', 'আঁধারে চোখ জলে', 'পাথারে ভাসে', 'পাপীর পাপ আগুনের মুখে খড়ের মত পুড়ে ছাই হয়ে যায়', 'পুণ্যবানের পুণ্য সোনার মত পুড়ে খাঁটি হয়', 'ক্ষুধায় অন্ন মেলে', 'তৃষ্ণায় জল মেলে', 'অপুত্রকের পুত্র হয়', 'ধরমের কৃপা হ'লে সকল কাজে সিদ্ধি', 'পরকালে গতি'। ধরম ভিন্ন পাপী তাপী হাড়ী ডোম চণ্ডাল বাউড়ী বায়েনের কেউ নাই; এ জন্মের পাপ খণ্ডন ক'রে পরজন্মে উচ্চকুলে জন্ম দেবেন ধর্ম্মরাজ। এই কারণে ষোলো বৎসর বয়স থেকে ধরমের উপোস করতেই হবে। তবে ভক্ত হওয়া কঠিন কথা। পুণ্যবল চাই। দেবাংশীর অনুমতি চাই। মুক্তিচান ক'রে উতুরী গলায় দেওয়া সোজা কথা নয়। বেতের দণ্ড হাতে নিতে হবে; মড়ার মাথা নিয়ে নাচতে হবে; ফুল খেলতে হবে, গাছের ফুল নয়—আগুনের ফুল; রাশি রাশি জলন্ত আঙার ঢেলে দেবে মন্দিরের সামনে, তার উপর ভক্তরা নাচবে। যে পাপী সে পুড়বে, ঝলসে যাবে। আগে তো আরও কঠিন ছিল, তখন কাটারির উপর, পজালের উপর ভক্তরা শুয়ে থাকত। এখন সেসব পুলিসে উঠিয়ে দিয়েছে। এ ছাড়া আছে 'ভাঁড়াল'। ভক্তরা মাথায় পূর্ণ ঘট নিয়ে পথে বার হবে, ঢাক বাজবে, ধূপের ধোঁয়ায় চারিদিক 'মোহ-মোহ' করবে; তারই মধ্যে মাঝে মাঝে এক-একজনের 'ভর' হবে। সে ভক্ত টলতে থাকবে, চোখ বন্ধ হয়ে যাবে, দাঁতে দাঁত লেগে যাবে, আর হুঙ্কার ছাড়বে, দেবতার আদেশ আসবে তার মুখ দিয়ে। এসব কি যে সে লোকের দ্বারা হয়! পাপী হ'লে, পুণ্যবল না থাকলে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে ম'রে যাবে।

ধর্ম্মরাজের দেবাংশী গিরিধর ধীবর, কপালে একটা ডগডগে সিন্দূরের ফোঁটা কেটে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা প'রে ভাম হয়ে ব'সে আছে দাওয়ার উপর। কালো রঙ, লম্বা-চওড়া দশাশয়ী চেহারা,—তার উপর মাথায় একটা জটা আছে। চোখ দুটো লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। জাতিতে ধীবর, মাছ ধরা পেশা, ভোরবেলা থেকে আরম্ভ ক'রে বেলা চারটে পর্য্যন্ত শীত-গ্রীষ্ম বারো মাস জলে থাকতে হয়; মদ ভিন্ন শরীর সহজ হয় না। ভাত এক বেলা না হ'লে চলে, কিন্তু মদ না হ'লে চলে না। আরও একটা জিনিস—তেল; সারাদিন জলে থাকার পর দেহে যখন রোদ আর বাতাস লাগে তখন চামড়া শুকিয়ে টান হয়ে ওঠে, মনে হয়, কেটে চৌচির হয়ে যাবে; তার উপর জলে শেওলা, পানাড়ী, পানকল তার সঙ্গে আরও কত হরেক রকমের জলের গাছের দলদাম ঠেলে সর্ব্ব শরীরে 'খালুস' লাগে, অর্থাৎ আলকুশী-বিছুটি লাগার মত শরীরে একটা জ্বালাজনক কণ্ডুয়ন ধ'রে যায়। তেল হ'ল তার একমাত্র ওষুধ; সরষের তেলের সঙ্গে কিছু নিমফলের তেল মিশিয়ে সেই তেল ধীবরেরা খুব যত্নের সঙ্গে আরাম ক'রে মাখে। বেচারী

দেবাংশীর আজ দশ-বারো দিন ধ'রে তেল আর মদ দুইই বারণ। শুক্লপক্ষের প্রতিপদের দিন থেকেই দেবাংশীকে সংযম হবিষ্যি করতে হচ্ছে। মদের বদলে গাঁজা চলছে, কিন্তু তেলের আর বিকল্প নাই। দেবাংশীর শরীর থেকে মন পর্য্যন্ত টান হয়ে আছে মরা জানোয়ারের ছাড়িয়ে-নেওয়া শুকনো চামড়ার মত। উপকার করেছে গাঁজায়। তিরিক্ষে মেজাজ নিয়েও সে নির্ব্বাক ভাম হয়ে ব'সে আছে। দশটা কথা বললে একটা উত্তর দেয়, তাও হুঁ, হাঁ, না এই পর্য্যন্ত। তার জন্ত কাজের ক্ষতি কিছু হয় না। সব কাজের বন্দোবস্তের ভার থাকে বেশ ওয়াকিবহাল লোকের উপর। বেনেপাড়ার চন্দ্র গড়াঞী আছে, স্বর্ণকারদের পঞ্চানন আছে, সাহাদের হরিহর আছে। কাগজ পেন্সিল নিয়ে ভক্তদের ফর্দ্দ করছিল চন্দ্র গড়াঞী। আগে থেকে সংখ্যা নিরূপণ না ক'রে রাখলে পরে গণ্ডগোল হয়। যতগুলি ভক্ত ততগুলি উত্তরী চাই, ততগুলি 'ভাঁড়ালের' কলসী চাই, তার দ্বিগুণ সংখ্যক চাই ফুলের মালা; ফুলের মালার একগাছি থাকবে ভক্তের গলায়, একগাছি দিতে হবে ভাঁড়ালের কলসীর গলায়। এ ছাড়া ভক্তদের প্রসাদ দিতে হবে, বেতের দণ্ড দিতে হবে। গ্রামের ইতর-ভদ্রদের কাছে চাঁদা চাইবার সময় বলতে হবে, এতগুলি ভক্ত হয়েছে মশায়। তা চাঁদা না বাড়ালে এসব খরচ আসবে কোথা থেকে?

ভক্ত পুণ্যকামীরা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল সামনের উঠানটায়।

চন্দ্রনাথ লিখছিল; হঠাৎ সে পঞ্চাননের মাথাটা টেনে কানে কানে কি বললে। পঞ্চানন উঠে গেল দেবাংশীর কাছে। দেবাংশীর কানের কাছে মুখ নিয়ে কথাটা বললে। দেবাংশী কিন্তু নড়ল না। পঞ্চানন এবার তার কানের কাছে একটু জোরেই ডাকলে, শুনছ?

দেবাংশী চমকে উঠল, পঞ্চাননের চীৎকার তার কর্ণপটহে গিয়ে লেগেছে।

পঞ্চানন হেসে বললে, আমি। আমি।

পঞ্চানন বাবা!

হ্যাঁ। শোন। একটা কথা।

কথা!

হ্যাঁ।

হতাশভাবে হাত নেড়ে দিয়ে গিরিধর বললে, শুনতে পাচ্ছি না। কানে জল ঢুকেছিল, তার ওপর—। সে হতাশভাবে একবার ঘাড় নেড়ে দিলে।

পঞ্চানন এবার কানের খুব কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কিছু বলতেই গিরিধর খিলখিল ক'রে হেসে উঠল, সমস্ত শরীর এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে বললে, সুড়সুড়ি লাগছে, সুড়সুড়ি লাগছে। না না না। হেই বাবা, তোমার পায়ে পড়ি।

খানিকটা স'রে এসে কানে আঙুল দিয়ে সজোরে নাড়া দিতে আরম্ভ করলে। পঞ্চানন বললে, কি বিপদ! তা হ'লে বলব কি ক'রে?

বল কেনে, এঁটেই (জোরে) বল কেনে।

বার দুয়েক ইতস্তত ক'রে পঞ্চানন স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললে, বলছিলাম, তুমি মনে পড়িয়ে দিতে বলেছিলে। সাতন বাউড়ীরা দুই ভাই ভক্ত হতে এসেছে।

হ্যাঁ। ওরা তো পুরনো ভক্ত গো। তা জোয়ান বটে সাতন। ক বছর হ'ল রে তোর সাতন? সেই তো ছেলেমানুষ থেকে ভক্ত হয়ে আসছিস!

হ্যাঁ। তা অনেক বছর হবে বইকি। আমি আর ছিষ্টিধর (সৃষ্টিধর) দুজনাতে একসঙ্গে উতুরী নিয়েছিলাম। তখন আমি নামপাড়ার বাবুদের বাড়িতে রাখালি করতাম।

পঞ্চানন বললে, তা হ'লে আমি কিন্তু দায়ে খালাস। এর পরে গোলমাল হ'লে তোমাকে সামলাতে হবে। আমরা কিছু জানি না।

এবার চমকে উঠল গিরিধর। গাঁজার নেশায় আচ্ছন্ন চোখ দুটোকে বিস্ফারিত ক'রে পঞ্চাননের দিকে চেয়ে বললে, হুঁ হুঁ। বটে। হুঁ। সেই কেলেপারা ছুঁড়ীটা, সেই কোঁকড়াচুল, টানা চোখ, সেই পরী না কি নাম, সেই ছুঁড়ীটা সাতনের বুন লয়?

হ্যাঁ গো। আর গাঁজা খেয়ো না তুমি। নিজে কথা ব'লে তোমার মনে থাকছে না।

হুঁ হুঁ। মনে পড়েছে। কেটে দাও, সাতনের নাম কেটে দাও। হবে না। উঁহু!

সাতন চমকে উঠল, এতগুলি লোকের সমক্ষে ইঙ্গিতে যে কথাটা হ'ল তাতে অপমানে তার সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধ'রে গেল, ক্ষোভে রাগে মাথার ভিতরে যেন আগুন জ্ব'লে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত বেগে। চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, খবরদার! মুখ সামিলে (সামলে) কথা বল বলছি।

তার চীৎকারে সমস্ত মজলিসের আবহাওয়াটা পাল্টে গেল। সকলেই চমকে উঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে সাতনের দিকে; ঢাকীরা ব'সে ঢাকের উপর কাঠির অতি মৃদু আঘাতে বোল বাজিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল, তারাও চমকে উঠল, বাজনা আলোচনা বন্ধ করলে। দেবাংশীর গাঁজার নেশার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল, চোখ বিস্ফারিত ক'রে সে সাতনের দিকে চাইলে এবার।

চন্দ্র গড়াঞী উঠে দাঁড়াল। ভীষণ ব্যক্তি চন্দ্র গড়াঞী। অস্পৃশ্য পল্লীর প্রতিটি ব্যক্তি তাকে খুব ভাল ক'রে চেনে। লম্বায় প্রায় ছ ফুটের কাছাকাছি, দেখতে রোগা কিন্তু হাত পা যেন লোহা দিয়ে তৈরি। তা ছাড়া তার বুদ্ধি, তার চালচলন, এস

লোকের বুদ্ধির অতীত। জাতিতে গড়াঞী অর্থাৎ কলু; বাড়িতে ঘানি আছে, সে কারবার দেখে চন্দ্র গড়াঞীর স্ত্রী এবং ভগ্নী, সে নিজে করে হরেকরকম কাজ—চাল ধানের কারবার করে, গুড় কাঠ শালপাতার দালালি করে, আর করে এদের মহলে মহাজনি। আরও কাজ করে, সেগুলি খেয়ালের কাজ—ছুতোরের কাজ, ঘরামির কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, মাটির দেওয়ালমিস্ত্রীর কাজ; কামারশালায় ব'সে কামারের কাজও করতে পারে চন্দ্র গড়াঞী। মদ খায়, গাঁজা খায়, সাপ ধরে চন্দ্র গড়াঞী। মারামারি হ'লে চন্দ্র গড়াঞী নিষ্ঠুরতম কৌশলে প্রহার করে। প্রথমেই ধরে মানুষের কণ্ঠনালীতে, পেটে লাথি মারে, বুকের উপর চেপে ব'সে নাকের ছিদ্রে আঙুল পুরে চাড় দেয়, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে মানুষ হাঁ করলে, জিভ টেনে ধরে চন্দ্র গড়াঞী। চন্দ্র গড়াঞী উঠে দাঁড়াতেই মজলিসটা আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

সাতন এবার ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে খালি জায়গায় দাঁড়াল।

চন্দ্র বললে, দাঁড়া রে শালা, ওরে শালা বাউড়ী, পালাচ্ছিস কেনে রে শূয়ারের বাচ্চা হারামজাদা?

সাতন নিজের কাপড় সেঁটে আঁট ক'রে প'রে নিয়ে বললে, পালাই নাই। আমার কথা আমি বলব, তবে যাব। জমিদারের কাছে যাব, দারোগার কাছে যাব। দেখি, বিচার হয় কি না!

তা যাবে বইকি, জমিদার দারোগা যে তোমার বোনাই।

সাতন চীৎকার ক'রে এক মুহূর্তে উত্তর দিয়ে উঠল, তুমি? তুমি? তুমিও যে বোনাই হতে গিয়েছিলে আমার; জমিদারের ঠ্যাঙার (লাঠির) ভয়ে গলি গলি ছুট মেরেছ, সাধ মেটে নাই। গায়ের ঝাল বুঝি সেইজন্যে?

চন্দ্র এবার দাওয়া থেকে নামতে আরম্ভ করলে। চন্দ্র গড়াঞীর মাথা গরম হয় না, গরম হ'লেও সে বিস্ফোরকের মত একমুহূর্তে ফাটে না; সে আস্তে আস্তে অগ্রসর হয় এমন ক্ষেত্রে। উঠে দাঁড়ায়, তারপর কয়েক পা এগিয়ে আবার দাঁড়ায়, কয়েকটা কথা বলে, আবার অগ্রসর হয়, আবার দাঁড়ায়, শেষ গিয়ে দাঁড়ায় প্রতিপক্ষের একেবারে মুখের সামনে, স্থিরদৃষ্টি তার মুখের উপর রেখে কথা বলে, তারপর যে মুহূর্তে লোকটা এক পা পিছু হটে, সেই মুহূর্তে তার কণ্ঠনালীটা চেপে ধরে বাঁ হাতে। তারপর চলে তার হিসেব-করা আঘাত।

দাওয়ার সিঁড়ি থেকেই ভক্তের দল চাপ বেঁধে ব'সে আছে, চন্দ্র তাদের বললে, সর্, পথ দে।

পিছন থেকে পঞ্চানন তার হাতে ধ'রে বললে, ছি!

তার দিকে ফিরে তাকিয়ে চন্দ্র বললে, ছাড়্।

না। কেলেঙ্কারি ক'রো না।

সাতন ওদিক থেকে চীৎকার ক'রে ব'লে চলেছে, দরবারে হেরে মাগকে মারে ধ'রে, জমিদারের ঠ্যাঙার ভয়ে পালিয়ে এসে আমার ওপরে ঝাল! আমি ভক্ত হতে পার না! ছের(চির)জীবন আমি বাবার ভক্ত হয়ে এলাম, আজ আমার কেলেঙ্কারি তুলে আমাকে তাড়িয়ে দেবে! বলি, কেলেঙ্কারি নাই কার? কার বুন কার পরিবার কার বেটীর কেলেঙ্কারি নাই? বলব নাকি খুলে এক-এক ক'রে? ভদ্দলোকেদের পেসাদী হতে বাকি আছে কার ঘর? বলুক, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে বলুক। ভদ্দলোক দূরের কথা, শ্যাখ(শেখ)দের সঙ্গে কারবারের কথা বলব নাকি?

সাতন!—কয়েক পা এগিয়ে এল চন্দ্র।

তোমার ধমকে আজ থামব না আমি। কারুর কুলের কথা আমি আজ বাকি রাখব না। ভক্তদের কেউ তো আ (রা) কাড়ছে না। দেবাংশীর কথা বলব নাকি—দেবাংশী মাশায়?

হঠাৎ একটা অঘটন ঘ'টে গেল। গিরিধর দেবাংশী গুলি-খাওয়া বুনো জানোয়ারের মত একটা চীৎকার ক'রে উঠল। সকলে সভয়বিস্ময়ে তার দিকে ফিরে তাকালে, তার সে মূর্তি দেখে শিউরে উঠল তারা। রাঙা টকটকে চোখ দুটো যেন ফেটে পড়তে চাচ্ছে, চওড়া কপালের রুখু চামড়া কুঁচকে উঠেছে সারিবদ্ধ রেখায়, দুপাটি অপরিষ্কার বড় বড় দাঁত আকর্ণবিস্তার হাঁয়ের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, বুকের পেশী থরথর ক'রে কাঁপছে; গিরিধর নিষ্ঠুর ক্ষোভে রাগে তার মাথার জটাটা ধ'রে নির্মমভাবে টানতে টানতে গর্জন করছে, ঈ—ঈ—ঈ—ঈ! তার সে মূর্তি দেখে চন্দ্র গড়াঞী পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেল।

পঞ্চানন দেবাংশীকে ধ'রে ডাকলে, দেবাংশী! দেবাংশী! দেবাংশী!

চন্দ্র গড়াঞী ফিরে এল, দাওয়ার ওপাশে নতুন-কেনা মাটির কলসী থেকে জল নিয়ে দেবাংশীর মুখে চোখে মাথায় ঝাপটা দিয়ে একজনকে বললে, বাতাস বাতাস। পাখা পাখা। দেবাংশীর চীৎকারের মধ্যে এবার ভাষা ফুটল, নিব্বংশ হবে, নিব্বংশ হবে, নিব্বংশ হবে।

গিরিধরের কন্যার দুর্নাম আছে। স্বর্ণকারদের কেষ্ট গিরিধরের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত করে। গিরিধরের স্ত্রীকে বলে, কেওট-মা। গিরিধরের মেয়ের কানে সোনার মাকড়ি, নাকে পাথর-বসানো নাকছবি দিয়েছে সে। মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি যায় না। বাবু-পাড়ায় গিরির মেয়ে মাছ বেচতে যায়, বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে হাসিতামাশা করে। এসব অবশ্য সাধারণ ব্যাপার। জেলেদের পুরুষেরা মাছ ধ'রে আনে, পসরা সাজিয়ে সে মাছ পাড়ায় গ্রামে গ্রামান্তরে হাটে বাজারে বিকিকিনি ক'রে বেড়ায় মেয়েরা।

হাসি-রসিকতা, কথার মারপ্যাচ ওদের বংশগত সংস্কার। কিন্তু কিছুদিন আগে দুটি ঘটনা ঘটেছে—প্রথম, গিরিধরের কন্যার আকস্মিক অসুখ। রক্তস্রাবে পেটের যন্ত্রণায় মেয়েটি যায় যায় হয়েছিল। তার চার-পাঁচ দিন পরেই বাবুদের একটা পুকুরে মাছ মরতে আরম্ভ হ'ল, জল কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল, তারপর আবিষ্কৃত হ'ল দু-দুটো ভ্রূণ। মরা মাছের লোভে বাউড়ী-ডোমেরা জলে নেমেছিল, তাদেরই পায়ে লেগে ভেসে উঠল। একটা গলিতপ্রায়, অন্যটা তখনও অবিকৃত। গলিতপ্রায় যেটা, সেটার সঙ্গে নিশ্চিতরূপে সম্বন্ধ নির্ণীত হ'ল গিরিধরের কন্যার। গিরিধর এর জন্য জরিমানা দিয়েছে দু দফা। এক দফা পুকুরের মালিককে, আর এক দফা নিজেদের সমাজকে। এসব ক্ষেত্রে জেলে-সমাজে কাঞ্চনমূল্যের মত মদ্যমূল্যেই সব দোষ সব কলঙ্ক স্খালন হয়ে যায়; প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান ক'রে নেশার আনন্দে অথবা বিহ্বলতায় সব বিস্মৃত হয়ে যায় ওরা।

অন্য ভ্রূণটির সম্বন্ধনির্ণয় হয় নাই। কেউ চেষ্টা করে নাই। ভ্রূণটির সর্বাঙ্গে জড়ানো ছিল এক ফালি ফরাসডাঙ্গার দামী কাপড়-ছেঁড়া। কাপড়-ফালিটাই চাপা দিল সম্বন্ধ-নির্ণয়ের প্রকাশ্য চেষ্টাকে। দারোগা গুহ শুনে হেসে বলেছিলেন, গিরে বেটাকে চেপে ধর, কোন্ ধাই এ কাজ করেছে, জেনে নাও। তারপর সে বেটীকে ধর, ধরলেই বেরিয়ে যাবে। এক বেটীর দ্বারাই দুটো কাজ হয়েছে। দুটো পুকুরে ফেললে দুটো পুকুরে মাছ মরবে, এই ভয়ে বেটী এক পুকুরেই দুটো গেড়েছে।

গুহ খানিকটা অগ্রসরও হয়েছিলেন। তারপর থেমে গিয়েছেন। লোকে অনেক কথা বলছে। পাঁচ-সাতটি ব্রাহ্মণ-পরিবারের, দু-তিনটি বণিক-পরিবারের কথা হচ্ছে। ইঙ্গিতে অস্পষ্ট কথা। স্পষ্ট কেবল একটা কথা, দারোগা গুহ সাহেবের পকেটে কিছু এসেছে।

যাক এ কথা। গিরিধর কন্যাকে নিয়ে অনেক দুর্ভোগ সহ্য করেছে, জরিমানা দিয়েছে পুকুরের মালিককে, অশ্লীল মন্তব্য শুনেছে, গালিগালাজ শুনেছে; আসবার সময় মালিক গিরির স্ত্রীকে ডেকে ফিসফিস ক'রে কিছু বলেছে, তাও শুনেছে; সমাজের সঙ্গে ঝগড়া করেছে; ওই সাতনের মত তার বিচারকদের প্রত্যেকের ঘরের অতীত কুৎসার ইতিহাস বলেছে, অবশেষে অপরাধ স্বীকার করেছে, জরিমানার পরিমাণ নিয়ে দরদস্তুর করেছে। কন্যার জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে অপরিমেয় উদ্বেগ ভোগ করেছে, ধর্মরাজ বাবার কাছে মানত করেছে, কন্যা সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে তিরস্কার করেছে, তার মৃত্যু-কামনা করেছে। সে সবই তাদের জীবনের পুরুষানুক্রমে অভ্যাস করা ব্যাপার। কিন্তু সে যখন এই বাবার মন্দিরে জটায় জবাফুল বেঁধে এসে বসে, তখন সে অন্য মানুষ। বাবা ধর্মরাজকে ডাকে, তাঁকে স্পর্শ করে, সেই স্পর্শ-পবিত্র হাতে বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণকন্যার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়; জমিদার-বাড়ির পূজা এলে উপকরণগুলি

বাবাকে স্পর্শ করিয়ে নিজের থালায় ঢেলে নিয়ে, জমিদারের থালাতে প্রসাদ এবং পুষ্প দিয়ে বাবাকে বলে, মঙ্গল কর বাবা, হে বাবা ধর্ম্মরাজ, রাজাবাবুর মঙ্গল কর, মনের বাসনা বাবা পূরণ কর। হে বাবা, হে ধম্মরজো! এই সময়ে সে অন্য মানুষ হয়ে যায়। এ সময়ে সে কারও কোন কথা সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। তার উপর এই বাৎসরিক পূজার সময়, শরীরের এই রুক্ষ অবস্থায়, উঠানভরা ভক্তদের সম্মুখে সাতনের মুখে ওই কন্যার প্রসঙ্গ তুলে অপমানের কথায় সে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যেন পাগল হয়ে গেল। এ নিয়ে যত অপমান এর পূর্ব্বে সে অভ্যাসক্রমে সহ্য করেছিল, সেও তার মনে পড়ল। পশুর মত চীৎকার ক'রে সে অভিসম্পাৎ দিলে, নির্ব্বংশ হবে, নির্ব্বংশ হবে, নির্ব্বংশ হবে।

সমস্ত জনতাটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। হে বাবা ধর্ম্মরাজ! হে বাবা, সদয় হও!

বার বার চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে চন্দ্র ডাকলে, দেবাংশী! দেবাংশী! দেবাংশী!

দেবাংশী মাথার জটাটা হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে সজোরে আকর্ষণ করছিল। জ্ঞান নাই। ভ্রমরকুডা গ্রামের প্রবীন বায়েন শশী ঢাকটা কাঁধে নিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বললে, ভর হয়েছেন মনে হচ্ছেন। পভু, বাজাব নাকি?

না।

বাজা বাজা বাজা। নাচব, আমি নাচব। বাজা।

ঢাকে ঝা-ঝা-ঝা-ঝা শব্দ তুলে কাঠি চালিয়ে নিজে দুলে, ঢাকের প্রকাণ্ড চামর ফুল্কো নাচিয়ে শশী মুখে বোল বলতে আরম্ভ করলে, তারা-তারা-তারা-তারা-তারা-তারা-তারা-তারা, শিবং-শিবং, ব'লে সশব্দে দুটো কাঠি দিয়ে ঢাকে আঘাত ক'রে আওয়াজ তুললে, গুড়ুম-গুড়ুম।

নিজের মাথার জটাটা কখন ছিঁড়ে ফেলেছে দেবাংশী। সেই জটাটা হাতে নিয়ে সে নাচতে আরম্ভ করলে, নির্ব্বংশ-নির্ব্বংশ-নির্ব্বংশ-নির্ব্বংশ।

শশীও নাচছে, বাজাচ্ছে, মুখে বলছে, শিবং-শিবং-শিবং-শিবং!

চন্দ্র পর্য্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। সে মাটির পুতুলের মত দাঁড়িয়ে।

বাবা! বাবা! বাবা গো!

ওগো! ওগো! ওগো দেবাংশী গো!

হাউমাউ ক'রে কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে ছুটতে এল গিরিধরের স্ত্রী এবং কন্যা। কন্যা যবুনা (যমুনা) এসে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল। গিরিধর যবুনাকে দেখে হা-হা ক'রে হেসে উঠে হাতের জটাটা দিয়ে তাকেই আঘাত ক'রে চীৎকার ক'রে উঠল, নির্ব্বংশ। তারপর সে টলতে টলতে আছড়ে প'ড়ে গেল সেইখানে।

হাহাকার উঠে গেল চারিপাশে। জল, বাতাস!

চন্দ্র ছুটে গেল ডাক্তারের কাছে। মিনিট পনেরো পরে ফিরে এল একটা সবুজ রঙের

শিশি হাতে নিয়ে। ডাক্তার আসতে পারেন নাই, এই শিশিটা দিয়েছেন নাকের কাছে ধ'রে শোঁকাবার জন্যে। নিষ্ঠুর ঝাঁজালো ওষুধ। চন্দ্র নিজে শুঁকে 'বাপ' ব'লে উঠতে বাধ্য হ'ল।

ধীরে ধীরে চোখ মেললে দেবাংশী। কিছুক্ষণ পর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে বসল। চন্দ্র পঞ্চানন এবার ধরাধরি ক'রে তাকে দাওয়ার উপর তুলে শুইয়ে দিলে। চন্দ্র বললে, শুয়ে থাক তুমি চুপ ক'রে। যা হয় আমরা করছি।

সাতন কখন চ'লে গিয়েছে।

মুকুন্দ বললে, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালাচ্ছিল। আমি তো জানি না কিছু, আমি সবে আসছি এখানে; শুধালাম সাতনকে, কি রে, গোল কিসের বল তো? তা জবাব দিলে না, ছুটে পালাল।

চন্দ্র বললে, যাক, হারামজাদার কথা বাদ দাও। কই রে, মতিলাল পর্য্যন্ত হয়েছে, তারপর বল্। নন্দ, যশন্দ, নারদ—

আজ্ঞেন হ্যাঁ। নারদের বেটাও এবার ভাঁড়াল দেবেন গো।

কি নাম?

ধম্মদাস। ধরমের মানতের ছেলে আজ্ঞেন।

মুকুন্দ ব'সে গুনগুন ক'রে গান ভাঁজছিল। পঞ্চানন তার কাছে স'রে এসে বললে, তোমার কতদূর হ'ল?

হবে। হবে। দেখ না কেন। হাসতে লাগল মুকুন্দ। মুকুন্দর হাতে 'সঙের' ভার। ময়রার ছেলে মুকুন্দ গান রচনা করে, বাউড়ী ডোম হাড়ী এদের পাড়ায় পাড়ায় ভাসানের গানের দল আছে, বোলানের দল আছে, ঘেঁটুগানের দল আছে, মুকুন্দ তাদের ওস্তাদ। ওদের গান তৈরি করে, ছড়া বাঁধে, পালা গেঁথে দেয়। ধরমপুজোয় ভক্তদের দলের সঙ্গে সঙের দল বার হবে, তার ভার মুকুন্দর হাতে।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উপহার

ওগো আমার প্রিয়,
 চাদরঢাকা, মোড়কবাঁধা, তোমার হাতে কি ও?
ভাবতে জিভা রসছে দেখি!
ব্ল্যাক-বাজারে ডুব দিয়ে কি
 আনলে খুঁটি' রত্নমুঠি,—আধেক সের চিনি?
চিনির রসে জরিয়ে, মোর হৃদয় নেবে জিনি?

—নয়, নয়, তা নয় ?
—চা ও দুধু, কথায় শুধু করবে মধুময় ?

ওগো আমার প্রিয়,
চৌকোপানা প্যাকেট করা, তোমার হাতে কি ও ?
আঁধারে আজ জ্বলবে মানিক !
তেল কেরাসিন আধপো খানিক
আনলে বুঝি, অনেক খুঁজি, ফ্লিটের টিনে ভরি ?
তেল দিয়ে মোর মনের যত ময়লা নেবে হরি ?
নয়, নয়, তা নয় ?
দেঁতো হাসির ছটায় কি সে তিমির হবে ক্ষয় ?

ওগো আমার প্রিয়,
আদর ক'রে আগলে রাখা, হাতে তোমার কি ও ?
ভাবীসুখের স্বপন হেরি,
পুলক জাগে অঙ্গ ঘেরি !
আনলে কি গো, আমার লাগি চার-গজী এক শাড়ি ?
শরম রেখে, মরমটুকু নিতে চাও কি কাড়ি ?
নয়, নয়, তা নয় ?
কদিন ক্লথকোল্ডারে আর লজ্জা ঢাকা রয় ?

ওগো আমার প্রিয়,
কাপড় চিনি তেল নয় তো তোমার হাতে কি ও ?
তাক-লাগানো কি ধন আনি
চাইছ চোখে ঝিলিক হানি ?
মুখ যে তোমার ভেবড়ে গেল চাপা হাসির তোড়ে !
আমার জন্যে এনেছ আজ বেলফুলের এক গোড়ে ?
ভুল করেছ, প্রিয়,
গোড়ের চেয়ে কাতার দড়ি নয় কি বরণীয় ?

"বরম"

সংবাদ-সাহিত্য

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে একটি বিবিধ সুপক্ক মাংস সমন্বিত ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলাম, পথে হঠাৎ স্মরণ হইল, মহাকবি কালিদাস-কীর্তিত এই স্মরণীয় দিবসেই ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশন ও বড়লাট বাহাদুরের ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন সম্পর্কিত চরম ঘোষণা করিবার কথা। দিল্লীতে বেঙ্গল টাইম পাঁচটায় ঘোষিত বার্তা এতক্ষণে কলিকাতা পৌঁছিয়াছে। বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। নির্বাচিত ১৪ জনের নাম অবিলম্বে শুনিতে পাইলাম। নিখুঁত নির্ভেজাল কংগ্রেস ৬, ঐ লীগ ৫, কংগ্রেসসম্মত ২, খাস লাটীয় ১— মোট এই ১৪ জন। বদমায়েসী যতপ্রকারে করা সম্ভব সবই বজায় আছে; বর্ণহিন্দুর সঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাসাম্যের চাল, জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগকে অস্বীকারের চাল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত কংগ্রেস প্রদেশ হইতে লীগ সদস্য নির্বাচন অথচ সামান্য সংখ্যালঘু বাংলা-আসামের হিন্দু প্রতিনিধি বর্জনের চাল ব্রিটিশ মিশনের সদিচ্ছার মুখোশ সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছে। মনটা অতিশয় দমিয়া গেল। ক্রীপ্‌স-দৌত্য, সিমলা-সম্মেলন ও এই বারের মন্ত্রীমিশনের ব্যাপার আনুপূর্বিক স্মরণে আসিল। ফাঁকির অভিনয় বুদ্ধিমানে একবারই করিয়া থাকে, কিন্তু নির্লজ্জের একই কৌশল তিন-তিনবার অবলম্বন করিতে বাধে না। তবে স্বীকার করিতেই হইবে এবারের যোগসাজসটা বড় জবর রকমেরই হইয়াছে। ধোঁকাটি এমন লাগসই হইয়াছিল যে, প্রথমটা আগান্ধী 'ভারত' সকলেই উল্লাসে ডগমগ হইয়া উঠিয়া শেষ পর্যন্ত ঢোঁক গিলিতে গিলিতে কূল পাইতেছেন না। এ পক্ষের তো এই অবস্থা। অন্য পক্ষে জনাব জিন্না গোড়ায় মূল গায়েনদের নির্দেশমত মুখ গোমড়া করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে দন্তরুচিকৌমুদী বিকাশ করিতেছেন। তাঁহার নকল গোসায় চট্টগ্রাম প্রমু ভারতবর্ষের বহু স্থলে "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" ভিশিরে রক্তারক্তিও হইয়া গিয়াছে গত ১৬ মে হইতে ১৬ জুন পর্যন্ত এক প্রস্তাবের লক্ষ টীকা ও বোধিনী দেখিতে দেখিতে বিরক্তি ধরিয়া গেল, গান্ধীজী দফায় দফায় নূতন ব্যাখ্যান দিয়া আমাদিগকে বিমূঢ় করিয়া তুলিতে লাগিলেন, শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগের প্রস্তাব-গ্রহণ ঘোষণায় অনেক বিভ্রা ব্যক্তি সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া নেপথ্যবিধানের চাতুরী সম্বন্ধে অবহিত হইতে লাগিলেন কংগ্রেস মধ্যবর্তীকালীন ব্যবস্থায় রাজি হইলেন না। তারপর ১লা আষাঢ়ের এই চৌদ্দ খেলা, অ্যাওয়ার্ড বা দান যখন, তখন ইহাকে "প'ড়ে-পাওয়া চৌদ্দ আনা" বলিলেও ক্ষতি নাই। ভারতবর্ষের একমাত্র লীগ-মুখপত্র কলিকাতার 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকা হুমকি দিয়াছেন, মন্ত্রীমিশন করুণাপরবশ হইয়া কংগ্রেসের অন্যায় দাবি বারে বারে তিনবার মানিয়া লইয়া মত বদলাইয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের শেষ বা চরম সিদ্ধান্ত। উদারহৃদয় জনাব জিন্নার আদর্শ মানিয়া কংগ্রেস এই শুভ দিনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে ভারতব

রক্তগঙ্গা বহিবে। বলিতে ইচ্ছা হইল, ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট হইতে রক্তগঙ্গার ভয় ভারতবর্ষ আর করে না। কিন্তু বলিব কাহাকে ? অত্যন্ত ক্ষুন্নচিত্তে গৃহে ফিরিলাম।

* * *

পরের দুই দিন ব্যাকুল এবং অস্বস্তিকর প্রতীক্ষার পালা চলিতেছে। দেশের শিল্প-সাহিত্য, ব্যবসায়-বাণিজ্য, অন্নবস্ত্র, দুর্ভিক্ষ-মহামারীর প্রতিকার সব কিছুই ভারতবর্ষের দানে-পাওয়া অথবা কাড়িয়া-লওয়া স্বাধীনতার উপর নির্ভর করিতেছে। আগে স্বাধীনতা, তাহার পর অন্য কথা; এ বিষয়ে আর মতান্তর নাই। দীর্ঘ দেড় শত বৎসরের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আন্দোলন এবং কংগ্রেসের ৬১ বৎসরের সাধনা আমাদিগকে এই একটি মাত্র শিক্ষা দিয়াছে যে, বৈদেশিক শাসকদের কবল হইতে মুক্ত না হইলে ভারতবর্ষের কল্যাণ নাই। এই কারণে এই স্বাধীনতার প্রস্তাবে দেশসুদ্ধ সকলে এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছি। যেন তেন প্রকারেণ একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আর কিছুই করিবার নাই। মুসলমান ভাইদের অযৌক্তিক ও ভয়াবহ আবদার সহ্য করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ কংগ্রেসকে এই এক কারণেই বারংবার এত নরম হইতে হইতেছে। যাহারা দেশের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য সূচ্যগ্র পরিমাণ ত্যাগও স্বীকার করিবে না পণ করিয়াছে, তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কংগ্রেসের আত্মনিগ্রহ ও লাঞ্ছনার অবধি নাই। রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই কয় বৎসরে যে সহনশীলতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, ভারতের ভাগ্য নিতান্ত বিরূপ না হইলে তাহাতেই একটা সুরাহা হইবার কথা। ইহার উপর মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা ও উপদেশ নিরন্তর গৃহবিবাদহীন কল্যাণের পথে আমাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, তাই নিখিল-ভারতের কংগ্রেসধর্মী সকলে অত্যন্ত আশা করিয়া পাষাণ গলিবার প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু পাষাণ গলিতেছে কই ? যাইবার মুখেও ব্রিটিশ কূটচাল সংখ্যালঘুতার ওজুহাতে সংখ্যাসাম্যের যে নবতর বন্ধন রচনা করিয়া যাইতেছে, তাহাতে পাষাণ, বিগলিত হওয়া দূরে থাকুক, আরও কঠিন হইতে চলিয়াছে।

* * *

শেষ পর্যন্ত কি ঘটিবে জানি না, কংগ্রেস গ্রহণ বর্জন যাহাই করুক, আমাদিগকে বিনা দ্বিধায় তাহা মানিতে হইবে, আমরা সাধারণ ভারতবাসী, কংগ্রেসের সৈনিক মাত্র, প্রশ্ন করিবার অধিকার আমাদের নহে। নির্বিচারে হুকুম মানাটাই সাধারণ সৈনিকের পরম কর্তব্য। অতিরিক্ত ব্যক্তিগত বুদ্ধি খাটাইয়া কংগ্রেসের আদেশ না মানিয়াই আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। আজ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ আমাদিগকে আত্মশাসন দিবার যে প্রস্তাব করিতেছে, তাহাও ১৯৪২ এর ৮ই আগষ্টের দান, মাত্র কয়েকটি দিন আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এক হইতে পারিয়াছিলাম। ভারতগৌরব সুভাষচন্দ্রেরও শেষ শিক্ষা ইহাই।

নানা চিন্তা মনে জাগিতেছে, নানা চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রতিবাদও কানে আসিতেছে। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ডাঃ জি. ভি. দেশমুখ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদকে তার করিয়া যাহা জানাইয়াছেন তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া বর্জনের দিকেই মন যাইতেছে। তিনি বলিতেছেন, 'বর্তমান প্রস্তাব অনুযায়ী অস্থায়ী গবর্মেণ্ট গঠনে পাকিস্তান আছে। চিরস্থায়ীরূপে দেশকে বিভক্ত করার প্রস্তাব আছে, যৌথ নির্বাচন ব্যতীত সংখ্যাসাম্যের বিধান আছে। জাতীয় আদর্শের কোনও ভিত্তি সৃষ্টি হয় নাই। কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে না। কোনও ক্ষতিকর অন্তর্বর্তীকালীন গবর্মেণ্টে আমাদের যোগ দিতে বাধ্য করা যাইতে পারে না। ইচ্ছা করিলে অন্য সকলে যোগ দিতে পারেন। ইহা দ্বারা কংগ্রেসী মুসলমানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে এবং দেশের নিকট কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইবে।' নয়াদিল্লীর ১৬ জুনের সংবাদে দেখিতেছি, নিখিল-ভারত হিন্দুমহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, 'বড়লাট যে ভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিতে চাহিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। বড়লাটের প্রস্তাবে বর্ণহিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাসাম্যের নীতি দেশের উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা গণতন্ত্রবিরোধী।'

দেখিলাম, এতদিনে ভারতরাষ্ট্রের জ্ঞানবৃদ্ধ প্রপিতামহ মহাত্মা গান্ধীও বিচলিত হইয়াছেন। নয়াদিল্লীর ১৭ জুনের এক সংবাদে দেখিতেছি, "জানা গিয়াছে যে, গান্ধীজী মনে করেন তাঁহার অথবা মৌলানা আজাদের সহিত পরামর্শ না করিয়া কংগ্রেসের তালিকা হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর নাম বাদ দিয়া শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মহতাবকে তালিকাভুক্ত করায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, লর্ড ওয়াভেল শাসনতান্ত্রিক কর্তারূপে কাজ না করিয়া যথেচ্ছাচার করিবেন। ইহাতে গান্ধীজীর মনে বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছে।"

আমাদের মনেও নানাবিধ ভাবের সঞ্চার হইতেছে, কিন্তু আমরা তাহা প্রকাশ করিবার অধিকারী নহি। কংগ্রেস যদি সর্ববিধ বাধা সত্ত্বেও মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হন, সমস্ত ভারতবর্ষের একমাত্র কর্তব্য হইবে বিনাদ্বিধায় তাহা মানিয়া লওয়া। আগামী কাল বুধবার (১৯ জুন) কংগ্রেস সম্ভবত মত প্রকাশ করিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তভাবে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আমাদের কোনই কর্তব্য নাই।

* * *

এবম্বিধ বহুপ্রকার জল্পনা-কল্পনা করিতেছি, হঠাৎ গোপালদার নিকট হইতে এক পত্রাঘাত পাইলাম। গোপালদা চিঠিপত্রের ধার ধারেন না, তাঁহার যাহা বক্তব্য স্বয়ং বলিয়া থাকেন, তাঁহার মতিপরিবর্তনে বিস্মিত হইলাম। ততোধিক বিস্ময় অনুভব

করিলাম চিঠিখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া। তিনি আসর হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন। চিঠিখানিই উদ্ধৃত করিতেছি।—

"ভায়া, কমলাকান্তের মত আমিও বিদায় হইলাম, আর লিখিব না, তোমাদের আসরেও আর অবতীর্ণ হইব না। এ দেশে আমার পোষাইল না, কাহারও সঙ্গে বনিল না। তোমরা সাহিত্য ছাড়িয়া পলিটিক্স ধরিয়াছ, তোমাদের সঙ্গেও তাই বনিল না। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি, সেই কমলাকান্তের কথাগুলাই ঠিক। তাঁহার কথাগুলা উদ্ধৃত করিয়া আমি তোমাদেরও বলিতে চাই, 'ভাই পলিটিক্স্‌ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগকে হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ি আছে তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স নাই। জয় রাধেকৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!—ইহাই তাহাদিগের পলিটিক্স। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।'

দেখ, আমি বাঙালী, বাংলা দেশকে ভালবাসিব ইহা স্বাভাবিক, বাংলা দেশের ভালমন্দ লইয়া হাসিব কাঁদিব, গুণে গৌরব অনুভব করিব, দোষে গালিগালাজ দিব ইহাতে তোমরা কেহ মন্দ বলিতে পার না। সমগ্র ভারতবর্ষের ভিত্তিতে স্থাপন করিয়া ভারতীয় নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিবার মত তোমাদের উদারতা আমি অর্জন করি নাই। আমি প্রাচীনপন্থী, পুরাতনকাল হইতেই দেখিয়াছি ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাংলা দেশ নিপাতনে সিদ্ধ, ইহা পাণ্ডববর্জিত দেশ। এখানকার বিদ্যাবুদ্ধি হালচাল বিচার-বিবেচনা সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহা তন্ত্রের দেশ, মাতৃসাধনা এখানকার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, শেষ পর্যন্ত নেড়ানেড়ীর দুর্গতি এখানকারই। ইহা লইয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই। আমরা কাছি মাড়োয়ারী বর্গী মারাঠী হইয়া উঠিতে পারি নাই, ইহাতে কোনও অগৌরবের কারণ দেখি না। নদীমাতৃকা এই জলাভূমিতে আমরা বৈষ্ণবীকীর্তনে কাঁদিয়া ভাসাইয়াছি অথবা শক্তিসাধনায় রক্তগঙ্গা বহাইয়াছি ইহা লইয়া কোনও দিনও লজ্জা অনুভব করি নাই। সেই প্রাচীন কাল হইতে দেখ, আমাদের ব্যাকরণ আলাদা, দর্শন আলাদা, ন্যায় আলাদা, উচ্চারণ আলাদা, মায় বানান পর্যন্ত আলাদা; তোমরা আজ গায়ের জোরে বাঙালীকে ভারতীয় করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছ, তাহাকে হিন্দুস্থানী শিখাইতে বসিয়াছ। তোমাদের সহিত আমার পোষাইবে না।

বেশিদিনের কথা নয়, বাঙালী কবি জয়দেব হইতেই ধর, সমগ্র ভারতবর্ষ যখন ভাষা ছন্দ ও বিষয়বস্তুর গতানুগতিকতার পঙ্কে আ-নাক নিমজ্জিত হইয়া মরিতে বসিয়াছিল, তখনই এই বাঙালী কবি অসামান্য প্রতিভাবলে ভাষা ও ছন্দের মুক্তি আনিয়া ভারতবর্ষের সাহিত্যকে রক্ষা করিলেন, প্রাকৃতের কাঁধে সংস্কৃতের জোয়াল না চাপাইয়া সংস্কৃতের কাঠামোয় প্রাকৃতের পুষ্পসজ্জা পরাইলেন। এটা যে কত বড় কৃতিত্বের কথা

কেহ কি বিচার করিয়া দেখিয়াছে? তারপর কবি চণ্ডীদাসের কথা ধর, তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় কবি, যিনি রীতি ও পদ্ধতির সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া নূতন ভাষায় নূতন ভঙ্গীতে মনের অনুভূতিকে সঙ্গীতে রূপ দান করিলেন, তোমাদের বাঁধাধরা ব্যাকরণ অলঙ্কার কাব্যপ্রকাশ কাব্যদর্পণ সব কিছুকে প্রাণের বন্যায় ভাসাইয়া তিনি সহজ মানুষকে জয়যুক্ত করিলেন। সাহিত্যে এই বিপ্লব ভারতের অন্য কোথাও কেহ কি কল্পনা করিতে পারিয়াছে? ভারতীয় সঙ্গীতকে দলিয়া মন্থন করিয়া কীর্তন পাঁচালি ও কবিগান বাঙালীই রচনা করিতে পারিয়াছে। ইংরেজ আমলের কথা ভাব; রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারায় এই কয়টি বাঙালী সন্তান, প্রত্যেকেই এক-একজন বিপ্লবী বিদ্রোহী—ইহাদের চিন্তার পদ্ধতি স্বতন্ত্র, বক্তব্য নূতন। ইহাদের প্রবল প্রভাবে সনাতন ভারতবর্ষ বার বার কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছে এবং আজও হইতেছে। রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসেও আমরা আজও পর্যন্ত সম্পূর্ণ নূতন পথ ধরিয়া চলিতেছি, কাহারও অনুসরণ করি নাই। বাংলা-মায়ের সুসন্তান সুভাষ এই সেদিনও নিতান্ত একক সাধনায় যাহা করিয়া গেল, সমস্ত পৃথিবী তাহাতে বিস্ময় অনুভব করিয়াছে। ইহা তোমাদের সর্বভারতীয় অহিংস রাষ্ট্রীয় যজ্ঞের সহিত মোটেই সম্পর্কিত নয়। ইহা স্বতন্ত্র, তান্ত্রিক বাঙালীর সাধনা।

সেই বাঙালী আজ তোমাদের আত্মবিস্মৃতিমূলক প্রচারের প্রভাবে ধর্মচ্যুত হইতে বসিয়াছে, ভারতীয় মতের সংঘর্ষে খাঁটি বাঙালী মন আজ বিভ্রান্ত, তাই তোমাদের সঙ্গে আমার পোষাইল না। ১৩৫০-এর মন্বন্তরেই দেখিলাম, বিপ্লবী বাঙালী তরুণ সম্প্রদায় অহিংস মতবাদের আওতায় এমনই বীর্যহীন হইয়া পড়িয়াছে যে, লক্ষ লক্ষ প্রাণীহত্যাকারী কালোবাজারী পিশাচদের একটিরও পিঠের চামড়া ছাড়াইয়া লইতে তাহাদের একজনও অগ্রসর হইল না। নারীনির্যাতনের আর্তনাদ প্রতিদিন সংবাদপত্রে দেখিয়া অধোবদন হইতেছি, যদি দেখিতাম, একজন বাঙালী যুবকও ইহা রোধ করিতে গিয়া প্রাণ দিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিয়া আশ্বস্ত হইতাম যে বিপ্লবী বাংলার অন্তরাত্মা এখনও মরিয়া যায় নাই, ফুটবল-সিনেমার জঞ্জালের তলদেশে ইহাদের প্রাণশক্তি আজিও অব্যাহত আছে। বাঙালীকে ভারতীয় করিবার প্রয়াসে যাহারা তাহার বিপ্লবী সত্তাকে জড়ীভূত করিতেছে তাহাদের সহিত আমার কোনও কারবার নাই, আমি বিদায় হইলাম।

দেখ, সকল কথা বিশদ করিয়া খুলিয়া বলিতে আমি পারিতেছি না। আমার সে লেখনীদক্ষতাও নাই, মনের অবস্থাও সাত কাহন রচনা করিবার অনুকূল নয়, তোমরা একটু সহৃদয় হইলে আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবে। বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য, বাংলার তরুণদের যুগে যুগে নব নব বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পথে অভিযান এই সকলের সহস্র দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। বাঙালী নিখিল-ভারতীয় পলিটিক্সে

যাত্তিয়া কিভাবে প্রতিদিন অধঃপতিত হইতেছে, তাহারও হাজার দৃষ্টান্ত আমার মনে অহরহ জাগিতেছে। আমি ব্যথিত বিভ্রান্তচিত্তে প্রতিদিন অনুভব করিতেছি, বাঙালীর বিপ্লবী সৃজনী শক্তি আজ অন্ধ অনুকরণ ও পরানুবর্তিকতার পঙ্কিল পথে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে; সে আজ রুশীয় কম্যুনিজ্‌ম, গুজরাটী গান্ধীজ্‌ম, এবং পোষ্টওয়ার ডিকাডাণ্ট ইংলণ্ডের আর্ট ফর আর্টিজ্‌ম-এ নির্লজ্জভাবে মাতিয়াছে; নিত্যসরণশীল নদীমাতৃক বাংলার বিপ্লবী প্রাণশক্তিকে হারাইতে বসিয়াছে। আমার মতবাদী লোক বাংলা দেশেও আজ বেশি নাই, আমরা পরাজিত হইতেছি, সুতরাং পরাজয়ের গ্লানি লইয়া বিদায় গ্রহণই আমাদের পক্ষে সঙ্গত। তাই বিদায় হইলাম।

বাংলা দেশের উপর সহস্র অবিচারের মধ্যে একটিমাত্র অবিচারের উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। তোমাদের কংগ্রেসমণ্ডলের কোনও ধুরন্ধরই এই অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলেন নাই। ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের দ্বারা পীড়ন ও অত্যাচারের ওজুহাতে মুসলমানেরা সেফগার্ড প্রটেক্‌শন ইত্যাদি দাবি করিতেছে, ইংরেজ সেই রক্ষাকবচ দিতে বদ্ধপরিকর, কংগ্রেসও মুসলমানের আবদার রক্ষায় যত্নশীল। কিন্তু সেই যুক্তিতে বাংলা দেশের সামান্য সংখ্যালঘু হিন্দুদের তো কোনও প্রটেক্‌শন দেওয়া হইতেছে না। বরং নিখিল-ভারতীয়-হিন্দু-সংরক্ষণ-যজ্ঞে বাঙালী হিন্দুদের বলি দিতেই সকলে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন। মুসলমানেরা সেল্‌ফ-ডিটারমিনেশন পদ্ধতি অনুযায়ী বি গ্রুপে ও সি গ্রুপে স্বরাজ ও স্বাতন্ত্র্য অর্জন করিবেন, কিন্তু বাংলা দেশের ৪৯% হিন্দু ন্যায় ও সুবিচারের যূপকাষ্ঠে বলি হইবেন; বাংলা দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি গঠনে যে হিন্দুরা বহুবিধ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, সেই হিন্দুরাই সেই সকলের সুবিধা হইতে অবাধে বঞ্চিত হইবে, এ তোমাদের কেমন বিচার! তোমরা বলিতে পার, আমরা সংশয়বাদী এবং অনর্থক ভয় পাইতেছি। কিন্তু ইতিমধ্যেই পশ্চিম-বঙ্গের কালনায় ও পূর্ব-বঙ্গের বহু স্থলে কি ঘটিতেছে, তাহা কি লক্ষ্য করিতেছ না? সেকেণ্ডারি এডুকেশন বিল বিধিবদ্ধ করিবার জন্য যে সকল কৌশল অবলম্বিত হইতেছে, তাহাও কি তোমাদের নজরে পড়িতেছে না? মাঝ হইতে দুর্ভাগ্য বাংলা দেশের সঙ্গে আসামকে জুড়িয়া দিয়া আসামী হিন্দুদের যে সর্বনাশ সাধন করা হইতেছে, তাহাই বা কোন্ ন্যায় বিচারে ঘটিতেছে?

মোটের উপর, তোমাদের উপর রাগ করিয়া আমি সরিয়া যাইতেছি, ইহা মনে করিও না। নিজের মতবাদের উপরই আমার সন্দেহ জাগিতেছে বলিয়া আমি আরও গভীরভাবে তলাইয়া দেখিবার জন্য বিদায় লইতেছি। এই বিদায় সাময়িকও হইতে পারে। বাংলা দেশের তরুণদের বীর্যবান মনোহারী মূর্তি গত নবেম্বর হইতে কয়েকবারই দেখিলাম। মৃত্যুভয়কে তাহারা জয় করিয়াছে—এবার মৃত্যুকে দলবদ্ধভাবে নয়, একা একা বরণ করিবার শক্তি যদি তাহারা অর্জন করে, সমস্ত বাংলা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়া অনাচার

অত্যাচারের বিরুদ্ধে যদি তাহারা একক দাঁড়াইয়াও প্রাণ দিতে পারে, তাহা হইলে আর ভয় নাই। শরৎচন্দ্র তাঁহার 'পল্লীসমাজে' একজন সামান্য কলুর ছেলেকে দিয়া বেণীর মাথা ফাটাইয়া যে আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন, যেদিন শুনিতে পাইব, বাংলা দেশের তরুণদের একজনও কাজে সেই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছে সেইদিনই আমি আবার সানন্দে ফিরিয়া আসিব, আজ বিদায় হইলাম।

দেখ, তোমাদের নিখিল-ভারতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া আমি কয়েকটি গান রচনা করিয়াছি, সেগুলি তোমাদেরই সম্পত্তি, তোমাদের হাতেই দিয়া গেলাম। তোমাদের কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘের সুকৃতি সেন গানগুলিতে সুর যোজনা করিয়া যদি প্রচার করেন, আমার অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হইবে। আমার ব্যক্তিগত মতামত যাহাই হউক, তোমাদের জন্য রচিত এই গানগুলি তোমাদের কাজে লাগিবে, ইহা ভাবিতেও ভাল লাগিতেছে। দেখিও যদি কিছু করিতে পার। আমার আর কিছু বক্তব্য নাই, আশা করিতেছি শীঘ্রই সুস্থ ও স্বস্থ হইয়া পাকিস্তানী বাংলায় ফিরিয়া আসিতে পারিব। আজ বিদায়। ইতি আঃ গোপালদা।"

*   *   *

গোপালদার মর্মান্তিক চিঠিখানি পড়িয়া কেন জানি না, চক্ষু অশ্রুসজল হইল, একবার ভাবিলাম, ছুটিয়া তাঁহার নিকট যাই, তাঁহাকে বুঝাইয়া ফিরাইয়া আনি, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, থাক্, কাজ নাই, দুস্তর সমুদ্রে আমরা সকলেই এখন ভাসিতেছি—দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ও পাকিস্তান চারিদিক আঁধার করিয়া আসিতেছে। এ অবস্থায় স্ব স্ব ভেলায় ভাসাই নিরাপদ, জোট বাঁধিয়া অতলে তলাইবার কোনই মানে হয় না। গোপালদার গানগুলি সাধারণের হিতার্থ এখানে প্রকাশ করিলাম—

(১)

নতুন ক'রে গড়ব আপনারে।
গেছে যা তা যাক্ ভেঙে যাক
ফাঁক পড়ে তো ফাঁক প'ড়ে থাক্,
ভাঙা ফুটো জোড়া দিয়েই হাল ধরেছি হা রে।
গগনভেদী কিসের জয়রব ?
সঞ্জীবনীমন্ত্রে চিতায় উঠছে ব'সে শব,
হারাজীবন পেল যারা তাদের কলরব।
শিব জেগেছে শ্মশানপুরে
ভয় ভাবনা নাই কিছু রে
এবার সারা ভারত উঠুক বেজে এক সুরে এক তারে।

(২)

শ্মশানে কি নতুন ক'রে লাগল সবুজ রঙ,
সঞ্জীবনীমন্ত্র সে কি "বন্দেমাতরম্" ?
উড়েছিল খাক্ হয়ে যা, ফুলের শোভা ধরল কি তা,
মৃত্যুপুরে নতুন প্রাণের দেখছি নতুন ঢঙ।
"করব কিংবা মরব"-মন্ত্রে জাগল সারা দেশ,
মরা মায়ের অঙ্গে আজি মনোহরণ বেশ।
যারা অধীনতার ফাঁসে রুধেছিল জীবন-শ্বাসে
বিদায়-ঘণ্টা ওই তাহাদের বাজল যে ঢঙ্ ঢঙ।
শ্মশানে আজ নতুন ক'রে লাগল সবুজ রঙ।

(৩)

আমাদের ঘুম ভেঙেছে ও বিদেশী ফিরে যা রে।
তোদের অত্যাচারে অপমানে ফিরে পেলাম হারা-মারে,
প্রাণের নতি জানাই তোদের, ও বিদেশী ফিরে যা রে
নিজের পায়ে ভর দিয়ে আজ উঠল জেগে সারা ভারত,
ছেড়ে যেতেই হবে তোদের ভারতজোড়া পোড়া আড়ত—
রক্তচোষা খুনের আড়ত।
এবারে ফাঁদ দেখবে ঘুঘু, ধান খেয়েছ বারে বারে।
ফাঁকি এবার নয় বিদেশী, রক্তমূল্যে শুধন্থ দেনা,
ভালয় ভালয় যাও ফিরে যাও অনেক কালের হ'ল চেনা—
ভাল ক'রেই হ'ল চেনা।
তোদের বাঁধন কাটব ঠিকই, যাই তো যাব ছারেখারে।

(৪)

ভারতমন্ত্রে কে নিবি দীক্ষা আয় রে।
উষার আলো ফুটছে নভে সময় ব'য়ে যায় রে।
আয় বাঙালী, আয় মারাঠী,
মাদ্রাজী আয়, রে গুজরাটী,
প্রদেশ-ভাষার গণ্ডী ছাড়ি
আয় ওড়িয়া, আয় বেহারী,
সবাই মিলে গড়ব এবার ভারত-সমবায় রে।
মন্দিরে মসজিদে মোদের ধর্ম থাকুন বন্দী,
মোরা ভায়ে ভায়ে হাত মিলায়ে মায়ের চরণ বন্দি।

বিদেশীদের নিগড় থেকে
বাহিরিবি আয় তোরা কে।
আয় আসামী, আয় বেলুচী,
ব্রাহ্মণ আয় মেথর মুচী
একলা কারো সাধ্য কি বা, সকলের এ দায় রে।

(৫)

শোষক শাসক, মুখোশ তোমার গিয়েছে খুলে,
বিদায়-তরণী তরঙ্গঘায়ে উঠিছে দুলে।
সুরভি মাল্য পরহ গলে
শৃঙ্খল ফেল সাগরজলে
বন্ধন-ছেঁড়া সঙ্গীত হবে বন্দনা-গান তোমার কূলে।
বিদায়-বেলায় দুশো বছরের প্রণয় লহ
নিবাইয়া যাও বিদ্বেষ বিষ, হ'ল অসহ।
দেওয়া-নেওয়া প্রভু, অনেক হ'ল
এবার নোঙর তোল গো তোল
বক্ষরক্তে বিদায়-অর্ঘ্য অনেক দিলাম চরণমূলে—
তরণী এবার পশ্চিমপানে দাও গো খুলে।

(৬)

শোণিত-অর্ঘ্যে ভারতের মাটি করিয়া লাল
মরণের পারে যাহারা গিয়েছ মার দুলাল,
তাহারা মোদের প্রণাম নাও
তাহারা মোদের আশিস্ দাও
বক্ষে বক্ষে সাড়া দাও তুলে—
জাগো জাগো জাগো হ'ল সকাল।
বিদেশী শাসন মোহবন্ধন হ'ল শিথিল,
শুরু হইয়াছে পথে পথে হের ভুখা-মিছিল।
তোমরা দাঁড়াও সমুখে আসি
যুগান্তরের জড়তা নাশি
মানুষ করিয়া তোল তাহাদের
ভয়ে যারা হ'ল ভেড়ার পাল।

(৭)

সাতই আগস্ট, তোমায় নমস্কার।
কাটল যেদিন ভারতজোড়া মনের অন্ধকার।
দগ্ধ বিয়াল্লিশের ভালে
নতুন আলো কে জ্বালালে,
শঙ্কাহরণ সোনার বরণ আলোক চমৎকার!
সাতই আগস্ট, তোমায় নমস্কার।
চমকে ওঠে মৃত্যুভীত জন
পথে চলার কিই বা আয়োজন,
জীবন আছে, মায়ের পূজার সেই তো উপচার।
সাতই আগস্ট, তোমায় নমস্কার।
এক নিমেষে বুঝল সেদিন সবে
স্বাধীনতা ফিরে পেতেই হবে
উঠল সর্বনাশের হাওয়া কাটল মনের ভার,
সাতই আগস্ট, তোমায় নমস্কার।

(৮)

বক্ষের স্নেহে পালন করিছে যে দেশ তোরে,
সুখে দুখে বেঁচে জীবন-অন্তে যে দেশে ম'রে
বাতাসে মিলাস শেষ-নিশ্বাস
যে মাটিতে শেষ-আশ্রয় পাস
যেখানে জনম যেখানে মরণ, জানিস ওরে
সে দেশ জননী, ত্যজিবি কি তায় এমন ক'রে?
পশ্চিমমুখো হইয়া আরবে যতই চাও,
রক্তগঙ্গা গোমুখীর সেথা ঠিকানা পাও?
আলোকলতার লইয়া ভাবনা
প্রাণ নাহি মেলে শুধু হয় গনা
ঘরভোলা ছেলে, ফিরে আয় আয় মায়ের ক্রোড়ে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৩

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা

আজ হতে বছর চল্লিশ-একচল্লিশ আগেকার কথা। স্বদেশী যুগ। শিবাজি-উৎসবে কবি শিবাজির উদ্দেশে রচিত তাঁর বিখ্যাত কবিতা আবৃত্তি করছেন অথবা রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে গেয়ে জাতীয় ভাণ্ডারের জন্যে চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছেন অথবা ছাত্রদের সভায় সভাপতিত্ব করছেন অথবা টাউনহলের বিরাট সভায় "অবস্থা ও ব্যবস্থা" প্রবন্ধ পড়ছেন, গলা কাঁপছে আবেগে, শরীরে অনুভূত হচ্ছে রোমাঞ্চ, যার দ্যোতনা জনগণের মনে সঞ্চারিত হচ্ছে।

এ রকম পরিপ্রেক্ষিতে বা এ রকম সব চিত্রের নিরিখে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের সবটুকু ধরা পড়বে না। তাঁর স্বাদেশিকতা বুঝতে গেলে, তিনটি জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে—দেশ, কাল ও পাত্র। এই তিনটিরই ক্রমবিকাশ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে আমাদের একটা পুরো ধারণা হওয়া সম্ভব। পাত্র এখানে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

কবির স্বাদেশিকতার মধ্যে একটা বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সবসময়ে একই ধরণের দেশাত্মবোধ তাঁর ভেতরে ছিল এমন নজির নেই। দেশ ও কাল ভেদে পাত্র রবীন্দ্রনাথেরও মানসগঠন পরিবর্তিত হয়েছে। আবার কোন সময় কবি দেশ-কালকে তফাতে রেখেও গেছেন।

কবির স্বাজাত্যবোধের প্রমাণ হিসেবে তাঁর গদ্য ও পদ্য রচনা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক না হ'লেও ওই রচনাগুলি কেমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সম্ভব হয়েছে বা কোন্ সমসাময়িক অনুভূতির ওপর বিধৃত হয়ে আছে, তার বিশ্লেষণই বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক কবিমানসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেবে।

রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করলেন বহুখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে, যে পরিবার কলকাতায় স্থানান্তরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির চাকরি আর ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন ক'রে ততদিন বিস্তৃত ভূসম্পত্তি কিনে ফেলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মালেন, তাঁরা বনেদী জমিদার, বিশাল গোষ্ঠী। এ পরিবারে ছেলেপুলেদের পালন করবার নিয়ম ছিল কড়া পাহারার মধ্যে বন্দী রেখে, যেটাকে রবীন্দ্রনাথ পরে 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র' নাম দিয়েছিলেন। সে যাই হোক, এই পারিবারিক পাহারা গোড়া থেকেই তাঁর মনে একটা দুর্বার বাসনা এনেছিল বাঁধন ছেঁড়বার, বাইরের জগৎকে জানবার।

তারপরে কৈশোরে পা দিতে না দিতে এল হিন্দুমেলার যুগ, সঞ্জীবনী সভার যুগ। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারকে আজকালকার শ্রেণীসংগ্রামের আবহাওয়ায় বুর্জোয়া

ব'লে সহজেই চিহ্নিত করা যেতে পারলেও নতুন ভাবব্যঞ্জনার স্বকীয় অনুসরণে তাঁরাই ছিলেন অগ্রণী। জাতীয়তার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। তাই হিন্দুমেলার নেতৃত্বপদে আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গণেন্দ্রনাথকে দেখেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্-মন্ত্রের জন্মের আগে সত্যেন্দ্রনাথের 'মিলে সব ভারতসন্তান' গান শুনেছি, আরও দেখেছি সঞ্জীবনী সভার উদ্যোক্তা হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য রইলেন রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি তৎকালীন দেশপ্রেমিকেরা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার আদর্শে এতই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে, চারটে বীররসের নাটকই লিখে ফেললেন পর পর—'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী' আর 'স্বপ্নময়ী'। রবীন্দ্রনাথ তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ হ'লেও জ্যোতিদাদা তাঁকে সঞ্জীবনী সভা আর হিন্দুমেলার সভ্য ক'রে নিয়েছেন, অর্থাৎ জ্যোতিদাদার আওতায় তাঁর স্বদেশপ্রেমের প্রাথমিক উন্মেষ হ'ল। "হিন্দুমেলায় উপহার" নামে তিনি একটি কবিতা লিখলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের প্রসিদ্ধ গান "জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" এবং 'স্বপ্নময়ী'র'ও কয়েকটি গান তাঁরই রচনা। এ সমস্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুপ্রাণনাতেই সম্ভব হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে তাঁর জ্যোতিদাদার প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশি। এ কথা তিনি বহুবার স্বীকার করেছেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে, মাইকেল-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের যুগে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম-জীবনে, বাংলা দেশে তথা সারা ভারতে স্বাজাত্যবোধের উদ্বোধন হয়েছিল সত্যি, কিন্তু তার প্রসার ছিল সংকীর্ণ। তখনকার মনীষীরা এ সংকীর্ণতাকে এড়াতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথও না। তখন স্বাজাত্যবোধ ছিল ধর্ম বা সংস্কৃতিগত, ইংরেজীতে যার নাম Cultural বা Religious Nationalism। হিন্দুরা সব বিষয়ে অগ্রগামী ছিল ব'লে তখনকার জাতীয়তা মুখ্যত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ধ্যানধারণা হতে সঞ্জাত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত নাটকগুলির মধ্যে এক 'পুরুবিক্রম' ছাড়া সবকটিই মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর জাগরণের কাহিনী। 'পুরুবিক্রম' খালি আলেকজাণ্ডার ও পুরুরাজকে নিয়ে লেখা। বাস্তবক্ষেত্রেও হিন্দুমেলার কার্যকলাপে যদিচ স্বাধীনতালাভের সংকল্প স্ফুট ছিল, এ স্বাধীনতার সীমা যেন হিন্দুদের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই শেষ। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের শিবাজি-উৎসব পর্যন্ত এ মতের সত্যতা প্রমাণ করতে পারে। শিবাজি-উৎসব তখনকার দিনে জাতীয় উৎসব। ভারতের প্রথম বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কথিত, ইংরেজী ১৮৯৪ সালে সংগঠিত পুনার চাপেকর সংঘে যা হ'ত, বা বাংলা দেশে যা হয়েছে, সবেরই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল মারাঠাবীর শিবাজির স্বাধীনতার আদর্শ, লক্ষ্য ছিল সেই আদর্শের প্রচার। কাজেই এই গোষ্ঠী ও ধর্মগত স্বাধীনতার জল্পনা যা

সে-হিসেবে কাজ করার কল্পনা নিঃসন্দেহে উদার মতবাদের পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ইতিমধ্যে হয়ে গেলেও, না ছিল তখন গণসংযোগ, না ছিল কোন কাজকর্ম, না ছিল আজকের কংগ্রেসের সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গী।

তখনকার দিনে বঙ্কিমের মত অপেক্ষাকৃত উদারমতাবলম্বীরা বেন্থাম মিল বা কোঁৎ পড়তেন। বঙ্কিম তো আবার মার্ক্স-এংগেল্‌সের 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' পর্যন্ত বাদ দেন নি কিন্তু "সাম্য" "বঙ্গদেশের কৃষক", 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র কয়েকটি প্রবন্ধ প্রভৃতি ছাড়া বঙ্কিমের রচনা কদাচিৎ এই ধর্মগত বা গোষ্ঠীগত স্বাধীনতাদর্শের ওপরে অগ্রসর হয়েছে। এবং আগেই বলেছি, সাময়িকভাবে হ'লেও রবীন্দ্রনাথও একসময় সম্পূর্ণ অতিক্রম ক'রে যেতে পারেন নি এই কালপ্রবাহকে। তা সে বাঙালীসুলভ ভাবালুতার জন্যেই হোক, আর যে কোন কারণেই হোক। শিবাজি-উৎসবের প্রধান ভূমিকায়ও তাই তাঁকে দেখা গেছে এককালে। অবিশ্যি এটাও ঠিক যে স্বদেশী যুগে কার্যকরী রাজনীতির আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লেও প্রধানত এ সময় থেকেই তাঁর কবিমানসের পটপরিবর্তন শুরু হয়েছে, শুধু স্বদেশের মানুষকে নয়, পৃথিবীর মানুষকে ভালবাসবার কথা মনে হয়েছে তাঁর। অজস্র গান ও কবিতা লিখেছেন তখন। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ", "তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না", "বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান" "বাংলার মাটি বাংলার জল" ইত্যাদি সমস্ত বিখ্যাত গান ও কবিতাই ১৩১১-১২ বঙ্গাব্দের রচনা, অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের কালে।

ইংরেজী ১৯০৭ সাল নাগাদ অকস্মাৎ তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। রাখিবন্ধন, জাতীয় ভাণ্ডার, বক্তৃতা, করতালি, সব-কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে আনলেন ক্রমশ। লোকে বললে, দেশের যুবশক্তিকে নানা দিক দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে ভাববিলাসী কবির, অন্তর্ধান অত্যন্ত অসঙ্গত হয়েছে। তবু কবি আর রাজপথে নামলেন না। তাঁর মানস তখন ওই যুগধর্মকে অস্বীকার করবার কথা ভাবছে। তিনি বুঝলেন, স্বদেশী-আন্দোলন উত্তেজনার ঘূর্ণাবর্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। সমাজসংস্কারই যে রাষ্ট্রিক মুক্তির প্রথম উপায়—এ কথা দৃঢ়ভাবে তিনি বুঝলেন। আগে এই চিন্তাই তাঁর মনের মধ্যে দেখা দিলেও পারিপার্শ্বিকের আলোড়নে খুব স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায় নি। তাই স্বদেশী-আন্দোলনের অনুপূরক হিসেবে বাঙালী ছেলেরা যে সন্ত্রাসবাদের দিকে পা দিল, তাতে ভাবাবেগের দিক থেকে কবির একটা স্বতস্ফূর্ত সহানুভূতি থাকলেও এ প্রয়াসকে গ্রহণ করতে পারেন নি। কেন না, বাইরের বিশাল সমাজের সঙ্গে এ প্রচেষ্টার কোন যোগসূত্র বিশেষ ছিল না। এ প্রয়াসও ছিল সংস্কৃতিগত স্বাদেশিকতার এক সংস্কৃত রূপ, বিশেষত অন্ধ ইংরেজবিদ্বেষের নমুনায় মলিন।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রত্যভিঘাত 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে ধরা পড়েছে। দেশাত্মবোধের নামে কোনও সংকীর্ণতা, কোনও নীচ কাজ, কোনও মিথ্যাকেই কবি আমল দিতে রাজি নন। তাঁর মতে দেশধর্ম মানবতার ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বৃহৎ ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহ গৃহীত হবার পর অবশ্য রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আনবার জন্যে বিপ্লবপন্থা প্রকৃষ্ট পন্থা ছিল না, এটা বলা কখনও কখনও সহজ, কারণ রাষ্ট্রগুরু স্বয়ং এ কথা বলেছেন। কিন্তু "ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার" আর "পথ ও পাথেয়"র মত প্রবন্ধ বা 'ঘরে বাইরে'র মত উপন্যাস লেখা তখন সহজ ছিল না, তবু কবি এগুলি না লিখে পারেন নি। শুধু এই নয়, অগ্নিযুগের প্রত্যভিঘাত তাঁর মনকে এতটা নাড়া দিয়েছিল যে, পরিণত বয়েসেও 'চার অধ্যায়ে'র মত উপন্যাস লিখেছেন। এসবেরই মধ্যে তিনি সাময়িক চিত্তবিক্ষোভের অসম্বৃত বহিরঙ্গকে অপ্রধান ক'রে দেখেছেন আর সমালোচনা করেছেন। 'চার অধ্যায়ে' অতীন যে নিজের স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিল অথচ ফেরবারও পথ ছিল না, এর সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সেই স্বীকারোক্তির ('রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে') কতটা সামঞ্জস্য আর কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে, তা একমাত্র কবিরই জানা থাকবার কথা এবং আমাদের প্রয়োজনে গৌণ। এর থেকে আমরা পারি মাত্র তাঁর চিন্তাধারার গতিপথটা বুঝতে, আর অসংকোচে তা মেনে নিতেও ক্ষতি দেখি নে। এখানে ওখানে অতীনের জবানির তীক্ষ্ণ শ্লেষ বা খেদোক্তিগুলি কবির বেদনাই বহন করে। অন্যায়ে অন্যায়কারীর সমান হ'লেও তাতে হার—কবির এ বাণী মানুষ যদি মনে রাখত!

প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথ এমন স্বাদেশিকতা চান নি। তিনি চেয়েছিলেন একের সঙ্গে বহুর মিলন, বহুর সঙ্গে একের মিলন, সকলের মিলন। তা ছাড়া, সেই স্বদেশী-যুগেই তিনি বলতে চেয়েছিলেন, রাষ্ট্রিক পরাধীনতা কিছুই নয়, সমাজ স্বাধীন হ'লে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা আসতে বাধ্য। অপর পক্ষে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা পেয়ে গেলেও সমাজ স্বাধীন না হতেও পারে। এ দিক দিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর বেশ মিল আছে, তিনিই অবশ্য পূর্বসূরী। অনেক আগেই তিনি বুঝেছিলেন, সমাজকে ঢেলে সাজানো দরকার, লিখেছিলেন 'স্বদেশী সমাজ'। সক্রিয় রাজনীতির বিপথগামী আবর্ত থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে এই স্বদেশী সমাজ সৃষ্টি করবার কাজেও রবীন্দ্রনাথ তখন আগুয়ান হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় তখন ক্রমে ক্রমে গ'ড়ে উঠছে। এখানে কবি একান্তভাবেই কর্মী। এবং শান্তিনিকেতনে বা নিজের জমিদারিতে গঠন-কাজের পরীক্ষা চালাতে গিয়ে কিছু কিছু সম্পত্তি খুইয়েছিলেন, এটাও আমাদের ভুললে চলবে না।

'স্বদেশী সমাজে'র বিরুদ্ধেও কিন্তু কিছু কিছু সমালোচনা অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর সমালোচনা তেমন না হ'লেও, বিশেষ কেউই তার মর্ম বুঝতে পারে নি। কেন না,

অন্ত চিত্তমথনের দিনেও তিনি ইংরেজ তাড়াবার একটাও বিদ্বেষপূর্ণ কথা বলেন নি, কেবল গঠনকর্মের এক তালিকা উপস্থিত করেছেন। 'স্বদেশী সমাজ' তাই অনেকের অনুরাগ কুড়োতে পারল না। তবে আজকের দিনে আমরা তার মূল্য বুঝতে যেন পারছি। গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্যক্রমের এমন একটি দফাও বের করা শক্ত, যা রবীন্দ্রনাথের অত দিন আগেকার লেখায় ছিল না। এই সবের জন্যেই না পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর মিলন সম্ভব হয়েছে, এই সবের জন্যেই না রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর গুরুদেব। বস্তুত মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের অক্লান্ত অনুসারী—তাঁরা দুজনে একই ভাবের ভাবুক। "৪ঠা আশ্বিনে"র অল্প পরিসরেও এর প্রমাণ মিলবে।

এরবিধায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী ভাবধারা এগিয়ে গেছে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী স্বাদেশিকতা তাঁকে বারংবার ব্যথিত করেছিল। কিন্তু ১৯৩০-এ যখন সোভিয়েট-রাশিয়া ঘুরে এলেন, তিনি শান্তি পেয়েছিলেন সেখানকার সমাজব্যবস্থা দেখে। ফিরে এসে বেরোল 'রাশিয়ার চিঠি'। এ সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে অর্থনৈতিক দৈন্য দেখা দিয়েছে। বিশেষত ভারতে এর ওপর ছিল দ্বিতীয় অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন দমনে বিদেশী শাসকের নিষ্করুণ অত্যাচার। সোভিয়েটের পটভূমিতে খতিয়ে কবি বুঝলেন, তাঁর নিজের দেশ কত অসহায়। আজ নয়, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় নবযুগের আদর্শ তখনই তিনি অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এর পরে জওহরলাল ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে লক্ষ্ণৌ ও ফয়জাবাদে যা বক্তৃতা দেন, তা প্রায় সবই 'রাশিয়ার চিঠি'তে বলা হয়ে গিয়েছে।

প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিদেশে। ফিরে এলেন যখন, দেশে জাতীয়তার বান ডেকেছে। যিনি জাপানের বুকের ওপর জাপানীদের সংকীর্ণ দেশাত্মবোধকে কশাঘাত করেছেন, ইউরোপের মাটিতে দাঁড়িয়ে ইউরোপের আক্রমণাত্মক স্বদেশপ্রেমের কঠোর সমালোচনা করতে ভোলেন নি, তিনি নিজের দেশের এই আন্দোলনকেও হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না, যদিও অসহযোগের মর্মবাণী কবির আজীবন সাধনার সঙ্গে অভেদ। জাপানে, আমেরিকায়, ইউরোপে জাত্যাভিমানের প্রলয়ঙ্কর প্রকাশ তিনি দেখেছেন, ধর্মোন্মাদনাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের বিপদ তাই তিনি বুঝেছেন। তাঁর মনে কেবল ভয় এই, অসহযোগও যদি সে রকম কলুষিত রূপ পরিগ্রহ করে? বললেন, এ আন্দোলন নেতিবাচক। বিদেশী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্যবান রত্ন রয়েছে, সে সব আহরণের পথ রুদ্ধ ক'রে শিক্ষার মিলন হওয়া সম্ভব নয়, এবং এমন ব্যবস্থা নেতিবাচক।

কিপ্‌লিং প্রমুখ কূপমণ্ডূক কবিদের ধারণায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন কখনই হতে পারে না। কিন্তু আমাদের রবীন্দ্রনাথ একদিন গেয়েছিলেন—"দিবে আর নিবে,

মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।" হালে অবশ্য আমরা শুনি, ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধেই ভারতবাসীর অভিযান, ব্যক্তিগতভাবে কোনও ইংরেজের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু প্রথম অসহযোগেরও অনেক আগে রবীন্দ্রনাথের "ভারত-তীর্থে"র মত কবিতা কতখানি বিপ্লবাত্মক, সে কথা ভেবে দেখলে অবাক হতে হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সময় উপাধি-পরিত্যাগের গুরুত্ব এর পরে বিবেচ্য। কিন্তু আজকের কেউ কেউ কবির এই প্রাগ্রসর মাত্রাচেতনার ক্রম[১] জেনে নিয়েও যদি তাঁকে সাম্প্রদায়িক ভেদসম্পন্ন ব'লে গণ্ডিবদ্ধ করতে চায়, বা "ভারত-তীর্থে"র মধ্যে অপ্রচ্ছন্ন হিন্দুরূপক[২] দেখতে পায় তো সে দোষ কবির নয়, বিভ্রান্ত উত্তরসূরীদের। জীবনের প্রায় অধিকাংশ সময়েই যাঁর মনের নায়ক বিশ্বমানব, সামান্য ধর্মাভিমান কেমন ক'রে তাঁতে বর্তাবে? এমন কি বঙ্গভঙ্গের দিনেও যখন কবি কিছুটা আবেগচপল ছিলেন, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তাঁর নিজস্ব ধারণাগুলি সব সময় ফুটে ওঠে নি পুরোপুরি—সেই রাখিবন্ধনের দিনেও তিনি মুসলমানদের হাতে মিলনের রাখি বাঁধতে গিয়েছিলেন। কেউ বেঁধেছিল কেউ বাঁধে নি। প্রকৃতপক্ষে এসব ইতিহাস ভুলে না গেলে কবির আজীবন শিবসাধনাকে আর অস্বীকার করা যায় না।

তিরিশের মুক্তিসংগ্রামের সময় কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্তরদেবতা সাড়া দিয়েছিল, কারণ প্রথমবারের অসহযোগের ওপরে উন্নীত হয়েছিল এ আন্দোলন। এ আইন-অমান্য। রক্ষকরূপী বিদেশী ভক্ষকের অন্তহীন অবিচারের আইন অমান্য করতে গেলে যে 'সাহসবিস্তৃত বক্ষপট' থাকা প্রয়োজন, তেমন দৃঢ়তা এ আন্দোলনের মধ্যে দেখেছিলেন ব'লে সমর্থন করেছেন। সত্যি বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় ভাবধারার পরিবর্তন এতে বোঝায় না। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের নেতিবাচক বহিঃপ্রকাশের প্রতিই ছিল তাঁর বিরাগ, নইলে সত্যাগ্রহদর্শন আর সমাজসংগঠনের মূলতত্ত্ব ১৯২২ সালের রচনা 'মুক্তধারা'য় যেভাবে ফুটে উঠেছে, তা অতুল্য। তাঁর যা স্বপ্ন সেই আদর্শে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ভারতীয় রাজনীতির মান পরিবর্তিত হচ্ছিল ব'লেই রবীন্দ্রনাথ আইন-অমান্য এবং সত্যাগ্রহকে অর্ঘ্য দিয়েছেন। প্রাণশক্তির এই গতিধর্ম রবীন্দ্রনাথের চিন্তার এক-একটি অবিচ্ছেদ্য চরণ। কবির চিরকালের ধ্যান নবীন ও সবুজ প্রাণের

১ 'ধর্মপ্রচার' জাতীয় নিছক ধর্ম সম্বন্ধের আলোচনা হতেও রবীন্দ্রনাথের এই মাত্রা-চেতনার ক্রম কিছু কিছু জানা যায়। ওতে তিনি এমনও বলতে চেয়েছেন যে, সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্মসাধনাকে মানুষ যখন আধ্যাত্মিক সাধনা হিসেবে গ্রহণ করে, ধর্মসাধনা খণ্ডিত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

২ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'জাতীয় সঙ্গীতে'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

মধ্যে অনুরণন তুলেছে। "ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা, ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।"

এ সমস্তর মধ্যেই রবীন্দ্র-মননের একটা ঐতিহাসিক ক্রম র'য়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের এ ঐতিহাসিক বোধ আস্তে আস্তে প্রকট হয়ে উঠল 'পরিশেষ', 'রথের রশি', "৪ঠা আশ্বিন" প্রভৃতি রচনায়, যার জের 'প্রান্তিকে'ও কাটে নি। তবু 'পরিশেষে'র "প্রশ্ন"-জাতীয় কবিতায় কবির অন্তর্লোক যেন খানিক সংশয়ে দুল্যমান। ভগবান, যারা প্রত্যহের হিংসা ও বিদ্বেষবিষে তোমার স্বর্গরাজ্য বিষাক্ত ক'রে তুলল, তারা কি তোমার ক্ষমা পাচ্ছে? পাওয়া উচিত না হ'লেও এই প্রশ্ন উঠিয়ে তিনি নিজের কাছে মোহমুক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর সৃষ্ট 'গোরা'র ঘটনাবৈগুণ্যই তাঁর নিজস্ব জীবনাদর্শের বিশেষ বোধক। সংকীর্ণ জাতি বা ধর্মমত কাটিয়ে উঠে বাহির-বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ। গোঁড়া গোরাকে শেষ পর্যন্ত আইরিশজাত প্রতিপন্ন ক'রে পৃথিবীর পথে ছেড়ে দিলেন। পরবর্তী প্রবাহ বাস্তবে উহ্য থাকলেও আমরা কল্পনা ক'রে নিতে পারি। গোরার শুরু ও শেষ— এ দুয়ের মাঝখানে যে সোপান বর্তমান, তার এক-একটি ধাপ অতিক্রম ক'রে স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের মানস মহাজাতির রূপায়ণে রঙিন। কবির স্বাজাত্যবোধ এই চক্রপথই প্রদক্ষিণ ক'রে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা তাই সব সময় স্বার্থসন্ধ সংকীর্ণতাকে পেছনে ফেলে গেছে, ভঙ্গ দিয়ে গেছে পারম্পরিক পরিবাদী রণে। কি "সত্যের আহ্বানে" কি "Nationalism"-এ, কি 'মুক্তধারা'র রূপকে, কি 'কালান্তরে'র প্রবন্ধগুলিতে তাঁর মত পরিস্ফুট। প্রধানত গীতধর্মী এবং রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত হওয়ায় 'রক্তকরবী'র সমাজচেতনা ততটা বিকশিত নয়, কিন্তু 'মুক্তধারা'য় সমসাময়িক কালের পশ্চাদপটে কবির সমাজমানস আশ্চর্য সচেতন। প্রথম মহাযুদ্ধের বড় বড় আদর্শ ইতিমধ্যে উবে গেছে। মানুষের কেবল পাশবিক শক্তিই বাড়িয়ে তুলেছে যন্ত্রসভ্যতা। প্রভুজাতির দৌরাত্ম্য তখনও অবাধ। এর ওপর আছে সত্যাগ্রহের প্রশস্তি, যাতে ক'রে ইউরোপের ধনতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতার অকিঞ্চনতা আরও বেশি ক'রে ধরা পড়েছে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী, জাতি ও বর্ণদ্বেষক্লিষ্ট দেশাত্মবোধের উদ্যম ও প্রসারণ যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতায় সম্ভব, তা কি সত্যিকারের স্বাধীনতা? বস্তুত এ রকম Aggressive Nationalism বা আক্রমণশীল জাতীয়তার পোষকতা করা রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের অগোচর। যে স্বাদেশিকতা অপর কারও স্বাধীন সত্তার অপহ্নব ঘটাবার ইচ্ছে রাখে, কাজ কি তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে? বিদায় নেবার আগে তাই কবি ডাক দিয়ে গেছেন তাদের, 'দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।' এ আহ্বানে সাড়া দেবার ভার শুধু ভারতীয়ের নয়, বিশ্বমানবের, কবির যিনি মনের নায়ক।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা একটা আবেগপূর্ত আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়, তাঁর সারা জীবনেরই ধ্যান-ধারণার অবিভাজ্য অংশ। স্বদেশী-যুগে তাঁর প্রধান প্রকাশ হ'লেও পরে সে-ভূমিকা গৌণ হয়ে গেছে। কবির শেষের দিকের রচনাগুলি খানিকটা মৃত্যুকল্পী। তবে 'রোগশয্যা'র পর তাঁর মুক্তিস্নান হ'ল: সবরকম অন্ধকার থেকে মন তাঁর তখন জ্যোতির্ময় আলোকের এষণায় স্থির। কিন্তু তবু যেন তিনি সংসারবিমুক্ত নন। আরও স্বচ্ছ আরও গভীর দৃষ্টির অধিকারী হয়ে তিনি তখন ভারমুক্ত, প্রজ্ঞায় স্থিত। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত চেতনা নিয়ে বিচার করেছেন তাঁর সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে, বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর নিজস্ব অনুভূতিকে। এই নিরাসক্তিই তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীকে পূর্ণাঙ্গ করেছে। এ সময়ে কবি 'শেষ খেয়া'র জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, তবু সংসার আর পৃথিবীকে ভালবেসেছেন ব'লে তাঁর পিছুটান কাটছে না। "এবার ফিরাও মোরে"তে সুখদুঃখের সংসারে ফেরবার যে একটা অদম্য আকূতি দেখা গিয়েছিল, তা যেন গিয়েও যাচ্ছে না। চারিদিকে ভিড় ক'রে আসছে অনুন্নত মানুষেরা, শ্রমধর্মী সাধারণ মানুষেরা, বর্তমান সমাজব্যবস্থার বিষময় ফলে যাদের জীবন দুর্বহ, মানবতার অধিকারে যারা বঞ্চিত। হয়তো এরা বেশি অসহায় ব'লেই এদের বেশি ক'রে মনে পড়েছে সংবেদনশীল কবির! দুনিয়ার শোষণের হাত থেকে এদের বাঁচাবার উপায় কি? এর প্রতিকারের জন্যে কবি হয়তো আরেকবার নতুন মন্দ্রে বিষাণ বাজাতেন, কিন্তু তার আগেই কাল তাঁর জীবনতরীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল অনাদি শান্তির পারাবারে।

রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনার এই-ই হচ্ছে ভূমিকা, যা তাঁর স্বদেশপ্রেমেরও বৃত্তি। 'চিত্রা'র ইঙ্গিত 'গীতাঞ্জলি'তে সার্থক হয়েছে, এবং তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথের ভগবান স্বর্ণসিংহাসন ছেড়ে নেমে এসেছেন সংসারের পথের ধূলোয়, "সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে"। গেছেন "যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ, পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস"। ওই পথে পরবর্তী-কালেও রবীন্দ্রমানস এই মূল ভাব থেকে বিচ্যুত হয় নি বরং আরও পরিণত রূপ পেয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে একমাত্র 'রথের রশি'ই[৩] তো যথেষ্ট। ওতে কবি অবিশ্বাস্য বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। অনেক-দিনের অনড়ত্বের পর মহাকালনাথের রথ আজ বাধা-বন্ধহারা হয়ে ছুটে চলেছে। ইতিহাসের আবর্তনে রশি ধরেছে জনতা। এবার চাকার তলায় পড়বার পালা কুটিল

৩ 'রথের রশি'র ভাবাদর্শ কতকটা বিশ্বের পটভূমিতে। এরই ভারতীয় রূপ "৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩৯"-এর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে মহাত্মাজীর মৃত্যুপণ-অনশনব্রতের গূঢ়ার্থকে অনুধাবন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "আমাদের রাষ্ট্রিক মুক্তিসাধনা কেবলি ব্যর্থ হচ্ছে এই (সামাজিক) ভেদবুদ্ধির অভিশাপে।'

ধনপতি আর দাম্ভিক শস্ত্রপাণিদের। তাদের ধনভাণ্ডার আর শস্ত্রশালা সব গুঁড়িয়ে যাবে। "জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে"। কালের এই রথযাত্রায় কবিরও ডাক পড়েছে বহুবার, কিন্তু "কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারে নি সে পৌঁছতে"। শেষের দিকে কবির আত্মসমালোচনার সুর। প্রগতিক চেতনার ধারক হয়েও তিনি তাঁর দুর্ভাগা দেশের অপমানিত জনতার প্রতি ঠিক সুবিচার করতে পেরেছেন কি না, এই চিন্তা তাঁকে আগাগোড়া পীড়া দিয়েছে। সেজন্যে তিনি আবাহনও জানিয়ে গেছেন আগামী দিনের সেই মহাকবিকে, যিনি অজের আশায় ধ্বনিত করতে পারবেন এদের ভগ্ন বুক, মূক মুখে দিতে পারবেন স্বপ্রকাশের ভাষা, জগতের সামনে মহীয়ান করবেন এদের জীবন, সত্য ক'রে তুলবেন তাঁর অভীপ্সাকে। কবির আবাহন ফলপ্রসূ হোক।

কবি তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। স্বদেশের মধ্যে জাতীয় জাগরণ দমনে বিদেশী শাসকের অত্যাচার; বিদেশে ফাসিস্ত ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়ার স্বাধীনতাহরণ, মদগর্বী জাপানের চীন আক্রমণ এবং সবার ওপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও সর্বাত্মক ধ্বংসপর্বের প্রারম্ভ। তাও তো তিনি দেখলেন না আগষ্ট অভ্যুত্থানের দিনে ভারতে সরকারী চণ্ডনীতি, দেখলেন না পঞ্চাশের মন্বন্তর, দেখলেন না আণবিক যজ্ঞ। কিন্তু যা দেখেছেন, সেই দুঃস্বপ্নগুলিই তাঁর শেষ জীবনকে বিস্বাদ ক'রে তুলতে যথেষ্ট। তাঁর একান্ত ভালোবাসার পাত্র মানুষ আজ তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্বার্থের হানাহানিতে মানুষের ভগ্নাংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সংঘাতের কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই, যেখানে আশ্রয় নিয়ে কবির মন কিছু স্বস্তি পেতে পারে। এ বেদনা কবি ভুলবেন কি ক'রে? তাঁর স্বপ্ন তো এ নয়, তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা যে মহাপৃথিবী গড়বার, গোটা মানুষ গড়বার, তা হ'লে কেন এমন হয়? তিনি কি মিথ্যাদ্রষ্টা? এর জবাব দিতে গেলে মানুষের প্রতি তাঁর সমস্ত বিশ্বাস ভেঙে যেতে পারত, কিন্তু তিনি সত্যিকারের বিবর্তনবোধের অধিকারী হয়েছিলেন ব'লেই বুঝতে পারলেন, বর্তমানের এই ধ্বংসের মধ্যেই মানবসমাজের ইতিহাস শেষ নয়। "যুগাবসানে লাগেই তো আগুন। যা ছাই হবার তাই ছাই হয়, যা টিকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের"। সুতরাং ভাঙার ভেতর দিয়েই গ'ড়ে উঠবে নতুন উপনিবেশ, গর্ভবেদনার পরেই প্রসূত হবে নবজাতক, দেশ কাল অগ্রাহ্য ক'রে জয়ী হবে শাশ্বত মানুষের ধর্ম। নতুন সমাজব্যবস্থায় তৈরি হবে নতুন স্বাধীনতা, তোমার-আমার সকলের স্বাধীনতা। আজকের রাত্রির এ তপস্যা কালকের সূর্যজ্বলা দিন, আজকের সভ্যতার এ সংকট কালকের পরিপুষ্ট সৃষ্টি; আর এইখানেই কবির বিশ্লেষণ শেষ।

শ্রীসনৎ মুখোপাধ্যায়

২

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট, জেলা হাবড়া, ১৩.৬।২৯

মণ্টু, তোমার নামে তো আর ওয়ারেণ্ট ছিল না যে সাধু হতে গেলে? ব্যস্, আর না। এই পত্র পাবা মাত্র চলে আসবে। আবার না হয় দিন কতক পরে যেয়ো ক্ষতি নেই। আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমার কথাটা শুনো। তোমার বয়সে আমি চার-চারবার সন্ন্যাসী হয়েছি। ও অঞ্চলে বোধ করি মাছি আর মশা কম, নইলে হিন্দুস্থানী ব্যাটাদের পিটের চামড়া ছাড়া কার সাধ্য সে দংশন সহ্য করে! এ বাঙ্গালীর পেশা নয় বাপু, কথা শোন, চলে এসো। তুমি এলে এবার একসঙ্গে বর্ষার পরে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ একবার বেড়াতে যাবো। তুমি সঙ্গে না থাকলে খাতির পাওয়া যাবে না, খাওয়া-দাওয়ারও তেমন সুবিধে ঘটবে না। কবে আসচো পত্রপাঠ লিখে পাঠাবে। আমি ইষ্টিসানে যাবো।

আর একটা কথা। বারীন শুনেছি যে-কোন গাছের পাতা তোমার নাকের ডগায় রগড়ে দিয়ে যে-কোন ফুলের গন্ধ শুঁকিয়ে দিতে পারে। উপেন বাঁড়ুয্যে বলে এটা সে কর্ত্তার কাছ থেকে মেরে নিয়েচে। আসবার সময় এটা তুমি শিখে নেবে। হঠাৎ সে মানবে না, কিন্তু ছেড়ো না। দিন কতক তার আন্দামানের বাঁশীর খুব তারিফ করতে থাকবে এবং বইখানা সর্ব্বদাই হাতে হাতে নিয়ে বেড়াবে। এবং, এ বই এতদিন যে পড়োনি এই বলে মাঝে মাঝে তার সুমুখে অনুতাপ প্রকাশ করবে। খুব সম্ভব এই হলেই "বিভূতি"টা হস্তগত করে নিতে পারবে। উত্তর ভারত বেড়াবার সময় এটা বিশেষ কাজে লাগবে।

অনিলবরণ শুনেছি নাকি মাটির গুঁড়োকে চিনি করে দিতে পারে। বেশিক্ষণ থাকে না বটে, কিন্তু ৫।৭ ঘণ্টা চিনির মত দেখতেও হয়, খেতেও লাগে। এটাও নিশ্চিত শিখে আসবার চেষ্টা কোরো। হঠাৎ টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে পথে ঘাটে বিদেশে,—বুঝেচ ত? এটা শেখাই চাই। অনিলবরণ লোকটি সরল এবং ভালো মানুষ,—একান্তই যদি শেখাতে আপত্তি করে তো খুব ভূত পেত্নীর গল্প করবে। হলফ করে বলবে যে পেত্নী তুমি চোখে দেখেচো। তারপরে ভাবতে হবে না,—অনায়াসেই কৌশলটা মেরে নিতে পারবে। আর এ দুটো সত্যিই যদি শিখে নিতে পারো ত ওখানে কষ্ট করে থাকবারই বা দরকার কি?

সেদিন একটা সাহিত্যিক মজলিসে তোমাদের সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা শুনছিলাম। সুরেশ চক্রবর্ত্তী না কি সমস্ত মেয়েদের ন্যাংটো করে দেবার প্রস্তাব করে একটা কি কবিতা লিখেচে না এমনিই কি একটা কথা। সকলে ভারি নিন্দে করছিল। করবারই কথা।

মেয়েদের ন্যাংটো করে সারবন্দি দাঁড় করিয়ে দিলেই যে তাদের অত্যন্ত রূপসী দেখতে হয় এ খবর তাকে কে দিলে? যে-ই দিয়ে থাক্, ভুল খবর দিয়েছে। তোমাদের আশ্রমটা চোখে দেখবার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়। কয়েকটা খবর লিখো—

আশ্রমে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কিরূপ? অনেকে বলে শ্রীঅরবিন্দের মেজাজ ভারি গরম। তিনি সকল সময়ে বার হন না তাই রক্ষে, নইলে যারা আশ্রম দেখতে যায় তাদের না কি সেই সময়টায় (অর্থাৎ inspection এর সময়টা) গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হয়। সুমুখে পড়ে গেলে দুর্গতির একশেষ হয়। এ সব কি সত্যি? ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে কেমন তিরিক্ষি হয়ে গেছেন। আমি অনেক আশ্রমের মোহন্তদের এই রুক্ষ স্বভাবটা লক্ষ্য করেছি। এই হয়ত এই line এ স্বাভাবিক। যাই হোক, যদি যাই এই খবরগুলো জানিয়ো।

অনেককাল তোমাকে দেখিনি। ভারি দেখবার ইচ্ছে হয়, গান শোনবার সাধ হয়। কবে আসবে জানিয়ো। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ— "বিভূতি" ছুটো আদায় করে আনাই চাই। সময়ে অসময়ে ভারি কাজে লাগে। যাই হোক্ শীঘ্র চলে এসো। সন্ন্যাসী হওয়া ভারি খারাপ মণ্ট্, আমার কথা বিশ্বাস কর। আজকালকার দিনে কিচ্ছু মজা নেই। কবে আসবে নিশ্চয় লিখো।

ক্রমশ

পদচিহ্ন

(পূর্বানুবৃত্তি)

সমস্ত অস্পৃশ্য পল্লীটা শিউরে উঠল। ওগো মা গো, কি হবে গো! হে বাবা ধর্ম্মরাজ, হে দয়াময়, রক্ষা কর বাবা, রক্ষা কর।

বাউড়ীপাড়ার মাতব্বর নোটন বাউড়ী এসে দাঁড়াল সাতনের উঠানে। অন্য মাতব্বর অটল সে আগেই এসে ব'সে ছিল সাতনের বাড়ির দাওয়ায়। সাতন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে মাটির দিকে অর্থহীনভাবে তাকিয়ে রয়েছে, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে, সর্ব্বাঙ্গের পেশী এখনও কঠিন হয়ে রয়েছে। সাতনদের সংসার এখন সমস্ত পাড়ার মধ্যে জমজমাট সংসার। সাতনেরা সাত ভাই, পাঁচ ভাই উপযুক্ত, ভরাভর্ত্তি জোয়ান। সাতনের মায়ের ষষ্ঠ সন্তান পরী। পরীর বয়স সঠিক কত, সে সাতনের মা বলতে পারে না। বলে, বামপাড়ার মুখুজ্জেবাবুদের ছেলে গোবিন্দতে আর আমার পরীতে একদিনে হয়েছে। গোবিন্দের বয়স সতেরো বৎসর তিন মাস। পরীর পিঠে পর পর দুই ভাই, পরস্পরের চেয়ে দু বছরের ছোট। পনরো আর তেরো বয়স হয় হিসেবে। এ বছর হিসেবটা

হয়েছিল বিশেষ ক'রে—এই কয়েকদিন আগেই। পরীর ঠিক পরের ভাইয়ের ভক্ত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে হিসেব হয়েছিল, পরীর মা মুখুজ্জে-বাড়িতে গিয়ে গোবিন্দের বয়স জেনে অটল দেওরকে দিয়ে তার থেকে দু বছর বিয়োগ করিয়ে ঠিক করেছিল 'নারানের' (নারানের) বয়স এখনও ষোলো পূর্ণ হয় নাই; সুতরাং ভক্ত হওয়া হয় নাই নারানের; ষোলো বছরের আগে ধরমের ভক্ত হতে 'নেষদ' (নিষেধ) আছে সাতনদের সংসারে। নিষেধ ক'রে গিয়েছে সাতনের 'কত্তামা' (ঠাকুরমা); সাতনের ঠাকুরমায়ের এক ভাই মারা গিয়েছিল ষোলো বছর বয়স পূর্ণ হবার আগে ধরমের ভাঁড়াল মাথায় ক'রে। ভাঁড়াল রেখে এসে ছেলে বাড়ি ফিরল 'মাথা গেল, মাথা গেল' রব তুলে। গায়ে সে কি জ্বর! ধান দিলে খই হয়ে ফুটে যায়, এমন তাপ গায়ে। ঘন ঘন প্রস্রাব। নাকের সে কি শব্দ! আর বকুনি—ধম্মরঞ্জো! ধম্মরঞ্জো! বৈদ্যতে বললে, তাত লেগেছে। কিন্তু ওষুধে কিছু হ'ল না। বৈদ্যের কথা বিশ্বাস করে নাই কেউ। ছেলেটা ধড়ফড় ক'রে ম'রে গেল। সেই অবধি সাতনের ঠাকুরমায়ের মা নিষেধ দিলে, ষোলো বছর না পূরলে ভক্ত হ'লে 'খ্যানত' অর্থাৎ খুঁত হবে। তবে বাপ যদি থাকে, তবে ষোলো বছর না হ'লেও ছেলে বাপের কাছে উতুরী চেয়ে নিতে পারবে। যাক সে কথা। ষোলো বছর বয়স না হওয়ায় নারানের ভক্ত হওয়া হয় নাই বটে, কিন্তু জোয়ান সেও প্রায় পূরো হয়ে উঠেছে। সেই এখন ঘর-সংসারের কর্ত্তা। পাঁচ ভাই এখন চাষের কাজ করে, চাষের কাজ না থাকলে জনমজুর খাটে; তাদের সঙ্গে থাকে পাঁচ বউ। নারান এতদিন বাবুদের ঘরে রাখালের কাজ করত, সে কাজ থেকে এবার তাকে ছাড়িয়ে ঘরের কাজে দেওয়া হয়েছে। ঘরের কাজ এবার অনেক সাতনদের। এবার তারা দু জোড়া বলদ কিনেছে; দু জোড়া হালের পিছনে খাটবে পাঁচটা মরদ, পাঁচটা মেয়ে। ভাগে জমি নিয়েছে। স্বর্ণবাবু জমি দিয়েছেন কুড়ি বিঘে। আরও বাবুদের জমিও পেয়েছে সাতন। এবার মোট তিরিশ বিঘে জমি। জমি আরও অনেকে দিতে চায়, কিন্তু নিয়ে করবে কি সাতন? গরু দু জোড়া ছোট, বয়সেও কাঁচা, এখন বেশি চাপ দিলে হয়তো ভরা চাষের সময় অক্ষম হয়ে পড়বে। তা ছাড়া এত অল্প সময়ের মধ্যে আর তারা কি করবে?

পরী শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে তিন মাস। তার মাস খানেক পরেই নোটন মুরুব্বি এল। বললে, সাত ভাই তোরা হাল কর্। পরের ঘরে খেটে মরছিস কেনে?

হাল করা কি সোজা কথা কাকা? টাকা কোথা?

বাবুর কটা ষাঁড় আছে। যাস বাবুর কাছে, আমি ব'লে দোব। বাবু অর্থাৎ স্বর্ণবাবু। স্বর্ণবাবুর প্রিয়পাত্র নোটন।

ঠিক এই সময়ে জলের কলসী নিয়ে পরী ঘরে ঢুকছিল, কথাগুলি শুনে সে ব'লে গেল, মরণ! ঘরে ঢুকে সে অকারণে খিলখিল ক'রে হাসতে লাগল।

সাতন চুপ ক'রে রইল, উত্তর দিলে না। স্বর্ণবাবুর গোদান গ্রহণ করতে গেলে কি দিতে হবে সে অনুমান করতে পারে। কিন্তু সে কে? বধূদের মধ্যে—? ভুরু কুঁচকে উঠল তার।

নোটন বললে, তোর মাকে পাঠিয়ে দিস আমার বাড়ি।

সাতন এ কথারও কোন জবাব দিলে না। ভাবতে লাগল।

ব্যাপারটা সহজ ক'রে দিলে মা; মায়ের অনেক বয়স হয়েছে। আপত্তি করেছিল সাতন; সাতনের মা বলেছিল, তু থাম্ রে। তোর প্যাটে (পেটে) আমার জন্ম, না আমার প্যাটে তোর জন্ম? সে নিজে গিয়েছিল স্বর্ণবাবুর কাছে। নোটন অবশ্য সঙ্গে গিয়েছিল। এক জোড়ার বদলে দু জোড়া ষাঁড় সে বাবুর কাছে আদায় ক'রে নিয়ে এল। এটা সেই যে রাত্রে স্বর্ণবাবুর বাগানবাড়ির দাওয়ায় দারোগা এবং স্বর্ণবাবুর মাঝখানে নিকষ পাথরে গড়া নারীমূর্তির মত একটা কালো মেয়েকে অনাবৃত দেহে প'ড়ে থাকতে দেখেছিল কিশোর, সেই দিনের কথা।

ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত স্বাভাবিক।

কতকাল থেকে চ'লে আসছে এই ধারাধরন, সে হিসেব কেউ করে না। ওদের করার কথাই নয়। ওরা কুড়ির বেশি গুনতে জানে না। কাল ব'লে কিছু জানেই না ওরা। বয়সের হিসেব করে বাবুদের ছেলেদের বয়স ধ'রে। নিজের বাপের নাম জানে, পিতামহের নাম প্রবীণকে জিজ্ঞাসা না ক'রে বলতে পারে না। অতীতের কথা ওরা জানে না। বাবুরা বলে, বহুকাল আগে এখানে এক বাউড়ী রাজা ছিল। একটা মজা দিঘি দেখিয়ে বলে, বাউড়ী রাজার দিঘি। সে কথা শুনেও ওদের মনে এতটুকু চাঞ্চল্য জাগে না। কোন প্রশ্ন মনে ওঠে না। বাপপিতামহের আমলের কয়েকটা কথা জানে। তার মধ্যে একটা কথা হ'ল, ঠাকুরমায়ের, মায়ের কলঙ্ক-কাহিনী। সে কাহিনী লজ্জার নয়, ঘৃণার নয়, শুধু একটু রসঘন মাত্র। বাল্যকাল থেকে দেখেছে, বাবুদের পেয়াদারা আসে সন্ধ্যাবেলা তাদের পাড়ায় বেড়াতে; পুরুষদের সঙ্গে, মেয়েদের সঙ্গে হাসে গল্প করে, ক্রমে পুরুষেরা উঠে যায়, পেয়াদা তবু ব'সে থাকে। রাজমিস্ত্রীরা আসে, তারাও ব'সে থাকে পেয়াদাদের মত। মেয়েরা তাদের কাছে মজুরনী খাটে। মধ্যে মধ্যে বিদেশী মিস্ত্রীদের সঙ্গে দু-চারটে মেয়ে পালিয়েও যায়। মধ্যে মধ্যে শোনে, মেয়েরা কেউ গিয়েছিল কাঠ ভাঙতে বাবুদের বাগানে, সেখানে বাবুদের ছেলেরা ডেকে নিয়েছে। গ্রামের বেনেদের সাহাদের কয়েকজনের বাড়িতে তাদের পাড়ার কয়েকটি মেয়ে স্থায়ীভাবে বাস করছে। অধিকাংশই ঝিউড়ী মেয়ে, জন দুই বহুড়ীও আছে। মধ্যে মধ্যে রাত্রে ঘুম ভেঙে যায় উন্মত্ত চীৎকারে। প্রবীণেরা শিউরে উঠে বলে, বাবুরা মেতেছে।

মদ খেয়ে মধ্যে মধ্যে বাবুদের ছেলেরা মাতাল হয়ে আসে। কারও দোরে লাথি মারে। সকালে দেখা যায়, বাবুদের ছেলে ওদের কারও ঘর থেকে ঘুম ভেঙে বেরিয়ে যাচ্ছে। অথবা কারও বউ বা বেটী বাবুপাড়া থেকে ভোরে ফিরে আসছে নিজের বাড়ি খুঁটে বাঁধা একটা আধুলি কি একটা সিকি অথবা একটা টাকা।

এ ক্ষেত্রে পরীর ভাগ্য তো কল্পনাতীত সৌভাগ্য বলতে হবে। দু জোড়া খাড়ু, অন্তত পঞ্চাশ টাকা দাম। শুধু বাবু ব'লে দিয়েছে, খবরদার, আর কোথাও যদি যাওয়া শুনি, তবে—। তবে কি করবেন বা কি হবে, সে কথা বাবু স্পষ্ট বলেন নাই, কিন্তু সে যে কি না হতে পারে তা ভেবে উঠতে পারে না সাত্তন বা সাত্তনের মা। ঘরের চাল কেটে তুলে দিতে পারে, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে ঘর, চুরির দাবিতে এজাহার করতে পারে থানায়, থানাতেই বা যেতে হবে কেন, ধ'রে নিয়ে গিয়ে খুঁটি কি থামের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারে, জুতো কি বেত মেরে পিঠের চামড়া তুলে দিতে পারে। খুন ক'রে লাশ গায়েব ক'রে দিলেই বা কে কি করতে পারে?

এই কারণেই চন্দ্র গড়াঞীর আক্রোশ। কয়েকদিন থেকেই সে আসা-যাওয়া শুরু করেছিল। পরীর নামটা এখন গোটা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এ পাড়ার রাস্তা দিয়ে ছোকরাদের যাতায়াত অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। বাবুদের ছেলে, বেনেদের ছেলে, সাহাদের ছেলে থেকে আরম্ভ ক'রে শেখ পাড়ার ছোকরা পর্য্যন্ত। মাত্র তিন-চারদিন মজুরনী খাটতে গিয়েছিল পরী। সেইখানে তাকে প্রথম দেখেন স্বর্ণবাবু। তারপর তার খাটতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরী-পরী শব্দটা ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। পরীর মায়ের অহঙ্কার বেড়েছে। সে বাবুর কাছে তালগাছ আদায় করেছে। কোঠা ঘর করবার কথা বলেছে ছেলেদের। পাড়ায় সে হেলেদুলে বড় বড় কথা ব'লে ঘুরে বেড়ায়। চন্দ্র গড়াঞীকে সে গোড়াতেই বলেছিল, গড়াঞী, ওদিকে তাকিও না বাপু। বাবু জানতে পারলে তোমাকেও জ্যান্ত রাখবে না, আমাদের তো গুষ্টীসুদ্ধকে মেরে ফেলাবে।

গড়াঞী শোনে নাই কথা।

তার ফলে একদিন সন্ধ্যাবেলা গড়াঞী তাড়া খেলে বাবুর চাপরাসীর কাছে। সেদিন অনেক লাঞ্ছনা হ'ত গড়াঞীর। কিন্তু ভাগ্য ভাল তার, তার নাগাল পায় নাই চাপরাসীরা। সামনে পড়েছিল একটা পাঁচিল, লম্বা মানুষ চন্দ্র, তার উপর সে চন্দ্র গড়াঞী, মুহূর্ত্তে পাঁচিলটার মাথায় একটা হাত দিয়ে লাফ দিয়ে টপকে ওপারে প'ড়ে ছুটে পালিয়েছিল। সাত্তনদের যোগসাজস ছিল এর মধ্যে এ কথা সত্য এবং সাত্তন সেদিন 'ধর ধর' ব'লে উচ্চ চীৎকার ক'রে হা-হা ক'রে হেসেছিল এ কথাও সত্য। তারই ফলে চন্দ্র করলে এই কাণ্ড।

নোটন বললে, তুই কিছু না ব'লে বাবুর কাছে এলি না ক্যানে? দেবাংশীর কথা নিয়ে পড়তে গেলি ক্যানে?

অটল বললে, মতিভ্যম দাদা, মতিভ্যম (মতিভ্রম) হয়েছিল আর কি!

নোটন বললে, চল্, আমার সঙ্গে চল্।

কোথা?

দেবাংশীকে ধরি গিয়ে। একটা পাঁঠা বরং দেখ্। বাবার থানে বলি দিবি।

না।

না কি রে?

না না না।— চীৎকার ক'রে উঠল সাতন।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল পরী। বললে, না নয়। যাও, ওঠ! পরীরও পরিবর্ত্তন হয়েছে; এ-সংসারের সকল সৌভাগ্যের যে কেন্দ্রস্থল সে, এ বোধ তার জন্মেছে। বিজ্ঞতার সঙ্গে দাদাকে উপদেশের খোলস পরিয়ে আদেশই করলে সে। কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। প্রচণ্ড ক্রোধে উঠে পরীর চুলের মুঠোয় ধ'রে আছাড় মেরে মাটিতে ফেলে দিলে সাতন। —হারামজাদী! তারপর কিল চড় লাথি মারতে লাগল, উন্মত্তের মত অশ্লীলতম গালাগালি দিতে লাগল।

হাঁ-হাঁ ক'রে উঠল সকলে। নোটন অটল জাপটে ধ'রে ফেললে সাতনকে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সাতন। পরী কিন্তু হাসিমুখে উঠে নিজের কাপড় এবং চুল সম্বৃত ক'রে বললে, ছেড়ে দাও কাকা, আরও খা কতক মারুক উ আমাকে। রাগটা পড়ুক ওর।

পরীর হাসিতে এবং কথায় ব্যাপারটা সহজ হয়ে উঠল। সাতনকে ছেড়ে দিয়ে নোটন বললে, সাধে কি আর আমাদিগে জাত-ছোটনোক বলে রে!

অটল বললে, কোধ-চণ্ডাল কি না, উনি ঘাড়ে চড়লে মানুষ তখন চণ্ডাল। আরে— আরে—আরে— এই যা!

মাঠ থেকে রোদে উত্তপ্ত হয়ে একপাল শূকর কাদা মেখে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ ক'রে এসে দাঁড়াল উঠানে। তারপর হঠাৎ, সম্ভবত ছায়ার প্রত্যাশায় সকলকে ঠেলেঠুলে দাওয়ার উপর উঠে গেল। তাদের অভিযানে বিব্রত হয়ে দাওয়ার কোণ থেকে প্যাঁক-প্যাঁক শব্দ ক'রে বেরিয়ে এল একপাল হাঁস। গোটা কয়েক মুরগী ফরফর ক'রে উড়ে বেরিয়ে গেল। মুহূর্ত্তে সমস্ত সংসারটা বিশৃঙ্খল হয়ে উঠল। তিক্তচিত্ত মানুষগুলি প্রত্যেকেই বিরক্তি অনুভব না ক'রে পারলে না। সাতনের মা অভিসম্পাত দিতে আরম্ভ করলে, মরুক, মরুক, মরুক। সাতনের হাতের কাছেই প'ড়ে ছিল একটা বাঁশের ডগার

দিকের টুকরো, সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে সে উঠে শূকরগুলোকে ঠ্যাঙাতে শুরু করল এবার। পৃথিবীটাকে রসাতলে দিতে পারলে তার ক্ষোভ আক্রোশ মেটে।

* * *

সান্তন কিছুতেই আর গেল না। সে যে সেই 'না' ধরেছিল, তাই-ই ধ'রে রইল। বললে, মরি মরব। আমি যাব না।

মা বললে, ওরে 'খালভরা' 'ডাকাবুকো', তোর যেন ভয় নাই, কিন্তুক গোটা সংসারটাকে ছারেখারে দিবি?

সান্তন বললে, বলেছি আমি, দেবাংশী আমাকে বলেছে নিব্বংশ হবে। 'ধ্যানত' হয়, আমার ওপর দিয়ে যাবে। নিব্বংশ হই, আমি হব। অন্তের সাথে তার সম্বন্ধ কি? ভয় লাগে তোমাদের আমি 'ভিন্ন' (ভিন্ন) হছি, আজই ভিন্ন হছি আমি।

সান্তনের স্ত্রী দাওয়া থেকে চীৎকার ক'রে উঠল, আমি মাথা খুঁড়ে মরব। আমি গলায় দড়ি দোব।

সান্তন বললে, দে গা, মর্ গা। মন যদি হয় বল্, আমি তোকে 'ছাড়ান-বিত্তেন' দিচ্ছি, চ'লে যা, অন্ত লোককে সাঙা কর্ গা। 'হিয়ে খোলসে' (হিয়া খোলসায়) বলছি আমি, চ'লে যা।

মা চীৎকার ক'রে উঠল, তা ব'লে বিধেন তো একটা করতে হবে?

বিধেন? এর আবার বিধেন কি? বলি, আমাকে যে নিব্বংশ হবে বললে দেবাংশী, আমার অপরাধটা কি? ওর কত্তের কথা কি আমি মনে গ'ড়ে মিছে ক'রে বলেছি? বলি, কথাটা সত্যি, না মিছে?

সত্যি হোক, মিছে হোক, তোর বলবার দরকার কি?

দরকার কি? একশো বার, হাজার বার, পাঁচ হাজার বার দরকার আছে। আমাকে বললে ক্যানে? হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। উঠানে পায়চারি করতে করতে বললে, এখন হয়েছে কি? একটা ঢোল কিনব, নয় তো ডুবকি কিনব, কিনে গাঁয়ে ভিন গাঁয়ে বাজাব আর ব'লে আসব। দেবাংশীর কত্তের কথা বলব, চাঁদা কুলুর জাতজ্ঞাত—'গিরি', 'তারি', 'চারি'র কথা বলব। 'গড়াঞীদেরই তিন কত্তে গিরি, তারি, চারি', বাই বলেহারি। থানার ছামনে বাড়ি।'

নোটন এবার ধমক দিয়ে বললে, ব'স, যা বলি তাই শোন্।

কি?

এখানে না যাস, চল্, আমার সঙ্গে গ'লপাড়া (গোয়ালপাড়া) চল্। সেইখানে বাবার থানে মানত ক'রে আসবি, পূজো দিবি, বলি দিবি; মন হয় তো উতুরী লিবি, গ'লপাড়ার বাবার থানে।

অটল এতক্ষণ ব'সে ছিল চুপ ক'রে, সে বললে, এই ভাল বলেছ। এও বাবা, সেও বাবা। এ তো তোমার মাথার ওপরে আকাশের চাঁদ, যেখানে যাবে তুমি সাঁতে-সাঁতে (সাথে-সাথে) চলবে। ই গাঁয়েও চাঁদ, উ গাঁয়েও চাঁদ, সি গাঁয়েও চাঁদ। অথচ সেই এক তোমার মাথার ওপরের চাঁদ।

সাতন এবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, চল্। তাই চল্। নতুন গামছাখানা টেনে সে গায়ে জড়িয়ে নিলে। তারপর হঠাৎ সে হাউহাউ ক'রে কেঁদে উঠল—বিচার কর, বিচার কর তুমি বাবা ধরম, তুমি ন্যায্য বিচার কর।

গোয়ালপাড়াতে এ অঞ্চলের আট-দশখানা গ্রামের মধ্যে ধরম-পূজোর সমারোহ সবচেয়ে বেশি। এ অঞ্চলে অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গে বিশেষ ক'রে রাঢ় অঞ্চলে প্রায় গ্রামে গ্রামেই ধর্ম্মরাজ-পূজা হয়। তার মধ্যে প্রসার-প্রতিপত্তি সকল ধর্ম্মরাজের সমান নয়। যে দেবতা যেমন জাগ্রত, অর্থাৎ মনস্কামনা সিদ্ধ করতে, রোগ ভাল করতে যে ধর্ম্মরাজ যেমন পারেন, তাঁর প্রতিপত্তি তেমনই বেশি। এ জেলার মধ্যে প্রসিদ্ধ 'বেলের' ধর্ম্মরাজ বাবা। বাতব্যাধির অব্যর্থ ওষুধ আছে বাবার। মাটি তেল আর লতাপাতার ওষুধ। দেশদেশান্তর থেকে লোক আসে। কলকাতা, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী পর্য্যন্ত বাবার ভক্ত আছে। 'ভাসতোড়' গ্রামেও বাবার প্রসার খুব, ওখানে আছে অম্বলের ব্যাধির ওষুধ। 'সিজেকডাং' গ্রামের বাবার আছে হাঁপানির মাদুলি ও ওষুধ। এসব জায়গায় হাজারে হাজারে লোক জমায়েত হয়। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, মীর, খাঁ, শেখ সব ঘরেরই ভক্ত আছে। হিন্দুরা এ পূজার সময় উপবাস করে, মাটির ঘোড়া ও পূজা পাঠায়, অনেকে বলি দেয়, মীর-সাহেব, খাঁ-সাহেব, সেখজীরা মাটির ঘোড়া ও পূজা পাঠায়। গোয়ালপাড়ার ধর্ম্মরাজের আছে চোখের অসুখের ওষুধ এবং 'আঞ্জন' (অঞ্জন)। লোকে বলে, বাবার 'আঞ্জনে' চোখের ছানি পর্য্যন্ত কেটে যায়। বহু স্থান থেকে ভক্ত আসে; বাইরের লোকই আসে প্রায় দুশো আড়াইশো। তা ছাড়া আশপাশ গ্রামের ভক্তও অনেক। ঢাক আসে পঞ্চাশ-ষাটখানা। বলি হয় তিরিশ-চল্লিশটা। নবগ্রামের ধর্ম্মরাজের ওষুধের তেমন কোন নামডাক নাই, কিন্তু নবগ্রাম এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ গ্রাম, সেই হিসেবে এখানকার চন্দ্র গড়াঞী প্রমুখ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎসাহীরা গোয়ালপাড়ার ধর্ম্মরাজের উৎসবের সঙ্গে বেশ একটি প্রতিযোগিতা করবার চেষ্টা করে। এ গ্রাম থেকে কেউ যাতে ভক্ত ওখানে না যায়, তার জন্য তাদের চেষ্টা যথেষ্ট। বলে, আমাদের হ'ল জমিদার ধরম। ওদের ধরম হ'ল আমাদের প্রজা। ওখানে যাবি কি?

নবগ্রামের জমিদারি-স্বত্বে এখানকার বাবুরা অধিকারী। স্বর্ণবাবু তাঁদের অন্যতম।

সরকারবাবুরা আছেন; শ্যামাদাস আছেন; সম্প্রতি দশ-বারো দিন আগে গোপীচন্দ্র আড়াই পয়সা অংশ কিনেছেন পাঁচশো টাকায়। একশো টাকা পয়সা হিসেবে এর আগে বিক-কিনি চলছিল; এবার সরকার-বাবুদের একজন নাজেহাল শরিক ওই অংশটা বিক্রি করতে উদ্যত হয়েছিল আপনাদের সরকারগোষ্ঠীর মধ্যেই। ক্রেতা ছিলেন বংশলোচন। একশো টাকা হিসেবে দাম-দর সব স্থির, হঠাৎ স্বর্ণবাবুর লোক এসে হাঁকলে, একশো পঁচিশ। শ্যামাদাস দেড়শো দর পাঠালেন। গোপীচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিচন্দ্র ছিলেন কলকাতায়, বংশলোচন তাঁকে টেলিগ্রাম করলেন। কীর্ত্তিচন্দ্র পরদিনই এসে একেবারে দুশো টাকা পয়সা দাম হেঁকে দিলেন। রেজেষ্ট্রী হয়ে গেল। কীর্ত্তিচন্দ্র এবার পাঁচখানা ঢাকের খরচ দিয়েছেন গোয়ালপাড়ার পূজায়। বলেছেন, ভাঁড়াস নিয়ে ভক্তের দল এখানে এলে, মাতব্বরেরা যারা উপবাস করে না, তারা এখানে শরবত, পান, তামাক খাবে।

এসব ব্যবস্থায় চন্দ্র গড়াঞীদের দল একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গোয়ালপাড়ার ধর্ম্মরাজের পূজার সমারোহ বেশি হ'লে তারা নিজেদের অপমানিত বোধ করে। ঠিক এই কারণেই সাতন আরও খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল।

নোটন অটল সঙ্গে গেল।

ওরা চ'লে যেতেই, পরী খাটো কাপড়খানা ছেড়ে একখানা পরিচ্ছন্ন দশহাত শাড়ী প'রে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

মা বললে, কোথা যাবি? এই ঝাঁ-ঝাঁ 'দোপোর' (দুপহর) বেলায়?

মৃদুস্বরে পরী বললে, যাব বাবুর কাছে।

মরণ! লাজের মাথা একেবারে খেলি? দিনে 'দোপরে'—

তু সুদ্ধ সঙ্গে আয়। আমি চাঁদা কুলুর কথা ব'লে আসব বাবুকে। দাদাকে বলেছে দারোগা জমিদার তোর বোনাই। বিচার করুক বাবু।

বাবুর দৃষ্টি দেখে কিন্তু পরী শুকিয়ে গেল। রাত্রিবেলার সে চাউনি, আর এ চাউনিতে আকাশপাতাল তফাত। আশ্চর্য্যের কথা, সে চাউনির আভাস পর্য্যন্ত খুঁজে পেলে না, চোখের কোথাও কোন কোণে। কোঁচকানো জ্র মধ্যে এমন রূঢ় দৃষ্টি, সে আর দেখে নাই। পরী একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। বুকটা তার দুরুদুরু ক'রে কাঁপছিল, একটা আবেগও ছিল, মধ্যে মধ্যে হাসিও হাসছিল। লজ্জা এবং আনন্দের হাসি। চেষ্টা করছিল, বাবুর চোখে চোখ পড়লেই সে ইশারা ক'রে ডাকবে। কিন্তু তার কোন অন্যমনস্কতা অথবা নতনেত্রতার অবসরে বাবু তাকে দেখেছিলেন। তিনি ডাকলেন, কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

সে ডাকে চমকে উঠল পরী।

দেখ্ তো রে, কে একটা মেয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে? দেখ্ তো কি চায়?

মেয়েটি যে পরী এবং সে যে কি চায়, স্বর্ণবাবু তা জানেন। সকল খবরই তাঁর কানে এসেছে। তাঁর অন্তরের মধ্যে ক্ষোভ টগবগ ক'রে ফুটছে গলন্ত ধাতুর মত। ইচ্ছে হচ্ছে, ওই গহ্লাঞীটাকে নিয়ে এসে চাবুক মেরে রক্তাক্ত ক'রে দেন, যে জিভে ওই কথাগুলো উচ্চারণ করেছে সেই জিভটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলেন। কিন্তু সে হয় না। সমাজ আছে, কীর্তিচন্দ্র আছেন। আরও আছে, বংশলোচনকে তিনি গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু রাধাকান্ত সম্বন্ধে আশঙ্কা আছে। সম্প্রতি রাধাকান্তও তাঁর উপর বিরূপ। তিনি সেই যোড়শীকে যে দিন রাত্রে চাইতে গিয়েছিলেন মদের নেশার ঝোঁকে, সেই দিন থেকে রাধাকান্তের সঙ্গেও তাঁর প্রীতির সম্বন্ধ ঘুচে গিয়েছে, কথায় কি ব্যবহারে কোন বিরূপতা আধারতঃ প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু স্বর্ণবাবু অনুভব করতে পারেন সেটা।

তিনি রূঢ়কণ্ঠে বললেন, যা যা। ভাগ্ এখান থেকে। ছেনালি করিস, ছেনাল বলেছে, তার আবার বিচার কিসের? যা। যা এখান থেকে।

পরীর সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল। সে নড়তে পারছিল না। স্বর্ণবাবু চাপরাসীটাকে বললেন, এই, ওকে বার ক'রে দে।

চাপরাসী তার পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে বাইরে নিয়ে এল। এবার পরী হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করলে। মৃদুস্বরে কাঁদছিল সে, ও মা গো, ওগো মা গো! ওগো মা গো! ওগো বাবা গো!

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল

(পূর্বানুবৃত্তি)

২

And this defendant further answering denies that the said Ramcaunt Roy and Juggomohun Roy or either of them had at any time any right title or interest whatsoever to or in the said last mentioned Talooks or to or in either of them or any part thereof or that the said Talooks or either of them continued to be the joint property of the said Ramcaunt Roy Juggomohun Roy and this defendant from the time of the purchase thereof at the Government sale as stated in the Complainants Bill, until or at the time of the death of the said Ramcaunt Roy, as in the bill is untruly stated And this defendant further answering saith that the said Ramlochun

Roy was not nor did he become entitled to any part of any joint estate upon the death of the said Ramcaunt Roy in as much as there was not any joint estate upon or at the time of the death of the said Ramcaunt Roy And this defendant further answering saith that the said Ramlochun Roy from the time when he so proceeded to Radanagar as hereinbefore mentioned did not afterwards re-unite himself with the said Ramcaunt Roy Juggomohun Roy and this defendant or with any or with either of them and that the said Ramcaunt Roy this defendant and the said Juggomohun Roy or any of them from or after the time of the said partition did not at any time during the life time of the said Ramcaunt Roy re-unite or form an undivided family, but that on the contrary thereof the said Ramcaunt Roy shortly after the said partition, proceeded to reside in the said lodging house at Burdwan which he had so reserved for himself as aforesaid and continued during the remainder of his lifetime to reside and live apart and separate from this defendant and from the said Juggomohun Roy and that this defendant and the said Juggomohun Roy although they occasionally occupied portions of the same house and although their families were under the superintendance and management of the said Tarraney Dabey as aforesaid yet lived and conducted their affairs and concerns separately and unconnected wlth each other and did not at any time after the said partition re-unite or form an undivided Hindoo family as untruly stated in the Complainants Bill. And this defendant further answering saith that he this defendant or the said Ramlochun Roy to the knowledge or belief of this defendant did not claim to be entitled to any part of the estate immoveable and moveable or real and personal of which the said Ramcaunt Roy was possessed or entitled unto at the time of his death but that the said Juggomohun Roy preferred a certain claim as the sole heir of the said Ramcaunt Roy before the Zillah Court of Burdwan and also before the provincial Court of Appeal of Calcutta in order to obtain possession of certain property which had belonged to the said Ramcaunt Roy at the time of his death and that in default of other claimants the said Juggomohun Roy was recognized by the said Courts respectively as the sole heir of the said Ramcaunt Roy And this defendant further answering saith that upon the death of the said Ramcaunt Roy he this defendant and also the said Ramlochun Roy and Juggomohun Roy did as this defendant believes become entitled jointly to the estate immoveable or real and moveable or personal which was of the said Ramcaunt Roy at the time of his death But this defendant further answering denies that the said Ramcaunt Roy at the time of his death was seized and possessed of or

otherwise entitled unto any estate immoveable or moveable jointly with this defendant and the said Juggomohun Roy or that this defendant and the said Juggomohun Roy either at the time of the death of the said Ramcaunt Roy or at any time afterwards became or were entitled unto or at any time possessed themselves of the whole or of any part of any estate immoveable or moveable, which had belonged to the said Ramcaunt Roy Juggomohun Roy And this defendant at the time of the death of the said Ramcaunt Roy. And this defendant further answering positively denies that at the time of the death of the said Ramcaunt Roy or at any time afterwards the said Talooks of Govindpore and Rammissorpore which in the Complainants Bill of Complaint are alleged to have yielded together, after payment of the Revenue to Government an annual income or profit to the Zamindar of Fifteen thousand Rupees or thereabouts were or was comprized in the real or immoveable estate whereof the said Ramcaunt Roy died seized or possessed or that the said Talooks or either of them were or was held in the name of Rajiblochan Roy upou the trust untruly stated in the Complainants Bill of Complaint for this defendant saith that the said Talooks and each of them before at and after the death of the said Ramcaunt Roy were and was the sole and exclusive property of this defendant as hereinbefore mentioned subject only to the conditional transfer herein before in that behalf mentioned

ক্রমশ

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

ছোটে সাহেব সেলাই বন্ধ ক'রে বললে, যা বলেছিস আহিয়া! লল্‌হিত আর সূদনের মতন ছেলে আর হয় না। জানো রায় সাহেব, শর্মাজী শুনো। বাবুজী তখন সরকারী চাকরি থেকে পেন্‌সিন নিয়ে বাঁন্‌স্‌ বেরিলিতে চাকরি নিয়েছেন। আমার উমর তখন দশ কি বারো, একদিন বাবুজীর সঙ্গে বাজারে জামা কিনতে বেরিয়েছি, দেখি দুটো বাংগালীর ছেলে, একেবারে নাদান্‌, আমারই হাম-উমর্‌ হবে, বিমর্ষ হয়ে রাস্তার ধারে ব'সে রয়েছে। বেরিলিতে যত বাংগালীর ঘর আছে তাদের সবাই আমাদের চেনা, এরা তাদের কেউ নয়। বাবুজী জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের বাড়ি কোথায়? তারা কাঁদতে কাঁদতে ব'লে ফেললে যে, তারা ঘরসে ভেগে পচ্ছিম চ'লে এসে এমন মুশকিলে ফেঁসে গেছে। সাবাস বাংগালী, দশ বছরের ছেলে বাবা ঘর্‌সে

ভেগেছে। বাবুজী তাদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসে একেবারে আমার মায়ের জিম্মে ক'রে দিলে।

সেই থেকে তারা আমাদের ঘরেরই ছেলে হয়ে গেল, আর বাড়ি ফিরলে না। একই বয়সী কিনা তাই আমার সঙ্গে তাদের এমন ভাব হয়ে গেল যে, লোকে মনে করত, আমরা বুঝি সব মায়ের পেটের ভাই। আমার মায়ের তো লল্‌হিত ছাড়া এক লম্‌হাও চলত না। বহেনজী তখন ছিল শ্বশুরাল, আমার বড়ে ভাই বিয়ে করে নি, মার সেবা করবার কেউ নেই। লল্‌হিত মার খুব সেবা করত। রোজ সন্ধের সময় দু ঘণ্টা ক'রে মার গোড় দাবানো, এখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া, লল্‌হিত ছাড়া মার আর একদণ্ডও চলে না।

এই রকম প্রায় দশ বছর কেটে যাওয়ার পর সেবারে বেরিলিতে ভারি চেচক্‌ শুরু হয়ে গেল। কোথা থেকে লল্‌হিত বেচারা চেচক্‌ নিয়ে এল। বাবুজী শহরের সেরা সেরা ডাক্তার দেখালে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। বেচারার চোখ দুটো আগেই নষ্ট হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, মা, আমার চোখই যখন নষ্ট হয়ে গেল, তখন আর বেঁচে লাভ কি? মা তাকে বোঝাতে লাগল, যতক্ষণ আমার চোখ আছে বেটা, ততক্ষণ তোর ভাবনা কি? আমি গেলে ছোটকা রইল, সুদন রইল, তারা তোকে দেখবে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। দু মাস ভুগে লল্‌হিত বেচারা চ'লে গেল, আমার মায়ের কোলেই মাথা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমার মা তো বেহোঁশ হয়ে সেই মুর্দা জড়িয়ে ধ'রে প'ড়ে রইল, শেষকালে বাবুজী এসে তাকে ছাড়িয়ে নিলে। মা যে সেই পাশ ফিরলে সাত দিন আর উঠল না। শেষকালে আমার এই আহিয়া, এই মেয়েমানুষটা, তাকে তুলে নাওয়ালে খাওয়ালে।

এতখানি এক নাগাড়ে ব'লে ছোটে সাহেব একটু দম নিয়ে বৃদ্ধার উদ্দেশ্যে বললে, আহিয়া, তুম্‌হে ইয়াদ্‌ হ্যয় উও সব বাতেঁ?

আহিয়া গজগজ ক'রে কি বললে, বুঝতে পারলুম না।

পরিতোষ জিজ্ঞাস করলে, সুদন কোথায়?

ছোটে সাহেব সেলাই থামিয়ে তার দিকে চেয়ে বলতে আরম্ভ করলে, আরে ভাইয়া, তার আসল নাম হচ্ছে মদ্‌সূদন। আমার মা তাকে সুদন ব'লে ডাকতেন। সেই থেকে মদ্‌সূদন সুদন হয়ে গেছে। লল্‌হিত মারা যাবার

পর বাবুজী সুদনের চাকরি ক'রে দিলেন মিউনিসিপ্যালিটিতে, বাইশ টাকা মাইনেতে। সে বেচারী মাইনের সব টাকা এনে আমার মায়ের হাতে দিত। এই রকম বছরখানেক যেতে না যেতেই লল্‌হিত আমার মাকেও টেনে নিলে। মাও ওই চেচকেই ম'রে গেল।

এতক্ষণে ছোটে সাহেবের কণ্ঠে একটু যেন অশ্রুর আমেজ পাওয়া যেতে লাগল। সে ব'লে চলল, মা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাবুজী ওখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কাশীতে চ'লে এলেন। সুদন ওইখানেই র'য়ে গেল, আজ সে আশি টাকা তন্‌খোয়া পায়। সুদন বেচারা বড় ভাল। আগে পূজো ও বড়দিনের ছুটিতে দুবার ক'রে বাড়ি আসত, কিন্তু আমার অসুখ বাড়ার খবর পেয়ে আজকাল দু-তিন মাস অন্তরই একবার দুবার ক'রে এসে আমাকে দেখে যায়। সে তো চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে চ'লে আসতে চায়, কিন্তু বাবুজী আর দিদিমণি তাকে চাকরি ছাড়তে দেয় না। সুদন যতদিন এখানে থাকে, ততদিন বেশ ফুর্তিতেই দিন কাটে, এই তো দিন পনেরো আগে সে গেছে।

ছোটে সাহেব আবার কিছুক্ষণের জন্যে চুপ ক'রে বোঁ-বোঁ ক'রে সেলাই ক'রে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ একবার মুখ তুলে বললে, আমি এবার সুদনকে ব'লে দিয়েছি, ভাইয়া, এবারে লল্‌হিত আমাকেও টেনেছে, কবে নিয়ে যাবে সেই আশায় ব'সে আছি। আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

দেখতে দেখতে ছোটে সাহেবের চোখ দুটো জলে ভ'রে উঠল, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলুম যে, সেই দুর্বলতাকে দমন করবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। হঠাৎ ছোটে সাহেব ঘাড় নীচু ক'রে আবার সেলাইয়ে মন দিলে।

মানুষের জীবনে অথবা মানুষের মনে প্রেম ও শোক এই দুটি অনুভূতিই প্রধান। প্রেমের মতন শোকও অজানা অপরিচিতকে আপনার করে, দূরকে নিকটে টেনে নিয়ে আসে, আত্মীয়কে পরমাত্মীয় ক'রে তোলে। শোকাশ্রুই পলাতকা অতীতকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে বর্তমানের বাহুবন্ধনে। আজ সকালে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম ক'রে যখন উঠে বসেছিলুম, তখন এই পরিবারের সুখদুঃখ তো দূরের কথা, তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোনও জ্ঞানই আমার ছিল না। এই মৃত্যুপথযাত্রী পঙ্গু যুবকের মুখের কয়েকটি কথা আর ওই বৃদ্ধার কয়েক ফোঁটা অশ্রুজল তাদের সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য বন্ধনে

বেঁধে ফেললে। কে কোথাকার লল্‌হিত আর স্থদন, যাদের কখনও চোখেও দেখি নি, তারা হয়ে উঠল আমাদের জীবনবন্ধু। চোখের সামনে যেন দেখতে লাগলুম, আমাদেরই মতন দুটি অসহায় বালক পথের ধারে বিষন্ন মুখে ব'সে আছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ভবিষ্যতের অন্নবস্ত্রের চিন্তায় যখন তারা দিশাহারা, সেই সময় অতি অপ্রত্যাশিতভাবে দেবদূতের মতন এসে এই সংসারের কর্তা তাদের তুলে নিয়ে এলেন নিজের গৃহে, সেই থেকে এই গৃহই তাদের আপন হয়ে গেল। এদের দুঃখসুখের সঙ্গেই তাদের জীবনসূত্র জড়িয়ে গেল চিরদিনের জন্যে।

বেলা বেড়েই চলল। আমরা দুটিতে চুপ ক'রে ব'সে আছি আর ভাবছি, লোকটা যে থাকতে বললে, কিন্তু সে সম্বন্ধে আর কোনও কথাই বলছে না তো! বুড়ীও কোন কথা কয় না। সেও কলের মতন ছোটে সাহেবের পিঠে হাত বুলিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে ঢুলে তার মাথাটা ছোটে সাহেবের পিঠে গিয়ে ঠেকছে, কিন্তু সে নির্বিকার, বোঁ-বোঁ ক'রে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে চলেছে, মাঝে মাঝে ছুঁচের গর্তে স্থতো ভ'রে নিয়ে আবার সেলাই শুরু করছে।

বোধ হয় ঘণ্টাখানেক এই ভাবে চুপচাপ কাটবার পর ছোটে সাহেব বুড়ীর দিকে ফিরে তার কানে কানে কি বললে, শুনতে পেলুম না।

বৃদ্ধা ধীরে-স্থস্থে খাট থেকে নেমে গেলাসটা তুলে নিয়ে বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কি নিয়ে গজগজ করতে করতে নীচে নেমে গেল।

ছোটে সাহেব আমাদের সঙ্গে গল্প করতে লাগল, তার বাবার কাশীতে মস্ত ডিস্‌পেন্‌সারি, ওখানকার যত রইস আছে প্রায় সবার বাড়িরই তিনি গৃহ-চিকিৎসক, কাশী-নরেশের বাড়ি থেকেও তাঁর ডাক আসে। সব জায়গা থেকেই মাসোহারা পান, এতেই তাঁর প্রায় পাঁচশো টাকা আমদানি আছে, এ ছাড়া কাশীর সিক্‌রোলে বড় বাড়ি আছে, নীচে বড় দাওয়াখানা, সকাল সন্ধ্যেয় প্রায় দু-তিনশো রুগী আসে, তাদের ওষুধ বিক্রি ক'রেও দৈনিক প্রায় শতখানেক টাকা রোজগার আছে। সে ব্যবসা বড়ে ভাই দেখে; বাবুজী তা থেকে কিছুই পায় না, সে-ই সব মেরে দেয়। মাঝে মাঝে বহেনজী হাঙ্গামা-হুজ্জৎ ক'রে তার কাছ থেকে সংসার-খরচ বাবদ দু-পাঁচশো টাকা আদায় ক'রে নেয়। আমার ভাইটা হচ্ছে বদমাইস। সব টাকা মাগী, ইয়ার আর সরাবেই ফুঁকে দেয়। বাবুজী একেবারে শিবের মতন, সে তো কিছু বলে না; কিন্তু বহেন্‌জী

হচ্ছে একেবারে পাহ্‌লোয়ান, বড়ে ভাইয়ের মতন দশটা মরদকে সে গায়ের জোরেই ঠাণ্ডা ক'রে দিতে পারে। দাওয়াখানার হিসাবপত্তর সব বহেন্‌জী দেখে, এই নিয়ে হর্‌হপ্তা ঘরে ভাইবোনে খুনোখুনি চলতে থাকে।

কিছুক্ষণ আবার সেলাই-ফোঁড়াই চলবার পর ছোটে সাহেব মুখ তুলে বললেন, বহেন্‌জীর নিজের টাকার অভাব নেই, সে আমার জন্যেই ভাইয়ার সঙ্গে লড়াই ঝগড়া করে। বেচারা তো জানে না যে, আমার দিন খতম হয়ে এসেছে।

এবার আমি বললুম, আপনি বৃথাই ভয় পাচ্ছেন। আপনি ঠিক সেরে উঠবেন।

ছোটে সাহেব একটু হেসে সেলাইটা এক পাশে রেখে ডান পায়ের আচ্ছাদনটা তুলে বললে, এ পা-টা দেখছ?

তারপরে বাঁ পা-টা দেখিয়ে বললে, এই পা-টাও এমনিই ছিল, এখন দুটোতে তফাৎ দেখ।

দেখলুম, দুটো পায়ে আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে গিয়েছে, তবুও তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, এ পা-টাও সারবে, তবে পা-টা পঙ্গু হয়ে যাবে।

ছোটে সাহেব হেসে সেলাইটা তুলে নিয়ে বললে, শর্মাজী, তোমরা ছেলেমানুষ। আমার চাইতে কম আজ্ কম দশ-পনেরো বছরের ছোট হবে, তোমরা কি জান?

আমাদের কথাবার্তা চলেছে, এমন সময় একটা লোক দু হাতে দু থালা জলখাবার নিয়ে এসে আমাদের সামনে রেখে দিয়ে চ'লে গেল। ছোটে সাহেব বললেন, নাও রায় সাহেব, শর্মাজী, কিছু জল খেয়ে নাও। এ-বেলা তো ভাত-টাত কিছুই হ'ল না।

বিশেষ অনুরোধ আর করতে হ'ল না। বেলা তখন দ্বিপ্রহর—ক্ষুধাও বেশ চন্‌চনে হয়েছিল। দেখতে না দেখতে থালা সাফ হয়ে গেল। যে লোকটা খাবার দিয়ে গিয়েছিল, সে-ই একটা গেলাস ও একটা জলভরা ঘটি নিয়ে এসে আমাদের জল খাইয়ে গেল।

একটু পরে ছোটে সাহেব আমাদের বললে, কি, বিড়ি-টিড়ি ফোঁকা অভ্যেস আছে নাকি?

বললুম, অভ্যেস না থাকলেও মাঝে মাঝে ফুঁকে থাকি—আপত্তি কিছুই নেই।

আমাদের কথা শুনে সে কিছুক্ষণ পেছনের তাকিয়ার ওপর শুয়ে নির্বিকার হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। তারপরে উঠে পাশের সেই লম্বা বাঁশের লাঠিটার ওপর ভর ক'রে দাঁড়াল। দেখলুম, তার সেই পঙ্গু দোমড়ানো পা-খানা জমি থেকে বোধ হয় হাতখানেক উঁচুতে নড়বড় ক'রে ঝুলতে লাগল। ডান হাত দিয়ে সেই পা-খানা লাঠির চারিদিকে এক ফের কি দু ফের ঘুরিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে নেংচে নেংচে ছাদের এক কোণের ঘেরা বারান্দা দিয়ে বোধ হয় বাড়ির ভেতরে চ'লে গেল। কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর পরিতোষ বললে, সরাইওয়ালাকে যে মাংস কেনবার জন্যে পয়সা দিয়ে আসা গেল, তার কি হবে?

দেখা যাক কি হয়! বরাতে মাংস খাওয়া আজ নেই ব'লেই তো মনে হচ্ছে।

কথাবার্তা চলছে, এমন সময় ছোটে সাহেব সেই রকম লাঠির ওপরে ভর দিয়ে করুণ কাতরধ্বনি করতে করতে ফিরে এল, হাতে তার এক বাণ্ডিল বিড়ি।

বিড়ির বাণ্ডিলটা আমার হাতে দিয়ে বললে, নাও শর্মাজী, পিও।

তারপরে তেমনই কাতরাতে কাতরাতে খাটের ওপর গিয়ে ব'সে পড়ল। আমরা দুজনে দুটো বিড়ি ধরিয়ে মোক্ষম টান মেরে কাশতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। ছোটে সাহেব আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে সহাস্য বদনে বললে, কি, খুব কড়া বুঝি?

কাশতে কাশতেই বললুম, না, অনেকদিন টানি নি কিনা, তাই কাশি হচ্ছে।

বাণ্ডিলটা তোমাদের কাছেই রেখে দাও, ফুরিয়ে গেলে আমাকে ব'লো।

এই ব'লে সে তাকিয়ায় হেলান দিলে। কিছুক্ষণ সেই ভাবে থেকে বললে, শর্মাজী, একটু লেটছি ভাই, কিছু মনে ক'রো না, এই মিনিট পাঁচেক, চ'লে যেও না যেন।

বললুম, না না, মনে করব কি! আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন।

ছোটে সাহেব বালিশে মাথা দিয়ে চোখ বুজে ফেললে। আমরা দুটিতে ব'সে ব'সে বিড়ি ফুঁকতে লাগলুম। অনেকদিন পরে ধোঁয়ার আস্বাদ পেয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বোধ হয় গোটা-পঁচিশেক বিড়ি শেষ ক'রে ফেললুম। বিড়ি ফুঁকছি আর অদৃষ্ট এবার আমাদের কি নতুন প্যাঁচ মারলে তারই গবেষণা চলেছে। দেখতে দেখতে ছাতের এক পাশ থেকে রোদ গড়াতে গড়াতে রাস্তায়

নেমে পড়ল। ছোটে সাহেব তেমনই প'ড়ে আছে খাটের ওপরে, চোখ বুজে একপাশ ফিরে কুঁকড়ে-শুঁকড়ে। একবার উঠে গিয়ে তার কপালে হাত দিয়ে দেখলুম, আগুন গরম—বোধ হয় একশো চার ডিগ্রী জ্বর হবে। কপালে হাত দেওয়া মাত্র ধরা গলায় সে বললে, আহিয়া!

হাত সরিয়ে নিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসলুম। কি করব তাই পরামর্শ করতে লাগলুম।

পরিতোষ বললে, চল্, সরাইয়ে ফিরে যাই। কিন্তু ভদ্রলোক বার বার অনুরোধ ও মিনতি ক'রে বলেছে তার কাছে থাকবার জন্যে, এই সব আলোচনা চলছে এমন সময় ওবেলাকার সেই বৃদ্ধা আবার একটা গেলাস হাতে নিয়ে ছাতে এসে উপস্থিত হ'ল।

বৃদ্ধা খাটের কাছে গিয়ে বেশ উচ্চৈঃস্বরে হাঁক ছাড়লে, আরে ছোটে!

ছোটে সাহেব চমকে চোখ চেয়ে বললে, আহিয়া, আয়ি তুম্?

তারপরে ক্যাঁকাতে ক্যাঁকাতে উঠে ব'সে বৃদ্ধার হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে এক চুমুকে সেটা নিঃশেষ ক'রে ফিরিয়ে দিতে দিতে বললে, শঙ্কর আর ভরতকে পাঠিয়ে দে, আমাকে ঘরে নিয়ে যাবে।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলে, তাপ এসেছে বুঝি?

ছোটে সাহেব চোখ বুজেই বললে, ওঃ, বড়ি তকলিফ্।

বৃদ্ধা সিঁড়ির দরজার দিকে অগ্রসর হ'ল। ছোটে সাহেব তাকে ডাক দিলে, আহিয়া, শুন্।

বৃদ্ধা কাছে আসতে সে আমাদের দেখিয়ে বললে, এদের কথা বহেনকে বলেছিস? সারাদিন যে এদের খাওয়া-দাওয়া হ'ল না, সেই সকাল থেকে ব'সে আছে বেচারারা—

ছোটে সাহেবের কথা শুনে বুড়ী একেবারে চীৎকার ক'রে উঠল, হায় রামা! আমাকে কি তুই কিছু বলেছিস? সে মাগী শুনলে তো আমার জান খেয়ে ফেলবে। বলবে, মেহ্‌মানদের এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছিস! হায় রামা! অনেক তো দেখালি, আর কেন, এবার আমাকে টেনে নে। বলতে বলতে বুড়ী দেওয়ালে ঢকাঢক্ মাথা কুটতে আরম্ভ ক'রে দিল।

বুড়ী আরও হাঙ্গামা লাগাবার উপক্রম করছিল, এমন সময় ছোটে সাহেব চেঁচিয়ে উঠল, হারামজাদী—নিগোড়ে! আমাকে না খেয়ে কি তুই মরবি?

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তো শেষ ক'রে এনেছিস। যে কটা দিন আছি, একটু শান্তি দে।

কথাগুলো শুনে বুড়ী একেবারে চুপ হয়ে গেল। ছোটে সাহেব বললেন, যা, বহেন্‌জীকে বলগে যা, আমি ব'লে দেব, সে কিচ্ছু বলবে না তোকে।

বুড়ী আর কোন কথা না ব'লে কাঁপতে কাঁপতে নীচে নেমে গেল। ছোটে সাহেব আমাদের দিকে ফিরলে, দেখলুম, তার চোখ দুটো রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে। একটুখানি হাসবার চেষ্টা ক'রে সে বললে, আজকের তাপটা খুবই চড়েছে ব'লে মনে হচ্ছে। একটুখানি লেটব মনে ক'রে একেবারে শুয়ে পড়েছিলুম, কিছু মনে ক'রো না ভাই, তোমাদের বড় তক্‌লিফ হ'ল। কাল থেকে আর এমন হবে না।

আমি বললুম, না না, আমাদের কোন তক্‌লিফ হয় নি। আপনি কেন এসব কথা বলছেন?

ছোটে সাহেব বললে, না ভাই, তোমাদের রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে এসে এখানে বসিয়ে আমি শুয়ে পড়লুম। কি বলব, আমায় মাপ ক'রো ভাইয়া, বড় কসুর হয়ে গেল আমার।

এতদিন পরে এই জাতক লেখার তাড়নায় সেই সুপ্ত স্মৃতিকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে জাগিয়ে তুলছি আর মনে হচ্ছে, সে-দিনের সঙ্গে আজকের দিনের কত তফাৎ হয়ে গিয়েছে। আজ ভারতবাসী পূর্ণস্বাধীনতা-প্রয়াসী, অর্থে সামর্থ্যে আজ তারা অনেক উন্নত, অনেক সমৃদ্ধ। কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার—সেদিক দিয়ে যে তারা কত দরিদ্র হয়ে পড়েছে, তা আমার মত অভিজ্ঞতা যার আছে সেই জানে।

ছোটে সাহেবের কথা শুনে আমাদের চোখে জল এসে গেল। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তাকে বললুম, আপনি আমাদের এত উপকার করলেন আর আপনার নামটি পর্যন্ত আমরা জানতে পারলুম না।

ছোটে সাহেব বললে, আরে, আমার নাম বিশ্বনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায়, আমার ভাইয়ের নাম শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায়, আমাদের ঠাকুরের নাম ডাঃ শিবনাথ বন্দ্যোউপাধ্যায়। আমার ছোট ভাইয়ের মতন। আমাকে বিশুদা ব'লে ডেকো।

এতখানি ব'লেই সে আবার বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজে ফেললে।

ব'সে আছি তো ব'সেই আছি। দেখতে দেখতে রোদ প'ড়ে যেতে লাগল। ব্যাপারটা রাজকুমারীর বাড়ির চেয়েও রহস্যজনক হয়ে উঠছে দেখে আমরা ঠিক করলুম, আর কিছুক্ষণ দেখে আস্তে আস্তে নেমে চ'লে যাব। এমন সময় দুজন ষণ্ডা-ষণ্ডা চাকর ছাতে এসে উপস্থিত হ'ল। ছোটে সাহেব চোখ বুজে অজ্ঞানের মতন প'ড়ে ছিল, তাদের সাড়া পেয়ে সে চোখ চেয়ে বিজ্‌বিজ্ ক'রে কি বললে। তারপর তারা তাকে চ্যাংদোলা ক'রে তুলে নিয়ে চ'লে গেল। যাবার সময় ছোটে সাহেব বললেন, আমি ঘরে শুতে যাচ্ছি, তোমরা চ'লে যেও না যেন।

বিশুদা চ'লে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ কেটে গেল। আমরা উঠি উঠি করছি, এমন সময় আহিরা এসে বললে, চল, তোমাদের ভেতরে ডাকছে।

আবার সেই মইয়ের মতন সোজা সিঁড়ি বেয়ে নেমে একটা সরু গলিপথ দিয়ে আমরা বাড়ির ভেতরে চললুম। প্রকাণ্ড একটা উঠোন, উঠোনের এক কোণে তিনটে মুলতানী গাই বাঁধা রয়েছে—এমন সুন্দর গরু কলকাতার লোকের চোখে কমই পড়ে। সেই উঠোন পেরিয়ে আবার একটা আধা-অন্ধকার লম্বা গলিপথ পার হয়ে দালান। সেই দালানের এক কোণ দিয়ে সিঁড়ি। অপেক্ষাকৃত চওড়া হ'লেও প্রায় সেই মইয়েরই মতন সোজা। সেই সিঁড়ি প্রায় হামাগুড়ি মেরে অতিক্রম ক'রে ওপরে একটা বড় দালানে পৌছলুম। দালানের গায়ে এক সারে পাশাপাশি তিন-চারটে ঘর। বৃদ্ধা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে আমাদের বললে, এই যে, এদিকে এস। আমরা, আমি আগে আর পেছনে পুঁটলি-বগলে পরিতোষ, অতি সঙ্কোচের সঙ্গে পা পা ক'রে সেই ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখলুম, ঘরের মধ্যিখানে আমাদের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে একটি নারী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সদ্যোস্নাতা, মাথার মাঝখানে চুড়োর মতন উঁচু ক'রে চুল বাঁধা। একখানা ধপ্‌ধপে সাদা পাতলা ফিন্‌ফিনে থান পরা। তার ভেতর দিয়ে দেহের প্রায় সবই দেখা যাচ্ছে। বয়স কুড়ি থেকে ত্রিশের কোন একটা জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দেহলতা, দাঁড়াবার ভঙ্গী, চোখের দৃষ্টি ও মাথার সেই চুড়ো মিলিয়ে একটি নিষ্কম্প দীপশিখার সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। বার-বাড়ির সেই পঙ্গু, ভগ্নস্বাস্থ্য যুবকের যেন এটা উলটো পিঠ। এ রকম উদ্ধত যৌবনশ্রী এর আগে আর আমার চোখে পড়ে নি।

মিনিটখানেক আমাদের দিকে সেই ভাবে চেয়ে থেকে তিনি বললেন, খুব কষ্ট হয়েছে তো? ছোটটার কোনও আক্কেল নেই। সারাদিন নিজের কাছে বসিয়ে রেখে গাল-গপ্প করলে আর বাড়ির ভেতর একটা খবর পর্যন্ত পাঠালে না! সারাটা দিন খাওয়া হয় নি তো?

আমি বললুম, না, আমাদের কষ্ট কিছুই হয় নি। সকালবেলা খেয়েই বেরিয়েছিলুম। দুপুরে তো আপনি খাবার পাঠিয়েছিলেন, তাই খেয়েছি।

জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি?

নাম বললুম। পরিতোষের নাম শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জাত?

পরিতোষ বললে, আমরা কায়স্থ।

তিনি বললেন, আমাদের স্থদনও কায়স্থ। তোমাদের সঙ্গে কিছুই নেই বোধ হয়?

তারপরে মৃদু হেসে বললেন, পালাবার সময় কে আর জিনিসপত্র নিয়ে পালায়! কি বল?

পরিতোষটা এতক্ষণ আমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। স্ত্রীলোকের সামনে এলে অতিশয় লজ্জিত হয়ে পড়াই ছিল তার স্বভাব। হঠাৎ তার মনে যে কি অনুপ্রেরণা এল বুঝতে পারলুম না, সড়াক ক'রে এগিয়ে এসে তাঁকে একটা প্রণাম ক'রে ফেললে। তার দেখাদেখি আমিও একটা প্রণাম করলুম। প্রণামের পালা শেষ হবার পর তিনি হেসে বললেন, আমাকে কি ব'লে ডাকবে?

'মাসী' বলব, কি 'দিদি' বলব, এই নিয়ে মনের মধ্যে জল্পনা চলছে, এমন সময় তিনি নিজেই তার সমাধান ক'রে দিয়ে বললেন, আমাকে 'দিদিমণি' ব'লে ডাকবে, কেমন?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম।

দিদিমণির কথাবার্তার মধ্যে পশ্চিমী স্থরের একটু আমেজ থাকলেও বিশুদাদার মতন তিন ভাগ উর্দু নেই। কথাবার্তা ও হালচালের মধ্যে শুদ্ধ বাঙালী-ঘরেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

এবার তিনি বৃদ্ধাকে ডেকে ঠেট্-হিন্দীতে বলতে লাগলেন, বড়ে ভাইয়ের ঘরে এদের দুটো নতুন বিছানা পেতে দাও। অমুক জায়গা থেকে নতুন

বালিশ নেবে, অমুক স্থানে যে-সব তোষক আছে তা থেকে নিও না, অমুক ঘরে কাঠের সিন্দুকে বালিশের ওয়াড় ও বিছানার চাদর আছে, ইত্যাদি।

বৃদ্ধার প্রতি বক্তব্য শেষ ক'রে আমাদের বললেন, আমার বড়ে ভাইয়ের ঘরে তোমাদের শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। বাড়িতে ঘরের অভাব নেই, তবে সব ঘরই আসবাব-জিনিসপত্রে ঠাসা। একটা ঘরের জিনিসপত্র সরিয়ে দিয়ে তোমাদের ঘর ক'রে দেব। কয়েকটা দিন এখন ওই ঘরেই থাক। আমার দাদা প্রায় কাশীতেই থাকে। সপ্তাহে একদিন কি দুদিনের বেশি বাড়ি আসে না, কোনও অসুবিধা হবে না তোমাদের।

আহিয়া চ'লে গেল আমাদের বিছানাপত্রের ব্যবস্থা করতে। দিদিমণি দালানে একখানা শতরঞ্চি পেতে আমাদের নিয়ে ব'সে বাড়ির কথা, কেন বাড়ি থেকে পালিয়েছি, পালিয়ে কতদিন কোথায় ছিলুম ইত্যাদি সব কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। দিদিমণি বললেন, তাঁর বাবা সেই ভোরের ট্রেনে চ'লে যান কাশীতে শুধু এক লোটা দুধ খেয়ে। সকাল-সন্ধ্যে সেখানেই খাবার ব্যবস্থা আছে। বাড়ি ফেরেন রাত্রি দশটার ট্রেনে, স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরতে প্রায় সাড়ে দশটা বেজে যায়। আজ যদি তোমরা ঘুমিয়ে পড়, তা হ'লে আর তুলব না, কাল ভোরবেলা তুলে দেব বাবুজীর সঙ্গে দেখা করবে। না হ'লে বাবুজী রবিবারে বাড়িতে থাকেন, সেইদিন দেখা হবে।

আমি বললুম, আমাদের ভোরবেলাতেই তুলে দেবেন।

দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্তিরে রুটি খেতে কোন অসুবিধা হবে না তো?

কিছু না।

আচ্ছা, চল, তোমাদের ঘরে যাই।—ব'লে দিদিমণি উঠে ঘরের মধ্যে ঢুকে একখানা ধপধপে সাদা শাল গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপরে সেই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে এ গলি-সে গলি, উঁচু নীচু পথ দিয়ে আমাদের একটা বড় ঘরে নিয়ে এলেন। ঘরের মেঝেতে এক দিকে একটা দুজনের মতন বড় বিছানা আর এক দিকে একজনের মতন একটা বিছানা পাতা। ঘরের মধ্যে ঢুকে সেই বড় বিছানাটা দেখিয়ে আমাদের তিনি বললেন, ওইটে তোমাদের বিছানা, এটা দাদার বিছানা।

ঘরের দেওয়ালে খুব উজ্জ্বল একটা দেওয়াল-গিরি জ্বলছিল। দেখলুম, এ

বাড়িতে রেড়ির তেলের কারবার একেবারেই নেই। ঘরের আর এক দেওয়ালে ছোট্ট চৌকো একখানা আয়না ঝোলানো রয়েছে। আর এক দিকে ঘরের মেঝেয় একটা বড় কাঠের সিন্দুক, এ ছাড়া ঘরে আসবাব আর কিছুই নেই।

দিদিমণি হেসে পরিতোষকে বললেন, তোমার সম্পত্তি ওই সিন্দুকের ওপর রেখে দাও, ভয় নেই, কেউ নেবে না।

পরিতোষ লজ্জিত হয়ে সিন্দুকের ওপরে আমাদের পুঁটলিটা রেখে দিলে। দিদিমণি বললেন, আচ্ছা, এবার চল, আমার ঘর দেখবে।

আবার তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। তখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, চারদিক ঘোর অন্ধকার, আমরা এক রকম হাতড়ে হাতড়ে চলেছি তাঁকে অনুসরণ ক'রে। এই ঘরের পরেই অন্ধকার ছাত, তারই মাঝামাঝি রেলের গুম্‌টির মতন একটা চোরা-কুঠুরি-গোছের ঘর। তারই কয়েক গজ দূরেই একটা প্রকাণ্ড চার-জানলাওয়ালা হল-ঘরে দিদিমণি আমাদের নিয়ে এলেন। ঘরের এক দিক জুড়ে প্রকাণ্ড একটা পালং, বোধ হয় চার-পাঁচটা জোয়ান তাতে গড়িয়ে গড়িয়ে শুতে পারে। পালঙের ওপরে চমৎকার বাহারী মশারি—মশারি যে এত সুন্দর ও বাহারী হতে পারে তা এই প্রথম দেখলুম। ঘরের চার ধারে সুন্দর ও সুদৃশ্য ছোট-বড় দেরাজ, আলমারি ; লোহার সিন্দুকই বোধ হয় তিন-চারটে। এই ঘরে নিয়ে এসে দিদিমণি বললেন, এইটে আমার ঘর।

তারপরে একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, কেমন সাজানো! পছন্দ হয়?

বললুম, চমৎকার!

ঘরের এক কোণে একটা উর্দি-পরা ষণ্ডা-গোছের চাকর টুলের ওপরে ব'সে ছিল। আমাদের ঢুকতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল। দিদিমণি এবার তাকে হিন্দীতে কি ব'লে আমাদের বললেন, লোকটা সারাদিন এই ঘরে পাহারা দেয়। রাত্রিবেলা আর একটা লোক ওই চোরা-কুঠুরিতে শুয়ে থাকে পাহারা দেবার জন্যে।

তারপরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বললেন, ঘরে অনেক দামী জিনিস আছে কিনা! আমি তো সারাদিন অন্য ঘরে থাকি, রাত্রে বাবুজীকে ঘুম পাড়িয়ে ঘরে ফিরতে রাত্রি প্রায় বারোটা বেজে যায়, ততক্ষণ এরা পাহারা দেয়। আমি ঘরে এলে পাহারা চ'লে যায় চোরা-কুঠুরিতে, সকালে আবার পাহার বদলি হয়। রাতে আমার ঘরে আহিয়া শোয়।

দিদিমণির খাটের পাশেই দেখলুম, একটা স্ট্যাণ্ডে ছটো দো-নলা বন্দুক সাজানো রয়েছে। বললুম, দিদিমণির কি শিকার করা অভ্যেস আছে নাকি? বিছানার পাশেই বন্দুক কিসের জন্যে?

দিদিমণি বললেন, আরে ভাই, শিকার-খেলার অভ্যেস তো খুবই ছিল এককালে, নিশানাও ছিল খুব ঠিক, কিন্তু সে-সব এখন চুকেবুকে গেছে। ও ছটো আছে মানুষ শিকারের জন্যে। এখানে ডাকাতের ভয় আছে কিনা, যদি দরকার হয় তাই রাখা।

আবার সেই লোকটাকে কি ব'লে দিদিমণি বললেন, চল, এবার ছোটকার কাছে যাই।

সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আবার খানিকটা ছাত, তারপরে আর একটা চোরা-কুঠুরি, তারপরেই বিশুদার ঘর। বিশুদার ঘরের কাছাকাছি পৌছেই শুনতে পাওয়া গেল, ঘরের ভেতরে খুব মজলিস চলেছে। ঘরের দরজায় একটা লোক ব'সে ছিল, দিদিমণিকে দেখেই সে উঠে দাঁড়াল। দিদিমণি তাকে বললেন, শঙ্কর, ছোটে সাহেবকে বল আমি এসেছি।

এই ব'লেই তিনি পাশের চোর-কুঠুরিতে ঢুকে আত্মগোপন করলেন, শঙ্কর ভেতরে চ'লে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই ঘর থেকে দশ-বারোটা লোক হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে ছাতের এক কোণের একটা গলিপথ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বোধ হয় সেই ছাতে যেখানে সকালে আমরা এসে বসেছিলুম। লোকগুলো বেরিয়ে যাবার পর শঙ্কর চোর-কুঠুরির সামনে গিয়ে কি বলতেই দিদিমণি বেরিয়ে এসে আমাদের বললেন, এস।

বিশুদার ঘরে ঢুকলুম। ঘরখানা প্রায় দিদিমণির ঘরের মতনই বড়। মেঝেতে ঘর-জোড়া বিছানা। ছু দিকের দেওয়ালে ছটো উজ্জ্বল কেরোসিনের বাতি জ্বলছে, ঘর একেবারে ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। চারিদিকে, এমন কি বিছানার ওপরে পর্যন্ত, বিড়ির টুকরো আর দেশলাইয়ের কাঠি। ছটো তিনটে সটকার মাথায় কলকের ওপরে তখনো গন্‌গন ক'রে ছোট ছোট গুল জ্বলছে। বিছানার এক কোণে একটা উঁচু গদির ওপর আধশোয়াভাবে পিঠে বালিশ দিয়ে বিশুদা ব'সে আছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকে দিদিমণি সেই বিছানার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে বিশুদাকে একরকম জড়িয়ে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে, ভাইয়া, কেমন আছিস?

ভাই-বোনের সম্বন্ধ একেবারে বাঙালী ঘরের মতন হ'লেও উর্দুতে কথাবার্তা শুরু হ'ল। দিদিমণি বলতে লাগল, ছোটে, তুই কেন কিছু খাচ্ছিস না? এমন ক'রে কদিন বাঁচবি ভাই? বাবুজী বলে, দুধ আর গোশ্‌তের সোরবা না খেলে তুই বাঁচবি না। খাওয়া-দাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলি কেন?

বিশুদা বলতে লাগল, বহেন্‌, খেতে যে পারি না ভাই। তুই বুঝছিস না, তুই তো কিছুতেই মানবি না, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার দিন প্রায় শেষ হয়ে এল। সারাদিন বাদে তুই এলি—কোন্‌দিন এসে দেখবি তোর ছোটে আখ্‌রি শ্বাস ছেড়েছে।

পাঁচ মিনিট আগে এই ঘরে হাসির হর্‌রা চলছিল, আমরা নিজের কানে শুনেছি।

দেখতে দেখতে দিদিমণির চোখে অশ্রু দেখা দিল। অত্যন্ত ধরা গলায় করুণ কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, ছোটে, তুই চ'লে গেলে আমি কি নিয়ে থাকব ভাই—আমার কি রইল?

দিদিমণির অশ্রু ও করুণ কণ্ঠের চাইতে করুণতর হাসি হেসে বিশুদা বললে, বহেন্‌, পরমাত্মার দয়ার সীমা নেই। দেখ্‌, আমি চ'লে যাবার আগেই সে তোকে এই দুটো ভাই এনে জুটিয়ে দিয়েছে।

আমরা দিদিমণির দু পাশে—একটু পেছনে ব'সে ছিলুম। বিশুদা কথাটা বলামাত্র দিদিমণি একবার পাশ ফিরে আমাদের দেখে আবার ভাইয়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

ছোটে সাহেব বলতে লাগল, এই শর্মাজী ও রায় সাহেব—এরা তো এখনও বাচ্চা, তুই এদের নিজের মতন তৈরি ক'রে নে। এদের মুখ দেখেই বুঝতে পারা যায়, এরা শরীফ ঘরের ছেলে।

তারপরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে, আর সুদন তো রইল—আমি গেলে তাকে আর চাকরি করতে দিস নে, কাছে এনে রাখিস।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। তারপরে বিশুদা আমাকে ডেকে তার অদ্ভুত বাংলা ভাষায় বললে, দেখো শর্মাজী, আমার দিদিমণিকে তোমরা দেখো। বেচারা বড় দুঃখীলোক আছে, ওর সাথ কখনও ছেড়ো না।

এই অবধি ব'লেই বিশুদা একদৃষ্টে সামনের দিকে চেয়ে রইল। দিদিমণি বাঁ হাতখানা দিয়ে ভাইকে জড়িয়ে ধরেছিল। আমি ঠিক তার পাশেই অথচ একটু পেছনে ব'সে ছিলুম। সেই অবস্থাতেই সে তার ডান হাতখানা হাত্ড়ে হাত্ড়ে আমার বাঁ হাতটা আস্তে ধ'রে ফেললে। সে স্পর্শের মধ্যে সঙ্কোচ ছিল বটে, কিন্তু অনুনয় ছিল অতি গভীর। এক হাতে মুমূর্ষু ভাই, যার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে সে একত্রে বেড়ে উঠেছে, সারাজীবনের কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি যার সঙ্গে জড়িত—মুষ্টিবদ্ধ বালুকণার মতন যত জোরে সে তাকে আঁকড়ে ধরছে তত তাড়াতাড়িই তার জীবনকণা নিঃশেষ হয়ে চলেছে, এ কথা যে সে বুঝতে পারছে না তা নয়—অন্য হাতে অজানা, অপরিচিত, অনাত্মীয় নবাগত আমরা। দু দিকে দুই তরফকে নিয়ে দিদিমণি ব'সে রইল। আমি দেখতে লাগলুম, তার দুই চোখ দিয়ে নিঃশব্দে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল বিশুদার ডান কাঁধের ওপর।

প্রকাণ্ড হল-ঘর, দুটো দেওয়ালগিরিতেও ঘরের সবটা আলোকিত হয় নি। দূর প্রান্তের কোণগুলোতে অন্ধকার জমা হয়ে রয়েছে। বিশুদা অশ্রুবিহীন উদাস দৃষ্টিতে সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। বিড়ি ও গড়গড়ার ধোঁয়াগুলো ঠাণ্ডার চোটে স্তম্ভিত হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরের মাঝখানে স্থির হয়ে শূন্যে ঝুলতে থাকল। একবার পরিতোষের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার বড় বড় টানা চোখ দুটোতে অশ্রু টলটল করছে। সব স্থির নিস্তব্ধ—এরই মধ্যে স্থাণুর মতন আমরা চারটি প্রাণী ব'সে রইলুম।

আজ শীতের এই সন্ধ্যায়, আলোকহীন কলিকাতা নগরীর মধ্যে নির্বান্ধব পুরীতে একটা ঘরে একলা ব'সে এই জাতক লিখছি। মাথার ওপরে কালিমালিপ্ত বিজলী বাতির ফানুস জ্বলছে, তা থেকে আলোর চাইতে অন্ধকারই বিকিরণ করছে বেশি। জগদ্ব্যাপী মারণ-যজ্ঞের মন্ত্র মাথার ওপর দিয়ে গর্জন করতে করতে আকাশময় ছুটোছুটি করছে। চারিদিকে মৃত্যু ছাড়া আর কথা নেই, মৃত্যু ছাড়া আর সংবাদ নেই, মৃত্যু ছাড়া আর কাব্য নেই। প্রভাত-সূর্য উঠছে মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে, পূর্ণিমার চাঁদ সে তো মৃত্যুরই দূত। ব'সে ব'সে মৃত্যুর কথাই মনে হচ্ছে। মৃত্যু—সে তো আমার অজানা নয়। শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত বারে বারে আমি মৃত্যুর রূপ দেখেছি কত ভাবে! আমার কত প্রিয়জনকে যে সে নিয়ে চ'লে গিয়েছে, তার আর

ঠিকানা নেই। কিন্তু গভীরভাবে মৃত্যুর কথা এর আগে আর কখনও চিন্তা করি নি। আজ অকস্মাৎ অনুভব করলুম, ধীরে, সন্তর্পণে, অতি অতর্কিতে মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছে আমার সম্মুখে, অতি নিকটে। এত নিকটে যে একটুখানি হাত বাড়ালেই তাকে ছুঁতে পারা যায়। মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে দূর-অতীতের আর এক শীত-সন্ধ্যার সেই ছবিখানা মনের মধ্যে ফুটে উঠছে। মনে হচ্ছে, সেই অন্ধকার গৃহকোণের দিকে চেয়ে চেয়ে মৃত্যুপথযাত্রী বিশুদার মনে সেদিন কি ভাবের উদয় হচ্ছিল!

বোধ হয় আধ ঘণ্টা সেই রকম চুপচাপ কাটবার পর দিদিমণি বিশুদাকে বললেন, খানকয়েক হালকা লুচি আর একটু মাংসের সোরুবা পাঠিয়ে দিচ্ছি, খেয়ে ফেল্।

এতক্ষণে বিশুদা বাংলায় বোনের কথার উত্তর দিলে, তুই তো কিছুতেই মানবি না। পাঠিয়ে দে, যদি খেতে পারি তো খাব।

এবার দিদিমণি উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও টেনে তুললে। কারণ আমার বাঁ হাতখানা তখনও সে তেমনই চেপে ধ'রেছিসে।

বিশুদার ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। আমাদের ঘরের কাছে এসে দিদিমণি বললে, তোরা ততক্ষণ ঘরে গিয়ে আরাম কর্, খাবার তৈরি হতে দেরি হবে, আমি একটু দেখিগে যাই। বই পড়বি?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতে দিদিমণি বললে, আচ্ছা, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দিদিমণি চ'লে গেল। আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকে নির্দিষ্ট বিছানায় শুয়ে গল্প করতে লাগলুম। প্রথমেই পরিতোষ ধরা-ধরা গলায় বললে, গুরুমার চেয়ে এরা ঢের ভাল লোক। এদের ছেড়ে কখনও যাব না।

আমি চুপ ক'রে রইলুম, কারণ গুরুমা যে কি রকম লোক সে সম্বন্ধে আজও আমার কোন স্পষ্ট ধারণা হয় নি। মৃত্যুর মতন আজও সে আমার কাছে রহস্যই হয়ে আছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর পরিতোষ বললে, জয়া ফিরে এলে তাকে এইখানেই একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে এনে রাখা যাবে। তারও কাশীর ওই হুল্লোড় ভাল লাগে না।

এবার আমি তাকে একটু খোঁচা দিয়ে বললুম, তুই কি মনে করেছিস, তোর

কথা শুনে কাশী ছেড়ে জয়া এখানে চ'লে আসবে? মেয়েমানুষকে তা হ'লে এখনও চিনতে পারিস নি তুই।

আমার কথা শুনে পরিতোষ বললে, জয়া তোর রাজকুমারীর মতন নয়। আমি বললে সে আমার জন্যে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে।

পরিতোষ ভাগ্যবান! জয়া সম্বন্ধে এই ধারণা নিয়েই সে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছে।

বোধ হয় পনেরো-বিশ মিনিট বাদে বিকেলবেলাকার সেই ভরত এসে খান তিন-চার বাংলা বই আমাদের দিয়ে চ'লে গেল। আমরা এক-একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ভরত আমাদের জাগিয়ে খাবার ঘরে নিয়ে গেল।

রান্নাঘরের এক কোণে কাঠের উনুনে হিন্দুস্থানী ঠাকুর রাঁধছে, কাছেই একটা মোড়ার ওপর দিদিমণি ব'সে। দেখলুম, দুটো বড় বড় পিঁড়ির সামনে দুখানা খালি থালা পাতা রয়েছে। আমরা সেখানে উপস্থিত হওয়ামাত্র দিদিমণি বললেন, নাও, ব'সে পড়, আর রাত ক'রে কি হবে?

ঠাকুর গরম গরম রুটির দু পিঠে ঘি মাখিয়ে আমাদের থালার ওপরে দিয়ে গেল। দিদিমণি দু বাটি মাংস আমাদের দুই থালার পাশে রেখে বললেন, আর কিছু নেই, এই দিয়েই খেতে হবে।

দুটি বেশ বড় বাটি ভর্তি ঘন দুগ্ধ মেরে আহার সমাধা ক'রে ঘরে এসে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া গেল।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট

আপনি

দেখুন, একটা কথা বলি য'দ কিছু মনে না করেন, আপনি কি দয়াদাক্ষিণ্য সমস্ত বিসর্জন দিয়ে আমার পেছনে বরাবরই লেগে থাকবেন? বাড়িতে তো নানান ঝঞ্ঝাটের জ্বালায় একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারি না, কিন্তু বাইরেতেও যদি আপনি এই রকম প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তোলেন, তা হ'লে তো মারা পড়ি মশাই।

ট্রামে তো জায়গা থাকতেও দরজার সামনেটিতে দাঁড়িয়ে থেকে উঠতে দেবেন না,

পকেট কাটবেন, কি মেয়েদের চলমান দেহের ক্ষণিক স্পর্শে নিজেকে পুলকিত ক'রে নেবার জন্যে এই কীর্তি প্রতিদিন করবেন, তা বুঝতে পারি না—যখন উঠবেন তখন তো আমি নাবছি দেখেও এক ধাক্কায় আমার হাড়গোড় চূর্ণ করতে এগিয়ে আসবেন, সিগারেট সমেত হাইজাম্পশিপের কায়দা দেখিয়ে উঠে এই বাজারে আমার জামাটা পোড়াবেন, আবার সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে গেলে তো রেক্টিফায়েড স্পিরিটের মত দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠে আমাকেই মারতে আসবেন, উপদেশ দেবেন—এত ভিড়ে ওঠেন কেন? সবই তো দুবেলা শুনে শুনে কান প'চে গেল, কিন্তু আপনার কায়দার ঠেলায় আমার চরণযুগলের অবস্থা দেখেছেন কি? সকলে চতুর্দিক থেকে এইভাবে আমাকে পদদলিত ক'রে ছেঁচে দেবেন, এটা কি ঠিক হচ্ছে? বলবেন হয়তো, আহা, ননীর পুতুল, কে না কষ্ট ক'রে আজকাল যাতায়াত করছে! ঠিক কথা, আরাম ক'রে যাওয়া এ জীবনে হবে না; জানি, কারণ প্রতিদিন বুঝছি যে; সুস্থদেহে আশপাশ থেকে আপনাদের নানারূপ সিরামের যে প্রয়োগ আমার ওপর দিয়ে চলছে, তাতে আর বেশিদিন পৃথিবীতে আমাকে ভিড় বাড়াতে হবে না। বয়েস তো হয়েছে, এত উৎপাত সইবে কেন? তবু একটু নেকনজর করুন প্রভু! আচ্ছা, যাতায়াতের ভিড়ের কথা ছেড়ে দিন, আপনি আমার ওপর এত বিরূপ কেন বলতে পারেন? আমি আপনার কি পাকা ধানে মই দিয়েছি?

ট্রেনে ক'রে কলকাতায় এলুম, সেদিন আমায় এ রকম ভোগান্তি করালেন কেন বলুন তো? এক ঘণ্টা আগে এসে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলুম, দয়া ক'রে আমার টিকিটটা একটু আগে কেটে দিলে আপনার কিছু ক্ষতি হ'ত কি? অথচ আপনি যে কারুর কাটলেন না, তা তো নয়? ওপাশ থেকে ভাবের লোকদের হাতে তো টিকিটগুলি নির্বিবাদে কেটে দিলেন। আপনি তো আমার সঙ্গে কথাই কইলেন না প্রথমে, দেখলেন ভিড় জমেছে খুব, তবু তো একটু দয়া হ'ল না দাদা। ব'সে ব'সে চা খেলেন, পান খেলেন, মৌজ ক'রে বিড়ি ধরালেন, সবই তো ঘুলঘুলি দিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখলুম। ভাবলুম, কৃপাময় বোধ হয় এইবার আমাদের প্রতি করুণা করবেন। কিন্তু আপনার ব'য়ে যাচ্ছে, আপনি টেবিলের ওপর পা তুলে খবরের কাগজটা টেনে পড়তে শুরু করলেন, আপনার অ্যাসিস্টেন্টকে ডেকে বীরবিক্রমে একটা হেডলাইন প'ড়ে শোনালেন—শোন হে রমেশ, আমাদের স্বদেশবাসীর প্রতি অত্যাচার, বেটারা ব্ল্যাকমার্কেট ক'রে ক'রে দেশটাকে খেলে, অথচ এদিকে আপনার জাতভায়েরা একশো জন লাইন ক'রে দাঁড়িয়ে, তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই, দশ কি পাঁচ মিনিট আগে আপনি দয়া ক'রে একবার উঠে জানলার কাছে এগিয়ে এলেন, বিরক্ত হয়ে সেই সময় আমি একটু লাইনের বাইরে গেছি অমনই হুস ক'রে ট্রেন এসে গেল, আপনি সবশেষে আমায় যখন মুখ ভেঙিয়ে ভাঙানি দিতে শুরু করেছেন, সেই সময় ট্রেনখানি 'হুড়োর' 'হুড়োর' করতে করতে বেরিয়ে চ'লে

গেল, এর পর তিন ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে, ঝড়-বৃষ্টি সব-কিছু ওরই মধ্যে ব'য়ে গেল, আপনারও ব'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার নাজেহাল—এই আর কি!

খামকা এই ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে আপনার কি লাভটা হ'ল বলতে পারেন? আমি কি বিলিতী জাহাজে চেপে এ দেশে পদার্পণ করেছি?

শুধু কি আপনি?—আপনার গুষ্টিবর্গ সবাইকেই আপনি কি সব ঘাঁটিতে বসিয়ে রেখেছেন, না আপনিই পোশাক বদলে সর্বত্র ব'সে থাকেন, বুঝতে পারি না।

সেদিন মনি-অর্ডার করতে গেলুম, আপনি তো আমাকে মারমুখো হয়ে তেড়ে এলেন। কেন মশাই, আমি তো আপনাকে বেয়ারিংয়ে মনি-অর্ডার নিতে বলি নি, একটু ভদ্রভাবে বললে আপত্তি ছিল কি? এত রাগের কারণটা কি? খাটুনি! হায় রে, আপনি তো তবু চেয়ারে ব'সে পাখা খাচ্ছেন, আমরা যে গরমে ঠায় ঘণ্টাদুয়েক বাইরে দাঁড়িয়ে আপনার চাঁদমুখখানি দেখছি, এতেও কি আপনার মায়া হয় না?

বিল জমা দিতে যাই, সেখানেও দেখি, আপনি সেই মেজাজ নিয়ে ব'সে আছেন। অত কথা কি, ছুটির দিনে বায়স্কোপে থিয়েটারে টিকিট কেটে আপনাদের উপকার করতে গেলুম, তার ভেতরেও আপনি যে রকম খিঁচিয়ে উঠলেন, যেন আমি পাস চাইছি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দোব, আপনি অর্ধেক সময় তো তা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। ব্যাঙ্কে চেক ভাঙাতে যাব, কিন্তু সেটি একটু চালু হ'লে আমাকে তো কথা কইবার মত উপযুক্ত লোক ব'লে মনে করবেন না। আপনি খোঁজখবর দেবার জন্তেই আপিসে ব'সে আছেন, কিন্তু কোন বিষয়ে খোঁজ নিতে গেলে আপনার দাঁত-কিড়িমিড়ি শুনলে তো আত্মারাম শুকিয়ে যায়। আর বিপদে প'ড়ে আপনার কাছে ছুটে গেলে তো আর কথাই নেই, যাতে আরও জড়িয়ে পড়ি তার ব্যবস্থার জন্তে তো উঠে প'ড়ে লাগবেন। কাপড়ের দোকানের লাইসেন্স পেলে তো আপনার থিয়েটারের অ্যাক্টারদের চেয়েও মেজাজ চড়া হয়ে যায় দেখি। থানা, পুলিস, আদালত, স্বদেশী নেতাগিরির কথায় আর কাজ কি! সবার ঠেলায় তো প্রাণ যায়। সরকারী কোন জায়গায় বসলে আর আপনাকে পায় কে? মেজাজ টাইফয়েডের রুগীর চেয়ে দু-ডিগ্রীর ওপর গরম, খুব ভদ্রলোক হ'লে চেঁচিয়ে অবশ্য আপনি ব'লে দেন, যান যান, বেশি বকবেন না, রিপোর্ট করুন গে।

আরে মশাই, আপনি তো বললেন রিপোর্ট করুন, কিন্তু ঝঞ্ঝাটটা পোয়াবে কে বলুন তো? আর কথায় কথায় রিপোর্ট ক'রে চলতে গেলে তো হোঁচট খেতে খেতেই প্রাণান্ত হয়, আপনি রুল দেখাবেন সত্যি, কিন্তু অত মুখস্থ থাকলে তো হাইকোর্টে আমার জায়গাটা আর খালি প'ড়ে থাকত না, সেটা স্মরণশক্তির অভাবে পারি নি ব'লেই তো প্রতিনিয়ত আপনার রুল এবং গুলের ঠেলায় চোখে সর্ষেফুল দেখছি। এর থেকে আপনি একটু মেহেরবানি ক'রে রেহাই দিলে যে বাঁচি।

উঃ! সংসারে এত ঝঞ্ঝাট—এ কি কোন দিন কল্পনা করতে পেরেছি? তা হ'লে কার্ত্তিকের দোহাই, বিশ্বাস করুন, এ জায়গা বহু পূর্ব্বে ছেড়ে পালাতুম। আপনি ঈশ্বরের বরপুত্র জানি, কিন্তু আমরা তা না হ'লেও পুষ্যিপুত্র তো বটে, কিন্তু আমাকে এইভাবে লাঞ্ছিত করাটা কি আপনার ধর্ম্ম হচ্ছে?

আপনি দুধে জল মেশাবেন, আমাকে তা খাঁটির দরে কিনতে হবে। আপনি ঘিয়ে সাপের ব্যাঙের চর্বি মেশাবেন, আমায় তা গব্য ঘৃত ব'লে মেনে নিয়ে গলাধঃকরণ করতে হবে, আপনি পচা মাছ, বাছপড়া আলু চালান দেবেন আমায় তা পয়সা দিয়ে কিনতে হবে। যদি প্রতিবাদ করতে যাই, আপনি সকলের সামনে খপ ক'রে আমার হাত থেকে জিনিস কেড়ে নেবেন। বাসে ট্রামে ওঠাবেন, কিন্তু নামবার সময় রেলওয়ে-মেল যেমন পোষ্টব্যাগ ফেলে দিয়ে যায়, তেমনই ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। আপনি হোটেলে পচা মাংস ভেজিটেব্‌ল ঘিয়ে লঙ্কা দিয়ে ভেজে আমার ক্ষিদের সুযোগ নিয়ে যাতে খুব শিগগির সং ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে ওপর দিকে যেতে পারি হাসিমুখে তার বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন। রাস্তায় যখন চলবেন, তখন কনুয়ের গুঁতো মেরে হাঁটবেন, আমার জামার হাতার সঙ্গে আপনার ছাতা আটকে গেলেও আপনি তাই চড়চড় ক'রে ছিঁড়তে ছিঁড়তে চলবেন আমি রাত্তিরে খেটেখুটে এসে একটু চোখ বুজব, অমনই পাশের বাড়ির জানলার পাশে ব'সে হয় বাবা আদমের আমলের একটা গ্রামোফোন ও তাঁর সমসাময়িক খান চারেক রেকর্ড বাজাতে শুরু করবেন, নয় পনেরো-কুড়ি টাকার একটি হারমোনিয়াম নিয়ে প্রাণপণ বেসুরো চীৎকার ক'রে রাত একটা আন্দাজ মুক্তি দেবেন। এইভাবে আমাকে পাগল ক'রে আপনার কি সুখটা হচ্ছে সেটা তো বুঝতে পাচ্ছি না!

আপিসে চলেছি, আপনি ওপর থেকে এক ঝোড়া কুটনোর খোসা কিংবা পানের পিচ মাথায় ফেলে দিলেন, নেহাত তা না দিলেও জল খেয়ে অন্তত আধ গেলাস আমার মাথায় ছুঁড়ে দিলেন, এটা কি খুব ভাল হ'ল?

ঘরে ব'সে আছি, আপনি সেখানে ব'সে ব'সে পানের পিচ ফেলছেন, রাস্তার ফুটপাতে আপনি আঁবের খোসা ছড়িয়ে আমাকে নিপাতিত করার চেষ্টা করছেন, আমি যা সাজাচ্ছি, আপনি তা নষ্ট করছেন, আমি একটা কিছু গড়লে আপনি তা সর্ব্বাগ্রে যাতে ভাঙে তার জন্তে আদাজল খেয়ে উঠে প'ড়ে লেগেছেন, আমি ভুল ক'রে আপনার দেশে জন্মগ্রহণ ক'রে ফেলেছি ব'লেই কি আপনি আমার ওপর এত ক্ষেপে আছেন? দয়াময়, একটু স্থিরচিত্তে আমার অবস্থাটা ভাবুন, আর কটা দিন এই সব বাজে ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রেহাই দিয়ে আমায় একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দিন প্রভু!

শ্রীবিরূপাক্ষ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১৮৭৩—১৯৩২

জন্ম ঃ বংশ-পরিচয়

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি (২২ মাঘ ১২৭৯) তারিখে বর্দ্ধমান ধাত্রীগ্রামে মাতুলালয়ে প্রভাতকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—জয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ; আদি নিবাস—হুগলী জেলার গুরুপ।

ছাত্র-জীবন

প্রভাতকুমারের পিতা ঈ. আই. রেলে সামান্ত বেতনে সিগনালারের কর্ম্ম করিতেন। এই কারণে তাঁহাকে বিভিন্ন ষ্টেশনে—কখন বাবা, কখন জামালপুর, কখন বা দিলদারনগরে কাটাইতে হইয়াছে। প্রভাতকুমার তাঁহার মাসতুত-ভাই রাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে জামালপুরে থাকিয়া স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা করিতেন। রাজেন্দ্রচন্দ্র ছিলেন ঐ স্কুলের শিক্ষক। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১৫ বৎসর বয়সে, প্রভাতকুমার জামালপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে পরীক্ষা-দানকালে তাঁহার বয়স ১৩ বৎসর ছিল বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রভাতকুমার কোন্ সালে কোন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, ক্যালেণ্ডার হইতে তাহার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

এন্ট্রান্স ...	জামালপুর এইচ. সি. ঈ. স্কুল ...	২য় বিভাগ ...	ইং ১৮৮৮
এফ্. এ. ...	পাটনা কলেজ ...	৩য় বিভাগ ...	১৮৯১
বি. এ. ...	পাটনা কলেজ ...	...	১৮৯৫

বিবাহ

এফ্. এ. পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রভাতকুমার হালিশহর-নিবাসী অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্তা ব্রজবালা দেবীকে বিবাহ করেন। বিবাহ জামালপুরেই হয়, অন্নদাপ্রসাদ জামালপুরেই কর্ম্ম করিতেন। ১৩০৩ সালের চৈত্র-সংখ্যা (ইং ১৮৯৭) 'ভারতী'তে ব্রজবালা দেবী "ভূত না চোর ?" নামে ভাষান্তর হইতে গৃহীত একটি গল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিবাহের ছয় বৎসর পরে (ইং ১৮৯৭) তিনি দুইটি শিশুসন্তান—অরুণকুমার ও প্রশান্তকুমারকে রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন।

কেরাণীগিরি

বি. এ. পরীক্ষা দিবার পর, সরকারী ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রভাতকুমার অস্থায়ী ভাবে সিমলা-শৈলে ভারত-সরকারের একটি আপিসে কিছুদিন চাকুরী করিয়াছিলেন। সিমলা দর্শন করিয়া তিনি ১৩০৪ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'প্রদীপে' (ইং ১৮৯৮) "সিমলা-শৈল" নামে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সিমলা হইতে ফিরিয়া প্রভাতকুমার কলিকাতার ডিরেক্টর-জেনারেল অব টেলিগ্রাফসের আপিসে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হন (ইং ১৮৯৯)।

বিলাত-যাত্রা

কেরাণীগিরি প্রভাতকুমারকে বেশি দিন করিতে হইল না। অকস্মাৎ বিলাতযাত্রার এক অভাবনীয় সুযোগ তাঁহার মিলিয়া গেল।

পঠদ্দশা হইতেই প্রভাতকুমার 'ভারতী' পত্রিকায় লিখিতে শুরু করেন। ১৩০২ সাল (ইং ১৮৯৫) হইতে উক্ত পত্রিকায় তাঁহার রচনাবলী নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং তিনি 'ভারতী'র এক জন বিশিষ্ট লেখক বলিয়া পরিগণিত হন। সরলা দেবী তখন 'ভারতী'র সম্পাদিকা। প্রভাতকুমারের সাহিত্যিক প্রতিভার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। টেলিগ্রাফ আপিসে কার্য্যকালে 'ভারতী'-সম্পাদিকার সহিত প্রভাত-কুমারের আলাপ-পরিচয়ের সূচনা হয়। উভয়ের পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় এবং শেষে সরলা দেবীর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যস্থতায় বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হয়। স্থির হয়, সরলা দেবীর মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যয়ে প্রভাতকুমার ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করিবেন; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিলে যথারীতি বিবাহ হইবে।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি প্রভাতকুমার কাহাকেও কিছু না জানাইয়া বিলাত যাত্রা করেন। ইহার অল্প দিন পূর্ব্বে (ইং ১৯০০) তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মাতা তখন সদ্য বৈধব্যশোকে কাতরা। প্রভাতকুমার অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন; পাছে মাতা আপত্তি করিয়া বসেন, এই ভয়ে তিনি তাঁহার নিকটও বিলাতযাত্রার কথা পূর্ব্বাহ্নে ব্যক্ত করেন নাই।

তিন বৎসর পরে, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে প্রভাতকুমার ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু নূতন করিয়া সংসার পাতা তাঁহার ভাগ্যে আর ঘটিয়া উঠে নাই, তাঁহার মাতা এই বিবাহে সম্মতি দেন নাই। এই অপ্রত্যাশিত আঘাত তাঁহার মর্ম্মমূলে এক দুরপনেয় ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছিল,—তিনি চিরতরে সংসার-ধর্ম্মের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন।

ব্যারিষ্টারি

বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রভাতকুমার অল্পদিন দার্জ্জিলিঙে ছিলেন। সেখানে প্র্যাক্টিসের সুবিধা হইবে না বুঝিয়া তিনি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রংপুরে গমন করেন। তথায় চারি বৎসর প্র্যাক্টিস করিবার পর গয়া তাঁহার কর্ম্মস্থল হয় (মে ১৯০৮), এখানে তিনি আট বৎসর ছিলেন।

'মানসী ও মর্ম্মবাণী' সম্পাদন

ব্যবহারাজীবের কার্য্যে প্রভাতকুমারের মন বসিতেছিল না। সাহিত্যের কমল-বনে তিনি যে আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সমস্ত চিত্তকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'মানসী' ও 'সাহিত্যে' প্রকাশিত তাঁহার ছোট গল্প ও উপন্যাসগুলি পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্রমে 'ষোড়শী', 'দেশী ও বিলাতী', 'গল্পাঞ্জলি' ও 'নবীন সন্ন্যাসী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে বাংলা কথা-সাহিত্যের আসরে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী ও বিষয়বস্তু—সকল দিক্‌ দিয়াই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল প্রভাতকুমারের ছোট গল্পগুলি তদানীন্তন বাংলা-সাহিত্যে রীতিমত সাড়া জাগাইয়াছিল, বিশেষতঃ বিলাতের বিষয়বস্তু লইয়া লেখা 'দেশী ও বিলাতী' পুস্তকের গল্পগুলির অভিনবত্ব পাঠক ও সমালোচক সকলেরই চমক লাগাইয়া দিয়াছিল। এমনি ভাবে সাহিত্যচর্চা দ্বারা যেমন তাঁহার যশোবৃদ্ধি হইল, তেমনি অর্থাগমও হইতে লাগিল। অন্তরের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ এবং আর্থিক সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া একাগ্রচিত্তে সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য তাঁহার একান্ত আগ্রহ জন্মিল। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিল না, অচিরেই সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসে (ইং ১৯১৪) নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ রায় 'মানসীর' সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেন। মহারাজার চেষ্টায় এই সময় হইতে 'মানসী'র সহিত প্রভাতকুমারের সম্পর্ক দৃঢ়ীভূত হয়। ইহার দেড় বৎসর পরে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণকে সহযোগী-রূপে গ্রহণ করিয়া জগদিন্দ্রনাথ 'মর্ম্মবাণী' নামে সাহিত্য-বিষয়ক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৩ শ্রাবণ ১৩২২ (ইং ১৯১৫) তারিখে। প্রভাতকুমার স্বনামে ও ছদ্ম নামে* নিয়মিতভাবে রচনা দিয়া 'মর্ম্মবাণী'কেও সাহায্য করিয়াছিলেন। ছয় মাস পরে 'মর্ম্মবাণী' উঠাইয়া দিয়া এবং 'মানসী'র কলেবর বৃদ্ধি করিয়া, ১৩২২ সালের ফাল্গুন মাস (ইং ১৯১৬) হইতে 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামে এক মাসিকপত্র প্রকাশ করা হয়। নাটোরাধিপতির অনুরোধে তাঁহার সহযোগিরূপে প্রভাতকুমার 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সম্পাদক হন। তিনি তখনও গয়ায় প্র্যাক্‌টিস করিতেছিলেন; প্রথম কয়েক মাস পত্রিকা বাহির হইবার পাঁচ-সাত দিন পূর্ব্বে গয়া হইতে কলিকাতায় আসিতেন, তাহার পর কলিকাতায় স্থায়িভাবে অবস্থান করিবার সুযোগ মহারাজই করিয়া দেন। 'মানসী

* "শ্রীজানোয়ারমোহন শর্ম্মা" এই ছদ্ম নামে প্রভাতকুমার "সুস্বপ্নলোম পরিণয়" নামক একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক 'মর্ম্মবাণী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার কোন পুস্তক বা গ্রন্থাবলীতে পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

ও মর্ম্মবাণী' ১৩৩৬ সালের মাঘ সংখ্যা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই ১৪ বৎসর কাল প্রভাতকুমার সুষ্ঠুভাবে পত্রিকাখানি পরিচালন করিয়াছিলেন।

আইন-কলেজে অধ্যাপনা

গয়া হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রভাতকুমার নাটোরাধিপতির চেষ্টা-যত্নে ১ আগষ্ট ১৯১৬ তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল-কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

সাহিত্য-পরিষদের গুণগ্রাহিতা

১৩৩৩ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রভাতকুমারকে অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

মৃত্যু

৫ এপ্রিল ১৯৩২ (২২ চৈত্র ১৩৩৮, রাত্রি ২টা) তারিখে কলিকাতায় প্রভাতকুমারের মৃত্যু হয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

প্রভাতকুমার স্বল্পভাষী, শিষ্টাচারসম্পন্ন, নিরহঙ্কার ও সুমিষ্ট মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন আত্মগোপনপ্রয়াসী; সভা-সমিতির ঝিল্লিঝঙ্কার হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়া আজীবন নীরবেই সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছেন। অনাবিল সাহিত্য-রস পরিবেশন করিয়া পাঠক-সাধারণকে আনন্দদানই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত, নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা কখনও তাঁহাকে বিভ্রান্ত করে নাই। আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা ছিল তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ, এবং এই দুইটি গুণের দ্বারা তিনি বন্ধুগোষ্ঠীর হৃদয়ে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যিক প্রভাতকুমার অপেক্ষা মানুষ প্রভাতকুমার যে ছোট ছিলেন না, সে-পরিচয় লাভের সৌভাগ্য খুব বেশী লোকের হয় নাই।

রচনাবলী

প্রভাতকুমার ছাত্রাবস্থাতেই সাহিত্য-সেবা সুরু করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার প্রাথমিক রচনাগুলির নিদর্শন পুরাতন "ভারতী", 'দাসী' ও 'প্রদীপে'র পৃষ্ঠায় মিলিবে। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা বোধ হয় ১২৯৭ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা (ইং ১৮৯০) 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত "চির-নব" নামে একটি কবিতা; এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ১৭। ইহার পরবর্ত্তী চারি বৎসরে আমরা প্রভাতকুমারের কোন রচনার সন্ধান পাই না। কবিযশপ্রার্থী হইলেও তাঁহার মন ক্রমশঃ প্রবন্ধ ও

গল্প রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে তিনি স্মৃতিকথায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"প্রথম বৎসরের 'প্রদীপ', ১৩০৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীবিলাসের দুর্ব্বুদ্ধি' গল্পটিই সর্বপ্রথমে লিখিত ও প্রকাশিত ;* কিন্তু তখন আমি ছিলাম "কবি", সুতরাং গল্পে নিজের নাম না দিয়া শ্রীরাধামণি দেবী একটি কাল্পনিক নাম সহি করিয়া দিয়াছিলাম।† এই কাল্পনিক নামটির একটু ইতিহাস আছে। তাহার পূর্ব্ব বৎসর কুন্তলীনের বাৎসরিক পুরস্কারের বিষয় ছিল 'পূজার চিঠি'—স্ত্রী যেন প্রবাসী স্বামীকে বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিতেছে, এটা, ওটা জিনিষের সহিত এক বোতল কুন্তলীন আনিতেও অনুরোধ করিতেছে—এইরূপ পত্র রচনা করিতে হইবে। শ্রীমতী রাধামণি দেবীর বেনামিতে আমি একখানি পত্র রচনা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম ; উহা প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য, ওই নামটির উপর কেমন মায়া হইয়া যায় ; গল্পের ছদ্মনাম-স্বরূপ উহাই ব্যবহার করি। কুন্তলীনেরা কেমন করিয়া জানিতে পারেন, পত্রখানি আমার লেখা। সেই অবধি উঁহারা পুরস্কার ঘোষণার সময় লিখিয়া দেন, কেহ আসল নাম গোপন করিয়া ছদ্মনাম ব্যবহার করিলে পুরস্কার পাইবেন না।......

রবিবাবুর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই আমি গদ্য রচনায় হাত দিই। তিনি আমায় যখন গদ্য লিখিতে অনুরোধ করেন, আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম—'কবিতায় মা বাপ নাই, যা খুসী লিখিয়া যাই—কবিতা হয়। কিন্তু গদ্য লিখিতে হইলে যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন ; সে পাণ্ডিত্য আমার কই ?'

ইহাতে রবিবাবু উত্তরে লেখেন, 'গদ্য-রচনার জন্য প্রধান জিনিস হইতেছে রস। রীতিমত আয়োজন না করিয়া, কোমর না বাঁধিয়া, সমালোচনা হউক, প্রবন্ধ হউক, গল্প হউক, একটা কিছু লিখিয়া ফেল দেখি। ইহার ফলে 'দাসী'তে চিত্রায় এক সমালোচনা লিখিয়া পাঠাই, তাহাতে কোন নাম দিই নাই ;‡ আর, 'প্রদীপে'র জন্য ওই গল্প রচনা করি। কিন্তু গল্পের কথা রবীন্দ্রবাবুকে আমি

---

* ইহা ঠিক নহে, ১৩০৪ সালের কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রভাতকুমারের "কাজির বিচার" গল্পটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

† ইহা কল্পিত নাম নহে। প্রভাতকুমারের শ্যালক-পত্নীর নাম ছিল রাধামণি দেবী।

‡ 'দাসী', মে ১৮৯৬ (বৈশাখ ১৩০৩) সংখ্যা দ্রষ্টব্য। লেখার শেষে লেখকের নাম ছিল না, বার্ষিক সূচীতে ছিল। কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে ১৩০২ সালের 'ভারতী'র অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় প্রভাতকুমারের "দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর" ও "নীলকুল-বাসুদেবের ব্রতকথা" প্রকাশিত হইয়াছিল।

জানাই নাই। সেই সংখ্যা 'প্রদীপ' 'ভারতী'তে সমালোচনা করিয়া রবিবাবু (তিনি তখন 'ভারতী'র সম্পাদক) আমার গল্পটির সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ভাদ্রের 'প্রদীপে' আর একটি গল্প ছাপা হইল, 'বেনামী চিঠি',—তাহাও ওই রাধামণির বেনামীতে! রবিবাবু এবারও 'ভারতী'তে ইহার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা করিলেন। তখনও তিনি জানেন না যে, আমিই রাধামণি। দুইবার এইরূপ অনুকূল সমালোচনা হওয়াতে আমার বুক বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় বৎসর 'প্রদীপে' নিজ মূর্ত্তি ধরিয়াই বাহির হইলাম। 'অঙ্গহীনা' এবং 'হিমানী' গল্প দুইটি আমার স্বাক্ষর-যুক্ত হইয়া বাহির হইল।

এক বৎসর সম্পাদকতা করিয়া রবিবাবু 'ভারতী' ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী সম্পাদন আরম্ভ করিলেন। সেই বৎসর ভারতীতে 'ভুল ভাঙ্গা' বাহির হইল।"—"মনীষা-মন্দিরে" : কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত—'সঙ্কল্প', অগ্রহায়ণ ১৩২১।

গ্রন্থপঞ্জী

প্রভাতকুমারের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী তারিখগুলি বেঙ্গল লাইব্রেরির মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। **নব-কথা** (গল্প)। কলিকাতা, কার্ত্তিক ১৩০৬ (২০ ডিসেম্বর ১৮৯৯)। পৃ. ২৩৪।

২। **অভিশাপ** (ব্যঙ্গকাব্য)। ইং ১৯০০ (?)

৩। **ষোড়শী** (গল্প)। রঙ্গপুর, আশ্বিন ১৩১৩ (২০ অক্টোবর ১৯০৬)। পৃ. ৩০১।

৪। **রমাসুন্দরী** (সামাজিক উপন্যাস) রঙ্গপুর, ১৩১৪ সাল (২৬ এপ্রিল ১৯০৮)। পৃ. ২৩১।

৫। **শাহজাদা ও ফকীর-কন্যার প্রণয়-কাহিনী ; কাটা মুণ্ড** (পৃ. ১৯); **গুল বেগমের আশ্চর্য্য গল্প** (পৃ. ৬৭)। ১৩১৬ সাল (ইং ১৯০৯)।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাতকুমার ভাষান্তর হইতে গৃহীত এই তিনটি গল্প তিনখানি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে ("মুসলমানী কেচ্ছা নং ১, নং ২, নং ৩") নামমাত্র মূল্যে প্রচার করিয়াছিলেন। পুস্তিকায় লেখকের নাম ছিল না। প্রথম দুইটি গল্প 'নব-কথা'র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩১৮) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ; তৃতীয়টি আর পুনর্মুদ্রিত হয় নাই।

৬। **দেশী ও বিলাতী** (গল্প)। গয়া, আশ্বিন ১৩১৬ (১৫ অক্টোবর ১৯০৯)। পৃ. ৩৪৮।

৭। **নবীন সন্ন্যাসী** (উপন্যাস)। গয়া, ১ ভাদ্র ১৩১৯ (৬ সেপ্টেম্বর ১৯১২)। পৃ. ৪৪৬।

৮। **গল্পাঞ্জলি** (গল্প)। গয়া, আশ্বিন ১৩২০ (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৩)। পৃ. ১৯৭।

৯। **রত্ন-দ্বীপ** (উপন্যাস)। গয়া, আষাঢ় ১৩২২ (১৪ আগষ্ট ১৯১৫)। পৃ. ৩৪৯।

১০। **গল্পবীথি** (গল্প)। কলিকাতা, ১ আষাঢ় ১৩২৩ (২০ জুন ১৯১৬)। পৃ. ২৭০।

১১। **জীবনের মুল্য** (উপন্যাস)। ফাল্গুন ১৩২৩ (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৭)। পৃ. ২৪০।

১২। **পত্রপুষ্প** (গল্প)। ১৩২৪ সাল (১৮ আগষ্ট ১৯১৭)। পৃ. ১৯৮।

১৩। **সিন্দুর-কৌটা** (উপন্যাস)। বৈশাখ ১৩২৬ (২০ মে ১৯১৯)। পৃ. ৪২০।

১৪। **বারোয়ারি উপন্যাস**। [বৈশাখ ১৩২৮] ইং ১৯২১। পৃ. ২৪৪। ইহার ৯-১১ পরিচ্ছেদ প্রভাতকুমারের লিখিত।

১৫। **গহনার বাক্স** ও অন্যান্য গল্প। শ্রাবণ ১৩২৮ (১৬ আগষ্ট ১৯২১)। পৃ. ১৮৮।

১৬। **মনের মানুষ** (উপন্যাস)। ১৩২৯ সাল (১০ আগষ্ট ১৯২২)। পৃ. ৩০৪।

১৭। **হতাশ প্রেমিক** ও অন্যান্য গল্প। পৌষ ১৩৩০ (২২ জানুয়ারি ১৯২৪)। পৃ. ২৫৩।

১৮। **আরতি** (উপন্যাস)। ১৩৩১ সাল (১ অক্টোবর ১৯২৪)। পৃ. ১৭২।

১৯। **সত্যবালা** (উপন্যাস)। ১৩৩১ সাল (১৫ এপ্রিল ১৯২৫)। পৃ. ২৩৪।

২০। **বিলাসিনী** ও অন্যান্য গল্প। অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ (২৭ নবেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ১৮৬।

২১। **সুখের মিলন** (উপন্যাস)। আশ্বিন ১৩৩৪ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৭)। পৃ. ১৭২।

২২। **যুবকের প্রেম** ও অন্যান্য গল্প। ১৩৩৫ সাল (২৫ জুন ১৯২৮)। পৃ. ১৯৪।

২৩। **সতীর পতি** (উপন্যাস)। ১৩৩৫ সাল (৮ অক্টোবর ১৯২৮)। পৃ. ৩৬০।

২৪। **প্রতিমা** (উপন্যাস)। ১৩৩৫ সাল (৯ নবেম্বর ১৯২৮)। পৃ. ১৩২।

২৫। **নূতন বউ** ও অন্যান্য গল্প। ১৩৩৫ সাল (২৫ মার্চ ১৯২৯)। পৃ. ২২৩।

২৬। **গরীব স্বামী** (উপন্যাস)। ? (২৫ এপ্রিল ১৯৩০)। পৃ. ২৮৭।

২৭। **নবদুর্গা** (উপন্যাস)। ? (৩১ জুলাই ১৯৩০)। পৃ. ২৪৫।

২৮। **জামাতা বাবাজী** ও অন্যান্য গল্প। ১৩৩৮ সাল (৫ নবেম্বর ১৯৩১)। পৃ. ২২৮।

২৯। **বিদায় বাণী** (উপন্যাস)। ৬ পৌষ ১৩৪০ (২৩ ডিসেম্বর ১৯৩৩)। পৃ. ২৬৮।

ইহার ১৫২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রভাতকুমারের রচনা; বাকী অংশ শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের।

প্রভাত-গ্রন্থাবলী, ১ম-৫ম ভাগ। জানুয়ারি ১৯২৩—সেপ্টেম্বর ১৯২৫ (বসুমতী)

ইহাতে (১৪-সংখ্যক পুস্তক ছাড়া) ১ম হইতে ১৮শ সংখ্যক পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২০-সংখ্যক পুস্তকের দুইটি গল্প—গুণীর আদর ও অম্বালিকা, এবং ২২-সংখ্যক পুস্তকের তিনটি গল্প—যুবকের প্রেম, তারাধন ও পোষ্টমাষ্টার স্থান পাইয়াছে। ১ম ও ৩য়-৫ম ভাগ গ্রন্থাবলীতে "বিলাত ভ্রমণ" নামে কয়েকটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে; এগুলি 'ভারতী' ও 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। পঞ্চম ভাগ গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত দুইটি প্রবন্ধ—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও চিত্রা—১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের 'দাসী' হইতে গৃহীত।

Stories of Bengal Life—Translated from the Bengali of Prabhat Kumar Mukerji. By Miriam S. Knight and the Author. Calcutta 1912, Pp. 252 + 4 Glossary.

ইহাতে 'নব-কথা'র অন্তর্ভুক্ত "কুড়ানো মেয়ে"; 'ষোড়শী'র "বজ্র-শিশু", "কাশীবাসিনী", "কলির মেয়ে", "ছদ্মনাম" ও "ভুল শিক্ষার বিপদ" এবং 'দেশী ও বিলাতী'

পুস্তকের "প্রতিজ্ঞা-পূরণ", "উকীলের বুদ্ধি", "হাতে হাতে ফল" ও "খালাস"—এই ১০টি গল্পের ইংরেজী অনুবাদ আছে।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা—

প্রভাতকুমারের রচিত বহু কবিতা 'ভারতী', 'দাসী' ও 'প্রদীপে' মুদ্রিত হইয়াছিল; এগুলির মধ্যে কেবলমাত্র 'অভিশাপ'ই পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার লিখিত অনেক গদ্য-রচনাও বিভিন্ন মাসিকের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া আছে; এই সকল রচনা সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমরা পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার কতকগুলি রচনার নির্দেশ দিতেছি :—

নীলকুল-বাসুদেবের ব্রতকথা	...	'ভারতী', পৌষ ১৩০২
ছেলে মানুষ করা	...	আশ্বিন ১৩০৩
সিমলা-শৈল (সচিত্র)	...	'প্রদীপ', ফাল্গুন ১৩০৪
চিত্ত-বিকাশ (সমালোচনা)	...	ফাল্গুন ১৩০৫
গাজিপুরে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায় (সচিত্র)		আষাঢ় ১৩০৭
"সর্ববিষয়ে স্বদেশী"	...	'প্রবাসী', কার্তিক ১৩১৩
ভূতনামানো	...	চৈত্র, ১৩১৪
কুমীর পোষা (সচিত্র, সংকলন)	...	কার্তিক ১৩১৭
বঙ্কিমচন্দ্র-জীবনপঞ্জী	...	'মানসী', চৈত্র ১৩২১
সূক্ষ্মলোম পরিণয় (পঞ্চাঙ্ক নাটক)	...	'মর্ম্মবাণী', ১৩ শ্রাবণ...১৩২২
চন্দ্রের কলঙ্ক	...	২ ভাদ্র ১৩২২
পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত কালিদাসের গল্প	...	'মানসী ও মর্ম্মবাণী', ভাদ্র ১৩২৫
কালিদাসের বাঙ্গালীত্ব-সূচক একটি কিম্বদন্তী		পৌষ ১৩২৮
সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর	...	'সচিত্র শিশির', ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩০
চিত্তরঞ্জনের বাণী	...	'মাসিক বসুমতী', আষাঢ় ১৩৩২
অমৃতলালের স্মৃতিতর্পণ	...	শ্রাবণ ১৩৩৬
দুধ-মা (গল্প)	...	চৈত্র ১৩৩৮
কাজির বিচার (ছেলেদের গল্প)	...	'রামধনু', মাঘ ১৩৩৪
বীরবলের গল্প "	...	কার্তিক ১৩৩৫
কাজির বুদ্ধি "	...	'রংমশাল', ১৩৩৫

১৩১৭ সালের আশ্বিন মাসে (ইং ১৯১০) প্রকাশিত ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'ঘরের কথা'র ভূমিকা-স্বরূপ প্রভাতকুমার ছোটগল্প সম্বন্ধে যে নিবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাহাও পুনর্মুদ্রিত হওয়া উচিত।

১৩৩০ সালে প্রকাশিত, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ-প্রণীত 'হেমচন্দ্র' পুস্তকের ৩য় খণ্ডের পরিশিষ্টে "প্রভাতকুমারের স্মৃতিকথা" মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রভাতকুমার ও বাংলা-সাহিত্য

প্রভাতকুমারের গল্পগুলির সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় নাই বলিয়া এ যুগের তরুণ সাহিত্য-রসিক সম্প্রদায় বাংলা কথা-সাহিত্যে প্রভাতকুমারের যোগ্য মর্য্যাদা দিতে কার্পণ্য করিয়া থাকেন; এই কারণে এই যুগের পাঠক-সমাজের সহিত তাঁহার রচনার পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই কালানুক্রমিক তালিকাটি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি। প্রভাতকুমারের গল্পগুলি সরস বর্ণনায় এবং সুরস ব্যঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া আছে বলিয়া প্রাণধর্ম্মে চঞ্চল ও সজীব; সহৃদয় পাঠকের কাছে সেগুলির কখনও মার নাই। বিলাত হইতে দেশ, প্রাচীন হইতে আধুনিক—বিষয়ের বিস্তারেও প্রভাতকুমার আশ্চর্য্য প্রতিভা ও দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার রসিক সহানুভূতিপরায়ণ চিত্তটির স্পর্শও আমরা নির্ম্মল হাসি ও অক্রোধ ব্যঙ্গের মধ্য দিয়া সর্বত্র লাভ করি; জীবন ও জগৎকে দেখিবার ও দেখাইবার সহজ ভঙ্গিটি আমাদিগকে স্বতঃই মুগ্ধ করে। প্রভাত-কুমারের সাহিত্যের প্রধান পরিচয় তাঁহার গল্পগুলি, তাহা সমালোচকের বিচার-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। তথাপি এ যুগের পাঠকের অবগতির জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাতকুমারকে লিখিত দুইখানি পত্র এখানে মুদ্রিত করিলাম। পত্রগুলি ইতিপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর

কল্যাণীয়েষু, তোমার গল্পের বই দুটি [২য় সংস্করণের 'নব-কথা' ও 'ষোড়শী'] এখানে আসিয়া পাইয়াছি। মনে ভাবিলাম সব গল্পই ত পূর্ব্বে পড়া হইয়াছে—ইহা আর পড়িব কি? অন্যান্য সাধারণ লোকের মত অপূর্ব্বের প্রতি আমার একটু বিশেষ টান আছে। সময়টা তখন সন্ধ্যা, হাতে কাজ ছিল না তাই নিতান্ত অলসভাবে বইয়ের পাত উল্টাইতে সুরু করিলাম—দেখিতে দেখিতে মনটা আটকা পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় বার যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হুহু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই। ছোট গল্প লেখায় পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে তুমি যেন সব্যসাচী অর্জ্জুন, তোমার গাণ্ডীব হইতে তীরগুলি ছোটে যেন সূর্য্যের রশ্মির মত—আর কেহ কেহ আছে যাহারা মধ্যম পাণ্ডবের মত গদা ছাড়া যাহাদের অস্ত্র নাই—সেটা বিষম ভারি—তাহা মাথার উপর আসিয়া পড়ে, বুকের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে না। যাহা হউক তোমার প্রথম সংস্করণের পাঠকের

দ্বিতীয় সংস্করণেও যে ভীড় করিয়া দাঁড়াইবে নিজের মধ্যে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।
ইতি ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩১৮। শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিধাম, [ইং ১৯১৩]

পরমকল্যাণাস্পদেষু, আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবে তোমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল আমার মনে পড়ে না—আমি জানকীর বাড়িতে (Mr. Ghosal) তোমাকে একদিন দেখিয়াছিলাম—তখন তোমার গোঁফের রেখা মাত্র ছিল। তোমার সেই সৌম্য মূর্তিই আমার মনে অঙ্কিত রহিয়াছে। তোমার সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় না থাকিলেও তুমি আমার নিকট সুপরিচিত। তোমার রচিত কোন গল্প মাসিক পত্রিকাদিতে বাহির হইলেই আমি আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকি। তোমার গল্প আমার খুবই ভাল লাগে। বড় বড় ফরাসী গল্প লেখকদের গল্প অপেক্ষা তোমার গল্প কোন অংশে হীন নহে। তোমার প্রতিভায় বঙ্গসাহিত্যের এক অংশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার 'গল্পাঞ্জলি' উপহার পাইয়া যারপরনাই প্রীত হইলাম। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ কর। শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাব্য ও অলঙ্কার

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর সাহিত্যমীমাংসক ধারাধিপতি ভোজদেব মানব-দেহের সহিত কাব্য বা শব্দাত্মক সাহিত্যের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—

"শব্দ এবং অর্থ কাব্যের শরীর, রস (ভাব) প্রভৃতি কাব্যের আত্মা, (ওজঃ, শ্লেষ প্রভৃতি) গুণ শৌর্য প্রভৃতির ন্যায়, (কাব্যের) দোষ-সমূহ (মানবদেহের) কাণত্বাদির ন্যায়, রীতিসমূহ অবয়বের সন্নিবেশের সহিত তুলনীয় এবং অলঙ্কারসমূহ কটক কুণ্ডল প্রভৃতির সদৃশ।"

'কাব্যমীমাংসা'-রচয়িতা মহাকবি রাজশেখরও সারস্বতের 'কাব্যপুরুষে'র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"(হে বৎস!) শব্দ এবং অর্থ তোমার শরীর। সংস্কৃত তোমার মুখ; প্রাকৃত-ভাষানির্মিত তোমার বাহুদ্বয়; তোমার জঘনদেশ অপভ্রংশভাষাময়; তোমার পদযুগল পৈশাচভাষা-বিনির্মিত। তুমি সমতা, প্রসাদ, মাধুর্য এবং ওজোগুণযুক্ত। তোমার বচন উক্তিনৈপুণ্যে ভূষিত। রস তোমার আত্মস্বরূপ, তোমার রোমরাজি ছন্দোময়; অনুপ্রাস এবং উপমা প্রভৃতি তোমাকে অলঙ্কৃত করিতেছে।"

শব্দ এবং অর্থ যে সাহিত্যের দৈহ শরীর তাহা পূর্ব প্রবন্ধে সূচিত হইয়াছে (১)। কিন্তু গুণ, রীতি, অলঙ্কার, রস ইহাদের স্বরূপ কি? শব্দ এবং অর্থ হইতে ইহাদের পৃথক্‌ভাবে বিশ্লেষণ কি করিয়া সম্ভবপর? সাহিত্যমীমাংসক-সম্প্রদায় কাব্যশরীর ও রক্তমাংসগঠিত পুরুষদেহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখাইবার জন্য যত্নবান হইয়াছেন বটে; কিন্তু এই সাদৃশ্যের কোনও বাস্তব ভিত্তি আছে কি? ইহা কি false analogy নহে? পুরুষের চেতনা, কৃতি, ইচ্ছা, প্রভৃতির দ্বারা তাহার আত্মাকে অনুমান করা সম্ভবপর; তাহার শৌর্য্য, দাক্ষিণ্য, দয়া প্রভৃতি গুণ সাধারণের অনুভবগোচর; কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি আভরণ যে তাহার শরীরকে ভূষিত করে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না; তাহারা যে পুরুষদেহের সহিত অভিন্ন নহে, তাহা প্রত্যক্ষগোচর। কিন্তু শব্দার্থময় সাহিত্যের ক্ষেত্রে কি আত্মা, গুণ, অলঙ্কার প্রভৃতির সেইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ প্রতীতি সম্ভব? কাব্যশরীরের উপাদান শব্দ ও অর্থ হইতে তাহার আত্মা, গুণ, রীতি, অলঙ্কার প্রভৃতির পৃথক্‌করণ (abstraction) কি কাব্যমীমাংসকগণের একটা নিছক্ কল্পনামাত্র নহে?

প্রথমতঃ অলঙ্কার বিষয়েই আলোচনা করা যাউক। সাধারণ পাঠক যখন কাব্যসম্বন্ধে কোনও ধারণা করিতে যায়, তখন অলঙ্কারের কথা স্বতই তাহার বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। দৈনন্দিন ব্যবহারজীবনের ভাষা ও সাহিত্য বা কাব্যের ভাষার মধ্যে প্রভেদ কোথায়?—সাধারণ পাঠককে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, অনেকেই বলিবে, অলঙ্কারে। আমাদের ব্যবহারজীবনের ভাষা 'আটপৌরে' নিরাভরণ; শব্দকে মার্জিত করিবার, তাহাকে বিশিষ্টভাবে বিন্যস্ত করিবার দিকে আমাদের লক্ষ্যই থাকে না। ব্যবহারজীবনে আমরা যখন মাননীয় ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ অবসরে, "মহাশয়! অনুগ্রহপূর্বক সভাস্থলে উপস্থিত হইলে বাধিত হইব" এই পর্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট সৌজন্য রক্ষিত হইল বলিয়া মনে করি, কবির লেখনী এই নিতান্ত সাধারণ আমন্ত্রণকেই কত বক্রভাবে, কত বৈদগ্ধ্যের সহিত পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়া তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়া থাকেন! "মহাশয়! আমাদের গৃহ অনুগ্রহপূর্বক অলঙ্কৃত করিবেন কি?" "মহাভাগের উদার আকৃতি দর্শনে আমাদের নেত্র সফল হইবে" ইত্যাদি। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের প্রথম অঙ্কে মহারাজ দুষ্যন্তের আকস্মিক আশ্রমপ্রবেশে বিস্মিতা অনসূয়া তাঁহার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানিবার জন্য কত বক্রোক্তিরই আশ্রয় লইয়াছে:—

"আর্যের মধুর বিশ্রম্ভালাপ আমাকে (এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বিষয়ে) মন্ত্রণা দিতেছে যে, আর্য কোন্ রাজর্ষিবংশ অলংকৃত করিয়া থাকেন? কোন্ জনপদের অধিবাসিগণ মহাভাগের প্রবাসজনিত বিরহে পর্য্যুৎসুকহৃদয় হইয়া রহিয়াছে? কি নিমিত্তই বা আর্য এই নিরতিশয় সুকুমার আত্মাকে তপোবনপরিভ্রমণ-জনিত ক্লেশের ভাজন করিয়াছেন?"

(১) দেশ: ১১ই ফাল্গুন ১৩৫২ ('সাহিত্যের সংজ্ঞা')।

আশ্রমকন্যা অনসূয়ার মুখে, "আর্য কোন্ দেশ হইতে আগমন করিতেছেন, কি জন্যই বা আর্যের এই তপোবনে আগমন?" দুষ্মন্তের প্রতি এইরূপ নিরাভরণ প্রশ্ন নিতান্তই প্রাকৃতজনোচিত হইত; কালিদাস তাহাকে বক্র করিয়াছেন, তাহাতে বৈদগ্ধ্যযোজনা করিয়াছেন, যাহার ফলে উহা সাহিত্যে স্থানলাভের যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই উক্তিকৌশল, এই "বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি", এই বক্রোক্তিই সাহিত্যিক সৌন্দর্যের নিদান। এবং সাহিত্যমীমাংসকসম্প্রদায় যে সকল উক্তিবৈচিত্র্য অলঙ্কার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সে সকলেরই মূলে আছে 'বক্রতা' বা 'বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতি'। এই বক্রোক্তিরই অপর নাম 'অলঙ্কার'। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অতিশয়োক্তি, সমাসোক্তি, অপ্রস্তুতপ্রশংসা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার এই বক্রোক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। বক্রোক্তিই তাহাদের প্রাণস্বরূপ। আচার্য কুন্তক তাঁহার 'বক্রোক্তি-জীবিত' গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"পদসমুদায়াত্মক বাক্যের সহস্র প্রকারে বক্রতা সম্পাদন করা যাইতে পারে এবং সেই 'বক্রতা'র মধ্যেই সকল অলঙ্কারবর্গ নিঃশেষে অন্তর্ভূত হইবে।"

যেমন, 'মুখটি অতিশয় সুন্দর', এই বাক্যটিকেই 'মুখটি চন্দ্রের মত সুন্দর', 'মুখটি যেন চন্দ্র', 'ইহা মুখ নহে, ইহা চন্দ্র', 'এই মুখটি চন্দ্র হইতেও অধিকতর সুন্দর', এইরূপে যথাক্রমে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অপহ্নুতি, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কারের আকারে শত শত কবিজনোচিত বিদগ্ধভঙ্গীতে প্রকাশ করা যাইতে পারে। উদ্দেশ্য একই—মুখের সৌন্দর্য বর্ণনা; বাক্যবিন্যাসেই কেবলমাত্র ভেদ। অতএব এই বিন্যাসভেদ বা বক্রতাই যে অলঙ্কারের 'জীবাতু' তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল, এবং এই বক্রোক্তিই 'লৌকিক' বাক্যসমূহকে কাব্যের পদবীতে উত্তীর্ণ করিয়া থাকে। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের 'কাব্য'লক্ষণ পর্যালোচনা করিলে সাহিত্যক্ষেত্রে অলঙ্কারের প্রাধান্য অতি সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হইবে। চিরন্তন আলঙ্কারিক আচার্য ভামহ তাঁহার 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে বলিয়াছেন, "সুন্দরীর মুখচ্ছবি যতই কমনীয় হউক না কেন, ভূষাহীন হইলে কখনই তাহা শোভা পায় না।" পরবর্তীকালে বামনাচার্য তাঁহার "কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি" গ্রন্থের উপক্রমেই ভামহের এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, "অলঙ্কার-বশতই কাব্য সহৃদয়গণের আস্বাদনীয় হইয়া উঠে।" সাধারণ লৌকিক বুদ্ধিতে কাব্যের সহিত অলঙ্কারের সম্বন্ধ এমনই অবিচ্ছেদ্য যে, পরবর্তী একজন আলঙ্কারিক মন্তব্য করিয়াছেন:

"যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অনলঙ্কৃত শব্দার্থ-যুগলকে কাব্যরূপে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না, তিনি কি জন্যই বা অনলকে অনুষ্ণ বলিয়া কল্পনা করেন না?"

অভিপ্রায় এই: বহ্নিকে অনুষ্ণ বলিয়া কল্পনা করা যেরূপ অসম্ভব, অলঙ্কার-বিহীন শব্দার্থের কাব্যত্বকল্পনা ততোধিক অসম্ভব। অধিক কি, সাহিত্যবিচারে অলঙ্কারের এই

অত্যধিক প্রাধান্যই 'সাহিত্য-মীমাংসা'-শাস্ত্রের 'অলঙ্কার-শাস্ত্র' ব্যপদেশের মূলে। সংস্কৃত সাহিত্যবিচারের যে কোনও গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রতিপাদ্য বিষয় শুধু অলঙ্কারই নয়, ধ্বনি, রস, রীতি, গুণ, দোষ প্রভৃতির বিশ্লেষণ এবং মীমাংসাও উহার উদ্দেশ্য। কিন্তু অলঙ্কারবিচার আর সকল বিচারকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এবং সেইজন্যই সাহিত্যমীমাংসা-বিষয়ক গ্রন্থসমূহ সাধারণ পাঠকসমাজে 'অলঙ্কার' গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি'।

মানবসভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসে কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার এককালে সৌন্দর্যের অপরিহার্য উপাদান ছিল। সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ে অনুপ্রাস, যমক, প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এবং উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অর্থালঙ্কারও যে কবিকর্মের অপরিহরণীয় সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কেন না, সাহিত্য অনেকাংশে সমসাময়িক লৌকিক সভ্যতার প্রতিচ্ছবি, তাহার মধ্য দিয়াই তাৎকালিক মানবের সৌন্দর্যবোধ ও রুচিজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে(২)। এখনও মানবসমাজ অলঙ্কারের মোহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। পূর্বে যাহা স্থূল ছিল, এখন তাহাই সূক্ষ্ম হইয়াছে; যাহা গুরু ছিল, তাহা লঘু হইয়াছে; যাহা 'কুণ্ডল' ছিল, তাহা 'কর্ণিকা' হইয়াছে। "তাঁরা সবাই অন্য নামে আছেন মর্ত্যলোকে"। কাব্যালঙ্কারের ক্ষেত্রেও সেই একই রীতি। নূতন নূতন অলঙ্কার উদ্ভাবিত হইতেছে, কত সূক্ষ্ম 'বক্রোক্তি', বাক্যযোজনায় কত নূতন বৈদগ্ধ্য! এ' সমস্তই কাব্যের সৌন্দর্যসাধনের জন্য। কেন না, সৌন্দর্যই অলঙ্কার!

অলঙ্কার যে সৌন্দর্যসাধনের একটি বিশিষ্ট উপাদান, তাহা কোনও সহৃদয়ই অস্বীকার করিবেন না। দোলায়িত শ্রবণকুণ্ডল যে কমনীয় রমণীমুখের সৌন্দর্য অধিকতর ঔজ্জ্বল্য-মণ্ডিত করে, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রেরই অনুভবসাক্ষিক। ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ সাহিত্যক্ষেত্রে উপমা প্রভৃতি কাব্যালঙ্কারসমূহের যে একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন,—ইহা তাঁহাদের রুচিবোধেরই পরিচায়ক। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহারা ভ্রান্ত ছিলেন। তাঁহারা অলঙ্কারকেই সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে অলঙ্কারকে বাদ দিয়া কবিকর্মের কোনও অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। তাঁহারা যদি উপমানভূত নারীদেহের সহিত কাব্যশরীরের পূর্ববর্ণিত সাধর্ম্য এই স্থলে লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবত এইরূপ প্রমাদে পড়িতেন না। কটক, কুণ্ডল প্রভৃতি অপসারিত করিলে ভূষণহীন নারীদেহের

(২) "লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্"-নাট্যশাস্ত্র ১।১১৩। 'নাট্য' বা 'দৃশ্যকাব্য' সম্বন্ধে এই উক্তি 'শ্রব্যকাব্য' সম্বন্ধেও অনুরূপ প্রযোজ্য।

কি কোনও সৌন্দর্যই অবশিষ্ট থাকে না? সাহিত্যে অলঙ্কারের আত্মভাব মানিয়া লইলে, তুল্যযুক্তিতে লৌকিক নারীসৌন্দর্যেরও এইরূপ অবস্থাই দাঁড়ায় বটে। কিন্তু কোনও সৌন্দর্যরসিক ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করিয়া লইবেন না। নারীদেহের লাবণ্য আছে— মুক্তাফলের অন্তর্গত তরল কান্তির ন্যায় যাহার প্রভা। অলংকারের অপসারণের দ্বারা সেই প্রভাতরল জ্যোতিকে অপসারিত করা যায় না। তাহাই নারীসৌন্দর্যের নিদান, তাহাই সৌন্দর্যের আত্মা। কাব্যের স্থলেও অলঙ্কারচ্যুতি কাব্যসৌন্দর্যের ব্যাঘাত করিতে পারে না। উপমা, রূপক প্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কার শব্দার্থরূপী কাব্যশরীর হইতে সরাইয়া লইলেও প্রকৃত সাহিত্যিক কবিকর্মের সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করা যায় না। এবং সমস্ত অলঙ্কার বিযুক্ত করিয়া লইলেও ভূষণহীন কাব্যশরীরের যে কান্তি আপন মহিমায় দীপ্তি পাইতে থাকে, যাহা কাব্যদেহের লাবণ্যস্বরূপ, তাহাই কাব্যবস্তুর আত্মা বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। আনন্দবর্ধনাচার্য প্রমুখ ধ্বনিবাদিগণ কাব্যের এই অন্তর্নিহিত লাবণ্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই প্রাচীন ভামহ প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণের অলঙ্কারের মোহ তাঁহাদের তত্ত্বদৃষ্টিকে আবৃত করিতে পারে নাই। এই লাবণ্যের অপর সংজ্ঞা 'ধ্বনি',—'বস্তুধ্বনি', 'অলঙ্কারধ্বনি' 'রসধ্বনি'। ইহাদের মধ্যে রসধ্বনিই শ্রেষ্ঠ কাব্যতত্ত্ব,—তাহা হইতেই কাব্যের উৎপত্তি, তাহাতেই স্থিতি এবং তাহাতেই পর্যবসান। সেইজন্য রসধ্বনিই তাঁহাদের মতে কাব্যের আত্মা। সেই আত্মার সন্ধান যিনি পাইয়াছেন, তিনি কি কখনও অলঙ্কারের মোহে মুগ্ধ হইতে পারেন?

এখানে অনেকেই প্রশ্ন করিবেন: 'ধ্বনিবাদিগণ কি তবে সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারগুলিকে নির্বাসিত করিলেন? প্রকৃত কবিকর্ম কি তবে একেবারেই নিরলংকার? ধ্বনিবাদের প্রবর্তক আনন্দবর্ধনাচার্য সাহিত্যিক অলঙ্কার-সমূহের উপযোগিতা ও অস্তিত্ব আদৌ অস্বীকার করেন নাই। প্রাচীন সাহিত্য-মীমাংসক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার বিরোধ শুধু তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ লইয়া। ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণ লৌকিক অলঙ্কারের সমস্ত ধর্ম নিঃশেষে সাহিত্যিক অলঙ্কারের স্কন্ধে চাপাইয়াছিলেন। কাব্যালঙ্কারসমূহ যে নারীদেহের প্রসাধনের সামগ্রী কটক কুণ্ডল প্রভৃতি লৌকিক অলঙ্কার হইতে কোনও অংশে পৃথক্ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার কোনও আভাস তাঁহাদের গ্রন্থে নাই। তাঁহারা মনে করিতেন, শ্রবণ হইতে কুণ্ডল অপসারিত করিয়া যেমন তাহার পরিবর্তে কর্ণিকাসংযোগ করা যাইতে পারে, সেইরূপ কাব্যেও অনুপ্রাস, উপমা, রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি শব্দার্থালঙ্কারসমূহ কবি তাঁহার ইচ্ছানুসারে গ্রহণ ও বর্জন করিতে পারেন। এই হানোপাদানবশত কাব্যসৌন্দর্যের এমন কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটিতে পারে, এইরূপ ধারণা তাঁহাদের ছিল না। আনন্দবর্ধন কর্তৃক ধ্বনিবাদের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইয়া গেল। আনন্দবর্ধন

দেখাইলেন যে, পূর্বাচার্যকল্পিত অলঙ্কারের এই যথেচ্ছ-সংযোগ-বিয়োগ সাহিত্যক্ষেত্রে কেন, লৌকিক প্রসাধনের ক্ষেত্রেও অসম্ভব। সাহিত্যের যাহা মূলীভূত তত্ত্ব, অর্থাৎ রসধ্বনি, অলঙ্কার তাহারই অনুযায়ী হইবে। আত্মার ঔচিত্য অনুযায়ী অলঙ্কারের যোজনা করিতে হইবে। অলঙ্কারের কোনও পৃথক্ সৌন্দর্য নাই। উপমা, যে উপমা বলিয়াই সর্বত্র সুন্দর হইবে, এমন কোনও নির্দিষ্ট বিধি নাই। অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি আপাতদৃষ্টিতে যতই শ্রুতিসুখকর হউক না কেন, সর্বত্রই তাহাদের এই মাধুর্য অখণ্ডিত থাকিবে, এইরূপ আশা করা যায় না। অভিনবগুপ্ত এই স্থলে একটি উদাহরণের দ্বারা ধ্বনিবাদিগণের এই মতবাদ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন: "শবশরীরে অলঙ্কারযোজনার দ্বারা কিছুমাত্র সৌন্দর্যসাধন করা যায় না, কেন না, সেখানে আত্মার অস্তিত্ব নাই। যতিশরীর অলঙ্কার-মণ্ডিত হইলে দর্শকের হাস্যাবহ হইয়া উঠে, যেহেতু সেখানে আত্মার ঔচিত্য নাই।" অতএব কাব্যের আত্মস্বরূপ রসতত্ত্বের সদ্ভাব ও ঔচিত্য এই উভয়ের দ্বারা সাহিত্যে অলঙ্কার-যোজনা নিয়ন্ত্রিত হইবে। তবেই অলঙ্কার সৌন্দর্যের কারণরূপে বিবেচিত হইবে। নতুবা রসৌচিত্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যে কবি অলঙ্কার-বিন্যাস করিবেন, তিনি সাহিত্যিক সৌন্দর্যের মূল তত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে পুষ্পাভরণ-মণ্ডিতা শকুন্তলার যে মূর্তি মহারাজ দুষ্যন্তের দৃষ্টি বিমোহিত করিয়াছিল, সপ্তম অঙ্কে মহাকবি সেই শকুন্তলাকেই আবার নিরাভরণ মূর্তিতে দুষ্যন্তের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। প্রথম ক্ষেত্রে আভরণ-বিন্যাস সম্ভোগের উপকরণ ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নিরাভরণ পাণ্ডুতাই বিপ্রলম্ভ ব্যথাকে মূর্তিমতী করিয়া তুলিয়াছে। সমাহিত মহাদেবের তপোভঙ্গের জন্য প্রণয়মুগ্ধা পার্বতীর কত প্রসাধন, কত বিচিত্র আভরণ-বিন্যাস! কিন্তু উপেক্ষিতা, অবমানিতা পার্বতী যখন তপস্যায় প্রবৃত্ত, তখন তাঁহার অঙ্গ আভরণহীন, 'বাধ্যকশোভি বল্কল' তাঁহার ভূষা! ধ্বনিবাদিগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা সৌন্দর্যের এই নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, এবং কবিও সহৃদয়সমাজে ইহার প্রচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। অলঙ্কারসমূহ—সাহিত্যিকই হউক, অথবা লৌকিক হউক, যে সৌন্দর্যের উপাদান বলিয়া গৃহীত হয়, সে তাহাদের স্বতন্ত্র সৌন্দর্যের জন্য নহে, প্রকৃত রসের উৎকর্ষ সাধনের তাহারা উপায় বলিয়া। রসই উপেয়, অলঙ্কার তাহার উপায় মাত্র। যদি অলঙ্কারের অপসারণের দ্বারা রসবোধের গভীরতা বৃদ্ধি পায়, তবে তাহাই কর্তব্য। নিরলঙ্কার স্বভাবোক্তিই সেখানে অলঙ্কৃত বক্রোক্তির সমস্থানীয়।

ধ্বনিবাদের প্রচারের ফলে অলঙ্কার সম্বন্ধে প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীর অন্যান্য আরও পরিবর্তন সংঘটিত হইল। প্রাচীন মতবাদের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, কাব্যদেহের সহিত অলঙ্কারের সম্বন্ধ অনেকটা নারীদেহের সহিত

কটককুণ্ডলাদির সম্বন্ধের মতই। ইচ্ছানুযায়ী তাহার সংযোজন ও বিশ্লেষণ সম্ভবপর। কবি যেন পূর্বে মনে মনে অনলঙ্কৃত শুদ্ধ শব্দার্থযুগল কল্পনা করিয়া পরে ভাবিয়া চিন্তিয়া যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার ও উপমা, রূপক প্রভৃতি অর্থালঙ্কারসমূহ তাঁহার রুচি অনুসারে কাব্যদেহে বিন্যস্ত করেন। সুতরাং অলঙ্কারযোজনার অব্যবহিত পূর্বে অনলঙ্কৃত কাব্যশরীরের অস্তিত্ব তাঁহাদের মতে মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু অলঙ্কারযোজনার ইহাই কি অনুভবসিদ্ধ পদ্ধতি? উত্তম কাব্যের যে সকল অলঙ্কার, তাহারা কি নারীদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কতকগুলি শিথিলবিন্যস্ত জড়-পদার্থমাত্র? যে আবেগবশে কবি তাঁহার অন্তর্নিরুদ্ধ রসধারা শব্দার্থযুগলের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই একই আবেশের দ্বারা কি অলঙ্কারসমূহও জন্মলাভ করে না? তাহাদের জন্য কি কোনও পৃথক প্রযত্নের বা অভিনিবেশের আবশ্যকতা উত্তমকবি উপলব্ধি করিয়া থাকেন? বিচার করিয়া দেখিলে প্রাচীন আচার্যগণের মতবাদের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে। 'কাব্যের অলঙ্কার' এইরূপ উক্তির দ্বারা 'কাব্য' ও 'অলঙ্কারে'র মধ্যে যে ভেদ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহার মূলে কোনও অভ্রান্ত যুক্তি নাই, এবং তাহা সহৃদয়ের অনুভববিরুদ্ধ। উত্তমকাব্যে শব্দ ও অর্থের সহিত অলঙ্কারের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রসাবিষ্ট কবিচিত্ত স্বগত ভাবের প্রকাশের দিকেই উন্মুখীভূত হইয়া থাকে, শব্দ এবং অর্থ স্বতই উৎসারিত হইয়া আসে—বিচিত্র-বক্রোক্তির আকারে, বিবিধ অলঙ্কারের রূপ ধরিয়া। অতএব উত্তমকাব্যের যে সকল 'বক্রোক্তি' বা 'অলঙ্কার', তাহা শব্দার্থের কোনও বাহ্য বা আগন্তুক ধর্ম নহে। উহা শব্দার্থেরই অন্তরঙ্গ বিলাস। এইরূপে, যে সকল অলঙ্কার 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য' তাহারাই উত্তমকাব্যের প্রকৃত শোভার হেতু, তাহারাই প্রকৃত 'অলঙ্কার'। যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার কাব্যদেহের সহিত এইরূপ অন্তরঙ্গভাবে সম্বদ্ধ নহে। তাহাদের উদ্ভাবনের জন্য কবির স্বতন্ত্র অভিনিবেশ আবশ্যক। রসাবিষ্ট কবিচিত্ত হইতে উহারা স্বতঃ উৎসারিত হইয়া উঠে না। তাহারা 'পৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য'। এইজন্য ধ্বনিবাদের প্রবর্তক আচার্য আনন্দবর্ধন পুনঃ পুনঃ 'ধ্বনিকাব্যে' বা 'উত্তমকাব্যে' অনুপ্রাস প্রভৃতি বর্জন করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। প্রকৃত বক্রোক্তি বা অলঙ্কার কবির চিন্তাধারারই অন্তরঙ্গ রূপ মাত্র। কিন্তু যে সকল অলঙ্কার উদ্ভাবনের জন্য কবিচিত্তের পৃথক অভিনিবেশ প্রয়োজন, তাহাদের সহিত কবির চিন্তাধারার কোনও আন্তর সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সেইজন্য, আনন্দবর্ধনাচার্য উহাদিগকে বহিরঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ অলঙ্কার্য ও অলঙ্কারের মধ্যে অন্তরঙ্গতার তারতম্য লক্ষ্য করিয়া লৌকিক অলঙ্কারসমূহের ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ করিয়া গিয়াছেন। ধারাধিপতি ভোজদেব তাঁহার 'শৃঙ্গারপ্রকাশ' শীর্ষক আলঙ্কারিক নিবন্ধে বলিয়াছেন: "অলঙ্কারসমূহ ত্রিবিধ, বহিরঙ্গ, অন্তরঙ্গ ও মিশ্র। বহিরঙ্গের উদাহরণ যেমন,

বস্ত্র, মাল্য, (কটক, কেয়ূর প্রভৃতি) বিভূষণ। অন্তরঙ্গ যেমন, দন্তপরিকর্ম, নখচ্ছেদ এবং কেশবিন্যাস প্রভৃতি। মিশ্র যেমন, স্নান, ধূপ এবং (চন্দন, কুঙ্কুম প্রভৃতি) বিলেপন।"

সৌন্দর্যসম্বন্ধে যাঁহার সূক্ষ্মবোধ আছে, তিনিই উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগের যৌক্তিকতা স্বীকার করিবেন। বস্ত্রমাল্য-কুণ্ডল অপেক্ষা স্নান, ধূপবাস, কুঙ্কুমবিরচিত পত্রলেখা অধিকতর রমণীয়, তদপেক্ষা রমণীয় নখচ্ছেদ এবং অলকরচনা। ইহারা প্রত্যেকেই যে নারীদেহের প্রসাধনের উপাদান, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এই রমণীয়তার তারতম্য কিসের জন্য? সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে, অন্তরঙ্গতার তারতম্যই কি ইহার একমাত্র কারণ নহে? অলঙ্কার্য নারীদেহের সহিত যে অলঙ্কারের যত ঘনিষ্ঠ, যত অন্তরঙ্গ, যত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহার সৌন্দর্যই তত অধিক। বস্ত্রমাল্যবিভূষণ যত সহজে শরীর হইতে অপসারণ করা যাইতে পারে, সুরভিচন্দনের সুগন্ধ কিংবা কপোলবিন্যস্ত কুঙ্কুমরচিত পত্রলেখা, শুভ্রচন্দনের ললাটিকা মুছিয়া ফেলা তত সহজ নহে। সেইজন্য বিদগ্ধ রমণীগণের প্রসাধনের সামগ্রী কালাগুরুপত্রলেখা, অলকরচনা। কটককুণ্ডলের স্থূল প্রাকৃতহৃদয়হারী ঔজ্জ্বল্য তাঁহাদের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধকে পীড়া দেয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই একই তত্ত্ব। কাব্যালঙ্কারসমূহকেও ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যিনি সুকবি তিনি বিদগ্ধ নারীর ন্যায় অলঙ্কার নির্বাচনের সময় (যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি বুদ্ধিপূর্বক নির্বাচন করেন না) যমক-অনুপ্রাস প্রভৃতি একান্ত বাহ্য অলঙ্কারসমূহ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়া চলেন। কাব্যদেহের সহিত তাহাদের সম্পর্ক অতিশয় শিথিল, নারীদেহের সহিত বস্ত্রমাল্যবিভূষণের ন্যায়। তাঁহারা যে সকল অলঙ্কার রচনা করেন, তাহা কাব্যশরীরের সহিত দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট—ললাটিকার ন্যায়, পত্রবিশেষকের ন্যায়। প্রথমত অলঙ্কার বলিয়া তাহাদের চিনিতেই পারা যায় না, শব্দ ও অর্থের সহিত তাহারা যেন একাত্মতা প্রাপ্ত হইয়া যায়। মহাকবিগণের অলঙ্কার রচনায় ইহাই বৈশিষ্ট্য।

দেখা গেল, মহাকবিগণের লেখনীতে কাব্যদেহ হইতে শব্দার্থালঙ্কাররাজিকে পৃথক করিয়া বিশ্লেষণ করা দুষ্কর। শব্দার্থরূপী কাব্যদেহের সহিত তাহারা সম্পূর্ণরূপে একতা প্রাপ্ত হয়। প্রশ্ন হইতে পারে: প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ যে অলঙ্কারসমূহকে কাব্যের আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতবাদের কি তবে কিছুমাত্র ভিত্তিই নাই? অলঙ্কার কি কখনই কাব্যের আত্মপদবীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না? কাব্যদেহের সহিত সাযুজ্য লাভই কি তবে তাহাদের বিবর্তনের চরম নিষ্ঠা? তাহারা কি কাব্যের গভীর অন্তঃপুরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে একেবারেই অসমর্থ? ইহার উত্তর দিয়াছেন আনন্দবর্ধনাচার্য ও অভিনবগুপ্ত। অভিনবগুপ্ত তাঁহার 'লোচন' ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন: "প্রাচীন আচার্যগণের অলঙ্কার বিচার শুধু বাচ্য অলঙ্কারসমূহকে কেন্দ্র করিয়া। যে সকল অলঙ্কার অতি স্ফুটভাবে, স্পষ্ট কথায় কবি তাঁহার কাব্যে প্রকাশ করিয়া

থাকেন, ভামহ প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য সেই সকল অলঙ্কারেরই মুখ্যত্ব বিচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ওই সকল বাচ্য অলঙ্কারই কাব্যের আত্মা। কিন্তু আমরা দেখিলাম, অলঙ্কার, যাহা স্পষ্টভাবে কবির লেখনীতে প্রকাশিত হয়, তাহারা কখনই কাব্যের আত্মতত্ত্বের সহিত ঐক্য লাভ করিতে পারে না। দেহৈক্যপ্রাপ্তিই বাচ্য অলঙ্কার-সমূহের বিবর্তনের চরম নিষ্ঠা। তাহার জন্যও আবার অনন্যসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। মহাকবি প্রসাধননিপুণা বিদগ্ধ পুরন্ধ্রীর ন্যায় অলঙ্কারবিন্যাসে যতই কৌশলের পরিচয় দিন না কেন, তাঁহার লেখনী বাচ্য অলঙ্কারবর্গকে কখনই কাব্যশরীরের মর্যাদা উত্তীর্ণ করাইয়া অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিতে পারে না। কিন্তু সেই অলঙ্কার যখন ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা ব্যাপারের দ্বারা বোধিত হয়, যখন সাক্ষাৎভাবে বাচ্য না হইয়া কাব্যের অনুকরণের ('আণ্ডারটোন') দ্বারা প্রতীত হয়, তখন তাহাই অনায়াসে কাব্যের আত্মার সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। ব্যঞ্জনা ব্যাপারের এমনই অলৌকিক মহিমা। স্পর্শমণির মত তাহা শরীরকে আত্মায় পরিণত করিয়া দিতে পারে, বহিরঙ্গকে অন্তরঙ্গতম করিয়া তুলিতে পারে, যাহা ছিল তুচ্ছ অলঙ্কার তাহাই ব্যঞ্জনার অনির্বচনীয় স্পর্শ লাভ করিয়া অলঙ্কার্য হইয়া উঠে।" সুতরাং প্রাচীন আচার্য ও ধ্বনিসম্প্রদায়ের নব্য সাহিত্য-মীমাংসকগণের ভেদ শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্যে। অলঙ্কারের আত্মভাব ধ্বনিবাদিরাও মানিয়া লইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নন, কিন্তু তাহা ব্যঞ্জনা ব্যাপারের দ্বারা বোধিত হইতে হইবে। 'বাচ্য' অলঙ্কারের সে ঐশ্বর্য নাই। কিন্তু, যদিও ধ্বনিসম্প্রদায়ের নবীন আচার্যগণ বিশেষ ক্ষেত্রে অলঙ্কারেরও আত্মভাব মানিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের মতে রসই কাব্যের মুখ্য আত্মা, কেন না কাব্যের সমস্ত উপাদানের রসেই পর্যবসান। রসই কাব্যের অন্তরতম তত্ত্ব। ভরতাচার্য তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে রসকে বীজের সহিত তুলনা করিয়াছেন (১)। যেমন ক্ষুদ্র বীজ অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হয়, ক্রমে যেমন তাহা মনোহর পুষ্পপল্লবে বিভূষিত হইয়া উঠে, এবং তাহার চরম পরিণতি যেমন বিচিত্র ফলসম্ভারে, সেইরূপ কবির অন্তর্গূঢ় রসবীজ আপন প্রাণশক্তির উল্লাসবশে শব্দ, অর্থ, অলঙ্কাররূপে আপনাকে অঙ্কুরিত, কুসুমিত, মঞ্জরিত করিয়া তুলে, সর্বশেষে পরিণত হয় সহৃদয়ের রসচর্বণায়। এই রসাস্বাদই কাব্যবৃক্ষের অমৃতময় ফল। সুতরাং রসবীজ হইতে কাব্যের উৎপত্তি, রসাস্বাদেই ইহার পরিসমাপ্তি। বৃহৎ শাখাপল্লববিশোভিত বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র অখণ্ড বীজেরই প্রাণশক্তির বিবর্তন মাত্র, সেইরূপ শব্দ অর্থ অলঙ্কার —কাব্যের যতকিছু উপাদান সমস্তই কবিচিত্তের নির্বিভাগ, অখণ্ড রসানুভূতির বিবর্তন মাত্র, কবির আন্তর পরিস্পন্দেরই বাহ্য আকার মাত্র। কবির কাব্যসৃষ্টির ইতিহাস শুধু তাঁহার নিবিড় রসানুভূতিরই আবেগময় বিবর্তনের ইতিহাস। শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

(১) "যথা বীজাদ্ ভবেদ্ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা।
তথা মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ॥"—নাট্যশাস্ত্র : ষষ্ঠ অধ্যায়।

মানুষের প্রকৃতি ও শাস্তি

মানুষ সমাজে বাস করে। একা থাকা তার পক্ষে কষ্টকর তো বটেই, একেবারে অসম্ভব বললেও ভুল হয় না। একটা কথা আছে যে, যে একা থাকে সে হয় খুব উঁচু ধরনের সাধু পুরুষ, না হয় তার প্রকৃতি একেবারে জন্তু-জানোয়ারের মত—He is either a saint or a beast. সাধারণ মানুষ সকলের সঙ্গে মিলে-মিশেই থাকতে চায়। কিন্তু সুখে স্বচ্ছন্দে সমাজে বাস করতে গেলে প্রত্যেক লোককেই কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হয়, অনেক ইচ্ছা দমন করতে হয়, আবার সময় সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক কাজ করতে হয়। কোন্ প্রবৃত্তি দমন করতে হবে, কোন্ ইচ্ছা ত্যাগ করতে হবে, এসব সম্বন্ধে কতকগুলি ধারণা আদিমকাল থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমশ আস্তে আস্তে গ'ড়ে উঠেছে। এই ধারণাগুলো সব সমাজেই যে একই রকম তা অবশ্য নয়। বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন সমাজের ক্রমপরিণতি হয়েছে ব'লে, সামাজিক রীতিনীতির যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ভিন্ন ভিন্ন সমাজে দেখা যায়। ঐতিহ্য (traditions), প্রচলিত রীতি-নীতি, বিধিনিষেধ প্রভৃতির ভেতর দিয়েই মূলগত ধারণাগুলি প্রকাশ পায়, তাই এই সবের দ্বারা সামাজিক আচারব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণত লোকেরা তাদের নিজেদের সমাজের বিধিনিষেধগুলি মেনে নেয় এবং যে প্রথাগুলি তাদের সমাজে প্রচলিত, সেই অনুসারে চলাই কর্তব্য ব'লে তারা মনে করে। যারা মানে না, সমাজ তাদের অপরাধী ব'লে বিবেচনা করে এবং তাদের নানারকম শাস্তির ব্যবস্থা করে।

এ পর্যন্ত যা বললুম, তা সবই বাস্তব ঘটনা এবং আপনাদের অজানা কিছুই নয়। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, এই মেনে নেওয়া এবং এই শাস্তির ব্যবস্থার মধ্যে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক সমস্যা আছে। লোকে মেনে নেয় কেন? আপনি আপনার সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে যেতে ইতস্তত করেন কেন? কে আপনাকে মেনে নিতে বাধ্য করে? কবে আপনি এই গতানুগতিক পন্থায় চলতে আরম্ভ করেছেন? সব নিয়মকানুনগুলি কি আপনি বুদ্ধির সাহায্যে বিচার ক'রে দেখে তারপর মানতে আরম্ভ করেছেন? যারা মানে তাদের সম্বন্ধে যেমন এইসব প্রশ্ন তোলা যায়, তেমনই যারা মানে না তাদের সম্বন্ধেও অনেক জানবার কথা আছে। কেন তারা মানে না? চুরি ডাকাতি প্রভৃতি সমাজের ক্ষতিকর এবং নিন্দার্হ কাজ কোন কোন লোক করে কেন? ব্যভিচার, খুন, জখম প্রভৃতি অনেক রকমের অপকর্ম সব সমাজেই কিছু কিছু হয়। যারা এই সব কাজে লিপ্ত থাকে, সমাজ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। পুলিস, বিচারালয়, হাজত, কারাগার, ফাঁসিকাঠ, এই শাস্তি-ব্যবস্থারই নিদর্শন। সমস্যা কিন্তু এখানেও আছে। এই শাস্তি-ব্যবস্থার ভিত্তি কি? A tooth for a tooth? তুমি যদি আমার ক্ষতি কর, আমিও তোমার ক্ষতি করব—এই মনোভাব থেকেই কি

শাস্তির উৎপত্তি? তারপর, শাস্তি দেওয়ার ফল কি হয়? শাস্তি ভোগ ক'রে অপরাধীর চরিত্র কতখানি সংশোধিত হয়, আর শাস্তি দিয়ে সমাজ কতখানি উপকৃত হয়? যে উদ্দেশ্যে শাস্তি দেওয়া হয়, প্রচলিত শাস্তি-ব্যবস্থায় সে উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়? এখন এই সব সম্বন্ধে, বিশেষ ক'রে শাস্তি সম্বন্ধে, একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

কেউ কেউ বলেন, প্রতিহিংসা মানুষের একটা সহজাত বৃত্তি, instinct, এবং এই বৃত্তি থেকেই শাস্তির উৎপত্তি। কিন্তু প্রতিহিংসা সহজাত বৃত্তি ব'লে ধ'রে নেবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। শাস্তি দেওয়ায় প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির ইঙ্গিত হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু প্রতিহিংসাই যে সব শাস্তির উৎপত্তির কারণ, তা বলা যায় না। পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়, কেউ গোষ্ঠীর ক্ষতিকর কোন কাজ করলে গোষ্ঠীর ভেতর সে যাতে আর কোনকালে উপস্থিত হতে না পারে, তার একটা ব্যবস্থা করা হত। তা তাকে গোষ্ঠী থেকে নির্বাসন ক'রেই হোক বা একেবারে হত্যা ক'রেই হোক। গোষ্ঠী থেকে সরিয়ে দেবার মূলে দু-তিন রকমের মনোভাব মিশ্রিত থাকত। অপরাধীকে শত্রু ব'লে বিবেচনা করা হ'ত। নিধনই শত্রুর একমাত্র ব্যবস্থা। অপরাধীকে আবার অশুচি ব'লে অন্য লোকেরা মনে করত। গোষ্ঠীর মধ্যে থাকলে তার সংস্পর্শে অন্য সকলেও অশুচি হয়ে যাবে, গোষ্ঠীকে শুচি রাখবার জন্যে তাই অপরাধীকে গোষ্ঠীচ্যুত করা দরকার। অপরাধীকে বলি দিলে দেবতারা সন্তুষ্ট হবেন—এ ভাবটাও কিছু কিছু থাকত। সুতরাং প্রতিহিংসাপরবশ হয়েই যে তাকে হত্যা বা বিতাড়িত করা হ'ত, তা বলা যায় না।

অপরাধ ঠিক কাকে বলে, তা নির্ণয় করবার চেষ্টা সব দেশেই হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে মতামতও অনেক আছে। অপরাধের একটি লক্ষণ সম্বন্ধে সকলেই একমত। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধ কাজই অপরাধ, এবং যে সেইরকম কাজ করে সে অপরাধী। এটা অবশ্য খুব ব্যাপক অর্থ। ইংরেজীতে যাদের criminals বলি, তারা একশ্রেণীর অপরাধী, কিন্তু অপরাধী মাত্রেই criminal নয়। যে পুত্র বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ-পোষণ প্রভৃতির কোন ব্যবস্থা করে না, সমাজের চক্ষে সে অপরাধী বটে, কিন্তু criminal সে নয়। সব দেশের রীতিনীতি, বিধিনিষেধ এক রকম নয় ব'লে এক কাজ সব দেশেই অপরাধ ব'লে বিবেচিত হয় না, যেমন আত্মহত্যা ইংলণ্ডে অপরাধ, জাপানে কিন্তু নয়।

এই অর্থে অপরাধ কথাটি ব্যবহার করলে বলা যায় যে, অপরাধপ্রবণতা মানুষের সহজাত বৃত্তি। শিশুমাত্রই কতকগুলি বৃত্তি নিয়ে জন্মায়—কতকগুলি ভাল, কতকগুলি মন্দ। অর্থাৎ সমাজ কতকগুলিকে বাড়তে দিতে চায় আর কতকগুলিকে নষ্ট করতে চায়। প্রত্যেক নবজাত শিশুই একটি 'angel' দেবশিশুবিশেষ—রুসোর এ ধারণাটাও যেমন ভুল, প্রত্যেক মানুষই is an wolf to another man—হব্‌সের এ কল্পনারও তেমনই কোন ভিত্তি নেই। স্বার্থপরতা সহজাত। অনেক সামাজিক

অপরাধের ভিত্তি এই স্বার্থপরতা, সুতরাং বলা যায়, অপরাধপ্রবণতা সহজাত। যে সমস্ত বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হ'লে ভবিষ্যতে সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা অনিবার্য, সেইগুলি দমন করবার চেষ্টা করা শিশুদের শিক্ষার একটি গোড়ার কথা। একটি শিশু যখন আর একটি শিশুর কাছ থেকে জোর ক'রে খেলনা কেড়ে নেয়, তখন সে অপরাধ করে না, কারণ ন্যায়-অন্যায় বোধ তখনও তার হয় নি। এই ন্যায়-অন্যায় বোধ moral sense, যতক্ষণ না তার জন্মায়, ততক্ষণ তার কাজ অপরাধ ব'লে বিবেচনা করা যেতে পারে না। প্রথমে বাবা-মার নিষেধের জন্যে অনেক স্বার্থপরতা নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির পরিচায়ক কাজ থেকে সে বিরত হয়। ক্রমে সে নিজের অহম্ Ego-র এক অংশকে এই নিজেকে নিষেধ করবার ভার দেয়। যে অংশ এই ভার নেয়, তাকে বলে অধিশাস্তা Super Ego. এই অবস্থা যখন আসে, তখন আর বাইরের কারও নিষেধ করবার প্রয়োজন হয় না। এই অধিশাস্তাই হয় তখন তার নীতিজ্ঞান, বিবেক, ধর্মজ্ঞান প্রভৃতির ভিত্তি। সুতরাং অধিশাস্তার গঠন ও স্বরূপের ওপর তার ভবিষ্যৎ চরিত্রের গুণাগুণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। উপযুক্তভাবে লালনপালন না করার দোষে অনেক সময় শিশুর অধিশাস্তার গঠন দুর্বল হয়, সে ক্ষেত্রে শিশুর ভবিষ্যতে অপরাধী (criminal) হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। পিতামাতার সতর্ক দৃষ্টি, উপযুক্ত শিক্ষা, সুস্থ সবল অধিশাস্তা গঠনের একমাত্র উপায়।

শিশুকে সাজা দেওয়ার কোন কথা হতে পারে না, তবে তাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কোন অন্যায় অপকর্ম থেকে শিশুকে বিরত করতে হ'লে এমন কোন ব্যবস্থা করা দরকার যাতে অপকর্মের ফলে তাকে একটু যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যন্ত্রণার কথা মনে হ'লে সে ভবিষ্যতে সে কাজ থেকে বিরত হতে পারে, কারণ যন্ত্রণা ভোগ করতে কেউই চায় না, শিশু তো নয়ই। কিন্তু এখানে খুব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যন্ত্রণা কি ধরনের হবে এবং তার পরিমাণ কতখানি হবে, সে বিষয়ে অভিভাবকদের বিশেষ বিবেচনা করা উচিত। খুব রেগে গিয়ে বেদম প্রহার করলে কোন ফলই হয় না। এই উপায়, যাকে ইংরেজীতে conditioning বলে, অল্পবয়স্ক শিশুদের বেলায় কার্যকরী হয় বটে, কিন্তু একটু বয়স হ'লে, একটু বিবেচনা করতে শিখলে তখন আর এ উপায়ে কোন কাজ হয় না। কারণ বালক তখন অপকর্ম করার ফলে যে যাতনা, সেটা কি ক'রে এড়িয়ে যাওয়া যায় তারও একটা উপায় উদ্ভাবন ক'রে নেয়।

সমাজ যে শাস্তির ব্যবস্থা করে, তার মূলে কোন একটি মনোবৃত্তি আছে—এ ধ'রে নেওয়া ভুল। কোন কোন জায়গায় যেমন পোলাণ্ডে এ শাস্তির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকে বজায় রাখা, অপরাধীকে সরিয়ে দিয়ে। এখানে অপরাধী আসল ব্যাপার নয়, আসল ব্যাপার সমাজ। আবার এও অনেকে বলেন, শাস্তির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরাধীর চরিত্র সংশোধন করা, অথবা তাকে পুনরায় ওই কাজ করবার সুযোগ না

দেওয়া, অথবা প্রতিশোধ নেওয়া কিংবা অন্য লোককে ভয় দেখিয়ে ওই রকম কাজ থেকে বিরত করা, ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে শাস্তি-ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছে, তার ভিত্তিতে এই রকম একাধিক বৃত্তি আছে ব'লেই মনে হয়।

আধুনিক মনোবিদ্যা সমস্ত অপরাধতত্ত্বের ভেতর একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এনে দিয়েছে। পুরানো পথে চ'লে কেন ফল হচ্ছে না, তা যেমন এক দিকে দিয়েছে, অন্য দিকে তেমনই কি ভাবে অগ্রসর হ'লে ফল হতে পারে তার ইঙ্গিতও দিয়েছে। প্রথমেই বলি, যাকে অপরাধী ব'লে ধ'রে এনে শাস্তি দেওয়া হয়, তার মানসিক অবস্থা কি রকম, বাস্তবিক সে তার কাজের জন্যে দায়ী কি না, সেটা যে বিবেচনা করা উচিত মনোবিদ্যা এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। উদ্দাম উন্মাদ অবস্থা ছাড়াও অনেক মানসিক রোগ এমন আছে, যাতে রোগী তার কাজকর্মের ওপর সমস্ত শাসন হারিয়ে ফেলে। একজন লোক বাড়ি থেকে বেরুতে হ'লেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক থেকে একশো অবধি একবার গুণে নেয়। একজন রাস্তায় প্রত্যেক ল্যাম্প-পোষ্টেতে একটি × চিহ্ন দিয়ে যায়। যত চেষ্টাই করুক, কিছুতেই তারা নিজেদের দমন করতে পারে না। একটু বেশি মাত্রায় এগুলে এই ধরনের রোগীরা অনেক কাজ ক'রে বসতে পারে, যা সমাজের নীতিবিরুদ্ধ। শাস্তি দেবার আগে তাদের মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। সৌভাগ্যের কথা এই যে, আজকাল বিচারকগণও এই কথাটার যাথার্থ্য উপলব্ধি করেন এবং সন্দেহের কোন কারণ থাকলেই তথাকথিত অপরাধীকে 'নজরে' রাখবার এবং মানসিক-ব্যাধি-চিকিৎসকদের দিয়ে পরীক্ষা করাবার ব্যবস্থা করেন। সৌভাগ্যের কথা বলছি এইজন্যে যে, কিছুদিন আগেও অপরাধের সঙ্গে দায়িত্ববোধের যোগাযোগের কথা একেবারেই বিবেচিত হ'ত না। এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। একটা কুড়ুলেতে একজন লোকের আঘাত লাগে ব'লে এথেন্স শহরের বিচারালয়ে কুড়ুলের বিচার হয়, কুড়ুল দোষী সাব্যস্ত হয়, সমস্ত নিয়মকানুন বজায় রেখে তাকে দেশের সীমানা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ওপারে ফেলে দেওয়া হয় অর্থাৎ তার নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়। সেদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডে কোন গাছ মানুষের ওপর ভেঙে পড়লে, তাকে বাজেয়াপ্ত করা হ'ত এবং বিক্রি ক'রে দেওয়া হ'ত। সুইজারলণ্ডে একটা শুয়ার একটি ছোট ছেলেকে খেয়ে ফেলেছিল ব'লে তার বিচার হয়, এবং হুকুম হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যু হয় ততক্ষণ তাকে ফাঁসিকাঠে টাঙিয়ে রাখা হবে। এ অবস্থা থেকে আমরা যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি, সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

শাস্তির ফল কখন হয়? যখন অপরাধী নিজে মনে করে যে, সে সত্যই অপরাধী। তার নিজের যদি অপরাধজ্ঞান না থাকে, তাকে শাস্তি দিলে সে সমাজের ওপর অধিকতর বিরূপ হয় এবং সমাজের বিধিনিষেধকে আরও অবজ্ঞার চোখে দেখতে থাকে।

ভবিষ্যতে তার আবার অপরাধ করবার সম্ভাবনাই বেড়ে যায়। শাস্তির ফল একেবারে উল্টো হয়। অপরাধের তুলনায় শাস্তির গুরুত্ব যদি বেশি হয়, তা হ'লেও ঠিক এই রকম ফল হয়। যেখানে অপরাধজ্ঞান থাকে, সেইখানেই শাস্তি কার্যকরী হয়। সুতরাং শাস্তি দেবার সময়ে এ বিষয়েও দৃষ্টি রাখা উচিত, অপরাধীর মনে এ বিশ্বাস জন্মানো উচিত যে, সে সত্যিই অপরাধ করেছে। এটা খুব ব্যাপক তথ্য। কি ক'রে একজন অপরাধীর মনে সে বিশ্বাস আনা যেতে পারে, সেটা অবশ্য বিভিন্ন অপরাধীর বেলায় বিভিন্ন রকমের হবে, মনোবিদ্যা এখানে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যেখানে অপরাধজ্ঞান আছে, অন্য কেউ শাস্তি না দিলেও অপরাধী নিজেই নিজেকে শাস্তি দেবার উপায় উদ্ভাবন করে। সে প্রায়শ্চিত্ত করে।

মনোবিদ্‌দের আবিষ্কারের ফলে এখন যে নীতি গ্রহণ করবার কথা ক্রিমিনোলজিষ্ট-দের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে সেটা এই যে, এক দিকে অপরাধীকে ভাল ক'রে বোঝা অর্থাৎ তার 'ব্যক্তিত্ব' (personality) বিশদভাবে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, এবং অন্য দিকে সমস্ত সামাজিক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই দুটি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারলে তবেই শাসন-সংশোধন প্রভৃতির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারবে। এই জ্ঞান অর্জনের দিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়াই এখন কর্তব্য। এই জ্ঞান লাভ যত করতে পারব, উন্নতির ব্যবস্থা ততই আয়ত্তে আসবে, কারণ knowledge is power—জ্ঞানই শক্তি।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

অসহায়

বাইরে চটক বজায় রেখে চলি
সমাজ-দাবি ঘরের দাবি মানি,
রাখতে ভড়ং আপনাকেই ছলি,
শুকিয়ে গেল রসিক মম প্রাণী।
এই ছলনা চালাই কত কাল,
আনছি কুমির আপনি কেটে খাল—
জড়ো হ'ল হাজারো জঞ্জাল
বিদ্রোহী মন বলে, ফেল্ রে টানি—
কাঁধের জোয়াল ফেলতে তবু নারি
অভ্যাসেতেই চলছি টেনে ঘানি।

সংবাদ-সাহিত্য

আধুনিক কালে সাহিত্যের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হইয়া অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃততর তাৎপর্য লাভ করিয়াছে ; শুধু রসাত্মক বাক্যই এখন কাব্য বা সাহিত্য নয়। হিত, মনোহারী ও দুর্লভ বচন ; দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস ; মায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আলোচনাও সাহিত্যের মর্যাদা পাইয়াছে—শুধু কথাসাহিত্য-গল্পসাহিত্য, কাব্য-কবিতাই সাহিত্যের সর্বস্ব নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে খাস বাংলা দেশে এবং বৃহত্তর বাংলায় যতগুলি বাংলা-সাহিত্য-সম্মেলন হইয়াছে এবং সারা ভারতবর্ষে প্রবাসী বাঙালীদের উদ্যোগে বাৎসরিক যে বাংলা-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে সেগুলির বিবরণী পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, প্রায় গোড়া হইতেই দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্যাদি ভেদে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া সাহিত্য-মহীরুহ শোভা-সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইহা হওয়া স্বাভাবিক ও সঙ্গত। মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়কে দশজনের বোধগম্য ভাষায় চিত্তাকর্ষক-ভাবে উপস্থাপিত করার নামই সাহিত্য সৃষ্টি করা। প্রায় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কাল হইতে বাংলা দেশের চিন্তাশীল মনীষীরা নানা বিষয়ের সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং সমাজে শিক্ষায় ও রাষ্ট্রে তাঁহারাই প্রভুত্ব ও নেতৃত্ব করিয়াছেন। যে সকল রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের ফলে আমরা অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের জড়তা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছি, বাংলা দেশের সাহিত্যিক মনীষীরাই প্রধানত সেগুলি পরিচালনা করিয়াছেন। রামমোহনের চিন্তাধারা ; কৃষ্ণমোহন-অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর-রাজেন্দ্রলালের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যবুদ্ধি ; ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভা ; দেবেন্দ্র-নাথ-কেশবচন্দ্র-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাহিত্যাশ্রিত ধর্মবুদ্ধি ; দ্বিজেন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্র-নাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-নবগোপাল-মনোমোহন-হরিশচন্দ্র - শম্ভুচন্দ্র - কৃষ্ণদাস প্রভৃতির স্বাদেশিকতামূলক রচনা ও বক্তৃতা এবং সর্বোপরি দীনবন্ধু-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসাধনা মাত্র অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষকে যে কতখানি অগ্রসর করিয়া দিয়াছে আজ আমরা তাহা জানিতে পারিতেছি। হিন্দুমেলা, নিখিল-ভারত কংগ্রেস ও স্বদেশী আন্দোলনের মূলেও চিন্তাশীল সাহিত্যিক মনীষীদের প্রবর্তনা কত গভীর এবং ব্যাপক, তাহাও আমরা অবগত আছি। শুধু বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসেও আমরা দেখিতে পাই, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও কাব্যভেদে বিভিন্ন সাহিত্যিকেরাই বিবিধ বিপ্লব ও আন্দোলনের গোড়াপত্তন করিয়া সাধারণ মানুষের, সমাজের, জাতির ও দেশের সকল প্রকার বন্ধনশৃঙ্খল মোচন করিয়া

চলিয়াছেন। মানুষকে মুক্ত করিবার কাজে রুশো-ভল্টেয়ার, এমার্সন-হুইটম্যান-থোরো, শেলি-ওয়ার্ডসওয়ার্থ বায়রন, টুর্গেনিভ-টলষ্টয় ও মার্কস-এঙ্গেলস্‌-লেনিন প্রভৃতি সাহিত্যিক মনীষীদের কীর্তি আজ কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। ইতালির দেনানৎসিও-মুসোলিনী, ইংলণ্ডের মর্লে-অ্যাসকুইথ-চার্চিল-ওয়াভেল, ভারতবর্ষের গান্ধী-জওহরলাল প্রধানত সাহিত্যবুদ্ধি লইয়া রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্ব করিয়াছেন ও করিতেছেন। সাহিত্যের সোনার কাঠির স্পর্শ ছাড়া পৃথিবীর মানুষের জড়তা কোনও দিনই কাটে নাই এবং ভবিষ্যতেও কাটিবে না।

* * *

গত ১৬ই জুনের মন্ত্রী-মিশনের সঙ্কল্পিত অন্তবর্তীকালীন শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া নিখিল-ভারত কংগ্রেস যেদিন গণপরিষদে ব্যাপক নির্বাচনের নির্দেশ দিলেন, সেই দিনই সমস্ত পৃথিবী অনুভব করিল যে, কংগ্রেস বিজয়ী হইল, এবং সমগ্র ভারতের একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাহার দাবি নিঃসংশয়ে কায়েম হইল। আমরা সেই দিনই অনুভব করিলাম, দেশের সাহিত্য-বুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তানায়কেরা ভারতের ভবিষ্যৎ-কনষ্টিটিউশন-গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার অধিকার পাইবেন, মুসলিম লীগের একান্ত সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি কতকটা ক্ষতি করিলেও ভারতবর্ষের শুভ ও শ্রেয়কে ঠেকাইতে পারিবে না। আমরা সত্যসত্যই আশান্বিত হইলাম।

* * * *

কিন্তু বাংলা দেশের কংগ্রেস কর্তৃক যেদিন নির্বাচিতদের নামের তালিকা দাখিল করা হইল সেই দিন অনুভব হইল, এই পোড়া-দেশে দলগত স্বার্থবুদ্ধি এখনও শ্রেয়কে ও শুভকে বহু দূরে রাখিয়া চলিতেছে ; যে সকল সাহিত্য-বুদ্ধিসম্পন্ন মনীষী নির্বাচিত হইলে দেশের সত্যসত্যই কল্যাণ হইত, তাঁহাদের অধিকাংশই বাদ পড়িয়াছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সমস্যা তেমন কিছু গুরুতর নহে। কংগ্রেস যে অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রতিনিধি, একমাত্র বাংলা দেশে এবং পাঞ্জাবে সেই ভারতের অখণ্ডতা বিপন্ন হইতে পারে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুক্তিসহ কথা বলিতে পারেন এমন লোক অবাঙালী হইলেও বাংলা দেশের তালিকায় স্থান পাইলে ভাল হইত। ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রপ্রসাদ এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি হইতেন। বাংলার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সার্‌ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মত একজন চৌকস দার্শনিককে বাংলা দেশের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিলে আমাদের কল্যাণ হইত। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, কিরণশঙ্কর রায় ও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক-সংস্পর্শ আছে সত্য, কিন্তু তাহা গৌণ। মুখ্যত সাহিত্যিক যোগ্য ব্যক্তি অনেকে ছিলেন, যাঁহারা ইতিহাস, ভাষা ও পুনর্গঠন পরিকল্পনার দিক দিয়া দেশের বিবিধ হিতসাধন করিতে পারিতেন। সার্‌ যদুনাথ সরকার, ডক্টর

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর মেঘনাদ সাহাকে, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, প্রমথ চৌধুরী, অধ্যাপক সত্যেন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন, সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতিকে বুদ্ধিবিচার ও সংগঠনের দিক দিয়া তালিকাভুক্ত করা উচিত ছিল। মোটের উপর প্রবল প্রতিপক্ষের সহিত বাক্য ও কৌশলের লড়াইয়ের ক্ষেত্রে যাঁহারা দৃঢ় ও অনমনীয় থাকিতে পারিতেন, এমন বহু মনীষী বাদ পড়িয়াছেন, অথচ শুধু দলের ধ্বজা ধরিবার গুণে অতি সাধারণ ব্যক্তিও তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। দেশের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বাংলার কর্তারা কংগ্রেসের মূল নির্দেশকে অমান্য করিয়াছেন। ব্যাপক অর্থে দেশের সাহিত্য-বুদ্ধি রাজনৈতিক বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত না হওয়াতে গণপরিষদের নির্বাচন আশানুরূপ কল্যাণপ্রদ হইতে পারিবে না।

—

আমরা ভারতবর্ষ হইতে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দূর করিতে চাই। এমনিতেই তো পার্থক্যের অন্ত নাই, ইহার উপর কতকগুলি নামের মোহে মজিয়া এই পার্থক্যকে আমরা প্রতিদিন সুদৃঢ় ও কঠিন করিয়াই চলিয়াছি। দেশীয় খ্রীষ্টানদের মত ধর্মপরিবর্তনকারী মুসলমানেরাও যদি ধর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নামের পরিবর্তনসাধন না করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষ কখনই এমন ভাবে প্রজ্বলিত হইত না। একই পরিবারে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নিরুদ্বেগে বসবাস করিতে পারিতেন। নামপরিবর্তনই জাতীয় ঐতিহ্য লুপ্তির প্রধান কারণ, সেই কারণ নিবারিত হইলে ধর্মের নামে কখনই ভারতবর্ষের অখণ্ডতা খণ্ডিত করার প্রস্তাব উঠিত না। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখনও যদি আমরা সাবধান না হই, তাহা হইলে নিছক নামের ফাঁদেই শিকার হইয়া আমরা মারা পড়িব। এইরূপ আত্মধ্বংসের অত্যাধুনিক দৃষ্টান্ত মিলিতেছে কলিকাতার খেলার মাঠে। ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় দেওয়ালে দেওয়ালে এবং দোকানে দোকানে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান, পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ (বাঙাল ও ঘটি) প্রভৃতির আক্ষরিক রেষারেষি বরঞ্চ বরদাস্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু খেলার মাঠে, যেখানে প্রতিযোগিতা নয়, পরস্পর মিলনই একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, হিন্দু-মুসলমান ঘটি-বাঙাল ভেদে পরস্পর মাথা-ভাঙাভাঙি করিলে খেলার আসল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইয়া যায়। ইহা নিবারিত হওয়া উচিত এবং অচিরাৎ ইহা নিবারণের একমাত্র উপায় সাম্প্রদায়িক অথবা প্রাদেশিক বিভেদগন্ধী নামের টিমগুলিকে নামপরিবর্তনে বাধ্য করা। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, ইহা হইলেই খেলার মাঠের তাঁবুর কাছাকাছি ইষ্টক-খণ্ডগুলি ও সোডার বোতলগুলি অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত থাকিবে। কর্তারা একটু শক্ত হইলেই এই অবাঞ্ছিত বিরোধের হাত হইতে আমরা বাঁচিতে পারি। আসলে প্রতিযোগী

বিভিন্ন দলে হিন্দু-মুসলমান ঘটি-বাঙাল মাদ্রাজী-মারাঠী তো একাকার হইয়াই আছে—মিথ্যা ও অস্বাভাবিক নামের লেবেল আঁটিয়া দিয়া মালাকে তরবারি করিয়া তুলিয়া অনর্থক রক্তপাতের সার্থকতা কোথায় ?

—

বিগত বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়ে ভারতের একান্ত নিজস্ব প্রতিষ্ঠান অল-ইণ্ডিয়া রেডিও জার্মান ও জাপানী পুরুষদের ব্যাপক বলাৎকার-প্রবৃত্তি এবং জার্মান ও জাপানী নারীদের ঢালাও অসতীত্ব বিষয়ে যে ধারাবাহিক গবেষণা চালাইয়াছিলেন, আশা করিয়াছিলাম, তাহারই ধারা ধরিয়া তাঁহারা ইঙ্গ ও মার্কিন (সাদা ও কালো) সৈন্যাধিকৃত ভারতবর্ষে, জার্মানিতে ও জাপানে ফালতু নারীবাহিনী (W. A. C.) ও অন্যান্য একান্ত সাধারণ নারীদের উপর স্বর্গীয় প্রেম-ভালবাসায় যে প্রবল বর্ষণ হইয়াছে, তাহারই কাহিনী বিবৃত করিবেন। বিষয়ান্তরে ব্যস্ত থাকায় তাঁহারা তাহা করেন নাই। বিষয়ান্তরটা কি তাহাই ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ দ্বিপ্রাহরিক মহিলা-মজলিস অনুষ্ঠানের পুরুষ ঘোষকের কাঁচুমাচু কণ্ঠস্বর কানে আসিল—"আপনি রাঁধতে পারেন ?" রজতবিগলিত নারীকণ্ঠে উত্তর শুনিলাম, "হ্যাঁ, দরকার হলে রাঁধতে হয় বৈকি !" প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম, ইহার পরেই হয়তো প্রশ্ন শুনিব, আপনি চুল বাঁধেন তো, ফুলুরি পান্তাভাত খান তো ?

কিন্তু ব্যাপার কি ? মহিলা-মজলিসে ঘাসের চপ, লঙ্কার রসগোল্লা প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র ভক্ষ্যের নির্মাণপদ্ধতি বর্ণিত হইতে শুনিয়াছি বটে, কিন্তু কোনও ভাগ্যবতী রাঁধিতে পারেন কি না, সে বিষয়ে ঔৎসুক্য তো ইতিপূর্বে দেখি নাই ! পরক্ষণেই এই সংশয়ের জন্য নিজেই লজ্জা পাইলাম, ও হরি, বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী অমুক অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা শাখার মহিলা-মজলিসকে পদধূলিদানে ধন্য করিয়াছেন বাংলা দেশের মহিলাদের এই আকস্মিক সৌভাগ্য দর্শনে বিমূঢ় হইয়া প্রাণ খুলিয়া দিলাম। গোপালদা অন্তর্ধান করিয়া বাঁচাইয়াছেন, না হইলে কিছু বদ্‌জোবান শুনিতে হইত। শুনিতেছি, অতঃপর নাকি মহিলা-মজলিসে বিখ্যাত 'পতিতার আত্মকথা'র কিছু পাঠ প্রত্যহ হইবে।

—

কিন্তু এ সকলই বাহ্য। আসল ব্যাপার হইতেছে বাংলা দেশে আসন্ন দুর্ভিক্ষ। কথায় বলে, ইতিহাস পুনরাবর্তিত হয়—১৯৪২-৩ বা ১৩৫০-এর লক্ষণগুলি একে একে দেখা দিতেছে। ক্রিপস্‌-দৌত্য এবং তাহার বিফলতা, তাহার পরেই আগষ্ট আন্দোলন ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের ভয়াবহ ঝড়, এবং সর্বশেষ দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর মহামারী ; বাংলা দেশের কোটি খানেক নিরীহ মজুর-শ্রেণীর লোক একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

মন্ত্রী-মিশনের সঙ্গে এবারও সেই মহামান্য ক্রিপ্‌স দৌত্যে আসিয়াছিলেন, তিনি বা তাঁহারা যে সফল হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন তাহাও বলা যায় না, আগষ্ট আন্দোলন হয়তো ভ্রূণাবস্থায় পরিণতির অপেক্ষায় আছে, বামপন্থী জয়প্রকাশ-অরুণা-আসফআলির দল নিশ্চয় নিশ্চেষ্ট নাই। ইতিহাসের পুনরাবর্তনে মানুষ অপেক্ষা করিতে পারিতেছে হয়তো, কিন্তু প্রকৃতি নিশ্চিন্ত নাই। তিনি ইতিমধ্যেই প্রবল ধাক্কা মারিয়াছেন উত্তর-পূর্ব আসাম ও দক্ষিণপূর্ব বঙ্গদেশে। 'সি' গ্রুপের পূর্বপ্রত্যন্ত-দেশ এমন প্রচণ্ড আঘাত খাইয়াছে যে, টাল সামলাইতে সামলাইতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পুনরাবর্তন অবশ্যম্ভাবী। লীগের শাসন প্রায় অব্যাহত আছে, চোরাবাজার বাড়িয়াছে বই কমে নাই। শ্বেতচামড়ার শাসক-সম্প্রদায় ভোটাধিকার বর্জন করিয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়াছেন, মনে মনে নিশ্চয়ই বলিতেছেন, তোমাদের ভাল তোমরা সামলাও বাপু। ইহাই এখন একমাত্র সংবাদ। বৈদেশিক সাদা-কাগজের অভাবের তাড়নায় সংবাদপত্রগুলি সম্ভবত অন্যমনস্ক আছেন, তাই আর্তনাদ শুনা যাইতেছে না।

আমরা কিন্তু দুর্গত আতুরদের দূরাগত ক্রন্দন-কোলাহল শুনিতে পাইতেছি—ভৈরবরভসে ঐ আসে ঐ আসে ঐ আসে; সেবারে বস্ত্রাভাব ছিল না, এবারে অন্নাভাবের সঙ্গে বস্ত্রাভাব বিজড়িত হইয়া মন্বন্তর আরও বীভৎস হইবার কথা। তাহার উপর ডাক-ধর্মঘট আসিয়া জুটিয়াছে, রেলধর্মঘট হইতেই বা বাধা কি! অ্যাপক্যালিপসে বর্ণিত চার ঘোড়সোয়ার প্রস্তুত, লাগাম শুধু টানিয়া ধরা আছে, মুহুর্মুহু ক্ষুরাহত হইয়া ধরণীর ধূলি আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সফেন মুখে হ্রেষাধ্বনিও কান পাতিলে শুনা যাইবে।

কংগ্রেসের দায়িত্ব এবারে অসাধারণ, ভাবিতেও ভয় হইতেছে। সেবারে কংগ্রেস রাজরোষে নিপতিত হইয়া বাতিল হইয়াছিল, নেতারা সকলেই কারাগারের নিরুপদ্রব ব্যবধান হইতে দেশের সর্বনাশ পরোক্ষে অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিশ্চেষ্ট সহানুভূতি খুবই বেদনাদায়ক হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু এবারে তাঁহাদের প্রত্যক্ষে মুমূর্ষু জীবনের সহিত প্রবল মৃত্যুর সংঘাত ঘটিবে। তাঁহাদের দায়িত্ব অপরিসীম। সেবারে আমরা তাঁহাদের অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির সুযোগে বহুবিধ সাফাই গাহিয়াছিলাম, এবারে সে সুযোগ নাই। আসন্ন আত্মজন-হত্যার গুরুতর পাপভাগী হইবার পূর্বেই তাঁহাদিগকে বিচক্ষণ সেনাপতির মত দুর্বলতার সকল ঘাঁটিই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে—সরকারী বাধা তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন, সরকারী সাহায্য তাঁহারা গ্রহণ করিবেন, সাম্প্রদায়িক বাধার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত থাকিবেন, দেশকে বাঁচাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে দেশকে শাসন করিবার অধিকারও এখন হইতে তাঁহাদিগকেই লইতে হইবে। দলগত স্বার্থবুদ্ধি জাগ্রত হইলে সে কর্তব্য তাঁহারা পালন করিতে পারিবেন না। বর্তমান

রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত জওহরলাল কারাগার হইতে বাহির হইয়া অবধি মন্বন্তর-মৃত্যু রোধ করিবার জন্য দেশের লোকের কাছে বাগ্দত্ত হইয়াছেন, বাংলা দেশের কংগ্রেসীরা দলাদলি করিয়া অথবা কালোবাজারী স্বার্থবুদ্ধি ধরিয়া রাষ্ট্রপতির সম্মানকে ক্ষুণ্ণ না করেন। আগে হইতেই আমরা সাবধান করিতেছি।

—

খেলার মাঠের লড়কে লেঙ্গে-পাকিস্তানী মনোবৃত্তি সাহিত্যেও কি ভাবে সঞ্চারিত হইতেছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত গত আষাঢ়-সংখ্যা মাসিক 'মোহাম্মদী'র প্রথম পৃষ্ঠায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি নজরুল ইসলাম স্বয়ং সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে যাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই হিন্দু-মুসলমান সকল বাঙালীর প্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার গুলিগোলা হিসাবে তাঁহাকেই ব্যবহার করা হইবে জানিলে তিনি অসুস্থ না হইয়া মরিয়া বাঁচিতেন। "রেণেসাঁর কবি নজরুল" প্রবন্ধের লেখক মোহাম্মদ মোদাব্বের হিন্দুকবি রবীন্দ্রনাথকে ঘায়েল করিবার জন্য মুসলমান কবি নজরুল ইসলামের সহিত একটি তুলনামূলক আলোচনা করিয়াছেন। যথা—

"বাংলার গত দুই শতাব্দীর জীবনে এমনি দু'জন যুগ-স্রষ্টার আবির্ভাব ঘটেছে...

একজন সমৃদ্ধ-বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ।

অপরজন দুস্থ বেদনাহত বাংলার কবি নজরুল ইসলাম।

অনুকূল পারিপার্শ্বিকতার মাঝে মুখে রূপার-চামচ নিয়ে জন্ম হয় রবীন্দ্রনাথের। তাঁর অসাধারণ প্রতিভার বিকাশের পথ ছিল কুসুমাস্তৃত।

প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার মাঝে—দুঃখ ও দৈন্যের দুর্ব্বহ বোঝা মাথায় নিয়ে জন্ম নিলেন নজরুল ইসলাম। তাঁর যাত্রাপথ কণ্টকাকীর্ণ। পায়ে তাঁর বাধা-নিষেধের শৃঙ্খল। তাঁর চলার পথের বাঁকে বাঁকে হিংস্রতার ভয়াল ইঙ্গিত।

প্রতিভার উল্কাপিণ্ড নজরুল...

নজরুলকে কেন্দ্র করেই বাংলার সাহিত্য-জগতে হল রেনেসাঁর সূচনা। তাই নজরুল ইসলামকে বলতে হয় রেনেসাঁর কবি, শতাব্দীর কালজয়ী প্রতিভা।"

—

বঙ্কিমচন্দ্রকে বহুজনে বহুবিধ অপবাদ দিয়াছেন, সিরাজ-প্রশস্তির অছিলায় তাঁহাকে মিরজাফর উপাধি বাংলাদেশে পাকিস্তান-সূচনায় সর্বপ্রথম দান। বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেবের খাস 'মিল্লাতে' (২০ আষাঢ়, ৫ জুলাইয়ের সংখ্যা) এই উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। বঙ্কিমের উপন্যাসের কোনও নায়কের একটি মিসকোটেড উক্তি—"আমরা রাজত্ব চাই না, ইংরেজ রাজত্ব করবে, তাতে আমাদের আপত্তি নেই" 'মিল্লাতে'র ১ম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে মিরজাফর টাইটেল দেওয়া হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা ভাল কোটেশন আমরা দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই।

আমাদের প্রশ্ন এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির সব চরিত্রের উক্তিই কি বঙ্কিমের উক্তি? শেক্সপীয়রের নাটকগুলির সব চরিত্রই কি শেক্সপীয়র? এই হইল বিরুদ্ধ যুক্তি, কিন্তু আসলে বঙ্কিমের রচনা হইতে উদ্ধৃতিটিই যে বিকৃত ও মিথ্যা, তাহার পাপ কাহাতে বর্তাইবে? সুরাবর্দি সাহেবকে কি? দেশে ন্যায় ও সত্যের শাসন থাকিলে 'মিল্লাতে'র ধাড়িবাচ্চা সকলকেই এই ঘোরতর মিথ্যাচরণের জন্য শাস্তি পাইতে হইত। কিন্তু হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর শ্যালকের কান মলিবে কে? পাকিস্তানের নামে যে কি পরিমাণ জুয়াচুরি স্বয়ং বাংলার প্রধানমন্ত্রী মারফৎ চলিতেছে, তাহা সর্বসাধারণের কাছে বিশদভাবে প্রকট করিবার জন্য আমরা 'মিল্লাতে'র উদ্ধৃতি ও বঙ্কিমচন্দ্রের আসল লেখা পাশাপাশি তুলিয়া দিতেছি :

'মিল্লাত'—"এই [মিরজাফরী] মনোবৃত্তিই একদিন বঙ্কিমের কলমের মারফৎ বলেছিল—'আমরা রাজত্ব চাই না। ইংরেজ রাজত্ব করবে, তাতে আমাদের আপত্তি নাই; আমরা চাই নীচ যবনের ধ্বংস।' এই মনোবৃত্তিই প্রকট হয়েছিল মুসলিম রাজত্ব অবসানের সময় এবং তার পরে যখন ইংরেজদের সাথে রাজ্যশাসনে এদেশের এক শ্রেণীর লোক সহযোগিতা করলো।"

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', ৩য় খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ—"চতুর ভবানন্দ যখন দেখিলেন, ইংরেজের তোপ সকলই গেল, সৈন্য সব গেল, যাহা অল্পই রহিল, তাহা সহজেই বধ্য, তখন তিনি নিজ হতাবশিষ্ট দলকে ডাকিয়া বলিলেন যে, 'এই কয়েকজনকে নিহত করিয়া জীবানন্দের সাহায্যে আমাকে যাইতে হইবে। আর একবার তোমরা জয় জগদীশ হরে বল।' তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তান-সেনা 'জয় জগদীশ হরে' বলিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় কাপ্তেন টমাসের উপর লাফাইয়া পড়িল। সে আক্রমণের উগ্রতা অল্পসংখ্যক সিপাহী—তৈলেঙ্গীর দল সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা বিনষ্ট হইল। ভবানন্দ তখন নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিলেন। কাপ্তেন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, 'কাপ্তেন সাহেব! তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ? আইস, তোমার প্রাণদান দিলাম। আপাততঃ তুমি বন্দী। ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।"

এই ভয়াবহ ডবল মিথ্যাচারের প্রতিকার বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেব করিবেন কি?

—

বর্তমান সংখ্যা (১৩৫২, পৌষ) 'চতুরঙ্গে' "আড়াল" নামক একটি গল্পে শ্রীরমাপদ চৌধুরী আধুনিক কলেজে শিক্ষিতা মেয়েদের একেবারে বে-আব্রু করিয়া ছাড়িয়াছেন। সুজাতার বাড়িতে তাহার কলেজ-বন্ধু ইন্দ্রানী বেড়াইতে আসিয়াছে। উভয়েই কুমারী,

কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে খবর পাওয়া গেল, সহপাঠী সুকুমারের সঙ্গে ইন্দ্রানীর একটা অ্যাফেয়ার হইয়াছিল, এবং সুকুমার কি একটা কুৎসিত ব্যবহার করাতে ইন্দ্রানীর পক্ষে দুঃখকর ছাড়াছাড়িও হইয়াছিল। আরও খবর পাওয়া গেল যে, থ্রি মাসকেটিয়ার্স নামে খ্যাত তিন সখীর অন্যতমা অশোকা কোন এক ষ্টেটে গবর্নেসের চাকুরি লইয়া গিয়াছে।

"—গভর্নেস? তাই বলেই অবশ্য নিয়ে যায়। বিষণ্ণ ছায়া পড়লো ইন্দ্রাণীর মুখে।"

আরও অনেক খবর।

"ওদের সেই কোডের ভাষার কথাকওয়া, পুরুষ সতীর্থদের গোপন নাম, প্রফেসরদের দুর্বলতা। ডক্টর সেনের সঙ্গে মঞ্জুশ্রীর নাম জড়িয়ে রটনা করা।...কার্ণিভালের রাতটা মনে পড়ে। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল বাড়ি ফিরতে। বকুনি খেয়েছিল খুব একচোট। মিথ্যার প্রহসন বুনতে বুনতে বাসায় ফিরেছিল, কাজে লাগেনি।...আর একদিন। মেট্রোয় কি একটা সিনেমা দেখতে গেছে তারা ম্যাটিনিতে। পিছনের রোয়ে বসেছিল কলেজেরই একদল ছেলে। দুপক্ষই হাসাহাসি করেছিল। ঠাট্টা, বিদ্রূপ। সম্মুখে যুদ্ধ নয়। ইন্দ্রানীরা শুনিয়ে শুনিয়ে ব্যঙ্গবাণ ছুঁড়েছিল পশ্চাদ্বর্ত্তীদের উদ্দেশ্যে; তারাও আড়চোখে পিছন ফিরে তাকানো, আর ঠোঁট টিপে টিপে হাসা।"

সংবাদ আরও আছে।

"—বিয়ে করে ফেল শীগগির। সুজাতা বললে মৃদু হেসে।—যৌবন তো শেষ হতে চললো।

—বিয়ের সখ আমার ঐখানেই মিটে গেছে। বুঝেছি সব পুরুষই ওই সুকুমারের মত।"

ইন্দ্রাণী চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "বাঁ হাতের মণিবন্ধে ঘড়িটা বাঁধতে বাঁধতে সময়টা দেখে নিলে সুজাতা। না তার আসবার সময় হয়নি এখনো।" "চুলটা আর একবার ভালো করে আঁচড়ে নিয়ে কবরী বাঁধলে সুজাতা। নিপুণ হাতে। ব্রিলেণ্টাইনের প্রলেপ দিলে চুলে। মুক্তোর মালাটা কড়ে আঙুলে জড়িয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালে।

দু'সেট দুল্ হাতে করে ভাবলে কিছুক্ষণ। প্ল্যাটিনামের দুলটা পরাই ভালো। দয়িতাকে উপহার দিয়ে প্রত্যেক প্রেমিকই খুশী হয়। প্রণয়ীর দেহে সেই উপহারের ঔজ্জ্বল্য দেখে সুখী হয় আরো বেশী। নিপাড় সাদা জর্জ্জেটখানা পেঁচিয়ে পরলে সে। ডান হাতে পরলে আট গাছা সরু সরু রঙিন কাঁচের জলচুড়ি। বাঁ হাতের ষ্ট্র্যাপটা বদলে নিলে। সাদা ভেলভেটের ফিতেটাই ম্যাচ করবে। মুঠো মুঠো পাউডার ঢেলে দিলে বুকের ভাঁজে। কাঁধে, পিঠে, মুখে মাখলে গোলাপী সুবাস-রেণু। রঙের লালিমায় অধর রাঙালে। ইভনিং-ইন-প্যারিসের স্প্রে দিল বেসবাসে। আয়নায় চোখ রেখে ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলে সে নিজেই মোহিত হয়ে গেল নিজের রূপে। নীল রেশমী স্কার্ফটা রিফ্ নট দিয়ে ফাঁসিয়ে নিলে। আবার খুললে সেটা বাঁ হাতে বাঁধলে স্কার্ফটা ঘড়িটা ঢেকে।

তারপর ধীরে ধীরে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালে সে অপেক্ষমানা অভিসারিকার মত। পথের দিকে তাকিয়ে রইলো অধীর উদ্বেগে। আসবে তো।

হর্ণ বাজলো সচকিত হয়ে উঠলো সুজাতা। স্পষ্ট হয়ে উঠলো ছোট লাল রঙের টু-সীটারখানা! ও আসছে!

গাড়ীটা বাড়ীর সামনে ঘন ঘন হর্ণ বাজিয়ে দূরের গ্যাসপোষ্টের নীচে গিয়ে দাঁড়ালো। ওপরের হুডটা খোলা। গ্যাসের আলো পড়েছে ওর মুখে। চিকচিক করছে চশমার ফ্রেমটা। ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে তাকালে সে সুজাতার ঘরের দিকে। সুজাতা পেছিয়ে এল। মুখের ও দেহের ওপর আলোটা পড়েছে কি না দেখে নিয়ে হাত নেড়ে অপেক্ষা করতে বললে।

তারপর উঁচু হিল্ জুতোটা হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে নীচে নেমে গেল।"

* * *

শুধু এই গল্পই নয়, জ্যৈষ্ঠের 'পূর্বাশা'য় শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অমানুষিক" গল্পেও দেখিতেছি দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের তাড়নায় এক অতি দরিদ্র দম্পতির, ছিদাম আর কুঞ্জার বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল। গেল তৈজসপত্র, গেল গাই'টা, গেল কুঞ্জার রূপার পৈছা, কানের মাকড়ি, শেষ পর্যন্ত ভিটেটাও বাঁধা পড়িল ললিতবাবুর কাছে। ছিদাম পলাইয়া বাঁচিল, ভিখারী হইল, ডাকাত হইল, "সরকারী মেয়ে-বস্তির উচ্ছিষ্ট মেয়ে পাবো"কে লইয়া রোজগারের চেষ্টা করিল এবং শেষ পর্যন্ত একদিন সেই বাঁধাপড়া ভিটের টানে দেশে আসিল। কুঞ্জাকে দেখিল।

"চেহারা ফিরেছে কুঞ্জার। আজ মেঘলা অবেলায় খাসা দেখাচ্ছে কুঞ্জাকে। এ বড় অদ্ভুত কাণ্ড নয় কি! বিয়ের সময়কার রোগা প্যাঁটকা মেয়েটা ছ'সাত বছর যদ্দিন স্বামীর সঙ্গে ঘরকন্না করল, একটা ছেলে আর মেয়ের মা হয়েও রইল যেন প্যাঁকাটি, স্বামীর দেড় বছরের অন্তর্দ্ধানের সময়টাতে সে মরার বদলে পুড়ন্ত বাড়ন্ত যুবতী হয়ে গেছে!

কুঞ্জা ঝেঁঝে বলে, বাড়ন্ত সব, আরেক বাড়ি যাও।

ছিদাম বলে, চিনলা না মোরে? আমি যে ফিরা্যা আলাম।

কুঞ্জা দু'পা এগিয়ে যায়। তুমি! ফির‍্যা আসছ? কন থেইকা আইলা তুমি?

ম্রিয়মান ছিদাম বেড়া পেরিয়ে কাছে এগিয়ে আসে, উদাসকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, যামু গা?

ক্যান? যাইবা ক্যান? বসবা একদণ্ড? জলডা নিয়া আসুম?

গুম খেয়ে ছিদাম বসে থাকে। তার ঘরে খাট, টেবিল, তাক দেখে আর সে সমস্তে শহুরে-শয্যা, জিনিসপত্র, প্রসাধন-সামগ্রী দেখে, ললিতবাবুর বুড়ো ঝি সুবালার মাকে

উঠান ঝাঁট দিতে দেখে, রসুই ঘরের নতুন ক'রে পত্তা চালার নীচে কোন একজন রাঁধুনী রান্না চাপিয়েছে টের পেয়ে, গোয়ালে দুটো প্রকাণ্ড পশ্চিমা গাই দেখে, হিমসিম খেয়ে গেছে ছিদাম। ভিজে কাপড়ে বাড়ি ফিরে তাকে এখানে বসে থাকতে দেখে কুজা একটু রাগ করে।

আসো, আসো, আসো—ভিতরে আসো।

কুজা তাকে একরকম জোর করেই ভিতরে নিয়ে গিয়ে খাটে বসিয়ে দেয়, খাটে ছিদাম বসে তার জীবনে এই প্রথম, দামী খাটে গদি, তাতে তোষক, তাতে আবার চাদর পাতা ধবধবে পরিষ্কার।

তামাক দিবার পার একছিলুম?

কুজা তাক থেকে টিন সামনে ধরে সিগারেটের।

যামু?

ক্যান যাইবা? বস।

বাইরে থেকে ঘা পড়ে সামনের দরজায়।

কেডা? কুজা শুধায়।

আমি। জবাব আসে পুরুষের গলায়।

ছিদাম ফিস ফিস করে কুজাকে শুধায়, ললিতবাবু নাকি?

কুজা মাথা নামিয়ে সায় দেয়।

কি করণ যায় অখন!

কি জানি।

আবার ধাক্কা পড়ে দরজায়।

খুলে দে। ছিদাম শেষে বলে নিজে থেকেই। উঠে দাঁড়িয়ে ভিতরের দরজা দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।"

* * *

গল্পগুলির রচনা-নৈপুণ্য অথবা শৈথিল্য আমাদের বিচার্য নয়, কোন্ বিষয়বস্তু লইয়া এ যুগের কথা-সাহিত্যিকেরা কারবার করিতেছেন তাহাই বিচারের বিষয়। জ্যৈষ্ঠের 'মাসিক বসুমতী'তে শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ "রাহু" গল্পে, শ্রীআশীষকুমার বর্মণ "কার কপাল আর ফাটে কার" গল্পে, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা (১৩৫২) 'গুলিস্তাঁ'য় শ্রীমতী ইন্দিরা গুপ্ত "তুমি নি আমার বন্ধু" গল্পে, জ্যৈষ্ঠের 'পরিচয়ে' শ্রীননী ভৌমিকের "একতলা" গল্পে একই সামাজিক ব্যাধির বিভিন্ন প্রকাশ দেখিতেছি—কোথায় যেন কি একটা কল বিগড়াইয়া গিয়াছে, অচল হইবার অবস্থা। বাড়ির সমর্থ চাকরের সেক্সহাঙ্গার এবং তাহা যথাকালে পরিতৃপ্ত হইতে না দিবার ফলে তাহার কুৎসিত ব্যাধি, সরকারী চিকিৎসায় তাহার নিরাময়,

মনিবের সহানুভূতি, তাহাকে নিয়মিত দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা এবং সেখান হইতেও ব্যাধি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন, কারণ

"মধু মাথা নীচু করল, তারপর অনেক সংকোচে ধীরে ধীরে বলল...গণেশের মা [অর্থাৎ মধুর স্ত্রী]...ওখেনেও মিলিটারিরা এসেছিল।"

ইহাই হইল শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের "রাহু"। শ্রীমতী ইন্দিরা গুপ্ত দেখাইয়াছেন, কাব্যপ্রবণ স্ত্রী গীতির ম্যাটার-অব-ফ্যাক্ট স্বামী মন্মথর হাতে পড়িয়া মানসিক ক্লেশ, মন্মথর বন্ধু রণজিতের আবির্ভাব, তাহার সহিত গীতির ঘনিষ্ঠতা এবং শেষ পর্যন্ত বাড়ির পাশে মহুয়াবনে বেড়াইতে গিয়া রণজিতের অধীরতা দর্শনে

"আর্তস্বরে গীতি বলে, না! না গো না। চাই না আমি প্রিয়া হতে—চাই না হতে প্রেয়সী। পরস্পরের দেহ নিয়ে কামড়াকামড়ি করা, যেমন কুকুরে এক টুকরো মাংস পেলে করে—তেমন প্রিয়াত্বে আমার রুচি নেই। পৃথিবীর আদিকাল থেকে এই যে ক্রমোবর্তিত গতানুগতিক ইতিহাসের ধারা, কোনও কালেই কি এর কিছুমাত্র পরিবর্তন হবে না? পঙ্কিল কামনা কলঙ্কিত আত্মতৃপ্তির মধ্যেই কি মানুষের ভালবাসার শেষ কথা নিহিত রয়েছে!

উত্তেজিত হয়ে উঠে রণজিৎ বলে, মনের মিলনের পর দেহের মিলন, এই ত ভালবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—বাধা দিয়ে গীতি বলে, রক্ষা কর, তবে আমার ভালবাসায় কাজ নেই।"

* * * *

আধুনিক সভ্যতার বিকৃতি আমাদের সমাজ ও সাহিত্যে যে বিষময় ফল ফলাইতেছে, সে বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে। শুধু এ দেশে নয়, পাশ্চাত্য সমাজ ও সাহিত্যেও এই ভাঙন দেখা দিয়াছে এবং সেখানকার মনীষীরাও চিন্তা করিতেছেন। আমেরিকার একজন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত এই প্রসঙ্গে নিরাশাবাদীদের (pessimists) সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা শুনিলেই আমরা বুঝিব, এই ব্যাধি সমস্ত বিশ্বকে আক্রমণ করিয়াছে। তিনি আধুনিক সমস্যার সকল দিক দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আগামীবারের জন্য মুলতুবি রাখিয়া আমরা তাঁহার কথা কিছু উদ্ধৃত করিয়া এবারকার প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। তিনি বলিতেছেন—

You have grown up in a generation that has experienced, or remembers, war; and this has changed everything for you. You have seen violence let loose in a hundred forms, and new devices of international murder invented with great care; you have seen the crude realities of imperialistic greed and commercial competition behind the suave surface of diplomatic notes, and you cannot believe in Utopias any more. Your magazines specialize in showing you the worthless phases of modern life; they consume themselves

in attacking abuses and ignorance, in describing injustices and stupidity; they have declared war on all sentimentality and tenderness, and with laughter and statistics they whip you into a stoic apathy that has no belief in any goodness, and no trust in any love.

I pity you for the plays that you see, the pictures that you bear with, the music that you hear, and the liquor that you have to drink; they have all been poisoned by democracy and war. For the war hastened the industrialization of women, and flung them into such perpetual intimacy with men as was bound to break through the dykes that the old moral code had built to control the flood of sex in a world where puberty no longer brings marriage. The war unbalanced the minds of men and spread throughout Europe and America [কলিকাতাতেও] that disease called modern painting, which had begun in a France exhausted and humiliated by defeat. And democracy, which we thought would lift all men to manhood, all women to intelligence, and all governments to nobility and peace—democracy has canceled the exceptional man, made thinking illegal, dragged down the best to the level of the most, and substituted, for the standards of the mature, the art and drama and music of the mob. There are two hundred theatres in New York, and not three plays which an adult mind would care to see: take away *Strange Interlude*, *Faust*, and perhaps one more, and the rest is degrading trash. The musical comedies that form so large a part of your education are merely burlesque for the bourgeoisie; their humor is composed of horse-play such as was once confined to the rear rooms of saloons; and their glorifications of the naked American girl lack all excuse of beauty. Buy a front seat at these monstrosities, and lose another delusion.

উপরে উল্লিখিত যাবতীয় বীভৎসতা আমাদের দেশেও দেখা দিয়াছে, সুতরাং এবিষয়ে সকলের তৎপরতা প্রয়োজন।

"শব্দের অপপ্রয়োগ" সম্পর্কে প্রায় তিন ডজন আলোচনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, অনেকগুলির মধ্যে কাজের কথা আছে। ভাদ্র সংখ্যায় এই সকল আলোচনার প্রয়োজনীয় অংশ একটি প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইবে।

এবারেও স্থানাভাবে পুস্তক-পরিচয় দেওয়া গেল না। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় যাবতীয় হস্তগত পুস্তকের উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৩

অহিংস বিপ্লব

মৌলিক প্রশ্ন

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ আষাঢ় মাসের 'শনিবারের চিঠি'তে গঠনকর্ম সম্পর্কে একটি অতিশয় সঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আজ জনসাধারণ এবং শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগ্রাম চলিয়াছে। এই সংগ্রাম কখনও তীব্র আকার ধারণ করে, কখনও বা মন্দীভূত অবস্থায় চলিতে থাকে। আজ হয়তো সামরিক প্রয়োজনে গান্ধীজীর উপদেশমত আমরা ভারতবর্ষের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় শাসনের আয়ত্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্ত টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারি; অর্থাৎ গ্রামগুলি যাহাতে খাওয়াপরার ব্যাপারে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, লড়াইয়ের তাগিদে হয়তো বা সে অবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতেও পারি। কিন্তু প্রশ্ন হইল, যুদ্ধ যখন শেষ হইবে, অর্থাৎ জনসাধারণের পক্ষে জয়লাভ ঘটিবে, যখন চাষী-মজুরগণের স্বার্থপোষণই রাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য হইবে, তখনও কি বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা জীয়াইয়া রাখার প্রয়োজন আছে? অর্থাৎ ভবিষ্যতেও কি রাষ্ট্র হইতে স্বতন্ত্র কতকগুলি জনপ্রতিষ্ঠানের দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করিবার হেতু আছে?

প্রশ্নটি উত্থাপন-প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন, যদি তখনও সেরূপ ব্যবস্থা কায়েম থাকে তবে বুঝিতে হইবে, গান্ধীজীর মতানুসারে রাষ্ট্র এবং জনস্বার্থের মধ্যে ঐক্য কোনদিনই সম্ভব নয়। কিন্তু কংগ্রেস যে সময়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে গ্রামের পুনর্গঠনের জন্ত, গঠনকর্ম প্রসারের জন্ত, মন্ত্রীবৃন্দ রাষ্ট্রশক্তির প্রভাব প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অতএব ভবিষ্যৎ ভারতেও জনস্বার্থের পুষ্টিসাধনের জন্ত রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগ আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সমীচীন হইবে; ও যুদ্ধকালে জনস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্তে যে সকল প্রতিষ্ঠান গড়া হইয়াছিল, সেগুলি অপ্রয়োজনীয় হওয়াই স্বাভাবিক হইবে; অথবা রাষ্ট্রের বিভাগ হিসাবে রূপান্তরিত হইবে।

বর্তমানে আলোচনাটি উত্থাপন করা অতিশয় সমীচীন হইয়াছে; প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিকও বটে। ইহার সংক্ষেপে সমাধান সম্ভব হইবে না ভাবিয়া একটু গোড়া হইতেই আলোচনা আরম্ভ করিব; আশা করি, ধৈর্যশীল পাঠক তজ্জন্ত ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

মূলত প্রশ্নটি হইল, অহিংস সমাজব্যবস্থায় সমাজের নিয়ন্ত্রণভার রাষ্ট্রের উপরে কতখানি নির্ভর করিবে, তাহা লইয়া।

ভারতবর্ষের গ্রাম অথবা প্রদেশগুলি এক সময়ে মোটামুটি খাওয়াপরার ব্যাপারে

দূরদেশের উপরে বিশেষ নির্ভর করিত না। তখন জীবনধারণের মত প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রাম বা গ্রামের কাছাকাছি উৎপন্ন হইত, শখের জিনিস অথবা মূল্যবান প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যাহা নিত্য খরিদ করিবার আবশ্যকতা হয় না, তাহা দূরের হাট বা মেলা অথবা কোন শহর হইতে আমদানি হইত। এই ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি সুবিধা এবং কতকগুলি অসুবিধাও ছিল। সুবিধার মধ্যে, দেশে রাজার পর রাজা শাসন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু গ্রামবাসীর জীবন রাজতন্ত্রের পরিবর্তনে অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত বা ধ্বংস হয় নাই; আবার অল্পদিনের মধ্যে গ্রাম্য অর্থনৈতিক জীবনের ভারকেন্দ্র স্থিরত্ব লাভ করিয়াছে। অসুবিধার মধ্যে দুইটি প্রধান। কোন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ বা মহামারী উপস্থিত হইলে অন্য প্রদেশ হইতে দ্রুত পর্যাপ্ত পরিমাণ রসদ আমদানি করা সম্ভব হইত না; চলাচলের ব্যবস্থা আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে অতদূর উন্নতিলাভ করে নাই; দ্বিতীয়ত, ভারতের কোন অংশ বিদেশীর দ্বারা আক্রান্ত হইলে সমগ্র ভারতের পক্ষে এক হইয়া হঠাৎ শত্রুকে প্রতিহত করাও সম্ভব হইত না। আর্থিক জীবনে সকলে ছাড়া ছাড়া ভাবে থাকিবার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনেও ছাড়া ছাড়া ভাব কায়েম হইয়া ছিল; এবং হয়তো অংশত সেই কারণে মধ্যযুগে মুসলিম শক্তি অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজী ধনতন্ত্রের প্রসারকেও ভারতবাসী সম্মিলিত বাহুবলের দ্বারা প্রতিহত করিতে সমর্থ হয় নাই।

ধনতন্ত্রের প্রসারের ফলে আজ ভারতবর্ষের আর্থিক জীবন এবং উৎপাদন-ব্যবস্থা এমনভাবে ঢালিয়া সাজা হইয়াছে, যাহার ফলে কোনও গ্রাম বা কোনও প্রদেশ, অথবা সমাজের মধ্যে কোনও শ্রেণী, এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষ, আজ যাহা উৎপাদন করে শুধু তাহা ব্যবহার করিয়া সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে না। বোম্বাই বা মধ্যপ্রদেশে অপর্যাপ্ত তুলা উৎপন্ন হয়, বাংলায় কিছু ধান ও প্রচুর পাট হয়। কিন্তু বোম্বাই অথবা বাংলার তুলা বা পাট যদি যথাসময়ে বিক্রয় না হয়, তবে মানুষের দুর্গতির আর সীমা থাকে না। বাংলার চাষা অথবা বোম্বাইয়ের চাষী, কিংবা কলিকাতার পাটকলের কুলি এবং বোম্বাই ও নাগপুরের কাপড়কলের মজুরের পক্ষে আজ ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে, স্বীয় শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের উপরে নির্ভর করিয়া প্রাণধারণ সম্ভব নয়। যদি সেই সব মালের বিনিময়ে ব্যবহার্য জিনিস না পাওয়া যায়, চলাচলে ও ব্যবসায়ে বাধাবিঘ্ন ঘটে, তবে অন্নবস্ত্রের অভাবে চাষী-মজুরকে সর্বত্র বিকল হইয়া পড়িতে হয়। যে মুষ্টিমেয় শাসক-সম্প্রদায় আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের কলকাঠি নিজের আয়ত্তে রাখিয়াছে, তাহার পক্ষে অন্নবস্ত্রের অভাবে দেশের জনসাধারণকে কাবু করা কিছুই কঠিন অথবা অসম্ভব হয় না।

ইহা হইতে মুক্তির দুইটি উপায় হইতে পারে। যদি ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের চাষীমজুর কোনও এক দ্রুত বিদ্রোহের ফলে রাষ্ট্রশক্তি দখল করিয়া উৎপাদন-ব্যবস্থার

উপরে অধিকার বিস্তার করিতে পারে, অর্থাৎ বর্তমান শাসকসম্প্রদায় অন্নবস্ত্রের অভাবে তাহাদিগকে কাবু করিবার পূর্বেই যদি চাষীমজুররাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তো গান্ধী-প্রদর্শিত আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের কোন প্রয়োজনই হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে সেইজন্য এমন এক শ্রেণীর বিপ্লবী আছেন যাঁহারা মনে করেন, শাসকবর্গকে পরাস্ত করিবার জন্য, ধনতন্ত্রের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা নষ্ট করিবার আবশ্যকতা নাই; চাষীমজুরকে সংঘবদ্ধ করিয়া, মাঝে মাঝে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত করিয়া তাহাদের প্রতিরোধ-ক্ষমতাকে সুসংহত করিতে হইবে এবং অবশেষে কোনও ঐতিহাসিক সুযোগের সন্ধিক্ষণে সম্মিলিত চেষ্টায় বিপুল আক্রমণের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি, অর্থাৎ সমাজের আর্থিক এবং রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকে চাষীমজুরের করায়ত্ত করিবার আয়োজন করিতে হইবে।

যাঁহারা বিপ্লবের, অর্থাৎ জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্য উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোনও কলহ থাকিতে পারে না। কিন্তু আমার বক্তব্য হইল এই যে, গান্ধীজী জনসাধারণের মুক্তির জন্য, অর্থাৎ সমাজের উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে উৎপাদকবৃন্দের করায়ত্ত করিবার জন্য যে বিপ্লবপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা উপরোক্ত প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বর্তমান আলোচনার সুযোগ লাভ করিয়া, সেই প্রণালীর বিশেষত্ব কোথায়, আমি তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব। প্রসঙ্গক্রমে হিংস এবং অহিংস সংগ্রামকৌশলের মধ্যে প্রভেদ কি, আদর্শ অহিংস সমাজে বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা কতদূর বাঞ্ছনীয়, এ সকল বিষয়েও কিছু কিছু কথা উঠিবে। সমগ্র আলোচনা শেষ হইলে, তাহারই মধ্য দিয়া হয়তো সমাজ এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক-সম্বন্ধে যে মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য স্পষ্ট করিয়া তুলিতে পারিব।

প্রথমেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, হিংসাকে আমি ঘৃণ্য পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করি না। মানবসমাজে পটপরিবর্তনের সময়ে ইতিহাসে বারংবার হিংসার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে; যখন কোনও শ্রেণীবিশেষের অত্যাচার নানা কারণে অসহনীয় হয়, তখন নিপীড়িত শ্রেণী মুক্তিলাভের আশায় মত্ত হইয়া হিংসার অস্ত্র ধারণ করে। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনার ফলেই মনে হইতেছে যে, হিংসার দ্বারা সমাজের ধনোৎপাদক চাষীমজুর শ্রেণীর পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত মুক্তিলাভ হয়তো সম্ভব হইবে না। হিংসার অস্ত্রে এমন কতকগুলি ত্রুটি আছে, যাহার ফলে সেই মুক্তির আশা এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ-চেষ্টা বার বার পরাস্ত হইয়া যাইবে। সেইজন্য হিংসার প্রতিক্রিয়া মানবশিশুর মধ্যে 'স্বাভাবিক' হইলেও অহিংসার অস্ত্রের উপরেই আমার আস্থা দিন দিন গাঢ়তর হইতেছে।

ভারী জিনিস মাধ্যাকর্ষণের বশে মাটিতে পড়িয়া যাওয়া 'স্বাভাবিক'; কিন্তু তাহার সহিত প্রকৃতির মধ্যে এমন আরও কতকগুলি গুণ বা অবস্থার ধর্ম আছে যেগুলিকে আয়ত্ত করিয়া মানুষ আজ স্বচ্ছন্দে বায়ু অপেক্ষা গুরুভার এরোপ্লেন লইয়া আকাশে হেলায় বিচরণ করিতেছে। পূর্বে কেহ এরোপ্লেন নির্মাণ করে নাই বলিয়া বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ হাল ছাড়িয়া দেন নাই। সমাজজীবনে পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারেও তেমনই যাহা কিছু সহজে ঘটে, প্রাচীনকাল হইতে ঘটিয়া আসিতেছে, তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকিব কেন? যদি মনে হয়, প্রচলিত পরিবর্তন-সম্পাদনের ব্যবস্থার মধ্যে ত্রুটি রহিয়াছে, অথবা ব্যষ্টির ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে আরও উন্নত এবং ফলপ্রদ উপায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তবে সমষ্টির বেলাতেই বা অপেক্ষাকৃত অধিক কার্যকরী এবং নির্দোষ উপায় উদ্ভাবনের জন্য কেন চেষ্টা করা হইবে না? যদি বহুবার বিফলতা আমাদিগকে আক্রমণ করে, তবু সর্বোত্তম প্রণালী অনুসন্ধান বা উদ্‌ভাবনের চেষ্টায় যেন আমরা কখনও নিরুৎসাহ না হই। সফল হইলে, আমরা এরোপ্লেনের মত বিস্ময়কর বস্তুই হয়তো সৃষ্টি করিতে পারিবে; যাহা আপাতদৃষ্টিতে 'স্বাভাবিক' নিয়মের বা অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু যাহা বস্তুত 'স্বভাব' অথবা মানবপ্রকৃতি এবং মানবসমাজের সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর এবং সত্যতর জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ-পদ্ধতিকে আমি সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার বলিয়াই বিবেচনা করি। সেই সত্যাগ্রহ অথবা অহিংস বিপ্লবপন্থার স্বরূপ কি, অর্থাৎ তাহার বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহা এইবার নিবেদন করিবার চেষ্টা করিব।

বিভিন্ন বিপ্লবপন্থায় জনসাধারণ তথা পার্টির স্থান এবং স্বরূপ

ধনতন্ত্রের আলোচনা-প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছিল। যাহারা সমাজের জীবনকে পরিচালিত করে, তাহারা উৎপাদক শ্রেণীর তুলনায় সংখ্যায় অল্প হইলেও জনসমাজের জীয়নকাঠি মরণকাঠির কেন্দ্রস্বরূপ রাষ্ট্রশক্তিকে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য সেই শক্তি তাহারা স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থপুষ্টির জন্য নিয়োজিত করে; কিন্তু রাষ্ট্রই যে নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় শক্তির আধার হইয়া আছে, ইহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। সেই ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকবৃন্দকে যদি দ্রুত পরাস্ত করিতে হয়, তবে তাহাদের শক্তির কেন্দ্র কোথায়, অর্থাৎ সেই শ্রেণীর মধ্যে আবার শক্তির ভারকেন্দ্র কোন্ উপশ্রেণীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, কাহার মধ্যে বিপ্লবী সম্ভাবনা সমধিক বর্তমান, আক্রমণের সন্ধিক্ষণ কখন উপস্থিত হয় তাহার বিচার করিবার, এবং উৎপাদক শ্রেণীর শক্তি এবং আক্রমণকে তদনুযায়ী পরিচালিত করিবার জন্য কিছু বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আছে; অন্যথা চাষীমজুরের দুঃখবোধ এবং বিদ্রোহের সম্ভাবনা বর্তমান থাকিলেও

জয়ের আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। মার্ক্সপন্থী যাবতীয় মনীষীবৃন্দ সেইজন্য বলিয়াছেন, চাষীমজুরকে পরিচালিত করিবার জন্য, তাহাদের অন্তরস্থ বিদ্রোহের বহ্নিকে সংহত এবং পুঞ্জীভূত ও সার্থক করিবার জন্য বিপ্লবে দক্ষ এক সুসংবদ্ধ পার্টির একান্ত প্রয়োজন। শুনিয়াছি, মার্ক্সের নিজের নাকি ধারণা ছিল যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে নিপীড়িত জনসাধারণের মধ্য হইতেই উপযোগী নেতৃত্বের আবির্ভাব হইবে। পরবর্তী কালে, ঐতিহাসিক এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে লেনিন অনুভব করেন, বিপ্লব পরিচালনার জন্য সুনিয়ন্ত্রিত পার্টির একান্ত প্রয়োজন। আজ মার্ক্সবাদী সকলেই বোধ হয় নিরপেক্ষভাবে পার্টির প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করেন; তদভাবে ধূর্ত, শক্তিশালী এবং সুসংবদ্ধ ধনতান্ত্রিক শক্তির নাগপাশ হইতে জগতে জনসাধারণের মুক্তি সম্ভব নয়।

গান্ধীজী কিন্তু মনে করেন, যদি সশস্ত্র বিপ্লবের সার্থকতা পার্টির উপরে একান্তভাবে নির্ভর করে, তবে বিপ্লবের অন্তে যখন ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটিবে, যখন বর্তমান শাসকশ্রেণীর অধিকার হইতে দণ্ডশক্তি বিচ্যুত হইবে, তখন সেই শক্তি পার্টির অধিকারে কেন্দ্রীভূত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। বিপ্লবে যাহারা অস্ত্রচালনায় দক্ষতা অর্জন করিয়াছে বা গুরু দায়িত্বের ভার লইয়াছে, সেই শ্রেণী বা সংঘ প্রধানত দণ্ডশক্তির অধিকারী হইবে। মার্ক্সপন্থী গান্ধীজীর সঙ্গে সহমত হইয়া বলিবেন, 'নিশ্চয়ই, ক্ষমতা তো পার্টির হাতে আসিবেই। কিন্তু পার্টি সে ক্ষমতা জনসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ অধিকার করিয়া থাকিবে, এবং সেই ক্ষমতার সুনিপুণ প্রয়োগের দ্বারা প্রতিবিপ্লবের সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবে। জগৎসমাজে সর্বত্র ধনতন্ত্রের বিষদাঁত ভাঙিয়া গেলে দণ্ডশক্তির উপরে আর নির্ভর করিবার প্রয়োজন হইবে না; উৎপাদকশ্রেণী ধীরে ধীরে শিক্ষিত এবং সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিলে, সকল প্রতিবিপ্লবী শক্তির অবসান ঘটিলে, নিরঙ্কুশভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় আসিবে। তখন পার্টির দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রের আর প্রয়োজনীয়তা থাকিবে না, রাষ্ট্র ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে নিশ্চিহ্ন হইবে। তখন সমাজের পরিচালনভার দণ্ডশক্তির উপরে আর নির্ভর করিবে না; তৎপরিবর্তে মানুষ নিজের সুবিধামত, স্বেচ্ছাধীন নানা নূতন প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়া সমাজ এবং ব্যক্তির কল্যাণের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবে।

কিন্তু একটি প্রশ্ন থাকিয়াই যায়; দণ্ডশক্তি প্রয়োগে সুনিপুণ সেই পার্টি যে নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ আচরণ করিবে, ইহার স্থিরতা কোথায়? রুশিয়ার বর্তমান ইতিহাসের আলোচনা করিলে এ সম্বন্ধে বিশেষ ভরসা পাওয়া যায় না। বিপ্লবের পরবর্তীকালে সেখানে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সম্পর্কে কেহ বলেন, ট্রট্স্কি ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, আবার কাহারও মতে ষ্টালিনই বিপ্লবকে পথচ্যুত করিয়াছেন। সে তর্ক ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই,

রুশদেশে পুরাতন শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করিয়া যে বীর ত্যাগী কর্মীবৃন্দ সমাজতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্তত অর্ধেকের পক্ষে পথভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব হয় নাই। আর প্রগতিশীল কর্মীবৃন্দেরই সদা জয় হইবে, ইহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? জার্মানি স্পেন প্রভৃতি দেশে তাহার ব্যতিক্রমের ইতিহাস অপরিচিত নয়।

এই সকল কারণে গান্ধীজী এমন একটি কর্মপন্থা উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করেন, যাহার মধ্যে শত্রুকে নিপীড়নশক্তির দ্বারা পরাস্ত না করিয়া মানুষ স্বীয় সত্বগুণের বলে জয়লাভ করিতে পারে। অর্থাৎ দণ্ডশক্তি এবং দণ্ডশক্তির প্রয়োগে সুনিপুণ পার্টির পরিচালনার উপরে নির্ভর না করিয়া জনসাধারণ স্বীয় সহনশক্তি, দৃঢ়তা এবং আত্ম-নিয়ন্ত্রণের উপরেই বেশি নির্ভর করিবে। বিপ্লবের সাফল্য প্রধানত এরূপ শক্তির উপরে নির্ভর করিলে সংগ্রামের অন্তে ক্ষমতাও প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের আয়ত্তে আসা সম্ভব হয়, এবং উত্তরকালে ক্ষমতার কোনও অপপ্রয়োগ হইলে জনসাধারণের পক্ষে স্বীয় অসহযোগের দ্বারা কেন্দ্রীয় কর্মচারীবৃন্দকে সংযত ও আয়ত্তাধীন রাখা সম্ভব হয়। ইহাকেই গান্ধীজী প্রকৃত স্বাধীনতা বা স্বরাজ আখ্যা দিয়াছেন।

তবে কি বুঝিতে হইবে যে, গান্ধীজী বিপ্লবের সাফল্যের জন্য নেতৃত্বে আদৌ বিশ্বাস করেন না? তাহাই যদি হয়, তবে তিনি কংগ্রেসকে এত শক্তিশালী করিতে চান কেন? কংগ্রেসের নেতৃত্ব বা নির্দেশ ভিন্ন আইন-অমান্য নিষেধ করিবারই বা অর্থ কি? সেখানে উত্তর হইল এই যে, পার্টির বা বাহিরের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ষোলো আনা স্বীকার করেন না বলিয়া এক আনাও স্বীকার করেন না, ইহা ঠিক নহে। দ্বিতীয়ত, তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী নেতৃত্বের ধরনও ভিন্ন হইবে। জনসাধারণের মধ্যে দুঃখের বোধকে জাগ্রত করিবার জন্য; পুরুষকারের দ্বারা সেই দুঃখের নিবৃত্তি ঘটিতে পারে, ইহা শিখাইবার জন্য; ধনতন্ত্রের নাগপাশকে বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা কি ভাবে শিথিল করা যায়, তাহা বুঝাইয়া উপযুক্ত সংঘশক্তি এবং লোকায়ত্ত প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য কংগ্রেসের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। শুধু তাহাই নয়; যখন আইন-অমান্যের আন্দোলন আরম্ভ হইবে, তখন জনসাধারণের পক্ষে পর পর কি কি কর্তব্যের উদয় হইবে, সে সম্বন্ধেও কংগ্রেসকর্মীগণ পূর্বাহ্নে জনসাধারণকে সঙ্কেত দিয়া রাখিবেন। এবং সকলের চেয়ে বড় কথা হইল, শাসকবৃন্দ যখন নিপীড়নের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিবে, তখন সত্বগুণের অমোঘ বর্ম পরিধান করিয়া তাঁহাদিগকেই জনসমাজের সম্মুখে 'আগে হাঁটার' দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। এই জাতীয় নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহারা শাসনের দ্বারা জনসাধারণকে পরিচালিত করিবেন না, তাহাদিগকে সুকৌশলে যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মারফৎ আত্মনিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত করিয়া তুলিবেন।

যে পার্টি হিংসার অস্ত্রের উপর নির্ভর করে, তাহাকে জনসমূহের পরিচালন-ব্যাপারেও

অন্নবিস্তর হিংসা এবং নিষ্ঠুরতার আশ্রয় লইতে হয়; ইহার দ্বারা জনসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অনেকাংশে সঙ্কুচিত হইয়া যায়। উপরন্তু পার্টির মধ্যে মতানৈক্য ঘটিলে তাহা নিরশনের জন্ম হিংসার ব্যবহারও বিচিত্র নয়; ফলে কর্মীগণের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাধারা ও বিচারশক্তি এবং কর্মপ্রবৃত্তির স্ফূর্তির পথে যথেষ্ট বাধা জন্মে। কিন্তু গান্ধীজীর বিপ্লবপন্থায় কংগ্রেসের যে নেতৃত্ব তিনি গড়িয়া তুলিতে চান, তাহা শাসনশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। অর্থাৎ কর্মীগণের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাহার নিরসন করিতে হইবে। বিরুদ্ধ মতের সঙ্গতি সম্ভব না হইলে কংগ্রেসকে সংখ্যাধিক্যের মতানুসারে চালিত করিয়া, অপরকে কংগ্রেসের বাহিরে গিয়া স্বীয় মতানুযায়ী কাজ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, তাহাকে শাসনের দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা হইবে না। জনশক্তির পরিচালনেও উপরোক্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিরই প্রয়োগ করা হইবে। এইরূপে গান্ধীজী কংগ্রেসের যে নৈতিক নেতৃত্ব বা 'ময়্যাল লীডারশিপ' গড়িয়া তুলিতে চান, তাহার দ্বারা কঠিন পার্টির একচ্ছত্র অধিনায়কত্ব অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনা যে অনেক কম, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তদুপরি দণ্ডশক্তির পরিবর্তে সহনশক্তিই যেখানে প্রধান আশ্রয়, সেখানে বিজয়লাভ ঘটিলে জনসাধারণের পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা সহজ হয় যে, প্রধানত তাহাদেরই দৃঢ়তা এবং সদ্গুণের ফলে সাফল্যলাভ ঘটিয়াছে, নেতৃস্থানীয় কর্মীবৃন্দের কোন গোপন দক্ষতার ফলে নয়। অর্থাৎ বিপ্লবে এমন কোনও শক্তির প্রয়োজন হয় নাই, যাহা তাহাদের স্বকীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির আয়ত্তের বহির্ভূত।

কার্যত উপরোক্ত বিপ্লব সফল হইতে পারে কি না, অথবা সাধারণ মানুষের পক্ষে অহিংস থাকা সম্ভব কি না, তাহা আজ আমাদের বিচার্য নহে। গান্ধীজী যে বিপ্লবপন্থার পরিকল্পনা করেন, তাহার লক্ষণ নির্দেশ করাই আমার উদ্দেশ্য। মার্ক্সীয় বিপ্লবশাস্ত্রে শুনিয়াছি এক সময়ে ধারণা ছিল যে, শিল্পে সমুন্নত দেশগুলিতে শিল্পবিস্তারের ফলে সর্বহারা প্রলেট্যারিয়েট-শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত বিপ্লবের সম্ভাবনাও ঘনায়মান হইবে। কিন্তু উত্তরকালে শাস্ত্রকারগণ নাকি বলিয়াছেন, জগৎজোড়া ধনতন্ত্রপ্রসারের ফলে যখন চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের মত গোটা দেশকে প্রলেট্যারিয়েটের অবস্থায় অবনমিত করা হয়, তাহাদের স্বাভাবিক উন্নতি রোধ করিয়া শিল্পবিদ্যায় পশ্চাৎপদ রাখা হয়, সেরূপ শোষিত কাঁচা-মাল-উৎপাদনকারী দেশেও ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযানের আরম্ভ কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। হয়তো ধনতন্ত্রের নাগপাশ সেইখানেই প্রথম ছিন্ন হইতে আরম্ভ করিবে।

গান্ধীজীর বিপ্লবপন্থায় কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য হইল, এমন এক কর্মকৌশল উদ্ভাবন করা যাহার সার্থকতা সর্বহারা প্রলেট্যারিয়েট-শ্রেণীর সংখ্যাধিক্যের উপরে নির্ভর করিবে না, কিন্তু যাহা দরিদ্র, শোষিত জনসাধারণের স্বাধীনতাস্পৃহা এবং সংকল্পের দৃঢ়তার উপরেই প্রধানত নির্ভর করিবে। গান্ধীবাদের বিচারকালে যদি আমরা তাঁহার নিকট ধ্রুবতারার

মত অচঞ্চল এই লক্ষ্যটির সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকি, তবে তিনি কেন হিংসার অস্ত্র পরিহার করেন, গোপনীয়তা সর্বতোভাবে বর্জন করিতে বলেন, উৎপাদন-ব্যবস্থা বিকেন্দ্রী-সাধনের উপদেশ দেন, ইহার সবই তখন একে একে স্পষ্ট হইয়া ওঠে ; এবং অহিংস বিপ্লবের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব এবং সহজ হয়।

বিকেন্দ্রীকরণের ফলে আত্মশক্তির বিকাশ

গান্ধীজী খাদিকে কেন্দ্রে রাখিয়া গ্রামের যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা গড়িতে চান তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি হইল, ধনতন্ত্রের চাপে সেরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যজীবন প্রতিষ্ঠিত করা আজ আর সম্ভব নয়। আর যদি বা কোন প্রকারে সম্ভবও হয় তাহা হইলে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের ফলে সমগ্র জগতে যে শিল্পোন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা হইতে মানুষকে আবার বঞ্চিত করিয়া খর্ব কৃষিপ্রধান যুগে ফিরিয়া যাইতে হয়। তাহা ছাড়া, ধনতন্ত্রের লোভনীয় আকর্ষণের নিকট ঐরূপ উৎপাদন-ব্যবস্থার পক্ষে যেমন পরাস্ত হওয়া সম্ভব, উহার সামরিক শক্তির আঘাতের সম্মুখেও তেমনই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম বা প্রদেশের পক্ষে, এমন কি কোন দেশের পক্ষেই একা আর আত্মরক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

প্রথমে উৎপাদন বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে যুক্তিবিস্তার করিয়া আমরা পরে একে একে অন্য প্রসঙ্গগুলির বিষয়ে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

দেশে এমন এক শ্রেণীর কর্মী আছেন, যাঁহারা ভারতবর্ষের গ্রামসংগঠনের জন্য বর্তমান অবস্থায় চরকাকে আশ্রয় করিতে আপত্তি করেন না ; অথচ বাস্তবিক হয়তো তাঁহারা ভবিষ্যৎ ভারতে কলকারখানার যথেষ্ট উন্নতি দেখিতে চান। এরূপ কর্মীদের মধ্যে চরকার সপক্ষে একটি যুক্তির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ভারতের পল্লী অঞ্চলে অশিক্ষিত দরিদ্র কৃষিজীবীর নিকটে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া কাজ করিতে গেলেও দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে উপযোগী কোনও অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যবস্থা উপলক্ষ্য করিয়া যাওয়া মন্দ হয় না। সে দিক দিয়া বিবেচনা করিলে চরকা ও খাদি এবং গ্রামোদ্যোগের অন্যান্য যাবতীয় চেষ্টাকে সমর্থন করা যায়। কিন্তু উপরোক্ত মনোভাববিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীগণ অনেক ক্ষেত্রে গৃহশিল্পের দ্রুত প্রসারের জন্য গ্রামের বাহির হইতে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না ; কারণ আর্থিক উন্নতিবিধানের দ্বারা বহুসংখ্যক পল্লীবাসীর মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করা তাঁহাদের একটি লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। পরে তাঁহারা সেই প্রভাব অবলম্বন করিয়া জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার এবং সংগ্রামের জন্য সংগঠনের চেষ্টাও করেন।

কিন্তু গান্ধীজী গঠনকর্মের মধ্যে এরূপ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টাকে নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন। বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ ইহা নহে যে বাহিরের লোকবল, বাহিরের

অর্থবলকে আশ্রয় করিয়া যেমন তেমন উপায়ে গ্রামদেশে অন্নবস্ত্রের একটি উৎপাদন-ব্যবস্থাকে খাড়া করা। তাহার চেয়ে বড় কথা হইল, পল্লীবাসীগণকে আলস্য এবং পরস্পরের সহিত অসহযোগের বিষক্রিয়া হইতে মুক্ত করিয়া স্বীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের আয়ত্তে অর্থনৈতিক জীবনকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রিত করিবার শিক্ষা দেওয়া। গ্রামের অন্নবস্ত্রের অভাব মিটাইবার চেষ্টায়, গ্রামের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করিয়া উন্নত জীবনব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় যে পরিবর্তন সাধিত হইবে, তাহাই গঠনকর্মীর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

যদি কংগ্রেসকর্মীগণের উৎসাহদীপ্ত, বুদ্ধিযুক্ত, অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ভারতের দরিদ্রতম পল্লীবাসী এবং অবমানিত সামাজিক শ্রেণীর জীবনে এইরূপ বিপ্লব সাধন করা সম্ভব হয়, তবে বর্তমান ধনতন্ত্রের আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য আইন-অমান্যের প্রয়োজন হইলে, যদি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া যায়, প্রাদেশিক কংগ্রেসের পক্ষেও আন্দোলনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নির্দেশ দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহা হইলে প্রধানত স্বীয় শক্তি এবং পরিচালনক্ষমতার উপরে নির্ভর করিয়া ছোট ছোট গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-গুলির পক্ষে অগ্রসর হওয়া কি সম্ভব হইবে না? হয়তো তাহারা স্বীয় বুদ্ধি ও শক্তি অনুসারে ছোটখাট আইন-অমান্য হইতে আরম্ভ করিয়া খাজনা-ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন পর্যন্ত কংগ্রেসের পূর্বপ্রদত্ত নির্দেশানুযায়ী চালাইয়া যাইতে সমর্থ হইবে।

অর্থাৎ গান্ধীজী যখন বিকেন্দ্রীকরণের উপদেশ দেন, তাহা শুধু আর্থিক জীবনে উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার জন্য নয়, বরং তাহার প্রভাব মানুষের নবলব্ধ সামাজিক শক্তি ও পরিচালন-ক্ষমতার মধ্যে স্পষ্টত ফুটিয়া উঠুক, ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। আর্থিক জীবনে যেমন গান্ধীজী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী, সত্যাগ্রহের পরিচালনাতেও তিনি তেমনই স্বাবলম্বনের পক্ষপাতী। বিভিন্ন কেন্দ্র মূলত একই নীতি-অনুযায়ী অগ্রসর হইবে বটে; কিন্তু প্রত্যেককে স্বীয় শক্তি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া চলার মাত্রা নিরূপণ করিতে হইবে। সকল নদী সমুদ্রের অভিমুখে ধাবিত হয় সত্য, কিন্তু প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে নিজের পথ রচনা করিয়া লইতে হয়। সকলেই আকাশের বারিধারার উপরে শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে, সকল কেন্দ্রকেই মূলনীতির বিষয়ে কংগ্রেসের অধীন থাকিতে হয় সত্য, কিন্তু চলার দায়িত্ব, বিভিন্ন নদীপথের মত, প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে স্থির করিয়া লইতে হয়।

বিকেন্দ্রীকরণের দ্বিতীয় যুক্তি ও যুদ্ধ এবং সত্যাগ্রহের মধ্যে ভেদ

বিপ্লবী পাঠক হয়তো বলিবেন, হিংসার যুদ্ধেও তো ক্ষেত্রবিশেষে বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষে জনসাধারণের অবস্থা বিবেচনা করিয়া হয়তো অহিংস সংগ্রামেও

এরূপ আয়োজন মন্দ নয়। কিন্তু তাহার জন্ত এত আড়ম্বর কেন? উৎপাদন-ব্যবস্থাকে পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন কি? তাহাতে সংগ্রামকে অকারণ বিলম্বিত করা হয়, এবং জনসাধারণের দৃষ্টি ও উৎসাহ একান্তভাবে সংগ্রামের দ্রুতসিদ্ধির উপরে নিবদ্ধ না থাকিয়া আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের অপ্রয়োজনীয় চেষ্টায় অরণ্যপথে দিশাহারা হইয়া পড়ে, ফলে সংগ্রামেরই ক্ষতি হয়। কয়টা খাদি-কেন্দ্র সত্যাগ্রহের ব্যাপারে অগ্রণী হইয়াছে?

উত্তরে প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, গান্ধীজী যে-ধরনের মনোভাব খাদি বা গ্রাম-উদ্যোগ প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া গড়িতে চান, বহু খাদি-কর্মীর মনে সে-সম্বন্ধে ধারণা অস্পষ্ট থাকায়, অথবা কোন ধারণা না থাকায়, তাঁহারা বাহিরের বাজার, অর্থবল, লোকবল এবং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রণের ফলে যথাযথ মনোভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন নাই। ইহা সত্য বটে; কিন্তু সম্যক উদ্দেশ্য লইয়া সম্যক চেষ্টার দ্বারা উপযুক্ত মনোভাব এবং তদনুযায়ী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায় না, এরূপ সিদ্ধান্তেরও কোন সঙ্গত কারণ নাই।

অতঃপর বিলম্বের প্রশ্ন এবং দ্রুতসিদ্ধিলাভের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। এই প্রসঙ্গে যুদ্ধ এবং সত্যাগ্রহের মধ্যে একটি গুরুতর প্রভেদের বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক।

যুদ্ধ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যতিক্রম, এ-বিষয়ে কোন মতভেদ নাই; সে যুদ্ধ জনসাধারণের মুক্তির উদ্দেশ্যেই আরম্ভ হউক, অথবা বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতার ফলেই আরব্ধ হউক। ১৯১৪ সালের যুদ্ধ চার বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল, ১৯৩৯ সালের যুদ্ধও ছয় বৎসর যাবৎ চলিল; অথচ উভয় পক্ষের চেষ্টার অন্ত ছিল না, প্রতিপক্ষের উপরে প্রচণ্ডতর আঘাত হানিয়া কত শীঘ্র যুদ্ধের অবসান ঘটানো যায়। সেইজন্ত জার্মানির শহরগুলির উপরে বোমা নিক্ষেপের সময়ে জনৈক ইংরেজ ধর্মযাজক, সাধারণ নাগরিকের হত্যাকে অনিবার্য এবং যুদ্ধের আশু সমাপ্তির প্রয়োজনে অপরিহার্য জ্ঞান করিয়া সমর্থনই করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, যুদ্ধ এই উপায়ে শীঘ্র শেষ হইলে, চক্রশক্তিবৃন্দ পরাস্ত হইলে, জগতে লোকক্ষয় মোটের উপরে কম হইবে। সেই কারণেই চার্চিল সাহেব যখন জার্মান জাতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'We shall bleed and burn them to death', তখন শান্তিকামী, শিক্ষিত জনসাধারণ যুদ্ধের হত্যাকাণ্ডকে মানবের বৃহত্তর কল্যাণের জন্ত অনিবার্য ভাবিয়া চার্চিলের কথায় অন্তরে অন্তরে সায় দিয়াছিল।

মার্ক্সবাদীগণের কর্মধারা অনুধাবন করিলেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তাঁহারা মানবসমাজের কল্যাণকামী; জগতে শোষণের অবসান ঘটিয়া সর্বত্র শান্তি বিরাজ করুক ইহাই তাঁহাদের কাম্য। কিন্তু সেই শান্তি দ্রুত আনয়নের চেষ্টায় তাঁহারা যুদ্ধে নিরঙ্কুশ

নিষ্ঠুরতা সমর্থন করিয়া থাকেন। যেদিন বার্লিন শহর রুশ-সৈন্যের আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়, সেই দিবসকে তো তাঁহারা মানবজাতির মুক্তির এক সন্ধিক্ষণ বলিয়াই অভিনন্দিত করিয়াছেন।

মানবজাতির যুগযুগান্তব্যাপী শোষণের অবসানচেষ্টায় অর্থ বোঝা যায়। তাহার জন্য অসহিষ্ণুতা একান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সর্বত্র যুদ্ধের দ্রুত পরিসমাপ্তি ঘটাইবার জন্য যে ব্যস্ততা দেখা যায়, তাহার পিছনে আরও একটি ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে।

মানুষ যখন কোনও প্রয়োজনের বশে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন সেই সংহারলীলায় উভয়পক্ষের উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের স্বাভাবিক জীবন সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইয়া যায়। অথচ সামাজিক বিবাদ নিষ্পত্তির যদি অপর কোন উপায় জানা না থাকে, বাধ্য হইয়া উভয় পক্ষকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয়, তখন প্রত্যেকে চেষ্টা করে, কত দ্রুত এই অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, অথচ শত্রুর পরাভবের ফলে নিজের সুবিধামত এক নিষ্পত্তিতে পৌঁছানো যায়। সেই আশাতেই মানুষ যুদ্ধে উত্তরোত্তর নিষ্ঠুর হইতেছে, এবং বিজ্ঞানের সকল সম্পদ সংহারলীলাকে প্রচণ্ডতম করিবার জন্য নিয়োজিত করিতেছে ; শুধু এই আশায় যে, মারণাস্ত্র যত ব্যাপক ফলপ্রদ এবং অমোঘ হইবে, যুদ্ধের ব্যাপ্তিকালকেও তত সংক্ষিপ্ত করা সম্ভব হইবে।

কিন্তু গান্ধীজীর মতে উপরোক্ত পন্থায় জগতের সাধারণ মানুষ কোনদিনই মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে সক্ষম হইবে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মারণাস্ত্রের অধিকার এবং দক্ষ প্রয়োগের উপরেই যদি সামাজিক শক্তি নির্ভর করে, তবে সাধারণ নরনারীর পক্ষে সে পথে মুক্তিলাভ করা কি কোনদিন সম্ভব? দ্রুত বিজয়লাভের জন্য মানবসমাজে যে সকল অস্ত্র নির্মিত হইয়াছে, তাহার ফলে ক্ষমতা উত্তরোত্তর সাধারণ মানুষের অধিকার হইতে দূরে সরিয়া যায়, সে খেলায় কোটি কোটি মানুষ দাবার বোড়ে অপেক্ষা উন্নত স্থান কখনও লাভ করিতে পারে না। অতএব দ্রুতসিদ্ধির লোভ মানুষকে পরিহার করিতে হইবে। সংগ্রামের ধরনও এমন হওয়া আবশ্যক যাহা স্বাভাবিক জীবনের ব্যতিক্রম না হয়, কোটি কোটি জনসাধারণের জীবন যে উৎপাদন-ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করে, তাহাকে যেন বিপর্যস্ত করিতে না পারে।

সেইজন্য গান্ধীজী যখন সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের কল্পনা করেন, তাহার পূর্বে উৎপাদন-প্রণালীর বিকেন্দ্রীসাধনের দ্বারা তিনি এমনই লোকায়ত্ত এক জীবনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, যাহার সহিত সত্যাগ্রহযুদ্ধের কোনও অসামঞ্জস্য নাই। সেই লোকায়ত্ত উৎপাদনব্যবস্থাকে সর্বাবস্থায় সক্রিয় রাখার চেষ্টা এবং ধনতন্ত্রের নাগপাশ হইতে সংগ্রামের দ্বারা মুক্ত হইবার চেষ্টা, ভিন্ন ব্যাপার নয় ; উভয়েই এক। অর্থাৎ সত্যাগ্রহের মধ্যে আইন-অমান্য, এবং গঠনকর্মের দ্বারা জীবনে নববিধান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, দুইটিই একমুখী

হওয়ার ফলে অহিংস বিপ্লব কোন অবস্থাতেই স্বাভাবিক জীবনের ব্যতিক্রম হয় না; অতএব তাহার দ্রুতনিষ্পত্তিরও কোন প্রয়োজন থাকে না।

গঠনকর্ম এবং আইন-অমান্য বা শান্ত প্রতিরোধকে মুদ্রার এপিঠ ওপিঠের মত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সম্পর্কিত মনে করা যায়; দুইয়ের মধ্যে কোনও ব্যবধান পর্যন্ত নাই। দেশের কোটি কোটি জনসাধারণ যদি নবজীবন লাভের জন্য গঠনকর্ম আশ্রয় করে, তাহাকেই গান্ধীজী বর্তমান শোষণমূলক কলুষিত জীবনপদ্ধতির সঙ্গে শ্রেষ্ঠতম অসহযোগ বলিয়া বিবেচনা করিবেন। আর কোটি কোটি জনসাধারণের মধ্যে যদি গঠনকর্মের সম্পর্কে উৎসাহ উৎপন্ন করা না যায়, তাহারা যদি আলস্যে ডুবিয়া থাকে, তবে ক্ষণিকের উৎসাহে শুধু আইন-অমান্যের অস্ত্রাঘাতের দ্বারা ধনতন্ত্রের উচ্ছেদসাধনের চেষ্টাকে গান্ধীজী স্বরাজ লাভের উপায় বলিয়া কদাপি স্বীকার করিবেন না। গান্ধীজী আরও বলিয়াছেন যে, পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত দিয়া যেমন অন্নের গ্রাস মুখে তোলা যায় না, গঠনকর্ম ব্যতিরেকে আইন-অমান্যের দ্বারাও তেমনই স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টাকে অহিংস উপায়ে অসাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম অহিংস জীবনপদ্ধতির ব্যতিক্রম না হওয়ায় সত্যাগ্রহীর পক্ষে ব্যস্ততার কোনও কারণ থাকে না; গঠনকর্মের পরিবর্তে আইন-অমান্যকে স্বরাজ লাভের জন্য মুখ্য সাধন বলিয়া বিবেচনা করারও কোন অর্থ হয় না। যথার্থ বিপ্লব গঠনকর্মের পথেই আসিবে, তাহার বাধা নিরাকরণের জন্য কেবল যতটুকু সংগ্রাম বা আইন-অমান্যের প্রয়োজন। আর যদি এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায়, তবে সত্যাগ্রহীর পক্ষে সমগ্র জীবনব্যাপী চেষ্টাই তো বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়, তাহার মধ্যে ব্যস্ততা ও অসহিষ্ণুতার কোন স্থানই থাকে না।

যুদ্ধ এবং সত্যাগ্রহের ভেদ : অহিংস সংগ্রাম বিলম্বিত হইবার অপর কারণ

পাঠক হয়তো বলিবেন, অহিংসার পথে দীর্ঘব্যাপী সাধনা যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন অন্য উপায়ের সন্ধানও তো করা যাইতে পারে। সাধারণ মানুষের বিপ্লবেচ্ছা কখনও বহুদিন ধরিয়া তীব্র আকার ধারণ করিয়া থাকে না। অতএব হিংসার অস্ত্র প্রয়োগ করিলে যদি দ্রুত কার্যসিদ্ধি হয়, তবে হিংসার অসুবিধাগুলি সাময়িকভাবে স্বীকার করিয়া লইতে দোষ কি? হিংসার আনুষঙ্গিক দোষগুলি যথাসম্ভব পরিহার করিবার চেষ্টাও তো করা যাইতে পারে।

কিন্তু হিংসার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর যেমন এক আপত্তি, ইহা ধ্বংসমূলক ও অস্বাভাবিক এবং দ্বিতীয় আপত্তি, ইহার ফলে ক্ষমতা জনসমূহের আয়ত্তে যায় না, তেমনই তৃতীয়

একটি গুরুতর আপত্তির কথাও তিনি উত্থাপন করিয়াছেন, যাহা হইতে হিংসার অস্ত্রকে মুক্ত করিবার কোন উপায় আছে বলিয়া আদৌ মনে হয় না। সেইজন্য হিংসার অস্ত্রকে তিনি সর্বতোভাবে পরিহার্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

হিংসার অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া যখন আমরা শোষণমূলক উৎপাদন-ব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করিতে চাই, দণ্ডের দ্বারা প্রতিবিপ্লবকে নির্মূল করিয়া নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করি, তখন বিরুদ্ধ শক্তি আমাদের আঘাতের ফলে উত্তরোত্তর প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে। বর্তমান শোষকশ্রেণীকে কোনদিনই সবংশে হত্যা করিয়া নির্মূল করা সম্ভব নয়; অতএব ভয়ের বশে তাহাদের প্রতিবিপ্লবী বুদ্ধিকে সঙ্কুচিত রাখাই আমাদের লক্ষ্য হয়; তাহারা যেন পুনরায় সংঘবদ্ধ হইতে না পারে, সেজন্য সতর্কভাবে বহুবিধ আয়োজন বজায় রাখিতে হয়।

কিন্তু বর্তমান শোষণব্যবস্থার জন্য শুধু শাসক-সম্প্রদায়কে দায়ী করা কি ঠিক কাজ? তাহাদের সহিত শোষিত শ্রেণীও, স্বেচ্ছায় হউক অথবা অনিচ্ছায় হউক, সহযোগিতা করে বলিয়াই যে বর্তমান শোষণপদ্ধতি কায়েম হইয়া রহিয়াছে, এ বিষয়ে কি কোনও সন্দেহের কারণ আছে? সে সহযোগিতা দারিদ্র্যের বশে, ভয়ে বা লোভের বশে দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু তবু ধনতন্ত্রের স্থিতি যে ইহারই উপরে নির্ভর করিতেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমান শোষণযন্ত্রের অধিকারীগণ যে পরিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াছে তাহারই প্রভাবে তাহাদের স্বার্থবোধ, ক্ষমতালিপ্সা এবং নিষ্ঠুরতা নিরঙ্কুশভাবে বৃদ্ধির সুযোগলাভ করিয়া অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে; সে পরিবেশ তো আমাদের তামসিকতার দ্বারাই রচিত হইয়াছে। অতএব আমরা যদি অন্তরের তামসিকতা হইতে মুক্ত হই, স্বীয় পরিশ্রম এবং লোভহীন, অনলস চেষ্টার দ্বারা নূতন উৎপাদন-প্রণালী ও নূতন সমাজব্যবস্থা গড়িতে পারি, পুরাতন শোষণব্যবস্থার সঙ্গে নির্ভয়ে সহযোগ ছিন্ন করি, তবে সেই নূতন মানসিক পরিবেশের প্রভাবে আজিকার শোষক-সম্প্রদায়ের অন্তরেও দ্রুত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইবে।

মার্ক্সীয় বিপ্লবপন্থায় শাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম পরিবর্তন ভয়ের বশে করার বিধি আছে। পরে যদি শোষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু লোক নূতন সমাজে মানাইয়া চলিতে চায়, তবে তাহাকে পূর্ণ সুযোগ দিবার কথা আছে। কিন্তু অহিংস-পন্থার বিশেষত্ব হইল ইহা শাসক এবং শোষককে ভয়ে পঙ্গু করিতে চায় না, অহিংস অসহযোগের দ্বারা তাহার হৃদয়ে মনুষ্যত্বের ভাবকে জাগ্রত করিতে চায় এবং নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সমাজ-সৃজনের ব্যাপারে তাহার পূর্ণ ও সানন্দ সহযোগিতালাভের আশা পোষণ করে। এমন কি পুরাতন উৎপাদন-ব্যবস্থা ভাঙিবার ব্যাপারে পর্যন্ত তাহাদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করে।

তথাকথিত শত্রুর অন্তরে উপযুক্ত পরিবর্তন-সাধনের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ-সংগ্রামকে বিলম্বিত করিতেও গান্ধীজীর কোন কুণ্ঠা নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'আপাতত সত্যাগ্রহের পথ দীর্ঘ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা দ্রুত পথ আর নাই। কারণ এ পথে সাফল্যলাভের বিষয়ে কোনও সংশয় নাই; অপর সকল পথে কবে যে সাফল্যলাভ ঘটিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না।'

মৌলিক প্রশ্নের সম্বন্ধে আলোচনা

সহানুভূতিসম্পন্ন পাঠক হয়তো বলিতে পারেন, আচ্ছা, তর্কের খাতিরে না হয় স্বীকার করিলাম, অহিংস-সংগ্রামের প্রয়োজনে বিকেন্দ্রীকরণ অত্যাবশ্যক। ভারতবর্ষে আজ হিংসাত্মক সংগ্রামের জন্য সংগঠন সম্ভব নয় বলিয়াই হউক অথবা অহিংস-উপায়ের দ্বারা উৎকৃষ্টতর ফললাভের আশা আছে বলিয়াই হউক, আমরা আজ কংগ্রেস হইতে সাময়িক-ভাবে অহিংস-পন্থাকেই স্বরাজলাভের উপায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু যখন ভারত স্বাধীন হইবে, তখন যুদ্ধের চাপে বিকেন্দ্রীকরণের যে ভারা বাঁধা হইয়াছে, বাড়ি তৈয়ারি শেষ হইলেও কি সেই ভারা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে? বস্তুত শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ মূলত এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এবার সেই প্রশ্নের সম্বন্ধে যথাসাধ্য উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

শুধু গান্ধীজীর মত নৈরাজ্যবাদী কেন, মার্ক্সবাদী সমাজ-বৈজ্ঞানিকমাত্রে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, রাষ্ট্রের মূল দণ্ডশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দণ্ডের দ্বারা মানুষকে চিরকাল পরিচালিত করা কাহারও কাম্য হইতে পারে না। মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ স্বাধীনতার সূর্যালোকেই সম্ভব, শাসনের অন্ধকার মেঘচ্ছায়ায় কখনও সম্ভব নয়। সেই-জন্য মানবসমাজের পূর্ণ কল্যাণ যাঁহাদের কাম্য তাঁহারা এমন এক অবস্থা আনয়নের চেষ্টা করেন, যেখানে দণ্ডমূলক ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠানের যথাসম্ভব সঙ্কোচসাধন করিয়া, স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সামাজিক জীবন পরিচালিত হইবে।

সেইরূপ অবস্থায় পৌঁছিবার পূর্বে মার্ক্সীয় বিপ্লবচেষ্টায় একটি বিশেষ লক্ষ্য সাময়িক-ভাবে দেখা দেয়। বর্তমান কালে সমাজ-জীবনে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে যাহার ফলে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি যে সকল ভাবের অঙ্কুর প্রত্যেক মানবশিশুর মধ্যে অল্পাধিক মাত্রায় বর্ত্তমান, সেগুলি শ্রেণীবিশেষের মধ্যে অস্বাভাবিক বৃদ্ধির সুযোগ পাইয়া এমন আকার ধারণ করে যে, সমগ্র মানবজাতির জীবনপথ তাহার দ্বারা বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব মার্ক্সীয় মতে প্রথম প্রয়োজন হইল, সমাজের দণ্ড বা রাষ্ট্রশক্তি করতলগত করিয়া শোষণমূলক সকল প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদসাধন করা এবং

প্রতিবিপ্লবের সকল সম্ভাবনাকে নির্মূল করা। তখনই শুধু শোষণবিহীন সমাজরচনার পথ নিরঙ্কুশ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য, বাহিরে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আক্রমণ ও ভিতরে প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনার মধ্যে, রাষ্ট্রের হাতে প্রজার জীবনের উপরে সর্বময় কর্তৃত্বের ভার তুলিয়া দেওয়া উচিত। তখন কি সমাজে, কি উৎপাদন-বৃত্তিতে, এমন কি হয়তো চিন্তার উপরেও নানাবিধ বাঁধন দিতে হয়। কিন্তু যখন বাহিরে ও ভিতরে দুর্যোগ কাটিয়া যায়, সকল দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে সর্বত্র সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে, তখন আর দণ্ডমূলক রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকে না। ক্রমে ক্রমে তাহার কার্যভার দণ্ডের পরিবর্তে সম্মতিমূলক প্রতিষ্ঠানের উপরে অর্পিত হয়, রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ ক্ষয় সম্পন্ন হয়। কিন্তু যতদিন বিপদের সম্ভাবনা থাকে, ততদিন রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং সে রাষ্ট্র উৎপাদকশ্রেণীর স্বার্থপুষ্টির জন্য প্রজার জীবনের উপরে সর্বময় কর্তৃত্বের ভার লইতেও পশ্চাৎপদ হয় না।

গান্ধীজী কিন্তু রাষ্ট্রকে কোন সময়েই এরূপ সর্বময় কর্তৃত্ব দিবার পক্ষপাতী নহেন। জনসমূহের সত্যাগ্রহের ফলে ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয়, তখন ভিতরের ও বাহিরের বাধা অতিক্রম করিবার দায়িত্ব তিনি কেবল রাষ্ট্রের উপরেই অর্পণ করিতে চান না। বরং জাগ্রত জনসাধারণ স্বীয় গণতান্ত্রিক নানাবিধ প্রতিষ্ঠানকে সত্যাগ্রহশক্তির দ্বারা রক্ষা করুক, ইহাই তিনি বেশি করিয়া চাহিবেন।

পাঠক বলিবেন, স্বাধীন ভারতেও তবে কি রাষ্ট্রশক্তি যথাসম্ভব কম প্রয়োগ করা হইবে? অর্থাৎ যতদিন নূতন সমাজরচনার পথে বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা আছে, ততদিন অসহযোগের আয়োজন এবং বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাকেও চিরস্থায়ী করিয়া রাখিতে হইবে? তবে তো রোগের সমূল বিনাশের ফলে স্বাস্থ্যলাভের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। মানুষকে চিরদিনই কলকারখানা এবং শিল্পে বৈজ্ঞানিক উন্নতি পরিহার করিয়া স্বাধীনভাবে ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামে বাস করিতে হইবে। এ উপায়ে, সুখের পরিবর্তে স্বাধীনতালাভ ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু মার্ক্সীয় কর্মপন্থায় একত্র সুখ এবং স্বাধীনতার যে সমাবেশের সম্ভাবনা আছে, গান্ধীজীর পন্থায় তাহা তো কখনও সম্ভব নহে।

উত্তরে বলিব, গান্ধীজীর পথেও তাহা অনেকদূর পর্যন্ত সম্ভব। কিন্তু কতদূর সম্ভব তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন আছে। গান্ধীজী মনে করেন, জনসাধারণ বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা যে লোকায়ত্ত উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবে তাহার এক উদ্দেশ্য হইবে, কোন অবস্থাতেই যেন তাহাদিগকে অন্নবস্ত্রের অভাবে ক্লেশ পাইতে না হয়। কোন লোভের বশেই যেন তাহারা জীবনের মরণকাঠি জীয়নকাঠি পরহস্তে তুলিয়া না দেয়। কিন্তু এরূপ উৎপাদন-ব্যবস্থার ফলে শক্তির অপচয় ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।

শ্রম-লাঘবের উদ্দেশ্যে এবং সমাজের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করার জন্ম ছোট ছোট কেন্দ্রগুলি প্রয়োজনানুসারে সমবেত হইয়া বড় কলকারখানাও চালাইতে পারে। সে কারখানাগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হইয়া বিভিন্ন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত হইবে। যদি স্বাধীন কেন্দ্রগুলির সমবায়মূলক বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠানেও পরিণত হয়, তাহাতে গান্ধীজীর আপত্তি নাই। প্রতিষ্ঠানের অবয়ব ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, তাহাতে তিনি বিশেষ বিচলিত হন না; তাহার মূল দণ্ড অথবা স্বাধীন সম্মতির উপরে নির্ভর করে কি না ইহার উপরেই তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কেহ যদি বলেন, 'বেশ তো, দেশসুদ্ধ লোক যদি রাষ্ট্রেরই হাতে স্বেচ্ছায় সে ভার তুলিয়া দেয় তবে দোষ কি?' গান্ধীজী বলিবেন, 'দোষ কিছু নাই।' কিন্তু তখন আসলে রাষ্ট্র আর দণ্ডশক্তির আধার না হইয়া স্বেচ্ছায় গড়া প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইবে, তখন কি আর তাহাকে রাষ্ট্র নাম দেওয়া যায়?

অর্থাৎ স্বেচ্ছায় কেন্দ্রীকরণে গান্ধীজীর আপত্তি নাই, বাধ্যতামূলক, দণ্ডাধীন কেন্দ্রীকরণে তাঁহার আপত্তি। যদি আমরা এইটুকু মনে রাখি তবে বুঝিতে পারিব, ভবিষ্যৎ সমাজে উৎপাদন-ব্যবস্থাতেই হউক অথবা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ব্যবস্থাতেই হউক, কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কম বেশি হইতে পারে। কেবল, মার্ক্সীয় কর্মধারায় দণ্ডশক্তিমূলক রাষ্ট্রের যে সর্বময় কর্তৃত্ব সাময়িক প্রয়োজনে অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, গান্ধীজী কোন অবস্থাতেই সে-জাতীয় দণ্ডশক্তির কেন্দ্রীকরণে সম্মতি দিবেন না। বিপ্লবের পরে নহে, বিপ্লবের সম্পাদনকাল হইতেই তিনি লোকায়ত্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপরে মানুষের জীবন-পরিচালনার সমধিক ভার অর্পণ করিয়া রাষ্ট্রের বা দণ্ডশক্তির ক্ষয়সাধনের ব্যবস্থা করেন। এইখানেই মার্ক্স এবং গান্ধীর কর্মপন্থার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যবধান দেখা যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীকরণ শুধু বিপথগামী রাষ্ট্রের শাসন হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, মানুষের পূর্ণতর বিকাশের জন্যও প্রয়োজন হইতে পারে। গান্ধীর সহিত নৈরাজ্যবাদী ক্রোপটকিন বা থোরো ও টলষ্টয়ের এইখানেই মিল সর্বাপেক্ষা বেশি। তবে টলষ্টয় যেমন রাষ্ট্রকে আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না, গান্ধী ঠিক সেরূপ মত পোষণ করেন না। তিনি নিজেকে 'practical idealist' বা আদর্শবাদী হইলেও বাস্তবধর্মী বলিয়া বিবেচনা করেন। সেইজন্য তাঁহার প্রস্তাবিত সমাজে রাষ্ট্র বর্তমান থাকিলেও ভারকেন্দ্র নীচের দিকে প্রতিষ্ঠিত। থোরোর সহিত সহমত হইয়া সেইজন্য তিনি বলেন, 'সেই রাষ্ট্রই ভাল, যাহার শাসনের দায়িত্ব কম।' আমরা দেখিয়াছি, কেন্দ্রীকরণ আবশ্যক হইলে তিনি তাহা স্বাধীনভাবে প্রদত্ত সম্মতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। এবং সেই স্বাধীনতার

ভার অনির্বাণ রাখিবার জন্য অন্নবস্ত্র এবং জীবনের পরিচালনায় অনেকখানি ভার তিনি বিকেন্দ্রীকৃত অসংখ্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উপরে ন্যস্ত রাখিতে চান। অহিংস বিপ্লব যে নেতিমূলক নহে, তাহা মুখ্যত গঠনপদ্ধতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির উপরেই নির্ভর করে, এই মৌলিক তত্ত্বটি আবিষ্কার করিয়া গান্ধীজী অহিংসাকে ভাবরাজ্য হইতে নামাইয়া মাটির রাজ্যে, মানবসমাজের দৈনন্দিন জীবনে. ইহলোকের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য, তাহার আসন রচনা করিয়াছেন। ইহাই বর্তমান জগতে গান্ধীজীর শ্রেষ্ঠতম দান।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, মনুষ্যত্ববিকাশের বহুবিধ সুযোগ ও সুবিধা দিবার জন্য না হয় গান্ধীজীর অহিংস সমাজ গড়িয়া তোলা হইল। কিন্তু ধনতন্ত্র বা হিংসার পুষ্ট এবং নিপীড়নের প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন-গোষ্ঠীর আক্রমণের সম্মুখে কি এরূপ অহিংস খণ্ডীকৃত সমাজব্যবস্থা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? আত্মরক্ষার জন্য তো দণ্ডাধীন কেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন আছে। গান্ধীজী ইহার উত্তরে পুনরায় বলিবেন, অহিংস-সমাজব্যবস্থাকে সর্ববিধ আক্রমণের বিরুদ্ধে অহিংসার দ্বারাই আত্মরক্ষা করিতে হইবে। মরণের বীর্যের দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না—এই আশঙ্কাতেই মানুষ নিজের মত আরও কয়েকজনের সহিত সম্মিলিত হইয়া শত্রুর নিপাতসাধনের দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। এই তামসিক বুদ্ধিকে আশ্রয় করে বলিয়াই মানবসমাজ আজ পর্যন্ত মুক্তির আশ্বাস পায় নাই। সেই তামসিকতার প্রভাবে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনে, দল বাঁধিয়া মানুষ স্বীয় ঐক্যকে বারংবার পরাস্ত করিয়াছে। ধনী-নির্ধন, এক দেশ- অন্য দেশ, স্ত্রী-পুরুষ, শত্রু-মিত্র প্রভৃতির মধ্যে অধিকারের তারতম্য স্থাপন করিয়া মানুষ স্বীয় বুদ্ধির দোষে, অর্থাৎ নিজের কর্মফলের দ্বারা, নিজের দেহকে খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়াছে। স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রামের মধ্যে তাহারই মত একজন মানুষকে শত্রু ভাবিয়া সংহারের চেষ্টা করিয়াছে।

এই অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে মানুষ নিজেই যে আশু মুক্তি চায় তাহার প্রমাণ, যুদ্ধকে সে যথাসম্ভব সংকীর্ণ করিতে চায়; যুদ্ধের সময়ে যে বিদ্বেষবিষ উদ্গারিত হয় তাহার ফলে মানুষের অন্তর ক্লিষ্ট হয় বলিয়াই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিলে, জয়ই হউক অথবা পরাজয়ই হউক, মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু অন্তরের ভয় যদি বিদূরিত হয়, আত্মবলে প্রতিষ্ঠার দ্বারা নিঃশঙ্কভাব লাভ করা যায়, তখন মানুষ সর্বমানবের একত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। তখন আর কাহারও বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজন থাকে না, কেন না বিরুদ্ধ তখন আর কেহ নাই। যে ব্যক্তি তামসিক বুদ্ধিবশত সেই একত্বকে খণ্ডিত করে, সত্যাগ্রহী তাহার হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্য শান্তপ্রতিরোধ করেন, নিপীড়নের বা শাসনের, অর্থাৎ ভেদের অস্ত্র কখনও ধারণ করেন না। ইহাই সত্যাগ্রহীর পক্ষে আত্মরক্ষার সর্বোত্তম উপায়; সে অবস্থায় মানবসমগ্রের সহিত তিনি একাত্ম হইয়াছেন। এই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে, সেরূপ সত্যাগ্রহীর

প্রভাবে একত্বের বুদ্ধি ক্রমশ মানবসমাজে বিকীর্ণ হইলে, মানুষ যথার্থ মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে। একত্বের সত্যকে উপলব্ধি ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গান্ধীজী অহিংসাকে তপস্যা বা সাধনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

শেষ কথা

শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ স্বীয় প্রবন্ধে যে সকল প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছেন, অহিংস মতবাদের পক্ষ হইতে যথাসাধ্য তাহার মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুইটি ক্ষুদ্র প্রশ্ন তিনি প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করিয়াছেন, সর্বশেষে তাহার সম্পর্কে কিছু বিচার অবশিষ্ট আছে।

আজ ভারতের জাতীয় সংগ্রামের প্রয়োজনে ধনীদিগকে মনে করিতে হইবে যে, তাহার নিকট যে ধন আছে তাহা বস্তুত জাতির সম্পত্তি এবং সেই বস্তু উপনিধি স্বরূপ সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য শুধু তাহার কাছে ন্যস্ত আছে। গান্ধীজী বারংবার ধনীকে এই আদর্শ স্বীকার করিবার জন্য মিনতি জানাইতেছেন। তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, শ্রমিককুল অহিংস-অসহযোগের দ্বারা ধনীকে উপনিধিত্বের আদর্শে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবে, এবং সেই বিদ্যা বা সত্যাগ্রহের কৌশল নিপীড়িত জনসাধারণকে শেখানোই তাঁহার জীবনের ব্রত। ধনীকে ভয়ে পঙ্গু করিয়া নয়, শান্ত প্রতিরোধের দ্বারা তাহার শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া কল্যাণের পথে হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করাই নিপীড়িতের লক্ষ্য হইবে।

গান্ধীজীকে এক সময়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, যদি চেষ্টা সত্ত্বেও ধনী উপনিধিত্বের আদর্শ স্বীকার না করে, তখন কি তাহাকে উত্তরাধিকারীসূত্রে লব্ধ সম্পদ নিজের খেয়াল-মত অপব্যয় করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইবে; অথবা রাষ্ট্রীয় আইনের সহায়তায় সেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে? গান্ধীজী উত্তরে বলেন, কল্পিত অবস্থায় রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দণ্ডশক্তি প্রয়োগ না করিয়া সম্পত্তি অধিকার করায় দোষ নাই। কিন্তু যদি লোকটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, অথবা শোষিতের অহিংস অসহযোগের প্রভাবে, উক্ত আদর্শ গ্রহণ করিত, তবে তিনি বেশি খুশি হইতেন।

এখন প্রশ্ন হইল, ধনী বা মালিক জনসমূহের কল্যাণার্থে উপনিধিবাদ স্বীকার না করিলে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োগের দ্বারা তাহার সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার ব্যবস্থাই যদি থাকে, তবে গান্ধীজীর উপনিধিবাদের আদর্শকে শুধু ভারতের জাতীয় আন্দোলনে সকল শ্রেণীকে সংগ্রহ করিবার কৌশলমাত্র মনে করা কি ভুল হইবে? ধনীকে আশ্বাস দিয়া তিনি কি শুধু সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধি করিতেছেন না?

গান্ধীজী কিন্তু আদৌ তাহা স্বীকার করেন না। তিনি আর্থিক-সমতাসম্পন্ন নূতন যে সমাজ রচনা করিতে চান, সেখানে সকলে স্বেচ্ছায় স্বীয় সম্পদ সর্বজনের কল্যাণে

নিয়োজিত করুক, ইহাই তাঁহার আদর্শ। আজ যদি সমাজের অব্যবস্থার ফলে উৎপাদনের জন্ত প্রয়োজনীয় নানাবিধ উপকরণ কাহারও ব্যক্তিগত অধিকারে থাকে, এমন কি কাহারও যদি বিশেষ কোনও বিদ্যা থাকে, বা শিল্পে বা সমাজের লোকপরিচালনায় ব্যক্তিগত দক্ষতা থাকে, তবে প্রত্যেকে সেই গুণ বা ক্ষমতাকে সকলের প্রয়োজনে ব্যবহার করুক—ইহাই গান্ধীজী চান। প্রত্যেকের মনে করা উচিত, 'আমার যে সম্পদ আছে, তাহা ঘটনাচক্রে আমার নিকট উপনিধির মত সংগৃহীত হইয়াছে ; ইহার আসল মালিক সমাজ ; কেন না, বহুজনের ও দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফলেই ইহা বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, আমার ব্যক্তিগত দান সে তুলনায় যৎসামান্য। সে দানও আমি, সমাজের আশ্রয়ে বাঁচিয়া না থাকিলে, করিতে অসমর্থ হইতাম। অতএব বিদ্যাই হউক, দক্ষতাই হউক, অর্থসম্পদই হউক, সমাজের নিজস্ব কোন না কোন সম্পত্তি আমার নিকটে শুধু গচ্ছিত আছে। সেটিকে জনসাধারণের প্রয়োজনে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করিবার জন্ত আমি দায়ী।' এই বোধের জাগরণই উপনিধিবাদের মর্মকথা। অতএব গান্ধীজীর আদর্শমত অহিংস সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাঁহার উপনিধিবাদের অবসান না ঘটিয়া বরং তাহা পূর্ণতর ও স্পষ্টতররূপে দেখা দিবে।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থাকিয়া যায়, সঞ্চিত অর্থ বা উৎপাদনের উপকরণাদির উপরে ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব অবস্থাবিশেষে লোপ করায় যখন গান্ধীজীর সম্মতি আছে, তখন স্বেচ্ছাধীন উপনিধিবাদের কি আর কিছু অবশিষ্ট থাকে ? ক্রমে ক্রমে তো সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তি সাধারণসম্পত্তিতে পরিণত হইবে।

ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজী সন্তানের দায়াধিকারে বিশ্বাস করেন না। পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অর্থসম্পত্তি ভোগের ব্যবস্থার ফলে সমাজ দুই দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় : যে সম্পদ আসলে সমাজের সম্পত্তি তাহা হইতে সমাজ বঞ্চিত হয়, উপরন্তু বাল্যকাল হইতে ভোগের মধ্যে লালিতপালিত হওয়ার ফলে ধনীসন্তানের মধ্যে যদি বিশেষ কোন গুণ বর্তমান থাকে তাহাও চর্চার অভাবে বিকাশ পায় না, অতএব সেই সম্পদ হইতেও সমাজ বঞ্চিত হয়।

তাহা সত্ত্বেও মানবপ্রকৃতির বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া গান্ধীজী বলেন, 'যদি কোন লোক যথার্থই উপনিধিবাদ স্বীকার করে, এবং সমাজকে সেই নিধির প্রকৃত মালিক বলিয়া মানে, তবে আমি তাহার পরিচালনাধীনে ধনসম্পদ ছাড়িয়া রাখিতে প্রস্তুত আছি। এমন কি তাহাকে বলিব, পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার পর তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া তোমার যদি মনে হয়, সেও সমাজের কল্যাণে সেই ধন ব্যবহার করিবে, তবে তাহারই জিম্মায় ধনসম্পদ রাখিয়া যাইও। অন্যথা অর্থসম্পত্তি সাধারণ-ভাণ্ডারে পরিণত করিও।' অর্থাৎ, সমাজে যদি জাগ্রত জনশক্তি বর্তমান থাকে, তবে তাহার ছায়াতলে ভোগের নিমিত্ত ব্যক্তিবিশেষকে উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিবার স্বাধীনতা পর্যন্ত

দিতে গান্ধীজী স্বীকৃত আছেন। কিন্তু মানুষ সে অধিকার না চাহিয়া একান্তভাবে নিজের সকল গুণ এবং ক্ষমতা সমাজের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করুক, পুত্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহাকে সমগ্রের কল্যাণার্থে নিবেদন করুক, ব্যক্তিগত সম্পত্তি মিটিয়া যাক, ইহাই হইল গান্ধীজীর অপ্রতিগ্রহের চরম আদর্শ।

সাম্যবাদীগণও অপ্রতিগ্রহের আদর্শই প্রতিষ্ঠা করিতে চান। কেবল তাঁহাদের পথ স্বতন্ত্র। মানুষের বা ব্যক্তিবিশেষের উপর দায়িত্ব না রাখিয়া প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থান্তরের দ্বারা তাঁহারা সকলের কল্যাণের পরিবেশ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। তবে তাঁহারা যে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন, এরূপ মনে করিবার হেতু নাই, কেবল মানুষের উপরে তাঁহাদের ভরসা কম।

মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান, উভয়ের উপরে বিশ্বাস কমবেশি-মাত্রায় গান্ধীজী এবং সাম্য-বাদীদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সেই মাত্রার তারতম্য এত অধিক যে, সাম্যবাদ হইতে গান্ধীজীর অহিংস মতবাদকে প্রায় একটি পৃথক মত বলিয়া বর্ণনা করা যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির মারফত ভারতের আর্থিক জীবনের যে পরিকল্পনা দিয়াছেন, তাহা কি গান্ধী-প্রদর্শিত গঠনকর্ম অপেক্ষা উন্নত, সময়োপযোগী, স্বাধীন ভারতের পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা নহে? আমরা কি সংস্কারের বশেই ভবিষ্যতের জন্যও বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থাকে বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছি না?

পণ্ডিত জওহরলাল ভারতবর্ষের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীনে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের সহিত দেশের বেকার-সমস্যাকে সর্বতোভাবে দূর করিবার জন্য কুটিরশিল্পেরও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু সে ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় যন্ত্রশিল্পের স্থান মুখ্য এবং কুটিরশিল্পের স্থান গৌণ। কুটিরশিল্প বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের পরিপূরকের স্থান লাভ করিয়াছে, তাহার স্বাতন্ত্র্য নাই বলিলেই চলে। পণ্ডিতজীর বিশ্বাস, এবং বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকও বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, যদি বর্তমান জগতে ভারতবর্ষকে অপর স্বাধীন দেশের সঙ্গে সমান তালে চলিতে হয়, যদি এদেশে ভোগের মাত্রা যথেষ্ট উন্নত করিতে হয়, সর্বোপরি বর্তমানকালের সমরকৌশল আয়ত্ত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, তবে স্বাধীন ভারতে যথেষ্ট কেন্দ্রীকরণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িবে।

গান্ধীজী কিন্তু এই পদ্ধতিতে আদৌ আস্থাবান নহেন। সে ক্ষেত্রে জনসমূহের অধিকার হইতে আর্থিক জীবন ও তাহা রক্ষা করিবার ক্ষমতা অল্পসংখ্যক লোকের হাতে চলিয়া যাইবে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। এ অবস্থাকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু তিনি ইহাকে জনসাধারণের স্বরাজের আখ্যা দিতে অস্বীকার করিবেন।

তাঁহার পরিকল্পিত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে সুপরিচালনার জন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিলেও, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারকেন্দ্র বিকেন্দ্রীকরণ ও সত্যাগ্রহ-কৌশলের কল্যাণে নীচের দিকেই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

শহরে কলের জল সরবরাহের জন্ত যেমন প্রথমে এক স্থানে সমস্ত জল সংগ্রহ করিয়া তাহার পর প্রতি গৃহস্থের বাড়ি পর্যন্ত সেই জল কলের সাহায্যে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়, পণ্ডিতজীর পরিকল্পনা সেই প্রকারের। কিন্তু যদি মানুষের জীবনকে প্রকৃতির সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে সংযুক্ত রাখিয়া শহরের অস্বাভাবিক ঘনবসতি হইতে মুক্ত করিয়া নূতন ধরনের সুস্থ গ্রাম রচনা করা যায়, গান্ধীজীর পরিকল্পনা তাহার মত হইবে। সেখানে প্রতি গৃহস্থের বাড়িতে কূপ অথবা হয়তো পল্লীতে পল্লীতে জলাশয়ের ব্যবস্থা থাকিবে। জলের ব্যাপারে মানুষ স্বাবলম্বী হইবে। কিন্তু জল তো আবদ্ধ হওয়ার ফলে দূষিতও হইতে পারে। সেই সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত দোষ দূর করার জন্ত নিকটে নদী থাকিলে, এক গ্রামের লোক অপর গ্রামের লোকের সহিত সহযোগিতা করিবে, এক দেশের লোক অপর দেশের লোকের সহিত প্রয়োজনানুসারে সংঘবদ্ধ হইবে, এবং নদীর জলকে নিয়ন্ত্রিত, শাসিত অথবা খালের পথে পরিচালিত করিয়া মাঠের উর্বরাশক্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিবে, পুষ্করিণীকে নূতন বর্ষার জলে ভরিয়া মাছে পূর্ণ করিবার, গ্রামকে পরিচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। এইরূপে সমবেত সংঘশক্তির দ্বারা মানুষ জীবনের মানকে ও ভোগের মাত্রাকে আবশ্যকমত উন্নততর ও পূর্ণতর করিবার চেষ্টা করিবে।

পণ্ডিতজী এবং গান্ধীজীর পরিকল্পনার মধ্যে, জল সরবরাহের জন্য উপরে যে দুই ব্যবস্থার বর্ণনা করা হইল, তাহার মধ্যে যে প্রভেদ আছে, সেইরূপ প্রভেদ বর্তমান। একটিতে শক্তির ভারকেন্দ্র রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যস্ত; অপরটিতে প্রয়োজনানুসারে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলেও সর্ববিধ শক্তির ভারকেন্দ্র সমাজের নীচের দিকেই প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা হয়। উভয় পরিকল্পনার মধ্যে প্রভেদ এত বেশি যে উহাদিগকে ভিন্নধর্মী বলিয়া স্বীকার করাই ভাল।

ইহার মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত ভাল কোন্‌টি মন্দ তাহা বিচার করিবার অভিপ্রায় আমার নাই। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ যদি স্পষ্ট হইয়া থাকে, তবেই আমি নিজের শ্রমকে সার্থক বলিয়া বিবেচনা করিব।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

৯ই আগস্ট

চৈতন্ত লভিয়া জড় শুরু কৈল মুক্তির সংগ্রাম,
ভারতের চিত্ত জুড়ে র'য়ে গেল একটি প্রণাম।

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

শীতের প্রত্যুষে ঘুমটি যখন বেশ জমেছে, ঠিক সেই সময় দিদিমণি আমাদের ঘরে এসে চেঁচামেচি ক'রে আমাদের তুলে বললে, চল, বাবুজীর সঙ্গে দেখা করবে না ?

তখনও ফরসা হয় নি, কিন্তু দেখলুম, তার স্নান হয়ে গিয়েছে। মাথার ওপরে তেমনই চূড়ো ক'রে চুলের রাশি, গায়ে শুধু একখানা দামী শাল জড়ানো।

দিদিমণির সঙ্গে গিয়ে আমরা ঢুকলুম সেই ঘরে—কাল বিকেলবেলা যেখানে তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম, পেণ্টুলান ও হাঁটু অবধি ঝোলা গরম-কোট-পরা একটি ভদ্রলোক খাটের ওপরে ব'সে রয়েছেন। রোগা, লম্বা, মাথার চুল অধিকাংশই কাঁচা, তবু দেখলে মনে হয়, বেশ বয়স হয়েছে। তাঁর পাশে একটা নীচু জলচৌকির ওপর একটা কাঁসার ঘটি বসানো. শঙ্কর চাকর পায়ের জুতোর ফিতে বেঁধে দিচ্ছে।

আমরা ঘরে ঢুকেই তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। আমার মেয়ে মনোরমা কাল রাতে তোমাদের সব কথা আমায় বলেছে। তোমরা এসেছ, ভালই হয়েছে। এখানে থাক, মন-টন খারাপ লাগলে বাড়ি চ'লে যেও, সেখানে কিছুদিন থেকে আবার চ'লে আসবে।

দিদিমণি তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, ওরা আর বাড়ি যাবে না বলেছে।

জলচৌকির ওপর থেকে ঘটিটা তুলে নিয়ে আলগোছে প্রায় সের দেড়েক দুধ ঢকঢক ক'রে উদরস্থ ক'রে তিনি বললেন, মা বাপ রয়েছেন, মধ্যে মধ্যে বাড়ি যাবে বইকি! ছেলেমানুষ, মন খারাপ করবে না ?

দিদিমণি আমার দিকে এগিয়ে এসে বললে, কি মন খারাপ হবে নাকি ?

যেন সমস্যাটার সমাধান বাপের সামনে এখুনি হয়ে যাক।

আমি বললুম, না, মন খারাপ কেন হবে ?

দিদিমণি বাপের দিকে চেয়ে বললে, ওই শোন, কিছু মন খারাপ হবে না। কেন মন খারাপ হবে, এও তো নিজের বাড়ি—কি বল ভাই ?

বৃদ্ধ পিতা এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে খানিকটা প্রাণখোলা হাসি হেসে বললেন, কানের অসুখ কার ?

দিদিমণি পরিতোষকে দেখিয়ে দিতে তিনি তাকে আলোর কাছে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে কান টেনে-টেনে ভেতরে পরীক্ষা ক'রে বললেন, ও কিছু না, আমি আসবার সময় ওষুধ নিয়ে আসব।

বাবুজী চ'লে গেলেন। দিদিমণি বললে, চল্, তোদের ঘরে যাই।

ঘরে এসে একখানা লেপ তিনজনে পায়ের ওপর চাপা দিয়ে বসলুম। দিদিমণি বলতে লাগল, তোরা এসেছিস এবার একটু গল্প ক'রে বাঁচব। সুদন চ'লে গেছে সে আজ পনেরো-বিশ দিন হয়ে গেল, সেই থেকে বাবুজী ছাড়া আর বাংলায় কথা কইবার লোক পাই নে।

বাবুজীর কথা উঠল। দিদিমণি বললে, আমার বাবুজীও সত্যযুগের লোক, ওরকম লোক হয় না। কি মজলিসী লোকই ছিলেন, আমার মাতাজী মারা যাবার পর থেকে ওই এক রকম হয়ে গেছেন, আর কারুর সঙ্গেই মেলামেশা করেন না। নির্জনে বাস করবার জন্যে এখানে এই বাড়ি কিনেছেন। তা ওঁর বাড়ি কেনাই সার হয়েছে। সপ্তাহের ছ-দিন তো একরকম কাশীতেই কাটে, রবিবার দিনটা শুধু বাড়িতে থাকেন। বাবুজীর আসকারা পেয়েই তো আমার বড় ভাইটা নষ্ট হয়ে গেল। মাতাজী ওকে দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। আমার মাতাজী দেবী ছিলেন। তিনি চ'লে যেতেই তো সংসারটা ছন্নছাড়া হয়ে গেল।

দিদিমণির গলা ধ'রে গেল। আর কিছু না ব'লে সে চুপ করলে।

জিজ্ঞাসা করলুম, এই শীতে এত ভোরে আপনি স্নান করেন কি ক'রে ?

দিদিমণি হেসে বললে, এখন কি রে! স্নান করেছি সেই কখন! আমি উঠি ঠিক চারটেয়। উঠে গরুর জন্য যে চাকর আছে তাদের তুলে দিই গাইয়ের জাব দেবার জন্যে। তারপরে ঘণ্টাখানেক ধ'রে তেল মাখি। স্নান সেরে এসে বাবুজীকে তুলে দিই, তিনি স্নান করতে যান। ওদিকে শুতে শুতে প্রায় রাত্রি বারোটা বেজে যায়। রাত্তিরে এই তিন-চার ঘণ্টার বেশি ঘুমের আমার দরকার হয় না। শুধু দুপুরবেলা ঘণ্টা-দুয়েকের জন্যে শুই, তার মধ্যে এক ঘণ্টা পড়ি, আর এক ঘণ্টা ঘুমুই। দিনের বেলা বেশি ঘুমুলে—বাবা,

মোটা হয়ে যাব, এমনিতেই তো হাতী হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। এবার খাওয়া কমাতে হবে।

আমাদের কথাবার্তা হতে হতে চারিদিক ফরসা হয়ে গেল। বাড়িঘর ঝাঁট দেওয়া ও চাকর-বাকরদের আওয়াজ আসতে লাগল চারিদিক থেকে। দিদিমণি জিজ্ঞাসা করলে, চা খাবি ?

চার কথা শুনে আনন্দে মন নেচে উঠল। বললুম, চার ব্যবস্থা আছে নাকি ?

দিদিমণি উৎসাহিত হয়ে বললে, আরে, চায়ের আমার ভারি শখ। ছোট্‌কা আর আমি ছাড়া বাড়ির আর কেউ চা খায় না, তা আজকাল ছোট্‌কা চা ছেড়ে দিয়েছে ব'লে নিজের জন্যে আর তৈরি করি না। খাবি ?

বললুম, আমাদের তো জন্মাবধিই চা খাওয়ার অভ্যেস, কিন্তু বাড়ি থেকে পালিয়ে অবধি অভ্যেস ছুটে গিয়েছে, কোথায় পাব চা বিদেশ বিভুঁয়ে !

দিদিমণি মুখে একবার চক্‌চক্ আওয়াজ ক'রে বললে, বেচারা !

তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোরা ব'স্, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দিদিমণি চ'লে গেল। আমরা মুখ-টুখ ধুয়ে চায়ের প্রত্যাশায় ব'সে রইলুম, কিন্তু চা আর আসে না। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পর একজন চাকর একথালা গরম জিলিপি আর দু গেলাস গরম দুধ নিয়ে এসে হাজির হ'ল। চা আর বরাতে হ'ল না মনে ক'রে সেইগুলিরই সদ্ব্যবহার ক'রে বিড়ি ফুঁকতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, একটু পরেই দু বাটি চা এসে হাজির হ'ল। চা-পানান্তে বিশুদার আড্ডায় গিয়ে বসলুম। সেখানে গিয়ে দেখি, সেই ভোরেই দু-পাঁচজন লোক এসে হাজির হয়েছেন। বিশুদা তার সেলাইয়ের তল্পি কোলে নিয়ে সেইরকম পা ছড়িয়ে ব'সে তাদের সঙ্গে গল্প করছে।

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই যে বাংলা দেশ—অতি বিচিত্র দেশ এ, বিচিত্রতর এখানকার অধিবাসীদের হালচাল। ভারতের পুরাতন ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় যে, সেকালে এদেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত। বাংলা দেশের বাইরের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি ব'লে থাকেন, এ দেশ পাণ্ডববর্জিত, অর্থাৎ পাণ্ডবেরা নাকি এ দেশে কখনও আসেন নি। অবশ্য পাণ্ডবদের মতন অসভ্যরা যদি

এদেশে না এসে থাকেন, তাতে আমাদের কোনও ক্ষতিই হয় নি। যে দেশে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীর মুখ দেখলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত, সেখানে ভাদ্দরবউকে নিয়ে পাড়া জানিয়ে ঘরে খিল লাগানোর প্রতিক্রিয়া যে কি হ'ত, তা ভাবলে আর জ্ঞান থাকে না—কারণ পাণ্ডবদের ধর্মবন্ধু, মতান্তরে ধর্মপিতা, কৃষ্ণচন্দ্রের লীলাখেলাকে ধর্মসাধনের অঙ্গ ক'রে অধ্যাত্মজগতের পাকা সড়ক দিয়ে যেভাবে আমরা তেড়ে উন্নতির মার্গে আরোহণ ক'রে চলেছিলুম, অত্যাচারী ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট বাধা না দিলে বৃন্দাবনের স্থান নির্ণয় করতে হয়তো আজ ঐতিহাসিকেরা হিমসিম খেয়ে যেতেন। তাই বলছিলুম, পাণ্ডববর্জিত যদি হয়ে থাকি, তাতে আমাদের কোন দুঃখই নেই, দুঃখ এই যে, এ দেশ ঈশ্বরবর্জিত।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে পূর্ব সমুদ্রের কোলে এই যে বাংলা দেশ—এ দেশের অর্ধেক জল ও তার অর্ধেক জঙ্গল। এরই মধ্যে এখানে ওখানে যেটুকু ডাঙা জমি আছে, সেইটুকুই আমাদের চাষ ও বাসভূমি। প্রকৃতির লীলানিকেতন এই দেশ—পৃথিবীর আর কোনও দেশে ষড়ঋতুর আবির্ভাব হয় না; কিন্তু তথাপি অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও মহামারী—একটা না একটার উৎপাতে বঙ্গবাসী আবহমানকাল থেকেই পুলকিত হয়ে আসছে। এ ছাড়া সর্পভীতি ও অন্য জানোয়ারের ভয় তো আছেই। সবার ওপরে বিদেশীরাজ-স্নেহাতিশয্যের প্ররোচনায়-পালিত প্রতিবেশী কর্তৃক স্ত্রী-কন্যাপহরণের অত্যাচার —সে তো প্রায় গা-সওয়াই হয়ে গেছে।

এই দেশ—যেখানকার ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত মৎস্যমাংসভুক্, সেই দেশকে সারা আর্যাবর্ত ঘৃণা করলেও কোনদিনই তারা একে অবহেলা করতে পারে নি। তার কারণ আর্যাবর্তবাসীর ঔদার্য নয়, তার কারণ বাঙালীর পৌরুষ ও শক্তিমত্তা।

এই ঈশ্বরবর্জিত দেশ থেকে যুগে যুগে আচার্যেরা গিয়েছেন আর্যাবর্তের দিকে দিকে শিক্ষাদানের জন্য। দর্শন-বিজ্ঞান, কাব্য-ন্যায়ের নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভায় এ দেশ চির-প্রদীপ্ত।

ইংলণ্ডীয় ক্রীশ্চানেরা এখানে আসবার অনেক আগে থেকে এখানকার অধিবাসীরা আর্যাবর্তের স্থানে স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে কার্যব্যপদেশে। তারা যেখানেই গিয়েছে, সেই দেশকেই আপনার ক'রে নিয়েছে। শিক্ষায়, সেবায়

ও সমাজসংস্কারে তারা নিজেদের ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছে সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে—যুগে যুগে তারা সেখানকার অধিবাসীদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে।

কিন্তু পরবাসী হ'লেও মাতৃভূমির সঙ্গে নাড়ীর যোগ তাদের কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নি। মাতৃভূমির কোনও লোক, তা সে ভ্রমণব্যপদেশেই হোক বা দুর্দশায় প'ড়েই হোক, তাদের আশ্রয়প্রার্থী হ'লে, সে ব্যক্তি যে শ্রেণীর লোকই হোক না কেন, যথাসাধ্য তার সাহায্য করেছে, নিজের পরিবারের মধ্যে তাকে আপনার ক'রে নিয়েছে। বাইরে এদের হালচাল যাই হোক না কেন, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, বাংলা ভাষা, বাঙালীর পোশাক ও বাঙালীর খাদ্য তারা ত্যাগ করে নি।

এই রকম এক বাঙালী পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন আমাদের বর্তমান আশ্রয়দাতা, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব এই দুই প্রদেশের সীমান্তে কোন এক শহরে। লাহোরের মেডিক্যাল ইস্কুল থেকে পাস ক'রে কিছুকাল সৈন্যদলে কাজ ক'রে সিভিল চাকরিতে বদলি হয়ে সম্মানের সঙ্গে চাকরি শেষ ক'রে তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন। বিবাহ করেছিলেন বাংলা দেশেরই এক পল্লীগ্রামের মেয়েকে। দশ বছরের মেয়ে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চ'লে এসেছিল এই দূর বিদেশে। তারপরে বোধ হয় বার দুই-তিন বাপের বাড়ি আসবার সুবিধা হয়েছিল, তার পরেই স্বামীর ঘর নিজের ঘর হয়ে গেল। অদ্ভুত বাঙালীর মেয়ে, জগতে তাদের তুলনা নেই।

ওপরে যাদের কথা উল্লেখ করলুম, তারা ছাড়াও আর এক শ্রেণীর বাঙালী আর্যাবর্তের স্থানে স্থানে ছড়িয়ে আছে, মাতৃভূমির সঙ্গে যোগসূত্র তাদের ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। এরা বাংলা ভাষা, বাঙালীর বেশ ও খাদ্য ভুলে গিয়েছে, কিন্তু বাঙালীর সঙ্গে নাড়ীর টান এখনও ছিন্ন হয় নি। তাই বাঙালী কারুকে দেখতে পেলে অতি বিনীতভাবে নমস্কার ক'রে সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, ম্যয় বাংগালী হুঁ। এঁরা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ। নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে, অমুক ভটাচারী কিংবা অমুক ঘাংগোলি। এঁদের পূর্বপুরুষেরা বিদেশে গিয়েছিলেন কোনও মন্দিরের পৌরোহিত্য, কোনও রাজকার্য কিংবা সেনানীর চাকরি নিয়ে, ব্যবসা-সূত্রেও কেউ কেউ গিয়েছিলেন। পুরুতের কাজ নিয়ে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের বংশধরেরা এখনও পৌরোহিত্যই করছেন। যাঁরা অন্য কাজে গিয়েছিলেন,

তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়েছেন জমিদার, কেউ কেউ বা রাজসরকার থেকে জায়গীর পেয়ে হয়েছেন সর্দার। এদের ছেলেদের বিয়ে হয় অতি মুশকিলে। পরিবারের মধ্যে চারটি ছেলে থাকলে দুটির বিয়ে হয়, আর দুটিকে অবিবাহিতই থাকতে হয়। প্রত্যেক ছেলের বিয়ের সময়েই এরা প্রথমে খাস বাঙালীর ঘরের মেয়ে খোঁজে। তারপরে খোঁজে যুক্তপ্রদেশের আধা-বাঙালীদের ঘরে। সেখানেও না পেলে শেষে নিজেদের মধ্যেই, কিন্তু সগোত্রে নয়, বিয়ে দেয়।

এই রকম ঘরের একটি ছেলের সঙ্গে একবার আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে বেচারা বিয়ে করেছিল কাশীতে। স্ত্রীকে সে ভালবাসত বললে ঠিক বলা হয় না, তাকে সে দেবীর মতন পূজো করত। দু-পাঁচ বছর অন্তর স্ত্রী বাপের বাড়ি যেত, সেখান থেকে সে বাংলায় চিঠি লিখত স্বামীকে। আমার বন্ধু সেই চিঠি বগলে নিয়ে দশ মাইল দূরে এক আধা-বাঙালীর কাছে যেত চিঠি পড়াবার জন্যে আর তাকে দিয়েই সেই চিঠির জবাব লিখিয়ে ডাকঘরে ফেলে দিয়ে বাড়ি আসত। এদের বাড়িতে বার কয়েক নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছি। প্রথমবারে মেয়েরা কেউ সামনে বেরোয় নি। তার পরে ছেলেমানুষ দেখে মা-খুড়ীর দল বেরুলেন, ইয়া ইয়া পেশোয়াজের মতন ঘেরওয়ালা সব 'লাহেঙ্গ' পরা, কেউ বা যোধপুরের মেয়ে কেউ বা বিকানীরের। নতুন বউয়ের দেখাদেখি অল্পবয়সীরা শাড়ি পরতে আরম্ভ করেছে, তাই নিয়ে সংসারে অশান্তির সীমা নেই।

এই রকম একটি পরিবার, যাদের পূর্বপুরুষ রাজকার্য-ব্যপদেশে কোনও এককালে রাজপুতানার পাহাড়-ঘেরা কোলে এক রাজ্যে গিয়েছিল বসবাস করতে। নিজেদের শৌর্য ও কর্ম্মকুশলতায় তারা সেখানকার প্রথম শ্রেণীর সর্দারের পদে উন্নীত হয়েছিল। রাজ্য ছোট হ'লেও তাদের জমিদারি ছিল বিপুল। পাহাড়ের ওপরে প্রাসাদ, বাড়িতে চার-পাঁচশো লোক, এই পরিবারের বড় ছেলের সঙ্গে দিদিমণির বিয়ে হয়েছিল। সেখানকার মহারাজা নিজে উদ্যোগী হয়ে এই বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন। দিদিমণির মা বাবা মনে করলেন, তাঁদের মেয়ের যেমন রাজরাণীর মতন রূপ ও হালচাল, তেমনই ঘরে ভগবান তার বরও জুটিয়ে দিলেন। কিন্তু ভবিতব্য ছিল অন্য, কারণ, শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রথমবার ফিরে এসেই দিদিমণি প্রকাশ করলে যে, তার স্বামী আধপাগলা। তবে অত্যাচার কিছু করে না, শুধু সারারাত তার পা-দুটো জড়িয়ে ধ'রে শুয়ে থাকে।

কিন্তু এরকমও বেশি দিন চলল না। বিয়ে ক'রে ভাল ভাল মাথাওয়ালা লোকেরই মেজাজ বিগড়ে যায়, আধপাগলা তো দূরের কথা!

একদিন এই আধপাগলা ফুর্তির চোটে মারলে লাফ পাহাড়ের ওপর থেকে গভীর খাদে, দিদিমণি মাথার সিঁদুর মুছে ফিরে এল বাপের বাড়ি।

তারপরে চলল লড়াই বিষয়-আশয় নিয়ে। শেষকালে মহারাজা মাঝখানে প'ড়ে প্রায় লাখখানেক টাকা দিয়ে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন। দিদিমণির নামে টাকাটা তার বাবা আগ্রার বাঙাল ব্যাঙ্কে জমা ক'রে দিলেন। গয়না ইত্যাদি স্ত্রীধন সব বাড়ির সিন্দুকে উঠল। চেক কাটবার জন্যে সে ইংরিজী শিখতে লাগল, আমরা দেখেছি তার হাতের লেখা মুক্তোর মতন। সেই থেকে সে বাপের বাড়িতেই আছে।

মা মারা যাওয়ার পর বাপের বাড়ির সারা সংসারের ভার স্বেচ্ছায় তুলে নিলে সে নিজের মাথার ওপর। সেই ভোর চারটের সময় উঠে গরুর চাকরদের তুলে দেওয়া। তারপরে স্নান সেরে দুধ গরম ক'রে বাপকে খাইয়ে তাঁকে কাশী পাঠিয়ে দেওয়া। প্রায় পনেরোটি ঝি-চাকরকে খাইয়ে বেলা একটার সময় আহারাদি শেষ ক'রে সে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। বছর পাঁচেক আগে বিছানার চাদরের মতন লম্বা-চওড়া একখানা 'হিতবাদী' ও একখানা 'বসুমতী' সাপ্তাহিক তার বাবা কাশী থেকে কিনে এনেছিলেন, তারই একখানা নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। প্রতিদিন এই কাগজের সম্পাদকীয় থেকে আরম্ভ ক'রে বিজ্ঞাপন পর্যন্ত প'ড়ে ঘণ্টাখানেকের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ে। কাগজ দুখানায় যত বই, ওষুধ ও দৈব-মাতুলীর বিজ্ঞাপন আছে, দিদিমণি তা সব ভি.পি.তে নিয়ে এসে ঘরে জমা ক'রে রেখেছে। ঘুম থেকে উঠে আবার সংসারের কাজে লেগে যাওয়া, ঘড়ি ধ'রে রুগ্ন ভাইয়ের ওষুধ ও পথ্য পাঠানো— এ সব ছাড়া কাশীর দাওয়াখানার হিসাব তো আছেই। গরুদের শিঙে ও ক্ষুরে একদিন যদি চাকরেরা তেল মাখাতে ভুলে যায় তো হুলুস্থুল বাধে বাড়িতে, সমস্ত সংসার ঘড়ির কাঁটার মতন চলেছে, একটু এদিক ওদিক হবার জো নেই।

দিদিমণির বাবা, বয়স তাঁর প্রায় পঁচাত্তর। জীবনব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার দিন তাঁর ঘনিয়ে এসেছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর সব ছেড়ে-ছুড়ে যে-কটা দিন বাঁচেন, নির্জনবাস করবার জন্যে এখানে বাড়ি কিনেছিলেন; কিন্তু কিছুদিন

চুপচাপ ব'সে থাকবার পর আবার কর্ম্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। একদিন তাঁর সংসার ছিল বৃহৎ। নিজের অনেক ছেলেপিলে ছিল, তা ছাড়া বাইরের কত ছেলে কত আত্মীয়স্বজন তাঁর বাড়িতে মানুষ হ'ত। ক্রমক্রমে সংসার, সবার ওপরে ছিল লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রী, কিন্তু মৃত্যু এসে একে একে প্রায় সকলকেই নিয়ে গেছে। একদিন তাঁর একলার আয়ে সংসারের খরচ কুলোত না, আজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থানুকূল্যে ভাগ্যবিধাতা তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে দিচ্ছেন, কিন্তু লোক নেই, কে ভোগ করবে, তাই মাসে মাসে উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা হচ্ছে। একটা মেয়ে, সেও বিধবা। ছুটো ছেলের একটা কবে যায় তার ঠিক নেই, আর একটা হতচ্ছাড়া। কিন্তু কোনও কিছুতেই তাঁর আয়োজনও নেই বিসর্জনও নেই। তাঁর দিন যে ঘনিয়ে এসেছে সে কথা তিনি জানেন, কিন্তু মৃত্যুর পর মেয়ের যে কি হবে সে বিষয়ে কোনও চিন্তাই তাঁর নেই।

দিদিমণির ছোট ভাই, তার কথা আগেই বলেছি।

আমাদের দিনগুলি কাটতে লাগল পরম আনন্দে। পরিতোষের সঙ্গে বিশুদার ভারি ভাব জ'মে গেল, সে প্রায় সারাদিনই তার সঙ্গে কাটায়। দিদিমণি আমাকে দিয়ে তার নিজের টাকার হিসাব, সংসারখরচের হিসাব-পত্র লেখাতে আরম্ভ করলে। সকালবেলাটা আমার এই করতেই কেটে যায়। বাবুজী প্রতিরাত্রেই দাওয়াখানার একটা হিসাব নিয়ে আসতেন আর সকালবেলায় প্রতিদিন সেই হিসাব একটা পাকা খাতায় আমাকে টুকে রাখতে হ'ত। দিদিমণি বলতে লাগল, তুই আসায় যে আমার কি সুবিধে হয়েছে, তা কি বলব!

কিছুদিন যেতে না যেতেই পরিতোষ বিশুদার, আর আমি দিদিমণির লোক হয়ে গেলুম। ছুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে দিদিমণি যখন গড়ায়, তখন তার কাছে ব'সে মাথার পাকাচুল খুঁজতে হয়। কোন দিনই পাকাচুল পাওয়া যায় না; সে বলে, অনেক আছে, তুই দেখতে পাস না। শেষকালে চুল চিরে চিরে তার মধ্যে আঙুল চালিয়ে মাথায় সুড়সুড়ি দিতে হয়। সে ঘুমিয়ে পড়লেই একখানা বই নিয়ে শুয়ে পড়ি। কোন কোন দিন দিদিমণি গল্প করে, তাদের সংসারের, তার শ্বশুরবাড়ির গল্প। তার বড় ভয়, ছোট্‌কা ম'রে গেলে, বাবুজী চ'লে গেলে তার কি হবে?

আমি বলি, আমরা রয়েছি, তোমার ভাবনা কি দিদি ?

দিদিমণি উঠে ব'সে থুতনিতে হাত দিয়ে সজলকণ্ঠে বলে, সত্যি বলছিস ?

সত্যি বলছি।

দিদিমণি আমার চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

একদিন আমি তাকে বললুম, বাবুজী ও বিশুদা যদি সত্যিই চ'লে যায়, তা হ'লে আমরা দেশভ্রমণে বেরিয়ে যাব। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লে আবার কিছুদিনের জন্যে এখানে ফিরে আসব, আবার বেরিয়ে পড়ব।

আমার প্রস্তাবটা তার খুবই ভাল লাগল। সেই থেকে প্রায় প্রতিদিনই দেশভ্রমণের কথা শুরু হ'ল। দুপুরবেলা তার পাশে ব'সে ব'সে কখনও চ'লে যাই পৃথিবীর প্রান্তে সেই মেরুজ্যোতির দেশে, কখনও বা ঘুরে বেড়াই হিমালয়ের শিখরে শিখরে, কখনও বা স্বইট্‌জারল্যাণ্ডের হ্রদে ষ্টীমবোটে চড়ি, কখনও বা কন্যাকুমারীর মন্দিরে ব'সে থাকি। সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি, সেদিন আর বই পড়া হয় না।

এক অস্থির ছাড়া বাড়ির কথা মনেই হয় না, একা দিদিমণি আমার মা বোন দিদি সবার স্থান অধিকার ক'রে বসল।

মধ্যে মধ্যে মনে হয়, দেশভ্রমণের সময় মাকেও নিয়ে আসব। একদিন দিদিমণির কাছে সে-কথা বলামাত্র আনন্দে লাফিয়ে উঠে সে বললে, এখন কোনরকমে তাঁকে নিয়ে আসতে পারিস না ?

বললুম, মাকে আনতে গেলে আমায় তারা ধ'রে ফেলবে, আর আসতেই দেবে না।

নিরুৎসাহ হয়ে সে বললে, আচ্ছা, এখন তা হ'লে থাক্।

এবার এদের বড় ভাইয়ের কথা বলি। এ-বাড়িতে ঢুকে অবধি শুনে আসছিলুম যে, সে লোকটা মাতাল, লম্পট, জুয়াড়ী, বাড়ির সুখদুঃখের সঙ্গে তার কোনও সহানুভূতিই নেই। শুধু বাপের ভালমানুষির সুযোগে সে দু-হাতে সংসারের টাকা শুষছে আর ওড়াচ্ছে। এই সব শুনে তার প্রতি একটা বিরুদ্ধভাব মনের মধ্যে জমা হয়েই ছিল। দুই বন্ধুতে তার সম্বন্ধে অনেক আলোচনাও হ'ত এবং এ কথাও আমরা বলাবলি করেছি যে, আমাদের মতন ভাইয়ের পাল্লায় পড়লে দু-দিনে চাঁদকে ঠাণ্ডা ক'রে দিতুম।

দিদিমণিদের বাড়িতে আসার বোধ হয় সাত-আট দিন বাদে একদিন রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় সেই চাঁদের উদয় হ'ল আমাদের ঘরে।

দিদিমণি আমাদের বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়েছিল, রাত্রে আলো একেবারে নিবিয়ে শুয়ো না। এখানে চোর, ডাকাত, বিচ্ছু, করায়েৎ ইত্যাদির উৎপাত আছে।

· আমাদের বাতিটা খুব নামিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়তুম। দরজাটা ভেজানোই থাকত, কারণ বাইরের ছাতে সারারাত্রি পাহারা থাকত।

সে রাত্রে ঘুমিয়ে পড়বার পর হঠাৎ কার ভারী গলার আওয়াজে ঘুমটা ভেঙে গেল। চটকা ভেঙে যেতেই উঠে ব'সে পরিতোষকে ঠেলে তুলে দিলুম। দেখলুম, সামনেই একটা লোক দাঁড়িয়ে, মিস কালো, লম্বা-চওড়া চেহারা, মুখময় বসন্তের দাগ, তাতে একজোড়া ঝাঁটার মতন গোঁফ, ঘর ধান্যেশ্বরীর গন্ধে একেবারে ভরপুর, চোখ দুটো লাল টকটকে, বোধ হয় ধান্যেশ্বরীর ওপরে গাঁজাও চড়েছে। পশ্চিমী ধাচে কোমরে ধুতি বাঁধা, সে এক বীভৎস দৃশ্য; বদ্যিনাথ তার কাছে কন্দর্প বললেও অত্যুক্তি হয় না।

উঠে বসতেই লোকটা ভারী গলায় ধমকের স্বরে বললে, লাট সাহেবের পোতারা, বাতি জ্বেলেই শুয়ে পড়েছ! বাবার ঘরের তেল পেয়েছ, না?

আমরা আর কি বলব! প্রথম সম্ভাষণেই এমন পুলকিত হলুম যে, আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হ'ল না। ইতিমধ্যে বড়ে সাহেব গা থেকে শালখানা খুলে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপরে লম্বা কোটটা খুলে কাঠের সিন্দুকটা টিপ ক'রে ছুঁড়লেন বটে, কিন্তু সেখানা সিন্দুকের দশ হাত দূরে গিয়ে পড়ল আর তিনি টাল খেয়ে নাচের ভঙ্গীতে দু-পাক ঘুরে গেলেন, কাছেই দেওয়াল থাকায় সে যাত্রা সামলে গেলেন বটে; কিন্তু আমরা আর থাকতে না পেরে হেসে উঠলুম।

আমাদের হাসি শুনে বড়ে সাহেব উর্দ্‌ লেখার ভঙ্গীতে হেঁটে এসে আমাদের বিছানায় ব'সেই চীৎকার ক'রে বললেন, কি, মসকরা হচ্ছে আমার সঙ্গে! জান তোমাদের মতন পাঁচ-সাতটা লোক খুন ক'রে এই বাড়ির উঠোনে পুঁতে রেখেছি!

কি সর্বনাশ! অন্তরাত্মা চীৎকার করতে লাগল, জয় বাবা বিশ্বনাথ! ডাইনীর কবল থেকে উদ্ধার ক'রে শেষকালে ডাকাতের খপ্পরে এনে ফেললে

কেন বাবা? অতি দুর্দিনেও যে আড়াই টাকা খরচ ক'রে তোমার পুজো দিয়েছি!

কি করব, কি বলব, তাই ভাবতে লাগলুম। একবার মনে হ'ল, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে যাই দিদিমণির কাছে। ইতিমধ্যে পরিতোষটা ব'লে ফেললে, দিদিমণি রাত্রে বাতি নিবোতে বারণ ক'রে দিয়েছেন, তাই আলো জ্বলছে।

চুপ রহো।—ব'লে লোকটা এমন চীৎকার ক'রে উঠল যে, ছাতের পাহারাদার কিছু হয়েছে মনে ক'রে একবার ঘরে উঁকি দিয়ে চ'লে গেল।

বোধ হয় মিনিটখানেক চুপ ক'রে থেকে লোকটা বললে, বাবুজীর কাছে তোমাদের সব খবর শুনেছি। বাড়ি থেকে ভেগে আসা হয়েছে, না? আমাকে বাবুজী পাও নি, ঠাণ্ডা ক'রে দোব।

রাজকুমারীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে, যা হবার হবে ঝগড়া-মারামারির দিকে আর কখনও যাব না। কিন্তু সে কথা আমার মনে থাকলেও পরিতোষ সাফ ভুলে গিয়েছিল। হঠাৎ সে ব'লে ফেললে, কি করবেন আপনি? মারবেন? কেন মারবেন? কি করেছি আমরা আপনার? বাড়িতে না রাখতে চান, ব'লে দিন, আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি।

পরিতোষের কথা শুনে লোকটা এমন তিড়বিড়িয়ে উঠল যে মনে হ'ল, তার গায়ে যেন নাইট্রিক অ্যাসিড ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ষাঁড়ের মতন একটা ভয়াবহ গর্জন ক'রে সে বললে, কি! আবার চোপরা করা হচ্ছে মুখের ওপর! মারব বিচ্ছুয়া।—বলে সাঁ ক'রে কোমর থেকে সাপের মতন অ্যাঁকাব্যাঁকা একখানা চকচকে ছোরা বের ক'রে ধরলে একেবারে পরিতোষের নাকের ওপর! তারপরে কটমট ক'রে চেয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলতে লাগল, আজ তোমাদের শেষ দিন।

"আজ তোমাদের শেষ দিন"—এই ভবিষ্যদ্বাণী ইতিপূর্বে বাবার মুখেও বহুবার শুনেছি। শেষ দিনের শেষ মুহূর্ত অবধি পৌঁছবার সুযোগ না হ'লেও পিতৃপুণ্যের জোরে সে পথের অনেকখানিই আমার জানা ছিল। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাক্যকে নিশ্চিত সাফল্যে পরিণত করবার এমন পরিপাটি ব্যবস্থা তাঁর হাতে ছিল না, তাই এতখানি ভয় ইতিপূর্বে আর কোন দিনই পাই নি।

পরিতোষের তো কথাই নেই, এত বয়স অবধি বাপের হাতে একটা চড় পর্যন্ত কখনও সে খায় নি।

বড়কর্তা বিছুয়া ঘুরিয়ে পরিতোষকে শাসাতে আরম্ভ ক'রে দিলে, সেই ফাঁকে আমি ছুটলুম দরজার দিকে দিদিমণিকে খবর দিতে। আমাকে ছুটতে দেখে বড়কর্তা চেঁচিয়ে উঠল, এইও, কোথায় যাচ্ছ?

বললুম, দিদিমণির কাছে যাচ্ছি, একটু কাজ আছে।

আচ্ছা, চ'লে এস এদিকে। কিচ্ছু বলব না, এস এদিকে।

দিদিমণির নাম করতেই দেখলুম, লোকটা একেবারে নরম হয়ে গেল। আমি ফিরে এসে তার কাছ থেকে একটু দূরে ব'সে পড়লুম। পরিতোষও ইতিমধ্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ব্যবধানে গিয়ে একটা মোটা গিদ্দে কোলে নিয়ে উঁচু হয়ে বসল। আমি বসতেই লোকটা বললে, আজ আর কিছু বললুম না। ফের যদি আমার সঙ্গে কোন দিন মস্করা করতে দেখি তো জানসে মেরে দেব।

তারপরে ছোরাটাকে তিনবার চুক চুক ক'রে চুমু খেয়ে কোমরে গুঁজতে গিয়ে আবার সেটাকে বের ক'রে এনে বললে, খুন পিলাব ব'লে একে বার করলুম, কিন্তু এখন যদি একে কিছু না দিয়ে খাপে পুরি তো অধর্ম হবে। এই কথা ব'লে সে একবার পরিতোষের ও একবার আমার মুখের দিকে বিমর্ষভাবে তাকাতে থাকল, অর্থাৎ তোমাদের দুজনের মধ্যে যেই হোক একটু রক্ত একে দাও।

আমার মাথার ওপরেই দেওয়ালে সেই আরসিটা ঝুলছিল। টপ ক'রে উঠে মুখ দেখবার ভান ক'রে আয়নাটা দেওয়াল থেকে খুলে নিলুম, উদ্দেশ্য, যদি লোকটা পরিতোষের ওপর কোন অত্যাচার করতে উদ্যত হয় তো এক আয়নার ঘায়ে তাকে গোলোকধামের অন্তত মাঝপথ অবধি পৌঁছে দেব।

কিন্তু আমাদের আর কোন কথা না ব'লে সে নিজের উরুতের কাপড়টা তুলে ছোরার মুখ দিয়ে খ্যাঁচ ক'রে খানিকটা কেটে ফেললে, সেই ক্ষতমুখ দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। সেই রক্তে আমাদের বিছানার খানিকটা লাল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ রক্ত বেরুবার পর সে বললে, ছেঁড়া ন্যাকড়া-ট্যাকড়া আছে?

বললুম, ন্যাকড়া তো নেই।

বড়কর্তা আর কোন কথা না ব'লে ছোরাটা কোমরে গুঁজে উঠে পড়ল। তারপর টলতে টলতে গিয়ে নিজের বিছানার চাদরের খানিকটা পড়পড় ক'রে ছিঁড়ে ফেললে। আমরা মনে করলুম, হয়তো এবার উরুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হবে। কিন্তু তা না ক'রে আবার সেই রকম টলতে টলতে আমাদের কাছে এসে বললে, শিলাই আছে?

দেশলাইটা দিতেই সেই চাদর-ছেঁড়া ন্যাকড়ায় আগুন লাগিয়ে দিলে। তারপরে সেই জলন্ত ন্যাকড়া ক্ষতস্থানে চেপে ধ'রে মুখ থেকে হ্যাক হ্যাক ক'রে খানিকটা থুতু বের ক'রে তার ওপরে চাপাতে লাগল। কিছুক্ষণ এই রকম করবার পর বললে, যাক, থেমে গিয়েছে রক্ত-পড়া।

দেশলাইটা মেঝে থেকে তুলে বড়ে সাহেব আমাদের কাছে এসে বললে, তোমাদের তক্‌দির ভাল, আজ ভারি বেঁচে গেলে।

এবার আমি বেশ মিষ্টি ক'রে বললুম, আপনি আমাদের বড় ভাই, আপনি যদি মেরে ফেলেন তো আমরা কি করতে পারি বলুন, ম'রে যেতে হবে।

আমার কথা শুনে বড়কর্তার মেজাজটা বেশ নরম হয়ে গেল। সে বললে, আচ্ছা, আমায় বড় ভাইয়ের মতন মানিস তো?

নিশ্চয়।

তো, যা জিজ্ঞাসা করব ঠিক ঠিক জবাব দিবি?

নিশ্চয়।

মিথ্যে বললে, আমায় চেনো না, জিন্দা মাটিতে গেড়ে দেব। ও তোমার বাবুজী কি মনোরমা, কি তোদের বাপ এলেও বাঁচাতে পারবে না।

এ কথার আর কি উত্তর দেব! গভীরভাবে গবেষণায় মন দেওয়া গেল, বাবুজী বা মনোরমা কি করবেন জানি না, কিন্তু সত্যিই যদি আমার বাবা এ সময়ে এখানে উপস্থিত হন, তা হ'লে এই জিন্দা গেড়ে দেবার শুভকার্যে তিনি এ ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন কি বাধা দেবেন, তাই নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় চলতে লাগল।

আমার চিন্তাধারাকে চমকে দিয়ে বড়কর্তা খিঁচিয়ে উঠল, কি সাচ্ সাচ্ বলবি তো?

এবার পরিতোষ বললে, নিশ্চয়ই বলব, আপনি জিজ্ঞাসাই করুন না।

বড়ে সাহেব এবার চক্ষু বুজে কি ভাবতে আরম্ভ করলে তা সে

জানে। আমার মনে হতে লাগল যে, লোকটা বোধ হয় বত্তিনাথের বন্ধু। কাশীতে হয়তো আমাদের নামে ঢি-ঢি প'ড়ে গিয়েছে, সেসব কথা জানতে পেরে এ ব্যক্তি রাজকুমারী সম্বন্ধেই কোন প্রশ্ন ক'রে বসবে। কিন্তু আমার সব আন্দাজ ব্যর্থ ক'রে দিয়ে চোখ বুজেই সে প্রশ্ন করলে, রোজ কতখানি ক'রে কোকেন খাওয়া হয় ?

বলেন কি মশায়! কোকেন-টোকেন আমরা খাই না।

বাড়ি থেকে ভেগেছ বাবা, আর কোকেন খাও না! ন্যাকা বোঝাচ্ছ আমাকে ?

এ কথার আর কি জবাব দেব! বাড়ি থেকে ভাগতে হ'লে যে আগে থাকতে কোকেন খাওয়ার অভ্যেস করতেই হবে, এমন কোন শাস্ত্রের সঙ্গে ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় হয় নি।

চুপ ক'রে আছি, এমন সময় বড়দা বললে, আচ্ছা দেখি, জিভ বের কর্ তো!

আমরা একে একে জিভ বের ক'রে দেখালুম, কিন্তু সে ব্যক্তি তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে উঠে গিয়ে কুলুঙ্গিগুলো হাতড়ে হাতড়ে কি খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর আমাদের কাছে ফিরে এসে লোকটা বললে, কি বাবা, ঠিক সরিয়েছ তো ?

কি ?

মোমবাতি। আমার বড় একটা মোমবাতি ছিল, সেটা পাচ্ছি নে।

আমি বললুম, আপনার মোমবাতি কোথায় গেছে আমরা তা জানি না। আমরা এসে অবধি ও কুলুঙ্গিতে হাত পর্যন্ত দিই নি।

পরিতোষের দিকে চেয়ে দেখলুম, রাগে তার চোখ দুটো রাঙা হয়ে উঠেছে। একটা কিছু হাঙ্গামা বাধাবার জন্যে যেন সে উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা করবার চেষ্টায় আমি বেশ মিষ্টি ক'রে বললুম, এত রাত্রে মোমবাতি কি হবে বড়দা ? বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসব ?

বড়কর্তা বললে, তোরা কতখানি ক'রে কোকেন খাস তা এক্ষুনি ধ'রে ফেলতে পারতুম মোমবাতিটা পেলে।

কি ক'রে ?

মোমবাতির টোপা জিভে ফেললেই বুঝতে পারা যাবে। যদি কোকেন

খাওয়ার অভ্যেস থাকে তো মোমবাতির টোসা পড়লে জিভে লাগবে না, আর না হ'লে জিভ পুড়ে যাবে।

কি সর্বনাশ! মনে মনে বিশ্বনাথকে প্রণাম জানিয়ে বললুম, ভাগ্যে লোকটা মোমবাতি পায় নি!

হঠাৎ পরিতোষ চেঁচিয়ে উঠল, আপনি রোজ কতখানি ক'রে কোকেন খান?

বড়কর্তা বোধ হয় কল্পনাও করতে পারে নি যে, আমাদের তরফ থেকে এমন কোন প্রশ্নের সম্ভাবনা হতে পারে। প্রশ্নটা কানে যেতেই প্রথমে সে চমকে উঠল। তারপর পরিতোষের দিকে কটমট ক'রে চাইতে লাগল। গোড়ার দিকে লোকটার হালচাল ও বিছুয়ার রূপ দেখে মনের মধ্যে যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল, এতক্ষণ কথাবার্তার ফলে সে ভয় অনেকটা কেটে গিয়েছিল। হঠাৎ পরিতোষের গলায় অতি পরিচিত সুর শুনে আমার মনও সাহসে ভ'রে উঠল। আমি তড়াক ক'রে উঠে গিয়ে আয়নাটা দেওয়াল থেকে নামিয়ে দু-হাত দিয়ে ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। পরিতোষ আমার দিকে একবার দেখে নিয়ে বোধ হয় নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সেই সুরেই বড়কর্তাকে বললে, যাও, বাপের সুপুত্র হয়ে ভদ্রলোকের মতন বিছানায় শুয়ে পড়গে। রাত দুপুরে বাড়িতে এসে মাতলামি করতে লজ্জা করে না? এক্ষুনি না শুয়ে পড়লে বাবুজীকে গিয়ে খবর দেব।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল

(পূর্বানুবৃত্তি)

And this defendant further answering denies that shortly or at any time after the death of the said Ramcaunt Roy the said Juggomohan Roy and this defendant caused the said two Talooks to be transferred in the books of the said Collector to the name of Gooroodas Muckerjee a grandson by a daughter of the said Ramcaunt Roy in trust for the joint benefit of the said Juggomohan Roy and this defendant as untruly stated in the Complainants Bill of Complaint But this defendant further answering saith that some time after this defendant had conveyed the said several Talooks to the said

Rajiblochan Roy as hereinbefore in that behalf mentioned a son was born to this defendant whereupon this defendant gave up his intention of leaving the said two Talooks to be enjoyed after his decease by the said Gooroodoss Muckerjee But in as much as the said Rajiblochan Roy had done several acts respecting the said several Talooks in the name of the said Gooroodoss Muckerjee he this defendant did cause a transfer of the said two Talooks to be made in the books of the said Collector of Burdwan to the name of the said Gooroodoss Muckerjee and that shortly after the return of this defendant to Calcutta and when the said Gooroodoss Muckerjee had attained to the age of twentysix years or thereabouts this defendant resumed the said several Talooks and obtained a regular Conveyance and transfer thereof from the said Gooroodoss Muckerjee and in order to compensate the said Gooroodoss Muckerjee for the disappointment which he experienced in consequence of the birth of this defendants said son as aforesaid this defendant did about the same period of time by a Deed of gift transfer to the said Gooroodoss Muckerjee the whole of the right title and share of this defendant of in and to the said house at Nangoorparah in as full and ample a manner as the same had been granted and allotted to him this defendant by his said father under the aforesaid instrument of partition and which share of the said last mentioned house is as this defendant believes now in the use possession and occupation of the said Gooroodoss Muckerjee and this defendant further answering saith that the said Ramlochan Roy departed this life at or about the time in the Complainants Bill in that behalf mentioned leaving him surviving a widow named Labunggoluttah Daby and an only son named Hurgovind Roy, who as this defendant is advised and believes was the sole heir and personal representative of the said Ramlochan Roy and also leaving him surviving a daughter named Drubbamayee who afterwards married one Doorgapersaud Moockerjee by whom she has issue male and female now living and which said Drubbamayee is also now living and this defendant further answering saith that the said Hurgovind Roy departed this life, at or about the time in the Complainants Bill in that behalf mentioned without issue and leaving a widow named Hurrosoondary Dabey him surviving And this defendant further answering admits that the said Labunggoluttah Dabey and Hurrosoondary Dabey or either of them are or is not inhabitants or an inhabitant of Calcutta and that neither of them to the knowledge or belief of this defendant is in any manner subject to the jurisdiction of this Honourable Court And this defendant further answering denies that the said Ramcaunt Roy in his lifetime at any time subsequent to the date of the

said instrument of partition lent to different persons or to any person or persons large or any sums of money out of any joint funds or that any such oans or sums remained due and owing to the said Ramcaunt Roy at the time of his death or that this defendant recovered or got in several or any of such debts no such debts to the knowledge or belief of this defendant having at any time existed But this defendant further answering admits that he this defendant hath since his father's death received the principal and part .of the interest of a sum of about Eight thousand Sicca Rupees which he this defendant out of his own funds and some years before the death of the said Ramcaunt Roy lent to the Honourable Andrew Ramsay formerly Commercial resident at Junghipore and this defendant hath also recovered and received the sum of Five thousand Rupees or thereabouts with interest which he this defendant in like manner out of his own proper monies lent to Thomas Woodford Esq. formerly acting Collector at Dacca but this defendant positively denies that the said last mentioned sums or either of them or any part thereof were or was lent to the said Andrew Ramsay and Thomas Woodford respectively either by the said Ramcaunt Roy in his lifetime or out of any joint funds to which the said Ramcaunt Roy Juggomohan Roy or either of them were or was in any manner entitled And this defendant further answering denies that after the death of the said Ramcaunt Roy the said Juggomohan Roy and this defendant purchased out of any joint funds there not having been any such funds after the said partition as aforesaid either in the name of Rajiblochun Roy lent in trust for themselves or otherwise either a certain Putteney Talook called Kissenagur situate in Purgunnah Jahannabad in the Zillah of Burdwan of the value of Sicca Rupees Forty thousand or thereabouts or of any other value or a certain other Putteney Talook called Barlook also situate in the said Purgunnah Jahannabad of the value of Sicca Rupees Sixty thousand or thereabouts or of any other value or a certain other Putteney Talook called Barlook also situate in the said Pergunnah Jahanabad of the value of Sicca Rupees Sixty thousand or thereabouts or of any other value And this defendant further answering denies that the said Juggomohun Roy and this defendant out of any joint funds or otherwise purchased in the name of the said Ramlochun Roy lent in trust for themselves or in the name of any .other person the Putteney Talook Nangulparah situate in the Pergunnah of Bayrah and Zillah of Burdwan aforesaid for this defendant further answering saith as the truth is that the said Juggomohun Roy had not at any time any interest whatsoever in the said three last mentioned Talooks or in any or in either of them and that the funds with which the said last mentioned three Talooks were respectively purchased were the proper and exclusive monies of this defendant

ক্রমশ

পদচিহ্ন

ষোল

রাধাকান্ত ডায়েরি লিখছিলেন। আজ নবগ্রামে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘ'টে গিয়েছে। গোপীচন্দ্র দেবতার আশীর্বাদ পেয়েছেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরই রাধাকান্ত ঘটনাগুলি লিখছিলেন। ঘষা কাচের চৌকা লণ্ঠনের মধ্যে বড় মাটির প্রদীপে রেড়ির তেলের আলো জলছে। পাশে তাঁর শিশুপুত্র গৌরীকান্ত শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাধাকান্ত ইদানীং একা হয়ে পড়েছেন। তাঁর একাকীত্বের হেতু তিনি নিজেই। বাইরের সঙ্গে সংস্রব তিনি নিজেই রাখতে চান না। খোলার মধ্যে কচ্ছপের আত্মগোপন ক'রে আত্মরক্ষার যে উপায়, সেই উপায় সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা সম্ভবত স্বভাবজ, বোধ হয় বহুবিবর্তনবাদের মধ্যেও কামড়ানো আঁচড়ানো, সরীসৃপের মত পেষণ করা, লাথি মারা, ঢুঁ মারার অভিজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির মত ওটা মানুষের মধ্যে র'য়ে গিয়েছে। পিঠে খোলার অভাব পূরণ ক'রে দেয় চারিপাশের দেওয়াল এবং মাথার উপরের আচ্ছাদন, তা সত্ত্বেও যারা দরজা ঠেলে নিকটে আসে তাদের কাছে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ মনের ঘরে ঢুকে বসে। এমন ক্ষেত্রে যারা আসে, তারা অল্পক্ষণ নাড়াচাড়া ক'রে আসল মানুষ অর্থাৎ মনকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে যায়। রাধাকান্তের বন্ধুবান্ধব গ্রামস্থ ভদ্রজন এই ভাবেই ফিরে গিয়েছে।

বংশলোচন সেদিন ব'লে গিয়েছেন, আহা-হা! মরি মরি! একেবারে রাধিকার অবস্থা! 'বজরমুখী রাই আমাদের ব'সে আছেন একা।'

এতেও কোন উত্তর দেন নাই রাধাকান্ত, শুধু একটু হেসেছিলেন। তিনি গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। অন্তরের মধ্যে অশান্তি অনুভব করেন। মধ্যে মধ্যে নিজেও শিউরে ওঠেন। মনে হঠাৎ প্রশ্ন জেগে ওঠে, আমি কি ঈর্ষার আগুনে পুড়ছি? গোপীচন্দ্রের সম্পদ তার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি কি ঈর্ষান্বিত? নিজের ডায়েরি উল্টেপাল্টে দেখেন। অনেক জায়গায় চোখে পড়ে, গোপীচন্দ্রের সমালোচনা করেছেন, তাঁর কর্মের মধ্যে কূটবুদ্ধির ছায়া দেখে কারার অস্তিত্ব অনুমান করেছেন; বার বার সেই জায়গাগুলি প'ড়ে নিজেকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। নিজের মনে আপনার ইষ্টদেবতাকে ডাকেন, ডায়েরিতে লেখেন, "হে শঙ্কর দেবাদিদেব, হে মাতঃ অন্নপূর্ণে রাজরাজেশ্বরী, তোমার অধম সন্তানকে কৃপা কর, শক্তি দাও, সুমতি দাও, সম্পদ দাও, প্রচুর অর্থ দাও, তোমার দাসানুদাস আমি, সাধ পূর্ণ করিয়া সৎকর্ম করি; স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা নবগ্রামের সেবা করি, কীর্তিতে কীর্তিতে নানা অলঙ্কারে জননী জন্মভূমিকে কমলার মত রত্নালঙ্কারভূষিতা করিয়া তুলি।"

কোনদিন লেখেন, "আমার জীবনে কোন আশা নাই; আমার গৌরীকান্তের প্রতি কৃপা কর। তাহাকে বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও, সাহস দাও, প্রতিষ্ঠা দাও। বাবা গৌরীকান্ত,

আমার অভিলাষ তুমি পরিপূর্ণ করিয়ো। প্রাণপণে বিদ্যার্জন কর। স্বদেশে পূজ্যন্তে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। ধনী হইবার চেষ্টা করিয়ো না, তাহাতে নবগ্রামে হয়তো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে, কিন্তু বিদ্বান পণ্ডিত কর্মী হইলে সমগ্র দেশ তোমাকে পূজা করিবে।" গৌরীকান্তকে মুখে বলেন। নিজে পড়ান।

তবুও এর মধ্যেও নবগ্রামের ঘটনাচক্র প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চার করে অথবা বিচিত্র আকস্মিকতার সুযোগ নিয়ে এসে তাঁর জীবনে আবর্তের সঞ্চার করে। আজ তিনি লিখছিলেন, "মনে করি এখানকার কোন ঘটনার সংস্রবে থাকিব না, কোন চিন্তাকে মনে স্থান দিব না। কিন্তু সে বোধ হয় মানুষের অসাধ্য। আষ্টে-পৃষ্ঠে জটিল জালে একের ভাগ্য জীবন, অপর সকল মানুষের ভাগ্য এবং জীবনের সহিত আবদ্ধ। অনুরূপ একটি কর্মের প্রবাহ রহিয়াছে। স্পষ্ট অনুভব করিতেছি। ষোড়শী কোথাকার কে? তাহাকে একদিন আশ্রয় দিয়াছিলাম, কিন্তু রক্ষা করিতে পারি নাই। হতভাগিনী চলিয়া গিয়াছে অধঃপতনের পথে। সে মুছিয়া গিয়াছিল। সে তো কোনদিনই এ সংসারের কেহ ছিল না। বাহির হইতে আসিয়া দুই-চারিদিনের জন্য বায়ুতাড়িত বিহঙ্গীর মত আশ্রয় লইয়াছিল। নিজেই উড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং মুছিয়া যাওয়ার পক্ষে বাধাই বা কোথায়? আশ্চর্যের কথা, আজ গোয়ালপাড়ার রঙলালের পুত্র নবীন একটি সুন্দর কাঠের ঘোড়া হাতে করিয়া আসিয়াছিল, বলিল, ষোড়শী এটি গৌরীকান্তকে পাঠাইয়া দিয়াছে। নবীন বর্ধমান গিয়াছিল, ষোড়শীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। হতভাগিনী পাপীয়সী। তাহার দেওয়া কোন সামগ্রী গ্রহণ করা উচিত নয়। আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু সমস্ত দিন ষোড়শীর কথা মনে করিতেছি। স্বর্ণের উপর ক্রোধ হইতেছে। স্বর্ণ মনে করে, কৃতকর্মকে চাপা দেওয়া যায়, ভ্রূণের মত হত্যা করা চলে। হায় ভগবান! ভ্রূণকে হত্যা করিয়া জলের তলায় চাপা দেওয়ায় সম্প্রতি একটি পুষ্করিণীতে মাছ মরিয়াছে। গলিত ভ্রূণ ভাসিয়া উঠিয়াছে। পচা মাছ খাইয়া গ্রামে একদফা উদরাময়ের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া গেল। অধিকাংশ লোকের কৃষাণ উদরাময়ে শয্যাশায়ী থাকায় এবার এই জ্যৈষ্ঠ মাসে চাষের ক্ষতি হইল। এই ক্ষতির ফল ভবিষ্যৎ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া চলিবে।

"নবীন বলিল, ষোড়শী নাকি ইহারই মধ্যে নিজের অবস্থা সচ্ছল করিয়া তুলিয়াছে। আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। মেয়েটির রূপ আছে, বয়সে যুবতী, সুতরাং দেহ-ব্যবসায়ে অবিলম্বেই তাহার অবস্থা ফিরিবার কথা। ষোড়শী নবীনকে বলিয়াছে, স্বর্ণবাবুর সহিত অথবা অমূল্য-ভূপতির সহিত বারান্তরে বিবাদ বাধিলে সে বিবাদে প্রয়োজন হইলে ষোড়শী তাহার যথাসর্বস্ব দিবে। স্বর্ণের কর্ম ফলে পরিণত হইয়া নূতন কর্মবীজ প্রস্তুত করিতেছে। বিবাদের ক্ষেত্র তো প্রস্তুত। নবীনকে তো উদ্যত দেখিলাম।"

"কথাপ্রসঙ্গে ধর্মরাজপূজার সঙের কথা উঠিল, বলিলাম, কাজটা কিন্তু ভাল হয়

নাই তোমাদের। মানীজনের মানহানি করা শুধু অন্যায়ই নয়, অধর্ম। এবং ইহা হইতে বিবাদ বাড়িয়াই চলিবে। নবীন হাসিল। অর্থাৎ বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নয় সে, ইহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল। বুঝিতেছি, বিবাদ বাধিবে। কর্মকে চাপা দেওয়া যায় না, এই তার আর এক নিদর্শন। নবীনকে স্বর্ণ চাবুক মারিয়াছিল; নবীন ফৌজদারিতে মামলায় উদ্যত হইয়া কৃতকার্য হয় নাই, স্বর্ণ আটঘাট বন্ধ করিয়াছিল, এখানেও কেহ নবীনকে সাহায্য করে নাই। স্বর্ণ সেদিন গোঁফে চাড়া দিয়া বলিয়াছেন, ফুঃ। তুলার আঁশ ফাটিয়া বাতাসে উড়িয়া যায় বলিয়া শূন্যেই চিরদিন থাকে না, একদা সে বীজের ভারে মাটিতে পড়িয়া নূতন অঙ্কুরের সৃষ্টি করে। ধর্মরাজপূজার 'সঙ' উপলক্ষ্যে যাহা চাপা ছিল, তাহা দশ-বিশখানা গ্রামে প্রচার হইয়া গেল। নূতন কলঙ্ক রটনা করিয়া নবীন শোধ লইয়াছে। এ গ্রামের চন্দ্র গড়াঞী মুকুন্দ ময়রা ইহারা নবীনকে ব্যঙ্গ করিয়া সেই ঘটনাকে আরও স্পষ্ট করিয়া বিবাদ-সংঘর্ষকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছে।

• "মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হইতেছে, কীর্তিচন্দ্রের ইহাতে গোপন প্রেরণা আছে। শুনিলাম, গোপীচন্দ্রও নাকি সঙ দেখিয়া মুচকি হাসিয়াছিলেন।"

হঠাৎ লেখা বন্ধ করলেন রাধাকান্ত। গোপীচন্দ্র কীর্তিচন্দ্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ ক'রেই তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন। এ কি করছেন তিনি? ঘটনাপ্রবাহের গতি অপ্রতিহত, কর্মফল বিচিত্র ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করে। এ মহাসত্যকে স্বীকার ক'রেও তিনি কীর্তিচন্দ্র-গোপীচন্দ্রের উপর দোষ দিচ্ছেন কেন? তবে পরিকল্পনা বুদ্ধিমানের, তাতে সন্দেহ নাই।

ধর্মরাজপূজার শেষদিন অর্থাৎ 'ভাঁড়াল' মিছিলের দিন এই ব্যাপারটা ঘ'টে গিয়েছে। বৈশাখী পূর্ণিমার দ্বিপ্রহরে ভক্তেরা ফুলের মালায় সজ্জা করে, গলায় গুলঞ্চ চাঁপার মালা, মাথায় রাঙাজবার মালা পরে, কেউ এক-গাছা, কেউ দু-গাছা, কেউ চার-গাছা, মাথায় গামছার বিঁড়া নিয়ে তার উপর নেয় পূর্ণ কুম্ভ, সিন্দুর চন্দনে বিচিত্রিত কুম্ভ, তার উপর মোটা ফুলের মালা পরিয়ে দেয় কুম্ভের গলায়। তারপর ভক্তদের প্রবীণত্ব এবং গুরুত্ব বিচার ক'রে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। এক এক সারিতে পাঁচজন অথবা সাতজন অথবা নয়জন দাঁড়ায়; সারির পিছনে সারি। সর্বাগ্রে থাকে ঢাকের দল, ঢাক এবং ভক্তদের মধ্যে থাকেন দেবাংশী এবং পরিচারকেরা। প্রকাণ্ড বড় বড় ধুমুচিতে গনগনে আগুনের মাথা থেকে ওঠে ধূপের ধোঁয়া। বৈশাখের দুপুরের রৌদ্রে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে থাকে নীলাভ রঙ ধ'রে। ঢাক বাজে দেরে-দান্-দেরে দান্-দেরে দান্-দেরে-দান্, হুড়ুম-হুড়ুম, দে-রে, দে-রে, দেরে-দেরে, হুড়ুম।

বায়েনরা বলে, শিবরাম-শিবরাম-শিবরাম-শিবরাম, শিবম্-শিবম্, রাম-রাম-রাম-রাম শিবম্।

ভক্তরা নাচতে নাচতে চলে, বলো শিবো, ধম্মর—জো—! হে ধরম! মধ্যে মধ্যে নাচে মাতন ধরে। তখন ঢাকীরাও নাচে, তাদের কেশর ফুলো নাচে ঢাকের মাথায়, তখন মুখে বলে, ভক্ত নাচে! ভক্ত নাচে! ভক্ত নাচে। ভক্ত নাচে! রাজো রাজো রাজো রাজো ধর্মরাজো ধরমের ভক্ত নাচে! ধর্মরাজো।

বৈশাখের আকাশ, রৌদ্রের উত্তাপে খাঁ-খাঁ করা আকাশের কোলে কোলে সে প্রচণ্ড শব্দ পরিপূর্ণ হয়ে অদৃশ্য সঞ্চারে সঞ্চরণ করে। আকাশের বায়ুস্তর কাঁপে, বায়ুস্তরে ভাসে যে গ্রীষ্মের জলশূন্য শুষ্ক ধূলিকণা ধ্বনির আঘাতে সেগুলি চঞ্চল হয়ে ফেরে।

ভক্তদের পিছনে থাকে গ্রামের মানুষ। হরিজনদের আবালবৃদ্ধবনিতা। বণিক সাহা পাড়াএতীদের শূদ্রদের পুরুষেরা থাকে, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীরা যুবতীমণ্ডলীর পাশে পাশে চলে। তাদের পিছনে থাকে সঙ।

শিব-দুর্গা সাজায়। নন্দী-ভৃঙ্গী থাকে। ভূতপ্রেত থাকে। পূর্বকালে মানুষের দশ দশা সাজানো হ'ত। কৃষ্ণরাধাও সাজায়। এসব এখন কম। এখন বেশি হয়, সঙের মধ্য দিয়ে নবগ্রাম করে গোয়ালপাড়াকে ঠাট্টা, গোয়ালপাড়া করে নবগ্রামকে ঠাট্টা। গতবার নবগ্রাম সাজিয়েছিল—এক চাষা হরিতকীর মোরব্বার আঁটি হাতে নিয়ে প্রচণ্ড ভাবনায় পড়েছে। কাগজে লিখে দিয়েছিল মোটা মোটা হরফে এবং যে চাষা সেজেছিল সে সুর ক'রে ছড়া কেটে বলছিল, "সন্দেশের মধ্যে আঁটি? পুঁতলে তো বিক্ষ (বৃক্ষ) হবেন খাঁটি! ওরে বাপা খুঁড়ে ফেল, খুঁড়ে ফেল রে হেঁসেলে (রান্না) ঘরের মাটি। আহা! পুঁতবার আগে আমি আরও দুবার চাটি।" ব'লে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে আঁটিটি চাটছিল. গোয়ালপাড়া গতবার সাজিয়েছিল ফক্কাবাবু। বাবুর মা সাজিয়েছিল একজনকে, সে ধান ভানছিল, আর সিগারেট মুখে দিয়ে বাবু এলাচ খাচ্ছিলেন। "মা খায় ধান ভেনে—ছেলে খায় এলাচ কিনে" এই প্রবাদটা একটা কাগজে লিখে দিয়েছিল।

এবার সঙে অভাবনীয় ব্যাপার ঘটেছে। দুপক্ষেরই সঙের তীব্র ব্যঙ্গ শ্লেষ বর্ষিত হয়েছে স্বর্ণবাবুর উপর। নবগ্রামের সঙে নবীনকে ঠাট্টা করেছে, স্বর্ণবাবুর হাতে চাবুক খাওয়া নিয়ে। একজন সেজেছিল জমিদার, জমিদারটিকে যথাসম্ভব স্বর্ণবাবুর সাদৃশ্য দেবার জন্য একজোড়া সূক্ষ্মাগ্র গোঁফ এঁকে দিয়েছিল কালি দিয়ে; মাথায় চুলের সঙ্গে একটি টিকি বেঁধে দিয়েছিল। জমিদার স্বর্ণবাবুর অভ্যাস অনুরূপ বাঁ হাতে কখনও টিকিতে পাক দেওয়ার কখনও গোঁফে পাক দেওয়ার অভিনয় করেছিল, আর ডান হাতে ঘোড়ার চাবুক তুলে চোখ রাঙা ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, সামনে একজন চাষীর ছেলে সেজে পিঠে চাবুকের দাগ লাল কালিতে তুলি দিয়ে এঁকে একটি হাত কানে অপর হাতটি নাকে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নাকে ধুলো দিয়ে 'নাকখত' দেওয়ার চিহ্নও এঁকে দেওয়া

হয়েছিল। আর একটিতে গোপীচন্দ্র যে গোয়ালপাড়ার নতুন জমিদার হয়েছেন, তাই নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিল গোয়ালপাড়ার লোকদের। সেটা করেছিল এইভাবে, একজন অবস্থাহীন জমিদার দপ্তর বগলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ম্লান মুখে, তার সামনে চাষীপ্রজারা তর্জনী হেলিয়ে বলছে 'দেহি দেঙ্গা'। অর্থাৎ খাজনা। তার পিছনে গোপীচন্দ্রের মত ধরন-ধারণ ক'রে নতুন জমিদার ঢুকছেন গ্রামে, হাতে তাঁর দণ্ড, তাঁর সামনে চাষীরা আকর্ণবিস্তার হাসি হেসে বলছে, আসুন, আসুন। অন্য একটায় করেছিল ষোড়শীকে নিয়ে ব্যঙ্গ। একজন বাইজী সেজে কুৎসিত ভঙ্গীতে গালে একটি আঙুল রেখে অন্য হাতের আঙুল দিয়ে তার পা দেখিয়ে দিচ্ছে। কাগজে লিখে দিয়েছে "এস গো বাবুরা মোর চরণ-ধরণে; স্বর্গে যাব চাষার মেয়ে কাটা চরণে।"

আশ্চর্যের কথা তিনটি সঙেই বিদ্ধ হয়েছেন স্বর্ণবাবু। গোয়ালপাড়ার চাষীরা কতখানি লজ্জা পেয়েছে বা তাদের অঙ্গজ্বালা কতখানি হয়েছে, সে কথা রাধাকান্ত জানেন না। কিন্তু তিনটি সঙ দেখেই লোকে স্বর্ণবাবুকে মনে না ক'রে পারে নাই। স্বর্ণবাবু নিজেও এগুলির প্রত্যেকটিকে নিজের প্রতি নিক্ষিপ্ত বাণ ব'লে বুক পেতে নিয়েছেন। যে সঙটিতে অবস্থাহীন জমিদারকে উপেক্ষা ক'রে চাষীরা মুষলহস্ত গোপীচন্দ্রের কাছে নতজানু হয়েছে, সেটিতেও তিনি নিজেকে অবস্থাহীন জমিদারদের মধ্যে ফেলা হয়েছে এবং গোপীচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা ক'রে তাঁকে ছোট করা হয়েছে ভেবেছেন। ষোড়শীকে নিয়ে সঙটিতে তাঁর ব্যথা অত্যন্ত গোপন। এটাও যে তিনি তাঁর প্রতি ব্যঙ্গ ব'লে গ্রহণ করেছেন, এ কথা অন্য কেউ বুঝতে না পারলেও রাধাকান্ত বুঝেছেন।

গোয়ালপাড়াও সঙ দিয়েছে মর্মান্তিক ব্যঙ্গ ক'রে।

প্রথম সঙে একটা আবলুশের মত কুচকুচে কালো ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে তার দুই হাতের সঙ্গে দড়ির বাঁধন দিয়ে পাখার মত বেঁধে দিয়েছিল দুখানা কুলো। অর্থাৎ পরী। তার মাথায় একটা ঝুড়ি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল সে মজুরনী অর্থাৎ ছোট জাত। একটা বস্তার মধ্যে কাগজ পুরে কালো রঙ দিয়ে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে পায়ের কাছে রেখে দিয়েছিল, গায়ে লিখে দিয়েছিল 'শুয়ার'। পরীটার সামনে একজন বাবু, তাঁর পিছনে বাবুদের ছোকরার দল, তাদের পিছনে আর একদল, কারও হাতে দাঁড়িপাল্লা, কারও হাতে মিষ্টির পাত্র, কারও হাতে তেলের ভাঁড়, কারও হাতে মদের হাঁড়ি অর্থাৎ বেনে-ময়রা-কলু-শুঁড়িদের সকলে। সামনের বাবুটির সঙ্গে ওরা অবশ্য স্বর্ণবাবুর সঙ্গে কোন প্রকার সামঞ্জস্য রাখে নি, কিন্তু তিনি যে স্বর্ণবাবু এ সম্বন্ধে কোন সংশয়ই থাকে না। ঘটনা যেখানে সর্বজনবিদিত সত্য এবং দিনের আলোর মত স্পষ্ট, সেখানে সামান্য উল্লেখে অথবা অস্পষ্ট হ'লেও ইঙ্গিত মাত্রেই তা মানুষের মনে আপনা থেকে জেগে ওঠে। এই সঙটি দেখে গোপীচন্দ্র মুচকে হেসেছেন।

দ্বিতীয় সঙে গোয়ালপাড়া গোপীচন্দ্রের স্তুতি করেছে। শিব-দুর্গার সামনে গোপীচন্দ্র নতজানু হয়ে বসেছেন, তাঁরা আশীর্বাদ করছেন তাঁকে, পিছনে একজন সাহেব অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দাঁড়িয়ে গোপীচন্দ্রের পিঠে হাত দিয়ে সমাদর করছেন অথবা পৃষ্ঠ-পোষকতা করছেন।

গোপীচন্দ্র গোয়ালপাড়ার নতুন জমিদার হয়েছেন, এজন্ত তাঁর স্তুতি করেছে তারা। সঙ্গে সঙ্গে পুরানো জমিদারদের প্রতি তাদের বীতরাগও প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। অন্তত তাই মনে করছেন অন্ত সকল জমিদার এবং স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিরা। সবচেয়ে বেশি মনে করছেন স্বর্ণবাবু। কারণ পুরানোর প্রধানদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রধানতম।

এইটুকু নিয়ে রাধাকান্তের সন্দেহ ছিল। গোপীচন্দ্রের স্তুতি করার অভিপ্রায়ের অন্তরালে অপর সকলকে অবজ্ঞা উপেক্ষা এমন কি তাঁদের অবনতি-কামনা লুকানো আছে, এ কথাটা বার বার তাঁর মনে হয়েছে; কিন্তু তিনি নিজেই নিজের এ কল্পনাকে শাসন করেছেন, সংযত করেছেন, অস্বীকার করেছেন। নিজেকেই নিজে বলেছেন, ছি ছি! এ কথা মনে করছি কেন? একজনের মঙ্গলকামনা করলেই কি অপরের অমঙ্গলকামনার অভিপ্রায় সন্দেহ করতে হবে? এ যে মক্ষিকাবৃত্তি!

আজ এ বিষয়েও রাধাকান্তের সন্দেহ সংশয় দূর হয়েছে। নবীনের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে তিনি নিঃসংশয় হয়েছেন যে, গোয়ালপাড়ার লোকের মনে ওই কদর্য অভিপ্রায়টা সত্যই ছিল। তিনি সঙের কথা তুলে বলেছিলেন, কাজটা তোমরা ভাল কর নাই বাপু।

নবীন নিরুত্তর হয়ে রইল, কিন্তু গোপন তৃপ্তির খানিকটা হাসি সে গোপন করতে পারলে না। মুচকে হেসে ফেলে সে মুখ নামালে।

রাধাকান্ত এবার প্রশ্ন করলেন, তা হ'লে বিবাদ করাই তোমাদের অভিপ্রায়?

আজ্ঞে? নিরীহের মত মুখ তুললে নবীন।

বিবাদই তা হ'লে চাচ্ছ তোমরা?

আজ্ঞে না। সঙ দিয়েছি, সঙে নানারকম দেয়, তা ঝগড়া-বিবাদের জন্তে তো দেয় না।

সে সত্যি। কিন্তু এতে স্বর্ণবাবু এবং আর সব বাবুর অপমান তো হয়েছে। এটা তো বুঝতে পারছ?

কপালে সারি সারি রেখা ফুটে উঠল নবীনের। সে বললে, অপমান যদি হয়ে থাকে তবে মানহানির নালিশ করুন বাবুরা।

দপ ক'রে মাথার মধ্যে আগুন জ'লে উঠল যেন। রাধাকান্তবাবু চোখ বুজলেন,

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। নিজেকে সংযত করার এটি তাঁর একটি অভ্যাস-করা পন্থা। তাঁকে বলেছিলেন এক সাধু।

নবীন কিন্তু ক্ষান্ত হ'ল না, সে ব'লেই গেল, কাউকে অপমান করার ইচ্ছে ছিল না আমাদের বাবু। তবে এ গাঁয়ের বাবুদের ধারাধরন নিয়ে সঙ দিতে গিয়ে ওটা হয়ে গিয়েছে। বাউড়ীদের মেয়েটা—ওই সাতন বাউড়ীর বুনটাকে নিয়ে যে কেলেঙ্কারি আপনাদের গাঁয়ে হচ্ছে, সেটা ভেবে দেখুন। তাই আমরা ওটা দিয়েছি। কেলেঙ্কারি নিয়েই তো সঙ। আসল ঘটনাটা যদি মিছে হয়, শাস্তি নিতে রাজি আছি আমরা। আপনাদের গাঁ থেকে আমাকে চাবুক মারার ব্যাপার নিয়ে সঙ দিয়েছে। তাতে না হয় আমার খোয়ার হয়েছে, কিন্তু বাবুর কি তাতে 'গৈরব' (গৌরব) বেড়েছে ? আপনিই বলুন। আবার এই যে গোপীচন্দ্রবাবুকে নিয়ে সঙ দিয়েছি, তাতে তো তাঁর সম্মানই করেছি আমরা। এ নিয়ে আপনারা রাগ করলে আমরা আর কি করি বলুন ? জানব আমাদের অদেষ্ট (অদৃষ্ট)।

রাধাকান্ত বললেন, দেখ, আমার রাগের কথা কিছু নাই এর মধ্যে। আমি জমিদার নই। জমিদারেরা যা ভাবছেন, আমারও যা মনে হয়েছে, তাই বললাম। সংসারে বিবাদ বৃদ্ধি ক'রে লাভ কি ?

অন্যায় সহ্য না করতে পারলেই যদি বিবাদ হয় বাবু, তবে বিবাদ হওয়াই ভাল। আর আমরা সইতে পারছি না।

একটু চুপ ক'রে থেকে নবীন হেসে বললে, এবার আর বিবাদ সহজ হবে না বাবু। গোপীচন্দ্রবাবু জমিদার হয়েছেন, আমরা একটা আশ্চয় (আশ্রয়) পেয়েছি।

চমকে উঠলেন রাধাকান্ত। কি বললে ?

গোপীচন্দ্রবাবু জমিদার হয়েছেন এবার। স্বর্ণবাবু কি বংশলোচনবাবুরা আর যা-মন তাই করতে পারবেন না।

তা হ'লে খুশি হয়েছ তোমরা ?

তা হয়েছি আজ্ঞে।

এতদিনের পুরনো জমিদার, অবস্থা খারাপের জন্তে জুলুমও ছিল না তার, তার জন্তে দুঃখ হয় না তোমাদের ?

চুপ ক'রে রইল নবীন। এ কথার উত্তর দিতে পারলে না।

কি হে ?—হেসে প্রশ্ন করলেন রাধাকান্ত।

নবীনের কপালে আবার সারি সারি রেখা দাঁড়িয়ে উঠল। নখ দিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে বললে, তা আজ্ঞে, বড় বাপের ছেলে হতে কার না সাধ হয় বলুন ? জমিদার যার নাম, তিনি যদি জমিদারের মত না হন, তবে আর জমিদারি করা ক্যানে তাঁর ?

জমিদার পাঁচটা কীর্তি করবেন, দান ধ্যান করবেন, দশটা লোক তাঁর কাছে হাত পাতবে, নাম করবে। আমাদের জমিদার বলতেও তো বুকটা আমাদের ফুলে ওঠে আজ্ঞে। তা না, জমিদার এ বেলা আসছে, উ বেলা আসছে। চারটি শাক, দুটো লাউডগি, দু গণ্ডা বেগুন, চার গণ্ডা মূলো, আধ সের মাছ, আজ এক টাকা, কাল দু টাকা, টাকা না হয় আট গণ্ডা পয়সা, এ যারা করে তাদের জমিদারিতে কাজই বা কি, আর তাকে জমিদার বলতেই বা মন হবে ক্যানে, বলুন?

অকৃতজ্ঞ মানুষ, কদর্য মানুষ! ঘৃণায় ভ'রে গেল রাধাকান্তের অন্তর। তিনি বললেন, কিন্তু গোপীচন্দ্রবাবু—থাক্, তাঁর কথা থাক্। তিনি সত্যই মহাপুরুষ ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর ছেলে কীর্তিচন্দ্রকে তো জান। তিনি জমিদার হ'লে শাসনটা কি রকম হবে, বুঝতে পারছ তো?

নবীন বললে, তা তিনি রাজা তুল্য লোক, জমিদার শাসন করবেন বইকি।

অত্যাচার করলে কি হবে?

তা যদি করেন তো সে আমাদের অদেষ্ট।

বাইরে থেকে স্বর্ণবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, রাধাকান্তদা!

সঙ্গে সঙ্গে বংশলোচনও ডাকলেন, গোপেশ, গোপীকাকান্ত, রাধাকান্ত হে!

রাধাকান্ত চেয়ার ছেড়ে উঠলেন; অদ্ভুত সমন্বয় তো! স্বর্ণভূষণ এবং বংশলোচন দুজনে একসঙ্গে! বিশেষ ক'রে ইস্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উৎসবে, গোপীচন্দ্র ও বংশলোচন সম্প্রীতি এবং সাম্প্রতিক গোয়ালপাড়ার অংশ ক্রয়বিক্রয়ে স্বর্ণভূষণ-শ্যামাকান্ত-বংশলোচন প্রতিযোগিতা, অবশেষে বংশলোচনের দৌত্যে কীর্তিচন্দ্রের রঙ্গভূমে প্রবেশ ও শ্যামাকান্ত ও স্বর্ণের পরাজয় অধ্যায়ের মাস দুয়েক না যেতেই কোন্ যাদুতে এঁরা দুজনে একত্রিত হয়েছেন? বিস্মিত হয়েই তিনি আহ্বান করলেন, এস এস।

নবীন বললে, তা হ'লে আমি যাই বাবু।

কাঠের ঘোড়াটি দেখিয়ে রাধাকান্ত বললেন, ওটাকে আমি ছোঁব না বাপু, তুমি ওটা নিয়ে যাও।

নিয়ে যাব? ষোড়শী কিন্তু বলেছে, বাবাকে মাকে বলবে।

থাক্। এবার যখন ষোড়শীর সঙ্গে দেখা হবে, তখন ব'লো, আমাদের বাবা-মা বলতে আমি বারণ করেছি।

আজ্ঞে বাবু।

না নবীন, সে কথা তোমরা বুঝবে না। বুঝলে, তুমি ষোড়শীর সঙ্গে দেখা করতে না। নিয়ে যাও।

নবীন ঘোড়াটি তুলে নিয়ে চ'লে গেল। চ'লেই যাচ্ছিল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে ফিরে মুখে

বললে, প্রণাম। ব'লেও কপালে হাতটি শুধু ছুঁইয়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত একটি নমস্কার করলে। সেই মুহূর্তটিতেই বারান্দায় উঠলেন স্বর্ণভূষণ এবং বংশলোচন। নবীন পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল।

স্বর্ণবাবু তাকে তীর্যক দৃষ্টিতে দেখে ঘরের দিকে এগিয়ে এলেন; কিন্তু বংশলোচনের সে স্বভাব নয়, তিনি কথা না বলে ছাড়লেন না, মৃদু হাস্য ক'রে বললেন, কি হে, নবীনচন্দ্র যে। কি সংবাদ?

নবীন ঘাড়টি ঈষৎ নুইয়ে বললে, প্রণাম। এই এখানে একবার বাবুর কাছে এসেছিলাম।

সে তো স্বচক্ষেই দর্শন করছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

একটু কাজ ছিল।

তা তো ছিলই, নইলে রাধাকান্তবাবুর বদন তো চন্দ্রবদন নয় যে, দেখতে এসেছিলে শুধু-শুধু।

নবীন নিরুত্তর হয়ে রইল।

ও। গোপনীয়!

আজ্ঞে না, গোপনীয় কিছু নয়, তবে হ্যাঁ—

হ্যাঁ। গোপনীয় নয়, তবে বলা যায় অন্যকে। বেঁচে থাক, বেঁচে থাক। তা হ্যাঁ বাবা, আমাকে যে প্রণামটি করলে, ও প্রণামটি কার কাছে শিখেছিলে?

আজ্ঞে?

কর্ণে তো বধির নও বাবা, শুনতে তো পেয়েছ। স্বর্ণবাবুকে তো গ্রাহ্যই করলে না।

নবীন এবার কোন উত্তর না দিয়ে হনহন ক'রে চ'লে গেল।

বংশলোচন স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। স্বর্ণবাবু বললেন, এস এস, ভেতরে এস। একটা চাষীর প্রণামের জন্যে এত বকবক করে না।

বংশলোচন বললেন, বাকুম্ কুম পায়রা হব, কোন বেতালের পেটেতে যাব। যাও বাবা তাই, বনবেড়ালের পেটেই যাও, কীর্তিচন্দ্রের পেটেই যাও।

ভিতরে এসে বললেন, গোপনীয় কথাটা কি হে রাধাকান্ত?

থাক সে কথাটা লচুকাকা। এখন তোমাদের কথা বল।

গোপীচন্দ্রের পুকুরে নারায়ণ-বাসুদেবমূর্তি উঠেছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। কালাপাহাড়ের আমলের মূর্তি বোধ হয়। সমস্ত গ্রামের লোক, হৈ-হৈ ক'রে গিয়ে জুটেছে—পাঁচখানা গ্রামের লোক। ঢাক-ঢোলের ব্যবস্থা হচ্ছে। সমারোহ ক'রে নিয়ে আসবে। যাবে নাকি একবার?

স্বর্ণবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত নীরব হয়েই ব'সে ছিলেন, তিনি এবার বললেন, খুড়ো গিয়ে বললেন, চল, দেখে আসি। তা তুমি যদি যাও তো যাই রাধাকান্তদা।

বাসুদেবমূর্তি উঠেছে গোপীচন্দ্রের পুকুর থেকে। শত শত বৎসর পূর্বে যে দেবতা অপমানিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল পুষ্করিণীর গর্ভে, শত শত বৎসর ধ'রে পাঁকে পলিতে স্তরে স্তরে জ'মে যাকে বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত ক'রে রেখেছিল, এতকাল পরে তিনি উঠলেন!

শঙ্খচক্রগদাপদ্মশোভিত হস্ত, ত্রিলোকের পালক বিষ্ণু, আবার উদিত হলেন নবগ্রামের ভাগ্যে! গোপীচন্দ্রের কীর্তির মধ্য দিয়ে তিনি উত্থিত হলেন! পরিপূর্ণ হয়েছে গোপীচন্দ্রের সৌভাগ্য, আজ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দেবতা উঠে ঘোষণা করছেন। এ মুহূর্তে তাঁকে যেতে হবে বইকি। না গেলে তাঁকে যে অপরাধী হতে হবে। রাধাকান্ত বললেন, যাব।

এই! হ'ল তো! ওঠ। চল।—বংশলোচন বললেন স্বর্ণবাবুকে।

স্বর্ণবাবু বিস্মিত হয়ে রাধাকান্তের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, সত্যিই যাবে নাকি?

যাব বইকি। ওরে, আমার জামাটা আন্ তো। আচ্ছা, আমি নিজেই আসছি বাড়ির ভেতর থেকে।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী

৩

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট, জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

মণ্টু, তোমার চিঠি পেলাম। গোড়াতেই লিখেচো যে, বেশ বোঝা যাচ্চে যে আপনি আমার ওপরে ক্রমেই অখুসি হয়ে উঠচেন। অখুসির মানে যদি হয় বিরক্তি তা হলে উত্তরে বোল্‌বো নিশ্চয়ই না। আর অখুসির মানে যদি হয় গভীরভাবে ব্যথিত, তাহলে বোল্‌বো নিশ্চয়ই হাঁ। বস্তুতঃ, তোমাকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি, তাই যখনি মনে হয় দিন শেষ হয়ে আসছে, কিন্তু এ জীবনে আর তোমাকে দেখতে পাবোনা তখন এমন একটা কষ্ট হয় যে সে তোমাদের সাধন-ভজন করার দলে কেউ বুঝবে না। সুতরাং, এ সকল কথার প্রয়োজন নেই। জীবনে অনেক দুঃখই নিঃশব্দে সয়ে গেছি, এও একটা।

তোমার চিঠির আবশ্যকীয় অংশগুলোর একটা একটা ক'রে জবাব দিই। তোমাদের নতুন কাগজ আমাকে পাঠিও। আমি ছাড়া পরিচিত যারা, তাঁদেরও নেবার জন্যে বলে

দেবো। তোমার লেখা বেরুবে, ওটা পড়বার আমার সত্যিই আগ্রহ হয়। তুমি লিখেচো সাহিত্য ব্যাপারে আমার কাছে তুমি ঋণী,—অন্ততঃ এর সংযম সম্বন্ধে। ঋণের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু এই কথাটা তোমাদের অনেকবার বলেচি যে কেবল লেখাই শক্ত নয়, না-লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ, ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন ক'রে না রাখি। অ-লিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব, রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ ক'রে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত করবে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি বইবে না। জ··· তাঁর কি একটা বইয়ে মরা ছেলের বাপ মায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইলো, কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ, লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে দেয়। কে··· চমৎকার লিখতেই পারেন, কিন্তু চমৎকার না-লিখ্‌তে পারেন না। আর এক ধরণের অসংযম দেখতে পাই অ···র লেখায়। ছেলেটি লেখে ভালো, বিলেতেও গেছে,—এই যাওয়াটা ও একটা মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুল্‌তে পারে না। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখায় এমনি একটা অরুচিকর ভক্তিগদ্‌গদ 'আদেকৃলে-পণা' প্রকাশ পায় যে পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ করে। আমার গিরীনমামাকে মনে পড়ে। একবার বৈষ্ণব মেলা উপলক্ষে আমরা শ্রীধাম খেতুরিতে গিয়েছিলাম। মামার বিশ্বাস ছিল খেতুরির প্রসাদ খেলে অম্বল সারে। ষ্টীমার থেকে গঙ্গার তীরে নেমেই মামা অ্যাঃ—করে উঠ্‌লেন। দেখি ভয়ার্ত্তমুখে এক পা উঁচু করে আছেন।

কি হোলো?

বড্ড কাঁচা শ্রীগু মাড়িয়ে ফেলেচি।

তাঁর ভয় ছিল, ভক্তি-হীনতা প্রকাশ পেলে হয়ত অম্বল সারবে না। তোমার দোলার ব্যাপারটাও বিলেতের। সেদিন কয়েকটা অধ্যায় পড়ছিলাম। তাতে এই অহেতুক ভক্তিবিহ্বলতা, অকারণ, অসংযত বিবরণের ঘটাপটা নেই। মনে হয় এও বিলেতে গেছে, জানেও অনেক কিছু কিন্তু জানানোর মাতামাতি নেই। এইটুকু সর্ব্বদাই মনে রেখো মন্টু। আমি আশীর্ব্বাদ করচি একদিন তুমি বড় হবে। অ···র লেখার সম্বন্ধে আমার অভিমত কেউ যদি challenge ক'রে বলে কই দেখাও দিকি। আমাকে প্রত্যুত্তরে হয়ত শুধু এই কথাই বল্‌তে হবে যে এ সব জিনিস এমন জোরে দেখানো যায় না। ও রসজ্ঞ পাঠকের মন আপনি অনুভব করে। অ···দেবীর উপন্যাসে দেখ্‌তে পাবে বেদ বেদান্ত উপনিষৎ পুরাণ কালিদাস ভবভূতি সবাই ঢোকবার জন্যে যেন ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেয়। ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের এই মনোভাবটিই ধরা পড়ে,—ত্যাখো তোমরা আমি কি বিদুষী! কি পড়াটাই পড়েছি, কি জানাটাই জেনেচি। এই

আতিশয্য যেন কোনমতেই না লেখার মধ্যে ধরা পড়ে। ওদের এমনি সহজে আসা চাই যেন না এলেই নয়। এই না-এলেই-নয় জিনিসটাই লেখার বড় কৌশল। এ শেখানো যায় না—আপনি শিখতে হয়। আর শেখা যায় শুধু সংযমের অভ্যাসে। পাঠককে তাক লাগিয়ে দেবার সদিচ্ছায় বাহুল্যে তার স্বকীয় কল্পনার খোরাকে কখনো কৃপণতা কোরব না এই তত্ত্বটি লেখবার সময়ে একটি মিনিটের জন্যেও ভুললে চলবে না। অথচ, বড় ভাব, বড় তত্ত্ব, বড় idea, বড় প্রকাশ, এই নিয়েই চলা চাই লেখা;—জল পড়ে, পাতা নড়ে, লাল ফুল, কালো জল আর ঘায়ে ঘায়ে ঝগড়া আর বৌয়ে বৌয়ে মনোমালিন্য কিম্বা প্র···র বর্ণনায় নিপুণতা,—ঘরের মধ্যে ক'টা আলমারি ক'টা সোফা, প্রদীপে ক'টা শলতে দেওয়া এবং আলনায় ক'টা এবং কি পাড়ের কোঁচানো শাড়ী—এ সবলের দিনও গেছে, প্রয়োজনও শেষ হয়েছে। ও কেবল লেখার ছলে সাহিত্যকে ঠকানো।

তোমার লেখার মধ্যে আজকাল আমি অনেক আশা অনেক ভরসা পাই। অথচ, মনের মধ্যে বেদনা বোধ করি যে এ তুমি ছেড়ে দিলে। আশ্রমে বাস করে সে বস্তু কখনো হবে না। জীবনে যে ভালোবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না তার পরের-মুখে-ঝাল-খাওয়া-কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কত দিন জোগাবে? নাকটেপা-প্রাণায়ামের যোগবলে আর-যা-কিছুই হোক্ এ বস্তু হবে না। নিজের জীবনটাই হোলো যার নীরস, বাঙ্লা দেশের বাল-বিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম যৌবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দুদিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠ্‌বে। ভয় হয়, ক্রমশঃ হয়ত তোমার লেখার মধ্যেও অসঙ্গতি দেখা দেবে। সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সবকিছু ফুলের মতো বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখোনি বাঙ্লা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন-সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত। আমার কথা যাক্। তোমার নিজের কথায় একদিন আমি ভেবেছিলাম মণ্টু যে ব্যারিষ্টার হয়ে আসেনি সে ভালোই হয়েছে। না-ই করলে ও রাশি রাশি টাকা রোজগার, না-ই চড়ে বেড়ালো মটরগাড়ী, নাই হোলো হাই সার্কেলের কেও-কেটা। ওর অভাব নেই, যা-আছে বেশ চলে যাবে,—শুধু সঙ্গীত ও সাহিত্যে দেশকে অনেক কিছু যেন মণ্টু দিয়ে যেতে পারে। সে নিরানন্দ দেশের আনন্দের ভোজ,—সেই আমাদের চের। আমি আরও একটা কথা ভাবতাম। মণ্টু এই যে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়, ও অনেক জাত অনেক সমাজ অনেক লোকের সঙ্গে বাঙ্লা দেশের একটা স্নেহ ও শ্রদ্ধার বাঁধন বেঁধে দিচ্ছে। ওকে সবাই চেনে, সবাই ভালোবাসে। মণ্টুর

সঙ্গে গেলে কোথাও আদরের অভাব ঘটবে না। কিন্তু সে আশা সে আনন্দে ছাই পড়লো। যার দেহের, মনের আনন্দের, সামাজিকতার স্বাধীনতার সীমা ছিল না সে আজ এমনি দাসখৎ লিখে দিলে যে এক-পা বাড়াতে গেলেও আজ চাই ওর permission—ছাড়পত্র। এই হোলো ওর মুক্তির সাধনা। গেলো দেশ, রইলো ওর কাল্পনিক স্বার্থ—সেই হোলো ওর বড়ো। আমিও অনেক পড়েচি, অনেক দেখেচি, অনেক কিছু করেচি—এ কথা আমিও তো ভুলতে পারি নে। তাই, যে যা বলে মেনে নিতে পারি নে, আমার বাধে। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা নিষ্ফল। আমার ছেলেবেলার একটা কথা চিরদিন মনে থাকবে। মামার সঙ্গে স্যর গুরুদাসের বাড়ী দুর্গাপূজোর নেমন্তন্ন খেতে গেছি। গিয়ে দেখি গুরুদাসের প্রচণ্ড ক্রোধে মাথার বড় বড় কেশর ফুলে উঠেচে। একজন ছাত্র নাকি বলেছিল গঙ্গাস্নানে পাপ ক্ষয় হয় সে বিশ্বাস করে না। গুরুদাস ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে বলচেন যে, স্নানের প্রয়োজন নেই, শুধু তীরে দাঁড়িয়ে গঙ্গা বলে গঙ্গা দর্শন করলে শুধু তার নিজের নয় সাত পুরুষ যে পাপমুক্ত হয়ে অক্ষয় স্বর্গবাস করে এতে সন্দেহের অবকাশ কোন্‌খানে? কোন্ পাষণ্ড এ শাস্ত্রবাক্য অস্বীকার করতে পারে! বলতে বলতে তিনি রাগে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। মনে আছে সেই ছেলে বয়সেই মনে মনে বোললাম এই গুরুদাস! সেকালের এম. এ-তে Mathematicsএ first, বড় উকিল, বড় jurist, বড় জজ, Universityর ভাইস চ্যান্‌সেলার! ধার্ম্মিক, সত্যবাদী—তিনি ভণ্ডামি করেন নি, যা সত্য ব'লে বিশ্বাস করতেন তাই বলেছেন,—তাই এই ভীষণ ক্রোধ। দেখি এ নিয়ে Sir Oliver Lodgeএর সঙ্গেও তর্ক চলে না, আমার প্রজা গৌর মাঝির সঙ্গেও না। এ অন্ধ বিশ্বাস। তাকেই নানা যুক্তি, নানা কথার মার প্যাঁচ লাগিয়ে সত্যি বলে মেনে নেওয়া। বিদ্যে-সিদ্যে থাকলে কথায়-বার্ত্তায় খণ্ড চণ্ড লাগাতে পারে, না থাকলে সোজা কথায় সহজ কোরে বলে। প্রভেদ ঐটুকু। ঐ Sir Gooroodas! তোমার কাছে এ সব বলতেও ভয় হয়, কারণ, সকলেই জানে যে আশ্রম-বাসীরা অত্যন্ত ক্রোধী হয়। তারা কথায় কথায় গাল-মন্দ ক'রে তেড়ে মারতে আসে।...

...কোন আশ্রমের পরেই আমি প্রসন্ন নই, কিন্তু কোন-একটা বিশেষ আশ্রমের পরেই আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ বা আক্রোশ নেই। আমি জানি ও সবই সমান। সবই ভুয়ো।

আশ্রম যাক্,...আসল কথা তুমি নিজে। তোমাকে যে অত্যন্ত স্নেহ করি এ মিথ্যে নয়। ভারি দেখতে ইচ্ছে হয়। গান শুনতে গল্প করতে। ভারি বুড়ো হয়ে পড়েচি, আর কটা দিনই বা বাঁচবো, এ দিকে আসবে না একবার? ইতি ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৭। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মৃগ-তৃষ্ণিকা

১

প্রগাঢ় সম্পদ-তৃষ্ণা উচ্চকিত করেছে জীবন
অকস্মাৎ প্রিয়তম ! রিক্ততার তিক্ত অবসাদ
আচ্ছন্ন করেছে যত অনুভূতি। অসন্তুষ্ট মন···
ক্ষুব্ধ নেত্রে ভেসে যায় ঐশ্বর্যের কামনা অগাধ।
এ ভুবনে প্রকৃতির সৌন্দর্যের কত আয়োজন—
সামান্যের প্রয়োজনে অসামান্য প্রাচুর্যের ঘটা,
একটি পুষ্পের জন্য লক্ষকোটি বীজের সৃজন—
অঙ্কুরের প্রত্যাশায় নভোব্যাপী সূর্যালোকছটা।
আমার দারিদ্র্য-দুঃখে লজ্জা পায় গর্বিত মিলন,
অপমানে কেঁদে যায় সম্ভোগের সহস্র প্রত্যাশা,
অনাদরে লীন হয়,—ব্যর্থতায় হৃত আভরণ
অপ্রশস্ত পরিসরে বিকাশ-উন্মুখ ভালবাসা।

যে নারী কুণ্ঠিতপদে দিনশেষে মাটির কুটিরে
মিলনের শয্যা পাতে প্রদীপের স্তিমিত শিখায়,
ভীরু বসনের তলে সীমাবদ্ধ বাসনার তীরে
অস্পষ্ট প্রেমের পায়ে নতনেত্রে নিজেকে বিকায়,-
সে রমণী আমি নই। আমি চাই অকুণ্ঠ অন্তর—
মহান প্রেমের তরে সুমহান যোগ্য অবসর।

২

মনে আসে পুরাতন কাব্যগ্রন্থে পঠিত কাহিনী—
স্খলিত-প্রহর-দিবা-অভিসার স্বাধীনা নারীর,—
একক বান্ধব সঙ্গী ঘনকাল উদ্দাম বাহিনী···
গর্জিনীর স্নানশোভা ধারাক্রান্ত ক্লান্ত পৃথিবীর।
বৃষ্টিহত দর্দুরের পঙ্ক-ক্লিন্ন ব্যাদিত বদন,—
দীপায়িত নীপশাখে শিখীব্যূহ মদন-আতুর,—
বলাকার শল্যবিদ্ধ মেঘে মেঘে তড়িৎগর্জন,
সদ্য-ক্ষিতিগন্ধ-মত্ত মহিষেরা বর্ষণ-বিধুর।—
রূপে রসে রোমাঞ্চিত ধরণীর মণিময়ী শোভা,
বিদ্যুৎ-পতাকা-দীপ্ত প্রাবৃটের প্রবেশ-ঘোষণা,

সম্যক্-সম্ভোগ-লুব্ধ কামীদের দীপ্ত মুখপ্রভা—
পঞ্চশর-সম্রাটের করে শুধু আদেশ-দ্যোতনা।
কে সে ? কার অঙ্গশোভা অনঙ্গের উদ্ভ্রান্ত সন্ধান
অনুগত প্রিয়সার্থে অলজ্জিত হৃদয়-তোরণ,
চকিত দংশনে যবে জল-আর্দ্র ওষ্ঠ মথমান—
সর্ব-অঙ্গে ঝলসায় বহ্নিময় রত্ন-আভরণ।
মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের সম্মিলিত শ্রেষ্ঠ-নিয়োজনে
প্রেমমুগ্ধ কে সে নারী আমন্ত্রণ করে প্রিয়জনে ?

৩

জানি আমি সেই নারী,—মুখচ্ছবি হৃদয়-দর্পণে
বার বার ফেলে গেছে। বার বার তারি দীর্ঘচ্ছায়া
আমারে করেছে স্পর্শ, পদধ্বনি ক্লান্ত বিসর্পণে
অমর বিপাকে তারি বেষ্টন করেছে মর-কায়া।
কখনো করেছে রুদ্ধ সে আমার কালিকপ্রবাহ
এনেছে বৈফল্য শুধু সাধারণ সহজ জীবনে,
বেদনায় নিশামুখে সে এনেছে দিনান্ত-প্রদাহ,
সন্ধ্যার আরক্ত-আভা অকস্মাৎ চিত্ত-বিদারণে।
এই প্রকৃতির মাঝে সেই শক্তি নিয়ত ক্ষরিত,
সামান্যকে অসামান্য সেই তো করেছে বহুরূপে,
তুচ্ছ-জীব-জনমের প্রয়োজনে সৌন্দর্য অমিত—
গোপন ফল্গুর মত সঞ্চার করেছে চুপে চুপে।
সর্বদেহ পুণ্যবান তারি পুণ্যপদের স্পর্শনে,
গর্বিত ঐশ্বর্যে তার সার্থক সকল অবদান,
সর্ব-অণু-উৎকণ্ঠিত ক্ষণমাত্র দুর্লক্ষ্য দর্শনে
দুর্লভ আশ্বাসে তার চিরকাল আশংসিত প্রাণ।
জানি আমি সেই নারী, সে আমার করেছে চকিত,
আমার বাসনা মাঝে তারি জয় হয়েছে ঘোষিত।

৪

আঁধার খনির তলে মাণিক্যের আরক্ত দ্যুতির—
কে করে মহিমা-স্তব ? মৃত্তিকা ও প্রস্তর মিশ্রিত—

রক্তে শুধু অবসাদ—অন্ধকারে সংস্কার-চ্যুতির।
কে শোনে রোদনধ্বনি নিশীথের বেদনা-নিস্বন।
মনে হ'ত একদিন—নগরীর বিশাল ছায়ায়—
স্তিমিত আলোর তলে সুগোপন একটি কক্ষের—
পরিসর মুক্তি দেবে আমাদের প্রেম মহিমায়,—
ধন্য হবে আশাগুলি ব্যক্ত হয়ে প্রমুক্ত বক্ষের।
ছি ছি—এ কি লজ্জা তবু—দারিদ্র্যের নখর-আঘাতে
ব্যথিত রাত্রির বক্ষে জলে স্বল্প আলোকের ক্ষত,—
ছিন্ন সাজ ভগ্ন শয্যা—কেঁদে ওঠে প্রখর প্রভাতে,
স্খলিত হৃদয়-গ্রন্থি অকস্মাৎ শাসন-সংহত।

মনে হয় সব ব্যর্থ, সব কিছু মিথ্যা বা বিভ্রম,
সোনার বাসনাগুলি নির্বাসিত লৌহের বন্ধনে,
ধরণীর ধূলিপুঞ্জ নভস্পর্শ করে অতিক্রম—
সঙ্গীতের সুরগুলি স্তব্ধ হয় স্তিমিত ক্রন্দনে।
যে রবি মধ্যাহ্ন-চারী আকাশের দীপ্ত-সিংহাসনে,
সে কেন সমাপ্তি পায় অন্ধকারে সায়াহ্ন-ভাষণে?

৫

অর্থকে করেছে ঘৃণা এতকাল বিদগ্ধ-সজ্জন—
সহায় হয়েছে তার সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা।—
বিধিনিষেধের জালবদ্ধ হয়ে অবসন্ন মন—
এতকাল যা খুঁজেছে হয়েছে কি সার্থক আজো তা?
শতসাধ-স্বপ্ন-আশা সময়ের পিচ্ছিল সোপানে
স্খলিত হয়েছে মুহু। সাফল্যের শত সম্ভাবনা
স্বর্ণমায়ামৃগ-ফাঁদে বৈফল্যের কী বেদনা আনে?—
প্রেমিকের তপোভঙ্গে অকস্মাৎ কাঁদে কি সাধনা?—
এ ভুবনে প্রকৃতির সৌন্দর্যের কত আয়োজন!—
সামান্যের প্রয়োজনে অসামান্য প্রাচুর্যের ঘটা!—
একটি পুষ্পের তরে লক্ষকোটি বীজের সৃজন—
অঙ্কুরের প্রত্যাশায় নভোব্যাপী সূর্যালোকচ্ছটা।

মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের যুগ্ম মধু স্বর্ণের বন্ধনে
কে করেছে নিয়োজিত মর্ত্যদেহে অমর বাসনা?

দুর্লক্ষ্যের তৃষ্ণিকায় হয় নি যা সহজ জীবনে
তারি মাঝে এসেছে কি পৃথিবীর সুখ-সম্ভাবনা ?
আমার প্রেমের স্বপ্নে ব্যাপ্ত জানি এ বিশ্বভুবন—
তাই তো অমর স্বপ্নে মরদেহে রক্ত-উদ্ভাসন।

উমা দেবী

ভ্রষ্ট লগ্ন

শঙ্খ কুড়ানো ছেলে। সে যখন মাতৃগর্ভে, তখন তার বাপ মারা যায়, শঙ্খকে ভূমির হাতে সমর্পণ ক'রে তার মাও পতির অনুগমন করে। আপন বলতে গ্রামে তার কেউ ছিল না। এই অনাথ কৈবর্ত-শিশুটিকে নিয়ে কি করা যায়, এই চিন্তায় গ্রামের মুরুব্বিদের মাথায় ঘাম পায়ে ঝ'রে পড়তে থাকে।

অস্পৃশ্য জাতির একটি সদ্যোজাত শিশু; তবু তো কৃষ্ণের জীব! যে ক'রেই হোক তাকে বাঁচাতে হবে তো! কিন্তু বাঁচাবার উপায় উদ্ভাবন হয় না। গ্রামে দু-চার ঘর কৈবর্ত যে না আছে তা নয়, কিন্তু তাদের ঘরে পালে পালে ছেলেমেয়ে; সেগুলোকেই খেতে পরতে দিতে পারে না, পরের ছেলের বোঝা বইতে তাদের দায় পড়েছে। কারও যে একটু উপকার করবে সে মতিবুদ্ধি তো এদের নেই, ছোটলোক আর কাকে বলে ?

সকল সমস্যার সমাধান ক'রে দেয় নিবারণ ভট্টাচার্যের স্ত্রী বিনতা। ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে কয়েক ঘণ্টা বয়সের কৈবর্ত-শিশুটি মুখে আঙুল পুরে কাঁদছিল, নিঃসঙ্কোচে বিনতা তাকে বুকে ক'রে ঘরে নিয়ে আসে।

ব্রাহ্মণগণ, যাঁরা গ্রাম্য সমাজের মুরুব্বি, তাঁদের বিস্ময় আর ক্রোধের সীমা থাকে না। কৈবর্তের ঘরের এক ফোঁটা একটা ছেলে আঁতুড়েই যদি চোখ বোজে; তাতে জগতের এমনই কি লোকসান ? সেজন্য ব্রাহ্মণের মর্যাদা বিসর্জন দিতে হবে ? চারপোয়া কলি পূর্ণ হতে আর বাকি কি ?

সমস্ত গ্রামবাসীর ধিক্কারেও বিনতা বিচলিত হয় না। তার বয়স ত্রিশের উপরে, এখনও সে নিঃসন্তান। সমস্ত অন্তর মাতৃত্বের বুভুক্ষায় লালায়িত হয়ে উঠেছিল তার। শঙ্খকে বুকে নিয়ে সে যেন সার্থক হয়, পূর্ণ হয়। ওই একরত্তি শিশু তার শূন্য ঘর ভরপূর ক'রে তোলে। নিরীহ নির্বিরোধী নিবারণ ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত মতামত বড় একটা ছিল না, সুতরাং উভয় পক্ষের মতামতের মাঝখানে প'ড়ে সে বেচারা হাঁপিয়ে ওঠে, আর গৃহকোণ আশ্রয় ক'রে নিজেকে সকলের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রাখে।

গ্রামবাসী উচ্চবর্ণের সকলেই বিনতার কাজে বাধা দেয়। কিন্তু সঙ্কীর্ণ সমাজের

চোখরাঙানিকে ভয় করে না সে। একঘরে হ'লেই বা তার ভয় কিসের? তার তো আর পাঁচটা ছেলেমেয়ে নেই যে, তাদের জন্য সমাজ মেনে চলতে হবে!

বিনতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না; কিন্তু সে শঙ্খের জন্য রূপার ঝিনুক-বাটি গড়িয়ে আনে, ভাল ভাল জামা জুতো পরিয়ে তাকে ধনীর ছেলের মতন ক'রে মানুষ ক'রে তোলে।

দু বছর পর অপ্রত্যাশিতভাবে বিনতার একটি কন্যা-সন্তান জন্মে। সমস্ত বিদ্বেষ ভুলে গ্রামের লোক তার বাড়িতে এসে আনন্দ প্রকাশ করে। অযাচিত উপদেশ বর্ষিত হতে থাকে। ভগবান দয়া ক'রে তার শূন্য কোল পূর্ণ করেছেন, ছোটজাতের ছেলেটাকে আর তার কিসের দরকার? ওটাকে এখন দূর ক'রে দিলেই হয়। ওর জাতের কেউ যদি ওর ভার না নেয়, ফেলে রেখে এলেই হবে কোনও অনাথ আশ্রমে। এখনও ওই ছেলেটাকে ঘরে পুষলে দেবতা অপ্রসন্ন হবেন। কারণ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্যই দেবতা এই দয়া করেছেন, নয়তো বন্ধ্যা নারীর সন্তান হতে কে কবে দেখেছে? অকৃতজ্ঞ হওয়া মহাপাপ, দয়াময়ের করুণা স্মরণ ক'রেও বিনতার ওকে দূর ক'রে দেওয়া উচিত।

মেয়েটি কোলে শুয়ে স্তন্যপান করে, কাঁধ ধ'রে দাঁড়িয়ে শঙ্খ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে 'ভাই'।

বিনতার চোখ ছলছল করে। দূর ক'রে দিতে বললেই কি দূর ক'রে দেওয়া যায়? মাতৃত্বের ক্ষুধায় যেদিন তার সমস্ত অন্তর ক্ষুধিত হয়ে উঠেছিল, এই শিশুই সেদিন তার সে ক্ষুধা মিটিয়েছিল। যে একদিন সন্তানের স্থান পূর্ণ করেছিল, তাকে আজ দূর ক'রে দেবে সে কোন্ প্রাণে?

মা ষষ্ঠী এতদিনে প্রসন্ন হলেন, পাঁচ বছরের মধ্যে বিনতার আরও দুটি মেয়ে হ'ল। কিন্তু শঙ্খের জন্য তার অন্তরে যে স্নেহ সঞ্চিত হয়েছিল, তার বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না। তবে এখন তার তিন-তিনটি মেয়ে জন্মেছে, গ্রাম্য শাসন অবহেলা করবার সাহস তার নাই। তাই শঙ্খকে না বুঝতে দিয়ে যতদূর সম্ভব তার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করে, আর কয়েকটি বামুন খাইয়ে যথারীতি প্রায়শ্চিত্তও তার করতে হয়েছে।

শঙ্খ তখন স্কুলে ভর্তি হয়েছে। তার সহপাঠীগণ আর গ্রামের হিতৈষীগণ তার অবস্থা তাকে বোঝাবার জন্য বিশদরূপে চেষ্টা করে। বিনতার কোলে মাথা গুঁজে শঙ্খ কাঁদে, বলে, মা, ওরা বলে, তুমি নাকি আমার মা নও? তুমি নাকি আমাকে কুড়িয়ে পেয়েছ? তার সঙ্গে সঙ্গে বিনতাও কাঁদে, ওরা বড় মিছে কথা বলে শঙ্খ।

শঙ্খের ম্লান মুখে হাসি ফুটে ওঠে; কিন্তু বিনতার প্রাণ হাহাকার করে। সমাজের নিষ্পেষণ থেকে সে তাকে রক্ষা করবে কেমন ক'রে? সে শক্তি তার কোথায়?

মেয়ে তিনটি বেশ বড় হয়ে ওঠে, ম্যাট্রিক পাস ক'রে শঙ্খ শহরে গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়, সেই সময় পরপার থেকে নিবারণ ভট্টাচার্যের ডাক আসে। যে আয় দিয়ে কোনমতে সংসার চলত, তাও বন্ধ হয়ে যায়। পড়া ছেড়ে দিয়ে শঙ্খ কাজ করে, মাসান্তে সামান্য কয়টা টাকা এনে বিনতার হাতে দেয়, কায়ক্লেশে সংসার চলে।

সূর্য উদয় হয়, অস্ত যায়; সঙ্গে সঙ্গে বয়স বাড়ে। বড় মেয়ে নীপা বেশ বড় হয়ে ওঠে। মেয়ের দিকে চেয়ে বিনতার উৎকণ্ঠা বাড়ে। মেয়ের রূপ গুণ থাকা সত্ত্বেও বিয়ে হয় না, সব প্রস্তাবই শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়।

অতীত জীবনে ব্রাহ্মণ-সমাজের অনুরোধ ও আদেশ উপেক্ষা ক'রে বিনতা যে একটি নীচজাতি শিশুর জীবন রক্ষা করেছে, এ অপমান তারা এখনও ভুলতে পারে না। একজন দরিদ্র অশিক্ষিতা গ্রাম্যরমণী, কুসংস্কারের সংকীর্ণ গণ্ডি ডিঙিয়ে, দয়াদাক্ষিণ্যে তাদের চেয়ে মহৎ হয়ে দেখা দিল, ব্রাহ্মণের জাতিনাশের গ্লানি অপেক্ষা পরাভবের এই গ্লানিই তাদের কাছে বৃহত্তর হয়ে দেখা দিয়েছে। দয়া কি তারাও করতে জানে না? কিন্তু তারও তো পাত্রাপাত্র বিচার করা চাই! যারা উচ্চবর্ণের সুখ-সৌভাগ্যের উচ্ছিষ্ট ভোগের জন্যই জন্মেছে, ঠাকুরের ভোগের অন্ন তারই সম্মুখে ধ'রে দেওয়া হবে? এত দুর্বুদ্ধি তাদের নেই। সমস্ত মুরুব্বির আদেশ যে অবহেলা করে, সমাজের বুকে যে পদাঘাত করে, তারই হ'ল জয়? আর সেই নিম্নবর্ণের অখ্যাত বালকটিই উদারতা-মহত্ত্বে খ্যাত হয়ে উঠছে? ধ্বংসোন্মুখ পরিবারকে অন্নজল দিয়ে সেই রাখছে বাঁচিয়ে? স্নেহ মমতা আর কৃতজ্ঞতার এই মাধুর্যময় সমাবেশ তারা সহ্য করতে পারে না। সেই অম্লান পরিবেশের গায়ে কলঙ্কের কালি ছিটিয়ে দিয়ে তৃপ্তি লাভ করে। ফলে নীপার বিয়ে হওয়া দুরূহ হয়ে ওঠে।

ছুটির দিনে শঙ্খ ঘরে শুয়ে একখানা বই পড়ে; বিনতা এসে কাছে বসে। শঙ্খ বইখানা মুড়ে মার মুখের দিকে তাকায়।

তোমার খাওয়া হয়েছে মা?

না বাবা, আজ একাদশী। কি বলতে গিয়েও থেমে যায় সে, তার পরেই সহসা ব'লে ফেলে, নীপাকে তুই বিয়ে কর্ বাবা! শুনতে ভুল করেছে ভেবে বিনতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে শঙ্খ।

বিনতা পুনরুচ্চারণ করে, নীপাকে তুই বিয়ে কর্ শঙ্খ। বিহ্বলভাবে শঙ্খ বলে, এ তুমি কি বলছ মা?

না ব'লে কি করব বাবা? নইলে মেয়েটার যে গতি হয় না শঙ্খ।

শঙ্খ প্রবলভাবে মাথা নাড়ে, সে হয় না মা। নীপা আমার ছোট বোন, চিরদিন

তাই জেনে এসেছি। এ কথা তো আমি ভাবতেও পারি নে। তা ছাড়া আমার হাতে তাকে দিতে চাইছ কেন মা? কি আছে আমার? আমি অশুচি—

বাধা দিয়ে বিনতা বলে, তোকে যেদিন কোলে তুলে নিয়েছি শঙ্খ, শুচি-অশুচির প্রশ্ন আমার সেইদিনই ঘুচে গেছে। অন্তরের শুচিতাই মানুষকে শুচি করে, এই আমি জানি। নীপা যদি তোর মত স্বামী পায়, সে তার মহাভাগ্য। তা ছাড়া তার বিয়ে দেওয়াই যে অসাধ্য হয়ে পড়েছে রে!

শঙ্খ মাথা নীচু ক'রে থাকে। এই দুর্ভাগ্যকে অঙ্কে স্থান দিয়ে এই স্নেহময়ী রমণীর যে লাঞ্ছনার সীমা ছিল না, তা সে জানে। কিন্তু প্রতিকারের উপায় কি? জ্ঞানলাভের পর থেকে কতবার সে ভেবেছে যে দূরে চ'লে যাবে, কিন্তু একান্ত স্নেহপরায়ণা এই সরলা নারীর অন্তরে সে যে কতবড় শেল হয়ে বিঁধবে, তাও তো সে জানে। তা ছাড়া অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য ক'রেও যাঁরা তাকে জন্মক্ষণ থেকে সুখের নীড়ে লালন ক'রে বড় ক'রে তুলেছেন, সেই সহায়সম্পদহীন দুঃস্থ পরিবারকে ফেলে চ'লেই বা সে যাবে কেমন ক'রে? এতবড় অকৃতজ্ঞকে তা হ'লে বিধাতা ক্ষমা করবেন না।

অবশেষে নীপার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। বিদেশী বর, গ্রামের দলাদলির খবর রাখে না। বর লেখাপড়া জানে, বিদেশে চাকরি করে, ছুটি নিয়ে এসেছে, বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে কর্মস্থলে চ'লে যাবে।

বিনতা ও শঙ্খ সাধ্যমত বিয়ের আয়োজন করে। অধিবাস হয়ে যায়, সন্ধ্যালগ্নেই বিয়ে। বর বেলাবেলিই এসে পৌঁছে যায়।

কনেচন্দন, লাল চেলি আর সামান্য দু-একখানা অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে লজ্জানত মুখে ব'সে ছিল নীপা। সহসা কোলাহল শোনা গেল যে, বর এ মেয়েকে বিয়ে করবে না, সে কাউকে না জানিয়ে চ'লে গেছে।

কেঁদে আকুল হয় বিনতা; হিতৈষীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে; শত্রুরা প্রকাশ্যে হাসি-বিদ্রূপে তাদের দুঃখ বাড়িয়ে তোলে।

গরমের ছুটিতে কয়েকটি কলেজের ছেলে গ্রামে সমবেত হয়েছিল; সব শুনে তারা জামার আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে আসে। এতবড় দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের সঙ্গে যে নীপার বিয়ে হয় নি, এ যে তার কত বড় সৌভাগ্য, সে কথা ব'লে বিনতাকে সান্ত্বনা দেয়। তারপর সুপাত্রের খোঁজে তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে; শেষরাত্রে একটা লগ্ন আছে, সেই লগ্নে বিয়ে তারা দেবেই।

বিয়ের আসরের আলো নিবে গেছে। কেঁদে কেঁদে ঘরের মেঝেতে বিনতা ঘুমিয়ে পড়েছে। নীতা, নীলা উৎসবভঙ্গের ক্ষোভে শয্যার আশ্রয় নিয়েছে।

সেই শূন্য আসরে দাঁড়িয়ে আছে শঙ্খ। গভীর অন্ধকার; আকাশ তারায় তারায়

আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আঙিনার এক পাশে এক ঝাড় রজনীগন্ধা উদারভাবে গন্ধ বিলায়। চরাচর নিদ্রিত, শুধু ঝিঁঝিঁপোকার চোখে ঘুম নেই, নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তার ডেকেই চলেছে। গুমোট গরম, সহসা এক ঝলক শীতল বাতাস ছেলেমানুষের মত তার সর্বদেহে স্পর্শ বুলিয়ে দেয়।

হঠাৎ চুড়ি আর চাবির শব্দে শঙ্খ চমকে ওঠে। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে নীপা। আজ সেই তুচ্ছ প্রসাধনেই সে কি অপরূপ হয়ে উঠেছিল! মিথ্যা কলঙ্কে কালিমাময়ী অনাদৃতা নারী! অন্ধকারে নীপার মুখ দেখা যায় না, তবু তার ম্লান মুখ কল্পনা ক'রে শঙ্খের চোখে জল আসে। সস্নেহে বলে, উঠে এলি কেন নীপা, শুয়ে থাক্‌গে যা।

নীপা হঠাৎ তার পায়ের কাছে ব'সে পড়ে।

আমাকে এ অপমান থেকে বাঁচাও শঙ্খদা!

শঙ্খ তার পিঠের উপর হাত রাখে। আমার সাধ্য থাকলে তোর এত অপমান কি মুখ বুজে সইতাম নীপা?

তোমারই সাধ্য আছে শঙ্খদা, আর কারও নেই।—ব'লেই একটু থেমে মনের সঙ্গে কি যেন বোঝাপড়া করে। তারপর সহসা ব'লে ওঠে, তুমি আমায় বিয়ে কর শঙ্খদা। সমস্ত অপমান থেকে আমাকে বাঁচতে হ'লে এ ছাড়া আর কি পথ আছে বল তো?

শঙ্খের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। এই যে নক্ষত্রখচিত অসীম নীলাকাশের ছায়াতলে স্তব্ধ ঘুমন্ত পৃথিবী, এ কি সত্যি, না মিথ্যে? ওই যে সন্ধ্যামালতীর তন্দ্রাতুর দুটি পাতার উপরে দুটি জোনাকি জ্বলছে, এই যে রজনীগন্ধার সুগন্ধের আমন্ত্রণ, এ সবই কি সত্যি? অথবা ভ্রান্তি?

হঠাৎ শঙ্খ হেসে ওঠে, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি নীপা? আবোল-তাবোল বকছিস?

শঙ্খের পরিহাসে নীপার কণ্ঠ প্রখর হয়ে ওঠে। এখনও প্রকৃতিস্থ আছি, কিন্তু এর পর হয়তো থাকব না।

শঙ্খ জোর ক'রে হাসতে চায়, কেন বিয়ে হ'ল না ব'লে? বিধাতা যা করেন মঙ্গলের জন্য। ও লোকটা একেবারে ইতর, ওর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে ভালই হ'ল। ওরা পাত্রের খোঁজে বেরিয়েছে, শেষরাত্রে একটা লগ্ন আছে।

শেষরাত্রের কত দেরি বোঝবার জন্য শঙ্খ আকাশ নিরীক্ষণ করে।

লক্ষ্মী দিদি আমার! দুঃখু করিস নে, শুয়ে থাক্‌গে যা—

নীপা বলে, ভেবো না যে বিয়ের দুঃখে ম'রে যাচ্ছি। তোমার কাছে বিধাতার মহিমার কথাও শুনতে আসি নি। তোমার উপদেশ আর সান্ত্বনা শুনতে আমার ব'য়ে গেছে। আমি যা বলছি, করবে কি না স্পষ্ট ক'রে বল।

এবার শঙ্খ হাসতে পারে না, বলে, ভাইয়ে বোনে বিয়ে হয়, কখনও শুনেছিস নীপা?

আমার কথা একটু ভাবো শঙ্খদা, তোমার নামের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে যে কুৎসা রটনা হচ্ছে, তারপরে আবার আজকের ব্যাপার, কাল সূর্যের আলোয় আমি মুখ বার করব কেমন ক'রে? সহসা কেঁদে ফেলে সে। এ অপমান থেকে একমাত্র তুমিই আমাকে বাঁচাতে পার শঙ্খদা।

শঙ্খ বলে, কাঁদিস কেন নীপা? তুই নির্দোষ, নিন্দুকের রসনাকে তোর অত ভয় কিসের? সেই ভয়ে একটা প্রচণ্ড মিথ্যাকে তুই সত্যি ক'রে তুলবি? সে হয় না নীপা, জ্ঞানের পর থেকেই তোকে বোন ব'লে জানি; সে সম্পর্ক, সে স্নেহের সম্পদ ধুলায় লুটিয়ে দেব, অত শক্তি আমার নেই বোন।

নীপা উঠে নিঃশব্দে ঘরে চ'লে যায়। সেই নিরানন্দ বিবাহ-আসরে ততোধিক নিরানন্দ চিত্তে ব'সে থাকে নিঃসঙ্গ শঙ্খ।

প্রভাতের নির্মল আলোকে নীপার অপমানপীড়িত মলিন মুখ দেখতে হবে, এই ভয়ে পূর্বদিকে উষার আভাসের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ দ্রুতপদে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

যারা পাত্রের খোঁজে গিয়েছিল, প্রভাতে তারা ফিরে আসে। পাশের গ্রামের একজন শিক্ষিত উদার যুবক এই লাঞ্ছিতা মেয়েটিকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু তার পিতা গেছেন স্থানান্তরে; তাঁকে আনবার জন্য লোক গেছে। ছেলেটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, পিতাকে সম্মত করিয়ে আজ রাত্রের লগ্নে সে নিশ্চয়ই এই মেয়েকে বিয়ে করবে। সন্ধ্যার আগেই বরযাত্রী এসে পৌঁছবে, দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই।

বিনতার বিরস মুখে আবার হাসি দেখা দেয়, আঙিনার নষ্ট আলপনা উদ্ধারে মনোনিবেশ করে সে। কি কি উপায়ে নতুন জামাইকে বোকা বানানো যেতে পারে, নীতা নীলা সেই সব উপায় সংগ্রহে উৎসাহী হয়।

কিন্তু প্রতীক্ষার অবসান হয়। সন্ধ্যার লগ্ন ব'য়ে যায়, বর আসে না, আসে বার্তাবহ। এ মেয়ে বিয়ে করলে বাপ ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করবে ব'লে ভয় দেখিয়েছে। ছেলেটিও হঠাৎ সুপুত্র ব'নে গেছে; ভাবপ্রবণতা যেটুকু মনে সঞ্চয় হয়েছিল, সেটুকু বাপের তাড়া খেয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বিয়ে করতে সে অক্ষম, বার্তাবহ মারফৎ এ বার্তা সে দয়া ক'রে জানিয়ে দিয়েছে।

কলেজের ছেলেগুলো আবার আস্তিন গুটায়, আবার আস্ফালন করে, কিন্তু সাহস ক'রে পাত্রের সন্ধানে বার হয় না। ঘরে ব'সে সমাজসংস্কার বিষয়ে গরম গরম বক্তৃতা করে।

বিনতার শুষ্ক চোখে আবার জল ঝরে। নীলা, নীতা দিদির কাছে ব'সে ঘুমে ঢুলে ঢুলে অবশেষে শুয়ে পড়ে।

আলপনা আঁকা পিঁড়িতে স্তব্ধ হয়ে ব'সে আছে নীপা। তার জীবনের উপর দিয়ে

যে ঝড় ব'য়ে গেছে, তার শান্ত মুখে তার চিহ্নমাত্র নেই। মেয়ের কাছে এসে মাথার উপর হাত রেখে কেঁদে ওঠে বিনতা। চোখের জল যখন তার ফুরিয়ে এল, স্তব্ধতায় সারাবাড়ি তখন থমথম করছে।

অন্ধকার বিয়ের আসরে আজও শঙ্খ একাকী দাঁড়িয়ে ছিল। কোথা থেকে আকাশে একদল মেঘ এসে জুটেছে, তাদের আনাগোনার বিরাম নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলো ঠিকরে পড়ে, মাঝে মাঝে মৃদু গর্জন করে মেঘ। টপটপ ক'রে দু-চার ফোঁটা বৃষ্টিও এসে তার তপ্ত ললাট স্পর্শ করে।

সহসা অন্তরে বেদনাময় একটা তীক্ষ্ণ আনন্দ অনুভব করে শঙ্খ। গত রজনীর নিবিড় অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে একটি নিরুপায় নারী একান্তভাবে তাকেই আত্মসমর্পণ করতে এসেছিল। অন্ধকারে সে মুখের অসহায়তা সে দেখতে পায় নি, কিন্তু কণ্ঠ শুনেছিল। সেই করুণ কণ্ঠ যেন সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। বজ্রের আগুনে সে কণ্ঠ শঙ্খের শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রতি রক্তবিন্দুতে আঁকা হয়ে আছে।

সহসা শঙ্খ চমকে ওঠে, চারদিকে তাকায়, কিসের আশঙ্কায় দ্রুতপদে ঘরে গিয়ে দ্বার রুদ্ধ ক'রে দেয়। তবু তার অবাধ্য অন্তর রুদ্ধ দ্বারে কার কম্পিত করাঘাতের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

জানলা দিয়ে বাইরের কালিমাময় ঝোপ-ঝাড়, তরু-লতা চোখে পড়ে। অস্পষ্ট পল্লবের মাথায় মাথায় জোনাকি জ্বলে; বর্ষার আর্দ্র প্রকৃতি যে এত সুন্দর, অন্ধকার যে এত স্নিগ্ধ, তার বাইশ বছরের জীবনে সে কখনও অনুভব করে নি। যৌবন কোন্ সময় তার দেহমনে রাজার আসন পেতে বসেছে, সে তো কিছুই জানে না। যৌবনের স্পর্শ যে অন্তরকে এত মধুময় ক'রে তোলে, এই মুহূর্তে সে কথা সে অনুভব ক'রে শুধু বিস্মিতই নয়, পুলকে কণ্টকিত হয়ে ওঠে। তার অজ্ঞাতসারে তার অন্তরে এত ভালবাসা কবে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল? এ কি রহস্য!

ধীরে ধীরে তার ক্লান্ত চোখ দুটি ঘুমে ঢুলে পড়ে।

চোখ মুছে বিনতা বলে, ওঠ্, ওগুলো ছেড়ে ফেল্; যেমন কপাল ক'রে এসেছিস!

কই গো ভটাচায্যি-গিন্নী!

পুরোহিতঠাকুর এসে দরজায় দাঁড়ান।

ও পাড়ার পঞ্চানন খুড়ো বিয়ে করতে রাজি আছেন। কিন্তু তুমি কি দেবে?—ব'লেই পুরোহিত বিনতার মুখের দিকে তাকান।

বিস্ময়ে বিনতার মুখ খোলে না। পঞ্চানন চক্রবর্তী তো ঘাটের মড়া! সে-ই বা প্রস্তাব করে কোন্ সাহসে, আর ইনিই বা সে কথা মুখের বার করেন কোন্ লজ্জায়?

পুরোহিত আবার বলেন, তুমি রাজি হ'লে আজ রাত তিনটের লগ্নেই বিয়ে হয়ে যেতে পারে।

বিনতা বলে, বিয়ে না হয় নীপার না-ই হবে, তাই ব'লে বিয়ের নামে ওকে কি জলে ভাসিয়ে দেব?

পুরোহিত পঞ্চাননের টাকা খেয়ে এসেছেন; সুতরাং বিচলিত হ'লে তাঁর বিস্তর ক্ষতি। উদার কণ্ঠে বলেন, আমার আর কি স্বার্থ, বল? তোমাদের জাত যায়, তাই অনেক ব'লে ক'য়ে হাতে পায়ে ধ'রে রাজি করিয়েছি বই তো নয়। কলির ধর্মই এই, কারু উপকার করতে নেই।

সহসা নিজের উপায়হীনতার কথা বিনতার মনে পড়ে। নিশ্বাস ফেলে বলে, আপনি বসুন। শঙ্খকে ডাকি, দেখি, সে কি বলে!

নীপার অস্তিত্ব অনুভূত হয় এতক্ষণ পরে। সে মুখ তুলে বলে, কাউকে ডাকতে হবে না মা। তারপর পুরোহিতের দিকে চেয়ে বলে, তাঁকেই আপনি ডেকে নিয়ে আসুন। এ বিয়েতে আমার খুব মত আছে। আজ রাতে আমার বিয়ে হওয়া চাই-ই, সে যার সঙ্গেই হোক। শিগগির যান, দেরি করবেন না।

পুরোহিত তুষ্ট হন, এই তো বুদ্ধিমতীর মত কথা। এক ফোঁটা মেয়ে যা বোঝে, বুড়ো হয়েও তুমি তা বোঝ না ভটচাযগিন্নী! একেবারে রেগেই আগুন!

নীপা বলে, আমি আপনার কাছে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। কিন্তু আমার কলঙ্কের কথা প্রচার করতে তিনিই তো ছিলেন বেশি উৎসাহী। এখন কি তিনি সমাজচ্যুত হবেন না?

হাসির ভঙ্গীতে মুখখানা বিকৃত ক'রে তোলেন পুরোহিত। হ্যাঃ, ও আবার একটা কথা—তোমার মত ভাল মেয়ে—হ্যাঃ—

যাক, দুর্ভাবনা দূর হ'ল। যান তাঁকে শিগগির ডেকে আনুন।

বিনতা ধমক দিয়ে ওঠে, চুপ কর্ নীপা, তুই কি নিজেই নিজের অভিভাবক নাকি?

নীপা বলে, আমার বাপ নেই, ভাই নেই। আমার আঠারো বছর বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, আমার অভিভাবক আমি নিজেই। তুমি বাধা দিও না মা। চলুন পুরুতঠাকুর, লগ্ন ব'য়ে যাবে।

পুরোহিতের হাত ধ'রে উঠানে নেমে আসে নীপা, অন্ধকারের বুকে শুভ্র আলপনা-রেখা কুন্দফুলের মত ফুটে আছে।

কাল এই অন্ধকারে সমস্ত লজ্জা গোপন ক'রে আত্মরক্ষার জন্য সে এক হৃদয়হীনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে এসেছিল, কিন্তু সে হতভরে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

নিমেষে নীপার দেহের রক্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, পরাজয়ের গ্লানিতে তার সমস্ত অন্তর

তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। আত্মসমর্পণের নামে আজ যে সে আত্মহত্যা করতে চলেছে, এই তার মুক্তিপথ, এই তার জয়। কাল যে সময় তার পরাজয় ঘটেছিল, আজ ঠিক সেই সময়েই সে হ'ল সম্পূর্ণ জয়ী। তীক্ষ্ণ একটা প্রতিশোধের নেশা তাকে অভিভূত ক'রে ফেলে।

আসরের এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল পঞ্চানন। চঞ্চল চরণে নীপা এসে তার পাশে দাঁড়ায়। দ্বন্দ্ব-দ্বিধার অবসান হোক, এই তার নিয়তি। এই তার বিধিলিপি।

তুমিই তো সম্প্রদান করবে মা? তবে এস। কাজ আরম্ভ করুন পুরুতঠাকুর!

নীপার স্বর শান্ত।

মন্ত্র উচ্চারিত হয়, সাক্ষী থাকে মেঘমণ্ডিত আকাশ আর ধরণীর মূক মৃত্তিকা।

সহসা শঙ্খ এসে দাঁড়ায় এক পাশে। নিদ্রাতুর চোখে সে শুধু মূঢ়ের মত সকলের মুখের দিকে তাকায়।

পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেন; কেঁদে ওঠে বিনতা। শঙ্খের সম্বিৎ ফিরে আসে।

থামুন, থামুন, বন্ধ করুন মন্ত্রোচ্চারণ।—আর্তনাদ ক'রে ওঠে শঙ্খ। পুরোহিত ভয় পেয়ে থেমে যান। নীপা বলে, না।

ওই শান্ত সংক্ষিপ্ত একটি শব্দ যেন আর্দ্র অন্ধকার রজনীর শিরায় শিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেন। শঙ্খের উচ্চ কণ্ঠের প্রতিবাদে সে মন্ত্র শোনা যায় না।

কাজ শেষ করুন পুরুতঠাকুর।—নীপার কণ্ঠে আদেশের সুর।

যে কণ্ঠ শঙ্খের চেতনাশক্তিকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে, এ তো সে কণ্ঠ নয়। এ যেন সহসা বজ্রপাত হয়ে চারদিক দগ্ধ ক'রে ফেলতে চায়।

কাল আমি যে ভুল করেছি নীপা, সেটা সংশোধন করতে দাও আমাকে—

কিন্তু সেই অনাদৃত কণ্ঠ অন্ধকারে মাথা কুটতে থাকে, কেউ উত্তর দেয় না।

গাঁটছড়া বেঁধে বর-কনে যখন ঘরে গেল, তখন নবারুণের প্রভায় পূর্বদিক সোনালী হয়ে উঠেছে।

সুরুচি সেন গুপ্তা

সত্যাগ্রহ

মনের মুক্তি সব মুক্তির শেষ—
সেই মুক্তিতে নাহি জাগে যদি দেশ,
কি হবে গোপন হত্যাসাধনা হিংসা-দ্বেষের রূঢ় আরাধনা।
সত্যাগ্রহ তাই মানিয়াছি, মানিয়াছি কংগ্রেস।
নির্ভয়ে জাগো, গৌরবে জাগো, আনন্দে জাগো দেশ।

বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট

হাসপাতালে হাঁসফাঁস

কেমন কাটাচ্ছি, জানতে চান তো? বেশ স্বচ্ছন্দে কেটে যাচ্ছে। দিনে তিনবার ক'রে হাসপাতাল আর তিনশো পঁয়ষট্টিবার হাসপাতালের ডাক্তারবাবুর বাড়ি ছোটাছুটি ক'রে মরছি।

ছেলে মীটিঙে গিয়ে ঠ্যাং ভেঙে এসেছেন। অক্ষত অবস্থায় বেরিয়েছিলেন, যখন ফিরে এলেন তখন দেখলুম, একটা ঠ্যাং নড়বড় করছে। কি অবস্থা বুঝুন!—বাঙালীর ছেলের একমাত্র ভরসা দুখানি শ্রীচরণ, তার মধ্যে একটিকে একরকম খুইয়ে এল! তাড়া করলে যে ভবিষ্যতে ছুটে পালাবে, তার দফা গয়া! দেখুন দেখি ঝঞ্ঝাট!

তুই গেছিস মীটিঙে, সেখানে চুপ ক'রে গিয়ে একটু দাঁড়া—তার ব'য়ে যাচ্ছে। সকলের শেষে এসে সকলের আগে গিয়ে বসব, আবার সবাই বেরিয়ে যাবার আগে নিজে আগে বেরিয়ে পড়ব। এ কি বদ অভ্যেস বলুন তো? এতটুকু যদি কাণ্ডজ্ঞান আছে! তেমনই হ'ল, ভিড়ের চাপে ল্যাং মেরে দিলে কে তার ঠ্যাঙের দফা সেরে!

বরাবর ব'লে আসছি, ওরে বাপু, ও-রকম করিস নি, একটু ভব্যতা শেখ্, চ্যাংড়ামো করাটাই খুব বীরত্ব প্রকাশ নয়, তা কেবা-শোনে কার কথা! বাপ বকছে কি গাধা ডাকছে—সেইটেই ছেলেরা আজ পর্যন্ত আলাদা ক'রে ভাবতে পারলে না, তা আমি কি করি বলুন?

তার ওপর রয়েছেন ওদের মা। কিছু বললেই বলবেন, যত বুড়ো হ'চ্ছ, তত তোমার টিকটিক করা স্বভাব হচ্ছে, ওই জন্যেই তো ছেলেপুলেরা ওই রকম ব্যাদড়া হয়। যেন টিকটিক না ক'রে বাবাজীবনদের তামাক টিকে ধরিয়ে গুড়ুক ফোঁকবার আয়োজন ক'রে দিলেই সব ঠিক হয়, ছেলেপুলেরা ঠাণ্ডা থাকে, প্রায় এই রকম ভাবটা আর কি। সেটা ক'রে উঠতে পারলুম না, তাই মাসখানেক একেবারে চুপচাপ মেরে রইলুম। যা খুশি কর্ বাবা, কিচ্ছু কথাটি কইব না! তার ফল তো হ'ল ওই। তখন ঠ্যাং জোড়াবার জন্যে ডাক্ বাবাকে!

এ কি মলাটের পাতা যে খানিকটা আঠা দিয়ে জুড়ে দোব? হাসপাতালে দিতেই হ'ল। আকাশ-পাতাল ঘুরে বহু লোকের পায়ে ধ'রে তো কোনক্রমে একটা বেড জোগাড় করতেই হেড খারাপ হবার মত হ'ল। ডাক্তারবাবুরা দেখে বললেন, 'এক্স্‌রে' করতে হবে। করা হ'ল। করকরে বত্রিশ টাকা বেরিয়ে গেল। তারপর কতকগুলো ওষুধের ফর্দ দিলেন, ডিসপেন্সারির লোকগুলোই হা-রে-রে রে ক'রে কোথেকে যে সত্তর-আশি টাকা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল তা বুঝতে পারলুম না। তারপর নার্সকে দাও, মেথরকে

খাও, দরোয়ানকে দাও, এটা আনো, ওটা আনো করতে করতে আরও শ দুয়েক টাকা বেরিয়ে গেল। এ দেশের দাতব্য হাসপাতাল কিনা!

যাই হোক, এর ওপর আবার মুশকিল—যখন তখন ফস ক'রে যাওয়া যাবে না, ঘণ্টি দিলে বেরিয়ে আসতে হবে, সে কত রকমের আইনকানুন! তিতিবিরক্ত হয়ে ডাক্তারবাবুকে একদিন ব'লে ফেললুম, মশাই, এবার একে বাড়ি নিয়ে যাই, বিশেষ তো কিছু হয় নি ব'লে মনে হচ্ছে। তিনি সে কথা শুনে এমন ভাবে আমার মুখের দিকে চাইলেন যে, মনে হ'ল, আর একটু দৃষ্টি স্থায়ী হ'লে আমাকেও বোধ হয় ওই হাসপাতালের একটা বেডে শুয়ে পড়তে হবে।

ফস ক'রে কথাটা ব'লেই ভাবলুম যে, কাজটা হয়তো ভাল করলুম না, রাত্তিরে ছেলেটা একা থাকে, শেষকালে ডাক্তার চটলে হয়তো, সারাতে পারুক না পারুক, গোটাকতক ইন্‌জেকশন দিয়ে জব্দ করবে, আর নার্স-টার্সও হয়তো থাকবে না সেদিকে। তারপর ছেলের মুখে শুনলুম যে, এমনই না বললেও কেউ থাকত না। ওদের সব টাইম বাঁধা কিনা।—জলতেষ্টা বা অন্ত প্রয়োজনাদি সারবার টাইম বাঁধা আছে। রুগীকে সেই ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হবে, পাঁচ-দশ মিনিট এদিক ওদিক করেছ কি নিজেই যা খুশি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ক'রে যাও।

আবার বুঝে বুঝে আমার ছেলেটির যিনি সেবার ভার পেয়েছিলেন, তিনি একেবারে ভারতের মহিয়সী মহিলা। কি কড়া চোখ মুখ চোয়াল, কোথাও এতটুকু স্যাঁতসেঁতে ভাব নেই। মেয়েমানুষ যে এত খটখটে কি ক'রে হয়, তা তাঁকে না দেখলে বুঝতে পারতুম না। রোগীরা বলে যে, একজন ফোড়া অপারেশন করতে এসেছিল, কিন্তু হঠাৎ সেই নার্সটির শ্রীমুখপঙ্কজ দেখেই তার ফোড়া ফেটে গিয়েছিল, তাকে আর টেবিলে শুতে হ'ল না। তিনি, মনে করুন, করছেন আমার ছেলের সেবা। অথচ যেগুলি সত্যিকারের ভাল, যাদের মুখের দিকে রোগীরা রোগ ভুলে খানিকটা চেয়ে থাকে, তারা সেদিকে নেই, বোধ হয় পয়সাওয়ালা রোগীদের ভাগে পড়েছে। অথচ আমার দেখুন বিপদ!

ছেলেকেই বা কি বলি আর অজানা মেয়েছেলেকে ডেকেই বা তার কর্তব্য বোঝাই কি ক'রে? অভ্যেস নেই তো। শেষে গিন্নীকে দেখাতে নিয়ে এলুম, তিনি একটু নার্সকে কর্তব্য বোঝাতে গেলেন। তার উত্তরে সে দু-একটা কড়া কথা শুনিয়ে দিলে। গিন্নীও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি আবার তার জবাব দিলেন। উত্তরোত্তর ব্যাপারটা ঘন হয়ে উঠল। আমি তো ব্যাপার দেখে নিরুত্তর; শেষে সত্বর একটা ট্যাক্সি ডেকে কোনমতে পুত্র পরিবার সমেত সোজা হাসপাতাল থেকে নাম কাটিয়ে বাড়ি চ'লে এসে বাঁচি। শেষে কি হাসপাতালে একটা দাঙ্গা বাধিয়ে পুলিস-কেসে পড়ব?

গিন্নীর কি? কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায় তা তো জানেন না! আমাকে যে

হাড়ে হাড়ে বুঝতে হচ্ছে। তিনি তো বাড়ি এসে খুব চীৎকার শুরু করলেন, তুমি যে তাড়াতাড়ি আমায় নিয়ে এলে, তা না হ'লে আমি ওকে ওপরওয়ালাদের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে আগাপাস্তলা একবার দেখে নিতুম।

আমি শেষে বললুম, যাক, সংসারে অনেক কিছু ভাল ভাল জিনিস দেখবার আছে, খামকা ওকে দেখে নিয়ে আর কি হবে, তুমি এখন ছেলেপুলেগুলোকে দেখ!

তিনি কথাটা বোধ হয় পছন্দ করলেন না, রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দেখলুম।

দুনিয়াতে আমার আর দেখতে কিছু বাকি রইল না, বুঝলেন? ছেলেপুলেদের কাণ্ড দেখলুম, গিন্নীর মেজাজ দেখলুম, বন্ধু-বান্ধবের ব্যবহার দেখলুম, স্বদেশবাসীর কর্তব্যপরায়ণতা দেখলুম, লোকের পেছনে খামকা লাগার উৎসাহ দেখলুম, নিজেদের শৃঙ্খলা-রক্ষার দুশ্চেষ্টা দেখলুম, লোকের ভদ্রতা দেখলুম, আহাম্মকদের প্রচারের জোরে নামজাদা হতে দেখলুম, দাতব্য চিকিৎসালয়ে দাতাকর্ণদের দেখলুম, শুধু দেখতে পেলুম না আপনাদের দয়াময় করুণার অবতার ভগবানটিকে—যিনি আমার পেছনে হপ্তার 'পর হপ্তা ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে মজা দেখছেন।

একবার দেখা হ'লে শুধু একটি কথা তাঁকে বলব, মশাই, খুব ভদ্দরলোক যা হোক!

শ্রীবিরূপাক্ষ

রাম গল্প

রাম-রাজত্ব এখনও আছে। আমাদের দৃষ্টি কলুষিত বলিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি না। পবিত্র-দৃষ্টি জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি সংগ্রহ করিয়া সুধীবর্গের গোচরে তাহা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যে শান্তি পরিপূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছিল। সহসা কিন্তু একদিন তিনি শুনিলেন যে, জনৈক দস্যু নাকি তাঁহার রাজ্যে যথেষ্ট লুটপাট করিতেছে, প্রজারা রাজদরবারে নালিশ করিয়াও কোন সুফল পাইতেছে না। তাহাদের নালিশ নাকি গ্রাহ্য বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে না।

তিনি মন্ত্রীকে ডাকিলেন। সমস্ত শুনিয়া মন্ত্রী মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, কই মহারাজ, এরূপ কোনও দস্যুর সংবাদ তো শুনি নাই।

জলদগম্ভীর কণ্ঠে দাশরথী আদেশ করিলেন, অবিলম্বে অনুসন্ধান করুন।

ঈষৎ কাসিয়া মন্ত্রীমহাশয় নতমস্তকে নিক্রান্ত হইয়া গেলেন।

...ছয় মাস অতীত হইল। কোন সুরাহা হইল না। লুটপাটের গুজব কানে আসিয়া প্রজা-প্রাণ রাঘবের চিত্তকে ক্রমাগত উদ্বেলিত করিতে লাগিল।

পুনরায় মন্ত্রীকে আহ্বান করিলেন। বস্তুত মন্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত কোন প্রকার

রাজনৈতিক পদক্ষেপ করা যে কোনও রাজার পক্ষে অসম্ভবই। জানকীবল্লভের পক্ষে তো বটেই—মন্ত্রীই তাঁহার সব।

মন্ত্রী, দস্যুর কোনও সংবাদ পাইয়াছেন কি?

এখনও পাই নাই। অনুসন্ধান চলিতেছে।

অনুসন্ধান কতদিন চলিবে?

শীঘ্রই শেষ হইবে আশা করি। দক্ষ কর্মচারীগণের উপর ভার ন্যস্ত করিয়াছি—

একটু তাড়া দিন।

যথা আজ্ঞা, মহারাজ।

ঈষৎ কাসিয়া মন্ত্রী নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

আরও ছয় মাস কাটিল। আরও বহু বেনামী পত্র আসিয়া কৌশল্যানন্দনের প্রজা-বৎসল হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। মন্ত্রীকে পুনরায় আহ্বান করিলেন।

দস্যুর কোনও খবর মিলিল?

অনুসন্ধান চলিতেছে। দক্ষতর রাজকর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছে।

রঘুমণি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কে এই দস্যু? যে সকল প্রজা তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছে, তাহারাও কেহ দস্যুর নামোল্লেখ করে নাই। দুর্ধর্ষ, দুর্দান্ত, নৃশংস প্রভৃতি নানাবিধ বিশেষণ ব্যবহার করিয়া তাহার দুর্দমনীয়তা পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছে মাত্র। তা ছাড়া সমস্ত দরখাস্ত বেনামী। নিজেদের নাম দিতেও কেহ সাহস করে নাই। সীতাপতির মনে হইল, তাঁহার রাজ্যে যে শান্তি বিরাজমান তাহা আপাত-শান্তি, একটা মিথ্যা মুখোশ মাত্র। ভিতরে ভিতরে প্রত্যেক প্রজার অন্তরে অশান্তির হলকা বহিতেছে।

দুর্মুখকে আহ্বান করিলেন। দুর্মুখ নতমস্তকে সমস্ত শুনিয়া বলিল, মহারাজ, আমি সব জানি।

জান? কে সেই দস্যু?

ক্ষমা করুন, নাম বলিতে পারিব না।

পারিবে না? কেন?

ক্ষমা করুন আমাকে।

আমার আদেশ, বলিতেই হইবে।

আমাকে ক্ষমা করুন প্রভু। তাহার নাম আমি কিছুতেই বলিতে পারিব না। তবে নিতান্তই যদি জেদ করেন, দেখাইয়া দিতে পারি।

রাবণারি রাঘব কোষবদ্ধ তরবারি ঈষন্নিষ্কাষিত করিয়া পুনরায় কোষবদ্ধ করিলেন এবং বলিলেন, বেশ, তাই দাও।

তাহা হইলে আমার সঙ্গে আসুন।

চল।

নগরের প্রান্তে আসিয়া রাজরথ থামিল।

দুর্মুখ সবিনয়ে কহিল, এইবার মহারাজকে পদব্রজে কিঞ্চিৎ কষ্টস্বীকার করিতে হইবে। দস্যু অরণ্যনিবাসী।

বেশ, চল।

বেশ কিছুদূর হাঁটিয়া উভয়ে একটি অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুদূরে গিয়া দুর্মুখ নিম্নকণ্ঠে সন্তর্পণে কহিল, প্রভু, ওই দেখুন, ওই—

দুর্মুখের উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত তর্জনী অনুসরণ করিয়া রামচন্দ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং দেখিতে পাইবামাত্র কৃতজ্ঞতায় গদগদ হইয়া পড়িলেন।

বৃক্ষশাখায় বসিয়া ছিলেন স্বয়ং অঞ্জনানন্দন হনুমান। সীতানাথের গদগদ ভাব এখনও কাটে নাই।

"বনফুল"

সংবাদ-সাহিত্য

ধীশক্তি এবং কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা তিলে তিলে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সম্পদ অর্জন করিতে হয়, কয়েকদিনের সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও প্রচারের সাহায্যে অকস্মাৎ একদা এক নির্দিষ্ট দিবসে লুঠতরাজ ও রাহাজানি করিয়া সেই সম্পদ অধিগত করার নাম—"প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" বা ডিরেক্ট অ্যাকশন। বিগত ১৬ আগস্টের পর ডিরেক্ট অ্যাকশনের এইরূপ সংজ্ঞা বহু প্রত্যক্ষদর্শীর মনে জাগিয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন, ইণ্ডিরেক্ট অ্যাকশন বা অপ্রত্যক্ষ সংগ্রামের দ্বারা স্বসমাজকে উন্নীত করার যে অনেক ধকল অল-ইণ্ডিয়া হাইকম্যাণ্ড তাহা অবগত না থাকিলেও বাংলার উর্দুভাষী প্রধানেরা ভালই অবগত আছেন। এই কারণে কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গৃহে ও প্রাঙ্গণে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার পরিবর্তে লুঠতরাজের মাল ও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল, আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষিত-অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকদিগকেও হত্যা ও লুণ্ঠনে প্ররোচনা দিতে দেখা গিয়াছিল। ভুক্তভোগী ও আঘাত-প্রাপ্তদের ধারণা যাহাই হউক, এই মারাত্মক গৃহযুদ্ধে আমরা একটা ব্যাপার বিস্ময়ের সহিত প্রত্যক্ষ করিলাম যে, সমাজের উর্ধ্বতন অংশই পচিয়া সর্বনাশের কারণ হইয়াছে, নিচের দিকে পচন পৌঁছায় নাই—নিরীহ জনসাধারণ শুধু সংসর্গজাত অপরাধে জীবন ও সর্বস্ব ডালি দিয়াছে। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের মত গুণ্ডাশ্রেণীর জীবেরা

উচ্চশ্রেণীর জীবেদের দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহৃত মাত্র হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত অপরাধ এই প্ররোচকদের—যাহারা অপরের গজ-বোড়ের চালের সুদীর্ঘ সাধনার উপর উপর-চাল দিয়া সস্তায় কিস্তি মাত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে, পানি না ছুঁইয়া মাছ ধরাই যাহাদের একমাত্র পলিটিক্স এবং মাঝে মাঝে "লড়িয়া লইব" এই বাচনিক হুঙ্কার-আস্ফালন যাহাদের সঙ্কল্প-সাধনার একমাত্র অবলম্বন। সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাকুলতা যদি সত্য সত্যই ইহাদের থাকিত, তাহা হইলে ইহারা বর্ণপরিচয়-বোধোদয় মারফৎ শনৈ শনৈ অগ্রসর হইত, একেবারে একদিনে অকস্মাৎ পোষ্টগ্রাজুয়েট ডিগ্রী আয়ত্ত করিবার অলীক স্বপ্নে মত্ত হইয়া নিরীহ জনসাধারণের ব্যাপক অপঘাত-মৃত্যু ও সর্বনাশের কারণ হইত না।

* * *

যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সমস্ত ব্যাপারটা ধামাচাপা দাও—ইহা কখনই ন্যায়সঙ্গত বিচার হইতে পারে না। ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিবারণের জন্য আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনার বিশদ বিবৃতি সহসা-আক্রান্ত জনসাধারণের জানা একান্ত আবশ্যক। আমরা জানি, মিথ্যার বেসাতিতে কখনই মঙ্গল হয় না; কিন্তু কলিকাতার রাস্তায় ঘাটে পাঁচ হাজারের অধিক মৃতদেহ তো কল্পিত নয়, কুড়ি হাজার অল্পবিস্তর আহত মানুষ মিথ্যা নয়, শত শত নিখোঁজ পুরুষ ও নারী অলীক নয় এবং কোটি কোটি টাকার দগ্ধ ও লুণ্ঠিত সম্পত্তি শুধু কথার তোড়ে ধোঁয়া হইয়া যাইবে না। ক্ষয় ও ক্ষতির বিয়োগ-বেদনা দগদগে ঘায়ের মত সত্য হইয়া আছে, অকারণ মৃত্যুর আতঙ্ক আমাদের মনে বাসা বাঁধিয়াছে,—আমরা সহস্র উৎপীড়িত প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে জানিতে চাই, ইহাদের অবলম্বিত নৃশংসতার যথার্থ স্বরূপ কি, কয়েকদিনের বিকৃত প্রচার চিরন্তন মানবীয়তাকে কক্ষচ্যুত করিয়া কতখানি পাশবিক জিঘাংসার উদ্রেক করিতে পারে, প্রতিবেশী হিসাবে ভিন্নধর্মাবলম্বীর কাছ হইতে বিপন্ন ব্যক্তিরা কতখানি আশ্রয় ও সাহায্য লাভ করিতে পারে, আইন ও শৃঙ্খলার নামে নিযুক্ত ব্যক্তিদের উপর আমরা এইরূপ অবস্থায় কতখানি নির্ভর করিতে পারি! ব্যাপক হত্যা ও লুণ্ঠনের যে বীভৎস ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল, তাহাতে বাংলার গবর্নর ও মন্ত্রীমণ্ডলী, মেয়র, পুলিস কমিশনার, পুলিস ও সামরিক বিভাগ, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেন্ট, কম্যুনিষ্ট পার্টি, ফিরিঙ্গি ও আবেদকরী সম্প্রদায়, অবাঙালী ও বাঙালী নেতা এবং দালালদের কতখানি হাত ও সহযোগিতা ছিল, কলিকাতার নাগরিক হিসাবে আমরা তাহার যথার্থ সংবাদ জানিতে চাই। আমরা জানিতে চাই, বাংলা গবর্মেণ্ট যথেষ্ট কারণ সত্ত্বেও শুক্রবারেই সামরিক বিভাগকে আহ্বান করেন নাই কেন; জানিতে চাই, পুলিস ও সার্জেণ্টরা চোখের সামনে লুণ্ঠন ও হত্যা ঘটা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় ছিল কেন; জানিতে চাই, শেষোক্তেরা লুণ্ঠনে যোগ দিয়াছিল কি না; জানিতে চাই,

হত্যা ও লুণ্ঠন কার্যে সরকারী লরি ও ভ্যান ব্যবহৃত হইয়াছিল কি না; জানিতে চাই, রেডক্রস চিহ্নের আড়ালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে জঘন্য শয়তানি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কি না; জানিতে চাই, কলিকাতার বিভিন্ন থানার অফিসার-নিয়োগের সহিত ১৬ আগস্টের পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের কোনও যোগ আছে কি না; জানিতে চাই, বহিষ্কৃত গুণ্ডাদের চাঁদা করিয়া কলিকাতায় আনা হইয়াছিল কি না; জানিতে চাই, পূর্ব হইতেই হাজার হাজার লোকের রেশন মজুদ রাখা হইয়াছিল কি না! বাংলা দেশে যে গবর্নর ও মন্ত্রীমণ্ডলীর শাসনে এই বীভৎসতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাঁহারা এখনও বজায় আছেন, তাঁহাদের ক্ষমতায় বা অক্ষমতায় অনুরূপ ঘটনার যে পুনরাবৃত্তি হইবে না, সে সম্বন্ধে আমাদিগকে স্বয়ং বড়লাট বাহাদুরও নিঃসংশয় করেন নাই; সুতরাং ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার কাজে আমাদিগকে কি সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা বিভিন্ন ঘটনার বিশদ বিবৃতির সাহায্যেই আমরা নির্ধারণ করিতে পারিব। তিন দিনের অরাজকতা আমাদিগকে যে সংহতি দান করিয়াছে, তাহা বজায় রাখিতে হইলে সমস্ত ব্যাপারের ব্যাপক প্রচার আবশ্যক, মিথ্যা গুজবের প্রচার নয়, যতদূর সম্ভব সত্য ঘটনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতেই হইবে। বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ প্রকাশ করিয়া এবং সকল বিপদ উপেক্ষা করিয়া নিজেরা অনুসন্ধান করিয়া যে সকল পত্রিকা কলিকাতার স্মরণীয় স্বজন-আহবের ভবিষ্যৎ সত্য ইতিহাসের উপকরণ লিপিবদ্ধ করিতেছেন, তাঁহারা মহৎ কার্যই করিতেছেন। ইঁহাদের চেষ্টার ফলে বহু নিরুদ্দিষ্ট ও নিখোঁজ ব্যক্তির ক্রমশ সন্ধান মিলিতেছে, ইহাও কম কথা নয়।

* * *

আর যাঁহারা নিজেদের প্রাণসংশয় করিয়া এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মৃত্যুকে বরণ করিয়া জাতিধর্মনির্বিশেষে বিপন্ন ও শরণাগতকে আশ্রয় দিয়া, নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া অথবা সেবাশুশ্রূষা করিয়া রক্ষা করিয়াছেন বা রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আজ প্রণাম নিবেদন করিতেছি। এই দুর্যোগময় বিভীষিকার মধ্যে ইঁহাদের পরিচয় পাইলাম, ইহাই আমাদের পরম লাভ। বিভিন্ন সেবা-প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ডাক্তার ও নার্স এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতার শিখ সম্প্রদায় বিপন্ন ও বিপর্যস্ত কলিকাতার প্রাণবায়ু রক্ষা ও সৎকারের কাজে যে মহৎ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা আমাদের চিরদিন স্মরণে থাকিবে।

* * *

এতখানি আত্মীয়রক্তমূল্যে আমরা কোন্ শিক্ষা লাভ করিলাম?—এই প্রশ্নই সকলের মনে জাগিতেছে। বৃহত্তর ভারতবর্ষ বা বাংলা দেশের হিসাব না করিয়া আমরা যদি ক্ষুদ্র কলিকাতার কথাই ধরি, তাহা হইলেও এ কথা আমাদের মানিতে হইবে যে, হিংসা-

বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসই যদি অর্ডার অব দি ডে হয় এবং মুসলমান-অধ্যুষিত মধ্য-কলিকাতা হইতে হিন্দুরা যদি উত্তরে বা দক্ষিণে স্থান-পরিবর্তনও করে, তাহা হইলেও কাহারও নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। উত্তর-দক্ষিণের চাপে মধ্য, এবং শহরতলীর চাপে উত্তর-দক্ষিণকে সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতে হইবে। তাহা ছাড়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে বা চাকুরিস্থানে কোনও পক্ষেরই আগমন-নিষ্ক্রমণের নিরাপদ রাস্তা নাই। একে অন্যকে এই অবস্থাতেও বাদ দিয়া চলিতে পারিতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে বয়কট বা স্থানত্যাগের প্রশ্ন অবান্তর। সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও এতদিন এক সম্প্রদায় শুধু উগ্রতা ও সংহতির বলে অন্য সম্প্রদায়কে আতঙ্কিত রাখিয়াছিল, এইবারে মাত্র প্রকাশ পাইল, সে ভয় মিথ্যা। প্রয়োজন হইলে অপর পক্ষও উদগ্র ও সংহত হইয়া উঠিতে পারে এবং তাহারাও কম নির্মম হইতে জানে না। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে নির্মূল করিয়া নিশ্চিন্তে বসবাস করিবে, সে ধারণা যে আকাশ-কুসুম মাত্র ১৬ই আগষ্ট তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। বিভেদ-বিদ্বেষ, হিংসা-অপঘাত, পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের পথে যে তৃতীয়-পক্ষ-রচিত সমস্যার সমাধান নয়, এইবারে সুস্থ ও স্বস্থ হইয়া স্থায়ী দুই পক্ষই তাহা বুঝিতে পারিবে। সম্প্রদায়গতভাবে উত্তরোত্তর সংহতি শক্তি, শিক্ষা ও সমৃদ্ধিলাভের পরিপূর্ণ চেষ্টা করিয়াও প্রতিবেশী হিসাবে দুই সম্প্রদায়কেই প্রীতি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বাস করিতেই হইবে। ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই। হিন্দুরাও যে প্রয়োজন হইলে স্বেচ্ছায় মরিতে ও মারিতে পারে, বহু শতাব্দীকালের মধ্যে ইহা তাহারা দেখাইতে পারে নাই বলিয়াই ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানেরা কারণে অকারণে তাল ঠুকিয়া চোখ রাঙাইয়াছে, অযথা উৎপীড়ন করিয়াছে। তাহাদের এবারকার চরম নির্যাতন মূষিকপ্রবৃত্তিসম্পন্ন নিরীহকেও খুনের দলে পরিবর্তিত করিয়াছে, আর তাহারা অবাধে মার খাইয়া গুহাশ্রয় করিবে না। ইসলামের চিরন্তন যোদ্ধৃবৃন্দ এবারে প্রেম ও সম্মানের সহিত ভগবদ্গীতার উপাসকদের হাতে হাত মিলাইতে পারিবেন, ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবার কারণ আর ঘটিবে না।

এই প্রসঙ্গে বহুকাল পূর্বে লিখিত মহাত্মা গান্ধীর সুচিন্তিত মন্তব্য সকলকে স্মরণ করিতে বলি। তিনি বলিতেছেন—

Hindus think that they are physically weaker than the Mussalmans. The latter consider themselves weak in educational and earthly equipments. They are now doing what all weak bodies have done hitherto. This fighting, therefore, however unfortunate it may be, is a sign of growth. It is like the Wars of the Roses. Out of it will rise a mighty nation.—*Young India* 9. 9. 26

The union that we want is not a patched-up thing but a union of hearts based upon a definite recognition of the indubitable proposition that Swaraj for India must be an impossible dream without an indisoluble union between the Hindus and Muslims of India. It must not be a mere truce. It cannot be based upon mutual fear. It must be a partnership between equals, each respecting the religion of the other.—*Young India* 6. 10. 20

* * *

অনেক কথাই মনে জাগিতেছে, কিন্তু এই প্রসঙ্গ বিস্তার করিয়া লাভ নাই। ভোটাল্পতায় আমরা—বাংলা দেশে নিগৃহীত সম্প্রদায়—সরকারী অর্থ ও শক্তির ন্যায়-সঙ্গত অধিকার দীর্ঘকাল হইতেই পাইতেছি না। বিদেশীয় ও বিজাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির চাপে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন; ইংরেজীর আক্রমণ কাটিতে না কাটিতেই অবাঙালীদের কৃপায় উর্দুর আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। বাংলা দেশের কৃষি ও বাণিজ্য পর্যন্ত অবাঙালীদের চাপে বিপন্ন। বাংলা দেশের চাষী জেলে জোলা তাঁতি নাপিত নিকারী ছুতোর মুচি হাড়ি ডোম গোয়ালা সকল সম্প্রদায়ই ধীরে ধীরে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। দুর্ভিক্ষ অনশন ম্যালেরিয়া ও নানা মহামারী আমাদের নিত্য সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর সাম্প্রদায়িকতার নামে ১৯২৬ সাল হইতে শহরে ও মফস্বলে আমাদিগকে মারিবার ব্যাপক আয়োজন মরার উপর খাঁড়ার ঘা মাত্র; নারী-হরণের মামলা না হয় আপাতত মুলতুবিই রাখিলাম। সুতরাং বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, পশ্চিমী গোঁফ আস্তর ও জবানের মোহে স্বজনকে উৎপীড়ন করিয়া তাঁহারা শেষ পর্যন্ত যেন নিজেরাও বিপন্ন না হন। ছুরি-ছোরা-ডাণ্ডার কারবার বাংলা দেশের কোনও দিনই নয়; আমরা নিরীহ শান্তিপ্রিয় জাতি, পরস্পরকে পাঁচালী ও গীত শুনাইয়া, বিচিত্র রঙে আঁকা পট দেখাইয়া দীর্ঘকাল একত্রে বাস করিয়াছি, উর্দু জবান ও আমিরী চালকে আমরা কোনও দিনই প্রীতি ও সম্ভ্রমের চোখে দেখি নাই। উঁহারা আজ আসিয়া আমাদিগকে উস্কাইয়া পরস্পর যুদ্ধোন্মুখ করিয়া মজা দেখিতেছে, বাংলার লুঠের মালের পনেরো আনা ভাগ লইতেছে, নানা অপকৌশলের সাহায্যে বাংলার শাসনভার লইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া বাঙালীর সর্বনাশ করিতেছে। এবারের নিধনযজ্ঞ কাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, একটু অনুসন্ধান করিলেই তাহা তাঁহারা জানিতে পারিবেন। কিন্তু অনুষ্ঠাতাদের কাহারও গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগে নাই, তাঁহাদের আমদানি-করা গুণ্ডারা বাংলা দেশের লুঠের মাল লইয়া বেমালুম সরিয়া পড়িয়াছে, ধনেপ্রাণে মরিবার বেলায় মরিয়াছি—আমরা, নিরীহ বাঙালী হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়। এই অকারণ মৃত্যু মূল্যে আমরা কি এই সত্যটি লাভ করিব না যে, বাঙালীর পক্ষে হিংসা ও অবিশ্বাস বাঁচিবার পথ নয়, প্রীতি ও বিশ্বাসই তাহাকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করিয়াছে!

* * *

এই ব্যাপক নরমেধযজ্ঞের যাহারা উদ্যোক্তা হিন্দুমুসলমাননির্বিশেষে সকল বাঙালীরই তাহাদের চিনিয়া রাখার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহারা কখনই হিন্দু-মুসলমান কোনও বাঙালীরই হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতে দূরে থাকিয়া তাহারা মজা দেখিয়াছে ও লুঠের মালে ভাগ বসাইয়া অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। কলিকাতা শহরে এই

তাণ্ডবলীলা জুড়িয়া দিয়া তাহারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পায়ের তলার মাটি ধরিয়াই টান দিয়াছে, আকস্মিক ভূমিকম্পের এক ধাক্কায় বাঙালী সমাজের সমস্ত ভিত্তিমূল শিথিল হইয়া গেল। মরিল কাহারা? মুচি মেথর মুদ্দোফরাস দোসাদ কোচোয়ান কুলি গাড়োয়ান রাজমিস্ত্রী রিকৃশাওয়ালা বিড়িওয়ালা চাষী ব্যাপারী জেলে ও মাঝিরা। তাহারা শুধু প্রাণে মরে নাই, তাহাদের উপর যাহাদের নির্ভর ছিল তাহাদিগকে পেটে মারিয়া গিয়াছে। যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া আছে, তাহারাও রুজিরোজগার ছাড়িয়া হয় পলাইয়াছে, নয় প্রাণভয়ে এখনও রোজগারের সন্ধানে বাহির হইতে পারিতেছে না; তাহা ছাড়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার দরুন পরস্পর অসহযোগের চেষ্টাও চলিতেছে। ফলে কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, সাধারণ নাগরিক জীবন পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়াছে। ইহার সর্বনাশা পরিণাম দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। অচিরাৎ সম্প্রীতি ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত না হইলে আমরা সেই পরিণামের মধ্যেই অদূরভবিষ্যতে নিক্ষিপ্ত হইব। তখন যাহারা চেষ্টা করিয়া এবং প্রচার করিয়া এই বিপর্যয় ঘটাইয়াছে, তাহারা নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে ও নিরুদ্বেগে ঐশ্বর্য ও অট্টালিকার মধ্যে নিজেদের কৃতিত্বের কথা ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে; আর দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানেরা দুর্ভিক্ষ মহামারী ও মৃত্যুর মধ্যে আবার পরস্পরের আশ্রয় খুঁজিবে, শ্মশানে ও কবরে তখন কোনই ভেদ থাকিবে না। এই অব্যর্থ পরিণামের কথা চিন্তা করিয়া জনসাধারণ এখনও যদি নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি ফিরাইয়া আনিয়া এই সব দুষ্কৃতিকারীদের তফাতে রাখে, তবেই তাহারা রক্ষা পাইবে।

• • •

সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণগুলিতে টুকরা টুকরাভাবে এক বিরাট ষড়যন্ত্রের যে আভাস পাওয়া যাইতেছে, অবিলম্বে এক ট্রাইবিউনাল গঠন করিয়া সেই ষড়যন্ত্রের সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রস্তুত করা প্রয়োজন। মানুষের জীবন ও ধনসম্পত্তি লইয়া যাহারা ছিনিমিনি খেলিতে চাহিয়াছিল, তাহারা সমাজে ও রাষ্ট্রে যত প্রতিষ্ঠাসম্পন্নই হউক, নির্মম বিচারে তাহাদের চরম শাস্তি বিধান করিতেই হইবে। যতদিন তাহা না হইবে, ততদিন কেহই নিরাপদ নহে।

• • •

আমাদের এক দেশসেবক কর্মীবন্ধু এই প্রসঙ্গে যে চিঠিখানি লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়াই আমরা এই লজ্জাকর প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। তিনি হাতেকলমে কাজ করিয়া থাকেন এবং এবারেও সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, সুতরাং কিছু বলিবার অধিকার তাঁহার আছে। ৩০।৮।৪৬ তারিখে তিনি লিখিতেছেন—

"বাংলার বর্তমান মন্ত্রীসভার প্রভাবে কিছুকাল থেকে নগ্নভাবে হিন্দু ব'লে হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ এবং মুসলমানের প্রতি প্রীতি বর্ধিত হচ্ছিল। তার ফলে এখানে বাঙালী হিন্দুর

ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, গবর্মেণ্টের কাছে কোন বিপদেই সাহায্য পাওয়া যাবে না, নিজের শক্তিতেই নিজেকে বাঁচতে হবে। আত্মশক্তির রাজসিক এবং তামসিক উন্মেষের ব্যাপারে ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন এবং ১৯৪৫-এর নভেম্বর ও ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে কলিকাতার ঘটনাবলিও আংশিকভাবে সাহায্য করেছিল।

"১৬ই আগষ্ট যখন মুসলমান জনতা কলকাতার বিভিন্ন পল্লীতে মিছিলের পিছনে পিছনে লুঠতরাজ আরম্ভ করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা আত্মরক্ষার জন্য ইট লাঠি ইত্যাদিতে সজ্জিত হয়ে পাড়া পাহারা দিতে আরম্ভ করে। সেই রাত্রি থেকেই বিভিন্ন জায়গায় নরহত্যা, গৃহদাহের সংবাদ আসতে আরম্ভ করে। পরদিবস থেকে উভয় সম্প্রদায়, আত্মরক্ষা করছি—এই বিশ্বাসে নির্মমভাবে পরস্পরকে সংহারের চেষ্টায় প্রমত্ত হয়ে ওঠে। মোট বোধ হয় পাঁচ হাজারের ওপর লোক মারা গেছে, আহতের সংখ্যা বহুগুণ বেশি।

"এইটুকু দেখা গেল, আশঙ্কার তমসায় যখন মানুষের মন আচ্ছন্ন হয় তখন তার সকল শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে নগ্ন পাশবিক রূপ ফুটে ওঠে। সেই পশু-অবস্থায় প্রেমের কথা শোনে না, ভয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হিংসায় ধ্বংসই করতে চায়। হয়তো উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচার করলে কারুর মধ্যে লোভ বেশি, নিষ্ঠুরতা বা জঘন্যতায় কেউ কিছু কম, কেউ কিছু বেশি; কিন্তু উভয়েরই যখন নগ্ন রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তখন সেই রূপের মধ্যে তারতম্যের সন্ধান হয়তো না করাই ভাল।

"একটা ভরসার কথা এই। হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে আত্মরক্ষার শক্তি, আত্মবিশ্বাসের বোধ, অতর্কিত আক্রমণেও সংহত হওয়ার বীর্য দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়, ক্ষণেকের উন্মত্তার পরে লোকে কিছু লজ্জিত হয়ে বলেছে, আত্মরক্ষার এ ছাড়া তো উপায় ছিল না। তৃতীয়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরস্পরকে মানুষ হিসাবে যারা সাহায্য করেছেন, তাদের দিকেই সবাইকার দৃষ্টি ধাবিত হয়েছে।

"অর্থাৎ, ঝড়ের ফলে আমাদের সভ্যতার যে আলগা আবরণ গায়ের উপরে ছিল, সেটি উড়ে গিয়ে নগ্নভূমি প্রকাশ পেয়েছে। সেই নগ্নভূমিতে এরই মধ্যে শ্যামল তৃণের আবির্ভাব হয়েছে। ধানের জমিতে শস্যরোপণের পূর্বে, চাষের সময়ে, তার নগ্ন রূপই প্রকাশ পায়। সেই জমিতে শুধু তৃণের মত লঘু আবরণ আমরা চাই না, শ্যামল তরুরাজির বিস্তীর্ণ ও গভীর আবরণ সৃষ্টি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যে বিভিন্ন সংস্কৃতির আস্তরণ লঘুভাবে হিন্দু বা মুসলমানের চিত্তকে ঢেকে ছিল, ক্ষণেকের ঝড়ে তা উড়ে গেছে, তার জায়গায় নূতন তরুর রোপণ ও বৃদ্ধির চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। সেই তরুর মূল থাকবে আমাদের অন্তরে যে পশু-অবস্থায় আছে তার ঐক্যের মধ্যে অর্থাৎ জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের সমতায়; কিন্তু সেই তরু উর্ধ্বে মাথা তুলে যেন আকাশকে

স্পর্শ করতে পারে, উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত জীবনকে শান্তি ও সম্পদ বিতরণ করতে পারে।

"সেই তরুর রোপণ ও বৃদ্ধিতে আমরা কেমনভাবে সহায়তা করব, সেই চিন্তা যেন আমরা প্রত্যেকে সর্বক্ষণ করতে পারি।"

—

সহজ বুদ্ধির বশে যদিও বুঝিতে পারিতেছি, কলিকাতার মারণ-যজ্ঞ হইতে গুরুতর ঘটনা এই কালের মধ্যে ভারতবর্ষের বুকে ঘটিয়াছে, তথাপি প্রত্যক্ষই পরোক্ষ বৃহৎকে আমাদের চোখে মর্যাদায় মহিমান্বিত হইতে দিতেছে না। ভারতবর্ষ আত্মকর্তৃত্বলাভের পথে যে প্রথম সোপান অতিক্রম করিল, এই ঘটনায় আজ ভারতবর্ষের আপামরসাধারণ সকলেরই আনন্দ করিবার দিন। কিন্তু নানা সাময়িক উত্তেজনায় সেই সুবিপুল সম্ভাবনার মধ্যে আমাদের সোনার বাংলা দেশকে এখনও দেখিতে পাইতেছি না; "এ" গ্রুপের পট-ভূমিকায় "সি" গ্রুপের গৃহবিবাদ-জর্জরিত চিত্রটি তেমন গৌরবে ফুটিয়া উঠিতেছে না। হয়তো একদিন উঠিবে, কিন্তু কবে কেমন করিয়া তাহা ঘটিবে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তথাপি ভারতবাসী হিসাবে আজ এই পরিপূর্ণ সম্ভাবনার দিনটিকে আমরা বরণ করিতেছি। বিনা আড়ম্বরে আজ যে কতবড় একটা পরিবর্তন ঘটিয়া গেল তাহা আমরা হয়তো উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, কিন্তু গত বাষট্টি বৎসর ধরিয়া ইহাই আমরা কামনা করিতেছিলাম এবং ইহারই জন্য আমাদের সাধনা ও আত্মত্যাগের সীমা-পরিসীমা ছিল না। ইহার জন্য ভারতবাসী দলে দলে কারাবরণ করিয়াছে, ফাঁসিকাঠকে ভয় করে নাই, সর্ববিধ নিগ্রহ উৎপীড়নকে উপেক্ষা করিয়াছে। লীগপন্থীদের আপাতবিরোধিতাসত্ত্বেও এ কথা ঐতিহাসিককে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ আর কখনই এমন অখণ্ড রূপ গ্রহণ করে নাই। দীর্ঘ বাষট্টি বৎসরের সকল ভারতবাসীর প্রাণপণ সাধনা আজ যে আকারে ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহা হয়তো আমাদের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ নয়— তবু একটা রূপ তো বটেই। অন্তর্বর্তীকালীন-শাসন দীর্ঘমেয়াদী-শাসনে যদি পর্যবসিত হয় এবং ভারতীয় শাসনব্যবস্থা যদি শেষ'শেষি ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের ঐক্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই আমাদের দীর্ঘকালের সাধনা চরম সফলতা লাভ করিবে। সূত্রপাত যখন হইয়াছে, আমরা ততদিন সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে পারিব।

—

এই ব্যাপক হত্যা ও মৃত্যুর মধ্যে একটি বিদেশীয় এবং দুইটি স্বদেশীয় মৃত্যুর গভীর শোকাবহতা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। এইচ. জি. ওয়েল্‌সের মৃত্যু বিদেশে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের মৃত্যু অত্যন্ত আকস্মিক। 'সবুজ পত্রে'র কর্ণধাররূপে তিনি ভাষা ও ভঙ্গীর দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরাইবার কাজে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই

ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, গবর্মেণ্টের কাছে কোন বিপদেই সাহায্য পাওয়া যাবে না, নিজের শক্তিতেই নিজেকে বাঁচতে হবে। আত্মশক্তির রাজসিক এবং তামসিক উন্মেষের ব্যাপারে ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন এবং ১৯৪৫-এর নভেম্বর ও ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারিতে কলিকাতার ঘটনাবলিও আংশিকভাবে সাহায্য করেছিল।

"১৬ই আগষ্ট যখন মুসলমান জনতা কলকাতার বিভিন্ন পল্লীতে মিছিলের পিছনে পিছনে লুঠতরাজ আরম্ভ করে, তখন সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা আত্মরক্ষার জন্য ইট লাঠি ইত্যাদিতে সজ্জিত হয়ে পাড়া পাহারা দিতে আরম্ভ করে। সেই রাত্রি থেকেই বিভিন্ন জায়গায় নরহত্যা, গৃহদাহের সংবাদ আসতে আরম্ভ করে। পরদিবস থেকে উভয় সম্প্রদায়, আত্মরক্ষা করছি—এই বিশ্বাসে নির্মমভাবে পরস্পরকে সংহারের চেষ্টায় প্রমত্ত হয়ে ওঠে। মোট বোধ হয় পাঁচ হাজারের ওপর লোক মারা গেছে, আহতের সংখ্যা বহুগুণ বেশি।

"এইটুকু দেখা গেল, আশঙ্কার তমসায় যখন মানুষের মন আচ্ছন্ন হয় তখন তার সকল শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে নগ্ন পাশবিক রূপ ফুটে ওঠে। সেই পশু-অবস্থায় প্রেমের কথা শোনে না, ভয়ে ক্রোধে উন্মত্ত হিংসায় ধ্বংসই করতে চায়। হয়তো উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচার করলে কারুর মধ্যে লোভ বেশি, নিষ্ঠুরতা বা জঘন্যতায় কেউ কিছু কম, কেউ কিছু বেশি; কিন্তু উভয়েরই যখন নগ্ন রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তখন সেই রূপের মধ্যে তারতম্যের সন্ধান হয়তো না করাই ভাল।

"একটা ভরসার কথা এই। হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে আত্মরক্ষার শক্তি, আত্মবিশ্বাসের বোধ, অতর্কিত আক্রমণেও সংহত হওয়ার বীর্য দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়, ক্ষণেকের উন্মত্তার পরে লোকে কিছু লজ্জিত হয়ে বলেছে, আত্মরক্ষার এ ছাড়া তো উপায় ছিল না। তৃতীয়, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পরস্পরকে মানুষ হিসাবে যারা সাহায্য করেছেন, তাদের দিকেই সবাইকার দৃষ্টি ধাবিত হয়েছে।

"অর্থাৎ, ঝড়ের ফলে আমাদের সভ্যতার যে আলগা আবরণ গায়ের উপরে ছিল, সেটি উড়ে গিয়ে নগ্নভূমি প্রকাশ পেয়েছে। সেই নগ্নভূমিতে এরই মধ্যে শ্যামল তৃণের আবির্ভাব হয়েছে। ধানের জমিতে শস্যরোপণের পূর্বে, চাষের সময়ে, তার নগ্ন রূপই প্রকাশ পায়। সেই জমিতে শুধু তৃণের মত লঘু আবরণ আমরা চাই না, শ্যামল তরুরাজির বিস্তীর্ণ ও গভীর আবরণ সৃষ্টি করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যে বিভিন্ন সংস্কৃতির আস্তরণ লঘুভাবে হিন্দু বা মুসলমানের চিত্তকে ঢেকে ছিল, ক্ষণেকের ঝড়ে তা উড়ে গেছে, তার জায়গায় নূতন তরুর রোপণ ও বৃদ্ধির চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। সেই তরুর মূল থাকবে আমাদের অন্তরে যে পশু-অবস্থা আছে তার ঐক্যের মধ্যে অর্থাৎ জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের সমতায়; কিন্তু সেই তরু ঊর্ধ্বে মাথা তুলে যেন আকাশকে

স্পর্শ করতে পারে, উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত জীবনকে শান্তি ও সম্পদ বিতরণ করতে পারে।

"সেই তরুর রোপণ ও বৃদ্ধিতে আমরা কেমনভাবে সহায়তা করব, সেই চিন্তা যেন আমরা প্রত্যেকে সর্বক্ষণ করতে পারি।"

—

সহজ বুদ্ধির বশে যদিও বুঝিতে পারিতেছি, কলিকাতার মারণ-যজ্ঞ হইতে গুরুতর ঘটনা এই কালের মধ্যে ভারতবর্ষের বুকে ঘটিয়াছে, তথাপি প্রত্যক্ষই পরোক্ষ বৃহৎকে আমাদের চোখে স্বমর্যাদায় মহিমান্বিত হইতে দিতেছে না। ভারতবর্ষ আত্মকর্তৃত্বলাভের পথে যে প্রথম সোপান অতিক্রম করিল, এই ঘটনায় আজ ভারতবর্ষের আপামরসাধারণ সকলেরই আনন্দ করিবার দিন। কিন্তু নানা সাময়িক উত্তেজনায় সেই সুবিপুল সম্ভাবনার মধ্যে আমাদের সোনার বাংলা দেশকে এখনও দেখিতে পাইতেছি না; "এ" গ্রুপের পট-ভূমিকায় "সি" গ্রুপের গৃহবিবাদ-জর্জরিত চিত্রটি তেমন গৌরবে ফুটিয়া উঠিতেছে না। হয়তো একদিন উঠিবে, কিন্তু কবে কেমন করিয়া তাহা ঘটিবে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। তথাপি ভারতবাসী হিসাবে আজ এই পরিপূর্ণ সম্ভাবনার দিনটিকে আমরা বরণ করিতেছি। বিনা আড়ম্বরে আজ যে কতবড় একটা পরিবর্তন ঘটিয়া গেল তাহা আমরা হয়তো উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, কিন্তু গত বাষট্টি বৎসর ধরিয়া ইহাই আমরা কামনা করিতেছিলাম এবং ইহারই জন্ম আমাদের সাধনা ও আত্মত্যাগের সীমা-পরিসীমা ছিল না। ইহার জন্ম ভারতবাসী দলে দলে কারাবরণ করিয়াছে, ফাঁসিকাঠকে ভয় করে নাই, সর্ববিধ নিগ্রহ উৎপীড়নকে উপেক্ষা করিয়াছে। লীগপন্থীদের আপাতবিরোধিতাসত্ত্বেও এ কথা ঐতিহাসিককে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ আর কখনই এমন অখণ্ড রূপ গ্রহণ করে নাই। দীর্ঘ বাষট্টি বৎসরের সকল ভারতবাসীর প্রাণপণ সাধনা আজ যে আকারে ফলপ্রসূ হইয়াছে, তাহা হয়তো আমাদের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ নয়— তবু একটা রূপ তো বটেই। অন্তবর্তীকালীন-শাসন দীর্ঘমেয়াদী-শাসনে যদি পর্যবসিত হয় এবং ভারতীয় শাসনব্যবস্থা যদি শেষ'শেষি ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ের ঐক্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই আমাদের দীর্ঘকালের সাধনা চরম সফলতা লাভ করিবে। সূত্রপাত যখন হইয়াছে, আমরা ততদিন সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে পারিব।

—

এই ব্যাপক হত্যা ও মৃত্যুর মধ্যে একটি বিদেশীয় এবং দুইটি স্বদেশীয় মৃত্যুর গভীর শোকাবহতা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। এইচ. জি. ওয়েল্সের মৃত্যু বিদেশে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের মৃত্যু অত্যন্ত আকস্মিক। 'সবুজ পত্রে'র কর্ণধাররূপে তিনি ভাষা ও ভঙ্গীর দিক দিয়া বাংলা সাহিত্যের মোড় ফিরাইবার কাজে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই

ভঙ্গীর মধ্য দিয়াই তিনি চিরদিন জীবিত থাকিবেন। তাঁহার সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথকেও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চারিদিকে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রবন্ধ ও গল্পগুলি খুব গভীর না হইলেও হালকা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, স্থানে স্থানে ক্ষুরধার। বার্নার্ড শয়ের মত বচনে অনন্যসাধারণ হইবার একটা ঝোঁক তাঁহার ছিল। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে আমরা "বীরবলের আত্ম-পরিচয়" (সচিত্র) প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

"সবুজপত্র প্রকাশ করি এবং বাঙলা লেখা আমার নেশা হয়ে ওঠে। আজও তার জের টানছি। আমার লেখার মধ্যে যদি একরোখামী থাকে তো তার কারণ আমি বাঙ্গাল; যদি বাক্‌চাতুরী থাকে তো তার কারণ আমি কৃষ্ণনাগরিক; আর যদি প্রাণ থাকে তো তার কারণ আমি আকৈশোর রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রাণের স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়েছি।"

* * * *

লালগোলার মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাংলা সাহিত্যের সর্বোত্তম সুহৃদ ছিলেন স্বর্গীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর তিনি সমধর্মী। এই দুই মহৎ ব্যক্তির সহায়তায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ বর্তমান প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইঁহারা উভয়েই পরিষদের "বান্ধব ছিলেন। লালগোলার মহারাজ বর্তমান পরিষৎ-মন্দিরের দ্বিতলটি নির্মাণ করিয়া দিয়া ছিলেন, লালগোলা-তহবিল গঠন করিয়া বহু মূল্যবান প্রাচীন বাংলা গ্রন্থাবলী মুদ্রণ সম্ভব করিয়াছিলেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুমূল্য গ্রন্থাগারটি পরিষদের জন্য তিনিই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই যে তাঁহার দান নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে তিনি মুর্শিদাবাদের বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই শান্ত দানবীরের মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন সত্যকার সুহৃদ হারাইল।

ডাক ধর্মঘট এবং কলিকাতায় মারণ তাণ্ডবের দরুন আমাদের যে বিপর্যয় ঘটিয়াছে তাহাতে যথাসময়ে পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হইল না। এখন পর্যন্ত এক মাস পূর্বের চিঠিপ আমাদের হস্তগত হইতেছে। ইচ্ছা ছিল পূজার ছুটির পূর্বেই আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যা বাহির করিব, কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। আশ্বিন সংখ্যা বিশেষ "শারদীয়া সংখ্যা" হইয়া পূজা পূর্বে বাহির হইবে। পূজার ছুটির পরে কার্তিক সংখ্যা বাহির হইবে। শারদী সংখ্যায় শ্রীমতী অমলা দেবীর সুবৃহৎ গল্প "সমাধান" প্রকাশিত হইবে। কার্তিক বর্ষারম্ভে 'বনফুলে'র নূতন উপন্যাস "অগ্নি" বাহির হইবে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শনিবারের চিঠি
১৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৩

শক্তি-পূজা

গত পনরোই সেপ্টেম্বরের সাপ্তাহিক 'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী 'কর্তব্য কি' শীর্ষক নিবন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছেন, গুণ্ডাদের দ্বারা কাহারও ধনসম্পত্তি প্রাণ অথবা নারীরা আক্রান্ত হইলে অহিংস প্রতিরোধ সর্বোত্তম উপায়, "retaliation or resistance unto death is the second best"। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতার বিশুদ্ধ বাতাস যাহারা পান করিতে চায়, তাহারা পুলিস বা মিলিটারির সাহায্য না লইবার জন্ম নিজেদের অবশ্যই ইস্পাত-কঠিন করিয়া তুলিবে। নিজ নিজ সক্ষম বাহুর উপর তাহাদিগকে বরাবরই নির্ভর করিতে হইবে।

মহাত্মা গান্ধীর ত্রিশ বৎসরের শিক্ষা ও প্রভাব সত্ত্বেও আমরা এখনও জাতিগতভাবে সর্বোত্তম পথের পথিক হইতে পারি নাই। এই রূঢ় সত্য স্বয়ং গান্ধীজী স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয় পথের পন্থীও আমরা ছিলাম না। থাকিলে আমাদের দীর্ঘ হাজার বৎসরের ইতিহাস কেবল পীড়ন লাঞ্ছনা, ক্ষয় ও ক্ষতির ইতিহাস মাত্র হইত না, অসহায় মানুষের সভয় আর্তনাদে দেশের আকাশ বারংবার মথিত বিদীর্ণ হইত না। আমরা বহুকাল ধরিয়া শিথিল ভাবে শক্তি-পূজার ভান মাত্র করিয়া আসিয়াছি, কাপুরুষের পূজা দেবী গ্রহণ করেন নাই।

এইবার আমরা যে কারণেই হউক, কাপুরুষতার গ্লানিমুক্ত হইবার জন্ম বদ্ধপরিকর হইতেছি। সত্যকার শক্তি-পূজার কাল আসন্ন। গান্ধীজী-বর্ণিত দ্বিতীয় স্তরের মর্যাদালাভ করিয়া আমরা প্রয়োজন হইলে অত্যাচারী গুণ্ডাপ্রকৃতির দুষ্কৃতদের বিরুদ্ধে আমরণ প্রতিরোধ চালাইবার সঙ্কল্প করিতেছি, তাহাদিগকে সজ্ঞানে ফিরাইয়া আনিবার জন্ম প্রতিশোধও লইব। দেশের শাসনতন্ত্র এখনও আমাদের, অর্থাৎ ভারতীয়দের, অনুকূলে আসে নাই। আপৎকালে পুলিস-বিভাগের অথবা সামরিক-বিভাগের সহায়তা যে আমরা পাই না, এই তিক্ত অভিজ্ঞতা প্রত্যেক ভদ্র ব্যক্তির হইয়াছে। অনেকে বিপরীত অভিজ্ঞতাও অর্জন করিয়াছেন। পুলিস ও সামরিক বিভাগ বহুক্ষেত্রে গৃহস্থের উৎপীড়ন-লাঞ্ছনার কাজে গুণ্ডাদের সহায় হইয়াছে, বাংলা দেশের শহরে মফস্বলে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

গুণ্ডাদের দ্বারা সুপরিকল্পিত এবং সুঅনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক হত্যা ও লুণ্ঠন এমন অতর্কিত ভাবে আসিয়াছিল যে, গৃহস্থ ব্যক্তিরা প্রথমটা ধনপ্রাণ রক্ষার কোনও ব্যবস্থাই করিতে

পারে নাই, পরে মহল্লায় মহল্লায় সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যতদূর সম্ভব আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে। যতদূর সম্ভব বলিলাম এই জন্য যে, বেপাড়ায় অতর্কিত আক্রমণ অথবা ট্রামে বাসে সম্মিলিত আক্রমণ রোধ করা এখনও সম্ভব হয় নাই, পুলিস ও মিলিটারির সাহায্য ব্যতিরেকে একা একা আত্মরক্ষা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ কাজের অর্থাৎ উদরের চাপে অনেককেই গুণ্ডা-অধ্যুষিত স্থানে অথবা স্থান দিয়া একা একা যাইতে হয়। এসব ক্ষেত্রেও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি দিয়া গুণ্ডাদের ভবিষ্যৎ-আক্রমণ বন্ধ করা একদিনে না হউক, দশ দিনে যাইত; কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলার নামে অথবা সম্প্রতি-জারিকৃত এমার্জেন্সি আইন বা হুকুমের জোরে আমাদের তথাকথিত রক্ষাকর্তারা সে ব্যবস্থা আমাদের করিতে দিবে না। সেদিক দিয়া আমাদের বিপদ সম্পূর্ণ থাকিয়াই যাইতেছে। কিন্তু আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া মহল্লায় মহল্লায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের আইন মানা উচ্চ-নীচ সকল স্তরের ভদ্রব্যক্তিদের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় গুণ্ডাদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ সম্পূর্ণ রোধ করা যাইতে পারে।

গুণ্ডা বলিতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সকল সম্প্রদায়ের লোকই বুঝায়। সুবিধা পাইলে পুলিস ও মিলিটারিরাও কেহ কেহ অনেক ক্ষেত্রে গুণ্ডামি করিয়া থাকে। গুণ্ডা-আইন প্রবর্তনের সময় পশ্চিমভারতীয় একটি প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে মুসলমান সদস্যেরা পরিষৎ-গৃহ ত্যাগ করিয়া স্বসমাজের প্রতি ঘোরতর অন্যায় করিয়াছেন আমরা এরূপই মনে করি। আগে গুণ্ডারা হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকনির্বিশেষে গুণ্ডামি করিত, সম্প্রতি স্বার্থান্ধ ব্যক্তিদের কূটকৌশলে গুণ্ডারাও সাম্প্রদায়িক মাহাত্ম্য অর্জন করিয়া স্বসম্প্রদায়ের ভদ্রলোকদেরও আত্মীয় ও আশ্রয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার ভবিষ্যৎ ফল ভয়াবহ, পাশে চলিতে চলিতে ইহারা স্বভাববশে ঘাড়ে চড়িবেই, তখন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের দোহাই পাড়িয়া ইহাদের সর্বনাশা কবল হইতে কেহই রক্ষা পাইবে না। কলিকাতার সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় ইহাই সর্বাপেক্ষা অধিক কুফলরূপে প্রতিভাত হইতেছে। সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই অবিলম্বে সাবধান হইতে হইবে, উত্তপ্ত তাওয়া অপেক্ষা প্রজ্জ্বলন্ত অগ্নি কখনই সুখকর নয়।

আমাদের নিজেদের দোষে আমরা সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমানদের বাংলা দেশে অত্যাচারী-উৎপীড়করূপে গড়িয়া উঠিবার অবকাশ দিয়াছি। আমাদের দৈহিক ও মানসিক কাপুরুষতা-দুর্বলতার জন্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়া আমরা তাঁহাদের বেআইনী আবদারকে দাবির অধিকার দিয়াছি, আস্কারা পাইয়া পাইয়া তিল তাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু অসহ্য হইলেও বহুদিনের অভ্যাসবশে আমরা আজ বাধা দিতে পারিতেছি না। অনেক দিনের দাবির জোরে মুসলমানেরাও বিভ্রান্ত

হইয়াছেন, তাঁহারা অন্যায়কে ন্যায় এবং ব্যাধিকে স্বাস্থ্য বলিয়া ভুল করিতেছেন। এই ভুল ভাঙিবার দায়িত্ব আমাদেরই। আমরা মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়াইতে পারিলেই তাঁহারাও অবরদস্তি সঙ্কোচ করিতে করিতে সুস্থ হইয়া উঠিবেন, সাম্প্রদায়িক বিরোধের মূলোচ্ছেদ আপনা হইতেই হইবে।

জানি, মুসলমান বন্ধুদের এই সহজ সত্যটি আজ ভাল লাগিবে না; কিন্তু তাঁহাদিগকে সামান্য কয়েকটি ব্যাপার স্মরণ করিতে বলি। মসজিদের সন্নিকটে বাজনা বন্ধ করিবার অথবা প্রকাশ্য স্থানে গো-কোরবানির দাবির মামুলী দৃষ্টান্ত দিব না। আমরা যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, সেগুলি আকারে অতি ছোট, তিল মাত্র। এই তিলই তিলে তিলে পর্বতপ্রমাণ হয়। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, সম্পূর্ণ হিন্দু মহল্লায় অনেক দিন দ্বিপ্রহরে মুসলমান বালকেরা কোনও গৃহের দাওয়া বা রক অধিকার করিয়া তাস বা অন্যবিধ জুয়া খেলিতে বসে। তাহারা সে সময় পরস্পর সম্বোধনে যে ভাষা ব্যবহার করে থাকে, অনেক গৃহস্থই তাহা পুত্রকন্যাদের শুনিতে দিতে চাহেন না। কিন্তু তাহাদিগকে সরাইয়া দিতে গেলে তাহারা রুখিয়া উঠে, শাসায় ও হল্লা জুড়িয়া দেয়। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আকার লইতে বিলম্ব ঘটে না। তাহাতে অনেক ফ্যাসাদ, সুতরাং বহু গৃহস্থ চুপ করিয়া যান। এই উপেক্ষায় দাবির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে অনেককে পাড়া ছাড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি। মুসলমান-মহল্লার সন্নিকটে যাঁহাদের বাস, তাঁহারাই বৎসরে বৎসরে মহরমের চাঁদার আবেদন কি আকারে আসে তাহা সভয়ে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও দিতে হয়, কারণ বিপদের কল্পনা অনেক দিক হইতেই আসে। মুসলমানের কাছে দুর্গাপূজার চাঁদার দাবি কৌতুকছলেও আমরা করিতে পারি না। ফুটবল খেলার মাঠে যাইবার দুর্ভাগ্য যাঁহাদের আছে, মহামেডান স্পোর্টিঙের কোনও খেলায় দর্শকরূপে তাঁহাদের শ্রবণ ও চক্ষুগত অভিজ্ঞতা যদি তাঁহারা বর্ণনা করেন, তাহা হইলে পুলিসে ধরা পড়িবার আশঙ্কা আছে। মানবীয় ভাষা এবং ভঙ্গী যে কত কদর্য হইতে পারে, সেখানে না গেলে কেহ উপলব্ধি করিবেন না। ওইদিন ট্রামে বাসে মাঠে গমন-প্রত্যাগমনের অভিজ্ঞতাও ভয়াবহ। নিরুপায়ভাবে এ সকলই আমরা সহ্য করিয়া যাই। আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে, কিন্তু বিস্তার করিয়া লাভ নাই। আমাদের সহ্যগুণের চরম পরীক্ষা লওয়া হয় আমাদের মেয়েদের প্রসঙ্গে। পথে ঘাটে পার্কে সমবেতভাবে ইহারা যে কাণ্ড করিয়া থাকে, তাহাতে নিতান্ত কেঁচোর রক্ত বলিয়াই আমরা ঠাণ্ডা থাকিয়া যাই।

মুসলমান সম্প্রদায়কে আমি একেবারেই দোষ দিতেছি না। অসভ্য ইতর সকল সমাজেই আছে। ভদ্র শিক্ষিত মুসলমানেরা নিশ্চয়ই এই জাতীয় নির্লজ্জতার ও

ইতরতায় লজ্জা অনুভব করেন। আমরা সহ্য না করিলেই তাঁহারা খুশি হইতেন। আমরা সহ্য করি কেন? সহ্য করি, ইহাদের মামলাও বৃহত্তর মুসলমান-সমাজ অকস্মাৎ সঙ্ঘবদ্ধভাবে গ্রহণ করেন বলিয়া। সঙ্ঘবদ্ধ হইবার, নির্বিচারে সাধারণ ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক আকার দিবার অতিশয় প্রশংসনীয় ক্ষমতা মুসলমানদের আছে। আমাদের তাহা নাই, সুতরাং আমরা অপমান ও বেইজ্জতি পকেটস্থ করিয়া কাঁচুমাচু মুখে সরিয়া পড়ি। ইহাতে আমাদের ক্ষতি তো হয়ই, মুসলমান-সমাজও প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমাদের একান্ত অক্ষমতাজনিত প্রশ্রয়ের ফলে এই সকল পুঞ্জ পুঞ্জ সামান্য ঘটনা-ফেনা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া তুচ্ছ আবদার-উপেক্ষাকে অসামান্য রাষ্ট্রীয় অধিকারের রূপ দিয়াছে। আজ আর 'না' বলিবার উপায় নাই।

অতর্কিতে মাথায় একটু বেশি রকমের ঘা খাইয়া এবার আমাদের দীর্ঘকালের জড়তা কিঞ্চিৎ চিড় খাইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতার দাঙ্গার পর হিন্দু একবার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তি অর্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, স্মরণ হইতেছে। সেই উত্তেজনার মুখে আমরাও লিখিয়াছিলাম :—

"হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ হইবে না কেন, প্রয়োজন হইলে শুদ্ধির সাহায্যে সামাজিক ক্ষতিপূরণের চেষ্টাই বা সে না করিবে কেন? তোমরা সুবিধা পাইলেই নিরীহ হিন্দুনারীকে ধর্ষণ করিয়া হিন্দু-সমাজের অবমাননা ও লোকক্ষয় করিবে, শক্তিহীনকে ধরিয়া বাঁধিয়া কলমা পড়াইয়া মুসলমান করিবা মিথ্যা নমাজের দোহাই দিয়া যখন তখন হিন্দুর রক্ত দেখিয়া ছাড়িবে, হিন্দু আজ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তোমার এই অত্যাচারের প্রতিকার সাধনে চেষ্টিত হয় তাহা হইলে অন্যায় কোথায়? তুমি মারিবে আর আমি আত্মরক্ষা করিতে পারিব না, এ তোমার কেমনতর বিচার? তাহা ছাড়া, পৃথিবীর সকল ধর্মেই দেখিতে পাই, সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার এক প্রচণ্ড প্রয়াস আছে। খ্রীষ্টিয়ানের মিশনরি আছে, বুদ্ধের শ্রমণ ও ভিক্ষু ছিল, তোমার মোল্লা আছে, আর হিন্দু অন্যধর্মাবলম্বীকে বা ধর্মান্তরগ্রহণকারীকে স্বধর্মে আনিবার চেষ্টা করিলেই তাহার দোষ হইল, ইহা কিরূপ যুক্তি?

বুদ্ধিমান জীবকে যুক্তি দিয়া বুঝানো যায়, কিন্তু যেখানে যুক্তির পরিবর্তে লগুড় উঠিবে, সেখানকার একমাত্র ন্যায়যুক্তি লগুড় ছাড়া কিছুই নয়। হিন্দু যে এতকাল অত্যাচারের পরও ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ছুটাছুটি করিতেছে না ইহাই আশ্চর্য। কিন্তু মুসলমানের এমন অহেতুক অযৌক্তিক অত্যাচারের ফলে হিন্দুরা যদি মসজিদ ভাঙিতে কিংবা মন্দিরে পরিবর্তিত করিতে শুরু করে, মুসলমানকে শুদ্ধি করিয়া হিন্দু করিয়া লয়, মুসলমান নারীকে ধর্ষণ করে, তাহা হইলে কি ভাল হইবে? কলসির কানায় মার খাইয়া খাইয়া হিন্দু কি চিরকালই প্রেম দিবে? প্রেম করিবার পাত্রও তো উপযুক্ত হওয়া চাই।

মুসলমান নেতারা আজ আপাতমধুর ফল পাইয়া নৃত্য করিতেছেন বটে, কিন্তু কালের ভয়াবহ বিচারের কথা তাঁহারা ভাবিলেন না। আজিকার শারীরিক সামর্থ্যের জয় জয়োল্লাস কয়দিন টিকিবে? হিন্দু মার খাইয়া খাইয়া আজ মাথা তুলিতেছে, তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইবেই। তাহারা মারের পরিবর্তে মার দিবে, মুসলমানকে হিন্দু করিয়া সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে সবে তাহারা শুরু করিয়াছে। সামাজিক অনেক পঙ্কিলতা মুসলমানের সহিত বিরোধিতায় ধুইয়া যাইবে, তখন মুসলমান টিকিবে কোথায়? মুসলমান যদি আজও আত্মস্থ না হয়, তাহা হইলে লম্বা দৌড়ে তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।...

গত এপ্রিল মাস [১৯২৬] হইতে পর পর যে কয়েকটি দাঙ্গা বাংলার উপর হইয়া গেল, তাহাতে হিন্দু এই বুঝিয়াছে যে, ক্ষমা ও প্রেম নিরীহের মহত্ত্ব নহে, দুর্বলতামাত্র। হিন্দু যদি সবল হইত, ঠেঙানির উত্তর যদি ঠেঙানি দিয়া সে দিতে পারিত, তাহা হইলে প্রীতি-মৈত্রীর কথা অপ্রাসঙ্গিক হইত না বটে, কিন্তু এখন যখন মার খাইয়া ক্যাল্‌ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই, তখন প্রীতির বার্তা প্রচণ্ড উপহাস ছাড়া কিছুই নয়। মরণাপন্ন রোগীকে পোলাও-কালিয়ার কথা বলা যেরূপ হাস্যজনক, বিপন্ন দুস্থ অত্যাচারিত নিরীহ হিন্দুকে যীশুখ্রীষ্ট ও চৈতন্যদেবের চ্যালা করিয়া তোলাও তেমনই হাস্যকর।

আশ্চর্য এই মুসলমান নেতাদের একনিষ্ঠ ধর্মপ্রীতি দেখিয়াও হিন্দুনেতাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না। সাধারণ মুসলমানের প্রত্যেকটি কাজে যে তাঁহাদের সক্রিয় সহানুভূতি আছে, ইহা আমরা সর্বদা দেখিতেছি। ন্যায়-অন্যায় বিচার ইঁহারা করেন না, তাঁহারা দেখেন, মুসলমান ইহা করিয়াছে সুতরাং সমর্থনযোগ্য। হিন্দু নেতারা ইঁহাদের আদর্শে কবে অনুপ্রাণিত হইবেন?

ভারতের হিন্দুর অবমাননা ও লোকক্ষয় রোগের একমাত্র প্রতিকার শুদ্ধি আন্দোলন ও সংগঠন। হিন্দু দলবদ্ধ হউক। প্রাণ দিয়া মান রক্ষা করুক। যদি তাহারা বীরের মত মরিতে প্রস্তুত না থাকে, তাহা হইলে অলক্ষ্যে ছুরি খাইয়া মরিতে হইবে। যদি মৃতপ্রায় এই হিন্দুজাতিকে বাঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা তুমি আমি প্রত্যেকেই না করি, তাহা হইলে সকলেরই মুসলমান হইয়া গিয়া অকারণ গৃহবিবাদ হইতে দেশকে রক্ষা করা কর্তব্য।

অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার মন্ত্র জানিত, বাহিরে আসিবার মন্ত্র শিখে নাই বলিয়া প্রাণ হারাইল। হিন্দুসমাজ বাহিরে আসিবার মন্ত্র জানে, ভিতরে প্রবেশ করিতে জানে না বলিয়াই এমন হীনবল ও লাঞ্ছিত হইতেছে। বহির্গত হিন্দুকে সমাজগোষ্ঠীতে ফিরাইয়া আনিবার উপায় শুদ্ধি ও সঙ্ঘবদ্ধতা। এখন হইতে তাহা না

ইহা পূরা বিশ বৎসর পূর্বের কথা এবং রাগের কথাও বটে। বর্তমানে আমরা এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করি না। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রও সেদিন বর্তমান হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন। আজ তাহাও আমাদের স্মরণীয়। তিনি লিখিয়াছিলেন :

"কোন একটা কথা বহু লোকে মিলিয়া বহু আস্ফালন করিয়া বলিতে থাকিলেই কেবল বলার জোরেই তাহা সত্য হইয়া উঠে না। অথচ এই সম্মিলিত প্রবল কণ্ঠস্বরের একটা শক্তি আছে এবং মোহও কম নাই। চারিদিক গম গম করিতে থাকে,—এবং এই বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশের নীচে দুই কানের মধ্যে যাহা নিরন্তর প্রবেশ করে মানুষ অভিভূতের মত তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসে। Propaganda বস্তুত এই। বিগত মহাযুদ্ধের দিনে পরস্পরের গলা কাটিয়া বেড়ানোই যে মানুষের একমাত্র ধর্ম ও কর্তব্য, এই অসত্যকে সত্য বলিয়া যে দুই পক্ষের লোকেই মানিয়া লইয়াছিল সে তো কেবল অনেক কলম এবং অনেক গলায় সমবেত চীৎকারের ফলেই। যে দুই-একজন প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিল, আসল কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের অবধি ছিল না।

কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ অপরিসীম বেদনা ও দুঃখভোগের ভিতর দিয়া মানুষের চৈতন্য হইয়াছে যে, সত্য বস্তু সেদিন অনেকের অনেক বলার মধ্যেই ছিল না।

বছর কয়েক পূর্বে, মহাত্মার অহিংস অসহযোগের যুগে এমনি একটা কথা এ দেশে বহু নেতায় মিলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিম মিলন চাইই। চাই শুধু কেবল জিনিসটা ভাল বলিয়া নয়, চাই-ই এই জন্য যে, এ না হইলে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, তাহার কল্পনা করাও পাগলামি। কেন পাগলামি এ কথা যদি কেহ তখন জিজ্ঞাসা করিত, নেতৃবৃন্দেরা কি জবাব দিতেন তাঁহারাই জানেন, কিন্তু লেখায়, বক্তৃতায় ও চীৎকারের বিস্তারে কথাটা এমনি বিপুলায়তন ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া গেল যে, এক পাগল ছাড়া আর এত বড় পাগলামি করিবার দুঃসাহস কাহারও রহিল না।

তারপরে এই মিলন-ছায়াবাজীর রোশনাই যোগাইতেই হিন্দুর প্রাণান্ত হইল। সময় এবং শক্তি কত যে বিফলে গেল তাহার তো হিসাবও নাই। ইহারই ফলে মহাত্মাজীর খিলাফৎ আন্দোলন, ইহারই ফলে দেশবন্ধুর প্যাক্ট। অথচ এত বড় দুটা ভুয়া জিনিসও ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে কম আছে। প্যাক্টের তবু বা কতক অর্থ বুঝা যায়, কারণ, কল্যাণের হোক, অকল্যাণের হোক, সময়মত একটা ছাড় রফা করিয়া

[illegible] খিলাফৎ

আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য। কোন মিথ্যাকেই অবলম্বন করিয়া জয়ী হওয়া যায় না। এবং যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এত বড় অসহযোগ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। স্বরাজ চাই, বিদেশীর শাসন-পাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবির বিরুদ্ধে ইংরাজ হয়তো একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে তাহা টিকে না। পাই বা না পাই, এই জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য আছে, প্রাণপাত হইলে অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেহ নাই। কিন্তু খিলাফৎ চাই এ কোন্ কথা? যে দেশের সহিত ভারতের সংস্রব নাই, যে দেশের মানুষে কি খায়, কি পরে, কি রকম তাহাদের চেহারা কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কির শাসনাধীন ছিল, এখন যদিচ, তুর্কি লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ, পরাধীন ভারতীয় মুসলমান-সমাজ আবদার ধরিয়াছে। এ কোন্ সঙ্গত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ—অতএব এস, একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর। কিন্তু এদিকে ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট কর্ণপাত করিল না, এবং ওদিকে যাহার জন্য খিলাফৎ সেই খলিফাকেই তুর্কিরা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। সুতরাং এইরূপে খিলাফৎ আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার ও অর্থহীন হইয়া পড়িল, তখন নিজের শূন্যগর্ভতায় সে শুধু নিজেই মরিল না, ভারতের স্বরাজ আন্দোলনেরও প্রাণ বধ করিয়া গেল। বস্তুত এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে লোক ভর্তি করা যায়, না করিলেই বিজয় লাভ হয়? হয় না, এবং কোনদিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।

এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি খাটিয়াছিলেন মহাত্মাজী নিজে। এতখানি আশাও বোধ করি কেহ করে নাই, এতবড় প্রতারিতও বোধ করি কেহ হয় নাই। সেকালে বড় বড় মুসলিম পাণ্ডাদের কেহ বা হইয়াছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, কেহ বা বাম হস্ত, কেহ বা চক্ষু কর্ণ, কেহ বা আর কিছু,—হায় রে! এতবড় তামাসার ব্যাপার কি আর কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে! পরিশেষে হিন্দু-মুসলমান-মিলনের শেষ চেষ্টা করিলেন তিনি দিল্লীতে—দীর্ঘ একুশ দিন উপবাস করিয়া। ধর্মপ্রাণ সরলচিত্ত সাধু মানুষ তিনি, বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, এতখানি যন্ত্রণা দেখিয়াও কি তাহাদের দয়া হইবে না! সে যাত্রা কোন মতে প্রাণটা তাঁহার টিকিয়া গেল। ভ্রাতার অধিক, সর্বাপেক্ষা প্রিয় মিঃ মহম্মদ আলিই বিচলিত হইলেন সবচেয়ে বেশি। তাঁহার চোখের উপরেই সমস্ত

ইহার সত্যকার উপকার কিছু করাই চাই। অতএব আগে যাই মক্কায়, পিয়া পীরের সিন্নি দিই, পরে ফিরিয়া আসিয়া কল্‌মা পড়াইয়া কাফের ধর্ম ত্যাগ করাইয়া তবে ছাড়িব।

শুনিয়া মহাত্মা কহিলেন, পৃথিবী, দ্বিধা হও।

বস্তুত, মুসলমান যদি কখনও বলে, হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।

একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুত, অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের 'পরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোনও সঙ্কোচ মানে নাই।

দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। পাবনার বীভৎস ব্যাপারে অনেককেই বলিতে শুনি, পশ্চিম হইতে মুসলমান মোল্লারা আসিয়া নিরীহ ও অশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া এই দুষ্কার্য করিয়াছে। কিন্তু এমনিই যদি পশ্চিম হইতে হিন্দু পুরোহিতের দল আসিয়া কোন হিন্দুপ্রধান স্থানে এমনি নিরীহ ও নিরক্ষর চাষাভুষাদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করে যে, নিরাপরাধ মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘরে দোরে আগুন ধরাইয়া সম্পত্তি লুঠ করিয়া মেয়েদের অপমান অমর্যাদা করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই সব নিরক্ষর হিন্দু কৃষকের দল উহাদের পাগল বলিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিতে এক মুহূর্তও ইতস্তত করিবে না।

কিন্তু কেন এরূপ হয়? ইহা কি শুধু কেবল অশিক্ষারই ফল? শিক্ষা মানে যদি লেখাপড়া জানা হয়, তাহা হইলে চাষী-মজুরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের বেশি তারতম্য নাই, কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য যদি অন্তরের প্রসার ও হৃদয়ের কালচার হয় তাহা হইলে বলিতেই হইবে উভয় সম্প্রদায়ে তুলনাই হয় না, হিন্দুনারীহরণ ব্যাপারে সংবাদ-পত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন, মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃপুনঃ এত বড় অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার তো মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু অতি বিনয়বশতই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করব কি; সময় এবং সুযোগ পেলে...

মিলন হয় সমানে সমানে, শিক্ষা সমান করিয়া লইবার আশা আর যেই করুক আমি

তো করি না। হাজার বৎসরে কুলায় নাই, আরও হাজার বৎসরে কুলাইবে না, এবং ইহাকেই মূলধন করিয়া যদি ইংরাজ তাড়াইতে হয় তো সে এখন থাক্। মানুষের অন্য কাজ আছে, খিলাফৎ করিয়া, প্যাক্ট করিয়া, ডান ও বাঁ—দুই হাতে মুসলমানের পুচ্ছ চুলকাইয়া স্বরাজ-যুদ্ধে নামানো যাইতে পারিবে এ দুরাশা দুই-একজনার হয়তো ছিল, কিন্তু মনে মনে অধিকাংশেরই ছিল না, তাঁহারা ইহাই ভাবিতেন, দুঃখদুর্দশার মত শিক্ষক তো আর নাই, বিদেশী বুরোক্রেসির কাছে নিরন্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া হয়তো তাহাদের চৈতন্য হইবে, হয়তো হিন্দুর সহিত কাঁধ মিলাইয়া স্বরাজ-রথে ঠেলা দিতে সম্মত হইবে। ভাবা অন্যায় নয়, শুধু ইহাই তাঁহারা ভাবিলেন না যে, লাঞ্ছনাবোধও শিক্ষা-সাপেক্ষ, যে লাঞ্ছনার আগুনে স্বর্গীয় দেশবন্ধুর হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইত, আমার গায়ে তাহাতে আঁচটুকুও লাগে না, এবং তাহার চেয়েও বড় কথা এই যে, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে যাহাদের বাধে না, সবলের পদলেহন করিতেও তাহাদের ঠিক ততখানিই বাধে না। সুতরাং, এ আকাশ-কুসুমের লোভে আত্ম-বঞ্চনা করি আমরা কিসের জন্য? হিন্দু-মুসলমান-মিলন একটা গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ওই গাল-ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোন কাজেই আসে নাই। এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। আজ বাংলার মুসলমানকে এ কথা বলিয়া লজ্জা দিবার চেষ্টা বৃথা যে, সাত পুরুষ পূর্বে তোমরা হিন্দু ছিলে, সুতরাং রক্তসম্বন্ধে তোমরা আমাদের জ্ঞাতি, জ্ঞাতিবধে মহাপাপ, অতএব কিঞ্চিৎ করুণা কর। এমন করিয়া দয়া ভিক্ষা ও মিলন প্রয়াসের মত অগৌরবের বস্তু আমি তো আর দেখিতে পাই না। স্বদেশে বিদেশে ক্রীশ্চান বন্ধু আমার অনেক আছেন। কাহারও পিতা, কাহারও বা পিতামহ, কেহ বা স্বয়ং ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু নিজে হইতে তাঁহারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় না দিলে বুঝিবার জো নাই যে, সর্বদিক দিয়া তাঁহারা আজও আমাদের ভাই-বোন নন। একজন মহিলাকে জানি, অল্প বয়সেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এত বড় শ্রদ্ধার পাত্রীও জীবনে আমি কম দেখিয়াছি। আর মুসলমান? আমাদের একজন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে মুসলমানীর প্রেমে মজিয়া ধর্ম ত্যাগ করে। এক বৎসর পরে দেখা। তাহার নাম বদলাইয়াছে, পোশাক বদলাইয়াছে, প্রকৃতি বদলাইয়াছে, ভগবানের দেওয়া যে আকৃতি, সে পর্যন্ত এমনি বদলাইয়া গিয়াছে যে আর চিনিবার জো নাই। এবং এইটিই একমাত্র উদাহরণ নয়। বস্তির সহিত যাঁহারই অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা আছে,—এ কাজ যেখানে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে—তাঁহারই অপরিজ্ঞাত নয় যে, এমনিই বটে! উগ্রতায় পর্যন্ত ইহারা বোধ হয় কোহাটের মুসলমানকেও লজ্জা দিতে পারে।

অতএব, হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কি করিয়া এই অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হইবে;

হিন্দুর সমস্যা এই যে, কি করিয়া তাহারা সংঘবদ্ধ হইতে পারিবেন, এবং হিন্দু-ধর্মাবলম্বী যে কোন ব্যক্তিকেই ছোট জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্মতি তাঁহাদের কেমন করিয়া এবং কবে যাইবে। আর সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হিন্দুর অন্তরের সত্য কেমন করিয়া তাহার প্রতিদিনের প্রকাশ্য আচরণে পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। যাহা ভাবি তাহা বলি না, যাহা বলি তাহা করি না, যাহা করি তাহা স্বীকার পাই না,—আত্মার এত বড় দুর্গতি অব্যাহত থাকিতে সমাজ-গাত্রের অসংখ্য ছিদ্রপথ ভগবান স্বয়ং আসিয়াও রুদ্ধ করিতে পারিবেন না।

ইহাই সমস্যা এবং ইহাই কর্তব্য। হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল না বলিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বেড়ানোই কাজ নয়। নিজেরা কান্না বন্ধ করিলেই হবে অন্য পক্ষ হইতে কাঁদিবার লোক পাওয়া যাইবে।

হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে,—এ দেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই, তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ কি, এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু পিছু ভারতের জল বায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে! আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ শুধু হিন্দুর,—আর কাহারও নয়। মুসলমানের সংখ্যা গণনা করিয়া চঞ্চল হইবারও আবশ্যকতা নাই। সংখ্যাটাই সংসারে পরম সত্য নয়। ইহার চেয়েও বড় সত্য রহিয়াছে, যাহা এক দুই তিন করিয়া মাথা গণনার হিসাবটাকে হিসাবের মধ্যেই গণ্য করে না।

হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, তাহা অনেকের কানেই হয়তো তিক্ত ঠেকিবে, কিন্তু সেজন্য চমকাইবারও প্রয়োজন নাই, আমাকে দেশদ্রোহী ভাবিবারও হেতু নাই। আমার বক্তব্য এ নয় যে, এই দুই প্রতিবেশী জাতির মধ্যে একটা সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন ঘটিলে সে বস্তু আমার মনঃপুত হইবে না। আবার বক্তব্য এই যে, এ জিনিস যদি নাই-ই হয় এবং হওয়ারও যদি কোন কিনারা আপাতত চোখে না পড়ে তো এ লইয়া অহরহ আর্তনাদ করিয়া কোন সুবিধা হইবে না। আর না হইলেই যে সর্বনাশ হইয়া গেল, এ মনোভাবেরও কোন সার্থকতা নাই। অথচ, উপরে নীচে, ডাহিনে বামে, চারিদিক হইতে একই কথা বারম্বার শুনিয়া ইহাকে এমনিই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছি যে, জগতে ইহা ছাড়া যে আমাদের আর কোন গতি আছে তাহা যেন আর ভাবিতেই পারি না। তাই করিতেছি কি? না, অত্যাচার ও অনাচারের বিবরণ সকল স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এই কথাটাই কেবল বলিতেছি, তুমি এই আমাকে মারিলে, এই আমার দেবতার হাত-পা ভাঙিলে, এই আমার মন্দির ধ্বংস করিলে, এই আমার

মহিলাকে হরণ করিলে,— এবং এ সকল তোমার ভারি অন্যায়, ও ইহাতে আমরা যারপর-নাই ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতেছি; এ সকল তুমি না থামাইলে আমরা আর তিষ্ঠিতে পারি না। বাস্তবিক ইহার অধিক আমরা কি কিছু বলি, না করি? আমরা নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছি যে, যেমন করিয়াই হৌক, মিলন করিবার ভার আমাদের, এবং অত্যাচার নিবারণ করিবার ভার তাহাদের। কিন্তু, বস্তুত, হওয়া উচিত ঠিক বিপরীত। অত্যাচার থামাইবার ভার গ্রহণ করা উচিত নিজেরা এবং হিন্দু-মুসলমান-মিলন বলিয়া যদি কিছু থাকে তো সে সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া উচিত মুসলমানের 'পরে।

কিন্তু দেশের মুক্তি হইবে কি করিয়া? জিজ্ঞাসা করি, মুক্তি কি হয় গোঁজামিলে? মুক্তি অর্জনের ব্রতে হিন্দু যখন আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে, তখন লক্ষ্য করিবারও প্রয়োজন হইবে না, গোটাকয়েক মুসলমান ইহাতে যোগ দিল কি না। ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন, যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে; যখন বুঝিবে, যে কোন ধর্মই হৌক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সে বুঝার এখনও অনেক বিলম্ব, এবং জগৎসুদ্ধ লোক মিলিয়া মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের কোন দিন চোখ খুলিবে কি না সন্দেহ। আর, দেশের মুক্তিসংগ্রামে কি দেশসুদ্ধ লোকেই কোমর বাঁধিয়া লাগে? না, ইহা সম্ভব, না, তাহার প্রয়োজন হয়? আমেরিকা যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছিল, তখন দেশের অর্ধেকের বেশি লোকে তো ইংরাজের পক্ষেই ছিল? আয়র্লণ্ডের মুক্তিযজ্ঞে কয়জনে যোগ দিয়াছিল? যে বলশেভিক গবর্মেণ্ট আজ রুশিয়ার শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছে, দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে সে তো এখনও শতকে একজনও পৌঁছে নাই। মানুষ তো গরু-ঘোড়া নয়, কেবলমাত্র ভিড়ের পরিমাণ দেখিয়াই তাহার সত্যাসত্য নির্ধারিত হয় না, হয় শুধু তাহার তপস্যার একাগ্রতার বিচার করিয়া। এই একাগ্র তপস্যার ভার রহিয়াছে দেশের ছেলেদের 'পরে। হিন্দু-মুসলমান-মিলনের ফন্দি উদ্ভাবন করাও তাহার কাজ নহে, এবং যে সকল প্রধান রাজনীতিবিদের দল এই ফন্দিটাকেই ভারতের একমাত্র ও অদ্বিতীয় বলিয়া চীৎকার করিয়া ফিরিতেছেন, তাঁহাদের পিছনে জয়ধ্বনি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া বেড়ানোও তাহার কাজ নহে। জগতে অনেক বস্তু আছে, যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান-মিলনও সেই জাতীয় বস্তু। মনে হয়, এ আশা নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া কাজে নামিতে পারিলেই হয়তো একদিন এই একান্ত দুষ্প্রাপ্য নিধির সাক্ষাৎ মিলিবে। কারণ, মিলন তখন শুধু কেবল একার চেষ্টাতেই ঘটিবে না, ঘটিবে উভয়ের আন্তরিক ও সমগ্র বাসনার ফলে।"

আগষ্ট নরমেধযজ্ঞের পরে আমাদিগকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া এই বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। মুসলমানদের সহিত যদি আমরা সত্যকার মিলন চাই, তাহা হইলে আত্মশক্তির ভিত্তিতেই আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে, মনপ্রাণ দিয়া শক্তি-পূজা করিতে হইবে। অক্ষমের মত অসহায়ের মত, ছোটখাট অন্যায় সহ্য করিয়া করিয়া যে প্রশ্রয় আমরা দিয়া আসিয়াছি, তাহাতে কোনও পক্ষেরই মঙ্গল হয় নাই। বৃহৎ মিলনের খাতিরে আমাদিগকে অনেক কিছু ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, কিন্তু সামান্য সামান্য ব্যাপারে দুর্বলতা দেখাইয়া তজ্জনিত প্রশ্রয় দিয়া আমরা যেন পুনরায় দেশের সর্বনাশ না ডাকিয়া আনি।

শক্তি-পূজার মূল কথা নারীর সম্মান। যে দেশে নারীর সম্মান পদে পদে ক্ষুণ্ণ হয়, সে দেশে শক্তি-পূজা বিফল ও অসার্থক। দুর্বল কাপুরুষেরাই নারীর সম্মান রাখিতে পারে না। আমরাও পারি নাই, তাই আমাদের শক্তি-পূজা ভানমাত্র হইয়াছে, অথচ নিতান্ত ইতর এবং হীন মনোবৃত্তি লইয়া গুণ্ডাদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত নারীদের আমরা সামাজিক নিগ্রহ করিতেও কসুর করি নাই। এইখানে আমাদের পাপ চার পোয়া হইয়া আমাদিগকে অমানুষ করিয়া তুলিয়াছে। সেদিনের এত রক্তপাত এবং লোকক্ষয় যদি এই দিকে আমাদিগকে সচেতন করিয়া তুলিতে পারে, তবেই অশিবের মধ্যে শিবের মঙ্গলহস্ত আমরা দেখিতে পাইব।

নারী লাঞ্ছন ধর্ষণ ও হরণ বাংলা দেশের একটি ব্যাপক ও বৃহৎ সমস্যা। ইহা নিছক গুণ্ডাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও নিতান্ত থানা-পুলিস-আদালতেই এই সমস্যার চরম মীমাংসা হয় না। ধর্ষিত ও অপহৃত হিন্দুনারীদের বেলায় সর্বত্র শেষ পর্যন্ত ইহা সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। এই সামাজিক কারণে অনেক ক্ষেত্রে আদালত পর্যন্ত আমরা এই লাঞ্ছনার জের টানিতে চাই না, ফলে দুষ্কৃতকারীরা প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। কলিকাতায় নর ও নারী মেধযজ্ঞের নারী অংশের রহস্য এখনও অনুদ্‌ঘাটিত আছে। কানাঘুষায় যাহা শুনিয়াছি, তাহার সম্পূর্ণটাই গুজব নয়, কারণ সংবাদপত্রে পশ্চিম-ভারতের কোনও কোনও স্থানে মুসলমান গুণ্ডার সহিত কলিকাতা হইতে অপহৃত হিন্দুনারীর অবস্থান-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার কোনও কোনও অঞ্চলে পরিত্যক্ত গৃহ হইতে ধর্ষিত হিন্দুনারীদের উদ্ধার করা হইয়াছে। মফস্বল হইতেও প্রতিদিন নারীহরণের সংবাদ আসিতেছে। লজ্জার সঙ্কোচ কাটাইয়া প্রকাশ্যভাবে এই সকল ব্যাপারের অনুসন্ধান ও বিচার দাবি করিতে হইবে। পুরুষজাতির অক্ষমতার অপরাধে যে সকল নারী লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছেন, সামাজিকভাবে তাঁহাদের গায়ে যেন কোনও কলঙ্কের দাগ না লাগে—আমাদের সামাজিক মনোবৃত্তি এমন ভাবে গড়িয়া

তুলিতে হইবে। কোন্ কোন্ পল্লীর কোন্ কোন্ বাড়ির কোন্ কোন্ নারী অপহৃত হইয়াছে, তখন তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়া বিহিত ব্যবস্থা করিতে আমাদের বাধিবে না। আমাদের সমাজপতিদের অন্ধ কুসংস্কার ও গোঁড়ামির জন্য আমরা অনেক শতাব্দী ধরিয়া অপমানিত ধর্ষিত ও অপহৃত নারীদের বর্জন করিয়া সামাজিকভাবে প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। অপরপক্ষে ইহাদের লইয়াই মুসলমানেরা ধীরে ধীরে সংখ্যাবৃদ্ধি ও শক্তিসঞ্চয় করিয়াছে। এই নারীদের এবং ইহাদের অক্ষম অভিভাবকদের এই কথাই বুঝাইয়া দিতে দিতে হইবে যে, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির দ্বারা অনিচ্ছায় লাঞ্ছিত হইলে কোনও নারী পতিত হয় না। শাস্ত্রবিধি অনুসারেই তাহার সামাজিক দাবি সম্পূর্ণ বজায় থাকে।

এই আত্মবিনাশের পাপ বর্জন করিয়াই আমাদিগকে এবার শক্তি-পূজায় অবতীর্ণ হইতে হইবে। অন্য সম্প্রদায় কর্তৃক অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত নারীদের নিজেরা সামাজিক-ভাবে লাঞ্ছনা করিয়া আমরা হীনতর পাপ করিয়া আসিতেছিলাম, এই পাপের হাত হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া তবেই আমরা শক্তির ভজনা করিব। শক্তি অর্জিত হইলে ভবিষ্যৎলাঞ্ছনার ভয় বিদূরিত হইবে, যাহা হারাইয়াছে তাহাকে সম্মানের সহিত ঘরে ফিরাইয়া আনিতে পারিলে সর্বদা হারাই-হারাই ভয়ে আমরা আর মূর্ছিত থাকিব না। আমাদের অনেক বিপদ কাটিয়া যাইবে। দেবী আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন।

এ বিষয়ে দেশের অবিবাহিত যুবক সম্প্রদায়ের একটা বিরাট কর্তব্য আছে। ইহা তাঁহাদিগকে নানাভাবে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। সমাজের নেতারা এ বিষয়ে মুহুর্মুহু ফতোয়া জারি করিলে লুপ্ত সমাজচৈতন্য পুনর্জাগ্রত হইবে। আমাদের এবং বিশেষভাবে তাঁহাদের অক্ষমতা ও নিষ্ক্রিয়তার দরুন এই জাতীয় যে সকল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাঁহারাই প্রধানত তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, আমরা অর্থাৎ অভিভাবক সম্প্রদায় প্রায়শ্চিত্ত করিব অপহৃতা ও লাঞ্ছিতাদের সমাজে সসম্মানে স্থান দিয়া।

যত মাথা তত মত—হিন্দু বাঙালীর এই একটা অপবাদ আছে। শুধু বাংলা দেশে নয়, প্রবাসে বাঙালী যেখানে যেখানে পাকা ডেরা বাঁধিয়াছে, সেইখানেই পরস্পর দলাদলি ও বিরোধের অন্ত নাই। সামান্য অভিনয়ের ভূমিকা বিলি লইয়া অথবা বই বাছাই লইয়া খুনাখুনি পর্যন্ত হইতে দেখিয়াছি। অপরপক্ষ আমাদের এই দুর্বলতার কথা ভালই জানে এবং সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও তাহারা চোখ রাঙায়। এই দুর্বলতা সর্বাগ্রে দূর না হইলে আমরা কোনও দিনই নিজের পায়ে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিব না, বরাবর মার খাইতে থাকিব। অবাঙালী অন্য হিন্দু-সম্প্রদায়কেও প্রীতি ও সম্মানের চোখে দেখার অভ্যাস আমরা অনেক দিনই হারাইয়াছি। ইহাও আমাদের শক্তিহীনতার অপর একটি কারণ। আধুনিক সভ্যতার বিচারে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ যখন তমসাবৃত ছিল, তখন বাংলা

দেশ কতক বৈষয়িক প্রয়োজনে এবং খানিকটা নূতনত্বের মাদকতায় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। "ইয়ং বেঙ্গল" নামে প্রসিদ্ধ সেদিনকার বাঙালীর ক্লেশকর সাধনার ইতিহাস যাঁহারা অবগত আছেন, পূর্ণ এক শতাব্দীর সিদ্ধিলাভকে তাঁহারা আকস্মিক বিবেচনা করিবেন না। নূতনের বীজ যাহারা বপন করিয়াছিল, নূতন ফসল তাহারাই ন্যায়ানুমোদিত ভাবেই পাইয়াছিল। নূতন শিক্ষা ও জ্ঞানের মত্ততায় বাঙালী সেদিন সমস্ত ভারতবর্ষে ইংরেজের দালালরূপে জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছিল। সূত্রপাতে যাহা তাহার নিকটে শক্তিরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, অর্ধ শতাব্দীর ব্যবহারে দেখা গেল, তাহাই তাহার চরমতম দুর্বলতার আকর হইয়া উঠিয়াছে; বাঙালী স্বদেশে প্রবাসী হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের প্রসিদ্ধ নগর ও তীর্থস্থানগুলিতে কলিকাতার আদর্শে চৌরঙ্গী, পার্ক স্ট্রীট, গ্রেট ঈষ্টার্ন ও গ্র্যাণ্ড হোটেল পত্তন করিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন দেহাতী সম্প্রদায়ের যে অপরিসীম বিস্ময় বাঙালী উদ্রেক করিয়াছিল, বহুকাল পরে ঘুম হইতে সদ্য জাগিয়া তাহারাই ওই সকল পরম বিস্ময়কর পদার্থকে ঈর্ষার চোখে দেখিতে আরম্ভ করিল। সেই ঈর্ষা-সিন্ধুমন্থনসঞ্জাত হলাহলের দ্বারা বাঙালীর সমৃদ্ধি আজ ঘরে ও বাহিরে সর্বত্র জর্জরিত। যাহাদের ঘুম ভাঙানোর কাজে বাঙালী একদিন হয়তো লাভের লোভে কিংবা নিছক খোশখেয়ালে ভৈরবীসুর ভাঁজিয়াছিল, তাহারাই যে আজ অবিমিশ্র কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে প্রতিহিংসার বশে তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে ইহাতে অবাক হইলে চলিবে না। ইহাই হয়, কারণ ইহাই স্বাভাবিক। ইংরেজ আমাদের অন্ধকার যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোক আনিয়াছিল বলিয়া মনে মনে কৃতজ্ঞতাবোধ করিলেও আমরা বাহিরে "কুইট ইণ্ডিয়া"র ধুয়া ছাড়িতে পারি না। ইংরেজের পক্ষে সারা ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, যাহা ঘটিয়াছে, বাঙালীর পক্ষে বাংলার বাহিরে তাহাই ঘটিয়াছে। অবশ্য নাক-উঁচু বাঙালীর প্রেমহীন অবহেলা ইহার জন্য কতখানি দায়ী, আজ কে তাহার বিচার করিবে?

ব্যাধির বীজ রক্তে প্রবেশ করিয়াছে, কারণ বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া লাভ নাই। প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেই আমাদের অশেষ কল্যাণ। ইংরেজের অর্থাৎ বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের সহিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধের মূলে যে এক্সপ্লয়টেশনের গ্লানি, বাংলা দেশের বাহিরে বাঙালীর সহিত অবাঙালীর বিরোধের মূলেও অনুরূপ গ্লানি বর্তমান। এই গ্লানির ফলেই কোনও কোনও ক্ষেত্রে কংগ্রেসকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙালী-পীড়নযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে। ইহাতে ঘাবড়াইলেও চলিবে না।

কারণ, আজ আমরা মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছি, এই সঙ্কটকালে আমাদিগকে বৃহত্তর বিপদের কথাই সর্বাগ্রে চিন্তা করিতে হইবে। সে বিপদ আমাদের ঘরে একেবারে

আমাদের মর্মস্থলে বাসা বাঁধিয়াছে এবং গত ১৬ই আগষ্ট তারিখ হইতে আমরা তাহারই বিচিত্র প্রকাশ দেখিতেছি। বাঙালী হিন্দুর সহিত বাংলা দেশের মুসলমানের যে বিরোধ তাহা আজ শুধু ধর্মগত নয়, কূটকৌশলী নেতাদের নানা চালে তাহা পলিটিকাল বিরোধে দাঁড়াইয়াছে এবং কোয়াদে আজম জিন্নার "দুই জাতিতত্ত্বে"র মোহে পড়িয়া এই বিরোধ জাতিগত বিরোধ হইয়া উঠিতে আর দেরি নাই। বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতিগত পার্থক্যের ধুয়া তুলিয়া দুই সম্প্রদায়ের প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতিরও পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। বিরোধ এবং সংঘর্ষ এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, বিশেষত পূর্ববঙ্গের ব্যাপক অভিযান দৃষ্টে যে অবস্থার কথা মনে হয়, তাহাতে আজ আমরা কল্পনাই করিতে পারিতেছি না যে, কোনও দিন আমরা নিরুপদ্রবে পাশাপাশি বাস করিতে পারিব। যেন এক বা অপর পক্ষের নিঃসংশয় বিলোপ সাধিত না হইলে সমস্যার সমাধান হইবে না। আরও একটা কথা চিন্তা করিবার আছে। যে তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় বিরোধ ঘনীভূত হইয়া সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, তাহাদের স্বার্থ যতদিন আমাদের পরাধীনতার সহিত জড়িত থাকিবে, ততদিন হিন্দু-মুসলমানের ধর্মগত বিরোধ আইনের বলে তাহারাই লালনপালন করিবে। ইণ্টারিম গবর্মেণ্টের কার্যকরী ঢেউ বাংলা দেশের উপকূলে আসিয়া আঘাত করিতে এখনও বহু বিলম্ব আছে।

এ ক্ষেত্রে বাংলা দেশের হিন্দুকে বাঁচিতে হইলে অবাঙালী হিন্দুদের মুখাপেক্ষী হইতেই হইবে। ১৬ই আগষ্ট হইতে আমরা এই শিক্ষাও অল্পবিস্তর লাভ করিয়াছি। তাহাদের সহিত আমাদের আচার বা স্বার্থগত অন্যান্য যে বিরোধ, বৃহত্তর প্রয়োজনের তাগিদে তাহা বিলুপ্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। এই সত্য আমরা যেদিন সত্যসত্যই হৃদয়ঙ্গম করিব, সেদিন সকল অসুবিধা ও উত্তেজনা সত্ত্বেও আমরা আত্মস্থ হইব। বাংলা দেশে বর্তমান শাসনতন্ত্র যেভাবে ক্রমশ সাম্প্রদায়িক হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয়, নিখিল ভারতবর্ষের আদর্শে বাংলার শাসনতন্ত্র পরিবর্তিত না হইলে অদূরভবিষ্যতে বাঙালী হিন্দুকে ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া আত্মসম্মান বজায় রাখিতে হইবে। সংস্কৃতিগত মৃত্যু না ঘটিলে তাহাতেও আমাদের আপত্তি ছিল না। সুতরাং সমগ্র ভারতের পটভূমিকায় হিন্দু-ভারতবর্ষের সহিত একাত্মবোধের দ্বারা সংযুক্ত হইলে আমরা বিলুপ্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিব।

আমাদের বক্তব্য শেষ হইয়াছে, শক্তি-পূজার জন্য প্রস্তুতির কাল সমাগত। আমরা নব্যবাংলার শক্তিমন্ত্রের প্রথম এবং প্রধান উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি। 'ধর্মতত্ত্বে'র গুরুর মুখে তিনি বলিতেছেন :—

"যাহার শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম।

রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন, এইটা আইন বটে। কিন্তু কার্যত তাহা ঘটে না। রাজা সকলকে রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। পারিলে, এত খুন, জখম, চুরি-ডাকাতি, দাঙ্গা, মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। পুলিসের বিজ্ঞাপনসকল পড়িলে জানিতে পারিবে যে, যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আগু হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনার শরীর বা সম্পত্তিরক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাই তোমার বুঝা কর্তব্য। আত্মরক্ষা যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম, আপনার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, স্বজন, কুটুম্ব, প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তাদৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম। যে ইহা করে না, সে পরম অধার্মিক।

আত্মরক্ষা বা স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে ধর্মের চতুর্থ বিঘ্নের কথা উঠিতেছে। এই তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুতর, ধর্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই ধর্মের জন্য প্রাণ পর্যন্ত, প্রাণ কি, সর্বসুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বদেশরক্ষার কথা বলিতেছি।

যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম। সমাজস্থ এক এক ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সর্বস্ব অপহরণমানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাজ বা দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসন বা ধর্মের শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজ-শাসন নাই সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পারে, সে তার কাড়িয়া খায়। দুর্বল সমাজকে বলবান সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম। বরং আরও গুরুতর ধর্ম, কেন না, এ স্থলে আপন ও পর উভয়ের রক্ষার কথা এবং ধর্মোন্নতির পথ মুক্ত রাখিবারও কথা।

অতএব আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন, তাহা সকলেরই কর্তব্য।

সকলেরই সর্ববিধ অস্ত্র প্রয়োগে সক্ষম হওয়া উচিত।"

বঙ্কিমচন্দ্র ষাট বৎসর পূর্বে উহা বুঝিয়াছিলেন—প্রয়োজন ব্যতিরেকেও বুঝিয়াছিলেন। আমাদের প্রয়োজন ঘটিয়াছে, আমরা কি তবু বুঝিব না? বন্দে মাতরম্।

সমাধান

রায় বাহাদুর নৃপেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী ছাদের উপর একলা পায়চারি করিতেছেন। অন্ধকার রাত্রি। মাথার উপরে তারা-ভরা আকাশ। বাড়ির সকলেই সুপ্তিমগ্ন। সারা শহরের জীবন-চাঞ্চল্য স্তিমিতপ্রায়। মাঝে মাঝে দুই-একটা হ্যাকড়া-গাড়ির ঘড়ঘড় শব্দ বা মোটরের হর্নের শব্দ কানে আসিতেছে। পাশের বাড়ির কুকুরটা ক্রমাগত চীৎকার করিতেছে। দূরে রেল-ষ্টেশনে এঞ্জিনগুলা হুশ হুশ শব্দ করিয়া এক লাইন হইতে আর এক লাইনে যাওয়া-আসা করিতেছে; মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ তীব্র বাঁশির শব্দে অন্ধকার বিদীর্ণ করিতেছে। শহরের বিদ্যুতের কারখানায় এঞ্জিনের অবিশ্রান্ত ঘটঘট শব্দ। জেলখানার পেটা ঘড়ি মাঝে মাঝে ঢং-ঢং শব্দে বাজিয়া সময়ের পদক্ষেপ নির্দেশ করিতেছে।

বিস্তৃত ছাদের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত নতমস্তকে পদচারণ করিতেছেন। গভীর চিন্তামগ্ন ভাব। রায় বাহাদুরের বয়স ষাট পার হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ দোহারা গঠন; রঙ ধবধবে ফর্সা; লম্বা ধরনের মুখ; মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা; মুখে পরিপুষ্ট গোঁফ; চুল ও গোঁফ দুই সাদা হইয়া উঠিয়াছে। পরনে ধুতি, গায়ে ফতুয়া, পায়ে চটি। যৌবনে দেহ ঋজু ছিল; দৃঢ় শক্তিমান ছিল; এখন বার্ধক্যের ভারে সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়াছে। হাকিমি করিতেন। বৎসর কয়েক আগে অবসর লইয়া এই শহরে বাস করিতেছেন। বড় ছেলে অজিত ওকালতি পাস করিয়া এই শহরেই প্র্যাক্‌টিস করিতেছে; বয়স মাত্র ত্রিশ হইলেও ইহার মধ্যেই বেশ প্র্যাক্‌টিস জমাইয়াছে। আরও একজন ছেলে এবং দুইটি মেয়ে আছে তাঁহার। ছোট ছেলের নাম সুজিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এস. সি. পাস করিয়া ডাক্তারি ডিগ্রীর জন্য যুদ্ধ বাধিবার আগে বিলাত গিয়াছিল, যুদ্ধের জন্য এখনও দেশে ফিরিতে পারে নাই। মেয়ে দুটির নাম যথাক্রমে মৈত্রেয়ী ও আত্রেয়ী। মৈত্রেয়ী বিবাহিতা; পুত্র-কন্যার জননী। আত্রেয়ীর এখনও বিবাহ হয় নাই; তবে বিবাহের কথাবার্তা পাকা হইয়া গিয়াছে। অজিতেরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে, দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে হইয়াছে। রায় বাহাদুরের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার; গৃহিণী এখনও জীবিতা।

সূর্যের মত দীপ্ত গৌরবে জীবনাকাশ পরিক্রম করিয়া রায় বাহাদুর পাটে বসিয়াছেন। সরকারী চাকরিতে বাঙালী ডেপুটীর চরম ও পরম কাম্য ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইয়াছিলেন। নিখাদ রাজ-আনুগত্য ও ঐকান্তিক রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ 'রায় বাহাদুর' খেতাব পাইয়াছেন। অতি সচ্ছল আর্থিক অবস্থা। দেশে জমিদারি কিনিয়াছেন, পৈতৃক পুরাতন বাড়ি মেরামত করিয়া নূতনের মত করিয়াছেন। শহরেও দুইখানি বাড়ি,

একটিতে নিজে বাস করিতেছেন, আর একটি ভাড়া খাটিতেছে। ব্যাঙ্কে সঞ্চিত টাকার পরিমাণও সামান্ত নয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারে করণ-কারণ করিয়াছেন। শহরে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তাঁহার। সংসারেও সুখের সীমা নাই। পুত্রেরা স্বাস্থ্যবান, শিক্ষিত ও শ্রীমান; জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ তাহাদের সুনিশ্চিত। কন্তারা সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী। বড় জামাইটি মুনসেফ। যে ছেলেটির সঙ্গে ছোট মেয়ের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, সে ছেলেটি সম্প্রতি সাব-ডেপুটীর চাকরিতে বহাল হইয়াছে। ভালভাবে চাকরি করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ডেপুটী হইতে পারিবে। কাজেই মেয়েদের জীবনেও সুখ-সৌভাগ্য অবশ্যম্ভাবী। রায় বাহাদুরের গৃহিণী প্রৌঢ়ত্বে পৌছিয়াও দেহের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য এখনও বজায় রাখিয়াছেন। পুত্রবধূ রূপবতী গুণবতী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি একান্ত ভক্তিমতী। নাতি-নাতিনীগুলিও সদ্যফোটা ফুলের মত সুন্দর; অবিরত আনন্দোচ্ছল কলহাস্যে গৃহ মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। মোট কথা, রায় বাহাদুর সুখী ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, তাঁহার সুখ ও সৌভাগ্যের জন্ত তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত।

এ হেন ব্যক্তি যে রায় বাহাদুর, তিনি রাত্রির তৃতীয় যামে সুখশয্যায় সুপ্তিমগ্ন না থাকিয়া বিনিদ্র-চক্ষে কুঞ্চিত-কপালে একাকী পদচারণ করিতেছেন কেন? ইহার কারণ একটি মাত্র চিঠি।

সকালে বেড়ানো রায় বাহাদুরের অভ্যাস। বড় রাস্তা ধরিয়া শহর ছাড়াইয়া অনেক দূর চলিয়া যান; ফিরিতে নয়টা বাজিয়া যায়। আসিয়া স্নানাহ্নিক করেন। তারপর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বৈঠকখানার বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে অর্ধশয়ান হইয়া আগের দিনের খবরের কাগজটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন। পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে রাস্তার দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তাকান। বেলা এগারোটার সময়ে ডাক-পিয়ন চিঠি বিলি করে। তাহারই আগমনপ্রত্যাশায় এই উৎকণ্ঠা। বিদেশে ছেলেমেয়েরা থাকে; তাহাদের সংবাদের জন্ত মন সর্বদাই সতৃষ্ণ থাকে। সেদিনও যথারীতি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন রায় বাহাদুর। পিয়ন চিঠি দিয়া গেল। কয়েকটা খাম ও পোষ্টকার্ড। পোষ্টকার্ডগুলি গৃহিণী ও পুত্রবধূর। খাম তিনটির একটা অজিতের, লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানির তাগিদ-পত্র; বাকি দুইটি তাঁহার। বাকি চিঠিগুলি পাশের ছোট টেবিলে রাখিয়া তিনি একটি খাম খুলিয়া চিঠি বাহির করিলেন। ছোট মেয়ের ভাবী শ্বশুরের চিঠি। চিঠিটায় তাড়াতাড়ি আদ্যোপান্ত চোখ বুলাইয়া লইলেন। তারপর চিঠিটা খামে ঢুকাইয়া টেবিলে রাখিলেন। এমন সময়ে চাকর গড়গড়ার কলিকা বদলাইয়া দিতে আসিল। তাহাকে চিঠিগুলি অন্দরে লইয়া যাইতে আদেশ দিয়া, দ্বিতীয় খামটির উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। ঠিকানাটি মেয়েলী হাতে লেখা। লেখার ছাঁদ অপরিচিত মনে হইল। যাহাদের কাছ

হইতে হামেশা চিঠি পান, তাহাদের কাহারও নহে নিশ্চয়ই। পরম ঔৎসুক্যসহকারে খামটি খুলিলেন। এক্সারসাইজ খাতার পাতায় লেখা মোড়ক-করা চিঠি বাহির হইল। চিঠিটি খুলিয়া তিনি পড়িতে শুরু করিলেন—

পরমারাধ্য, পরমপূজনীয়,

বাবা! আজ কুড়ি বছর পরে তোমাকে চিঠি লিখছি। এতদিন যে চিঠি লিখি নি তার কারণ এ নয় যে, তোমার কথা আমি ভুলে গেছি। কুড়ি বছরের প্রত্যেক দিন তোমার কথা ভেবেছি; কোথায় আছ, কেমন আছ জানবার জন্তে উৎকণ্ঠিত হয়েছি; তোমাকে একটিবার দেখবার জন্তে ছটফট করেছি; খবরের কাগজ পেলেই খবরের কাগজে সরকারী চাকরেদের বদলির খবর যেখানটায় থাকে, তন্নতন্ন ক'রে পড়েছি। আমি আসবার পর তুমি কখন কোথায় বদলি হয়েছ, আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। তবু, পাছে তুমি বিরক্ত হও, মা রাগ করেন, তোমার সম্মান ও সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে চিঠি লিখতে সাহস করি নি। কতবার চিঠি লিখে ছিঁড়ে ফেলেছি। কিন্তু আজ এমন অবস্থায় পৌঁছেছি যে, পৃথিবীতে কারও বিরক্তি, রাগ বা সম্ভ্রম-হানি বাঁচিয়ে চলা আর চলছে না। পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ-সূত্র যখন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে, তখন যাঁদের মাঝে জন্মেছি, যাঁদের স্নেহে যত্নে একদিন প্রতিপালিত হয়েছি, তাঁদের সঙ্গে দেনা পাওনা চুকিয়ে দেবার জন্তে মন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

যাঁর হাত ধ'রে একদিন সমাজ, সংসার ও সংস্কার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, সামাজিক শ্রেণীবিভাগে তাঁর স্থান হয়তো নীচে ছিল, কিন্তু হৃদয় ও মনের দিক দিয়ে তিনি পৃথিবীতে কারও চেয়ে ছোট ছিলেন না। তিনি আমাকে আইনসঙ্গতভাবে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে যা আমি পেয়েছি, আমার বিশ্বাস পৃথিবীতে অনেক স্ত্রীর ভাগ্যে তা জোটে না। আত্মীয়-স্বজন, সমাজ ছেড়ে চ'লে আসার দুঃখ ও বেদনা তাঁর অপরিমিত অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রদ্ধায় তিনি মুছে দিয়েছিলেন। আমি জীবনে সত্যি, সুখী হয়েছিলাম, বাবা। এমন কি নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেছিলাম একদিন।

যেখান থেকে তোমাকে চিঠি লিখছি, এই গ্রামেই আমাদের বিবাহের পর আমরা এসেছিলাম। এখানে নিজের চেষ্টায় ও গ্রামবাসীদের সাহায্যে তিনি একটি ছোট স্কুল গ'ড়ে তুলেছিলেন। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি। স্কুলটাকে ভাল করবার জন্তে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খাটতেন। মাহিনা অল্পই ছিল। তবে গ্রামের সকলে তাঁর উদার সরল মন ও মধুর ব্যবহারের জন্ত তাঁকে খুব ভালবাসত। সকলেই যার যতটুকু সাধ্য জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করত। পাড়াগাঁ, স্বামী আর একমাত্র ছেলে নিয়ে ছোট সংসার; কষ্টে সৃষ্টে চ'লে যেত আমাদের।

চার বছর আগে তিনি চ'লে গেলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পাড়াগাঁয়ে

যতটা সম্ভব চিকিৎসা হ'ল। কিছুতেই রাখা গেল না তাঁকে। ছেলে আমার সে বৎসর ম্যাট্রিক দিয়েছে। আমাদের গাঁ থেকে তিন-চার মাইল দূরে একটা বড় স্কুল আছে। এই রাস্তা হেঁটে ওই স্কুলে সে পড়তে যেত। এখানে রাস্তাঘাট ভাল নয়। বর্ষায় তো সব ডুবে যায়; নৌকো ক'রে যেত আসত তখন। কাপড়, জামা, জুতো, ছাতা তাকে কোনদিন নিয়মিতভাবে দিতে পারতাম না। কত কষ্টে সে যে পড়াশোনা করত দেখে চোখের জল সামলাতে পারতাম না। তবে বাপ-মায় বড় দরদী ছেলে ছিল সে; যত কষ্টই হোক, মুখের হাসিটুকু কখনও নিবত না। পাসও করেছিল ভাল ক'রেই। উনি দেখে যেতে পারেন নি।

ওঁর মৃত্যুর পর দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। কোথায় যাই, কি করি, কেমন ক'রে ছেলেটিকে মানুষ ক'রে তুলি, ভেবে চোখের ঘুম আমার উবে যেত। সে সময়ে তোমাকে একটা চিঠি লিখব ব'লে ভেবেছিলাম, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। কারণ তোমার ব্যবহার আমি ভুলতে পারি নি। মহকুমা হাকিম হিসাবে তুমি আমাদের গাঁয়ে এসেছিলে, ওঁকে চিনতেও পেরেছিলে; কিন্তু একবার দেখা দিয়ে পর্যন্ত যাও নি। পাছে কখনও দেখা হয়ে যায়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি এ মহকুমা থেকে চ'লে গিয়েছিলে। আমার ওপরে তোমার রাগ ও বিরাগ যে বিন্দুমাত্র কমে নি, তা বুঝতে পেরেছিলাম। তবে তুমি মিথ্যে ভয় পেয়েছিলে, বাবা! তুমি আবার এখানে এলেও আমি নিজে থেকে কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা করতাম না। যেখানে স্নেহ নাই, সেখানে স্নেহের দাবি জানাতে যাওয়ার মত অপমান আর নেই, এ শিক্ষাটুকু আমি ওঁর কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

এ গাঁয়ের সাহাবাবুরা খুব বড়লোক। শহরে মস্তবড় পাটের আড়ত। ছেলে বললে, আড়তে চাকরি করবে সে, পড়াশুনা ছেড়ে দেবে। আমি রাজি হলাম না। সাহা-গিন্নীকে গিয়ে ধরলাম। ওঁদের মস্তবড় সংসার, রান্না-বান্নার জন্যে রাঁধুনী একজন বরাবর থাকে। এই কাজটি চাইলাম। সাহা-গিন্নী আমাকে শ্রদ্ধা করতেন; খোকাকেও ভালবাসতেন। অনেক খুঁতখুঁত ক'রে তিনি রাজি হলেন।

খোকা কলেজে পড়তে গেল। মাইনেটা আমি দিতাম। কিন্তু খাওয়া-থাকার খরচের জন্যে দু-দুটো টিউশানি করতে হ'ত। এত পরিশ্রম, কিন্তু খেতে পেত না ভাল। শরীর ভেঙে গেল তার। ছুটিতে যখন বাড়ি এল, দেখি, আধখানা হয়ে গেছে। ভয়ে শুকিয়ে গেলাম। গ্রামের কবিরাজকে বলতেই বিনা-পয়সায় ওষুধ দিলেন। সাহা-গিন্নী ভাল খাবারের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। সত্যি, বাবা, এই সব আত্মীয়দের কাছ থেকে এত উপকার পেয়েছি যে, জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। যদি কোনদিন সুদিন আসত, শোধ করবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু কিছুই হ'ল না। ঋণ মাথায় ক'রেই চললাম।

দু বছর পরে খোকাকে হারালাম। একদিন খবর পেলাম, খুব অসুখ। কান্নাকাটি করতে লাগলাম। সাহাবাবুরা লোক দিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। গিয়ে যখন পৌঁছুলাম, তখন সব প্রায় শেষ। আছড়ে প'ড়ে বুক ফাটা চীৎকার ক'রে ডাকলাম খোকাকে; ডাক কানে তার পৌঁছুল না। আমার চোখের সামনে খোকা আমার চিরদিনের মত ঘুমিয়ে গেল।

কলেজের ছেলেগুলি কত সান্ত্বনা দিলে, কত সাহায্য করলে। তখন একটা কথা আমার মনে হয়েছিল, তারা যদি আমার সত্যকার পরিচয় জানত, তা হ'লে কি এমনই শ্রদ্ধা করত? এমনই সহানুভূতি জানাত? কে জানে!

গাঁয়ে ফিরে এলাম। সাহা-গিন্নী দিন কয়েক কাজ করতে দিলেন না। একলা ঘরে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদতাম। পাড়ার বউ-ঝিরা কখনও কখনও আসত, সান্ত্বনা দিত। স্কুলের ছেলেরা খোঁজখবর করত মাঝে মাঝে। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই একলা থাকতাম। স্বামী-পুত্র হারিয়ে বেঁচে থাকা অনর্থক মনে হ'ত। রাত্রে সাহাবাবুদের একটা ঝি আমার কাছে শুত। সে ঘরের মধ্যে অঘোরে ঘুমোত সারারাত। আমি বাইরে দাওয়ায় অন্ধকারে একলা ব'সে দু চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতাম, যদি খোকা একবার দেখা দিয়ে যায় এই আশায়। স্বামীর মৃত্যুর পর অন্ধকারে একলা থাকতে ভয় করত। এখন অন্ধকারে একলা থাকতেই চাইতাম। কেউ কাছে থাকলে বরং বিরক্ত হতাম। ভয় হ'ত, পাছে খোকা দেখা দিতে এসে কাউকে কাছে দেখে ফিরে চ'লে যায়। মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করবার লোভ হ'ত। লোভ সামলে নিতাম। ভাবতাম, গত জন্মে কত পাপ করেছি, তার এই শাস্তি; এ জন্মে আবার পাপ ক'রে পরজন্মের পথে কাঁটা দেব না। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতাম, মৃত্যু দাও, আমার মত অভাগীকে বাঁচিয়ে রেখে আর দুঃখ দিও না।

ব'সে ব'সে পরের ঘাড়ে কত দিন খাওয়া যায়? কাজে যোগ দিলাম। সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ করতে হ'ত। আমার শোকাচ্ছন্ন নির্জন ঘরটি আমাকে প্রতি মুহূর্তে টানত। মনে হ'ত, খোকা যেন আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। খোকা যখন ছিল, তখন খোকাকে বাড়িতে রেখে কোথাও গেলে যেমন সারাক্ষণ মনের মধ্যে যাই যাই ভাব হ'ত, এখনও তেমনই হ'ত। খোকার জন্যে শোক আর খোকা আমার মনের মধ্যে যেন এক হয়ে গিয়েছিল। এই শোকের মধ্যেই আমি খোকাকে কাছে পেতাম। ভয় হ'ত, পাছে শোকের আগুন আমার কোনদিন নিবে যায়, তা হ'লেই খোকাকে আমি সত্যি সত্যি হারিয়ে ফেলব। তাই সাগ্নিকের মত শোকাগ্নিকে আমি পালন করতাম। খোকার কাপড়-জামা, বই-খাতা, আর-আর জিনিস যা সে ব্যবহার করত, ঘরের এক জায়গায় সযত্নে সাজিয়ে রেখেছিলাম। প্রত্যেক দিন কাজ থেকে ফিরে

এসে সেগুলি দেখতাম, নাড়া-চাড়া করতাম, বুকে চেপে ধরতাম। আমার শোকের আগুন অনির্বাণ জ্বলতে থাকত।

ভগবান আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। পাঠিয়েছেন মৃত্যুর পরওয়ানা। দেহে ঢুকেছে অসাধ্য-রোগ—ক্ষয়রোগ। কবিরাজ বলেছে, আর বেশি দিন থাকতে হবে না পৃথিবীতে। সাহাবাবুদের বাড়ির চাকরি গেছে। ওঁদের দয়া-মায়ার সীমা নেই; এখনও ওষুধ-পথ্য যোগাচ্ছেন। এখন আর কেউ কাছে এসে বসে না; দূর থেকে খবর নিয়ে চ'লে যায়। আমি একলা ঘরে প'ড়ে প'ড়ে কবে আবার স্বামী-পুত্রের সঙ্গে মিলতে পারব, তারই জন্যে দিন গুনছি।

যতই যাবার দিন ঘনিয়ে আসছে, ততই একটা প্রশ্ন মনে জাগছে—কেন এত দুঃখ পেলাম জীবনে? সমাজ-বিধান লঙ্ঘন করার শাস্তি? সমাজ-বিধান মানুষের তৈরি। হাজার হাজার বছর আগে তখনকার দিনের মানুষের সুখসুবিধার জন্যে তখনকার দিনের চিন্তাশীল মানুষেরা এই বিধান রচনা করেছিলেন। আজ হাজার হাজার বছর পরে মানুষ কত বদলেছে; কত বদলেছে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান-বুদ্ধি, মনের গতি-প্রকৃতি, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ। আজ আর সেই প্রাচীন বিধান কখনও চলতে পারে না। আধুনিক কালের মানুষের জন্যে আধুনিক কালের চিন্তাশীল লোকদের নূতন ক'রে বিধান রচনা করতে হবে। কাজেই প্রাচীন সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করা পাপ নয়, অপরাধও নয়। তা ছাড়া, আজকালকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় কেউই চুল-চেরা বিচার ক'রে সমাজ-বিধি মেনে চলেও না। কে শাস্তি পাচ্ছে আমার মত? তবে কি বিধাতার বিধান লঙ্ঘন করায় আমার শাস্তি? বিধাতা আমার কপালে লিখেছিলেন আমরণ দুঃখ। ভাল ক'রে জ্ঞান হতে না হতেই মাকে কেড়ে নিলেন; বিয়ের এক বছর যেতে না যেতে মুছে দিলেন সিঁথির সিঁদুর। সেই বিধানকে লঙ্ঘন ক'রে আমি সুখী হতে চেয়েছিলাম। তাই কি আমার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে দুঃখের বোঝা মাথায় চাপিয়ে দিলেন? কিন্তু একবার দুঃখ পেয়েই তাকেই চরম ও চিরন্তন পরিণাম ব'লে মেনে নেওয়াই কি মানুষের ধর্ম? কেই বা নেয়? সবাই দুঃখকে কাটিয়ে সুখী হবার চেষ্টা করে। আমিও তো সুখী হয়েছিলাম, বাবা! যদি সেই দুঃখকে মেনে নিতাম, তা হ'লে জীবনের কয়েকটা বছর যে স্বর্গসুখের আস্বাদ পেয়েছি, তা কি পেতাম?

তাই মনে হয়, তোমাদের দুঃখ দিয়েছি ব'লে আমার এই দুঃখ। দাদুর কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিলাম। চিঠি ফিরে এসেছে, মালিকের সন্ধান মেলে নি। খুব সম্ভব দাদু চ'লে গেছেন। তাঁর কাছে এ জগতে আর ক্ষমা চাওয়া হ'ল না। পরপারে গিয়ে যদি দেখা হয়, ক্ষমা চেয়ে নেব। কিন্তু যাবার আগে তোমার কাছে ক্ষমা পেতে চাই।

তোমার ক্ষমা-স্নিগ্ধ আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চাই। এই সাধ আমার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছে দিন দিন।

আর একটি সাধ—শেষের কয়েকটা দিন তোমার কাছে থাকবার, তোমার চোখের সামনে মরবার। মনে হচ্ছে, তুমি থাকতেও কেন এমন অনাথা ভিখারিণীর মত আমাকে চ'লে যেতে হবে? কেউ দেখবে না, শুনবে না, দুদণ্ডের জন্য পাশে দাঁড়াবে না, যেদিন চিরদিনের মত ফুরিয়ে যাব, একবিন্দু চোখের জল ফেলবে না। এই কটা দিনের জন্যে আমাকে আশ্রয় দিতে পার না, বাবা? তোমার বাড়ির একপাশে যেখানে চাকর-ঝিরা থাকে সেখানে? মেয়ে ব'লে বরং কাউকে পরিচয় দিও না। ব'লো, অনাথা মেয়ে রাস্তায় প'ড়ে ছিল, দয়া ক'রে মরবার জন্যে জায়গা দিয়েছ। মানুষের মত মানুষ যারা, তারা তো এমন দয়া করে। তা ছাড়া যা চেহারা আমার হয়েছে, এখন আর আমাকে কেউ চিনতে পারবে না; পরিচয় না দিলে হয়তো তুমিই পারবে না।

যদি আমাকে নিয়ে যেতে চাও, আমাকে চিঠি লিখে জানিও। এখান পর্যন্ত তোমাকে আসতে হবে না। এখান থেকে কেউ সঙ্গে গিয়ে ষ্টীমার-ঘাটে আমাকে পৌঁছে দেবে। সেখান থেকে তুমি আমাকে নিয়ে যেও। তবে একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা ক'রো, বাবা, না হ'লে হয়তো আর দেখা হবে না।

আমার প্রণাম নাও। মাকে প্রণাম দিও। আর ছোট ভাই-বোনদের আশীর্বাদ।

প্রণতা
হতভাগিনী কন্যা
সুমিত্রা

২

রায় বাহাদুর চিঠিখানি আদ্যোপান্ত বার দুই পড়িলেন। তারপর চিঠিখানি কোলের উপরে রাখিয়া, ঈজি-চেয়ারে অর্ধশয়ান হইয়া জীবনের অতীত অধ্যায়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রথমা স্ত্রী বিন্দুবাসিনীর কথা প্রথমে মনে পড়িল। শ্যামবর্ণা, ক্ষীণাঙ্গী, লাবণ্যময়ী, ঢলঢলে কচি মুখ। সরু সরু ঠোঁটে অবিরত হাসি লাগিয়াই থাকিত। যৌবনেও বালিকার মত চঞ্চল। ভড়বড় করিয়া কথা বলিত, থরথর করিয়া চলাফেরা করিত, একটু কৌতুকের আভাসে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিত। বাপের একমাত্র মেয়ে, অতি শৈশবে মা-হারা, অত্যন্ত আদুরে, আবদারে। কথায় একটু আঁচ সহ্য করিতে পারিত না; সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসি মিলাইয়া অভিমানের মেঘ নামিত। বাবার কাছেই থাকিত বেশি। ছয় বৎসরের বিবাহিত জীবনে তাঁহার কাছে দুই বৎসরের বেশি ছিল না। শ্বশুর মশায় মেয়েকে কাছছাড়া করিতে চাহিতেন না। বিন্দু কুণ্ঠিত

হইত ; মিনতি করিয়া বলিত, কি করবে বল ! বাবা আমাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না ; ভাইবোন তো আর কেউ নেই ! কদিনই বা আর বাঁচবেন ! যতদিন থাকেন ওঁর কাছেই থাকতে দাও। মাথার দিব্য দিয়া কহিত, তুমি কিন্তু ভুলে থেকো না ; মাসে অন্তত একবার দেখা দিও। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হইতে হইত তাঁহাকে। ছাত্রজীবনে অসুবিধা হইত না। মাসে একবার নয়, সপ্তাহে একবার দেখা দিয়া আসিতেন। চাকুরি-জীবনে সে সুবিধা ঘটিত না। তবে সুযোগ পাইলেই পত্নী-সন্দর্শন করিতেন। সেবার খুকীর প্রসবের পূর্বে বাপের বাড়ি যাইবার আগে বিন্দুর কি কান্না ! শ্বশুর লোক পাঠাইয়াছিলেন লইয়া যাইবার জন্য। বিন্দু কিছুতেই যাইতে রাজি হইল না ; কহিল, না, এখন যাব না ; আর দেখা হবে না তা হ'লে ; যা হয় তোমার কাছেই হোক ; যাইবার সময়ে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল বিন্দু। অন্যবারেও যাইবার আগে কাঁদিত বিন্দু, কিন্তু সে যেন জোর করিয়া চোখে জল টানিয়া আনা। এবারের কান্না অকৃত্রিম। প্রথম মা হওয়া মেয়েদের জীবন-মরণ সমস্যা। অনেক সান্ত্বনা, সাহস, নিয়মিত দেখা দেওয়ার এবং ছুটি লইয়া ঠিক সময়ে কাছে থাকিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে চুপ করাইতে হইয়াছিল। ছুটি পাইয়াছিলেন খুকী জন্মাইবার দুই মাস পরে। রাত্রি দশটার সময়ে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছিলেন। শ্বশুর মশায় কি বিপদ গিয়াছে, কি ভাবে বিপদ কাটাইয়া উঠিয়াছেন চিঠিতে জানানো সত্ত্বেও মৌখিক পুনরাবৃত্তি করিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরেও শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে গল্প শেষ করিয়া যখন ছুটি পাইলেন, তখন রাত্রি বারোটা। শয়নকক্ষে ঢুকিয়া দেখিলেন, বিন্দু ঘুমাইতেছে ; বিন্দুর কোলের কাছে ঘুমাইতেছে খুকী, ঠিক যেন মোমের পুতুল। ধবধবে ফরসা রঙ ; বিন্দুর মতই লম্বা ধরনের মুখ, মাথায় একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল। বিন্দুর গায়ে হাত দিলেন, কোন সাড়া নাই ; একেবারে অঘোরে ঘুমাইতেছে। বাহুমূলে নাড়া দিয়া চাপাস্বরে ডাকিলেন, এই ! শুনছ ! বিন্দু তাঁহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া বালিশে মুখ গুঁজিল। বুঝিলেন, অভিমান হইয়াছে। সে রাত্রে অনেক কষ্টে অভিমান ভাঙিতে হইয়াছিল। বিন্দু বলিয়াছিল, হ্যাঁ গো ! ছেলে হ'ল না ব'লে দুঃখু পাও নি তো ? হাসিয়া কহিয়াছিলেন, পাগল ! মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া আবদারের সুরে বলিয়াছিল বিন্দু, সবাই বলছে প্রথমে মেয়ে হ'লে বাপের ভাগ্যি খুব ভাল হয় ; খুকীর পরে তোমার খু—উ—ব উন্নতি হবে, দেখো।

তাঁহার কাছেই বিন্দুর মৃত্যু হইয়াছিল। বেশ ভাল ছিল। হঠাৎ জ্বরে পড়িল ; ডাক্তার বলিল, ম্যালিগ্ন্যান্ট ম্যালেরিয়া। তখন ইন্‌জেক্‌শনের তেমন চলন হয় নাই। ন দিনের জ্বরে বিন্দু মারা গেল। মরিবার আগে জ্ঞান ছিল না বিন্দুর। কোন কথা বলিয়াই সে চলিয়া গেল। শ্বশুর মশায়কে খবর দেওয়া হইয়াছিল। বিন্দুর মৃত্যুর

পরদিন আসিয়া পৌঁছিলেন। আসিয়াই সোৎকণ্ঠ প্রশ্ন, কোথায় সে? চল, একবার দেখি গে। সংবাদ শুনিবামাত্র আছাড় খাইয়া পড়িলেন। মেঝেতে লুটাইতে লুটাইতে সে কি বুকফাটা কান্না! তাহার পরের দিনই চলিয়া আসিলেন। কহিলেন, বিন্দু নেই, থাকতে পারছি নে এখানে। কিছু মনে ক'রো না বাবা! তবে একটি প্রার্থনা আছে আমার; ওর মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। যেমন ক'রে তাকে মানুষ করেছিলাম, তেমনই ক'রে ওকেও মানুষ করব। না হ'লে কি নিয়ে থাকব বল! তোমাকে আবার যে-খা করতেই হবে; মেয়েটার অযত্ন হবে।

তাহার পর হইতে দাদুর কাছেই মানুষ হইতে লাগিল খুকী। এক বৎসর পরে তিনি আবার বিবাহ করিলেন। সংস্কৃত কলেজের এক অধ্যাপকের মেয়ে মালবিকাকে। নিষ্ঠাবান পিতার নিষ্ঠাবতী কন্যা; অত্যন্ত আচারপরায়ণা। স্নান-আহ্নিক, জপ-তপ, বার-ব্রত, আচার-বিচার ইত্যাদিতে পিতার কাছে হাতে-কলমে সুশিক্ষিতা। তিনি নিজে কিছুই মানিতেন না। কিন্তু মালবিকা আসার পর হইতে বাহিরে না হউক, ভিতরে তাঁহাকে সবকিছু মানিয়া চলিতে হইত। খুকী মাঝে মাঝে আসিত। মালবিকা খুব আদর করিত তাহাকে। কিন্তু সে আদরের সঙ্গে যে তাহার অন্তরের যোগ থাকিত না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন।

খুকীর বিবাহের সময়ে সপরিবারে গিয়াছিলেন। যে ছেলেটির সঙ্গে বিবাহ হইল, দেখিতে শুনিতে ভাল; অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে; এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। খুকী দেখিতে ঠিক বিন্দুর মতই হইয়া উঠিয়াছিল, তবে বর্ণ শ্যাম নয়, শাঁখের মত ধবধবে ফরসা। তিনিই খুকীকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। বিবাহ-মণ্ডপের দৃশ্যটি চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। তাঁহার পাশে খুকী ব্রীড়ানত মুখে বসিয়া; পরনে আগুনের মত রঙের বেনারসী শাড়ি; সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার। সামনে বসিয়া সেই ছেলেটি, উজ্জ্বল শ্যাম গায়ের রঙ, দৃঢ়-পেশীবহুল দেহ, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল ছেলেমানুষের মত মুখ, মুখে লজ্জা ও কৌতুকের আভাস। ছেলেটির দক্ষিণ করতলে মেয়ের বাম করতল চাপিয়া ধরিয়া তিনি সম্প্রদানের মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। শ্বশুর মশায় কাছে বসিয়া ছিলেন, হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, পর হয়ে গেলি, দিদি!

বৎসর খানেক পরে খুকী বিধবা হইল। জামাইয়ের পরীক্ষার বৎসর। সারা-বৎসরের মধ্যে একবারও আসিতে পারে নাই। শুধু বিবাহের পরে কয়েকদিনের জন্য স্বামী-সঙ্গ পাইয়াছিল খুকী। স্বামীর সঙ্গে ভাল করিয়া পরিচয়ও হয় নাই। তাহার পূর্বেই স্বামীকে হারাইল। খবর পাইয়া তিনি গিয়াছিলেন। খুকীর বিধবার বেশ দেখিয়া তাঁহার বড় কষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া খুকী ফুলিয়া ফুলিয়া

কাঁদিয়াছিল। শ্বশুর মশায় বলিয়াছিলেন, সংসারের সাধ আমার মিটেছে, বাবা! নিয়ে যাও ওকে, ওর সন্ন্যাসিনীর বেশ চোখে দেখতে পারছি না আমি।

খুকী তাহার দাদুর কাছেই রহিয়া গেল। কিছুদিন পরে খুকীকে দেখিতে গিয়াছিলেন তিনি। খুকী অনেকটা সামলাইয়া উঠিয়াছিল। শ্বশুর মশায় খুকীকে পুরাপুরি বিধবার বেশ পরিতে দেন নাই। দেখিলেন, খুকীর পরনে চুলপাড় ধুতি, গলায় একটি সরু হার, হাতে চারগাছি করিয়া সোনার চুড়ি; মুখখানিতে শান্ত বিষণ্ণতা। বিধবার কঠোর আচারও পালন করিতে হয় না তাহাকে। দেখিয়া সুখীই হইয়াছিলেন তিনি। একদিন তো সবই করিতে হইবে; এত তাড়াতাড়ি কেন? তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন শ্বশুর মশায়। গৃহ-শিক্ষকটিকে দেখিয়াছিলেন তিনি। কায়স্থের ছেলে; বয়স খুব বেশি নয়; দেখিতে শুনিতেও মন্দ নয়। শ্বশুর মশায়ের কাছে এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিতেই তিনি বলিয়াছিলেন, ভারি ভাল ছেলে; অত্যন্ত সচ্চরিত্র; শহরে ওর জোড়া নেই; গরিবের ওপর ভারি দয়ামায়া; শহরের ছেলেদের নিয়ে সেবক-সমিতি করেছে; তা ছাড়া পিকেটিং ক'রে বার-দুই জেল খেটে এসেছে; ওর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ক'রো না বাবা। তিনি আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলেন।

বৎসর দুই পরে শ্বশুর মশায়ের কাছ হইতে এক টেলিগ্রাম পাইলেন, বড় বিপদ, সত্বর এস। সাহেবের কাছ হইতে ছুটি লইয়া তিনি গিয়াছিলেন। যাইয়া দেখিলেন, শ্বশুর মশায় শয্যাশায়ী। বহুদিন গুরুতর রোগে ভুগিয়াছেন এমনই মুখ-চোখের ভাব। পরম উদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কতদিন ধ'রে ভুগছেন? শ্বশুর মশায় ক্লান্ত করুণ কণ্ঠে কহিলেন, আমার কিছু নয়, খুকী নেই। চমকিয়া উঠিয়া আর্তকণ্ঠে তিনি কহিয়াছিলেন, খুকী মারা গেছে? কখন? কি হয়েছিল? আমাকে জানান নি কেন আগে? একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিলেন শ্বশুর মশায়; দুই চোখ হইতে জল গড়াইতেছিল; অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, মারা যায় নি, মারা গেলে তো ভাল ছিল।

ক্রমে ব্যাপারটা জানিতে পারিলেন। আট-দশ দিন আগে সেই গৃহ-শিক্ষকটির সঙ্গে কি একটা সভায় গিয়াছিল খুকী। আর ফিরে নাই। অনেক খোঁজ করা হইয়াছে, পুলিসে খবর দেওয়া হইয়াছে, চারিদিকে চিঠি ও তার পাঠানোও হইয়াছে, কিন্তু কোনও খবর পাওয়া যায় নাই। দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তাহারা, শুনিয়া দুঃখের চেয়ে রাগ হইয়াছিল বেশি; কড়া গলায় বলিয়াছিলেন, আমি জানতাম এ হবে; যেভাবে রাশ আলগা করেছিলেন, এ তার অনিবার্য ফল। আমি আপনাকে আগেই সাবধান করেছিলাম; আপনি শোনেন নি। মুনি-ঋষিরা মূর্খ ছিলেন না; হিন্দু বিধবার জন্যে

যে কঠোর আচারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা অনেক ভেবে-চিন্তেই করেছিলেন। শ্বশুর মশায় কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, যত ইচ্ছে তিরস্কার কর, আমার কিছু বলবার মুখ নেই ; তোমার মাথা হেঁট করেছি আমি। তিনি বলিয়াছিলেন, শুধু আমার নয়, আপনার নিজেরও। এ শহরে মুখ দেখাবেন কি ক'রে ? শ্বশুর মশায় বলিয়াছিলেন, মুখ আর দেখাব না, বাবা! সব বেচে-টেচে দিয়ে কাশীবাস করব ভাবছি। আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই। যাকে ধরতে যাচ্ছি, সেই ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছে। তিনি বলিয়াছিলেন, আর খোঁজ করবার দরকার নেই। ফিরে এলে ঘরে ঢোকাবেন কি ক'রে ? মনে করুন, মারা গেছে সে। শ্বশুর মশায় বলিয়াছিলেন, যদি চোখের সামনে মরত তো নিশ্চিন্ত হতাম। কোন্ ভাগাড়ে মরবে কে জানে ? যে আমাকে ঠকিয়েছে, সে যে তাকেই ঠকাবে না কে বললে ? কাউকে আর পৃথিবীতে বিশ্বাস নেই। মানুষ অমানুষ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। পশুত্বের স্তরে নেমে যাচ্ছে। পশুদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে ; শৃগাল সিংহিনীর সঙ্গে মিলবার স্পর্ধা করে না। মানুষের মধ্যে তাও থাকবে না, সব একাকার হয়ে যাবে। এসব দেখতে পারব না চোখে। যত শীঘ্র স'রে যেতে পারি, ততই মঙ্গল।

তিনি কহিয়াছিলেন, শৃগালের স্পর্ধা তো আপনা হতেই হয় না। সিংহিনীকেও তার মর্যাদা রাখতে জানতে হবে। সেইজন্তে শক্ত হতে হবে আমাদের। খুকী যেখানে গেছে যাক, সুখ অদৃষ্টে থাকে সুখী হোক, কিন্তু কোনদিন যেন আর আমাদের চৌকাঠ পার না হতে পারে। আর খোঁজ করবেন না তার। নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবেন না। যদি ফিরে আসে, কুকুরের মত তাড়িয়ে দেবেন।

মুখে কঠিন কথা বলিয়াছিলেন তিনি। কিন্তু বুকের মধ্যে বসিয়া পিতৃস্নেহ শরবিদ্ধ পাখির মত ছটফট করিয়াছিল। মুখে অন্ন রোচে নাই ; রাত্রে ঘুম আসে নাই। নিস্তব্ধ নির্জন ঘরে জানালার ধারে বসিয়া, বাহিরে অন্ধকারময়ী ধাত্রীর দিকে তাকাইয়া, কণ্টকময় জীবনপথের যাত্রী মেয়েটির অনিবার্য শোচনীয় পরিণামের কথা ভাবিয়া সারারাত চোখের জল ফেলিয়াছিলেন।

মালবিকাকে পরিচয় দিতেই সে দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া নমস্কার করিল। বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ও কি হ'ল ? গম্ভীর মুখে জবাব দিয়াছিল মালবিকা, প্রণাম করলুম বাবাকে ; ঋষিতুল্য মানুষ, যা বলেন বেদবাক্যি, মিথ্যে হয় না। তিনি বলিয়াছিলেন, তার মানে ?

মালবিকা কহিয়াছিল, আমি সব পরিচয় দিয়েছিলুম বাবাকে ; তিনি বলেছিলেন, এর ফল ভাল হবে না, ও মেয়েকে ঘরে রাখা দায় হবে। হিন্দুর বিধবাকে কত সাবধানে থাকতে হয়! কত আচার-বিচার উপোস-কাপাস ; খাওয়া-পরা শুধু বেঁচে থাকবার জন্তে যতটুকু দরকার ততটু ; একটুকু ইতরবিশেষ হ'লেই সর্বনাশ! আমার ছোট

বোন মাধুকে দেখ নি, বাইশ বছর মাত্র বয়স, কিন্তু এমন কড়াকড়ি আচারের মধ্যে আছে যে, কে বলবে ওর বয়স বেয়াল্লিশ নয়?

তারপর হইতে তাহার সংসারে খুকীর প্রসঙ্গ একেবারে উঠে নাই; উঠিবার উপক্রম হইলে মালবিকা নিষেধের তর্জনী তুলিয়া সতর্ক করিয়া দিত। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনরা জানিত, খুকী মারা গিয়াছে; ছেলেপিলেরা, দুই-একজন ছাড়া, খুকী বলিয়া তাঁহার কোন মেয়ে ছিল, তাহা জানিত পর্যন্ত না।

ক্রমে চাকুরি-জীবনে তাঁহার উন্নতি হইতে লাগিল। সম্মান, প্রতিপত্তি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ঐশ্বর্য্য-বিলাস জোয়ারের মত আসিয়া জীবনকে কূলে কূলে ভরিয়া দিল। কিন্তু খুকীকে তিনি ভুলিতে পারেন নাই। কর্ম-ব্যাপৃতির মধ্যেও তাহার কথা নিরন্তর মনে জাগিত। বাঁচিয়া আছে কি না কে জানে? যদি বাঁচিয়া থাকে, হয়তো পঙ্কিল কদর্য্য জীবন যাপন করিতেছে; হয়তো পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে, কিংবা কুৎসিত রোগে ভুগিতে ভুগিতে কোথাও মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। যখনই কোন ভিখারিণী দেখিতেন, একটু ভদ্রগোছের চেহারা, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন, খুকী নয় তো? কোন শহরে গেলেই হাসপাতাল দেখিতে যাইতেন, বিশেষ করিয়া মেয়েদের ঘরগুলি, কোথাও যদি খুকীকে দেখিতে পান এই আশায়। জীবনের সুখ ও আনন্দকে খুকী বিস্বাদ করিয়া দিত।

দশ বৎসর পরে। তিনি তখন পূর্ববঙ্গের একটা জেলার সদর-মহকুমা-হাকিম। একটি গ্রামের মধ্য-ইংরেজী স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী-সভায় সভাপতিত্বের জন্য আমন্ত্রণ আসিল। সেক্রেটারি নিজে আসিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি গিয়াছিলেন। গিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, সেই লোকটি—যাহার প্ররোচনায় খুকী গৃহত্যাগ করিয়াছে। লম্বা-চওড়া চেহারা; বেশ-ভূষা অতি সাধারণ, কিন্তু পরিচ্ছন্ন, খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা সবই ধবধবে সাদা। হাবে-ভাবে, কথা-বার্তায় চাল-চলনে এমনি একটি শান্ত-গাম্ভীর্য, অনমনীয় মহনীয়তা, অথচ মৃদু নম্রতা যে, সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। সামান্য লোকগুলার মধ্যে থাকিয়াও সে অসামান্য এবং সর্বসাধারণের সম্মানের পাত্র বুঝিতে দেরি হয় না। যতটুকু আবশ্যক তাহার বেশি আলাপ তাহার সঙ্গে তিনি করেন নাই। কিন্তু একটা কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, তিনি তো আর একটি কন্যার বিবাহ দেখিয়া-শুনিয়া দিয়াছেন, জামাইটি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, নৈকষ্য কুলীন, শিক্ষিত ও সরকারী পদস্থ কর্মচারী। কিন্তু ইহার সঙ্গে তাহার তো তুলনা হয় না! লোকটিও খুব সম্ভব চিনিয়াছিল; কিন্তু তাঁহাকে এড়াইয়া যাইবারও চেষ্টা করে নাই, ঘনিষ্ঠতা করিবারও চেষ্টা করে নাই, যতটুকু সম্মান তাঁহার প্রাপ্য, পুরাপুরি দিয়াছিল। তাহার আচরণে সঙ্কোচ ও জড়তার লেশমাত্র ছিল না। সভায়

একটি আট-নয় বৎসরের সুশ্রী ছেলে তাঁহার গলায় মালা পরাইয়াছিল। এবং একটি ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিল; ছেলেটির সপ্রতিভ ভঙ্গী, কোমল মধুর কণ্ঠস্বর, বিশুদ্ধ স্পষ্ট উচ্চারণ তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সেক্রেটারি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, ছেলেটি হেডমাষ্টার মহাশয়ের। ছেলেটির অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন সেক্রেটারি মশায়। তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, ছেলেটিকে ডাকিয়া তিনি আদর করেন, কিছু পুরস্কার দেন। সে ইচ্ছা তিনি দমন করিয়াছিলেন। ইচ্ছা হইয়াছিল, হেডমাষ্টারকে ডাকিয়া একবার জিজ্ঞাসা করেন, কেমন আছে তাহারা, কেমন আছে খুকী। সে ইচ্ছাও দমন করিয়াছিলেন। আসিবার সময়ে সাধারণ মৌখিক ভদ্রতা করিয়া বিদায় লইয়াছিলেন তিনি। আসিয়া কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই, মালবিকাকেও না। তবে মনে মনে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, স্বামী পুত্র লইয়া সুখে আছে খুকী। নাই বা থাকিল ধন-ঐশ্বর্য! আছে স্বাস্থ্যবান, বিদ্বান, মানুষের মত মানুষ স্বামী, সুন্দর সন্তান; এর বেশি মেয়েমানুষ কি চায়? তারপর আর একবার দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল তাহাদের; কিন্তু সুযোগ পান নাই; তারপরই সেখান হইতে বদলি হইয়া গিয়াছিলেন।

আরও দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সরকারী কাজে সারা বাংলা দেশ তিনি ঘুরিয়াছেন। বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন ধরনের বহু লোকের সঙ্গে তিনি মিশিয়াছেন। সমাজে যে দ্রুত পরিবর্তন শুরু হইয়াছে চোখ মেলিয়া দেখিয়াছেন, এবং ইহার কার্য-কারণ-যোগসূত্র সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন। মাঝে মাঝে তাঁহার মনে হইয়াছে, খুকীকে এমন করিয়া দূরে সরাইয়া রাখার কি কোনও যুক্তি আছে? প্রাচীন সমাজবিন্যাস যখন ক্রমে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথে আবহমানকাল ধরিয়া যে বাধার প্রাচীরগুলি ছিল, তাহা একে একে ভাঙিয়া পড়িয়া প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন পথ প্রস্তুত হইতেছে, প্রাচীন প্রথা ও লোকাচারকে অবহেলা করিয়া মানুষ অবাধে, যাহার যে পথে ইচ্ছা, চলিতেছে, তখন তিনি কন্যাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া কেন মিথ্যা দুঃখ ভোগ করিতেছেন, দুঃখ দিতেছেন?

একজন মহিলা বারান্দায় আসিলেন। বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ; ধবধবে ফরসা রঙ, মেদ-বহুল দেহ, চিবুকের নীচে থাক পড়িয়াছে, ভারী ভারী মুখ, চোখে সোনার ফ্রেমওয়ালা চশমা; সীমন্তে ডগডগে লাল সিন্দুর-লেখা; পরনে টকটকে লালপাড় গরদের শাড়ি; হাতে ঝকঝকে সোনার চুড়ি ও শাঁখা, গলায় বিছাহার। ইনি মালবিকা, রায় বাহাদুরের দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী।

গৃহিণী পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, হাতে একখানা চিঠি। কটাক্ষে স্বামীর কোলে ন্যস্ত চিঠিটার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, হ্যাঁগা, এ চিঠিখানা পড়েছ ?

রায় বাহাদুরের চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া গেল। একটু মৃদু চমক লাগিল দেহে। কোলের চিঠিটা মুড়িয়া সরাইয়া রাখিয়া কহিলেন হ্যাঁ, পড়েছি। গৃহিণী কহিলেন এত দিন পরে বলছে, গয়নার টাকা পাঠিয়ে দিতে হবে, ওরা নিজে গড়াবে। দেখ দেখি, কি ফ্যাসাদ !

রায় বাহাদুর কহিলেন, ফ্যাসাদ আর কি ! অজিতকে বল, টাকা পাঠিয়ে দিক। গৃহিনী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, পাঠিয়ে দিক ব'লে দিলেই হ'ল ! আমি স্যাকরাকে ডেকে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি, বায়না দেওয়াও হয়ে গেছে, সে হয়তো তৈরি করতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে—

তা কি করবে ? ওরা হচ্ছে বরপক্ষ, উঁচু পিঁড়ে ওদের, যা বলবে তাই করতে হবে আমাদের। গয়না যদি কিছু তৈরি হয়ে গিয়ে থাকে নিলেই হবে ; বাকিটা নিষেধ ক'রে দাও।

গয়না নিয়ে আমরা কি করব ? ওরা তো ফর্দে তা বাদ দেবে না।

রায় বাহাদুর মৃদু হাসিয়া কহিলেন, তা হ'লই বা, আর এক পদ না হয় বেশিই দেবে মেয়েকে। তাতে ওরা গররাজি হবে ব'লে মনে হয় না। গৃহিণী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, আমারও মনে হয় না, মুখ্যু মেয়েমানুষ হ'লেও। বেশি পেলে কেই বা গররাজি হয় ! কিন্তু কেন বেশি দোব ? ওরা তো দুয়ে নিতে কসুর করছে না !

রায় বাহাদুর মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন, তবে বউমাকে দেবে। মোট কথা, ওরা যখন বলেছে, তখন টাকা পাঠিয়ে দিতে আপত্তি করলে চলবে না। আর দিনও তো স্থির ক'রে দিয়েছে, আসছে মাসের দোসরা। এক মাস সময়ও নেই। অজিতকে বল তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করতে। গৃহিণী কহিলেন, অজিতের ওপরে সব ভার দিলে চলবে কেন ? তুমি কি করবে ? বানপ্রস্থ নেবে নাকি ?

রায় বাহাদুর জবাব দিলেন না।

গৃহিণী কহিলেন, ও চিঠিখানা কার দেখলুম ?

রায় বাহাদুর কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, কোন চিঠি ?

ওই যে তাড়াতাড়ি সরিয়ে রাখলে।—বলিয়া একটুকরা ধারালো হাসি হাসিলেন গৃহিণী। এতক্ষণে রায় বাহাদুরের যেন মনে পড়িল, কহিলেন, আমার এক বন্ধুর চিঠি। গৃহিণী শ্লেষের সহিত কহিলেন, মেয়েমানুষের হাতের লেখা দেখলুম যেন ! তোমার কোন মেয়েমানুষ বন্ধু আছে জানতুম না।

রায় বাহাদুরের মুখে বিরক্তির ছায়া পড়িল ; কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু

চাপিয়া দিয়া কহিলেন, বন্ধুর নয়, বন্ধুর মেয়ের চিঠি। পরক্ষণেই পরম গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া ভারী গলায় কহিলেন, পরে বলব এখন।

এই গাম্ভীর্যকে মালবিকা ভয় করেন। রায় বাহাদুর যখনই কোন আলোচনা অপছন্দ করেন, তখনই এই গাম্ভীর্যের কঠিন খোলের মধ্যে আত্মগোপন করেন। শত চেষ্টাতেও মালবিকা তাঁহার নাগাল পান না।

মুখ গম্ভীর করিয়া মালবিকা অন্দরে চলিয়া গেলেন।

দুপুরে আহারের সময় রায় বাহাদুরের অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়া মালবিকা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, কি ভাবছ এত? সেই চিঠির কথা বুঝি? কার চিঠি বললে না তো?

রায় বাহাদুর অন্যমনস্কতার অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এক মুহূর্তে; খাদ্যবস্তুর সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়া সোৎসাহে খাইতে শুরু করিয়াই থামিয়া কহিলেন, হ্যাঁ—চিঠিটার কথা—জরুরী চিঠি। গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, কার চিঠি?

বলব, খাওয়া-দাওয়ার পরে আমার ঘরে এস।

কার চিঠি এখন বলতে দোষ আছে কি?

রায় বাহাদুর গম্ভীর হইয়া উঠিয়া মৃদু বিরক্তির স্বরে কহিলেন, বলছি যে, একটু পরে বলব।

সংসারের সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকিলে মালবিকা রায় বাহাদুরের ঘরে গেলেন। তেতলায় একটি মাত্র ঘর, এই ঘরে রায় বাহাদুর শয়ন করেন। মালবিকা শয়ন করেন দোতলায় একটা ঘরে, পৌত্র-পৌত্রীপরিবৃতা হইয়া। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও রায় বাহাদুর সংসার হইতে নির্লিপ্ত থাকেন। সংসারচালনার সম্যক দায়িত্ব মালবিকার হাতে। প্রতি মাসে পেন্‌শন পাইলেই ছোট ছেলেকে যাহা পাঠাইতে হইবে পাঠাইয়া দিয়া বাকি টাকা রায় বাহাদুর গৃহিণীর হাতে দেন। অজিতও তাহার সমস্ত উপার্জন তাহার মায়ের হাতে তুলিয়া দেয়। মালবিকা সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রয়োজনের প্রতি সমদৃষ্টি রাখিয়া খরচ করেন। সাংসারিক ব্যাপারে প্রয়োজন হইলে তিনি পুত্র ও পুত্র-বধূর পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করেন। রায় বাহাদুর কখনও কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না; অবশ্য কোন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ চাওয়া হইলে, তিনি দেন। তবে তাঁহার পরামর্শ অনুসারে কাজ হইল কি না হইল, তাহা জানিবার জন্য বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন না।

রায় বাহাদুর বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন। মালবিকার পদশব্দে চোখ মেলিয়া কহিলেন, কে? ওঃ, তুমি! এস, ব'স।—বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। মালবিকা তাঁহার কাছ হইতে একটু দূরে বসিলেন। বালিশের নীচ হইতে চিঠিটি বাহির করিয়া

রায় বাহাদুর চিঠিটি মালবিকার হাতে দিলেন। মালবিকা চিঠি খুলিয়া পড়িতে শুরু করিলেন। রায় বাহাদুর তাঁহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

মালবিকা চিঠি পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে প্রথমে ফুটিল বিস্ময়, তারপর ব্যঙ্গের বাঁকা হাসি, তারপর বিরক্তির ভ্রূকুটি। চিঠিটি পড়িয়া রায় বাহাদুরের সামনে ফেলিয়া দিয়া মুখ আঁধার করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রায় বাহাদুর কহিলেন, কিছু বললে না? মালবিকা ভারী গলায় কহিলেন, আমাদের একটা চাকর চুরি ক'রে পালিয়ে গিয়ে গাড়ি চাপা পড়েছিল; অজ্ঞান অবস্থাতেই তাকে রাস্তার লোকে হাসপাতালে নিয়ে যায়, জ্ঞান হবার পরে হাসপাতালের লোকেরা তাকে আত্মীয়স্বজনের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে, সে বাবার ঠিকানা দিয়েছিল। তাকে দেখতে যাবার জন্তে হাসপাতাল থেকে বাবাকে খবর পাঠিয়েছিল—

রায় বাহাদুর কহিলেন, তোমার বাবা কি করেছিলেন?

যান নি। চুরি ক'রে পালাবার পরও যেমন খোঁজখবর করেন নি, যা যাবার গেছে ব'লে চুপ ক'রে ছিলেন, এখনও তেমনই মহত্ত্ব দেখাবার লোভে ছুটে যান নি। ভগবান যখন অপরাধীর শাস্তির ভার নিজের হাতে নেন, তখন সেখানে হাত লাগাতে যাবার চেষ্টা করা মানুষের বোকামি—এই ছিল তাঁর মত।

রায় বাহাদুর মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, তা হ'লে কি করতে বল আমাকে?

মালবিকা কহিলেন, তুমি চিঠির কোন জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাক। আর যদি কিছু করতেই চাও তো, লিখে দাও, যে মেয়ে সংসার থেকে, সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে বেশ্যাবৃত্তি—

রায় বাহাদুর বাধা দিয়া কিঞ্চিৎ কড়া গলায় কহিলেন, বেশ্যাবৃত্তি করে নি; বিধিসঙ্গত-ভাবে বিয়ে হয়েছিল ওদের—

এক ফোঁটা তীক্ষ্ণ কুটিল হাসি মালবিকার অধরোষ্ঠে কুঞ্চনাভাস জাগাইয়াই মিলাইয়া গেল। বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন, বিয়ে! একে তুমি বিয়ে বল নাকি? এই রকম বিয়েই তুমি দিয়েছ এক মেয়ের, আর দিতে যাচ্ছ আর এক মেয়ের? গম্ভীর হইয়া উঠিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিলেন, তা কি করতে চাও শুনি?

ওকে নিয়ে আসতে চাই।

নিয়ে এসে কোথায় রাখবে? এই বাড়িতে?—বলিয়া মালবিকা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রায় বাহাদুরের মুখের উপর কেন্দ্রিত করিলেন।

রায় বাহাদুর একটু ইতস্তত করিয়া কহিলেন, দোষ কি? নীচের তলায় একটা ঘরে—

মালবিকা বাধা দিয়া তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, কি বলছ? দোষ নেই? এই বয়সেই

ভীমরতি ধ'রে গেল নাকি তোমার? আঁস্তাকুড় থেকে ওই এঁটো মেয়েকে বাড়িতে এনে তুলবে? দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু-পুরোহিত নিয়ে হিন্দুর সংসার; বারো মাসে তেরো পার্বণ; কেউ আসবে তোমার বাড়িতে? শহরে তোমার এত সম্মান, কি মনে করবে সবাই? সম্ভ্রান্ত ঘরে কুটুম্ব-কুটুম্বিতে করেছ, শুনলে তারা কি বলবে? তা ছাড়া হাতে হাতে ছোট খুকীর বিয়ে; নানা জায়গা থেকে আত্মীয়-কুটুম্ব এসে জড় হবে। এ মেয়ে ঘরে আছে জানলে কেউ যে তোমার বাড়িতে জলগ্রহণ পর্যন্ত করবে না! তা ছাড়া এ কথা জানাজানি হয়ে গেলে খুকীর বিয়েই বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু এখনকার মত নয়, চিরজন্মের মত। যে বাড়িতে বেশ্যা বাস করে, সে বাড়ির মেয়ে নেবে কেন লোকে? যে মেয়ে কারও মুখের দিকে তাকালে না, নিজের খেয়াল মেটাবার জন্যে যার-তার হাত ধ'রে বেরিয়ে যেতে পারলে, তারই জন্যে আর এক নির্দোষী মেয়ের জীবন পণ্ড ক'রে দেবে? পূর্ণিমার চাঁদে কলঙ্ক আছে, আমার বাপের বাড়ির বংশ অকলঙ্ক; সেই বংশের মেয়ে হয়ে এই অ-হিন্দুয়ানি আমি সহ্য করব না।

রায় বাহাদুর কহিলেন, হিন্দুয়ানির কথা আর না বলাই ভাল; ছেলেকে তো বিলেত পাঠিয়েছ।

মালবিকা ঢোক গিলিয়া কহিলেন, তা পাঠাতে হয়েছে। ছেলে ঝুঁকে পড়ল, না পাঠালে কি অনর্থ ক'রে বসে ভেবে পাঠিয়েছিলুম। আজকাল অনেক ছেলেই যাচ্ছে। ম্লেচ্ছের দেশে গিয়ে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে যা পাপ হবে, শাস্ত্রে তার শোধনের ব্যবস্থা আছে। দাদা বলেছেন, প্রায়শ্চিত্ত করলেই আর কোন দোষ থাকবে না।

রায় বাহাদুরের মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া আবার নিবিয়া গেল। ধীরে ধীরে কহিলেন, বাইশ বৎসরে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কোন্ হিন্দুশাস্ত্রের বিধান?

ঝঙ্কার দিয়া মালবিকা কহিলেন, সে কি আমার দোষ, না তোমার? বড় খুকীর বিয়ের সময়ে বাবা বেঁচে ছিলেন; চেষ্টা-চরিত্র ক'রে ভাল ছেলে যোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন। বারো বছরে পড়তে না পড়তেই ওর বিয়ে দিয়েছিলাম। ছোট খুকীর বিয়ের জন্যে তো কতদিন থেকে বলেছি তোমায়; তুমিই গা কর নি।

ইহা সত্য। একটি মেয়েকে তিনি তাঁহার আদর্শমত মানুষ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নিজে পড়াইয়া তাহাকে বি. এ. পাস করাইয়াছেন। সন্তানদের মধ্যে এই মেয়েটি তাঁহার সকলের চেয়ে প্রিয়।

রায় বাহাদুর কহিলেন, যদি সুজিত বিলেত থেকে মেমসাহেব বিয়ে ক'রে ফেরে?

মালবিকা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন; তারপর অভিমান-গাঢ় কণ্ঠে কহিলেন, বাপ হয়ে ছেলের এই অকল্যাণ কামনা করছ তুমি?

রায় বাহাদুর একটু অপ্রতিভ হইলেন; কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, অনেকে করেছে তো! নজির আছে।

মালবিকা দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, যদি সেই সর্বনাশ করে সে, তো তার মুখ দর্শন করব না আমি। আর একটা কথা জানিয়ে দিচ্ছি তোমাকে—যদি সেই মেয়েটাকে ঘরে ঢোকাও তো মেয়ে, বউ, নাতি-নাতনীকে নিয়ে আমি এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব; অজিত আমার মানুষ হয়েছে, আমাদের খেতে পরতে দেবার ভার সে নিতে পারবে।

হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, চিরদিন ওই ভাব তোমার; আমাকে আর আমার ছেলেমেয়েদের কোনদিন নিজের ব'লে ভাবতে পারলে না; চিরদিন মুখপুড়ীরা পথ আটকে দাঁড়িয়ে রইল।

রায় বাহাদুর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ইহা মালবিকার চিরন্তন অনুযোগ; এই অভিমানে বহুবার কাঁদিয়াছেন মালবিকা। পূর্বে মালবিকা যখন তন্বী, তরুণী ছিলেন, রায় বাহাদুর তাঁহাকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা দিতেন। এখন সে প্রক্রিয়া অচল। কয়েক বৎসরের মধ্যে মালবিকা এমনই ভরাট হইয়া উঠিয়াছেন যে, বাহুবন্ধনের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। তবে মৌখিক সান্ত্বনা দেওয়া চলে। রায় বাহাদুর প্রস্তুতও হইলেন। কিন্তু মালবিকা তাঁহাকে অবসর না দিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেলেন।

রাত্রে আহারাদির পর, শয়নকক্ষের সামনে খোলা ছাদে একটা ঈজিচেয়ারে রায় বাহাদুর বসিয়া ছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস; কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি; ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে; পরিষ্কার আকাশ তারায় সমাকীর্ণ। পূর্বাকাশে বৃশ্চিকরাশি সুদীর্ঘ বাঙ্কম পুচ্ছ লইয়া বিরাজ করিতেছে; ঠিক মাথার উপরে বৃহস্পতি স্থির প্রশান্ত উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; তাহার ঠিক পাশেই একটি নীলাভ তারা; উত্তর দিক ঘেঁসিয়া দীপ্ত-দেহ সপ্তর্ষি সপ্ত আসনে ধ্যানমগ্ন।

রায় বাহাদুরের অত্যন্ত চিন্তাকুল ভাব, সম্মুখে গুরুতর সমস্যা। এক দিকে সমাজ সংসার, আর এক দিকে গৃহত্যাগিনী সমাজ-পরিত্যক্তা রুগ্না মৃত্যুতীরবর্তিনী কন্যা! কি করিবেন তিনি? সংসার ও সমাজকে শিরোধার্য করিয়া কন্যার প্রতি বিমুখ হইবেন? সংসারের সহিত তিনি তো একরকম সম্পর্কহীন। বাঁচিয়া আছেন বলিয়া সংসারের একজন হইয়া আছেন। যদি হঠাৎ মরিয়া কিংবা সরিয়া যান, সংসারের একটা অনাবশ্যক অঙ্গ খসিয়া পড়িবে মাত্র; সংসারের তিলমাত্র ক্ষতি হইবে না। তাহাতে সংসারের প্রতি কর্তব্যও তাঁহার সমাপ্তপ্রায়। বড় ছেলেটি উপযুক্ত হইয়াছে। বড় মেয়েটিকে যোগ্যপাত্রে সমর্পণ করিয়াছেন, ছোট মেয়েটির বিবাহ আসন্নপ্রায়; সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী ঘরে বিবাহ হইতেছে। খরচপত্র যাহা হইবে তাহার ব্যবস্থা করিয়

দিয়াছেন। ছোট ছেলেটির বিদেশ হইতে ফিরিতে দেরি নাই। না ফিরা পর্যন্ত খরচ, আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে, তিনিই চালাইয়া দিবেন। তাঁহার অবর্তমানে স্ত্রীর যাহাতে কষ্ট বা অসুবিধা না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন তিনি। টাকাকড়ি, গহনাগাঁটি যথেষ্ট তাঁহার আছে। তাহা ছাড়া, তাঁহার মৃত্যুর পরে জীবন-বীমার টাকা তিনিই পাইবেন। কাজেই, পুত্র ও পুত্রবধূদের নির্জলা ভক্তি ও ভালবাসা আমরণ পাইতে পারিবেন। সমাজের সঙ্গেও সংযোগ রাখিয়া চলিবার আর তাঁহার প্রয়োজন নাই। জীবনে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম প্রায় শেষ করিয়াছেন। যাহা বাকি আছে, তাহা তাঁহাকে বাদ দিয়াও হইতে পারিবে। জীবনে একটি বিশেষ ব্যাপার অবশ্য বাকি আছে, তাঁহার মৃত্যু। এই ব্যাপারে সমাজ ও সংসার দুইয়েরই প্রয়োজন হয়। না হইলে অসুবিধা হয়। অবশ্য আজকাল পয়সা খরচ করিতে পারিলে, সংসার ও সমাজের বাহিরেও রাজার হালে মরা যাইতে পারে; এমন কি শ্মশানযাত্রার সময়ে শোভাযাত্রারও ব্যবস্থা হইতে পারে।

বড় ছেলে অজিত আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়া কহিল, আমায় ডেকেছেন? রায় বাহাদুর চিন্তার জাল-বোনা স্থগিত রাখিলেন। কহিলেন, হ্যাঁ। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, বহরমপুরের চিঠির কথা শুনেছ? গয়না ওরা নিজেরা গড়াবে; টাকা পাঠিয়ে দিতে বলেছে; কাল সব টাকা পাঠিয়ে দিও; বিয়েরও দেরি নেই বেশি; এখন থেকে আয়োজন আরম্ভ ক'রে দাও। একটু থামিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, আর একটা কথা—। বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

অজিত ইতিমধ্যে মা ও স্ত্রীর কাছে সব কথা শুনিয়াছিল। পরামর্শ-সভাও বসিয়াছে। কিংকর্তব্য স্থির হইয়া গিয়াছে।

রায় বাহাদুর একটু ইতস্তত করিয়া কহিলেন, একটা চিঠি এসেছে আজ। অজিত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। রায় বাহাদুর একবার আড়চোখে তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন. তারপর কহিলেন, চিঠিটার কথা কিছু শুনেছ নাকি? অজিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ। রায় বাহাদুর কহিলেন, কি কর্তব্য বল দেখি? অজিত কহিল, মার মত নেই।

জানি। বউমার কি মত?

ওরও মত নেই।

রায় বাহাদুর অজিতের মুখের দিকে তাকাইয়া মিনিট কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তোমার কি মত?

অজিত কহিল, উনি যে-ভাবে গেছেন, তাতে হিন্দুর সংসারে ওঁকে আশ্রয় দেওয়া চলে না, ওঁরও আশ্রয় চাওয়া উচিত নয়। উনি নিজে হাতে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক

কেটেছেন। ওঁর সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের কোন যোগ নেই। কাজেই এতদিন পরে জোর ক'রে ওঁকে আমাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া অন্যায় হবে। জোড়া তো লাগবেই না; উলটে সংসারে অশান্তি হবে, সমাজে অসম্মান হবে, এমন কি ছোট খুকীর বিয়েতেও ঝাগড়া প'ড়ে যেতে পারে। তা ছাড়া, ওই রোগ ও রোগীকে—

রায় বাহাদুর বাধা দিয়া কহিলেন, কোন বাড়ি ভাড়া ক'রে—

অজিত বাধা দিয়া কহিল, কোথায় বাড়ি পাবেন শহরে? কত সরকারী চাকরেই বাড়ি পাচ্ছে না, এডালে ওডালে কাটাচ্ছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তা ছাড়া শহরে রাখাও চলবে না। আজ না হয়, দুদিন পরে আসল ব্যাপার শহরের লোক জানতে পারবে, তখন শহরে মুখ দেখানো দায় হবে।

রায় বাহাদুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তা বটে, কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, দেখ, ওদের আইনসঙ্গত বিবাহ হয়েছিল।

অজিত কহিল, কে বললে?

চিঠিতে লিখেছে।

ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে অজিত কহিল, ও:। রায় বাহাদুর অজিতের মুখের দিকে তাকাইলেন। অজিত তাঁহার চোখে চোখ রাখিয়াই কহিল, হ'লেও সমাজ তা গ্রাহ্য করবে না। রাজার আইন সমাজ মানতে বাধ্য নয়।

রায় বাহাদুর মৃদু হাসিয়া শ্লেষের স্বরে কহিলেন, সতীদাহ-প্রথাটা বন্ধ হয়ে গেছে বোধ হয়; বাল্য-বিবাহ—

অজিত রুক্ষ কণ্ঠে কহিল, বন্ধ হয় নি, পাড়াগাঁয়ে আগের মতই চলছে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কণ্ঠস্বর মসৃণ করিয়া কহিল, মোট কথা হচ্ছে এই, সমাজ জড়বস্তু নয়, তার মন আছে; সেই মনের সায় না থাকলে কারও আইন সমাজে চলে না, তিনি রাজাই হোন, আর যাই হোন।

রায় বাহাদুর কহিলেন, সমাজের মন তো পশুর মন, সংস্কারসর্বস্ব, বিচার-বুদ্ধিহীন। পশুর মত সাবেক চালেই চলতে চায়। চাল বদলানো যায়, হয় ভয় দেখিয়ে অথবা সমাজের অধিকাংশের বিচার-বুদ্ধি জাগিয়ে। দুই-ই করতে পারে রাজশক্তি। কিন্তু রাজা আমাদের সমাজের নয়। কাজেই সমাজের ভাল-মন্দর প্রতি তাঁর দৃষ্টি নেই। আর সমস্ত সমাজের বিচার-বুদ্ধি জাগিয়ে তোলা তো তাঁর স্বার্থের পরিপন্থী—

অজিত কহিল, যারা শিক্ষিত, যাদের বিচার-বুদ্ধি জাগ্রত, তারাও তো প্রাচীন পথেই চলেছে। রায় বাহাদুরের বলিতে ইচ্ছা হইল, চলা উচিত নয়; বিচার-বুদ্ধি দিয়ে যা ভাল মনে করি, তা যদি না করতে পারি, তা হ'লে আমাদের শিক্ষা ব্যর্থ; কিন্তু চাপিয়া গেলেন। মনে পড়িল, সারাজীবন তিনি নিজে কি করিয়াছেন।

অজিত কহিল, না চ'লে উপায় নেই। আর চলাই তো ভাল। এই পথে চ'লেই তো আমরা সুখ-শান্তি পেয়েছি একদিন—

রায় বাহাদুর বাধা দিয়া কহিলেন, সবাই পেয়েছে কি?

অজিত জোরের সহিত কহিল, নিশ্চয়। না হ'লে সমাজে বিপ্লব বেধে যেত।

রায় বাহাদুর হাসিয়া কহিলেন, আবহমানকাল পাঁঠা-বলি হয়ে আসছে; পাঁঠাদের বিদ্রোহ করতে দেখেছ? পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিলেন, তর্ক থাক্, সমাজ যা ইচ্ছে করুক; সমাজের সঙ্গে কারবার আমার চুকে গেছে। আমি সুমিত্রাকে নিয়ে যদি সমাজের বাইরে গিয়ে থাকি—

রায় বাহাদুর পেন্‌শনভোগী পিতা, পুত্রদের অত্যন্ত ভক্তি ও প্রীতির পাত্র। রায় বাহাদুরের স্থানান্তরে যাওয়া মানে—পেন্‌শনটার হাতের নাগালের বাহিরে যাওয়া। পিতৃ-বিরহ সহ্য করা যায়, কিন্তু পেন্‌শন-বিরহ অসহ্য। তাহা ছাড়া সুজিত ফিরিয়া আসিলেই পেন্‌শনটা পুরাপুরি সংসারের তহবিলে ঢুকিবে। অজিত ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, ও কাজ করবেন না বাবা। অসামাজিক কাজ ব'লেই নয়, ও রোগটা বড় ছোঁয়াচে। কাছাকাছি থাকলে আপনাকেও ধরতে পারে। তার চেয়ে বরং কিছু টাকা পাঠিয়ে দিন তাঁকে, সেখানে থেকেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করান। তারপর, না হয় মাসে মাসে কিছু সাহায্য করা যাবে। নেহাত বনে-জঙ্গলে তো প'ড়ে নেই—

রায় বাহাদুর নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অজিত দাঁড়াইয়া রহিল। রায় বাহাদুর কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, আচ্ছা যাও, আমি ভেবে দেখি। অজিত চলিয়া গেল।

৪

রাত্রে নিদ্রা আসিল না। পালঙ্কের উপর শুভ্র কোমল শয্যা; বিলাতী নেটের মশারি, মাথার উপরে বৈদ্যুতিক পাখা ঘুরিতেছে। চোখের পাতা ক্লান্তিতে ভারী হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ঘুমাইবার জন্য চোখ বুজিলেই নানা চিন্তা মাথার মধ্যে কিলবিল করিয়া উঠিতেছে; ঘুম আসিতেছে না। বিছানা হইতে উঠিয়া রায় বাহাদুর ছাদের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন।

সুমিত্রাকে তিনি কোথায় আশ্রয় দিবেন? তাঁহার বাড়িতে তাহার স্থান হইবে না। সে যদি অসামাজিক আচরণ না-ও করিত, তাহা হইলেও দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য তাহার স্থান হইত না। তাঁহার গ্রামের বাড়ি বেশ বড়। একাংশে তাঁহার এক পিসতুতো বোন স্বামী-পুত্র লইয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া বাস করিতেছে। যুদ্ধের সময়ে তাহাদের ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা মিলিটারির কবলে গিয়াছে। যুদ্ধ মিটিয়া গেলেও এখনও কিছুই তাহারা ফেরত পায় নাই।

এই কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি তাহাদের আশ্রয় ও আহার্য, দুইই যোগাইয়া

আসিতেছেন। বাড়ির বাকি অংশটাতে সুমিত্রাকে লইয়া তিনি বাস করিলে, উহারা সুমিত্রার পরিচয় জানিতে পারিলেও আপত্তি করিতে সাহস করিবে না। কিন্তু আপত্তি করিবে পল্লী সমাজ। আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়াও অজিতের মন ও মত যদি এত সঙ্কীর্ণ হয়, তাহা হইলে পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত লোকদের কাছ হইতে উদারতা কি করিয়া আশা করা যায়? মোট কথা, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, সকলেই সনাতন বাঁধা রাস্তার পথিক। পুরাতন পথের মোহ সকলের রক্তে মিশিয়া আছে; নূতন পথে চলিবার সাহস কাহারও নাই। যাহারা বাহিরে নিজেদের নবীন বলিয়া জাহির করে, তাহারাও অন্তরে লোলচর্ম বৃদ্ধ। তিনি নিজেই বা কি? আজ সংসারের দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়াছেন বলিয়া সুমিত্রাকে আশ্রয় দিতে সাহস করিতেছেন। কিন্তু দশ বৎসর আগে হইলে কি পারিতেন? সুমিত্রার সঙ্গে পাছে দেখা হইয়া যায়, এই ভয়ে তো একদিন তিনি পলাইয়া আসিয়াছিলেন।

কাজেই সংসারের বা সমাজের চোখের সামনে সুমিত্রাকে আশ্রয় দিলে ঘরে-বাহিরে অশান্তি অনিবার্য। তাহাকে লইয়া তাঁহাকে দূরে সরিয়া যাইতে হইবে। স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রতিবাদ করিবে, এই অসামাজিক কাজ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাঁহাকে নিজ সঙ্কল্পে দৃঢ় থাকিতে হইবে। হতভাগিনী কন্যার জীবনের শেষ দিনগুলিকে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়া মধুর করিয়া তুলিতে হইবে।

সেই রাত্রেই রায় বাহাদুর দুইটি চিঠি লিখিলেন। একটি সুমিত্রাকে, সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখিলেন—কাহাকেও সঙ্গে করিয়া ষ্টীমার-ষ্টেশনে এস, আমি নিজে যাইয়া লইয়া আসিব।

আর একটি চিঠি সরসীবাবুকে। সরসীবাবু তাঁহার বন্ধু মুনসেফ করিতেন; এখন পেন্‌শন লইয়া কাশীবাস করিতেছেন। কাশীতে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি, সুমিত্রার সকল ব্যাপার তিনি জানেন।

লিখিলেন, সুমিত্রা এতদিন পরে ফিরিয়া আসিতে চায়। আমি ছাড়া আপনার বলিতে কেহ তাহার নাই, আমার আশ্রয় ছাড়া আশ্রয়ও নাই। তা ছাড়া নিদারুণ ক্ষয়রোগে তাহার জীবন ক্ষয় করিয়া আনিয়াছে; মৃত্যুর আর দেরি নাই। আমার বাড়িতে তাহার স্থান হইবে না। কাজেই তাহাকে লইয়া দূরে সরিয়া যাইতে চাই। বিশ্বেশ্বরের চরণতলে শেষের দিন কয়টা কাটাইতে পারিলে সে বোধ হয় শান্তি পাইবে। তা ছাড়া তুমি সেখানে আছ, তোমার কাছে সাহস ও সাহায্য দুইই পাওয়া যাইবে। সেইজন্য তাহাকে লইয়া কাশী যাওয়াই স্থির করিয়াছি। তুমি যেমন করিয়া হোক, যত ভাড়াতেই হোক আমাদের জন্য একটি বাড়ি ঠিক করিয়া রাখিও।

৮

দিন কয়েক পরে রায় বাহাদুর গৃহিণীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আসন্নপ্রায় বিবাহের ব্যবস্থায় তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত, খাবার সময়ে স্বামীর কাছেও সব দিন বসিবার সময় পান না। এক সময়ে আসিয়া দেখা করিলেন। রায় বাহাদুর কহিলেন, কাল আমি যাব স্থির করেছি। গৃহিণী আকাশ হইতে পড়িলেন ; দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিলেন, সে কি! কোথায়? রায় বাহাদুর মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, সুমিত্রাকে আনতে।

গৃহিণী দাঁড়াইয়া ছিলেন, বসিয়া পড়িলেন ; সবিস্ময়ে কহিলেন, বল কি! এখানে আনবে তাকে?

এখানে নয়। কাশীতে একটা বাড়ির ব্যবস্থা করেছি। সেখানে নিয়ে যাব।

গৃহিণী করুণ কণ্ঠে কহিলেন, দু দিন পরে ছোট খুকীর বিয়ে। তুমি চ'লে গেলে লোকে বলবে কি? আমরাই বা কি বলব তাদের?

ব'লো শরীর অসুস্থ, কোথাও বেড়াতে গেছি।

খুকীর বিয়েতে থাকবে না তা হ'লে? সেই মাগীই তোমার কাছে বড় হ'ল?

রায় বাহাদুর চুপ করিয়া রহিলেন।

গৃহিণী কহিলেন, ওই সর্বনেশে রোগ ঘাঁটাঘাটি ক'রে তোমার যদি কিছু হয়?

রায় বাহাদুর হাসিয়া কহিলেন, হ'লই বা ; আমার বাঁচবার আর দরকার কি?

গৃহিণী তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে কহিলেন, তাই নাকি? আমার কথা ছেড়ে দাও। দুটি খেতে পরতে দিয়ে দাসীবৃত্তি করাবার জন্যে বিয়ে ক'রে এনেছিলে। সারাজীবন ধ'রে তোমার সংসারে তাইই করেছি। এর পর না হয় ছেলেদের সংসারেও তাই করব। আর বউদের পছন্দ না হয় তো, কারও বাড়িতে রাঁধুনীগিরি করতে পারব। একটা পেট তো, কোন রকমে চ'লে যাবে। কিন্তু তোমার ছোট ছেলের ব্যবস্থা কি হবে? সে কি চিরদিন বিদেশে প'ড়ে থাকবে?

রায় বাহাদুর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, সুজিতের পড়া তো শেষ হয়ে গেছে ; ফিরে আসতে দেরি নেই। এক বছরের মধ্যে আমার কিছু না হয় তো আমিই তার খরচ চালিয়ে দেব। আর যদি হয় তো, ভাবনা কিসের? আমার লাইফ ইন্‌সিওরেন্সের পলিসিটা তোমার নামেই আছে। মারা গেলেই পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে যাবে। তাতে সুজিতের খরচ চ'লে যাবে, তোমারও সারাজীবন সুখে-স্বচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে চ'লে যাবে। গৃহিণী এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিলেন ; রায়বাহাদুরের কথা শেষ হইতেই ঝাঁঝের সহিত কহিলেন, না, আর কোন ভাবনা নেই। এত টাকা রেখে যাবে আমার জন্যে। সিঁথির সিঁদুর ঘুচিয়ে, তোমার টাকা নাড়াচাড়া ক'রে সুখের আমার সীমা

থাকবে না। কণ্ঠস্বর কঠোর করিয়া কহিলেন, তোমাকে ভাল কথা বলছি আমি। ওসব মতলব ছাড়। যদি বাড়ি থেকে এক পা বেরোও তো বিষ খাব আমি।

রায় বাহাদুর সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, পাগল! বিষ খাবে কি দুঃখে? এই ভরা সংসার তোমার, ছেলে-বউ, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনী। হাতাহাতি মেয়ের বিয়ে—

গৃহিণী উত্তর করিলেন, আমার একলার নাকি? তুমি আছ ব'লেই আমার সংসার; তুমি না থাকলে কার কি?

রায় বাহাদুর কহিলেন, আমি কি চিরদিনের মত চ'লে যাচ্ছি যে, এমন করছ তুমি! সুমিত্রা যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিনই আমাকে থাকতে হবে।

গৃহিণী তীব্র কণ্ঠে কহিলেন, কেন থাকতে হবে? কে তোমার সে? কি সম্পর্ক রেখেছে তোমার সঙ্গে? কোনদিন একটা চিঠি দিয়ে খবর নিয়েছে কি? কোনদিন মাপ চাইবার চেষ্টা করেছে কি? আজ দুর্দশায় পড়েছে ব'লে বাবাকে মনে পড়েছে।

রায় বাহাদুর কহিলেন, সে যাই ক'রে থাক্, আমি তো তার বাবা। সে যখন আসতে চেয়েছে, আমি 'না' বলব কি ক'রে? তোমার যদি সে নিজের মেয়ে হ'ত তুমিই কি বলতে পারতে?

গৃহিণী কটুকণ্ঠে কহিলেন, আমার মেয়েদের এমন শিক্ষা আমি দিই নি যে, তারা এমন কাজ করবে। যা-তা কথা ব'লো না তুমি।

রায় বাহাদুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, আমাকে বাধা দিও না। কোন গোলমালও ক'রো না। পাঁচ কানে কথাটা উঠলে ছোট খুকীর বিয়েতে গোলমাল বাধতে পারে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে ব'লো, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে প'ড়ে চেঞ্জে গেছি, আমি—

গৃহিণী কহিলেন, তাই লোকে শুনবে নাকি? অসুখ হ'ল, ডাক্তার-কবরেজ জানলে না, বন্ধু-বান্ধবরা জানলে না—

কোথাও গিয়েও তো অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি।

গৃহিণী ধারালো কণ্ঠে কহিলেন, মিথ্যে কথা বলতে যাব কেন? যা সত্যি তাই ব'লে দেব। বলব, যে মেয়ে বেশ্যাবৃত্তি করেছে সারাজীবন, তাকে তুমি স্থান দিয়েছ, তার জন্যে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ছেড়েছ। বিয়ে বন্ধ হয় হোক, সমাজে কলঙ্ক হয় হোক, আমার ব'য়ে গেল।

উদাস সুরে রায় বাহাদুর কহিলেন, বেশ, যা ভাল মনে হয় করবে।

গৃহিণী সতেজে কহিলেন, কেন করব না? তোমারই যখন সংসারে কারও ওপর মায়া নেই, আমার কিসের মায়া? যা ইচ্ছে করগে তুমি, কিছু বলব না আমি। আমার যা ইচ্ছে করব, কিছু বলতে এস না।— বলিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রে অজিতের সহিত কথাবার্তা হইল। অজিত কহিল, আপনার এখন কোথাও যাওয়া হতে পারে না বাবা। মাথার ওপর বিয়ে। আমি একা সামলাতে পারব না।

রায় বাহাদুর হাসিয়া কহিলেন, সামলাতে না পারলে চলবে কেন? আমি যদি না থাকতাম? তোমার মা রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সব করবে।

খরচপত্র যদি বেশি হয়ে যায়?

কোন চিন্তা নেই। চেক-বই সই ক'রে দিয়ে যাব তোমার মায়ের কাছে। যা দরকার হয় বের করবে। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সংসারের ওই কাজটিই তো করি, আর তো কিছু করি না।

অজিত কহিল, যাবার আপনার কি দরকার? টাকাকড়ি কিছু পাঠিয়ে দিন।

টাকাকড়ি তো সে চায় নি।

কি চেয়েছে তবে?

রায় বাহাদুর কহিলেন, আমার কাছে থেকে মরতে চেয়েছে। জীবনে তো তাকে কিছুই দিই নি, এটুকু দিতে কার্পণ্য করি কি ক'রে, বল?

অজিত কহিল, একদিন যে এ অবস্থা হবে, সেটা বুঝে ও পথে পা দেওয়া তাঁর উচিত ছিল।

রায় বাহাদুর কহিলেন, এ অবস্থা হবে না, স্বামী-পুত্রের কোলে মাথা রেখে যেতে পারবে, এই ভেবেই ও পথে গিয়েছিল সে। ভাগ্য বিমুখ হ'লে কে কি করবে? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন. ও পথে পা না দিয়েও তো আমাদের সংসারে হাজার হাজার মেয়ে জীবন্ত মরছে।

অজিত কহিল, এ কথা জানাজানি হয়ে গেলে ছোট খুকীর বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে হয়তো।

যাতে জানাজানি না হয় তার ব্যবস্থা ক'রো। উপায় তোমার মাকে ব'লে দিয়েছি।

অজিত গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিল, শুনেছি। খুকীর বিয়ের পরে তো চুপ ক'রে থাকতে পারব না, বিবেকে বাধবে।

রায় বাহাদুর মৃদু হাসিলেন। অজিত ঈষৎ উষ্ণ হইয়া উঠিয়া কহিল, খুকীর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে থাকতে হবে দিন কয়েক। একজনের অন্যায়ের জন্যে সে কেন ভুগবে মিছিমিছি? পরে কিন্তু শ্বশুর মশায়কে জানাতেই হবে।

রায় বাহাদুর কহিলেন, ওঃ! তোমার শ্বশুর যে সনাতন-হিন্দু সভার একজন চাঁই, ভুলে গিয়েছিলাম। তা বেশ তো, জানিও, তিনি যা বলবেন তাই করবে।

রূঢ় কণ্ঠে অজিত কহিল, আপনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে তিনি নিশ্চয় নিষেধ করবেন।

রায় বাহাদুর কহিলেন, বেশ তো, রেখো না।

অজিত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কোথায় গিয়ে উঠবেন?

সরসীকে চিঠি লিখেছি কাশীতে একটা বাড়ির জন্তে।

অজিত কহিল, বাড়ি তো পাওয়া যাবে না, সরসীকাকা লিখেছেন।

বিস্ময়ের স্বরে রায় বাহাদুর কহিলেন, তাই নাকি? আমাকে তো কিছু লেখে নি!

অজিত কহিল, না, আপনাকে আর লেখেন নি। আমাকেই লিখেছেন, আপনাকে জানিয়ে দিতে; আপনাকে এ বয়সে এ কাজ করতে নিষেধও করেছেন।

গভীরতর বিস্ময়ে রায় বাহাদুর কহিলেন, বল কি! সরসী নিষেধ করেছে! প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর একজন ব্রাহ্ম বিধবাকে বিয়ে করবার জন্তে ক্ষেপেছিল সে, অনেক কষ্টে আটকিয়েছিলাম আমরা। হঠাৎ এত পরিবর্তন হ'ল কি ক'রে?

পরম আত্মপ্রসাদের সহিত অজিত কহিল, আমার শ্বশুর মশায়ের সম্পর্কে এসে। কাশীতে দুজনে দেখা হয়েছিল। তারপর থেকেই আমাদের সভায় তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য, আমাদের পত্রিকার সম্পাদকও।

রায় বাহাদুর চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, তা হোক, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন।

অজিত কহিল, দেখবে শুনবে কে? একা পারবেন?

একাই পারতে হবে; এ ভার তো আমার একার।

আপনার যদি নিজের অসুখ হয়, দেখবে কে তখন?

হাসপাতালে নার্স। রুক্ষ কণ্ঠে কহিলেন, সে জন্তে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। যেতে আমাকে হবেই। সারাজীবন ধ'রেই তো তোমাদের জন্তেই ক'রে এসেছি। এই কটা দিন আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছে হয় রেখো, না হয় রেখো না; অসুখ-বিসুখ হ'লে ইচ্ছে হয় খবর নিও, না হয় নিও না। তর্ক ক'রে ভয় দেখিয়ে কিছু লাভ হবে না, আমি দৃঢ়সঙ্কল্প। তোমাদের সংসার আমি গুছিয়ে দিয়েছি। আমার অভাবে তোমাদের কষ্ট হবে না। ছোট খোকার ব্যবস্থাও করব। কালই আমি যেতে চাই। আচ্ছা, যাও এখন।

অজিত বাবার মুখের দিকে তাকাইল। অনেক দিন এ রকম মুখের চেহারা দেখে নাই সে; পাথরের মত শক্ত, আসন্ন ঝড়ের আগে আকাশের মত থমথমে। সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

৬

বাড়ির সকলেই নন-কো-অপারেশন করিল। গৃহিণী কথাবার্তা বন্ধ করিলেন। খাবার সময়েও অনুপস্থিত। ছোট মেয়ে পুত্রবধূ দেখা হইলেই মুখ ভার করিয়া, চোখ

নামাইয়া সরিয়া পড়িতেছে। নাতি-নাতনীরা মাঝে মাঝে কাছে আসিত, তাহাদিগকেও নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে সম্ভবত। অজিতের দেখা-সাক্ষাৎ নাই। যে চাকরটা তাঁহার সেবার জন্য নির্দিষ্ট, তাহারও চাল-চলন কেমন এক ধরনের হইয়া উঠিয়াছে। নীরবে নিজের কাজ করে, কোন একটা কিছু করিতে বলিলে, হাঁ-না কিছুই না বলিয়া সরিয়া পড়ে, আর দেখা দেয় না। রায় বাহাদুর অবস্থা বুঝিয়া মনে মনে হাসিলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না। নিজেই সব ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন—সর্বাগ্রে টাকার ব্যবস্থা। সুমিত্রার দাদুর দেওয়া টাকা তাঁহার কাছে জমা ছিল। হুকুম ছিল—যদি কোন দিন সুমিত্রা দুরবস্থায় পড়ে এবং তিনি খবর পান, তাহা হইলে সুমিত্রাকে সেই টাকা যেন দেওয়া হয়। টাকাটা ব্যাঙ্কে এতদিন সুদে খাটিতেছিল। তাহা হইতে আবশ্যকমত টাকা উঠাইয়া আনিলেন। কাশীতে বাড়ি পাওয়া যাইবে না জানিতে পারিয়াই পুরীতে তাঁহার পাণ্ডাকে চিঠি লিখিলেন। পাণ্ডার নাম শ্রীনাথ, পুরীতে বেশ নাম-ডাক আছে তাহার, করিত-কর্মা ব্যক্তি। লিখিলেন, যত টাকা ভাড়াই হোক, একটা বাড়ি ঠিক কর; দু-চার দিনের মধ্যেই যাইতেছি, কোনমতে অন্যথা যেন না হয়। নিজেই বাক্স গুছাইলেন, বিছানা বাঁধিলেন। যৌবনের শক্তি জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিতে হইল তাঁহাকে। ভালই হইল। সামনে কঠোর দুঃখের দিন। কাহারও সাহায্য পাওয়া যাইবে না। রুগ্না মেয়েকে আনা, আশ্রয়ের ব্যবস্থা, সেবা, মৃত্যুর পরে সৎকার ও সদ্গতির ব্যবস্থা—সব একাই করিতে হইবে। বার্ধক্যের ভারে নুইয়া পড়িলে তাঁহার চলিবে কেন?

অপরাহ্নে ট্রেন। গৃহিণীর কাছে চাকরের মারফৎ খবর পাঠাইয়াছিলেন। যাত্রার কিছু পূর্বে পাচকের হাতে খাবার আসিল। তিনি একা আহার সমাধা করিলেন। জামা-কাপড় পরিলেন। গাড়ির ব্যবস্থা আগেই করিয়াছিলেন। বাড়ির গাড়ির উপর নির্ভর করা নিরাপদ মনে করেন নাই। বাড়ি-সুদ্ধ সকলে যখন ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তখন হয়তো ঠিক সময়ে গাড়ি আসিয়া পৌঁছিবে না। বাক্স-বিছানা গাড়িতে তুলিবার জন্য নিজেই কুলি ডাকিয়া আনিলেন। চাকরকে বলিতে ইচ্ছা হইল না। যেন মেসের বাবু; দেনা পাওনা চুকাইয়া মেস হইতে বিদায় লইতেছেন; কাহারও সহিত কোনদিন সত্য সম্পর্ক ছিল না, পরে থাকিবে না। যাবার আগে বোধ হয় কেহ দেখাও করিবে না। রায় বাহাদুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। গাড়ি আসিয়া পৌঁছানোর শব্দ পাওয়া গেল; তারপরেই গাড়োয়ানের হাঁক-ডাকের শব্দ। কুলি আসিয়া বাক্স-বিছানা গাড়িতে তুলিবার জন্য লইয়া গেল। তিনিও যাইবার জন্য উঠিবার উপক্রম করিলেন। এমন সময়ে গৃহিণী ঘরে প্রবেশ করিলেন, থমথমে মুখ, চোখ দুইটি ফোলা—কাঁদিতেছিলেন বোধ হয়। অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে কহিলেন, তুমি সত্যি যাবে?

রায় বাহাদুর ম্লান হাসিয়া কহিলেন, দেখতেই তো পাচ্ছ।

আত্রেয়ীর বিয়েটা নিজে দাঁড়িয়ে দেবে না? সকলের ছোট মেয়ে; সে কান্নাকাটি করছে যে!

অদৃষ্টে না থাকলে কি করব? কান্নাকাটি করতে মানা ক'রো। ওরা আজকালকার মেয়ে; বুঝিয়ে বললে বুঝবে। আমিই বলতাম, তা কাছেই এল না আর।

পকেট হইতে একটা চেক-বই বাহির করিয়া গৃহিণীর হাতে দিয়া কহিলেন, সই ক'রে দিয়েছি। যা দরকার হবে বার ক'রো। হ্যাঁ, আর একটা কথা, তোমাদের টাকা আমি কিছু নিই নি। খুকীর নিজের টাকা আছে জান তো, তাই নিয়ে চললাম।

গৃহিণী কহিলেন, কোথায় যাচ্ছ?

জানি না। কাশীতে লিখেছিলাম বাড়ির জন্যে; পাওয়া যায় নি। পুরীতে লিখেছি; পেলে সেখানেই যাব।

কবে ফিরবে?

বলতে পারি না। কি অবস্থায় আছে জানি না। যদি বেশি দিন না বাঁচে, সব শেষ হ'লে ফিরে আসতে পারি; অবশ্য নিজে যদি সুস্থ থাকি, আর তোমাদের কোনও অসুবিধা না হয়।

গৃহিণী সবিস্ময়ে কহিলেন, আমাদের অসুবিধে!

সামাজিক অসুবিধে। আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি, তা সমাজের চক্ষে অপরাধ। তার ওপর তোমার ছেলে সনাতন-হিন্দুধর্মধ্বজী শ্বশুরের জামাই। আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না বলেছে।—বলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

গৃহিণী কহিলেন, তা কি করবে? ছেলে-মেয়ে হয়েছে, সমাজকে অসম্মান করবার তার জো কি?

রায় বাহাদুর গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিলেন, সত্যি। নীরস কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, কাজেই ফেরার প্রশ্ন নিরর্থক। ছাড়াছাড়ি হতেই হবে। তবে ও নিয়ে মন খারাপ না করলেই পার। হ'তই তো একদিন। ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন, গাড়ির সময় হয়ে এল। এবার যেতে হবে।—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই গৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিলেন, তুমি যে এতদূর পাষাণ হ'তে পার, কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি।—বলিয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রায় বাহাদুর নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ধীরপদে আসিল আত্রেয়ী, বয়স বাইশ, ফরসা রঙ, ছিপছিপে গঠন, ধারালো মুখের ডৌল; ম্লানমুখে আনত-চোখে আসিয়া প্রণাম করিল। রায় বাহাদুর মাথায় হাত দিয়া মনে মনে আশীর্বাদ করিলেন। আত্রেয়ী মৃদুকণ্ঠে কহিল, কবে আসবেন বাবা? রায় বাহাদুর তাহাকে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, তুমি তো সব শুনেছ মা!

লেখাপড়া শিখেছ; বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়েছে; বেশ ক'রে ভেবে দেখো, না গিয়ে আমার উপায় নেই।

আত্রেয়ী মুখ নামাইয়া ডান হাতের আঙুল দিয়া বাম হাতের নখ খুঁটিতে লাগিল। রায় বাহাদুর কহিলেন, বিয়েতে যদি না আসতে পারি, কোনও দুঃখ ক'রো না। যেখানেই থাকি, আশীর্বাদ করব তোমাদের। পুত্রবধূ আসিয়া প্রণাম করিল; ধর্মধ্বজী পিতার মেয়ে; মুখে কঠিন গাম্ভীর্য। প্রণাম করিয়া উঠিতেই রায় বাহাদুর কহিলেন, দাদু-দিদিদের দেখছি না! পুত্রবধূ মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল, বেড়াতে নিয়ে গেছে।

রায় বাহাদুর নামিয়া আসিলেন। গৃহিণী রায় বাহাদুরের খাটের উপর বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রবধূ সামনে দাঁড়াইয়া নীরব সান্ত্বনা জানাইতে লাগিল। আত্রেয়ী পাছু পাছু নামিয়া আসিল। গাড়িতে চড়িবার আগে রায় বাহাদুর আত্রেয়ীকে কহিলেন, তা হ'লে যাই মা। আত্রেয়ীর দুই চোখ হইতে জল পড়িতে লাগিল। রায় বাহাদুর কহিলেন, ছিঃ, কাঁদতে আছে কি! একটা ভাল ব্যবস্থা যদি ক'রে দিতে পারি তো আসব একবার, তোমাদের দেখে যাব। তোমার দাদার সঙ্গে দেখা হ'ল না, তাকে ব'লো।

আত্রেয়ী রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, নিশ্চয় এসো, বাবা। রায় বাহাদুর পরমস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইলেন।

৭

রায় বাহাদুর চলিয়াছেন। ঈ. বি. আর.-এর ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছোট কামরা; মৃদু আলোকে আলোকিত। জানালার ধারে একটি গদি-মোড়া বেঞ্চিতে নিজের বিছানাটি পাতিয়া রায় বাহাদুর শুইয়া আছেন। কামরায় অন্যান্য বেঞ্চিতে ও বাঙ্কে জনকয়েক লোক শুইয়া আছে। সকলেই নিদ্রিত। মাঝের বেঞ্চির সাহেবী-পোশাক-পরা লোকটির প্রচণ্ড শব্দে নাক ডাকিতেছে। গাড়ির মৃদু দোলায় শরীর দুলিতেছে। রায় বাহাদুর চোখ বুজিয়া ঘুমাইতেছেন না, কত কি ভাবিতেছেন।

কলিকাতায় তাঁহার এক পরিচিত হোটেলে উঠিয়াছিলেন। এই হোটেলে কলিকাতা আসিলেই তিনি উঠেন। বহুবার যাতায়াতের ফলে হোটেলের মালিকের সঙ্গে হৃদ্যতা জন্মিয়াছে; খুব খাতির করে তাঁহাকে। ঠাকুর-চাকরেরাও বিশেষ সেবা-যত্ন করে। অবশ্য প্রত্যেকবার তিনি তাহাদের সন্তুষ্ট করেন। এবারে কোনও ঘর খালি ছিল না। অন্য লোক হইলে ফিরিয়া আসিতে হইত। কিন্তু মালিক একটা ঘর খালি করিয়া দিয়া তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সেই ঘরটিই কয়েক দিনের জন্য ভাড়া লইয়াছেন। তাঁহার অসুস্থ মেয়েকে লইয়া এখানে দিন কয়েক থাকিয়া শহরের কোন ভাল চিকিৎসক দ্বারা তাহার চিকিৎসা করাইবেন, এ কথা মালিককে জানাইয়াছেন। ভাড়াও দ্বিগুণ দিতে

স্বীকার করিয়াছেন। মালিক কোনও আপত্তি তোলে নাই। মেয়ের জন্য ফল কিনিয়াছেন, এক শিশি হর্লিক্স সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহাকে আনিবার জন্য রেল-কোম্পানির কর্মচারীদের ঘুষ দিয়া এই যুদ্ধের ভিড়েও একটি ছোট কামরা রিজার্ভ করিয়াছেন।

রায় বাহাদুরের ঘুম আসিতেছে না। নানা চিন্তা। মালবিকা ও ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়িতেছে। মালবিকা ও আত্রেয়ী কাঁদিয়াছিল। মালবিকা কাঁদিয়াছিল দুঃখে নয়, অপমানে। মর্যাদায় আঘাত লাগিয়াছে তাহার—রূঢ় মর্মান্তিক আঘাত। যে অভিনেত্রী মহিমান্বিতা মহেন্দ্রাণীর অভিনয় করিতেছিল, দর্শকদের চক্ষের সামনে তাহার রূপসজ্জা কাড়িয়া লইয়া লাঞ্ছিত করা হইয়াছে। পুত্র-পুত্রবধূ, কন্যা-জামাতা, দাস-দাসীদের কাছে সে মাথা তুলিতে পারিবে না। আত্রেয়ী কাঁদিয়াছিল অভিমানে। সে তাঁহার বড় আদরের মেয়ে। ছোটবেলা হইতে এত স্নেহ পাইয়াছে তাঁহার কাছ হইতে যে, একটু ইতর-বিশেষ হইলে অভিমানে থমথম করিতে থাকে। কাজেই তাহার সম্বন্ধে তাঁহাকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। আজ তাহার জীবনের এতবড় একটা ব্যাপারে, যাহাতে যোগ দিবার জন্য দেশ-বিদেশ হইতে আত্মীয়স্বজন আসিয়া জড় হইতেছে, তাহার বাবা দূরে সরিয়া যাইবেন, ইহা তাহার পক্ষে মর্মান্তিক আঘাত; গভীর লজ্জার কারণও বটে। পিতার প্রিয়তমা কন্যা বলিয়া সংসারে সকলের কাছে যে একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল, তাহা পদচ্যুত রাজকর্মচারীর মত এক মুহূর্তে উবিয়া যাইবে। স্বামী ও স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের কাছে তাহার ন্যায্য মূল্য হয়তো অনেক কমিয়া যাইবে; যতটুকু স্নেহ ও শ্রদ্ধা পাওয়া উচিত, হয়তো পাইবে না।

আসিবার সময় অজিত উপস্থিত থাকিল না। খুব সম্ভব ইচ্ছা করিয়াই। তাহার অভিমান নয়, রাগ। সাংসারিক সমস্যা তিনি জটিল করিয়া তুলিতেছেন বলিয়া। জটিলতা শুধু সামাজিক নয়, আর্থিকও। সুমিত্রাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করা না গেলেও তাহার টাকাটা—বিশেষ করিয়া সে টাকার অঙ্ক যখন সামান্য নয়, আপনার না বলা যায় কি করিয়া? তাঁহারই বুদ্ধির দোষে সেই টাকাটা হাতছাড়া হইয়া গেল। তাহা ছাড়া তাঁহার পেন্‌শন সম্বন্ধেও গোলযোগ। সেটা তো সম্প্রতি নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল; তারপর, যদি তাঁহাকে মৃত্যুরোগে ধরে ও তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে একেবারে ভাসিয়া গেল। ইহাতে কোন্ পুত্রের না রাগ হয়? পুত্রবধূরও রাগ হইয়াছে নিশ্চয়। আসিল যখন মুখ থমথমে, প্রণাম করিল নেহাত দায়-সারা গোছের; সকলকে দেখাইবার জন্যও এক ফোঁটা চোখের জল বাহির করিতে পারিল না।

কিন্তু সংসারকে এত আঘাত না করিয়া তাঁহার উপায় ছিল না। সুমিত্রা তাঁহার প্রথম সন্তান। তাহারই মুখ দেখিয়া হৃদয়ে সন্তান-বাৎসল্যের সুধাক্ষরণ শুরু হইয়াছিল। অথচ সে-ই আজীবন বঞ্চিত রহিয়া গেল। আজ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া,

শেষবিদায়ের পূর্বে, নিজের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে নয়, ভিখারিণীর মত একটু স্নেহের জন্য সে যদি তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, তিনি তাঁহাকে ফিরাইবেন কি করিয়া?

গাড়ি মাঝে মাঝে থামিতেছে। যাত্রীদের ওঠানামার কোলাহল, খালাসীদের ষ্টেশনের নাম-হাঁকা, ষ্টেশনের অফিস-ঘরের মধ্যে টেলিগ্রাফ-যন্ত্রের শব্দ, টেলিফোনে ষ্টেশন-বাবুর কথাবার্তা, এবং সকল শব্দের পটভূমিকা হিসাবে এঞ্জিনের শোঁ-শোঁ শব্দ। মাঝে মাঝে দুই-একটি ছোট-বড় পুলের উপর গুমগুম শব্দে গাড়ি পার হইতেছে। কখনও কখনও মাঝপথে গাড়ি থামিয়া যাইতেছে। এঞ্জিনটা হাঁপাইতে হাঁপাইতে তারস্বরে পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিয়া ষ্টেশনে ঢুকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে। কামরার লোকগুলি নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছে; পাশের লোকটার নাক ডাকার বিরাম নাই।

রায় বাহাদুর উঠিয়া বসিলেন। জানালার বাহিরে তাকাইয়া দেখিলেন, দিক্‌চিহ্নহীন অন্ধকার সমুদ্রের মধ্য দিয়া তাঁহারা চলিয়াছেন। যেন সীমাহীন, বর্ণহীন মহাশূন্যের মধ্য দিয়া এক গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে চলিয়াছেন। বালিশের নীচে টাইম-টেব্‌ল ছিল; রায় বাহাদুর তাহা বাহির করিয়া, চোখে চশমা আঁটিয়া, স্থান-কাল-সংস্থিতির মধ্যে তাঁহার গন্তব্য-স্থানের স্থিতি নির্ণয় করিতে লাগিলেন।

পরের দিন অপরাহ্ণে পৌঁছিবেন সেখানে। সুমিত্রা যদি আসিয়া থাকে, পরের দিন সকালে ফিরিতে পারিবেন। রাত্রে স্নান আহার ও বিশ্রামের সুযোগ জুটিবে কি না কে জানে? যদি সুমিত্রা না আসিয়া থাকে তো সেই গ্রামে যাইতে হইবে। দূর—দুর্গম পথ, অপরিচিত। একবার মাত্র গিয়াছিলেন সেখানে। প্রায় বারো-তেরো ঘণ্টা নৌকায় যাইতে হইবে। এই বয়সে এই শরীরে এতখানি পথ যাওয়া-আসা সম্ভব হইবে কি? দেহে ও মনে গভীর ক্লান্তি অনুভব করিলেন রায় বাহাদুর। যে ভার বহন করিবার জন্য তিনি দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি সংহত করিয়াছিলেন, তাহা দুর্বহ মনে হইল। সুমিত্রার উপরে মন বিরস হইয়া উঠিল। শেষ-বয়সে এই কঠিন সমস্যার সম্মুখে কেন ফেলিল তাঁহাকে? সারাজীবন সকল সমস্যা সাধ্যমত এড়াইয়া চলিয়াছেন তিনি। বরাবর স্রোতের সঙ্গে সাঁতার দিয়াছেন। আজ মন ও দেহের শক্তি—দুই নিঃশেষিত-প্রায়, এখন স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়া সাধ্যে কুলাইবে কি? সুমিত্রার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ভাল করেন নাই তিনি। অজিতের পরামর্শমত চিঠিতে ক্ষমা ও মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাইয়া দিলেই হইত।

একটা ষ্টেশনে গাড়ি থামিল; মিনিট কয়েক পরেই আবার যাত্রা শুরু করিল। রায় বাহাদুর পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিলেন। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। বাহিরের দিকে তাকাইতেই দেখিলেন, তাঁহার অন্যমনস্কতার অন্তরালে অন্ধকার কখন ফিকা হইয়া উঠিয়াছে। চাঁদ উঠিয়াছে, বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষের শেষের ক্ষীণ চাঁদ। আকাশে

এখানে-সেখানে চাংড়া চাংড়া মেঘ। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তারা; একটা তারা জলজ্বল করিতেছে। লাইনের ধারে কচুরিপানায় ভরা জলাভূমি; তাহার পারে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ; মাঝে মাঝে গ্রাম, গ্রামান্তে দীর্ঘশীর্ষ নারিকেল ও সুপারি গাছের সারি, সব অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। একটি অপূর্ব অনির্বচনীয় সুন্দর দৃশ্য। যেন এ পৃথিবীর নয়, স্বর্গের ছায়া ক্ষণেকের জন্ম পড়িয়াছে পৃথিবীতে।

রায় বাহাদুর মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। মুহূর্তের জন্ম রায় বাহাদুর সমাজ সংসার ভুলিলেন, সমস্যা ভুলিলেন, দুঃখ বেদনা আঘাত ও প্রত্যাঘাত ভুলিলেন। আকাশ ও পৃথিবী ব্যাপী স্নিগ্ধ, সুগভীর শান্তির স্পর্শ তাঁহার মনে লাগিল; তাঁহার মনের দাহ জুড়াইয়া গেল। সুমিত্রার বিরুদ্ধে তাঁহার মনের মধ্যে যে বিরক্তির মেঘ জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা মিলাইয়া গেল। ধীরে ধীরে তাঁহার চৈতন্যের উপর সঞ্চারিত হইল নিদ্রার কুহেলিকা; চোখের পাতা ভারী হইয়া উঠিল। রায় বাহাদুর শুইয়া পড়িলেন এবং শুইবামাত্র ঘুমাইলেন।

বেলা নয়টার সময় ট্রেন হইতে নামিয়া আরও ঘণ্টা কয়েক ষ্টীমারে আসিয়া, রায় বাহাদুর গন্তব্য-স্থানে পৌঁছিলেন। জায়গাটি নেহাত ছোট। অনেক লোক নামিল। সকলেই নিজের নিজের পোঁটলা-পেঁটরা কাঁধে-কাঁখে লইয়া চলিল। রায় বাহাদুরও নিজের বিছানাটি এক হাতে ও সুটকেসটি আর এক হাতে লইয়া ভিড়ের ধাক্কা খাইতে খাইতে জেটির বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিতেই একটি ছেলে তাঁহাকে নমস্কার করিল। ছেলেটির বয়স যোল, কি সতেরো। পোশাক-পরিচ্ছদ সাদাসিধে, কুণ্ঠিত হাব-ভাব। পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা সাধারণত যেমন হয় তেমনই। ছেলেটি সবিনয়ে কহিল, আপনার নাম কি—

রায় বাহাদুর কহিলেন, হ্যাঁ। তুমি?

ছেলেটি কহিল, আমি আপনাকে নিতে এসেছি। কাল আপনার আসার কথা ছিল।

রায় বাহাদুর কহিলেন, হ্যাঁ, বাবা। বিশেষ কাজে দেরি হয়ে গেল। কবে এসেছ তোমরা?

ছেলেটি কহিল, কাল বিকেলে এসেছি।

রায় বাহাদুর কহিলেন, তোমরা আমার মেয়েকে 'মা' বল তো? কেমন আছে তোমার মা?

ছেলেটি সম্ভবত তাঁহার কথা শুনিতে পাইল না। সে এদিক-সেদিক তাকাইয়া বোধ করি একটা কুলির খোঁজ করিতেছিল। খোঁজ না পাইয়া কহিল, না, কুলি পাওয়া যাবে না। আমাকেই দিন।

রায় বাহাদুর কহিলেন, সে কি বাবা! তা কি হয়?

ছেলেটি কহিল, ওই তো সামান্য জিনিস; এমন কিছু ভারী নয়; খুব নিয়ে যেতে পারব; বেশি দূর তো নয়।—বলিয়া রায় বাহাদুরের হাত হইতে এক রকম জোর করিয়া জিনিসগুলা লইতেই রায় বাহাদুর কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন, তুমিই ছুটো নেবে! আমাকে বরং একটা দাও।

ছেলেটি মাথায় ঝাঁকানি দিয়া কহিল, না না, তা কি হয়? কেন আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন? বেশি দূর নয়, আসুন।

কাঁচা-রাস্তার দুই পাশে বাজার, চা-খাবারের দোকান, লটকন-মসলার দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়ের ও কাটা-কাপড়ের দোকান, দর্জীর দোকান, চালের আড়ত, কয়লার আড়ত, বিশুদ্ধ হিন্দু-হোটেল, হোমিওপ্যাথি ডাক্তারখানা। একেবারে শেষপ্রান্তে একটি ছোট ঘর, ছেঁচা-বেড়ার দেওয়াল, গোলপাতার ছাউনি। সেই ঘরটির সামনে ছেলেটি দাঁড়াইল। ঘরের দরজা বন্ধ। সামনে একফালি বারান্দা। সেখানে একটি টিনের চেয়ারে একটি ছেলে শুষ্কমুখে বসিয়া ছিল। ইহাদের দেখিয়া নামিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মালিক ও আরও জনকয়েক লোক আসিয়া হাজির হইল। মালিক রায় বাহাদুরকে কহিল, আপনি বুঝি, যে স্ত্রীলোকটি মারা গেছে, তার আত্মীয়?

রায় বাহাদুরকে যেন অতর্কিতে প্রচণ্ড আঘাত করিল লোকটা। আপাদমস্তক ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। আর্তকণ্ঠে কহিলেন, মারা গেছে? কখন? তাঁহার সারাদেহ পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিতে লাগিল; দেহের ও মনের শক্তি রেণু রেণু হইয়া গুঁড়া হইয়া গেল; সেইখানে মাটির উপরেই বসিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন।

মালিক হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার কোমর জাপটাইয়া ধরিয়া কহিল, করেন কি? করেন কি? মাটির ওপরেই বসছেন যে! ছেলেদের দিকে তাকাইয়া কহিল, চেয়ারটা দিলাম যে হে ছোকরা—কোথায় সেটা? এনে দাও না! একটি ছেলে তাড়াতাড়ি চেয়ার আনিয়া পাতিয়া দিতেই মালিক রায় বাহাদুরকে তাহার উপরে বসাইয়া দিল।

মালিক কহিল, আপনি কি ব্রাহ্মণ? রায় বাহাদুর সামলাইয়া উঠিয়াছিলেন; মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন, হ্যাঁ বাবা। মালিক দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, আমিই এই ঘরের মালিক। হাত বাড়াইয়া কহিল, ওই যে আদর্শ হিন্দু-হোটেল, মস্ত বড় সাইনবোর্ড টাঙানো আছে যার সামনে, ওটা আমারই। আর এক দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, ওই যে কাঠ-কয়লার আড়ত, ওটাও আমারই। হাত নামাইয়া কহিতে লাগিল, বিদেশ-বিভুঁই থেকে যাত্রীরা এসে আমার ওখানেই থাকে, খায়। ছেলে দুটি আর ওই মেয়েটি কাল বিকেলে এল; মেয়েটিকে দেখলাম ধুঁকছে; দেখেই

বললাম, ও আর বেশিক্ষণ নয়। ঘর দিলাম, আসবাব-পত্র দিলাম; ডাক্তার ডেকে দিলাম। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী আমাদের কেনারাম ডাক্তার, চিতের তোলা মড়াকেও ঘরে ফিরিয়ে আনে। মাথার ঝাঁকানি দিয়া কহিল, নাঃ! চিকিচ্ছের কোনও ক্রটি হয় নি, মশায়। মানুষের সাধ্যে যতটা হয় হয়েছে, কিন্তু কালই ওর যাবার দিন, কে আটকাবে বলুন? ভোর-রাতে মেয়েটি মারা গেল। খবর পেয়েই ছুটে এলাম; কাঠ-কয়লা, লোকজনের ব্যবস্থা ক'রে দিলাম। ছেলে দুটি বললে, আপনি আসবেন; আপনি না এলে কিছু হবে না। তা এসে পড়েছেন, ভালই হয়েছে। একবার চোখের দেখা দেখে নিন। আমার এদিকে সব প্রস্তুত। কোনও চিন্তা নেই। কেবল একটি কাজ করবেন, যাবার আগে পাওনা-গণ্ডা সব মিটিয়ে দিয়ে যাবেন। একটি ছেলে কহিল, মা কাল আপনার জন্তে ভারি ছটফট করেছিলেন।

রায় বাহাদুর প্রস্তর-মূর্তির মত বসিয়া রহিলেন; চক্ষে বিহ্বল দৃষ্টি। তাঁহার চৈতন্যলোকে ভাগ্য-বিড়ম্বিতা কন্যার করুণ প্রার্থনা বিস্মৃত-প্রায় কোমল কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রায় বাহাদুর পরদিন সকালেই ফিরিলেন। সুমিত্রার শেষকৃত্যে কোন ক্রটি হয় নাই। হোটেলের মালিক নিখুঁত ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাঁহারও সেবা-যত্ন করিয়াছে খুব। তিনি টাকাকড়ি সমস্ত মিটাইয়া দিয়া, মালিকের ছেলেমেয়ের হাতে মিষ্টি খাইবার জন্ত দশ টাকা দিয়া আসিয়াছেন। মালিক একেবারে গদগদ হইয়া উঠিয়াছিল; আসিবার সময়ে পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া, পায়ের ধুলা মাথায় ও জিভে ঠেকাইয়া কহিয়াছিল, এদিকে আর যদি কখনও আসা হয়, অধমের এখানেই পদধূলি দেবেন। ছেলে দুটি ষ্টীমার-ঘাট পর্যন্ত সঙ্গে আসিল। বিদায়ের পূর্বে তাহারা তাঁহাকে প্রণাম করিতেই তিনি তাঁহাদের বুকে জড়াইয়া আশীর্বাদ করিলেন। ষ্টীমার ছাড়িতে দেরি ছিল। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া এপারের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। নদীর তীরে ওই কেয়াঝোপের কাছে, তাঁহার চোখের সামনে সুমিত্রা ছাই হইয়া গেছে। রুগ্ন দুর্বল দেহে এত কষ্টে এতদূর পথ আসিয়াও তাহার আশা মিটে নাই। মৃত্যুর আগে ক্লান্ত বিহ্বল নয়ন মেলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে খুঁজিয়াছে। গভীর নিরাশায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছে। দীর্ঘ যাত্রাপথে কোন সম্বল না লইয়াই যাত্রা করিতে হইয়াছে তাহাকে।

ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। ক্রমে ষ্টীমার-ঘাট, বাজার, নদীতীরবর্তী কেয়াঝোপ, কেয়াঝোপের কোলে শ্মশানভূমি দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। রায় বাহাদুর সরিয়া আসিয়া নিজের জায়গাটিতে বসিলেন। দেহ শ্রান্ত; মন শোকাচ্ছন্ন। কিন্তু কোথায় কোন রুদ্ধ পথ দিয়া মনের মধ্যে মুক্তির হাওয়া বহিতে লাগিল। যেন কোন কঠিন পরীক্ষায়

বসিবার পূর্বমুহূর্তে পরীক্ষা দেওয়া হইতে রেহাই পাইয়া গিয়াছেন। ঘণ্টা দুই পরে তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইল, এবং স্নানাহার করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিলেন।

যখন বাড়ি ফিরিলেন, বেলা নয়টা। বাহিরের বারান্দায় নাতি-নাতনীরা খেলা করিতেছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বাড়ির মধ্যে খবর দিতে ছুটিল।

রায় বাহাদুর বারান্দায় ঈজিচেয়ারে অর্ধশয়ান হইলেন। ঠিক এইখানে, এইভাবে বসিবার জন্য ভিতরে ভিতরে তৃষ্ণার্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বসিয়া গভীর তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। এবং চাকর কাছে আসিতেই তামাক আনিবার জন্য আদেশ দিলেন।

খবর পাইয়াই গৃহিণী, পুত্রবধূ, কন্যা, দাস-দাসী সকলে ছুটিয়া আসিল। সকলের মুখেই আনন্দের হাসি। গৃহিণী কৃত্রিম উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব্যবস্থা ক'রে এলে ?

রায় বাহাদুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। সুমিত্রার স্মৃতি ইহার মধ্যেই মসৃণ হইয়া উঠিয়াছে। জোর করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, আমাকে কিছুই করতে হয় নি ; ভগবান নিজে ব্যবস্থা করেছেন। যে সমস্যার কূল-কিনারা পাই নি আমরা, তিনি নিজে তার সমাধান ক'রে দিয়েছেন।

শ্রীঅমলা দেবী

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

জন্ম : ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৪ মৃত্যু : ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১২

রচনাপঞ্জী

গিরিশচন্দ্রের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বড় অল্প নহে ; ইহার বেশীর ভাগই নাট্যগ্রন্থ। তাঁহার ছোট-বড় একাধিক জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু চরিতকারদের কেহই তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজির প্রকাশকাল-সমেত একটি কালানুক্রমিক তালিকা সঙ্কলন করিবার কষ্ট স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের কেহ কেহ গিরিশচন্দ্রের নাট্যগ্রন্থগুলির প্রথমাভিনয়ের তারিখ দিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। প্রথমাভিনয়ের তারিখ হইতে নাটকের রচনা ও প্রকাশকালের আভাস পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সকল সময়ে এ নিয়ম খাটে না, বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্রের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তাঁহার কতকগুলি নাট্যগ্রন্থ অভিনয়ের অনেক পরে প্রকাশিত হইয়াছে। আসলে এরূপ গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলন মোটেই সহজসাধ্য নহে। গিরিশচন্দ্রের অনেক পুস্তক বর্তমানে একান্ত দুষ্প্রাপ্য, কতকগুলির টাইটেল-পেজ বা আখ্যাপত্রে আদৌ প্রকাশকাল নাই, কতকগুলি আবার স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে একেবারেই প্রকাশিত হয় নাই,—'গিরিশ-গ্রন্থাবলী'তেই প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল। কার্যের দুরূহতা

সত্ত্বেও আমরা বিশেষ পরিশ্রমে একটি নির্ভরযোগ্য কালানুক্রমিক গ্রন্থ-তালিকা সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তালিকায় সন-তারিখযুক্ত যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে, তাহা গবর্মেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত। পুস্তকে প্রকাশকাল-নির্দেশের অভাব প্রশ্নচিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে। এই রচনাপঞ্জী সঙ্কলনে শ্রীমান্ সনৎকুমার গুপ্ত আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

		বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত প্রকাশকাল	পুস্তকের আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল; বন্ধনীমধ্যে প্রথমাভিনয়ের তারিখ
১।	আগমনী (নাট্যরাসক)*	১৮৭৭, ২৯ সেপ্টেম্বর	
২।	অকাল বোধন (নাট্যরাসক)*	১৮৭৭, ৩ অক্টোবর	
৩।	দোল-লীলা (বিশুদ্ধ তানলয়-সংযুক্ত গীতপূর্ণ নাট্যগীতি)†	১৮৭৮, মার্চ	ইং ১৮৭৮ (ন্যাশনাল ৬ চৈত্র ১২৮৪, দোল-পূর্ণিমা)
৪।	যামিনী চন্দ্রমা হীনা গোপন চুম্বন A Kiss in the Dark (রঙ্গনাট্য) ‡	১৮৭৮, ৬ জুলাই	১২৮৫
৫।	মায়া-তরু (A Musical Melang)	১৮৮১, ১১ ফেব্রুয়ারি	?
৬।	মোহিনী প্রতিমা (গীতি-নাট্য)	১৮৮১, ১৬ এপ্রিল	১২৮৭, ১৯ চৈত্র
৭।	আনন্দ রহো (ঐতিহাসিক নাটক)	১৮৮১, ১৭ আগষ্ট	১২৮৮
৮।	রাবণবধ (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)	১৮৮১, ৫ নবেম্বর	১২৮৮ (ন্যাশনাল ৩০-৭-৮১)
৯।	অভিমন্যু-বধ (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)	১৮৮১, ২৬ নবেম্বর	১২৮৮
১০।	সীতার বনবাস (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)	১৮৮২, ২০ জানুয়ারি	১২৮৮, মাঘ

* পুস্তিকার আখ্যাপত্রে গ্রন্থকার-হিসাবে "মুকুটাচরণ মিত্র" নাম আছে। লেখক ইহাকে তাঁহার "প্রথম রচনা-কুসুম" বলিয়াছেন।

† পুস্তিকার আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। "শ্রীকেদারনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।"

‡ পুস্তিকায় গ্রন্থকারের নাম নাই। "শ্রীকিরণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" নবাবিষ্কৃত এই রঙ্গনাট্যখানি আমি ১৩৫২ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি।

১১।	লক্ষ্মণ-বর্জ্জন (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)	১৮৮২, ৫ ফেব্রুয়ারি	১২৮৮, মাঘ
১২।	সীতাহরণ (পৌরাণিক নাটক)	১৮৮২, ২১ আগষ্ট	১২৮৯
১৩।	রামের বনবাস (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)	১৮৮২, ২৬ আগষ্ট	১২৮৯
১৪।	মলিন মালা (গীতিনাট্য)	১৮৮২, ১৬ সেপ্টেম্বর	১২৮৯
১৫।	ভোট মঙ্গল। সজীব পুত্‌লো নাচ (ব্যঙ্গনাট্য)*	১৮৮২	১২৮৯ (ন্যাশনাল ৭-১০-৮২)
১৬।	ব্রজবিহার (পৌরাণিক গীতিনাট্য)	১৮৮৩, ১ এপ্রিল	(ন্যাশনাল চৈত্র ১২৮৮)
১৭।	হীরার ফুল (গীতিনাট্য)	১৮৮৪, ২৩ এপ্রিল	১২৯১
১৮।	বৃষকেতু (নাটক)	১৮৮৪	(ষ্টার ২৬-৪-৮৪)
১৯।	চৈতন্যলীলা (নাটক)	১৮৮৬, ১০ আগষ্ট	? (ষ্টার ২-৮-৮৪)
২০।	বেল্লিক বাজার (প্রহসন)	১৮৮৭	(ষ্টার ২৪-১২-৮৬)
২১।	বুদ্ধদেব-চরিত (নাটক)	১৮৮৭, ২২ এপ্রিল	১৮৮৭, ২২ এপ্রিল (ষ্টার ১৯-৯-৮৫)
২২।	(সচিত্র) নল-দময়ন্তী (পৌরাণিক নাটক)	১৮৮৭, ৩০ জুলাই	১৮৮৭, ৩০ জুলাই (ষ্টার ২১-১২-৮৩)
২৩।	চন্দ্রা (উপন্যাস)	১৮৮৭, ৭ সেপ্টেম্বর	১২৯৪
২৪।	রূপ-সনাতন (নাটক)	১৮৮৮, ২৮ জানুয়ারি	? (ষ্টার ২১-৫-৮৭)
২৫।	বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (নাটক)	১৮৮৮, ২৫ অক্টোবর	? (ষ্টার ৩-৭-৮৬)
২৬।	পূর্ণচন্দ্র (নাটক)	১৮৮৮, ১ ডিসেম্বর	? (এমারেল্ড ১৭-৩-৮৮)

* পুস্তিকায় গ্রন্থকারের নাম নাই। ইহা "ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনয় জন্য শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত।"

২৭।	মেঘনাদ বধ (নাটকাকারে গঠিত)	১৮৮৯, ২ জানুয়ারি *	
২৮।	প্রফুল্ল (সামাজিক নাটক)	১৮৮৯, ২২ আগষ্ট	
২৯।	(সচিত্র) দক্ষযজ্ঞ (পৌরাণিক নাটক)	১৮৮৯	১২৯৬ (ষ্টার ২১-৭-৮৩)
৩০।	বিষাদ (নাটক)	১৮৮৯, ২০ সেপ্টেম্বর	১২৯৫ (এমারেল্ড ৬-১০-৮৮)
৩১।	হারানিধি (নাটক)	১৮৯০, ১৪ জুন	১২৯৭, ২ জ্যৈষ্ঠ
৩২।	মলিনা-বিকাশ (নাট্য-গীতি)	১৮৯১, ২২ ফেব্রুয়ারি	১২৯৭
৩৩।	মহাপূজা (রূপক)	১৮৯১, ২২ ফেব্রুয়ারি	১২৯৭, পৌষ
৩৪।	কমলে কামিনী (নাটক)	১৮৯১, ১৫ অক্টোবর	? (ষ্টার ২৯-৩-৮৪)
৩৫।	মুকুল-মুঞ্জরা (নাটক)	১৮৯৩, ফেব্রুয়ারি †	?
৩৬।	আবু হোসেন (গীতিনাট্য)	১৮৯৩, ১ জুলাই	১৩০০
৩৭।	বড়দিনের বখ্‌শিশ্‌ (পঞ্চরং)	১৮৯৪, ১৯ ফেব্রুয়ারি	ইং ১৮৯৪
৩৮।	জনা (পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)	১৮৯৪, ২৮ ফেব্রুয়ারি	১৮৯৪, ফেব্রুয়ারি
৩৯।	আলাদিন বা আশ্চর্য প্রদীপ (পঞ্চরং)	১৮৯৪, ১ মে	১৩০১ (ন্যাশনাল ৯-৪-৮১)
৪০।	স্বপ্নের ফুল (গীতিনাট্য)	১৮৯৪, ১ ডিসেম্বর	?
৪১।	সভ্যতার পাণ্ডা (বড়দিনের পঞ্চরং)	১৮৯৪, ২৪ ডিসেম্বর	১৩০১
৪২।	করমেতি বাই (দৃশ্যকাব্য)	১৮৯৫, ২০ মে	১৩০২, ২৯ বৈশাখ
৪৩।	ফণির মণি (গীতিনাট্য)	১৮৯৬, জানুয়ারি	?
৪৪।	পাঁচ ক'নে (পঞ্চরং)	১৮৯৬, ৫ জানুয়ারি	১৮৯৬, ৫ জানুয়ারি

* উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ('বসুমতী') ইহা প্রকাশ করেন। ১৯০৯ সনের ৩০ ডিসেম্বর ইহার নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়; উপেন্দ্রবাবুর অনুরোধে গিরিশচন্দ্র "আনন্দের সহিত এই নাটকখানি পুনরায় সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া এবং আরও নূতন সঙ্গীত রচনাপূর্বক ইহাকে নববেশ পরাইয়া দিয়াছেন।"

† ১২৯৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে সমালোচিত।

৪৫।	নসীরাম (নাটক)	১৮৯৬, ১৫ জুন	১৩০৩ (ষ্টার ২৩-৫-৮৮)
৪৬।	কালাপাহাড় (ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য)	১৮৯৬, ৩ অক্টোবর	১৮৯৬, ৩ অক্টোবর
৪৭।	হীরক জুবিলী (গীতিনাট্য)	১৮৯৭, ১৫ অক্টোবর	?
৪৮।	পারস্য-প্রসূন বা পারিসানা (গীতিনাট্য)	১৮৯৭	১৩০৪ (ষ্টার ১১-৯-৯৭)
৪৯।	মায়াবসান (নাটক)	১৮৯৮, ৭ ফেব্রুয়ারি	১৩০৪, ১১ পৌষ
৫০।	দেলদার (গীতিনাট্য)	১৮৯৯, ৬ জুন	১৩০৬
৫১।	ম্যাক্‌বেথ (বঙ্গানুবাদ)	১৯০০, ২ আগষ্ট	১৩০৬ (মিনার্ভা ২৮-১-৯৩)
৫২।	পাণ্ডব-গৌরব (পৌরাণিক নাটক)	১৯০০, ২৫ অক্টোবর	১৩০৬
৫৩।	মণিহরণ (গীতিনাট্য)	১৯০০, ১৫ অক্টোবর	?
৫৪।	নন্দদুলাল (পৌরাণিক গীতিনাট্য)	১৯০০, ১৫ অক্টোবর	১৩০৭
৫৫।	অশ্রু-ধারা (রূপক)	১৯০১, ৭ মে	ইং ১৯০১
৫৬।	মনের মতন (নাটক)	১৯০১, ১ জুন	১৩০৮, বৈশাখ
৫৭।	অভিশাপ (পৌরাণিক গীতিনাট্য)	১৯০১, ২৮ অক্টোবর	১৩০৮, ১২ আশ্বিন
৫৮।	শাস্তি (বুয়র-সমর-সংক্রান্ত রূপক)	১৯০২, ১৪ জুলাই	
৫৯।	ভ্রান্তি (নাটক)	১৯০২, ২৭ আগষ্ট	১৩০৯
৬০।	আয়না (সামাজিক নক্সা)	১৯০৩, ১০ মার্চ	?
৬১।	গিরিশ-গীতাবলী : ১ম ভাগ * ২য় ভাগ	১৯০৪, ২ মার্চ (ইং ১৯১৩)	
৬২।	সৎনাম (ঐতিহাসিক নাটক)†	১৯০৪, ৫ মে	১৩১১, ১৮ বৈশাখ
৬৩।	সীতারামের গীতাবলী	১৯০৪	১৩১১, ২১ আশ্বিন
৬৪।	হর-গৌরী (গীতিনাট্য)	১৯০৫, ৮ মার্চ	১৩১১, চৈত্র
৬৫।	বলিদান (সামাজিক নাটক)	১৯০৫, ৩ জুন	১৩১২
৬৬।	সিরাজদ্দৌলা (ঐতিহাসিক নাটক)	১৯০৬, ১০ জানুয়ারি	১৩১২, আশ্বিন

* ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ২য় সংস্করণের পুস্তকে অনেক অতিরিক্ত গান—যেমন, দুর্গেশ-নন্দিনীর নাট্য-রূপের—স্থান পাইয়াছে।

† সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ-প্রকাশিত 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী'র ১০ম ভাগে 'বৈষ্ণবী' নামে মুদ্রিত।

৬৭।	বাসর (গীতপ্রধান নাটক)	১৯০৬	ইং ১৯০৬
৬৮।	মীরকাসিম (ঐতিহাসিক নাটক)	১৯০৬, ৭ নবেম্বর	
৬৯।	য্যায়সা-কা-ত্যায়সা (প্রহসন)	১৯০৭, ১৬ জুলাই	১৩১৩, ২৭ পৌষ
৭০।	ছত্রপতি (শিবাজী)—(ঐতিহাসিক নাটক)	১৯০৭, ৫ সেপ্টেম্বর	১৩১৪, ১৫ ভাদ্র
৭১।	বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (জীবনী)	১৯০৮, ২৬ সেপ্টেম্বর	১৩১৫, ১০ আশ্বিন
৭২।	শাস্তি কি শান্তি ? (সামাজিক নাটক)	১৯০৮, ১৫ ডিসেম্বর	১৩১৫, ৩ পৌষ
৭৩।	শঙ্করাচার্য্য (ধর্ম্মমূলক নাটক)	১৯১০, ২৫ আগষ্ট	১৩১৬, চৈত্র
৭৪।	অশোক (ঐতিহাসিক নাটক)	১৯১১	১৩১৭, চৈত্র
৭৫।	প্রতিধ্বনি (কবিতা)	১৯১১, ৩ নবেম্বর	১৩১৮, ৪ আশ্বিন
৭৬।	তপোবল (পৌরাণিক নাটক)	১৯১১, ২৩ ডিসেম্বর	১৩১৮, ৩ পৌষ

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৭৭।	আদর্শ গৃহিণী বা গৃহলক্ষ্মী (সামাজিক নাটক)*	১৯১২, ২১ সেপ্টেম্বর	১৩১৯
৭৮।	ছটাকী†	১৯২৭, ২৭ ডিসেম্বর	১৩৩৪, ৮ পৌষ
৭৯।	দুর্গেশনন্দিনী (নাট্য-রূপ)‡	১৯৩৩, ৩ মার্চ	? (মিনার্ভা ১১-২-১৯০৬)
৮০।	সীতারাম (নাট্য-রূপ)‡	১৯৩৯, ২৭ অক্টোবর	? (মিনার্ভা ২৩-৬-১৯০০)

গিরীশ-গ্রন্থাবলী : ইং ১৮৯২-১৯০০।

গিরিশচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁহার ভ্রাতা অতুলকৃষ্ণ ঘোষ সর্বপ্রথম ৬ খণ্ডে 'গিরীশ-গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন। গিরিশচন্দ্রের অনেকগুলি নাট্যগ্রন্থ স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে

* অসমাপ্ত রচনা। পঞ্চম অঙ্কটি দেবেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক লিখিত।

† অসমাপ্ত রচনা। এই অসমাপ্ত অংশটুকু ১৩৩৩ সালের 'বার্ষিক বসুমতী'তে "বুদ্ধিমন্ত" নামে প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। পৃ. ২৯-৪৮ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক লিখিত।

‡ বসুমতী-প্রকাশিত "নাট্য-সিরিজে" ভুলক্রমে "অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক নাট্যাকারে গ্রথিত" বলিয়া প্রচারিত। এই প্রসঙ্গে ১৩৫২ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রকাশিত না হইয়া এই গ্রন্থাবলীতেই প্রথমে মুদ্রিত হয়। প্রথম অভিনয়ের তারিখসহ সেগুলির নাম দিতেছি।—

১ম ভাগ (১ মে ১৮৯২):—'ধ্রুব-চরিত্র' (২৭ শ্রাবণ ১২৯০), 'প্রভাসযজ্ঞ' (২১ বৈশাখ ১২৯২), 'প্রহ্লাদচরিত্র' (৮ অগ্রহায়ণ ১২৯১), 'নিমাইসন্ন্যাস' (১৬ মাঘ ১২৯১)।

২য় ভাগ (১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩):—'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' (১ মাঘ ১২৮৯)—পরবর্তী কালে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত। 'চণ্ড' (১১ শ্রাবণ ১২৯৭), 'শ্রীবৎসচিন্তা' (২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১)।

৪র্থ ভাগ (ইং ১৮৯৪ ?):—'সপ্তমীতে বিসর্জ্জন' (২২ আশ্বিন ১৩০০)।*

৫ম ভাগ (১৫ এপ্রিল ১৮৯৫):—'সীতার বিবাহ' (২২ ফাল্গুন ১২৮৮)।

* * *

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর, ১৯২৮-৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ১০ খণ্ডে 'গিরিশ-গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করেন। ইহাতে নবাবিষ্কৃত 'যামিনী চন্দ্রমা হীনা গোপন চুম্বন', 'মেঘনাদ বধ' (নাট্য-রূপ), 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', 'ছত্রপতি', 'ছটাকী', এবং 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'সীতারামে'র নাট্য-রূপ ভিন্ন গিরিশচন্দ্রের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত পুস্তক-প্রবন্ধাদি সকল রচনাই স্থান পাইয়াছে। এই গ্রন্থাবলীতে গিরিশচন্দ্রের যে কয়খানি নাট্যগ্রন্থ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, সেগুলি :—

১ম ভাগ :—'চোল-রাজ' (অসমাপ্ত)

৩য় ভাগ :—অপ্রকাশিত নাটক (অসম্পূর্ণ)

৮ম ভাগ :—'নিত্যানন্দ-বিলাস'

১০ম ভাগ :—'রাণা প্রতাপ' (অসম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক); 'সাধের বউ' (অসমাপ্ত সামাজিক নাটক)।

মাসিকপত্র-সম্পাদন

১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৮৯৫) গিরিশচন্দ্রের সম্পাদনায় 'সৌরভ' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে তাঁহার কয়েকটি রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল। 'সৌরভ' মাত্র তিন মাস জীবিত ছিল।

* গ্রন্থাবলীতে স্থান পাইবার পূর্বে "পূজা পঞ্চরং সপ্তমীতে বিসর্জন" দুর্গাদাস দে-সম্পাদিত 'মজ্‌লিস্' পত্রে (৩য় বর্ষ, আশ্বিন ১৩০০, পৃ. ৫০-৭৩) প্রথমে প্রকাশিত হয়। চৈতন্য লাইব্রেরিতে এই রচনার প্রতিলিপি পুস্তিকাকারে বাঁধান আছে।

দ্রষ্টব্য :—এই রচনাপঞ্জীতে উল্লিখিত পৌরাণিক নাটক 'বৃষকেতু'র মূল সংস্করণ আমি দেখি নাই ; 'বেল্লিক বাজার' ও 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' পুস্তক দুইখানি দেখিয়াছি বটে, কিন্তু মলাট বা আখ্যাপত্র না-থাকায় সেগুলিরও সঠিক প্রকাশকাল সংগ্রহ করিতে পারি নাই। 'শনিবারের চিঠি'র পাঠকবর্গের কেহ এ-বিষয়ে আলোকপাত করিলে পরম আনন্দের বিষয় হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পদচিহ্ন

(পূর্বানুবৃত্তি)

বহুকালের মজা পুকুর, বর্ষার সময় একেবারে মাঝখানে খানিকটা জল জ'মে থাকত। জলজ ঘাসে কলমি-শুষনেলতায় ভ'রে থাকত, স্থানীয় মুসলমানদের হাজী সাহেবের, তামাকওয়ালা সাহুজীর, স্বর্ণবাবুর চাপরাসী বৃদ্ধ গোবিন্দ সিংহের তিনটে দেশী ঘোড়া এসে স্বেচ্ছামত আহার এবং বিচরণ ক'রে বেড়াত। এখানকার অশ্ববাতিকগ্রস্ত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা দল বেঁধে এসে অশ্বমেধের ঘোড়া ধরার মত ঘোড়াগুলিকে ধরত এবং নির্জন প্রান্তরে ঘোড়দৌড়ের শখ মেটাত। বৃদ্ধ গোবিন্দ সিং বহুকাল বাঙালী বাবুদের ঘরে চাকরি ক'রে ভাল বাংলা তো শিখেইছিল, ইংরেজী বুলিও কিছু কিছু বলতে পারত। বৃদ্ধ বলত, "মাই হর্স ইজ ইন দি লড়িয়া পণ্ড।" মজা পুকুরটার নাম 'লড়িয়া'। এখানকার প্রবাদ, এখন যেখানে মুসলমানপাড়া, সেইখানে ছিল হিন্দুরাজার রাজধানী। একদা এখানে এলেন এক পাঠান ফকির, সঙ্গে একদল তুর্কী। তাঁরা ঘাটবন্দরের পাশে তুরুকডাঙায় তাঁবু পাড়লেন। তারপর রাজার সঙ্গে হ'ল যুদ্ধ। যুদ্ধটা হ'ল এই লড়িয়া পুকুরের ধারে। হিন্দুরাজা সবংশে ধ্বংস হলেন। অবশ্যই তার মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী আছে, গোশৃঙ্গে মশাল বেঁধে রাত্রিকালে তুর্কীদের অগ্রসর হওয়ার কথা আছে ; কিন্তু সে কথা থাক্। মোট কথা, এই পুকুরের পাশেই লড়াই হয়েছিল, তাই পুকুরটার নাম লড়িয়া। কালক্রমে লড়িয়া ম'জে এসেছিল, পুকুরটার মাঝখান দিয়ে ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের সড়ক চ'লে গিয়েছিল ; গোপীচন্দ্র লড়িয়াকে কিনে, ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে সড়কটাকে ঘুরিয়ে তৈরি ক'রে দিয়ে, কাটিয়ে সরোবর ক'রে তুলেছেন। কাটানো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আজ হঠাৎ কয়েক টুকরা ভাঙা মূর্তির সঙ্গে এক অভগ্ন বাসুদেবমূর্তি বেরিয়ে পড়েছে। শুধু মূর্তিটির এক পাশে কোদালের একটা আঘাত প'ড়ে খানিকটা অঙ্গহীন হয়েছে।

সংবাদটা পেয়ে গোপীচন্দ্র চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন প্রথমটা। প্রচলিত সংস্কারে দেবদেবী নিয়ে অনেক বিচিত্র ধারণা আছে। দেবতা চরম সৌভাগ্য নিয়ে আসেন,

আবার দুর্ভাগ্য নিয়েও আসেন। সরকারবাবুরা ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, গুড় কেনা-বেচার দালালি করতেন, স্থানীয় গন্ধবণিকদের আশ্রিত ছিলেন। এক সাধু এসে সেবায় তুষ্ট হয়ে দিয়ে গেলেন রাজরাজেশ্বর-শিলা। সরকারেরা ধনে ধান্তে রাজ্যেশ্বর হয়ে উঠলেন রাজরাজেশ্বরের প্রসাদে।

আবার দশ ক্রোশ দূরবর্তী বিখ্যাত রায়বংশ একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল এক সূর্যনারায়ণ শিলামূর্তি কুড়িয়ে এনে বাড়িতে প্রতিষ্ঠা ক'রে। পালকি চেপে যাবার পথে এক গাছতলায় প'ড়ে থাকতে দেখেন এই মূর্তিটিকে। ঠিক এই ভাবেই একটা মাঠের পুকুর থেকে পাঁক তুলতে গিয়ে চাষীরা মূর্তিটিকে পেয়েছিল। তারা কেউ ভরসা ক'রে বাড়ি নিয়ে যেতে সাহস করে নাই, ফেলে রেখেছিল গাছতলায়। রায় মূর্তিটিকে পালকিতে তুলে বাড়ি এনে প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর এক পুরুষের মধ্যেই রায়বংশ একরকম ধ্বংস হয়ে গেল। জমিদারি গেল, প্রকাণ্ড পরিবারটার কতক কলেরার আক্রমণে শেষ হ'ল, কতক গৃহত্যাগ ক'রে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

বহু দৃষ্টান্ত আছে। গোপীচন্দ্রের স্ত্রীও ভাবিত হলেন। কর্মচারীরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে নীরব হয়ে রইল। গোপীচন্দ্র হঠাৎ সব ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। কেন তাঁর দুর্ভাগ্য আসবে? অপরাধ তো তিনি কিছু করেন নাই! তিনি দেবতা প্রতিষ্ঠা করেছেন, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করছেন, দেশের জন্ত বিদ্যালয় স্থাপন করছেন; দেশের মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা দিতে আরম্ভ করেছে, রাজা—যিনি কিনা সর্বদেবতার অংশ তাঁর প্রতিভূ তাঁকে সস্নেহ দৃষ্টিতে দেখেছেন, এই অবস্থায় দেবতা এলেন। সে দেবতা কেন আনবেন দুর্ভাগ্য? তিনি আনলেন তাঁর পরিপূর্ণ সৌভাগ্য। ত্রিলোকপতি বিষ্ণু! প্রণাম! হে ত্রিলোকপতি দেবতা, তোমাকে প্রণাম!

গোপীচন্দ্র নিজে এলেন; একেবারে যেখানে মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছে, সেখানে এসে দাঁড়ালেন, দেখলেন। কর্মচারীদের বললেন, চাপরাসীদের ডাক। আশপাশ গ্রামে যত ঢাক ঢোল সানাই বাঁশি পাওয়া যায় নিয়ে আসুক। বাড়ির পূজারীদের ডাক। তোমাদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ তারা স্নান ক'রে জল নিয়ে এস। বাড়ি থেকে নতুন পিতলের কলসী নাও। আর রূপোর ঘড়ায় গঙ্গাজল আন এক ঘড়া। রাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রার যে কাঠের দোলনা আছে, নিয়ে এস। তার দু পাশে, পালকির ডাঁটের মত বাঁশ বেঁধে ফেল, ভিতরে গালিচা পেতে দাও। শিগগির কর।

ইতিমধ্যে এসে পড়ল কল-কাটা বায়েন আর জীবন বায়েন ঢাক কাঁধে নিয়ে। এই গ্রামেরই বাদ্যকর দুজন। গোপীচন্দ্র বললেন, বাজা বাজা।

ঢাক বাজতে লাগল। লোক জমতে লাগল। ইস্কুলঘরে যারা কাজ করছিল, ইটখোলায় যারা মজুর খাটছিল, তারা এসে জমল। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তায় মজুরেরা

ঝুড়ি কোদাল ফেলে দিয়ে ছুটে এল। পথিক যারা যাচ্ছিল, তারা থমকে দাঁড়াল। শঙ্খবণিকপল্লী মোদকপল্লী সাহাপল্লীর সকলে ছুটে এল। অদূরবর্তী গ্রামটার প্রান্তভাগে ঢাক বেজে উঠল, শব্দ এগিয়ে আসছে; ক্রমশ দেখা গেল ঢাকীদের সঙ্গে কালো কালো মানুষের সারি।

হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে মানুষ জ'মে গিয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ভরা দুপহর বেলা, আকাশের দিকে চাওয়া যায় না, চারিদিকে মাঠে ধুলা উড়ছে, পায়ের তলায় মাটিতে অসহনীয় উত্তাপ, কিন্তু এসব তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে মানুষের কাছে। নারী পুরুষ বালক বৃদ্ধ যুবা অদ্ভুত বিস্ময়ে ছুটে এসেছে। দু-একটা পুকুর থেকে ভাঙা মূর্তি পাওয়া যায়। কিন্তু গোপীচন্দ্রের দিঘি থেকে এমন অক্ষত মূর্তিতে দেবতা ওঠা সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। এরই মধ্যে রটনা হয়ে গিয়েছে, গোপীচন্দ্র রাজা হবেন, দেবতা তাঁকে স্বপ্ন দিয়েছিলেন, তাই তিনি এ মজা দিঘিটা কাটিয়েছেন, ইত্যাদি। গোপীচন্দ্রের নবার্জিত সম্পদের পটভূমিতে, ইস্কুল-স্থাপনের উদ্যোগে রাজপুরুষের অনুগ্রহ দেখানোর ভূমিকার পর এই দেবতার আবির্ভাব, তার সঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশখানা ঢাক বিশ-পঁচিশখানা ঢোলের বাজনার সমারোহ সমস্ত ব্যাপারটাকে অলৌকিক না হ'লেও লোকের কল্পনাতীত বিস্ময়কর ঘটনা ক'রে তুলেছে।

মুসলমানেরাও এসেছে, তারা এক পাশে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এক্ষেত্রে তাদের স্পর্শদোষ আপত্তিজনক হবে, এটা তারা জানে। এ নিয়ে তাদের মনে কোন গ্লানি অবশ্য নাই, কারণ এইটাই তাদের অনেক কালের অভ্যাস। তারাও আলোচনা করছে, গোপীচন্দ্র এবার নিশ্চিন্ত রাজা হবেন।

হাজী এবারতও এসেছে, সে বলছে, যিনি আল্লাতাল্লা তিনিই ভগবান, যিনি রাম, তিনিই রহিমের ভাই। দেবতা উঠল, সে খোদাতালার দয়া। উনিকে আর ঠেকায় কে?

রাধাকান্ত এবং বংশলোচন এসে পুকুরের গর্ভে নামলেন। স্বর্ণভূষণ আসেন নাই; পথের মধ্যেই হঠাৎ কেমন অজ্ঞান হওয়ার মত অবস্থা হয়ে পড়ল তাঁর। অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী কালাচাঁদ চন্দ্রের দোকানে তিনি ব'সে পড়েন। মুখে চোখে জল দিয়ে হাওয়া ক'রে একটু সুস্থ ক'রে কালাচাঁদই তাঁকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে।

গোপীচন্দ্র বললেন, আসুন, আসুন।

* * *

বাড়িতে ফিরে রাধাকান্ত নিজের ডায়েরি লিখলেন। তার মধ্যে গোপীচন্দ্রের সৌভাগ্য আজ পরিপূর্ণ হ'ল—এই কথাটাই বড় হয়ে উঠল। পূর্বজন্মের কর্মফল এ জন্মের ভাগ্যকে সৃষ্টি করে—এই সত্যটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠল সমস্ত কথার অন্তরালে।

মামা রয়েছেন ?

কে ?—চমকে উঠলেন রাধাকান্ত।—গোপীচন্দ্রবাবু ? ব্যস্ত হয়ে তিনি উঠে বাইরে এলেন। গোপীচন্দ্রই।

আসুন, আসুন। এমন সময়ে ? ঠাকুর এলেন ?

গোপীচন্দ্র ঈষৎ চঞ্চল হয়ে রয়েছেন। আজকের ঘটনা তাঁর ধীরতাকে নাড়া দিয়েছে। তিনি বললেন, ঠাকুর আসছেন। কিন্তু ঠাকুর নিয়ে কি করব বলুন তো ? আপনাকেই জিজ্ঞাসা করতে এলাম। আপনাকেই আমি শ্রদ্ধা করি।

রাধাকান্ত বললেন, তাই তো, এর উত্তর আমি কি দেব ?

গোপীচন্দ্র কোন উত্তর করলেন না, রাধাকান্তের মুখের দিকেই চেয়ে রইলেন।

রাধাকান্ত মাটির দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, আপনার মন কি বলছে ?

আমার মন বলছে, দেবতাকে আমি প্রতিষ্ঠা করি।

এবার হেসে রাধাকান্ত বললেন, তবে আর কি ? তাই করুন। দেবতা কাষ্ঠেও নাই, পাষাণেও নাই, মৃন্ময় মূর্তিতেও নাই, অন্তরের ভাবের মধ্যে তাঁর বাস। আপনার ভাবনায় যখন তিনি ওই পাষাণমূর্তির মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে বাইরে প্রকাশিত হতে চাচ্ছেন, তখন আর তাতে দ্বিধা কি ?

ভয় দেখাচ্ছেন অনেকে।

কথা তো অনেকের নয়, কথা আপনার।

আপনার কথাটা আমি শুনতে চাই।

আমার কথা! একটু স্তব্ধ থেকে রাধাকান্ত বললেন, আমার কথা ওই ঠাকুরটি আপনার সৌভাগ্যের ষোলকলা পরিপূর্ণ করতে এসেছেন। ওতে আপনি দ্বিধা করবেন না।

গোপীচন্দ্র চ'লে গেলেন আশ্বস্ত হয়ে, খুশি হয়ে। রাধাকান্ত আবার ডায়েরি লিখতে উদ্যত হলেন। কিন্তু বাধা পড়ল ; বাউড়ীদের সাতনের মা এবং সাতন এসে দাঁড়াল। সাতনের মা ফোঁসফোঁস ক'রে কাঁদছে। ভুরু কুঁচকে রাধাকান্ত প্রশ্ন করলেন, কি ?

সাতন জোড়হাত ক'রে বললে, আজ্ঞে বাবু, আপনার কাছে নালিশ করতে এসেছি।

সাতনের মা কেঁদে উঠল এবার সশব্দে, আর আমাদের কেউ নাই হুজুর।

চুপ, চুপ কর্।—ধমক দিয়ে উঠল সাতন। তারপর সে বললে, গড়াঞীদের চন্দ গড়াঞী আমার বুনকে—

তোর বোন ? পরী ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আজ বাবুদের পুকুরে ঠাকুর উঠেছে, দোপর-(দুপুর)-বেলায়

আমার মা, আর পরী যেছিল (যাচ্ছিল) তাই দেখতে। দেরি হয়ে গিয়েছিল একটুকুন। লোকজন পথে কেউ ছিল না। পথে গড়াঞীয়ের দুয়োরে, গড়াঞীও তখুনি ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। পথে মাকে আর পরীকে একা পেয়ে, টেনে ঘরে ঢুকিয়ে নেয়। মা কি করবে—

রাধাকান্ত বললেন, আমিই বা এর কি করব? এ নালিশের বিচার আমি করতে পারব না।

আজ্ঞে, তবে আমরা কি করব? কোথা যাব?

তোদের জমিদার তো স্বর্ণবাবু?

সাতনের মা বললে, আজ্ঞে তিনি ইয়ের (এর) বিচার করবেন না।

সাতন বললে, তিনিই আপনকার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন, ওঁর কাছে যা।

রাধাকান্ত একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, তোরা গোপীচন্দ্রবাবুর কাছারিতে যা তাঁকে গিয়ে বল্। আমি এ বিচার করতে পারব না।

সাতন, সাতনের মা চুপ ক'রে ব'সে রইল। রাধাকান্ত বললেন, আমার কাছে ব'সে থাকলে ফল হবে না বাপু। যাও। যা বললাম, তাই কর।

এবার সাতন বললে, আজ্ঞে বাবু, উনি আজ বড়নোক হয়েছেন, কিন্তক আমাদের পুরনো রাজা তো আপনারা। তা ছাড়া বাবু, গাঁয়ের বেনে-বাস্তি এবা সব উ বাবুর পেটাও (অনুগত) নোক। চন্দ গড়াঞী বাবুর বড় ছেলে কীর্ত্তিবাবুর ভারি বাধ্য।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার সে বললে, আপনকারা আমাদিগে খেতে দেন, পরতে দেন, আপনকাদের মাটিতে আমার বাস। আপনকাদের পুকুরে আমরা চান করি, জল খাই। আপনকারা না থাকলে বেনে-বাস্তিরা আমাদের নাঞ্ছনার (লাঞ্ছনার) আর বাকি রাখত না। আপনাদিগে বাদ দিয়ে উ বাবুর বাড়িতে যেতে পারব না।

রাধাকান্ত এবারও বললেন, এর বিচার আমি করতে পারব না বাপু।

সাতনের মায়ের ধৈর্য এবার ভেঙে পড়ল, সে মাটিতে বারকয়েক চাপড় মেরে সেই হাতে কপাল চাপড়ে কপালটাকে ধূলায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে, আক্ষেপের স্বরে ব'লে উঠল, তবে কি আর আমার মেয়ে উদ্ধার হবে না বাবু আপনারা থাকতে?

উদ্ধার? এখনও কি আটকে রেখেছে নাকি?

আজ্ঞে, চন্দ গড়াঞী নয় মাশায়। ঠাকুরপাড়ার পাতু হাজাম আর কোরবান শাক। চন্দ গড়াঞী যখন জবরদস্তি ক'রে ঘরে বন্ধ করলে পরীকে, তখন মাশায়, ওরা দুজনে আবগারী দোকান থেকে আফিং কিনে ফিরছিল। ওরা দেখেছিল ব্যাপার-স্যাপার।

চন্দ্র গড়াঞী পরীকে মুক্তি দেবার জন্ত গৃহদ্বার উন্মুক্ত করবামাত্র তারা এসে উপস্থিত হয়, কলুষ ঘটনার ভয় দেখিয়ে বীভৎস উল্লাসে চীৎকার করতে থাকে। বলে, চীৎকার

ক'রে লোক জমায়েৎ ক'রে চন্দ্র এবং পরী ছুজনকেই টেনে নিয়ে যাবে ওই শিবির চারিপাশে সমবেত জনতার সম্মুখে। অবশেষে চন্দ্র একটি টাকা দিয়ে নিষ্কৃতি পায়, এবং পরীকে সম্মত হতে হয় দেহদানে।

সাতনের মা কেঁদে উঠল এবার, বললে, বাবু মাশায়, সেই নিয়ে গিয়েছে মেয়েকে, এখনও সে আমার ফিরল না।

রাধাকান্ত অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বাসুদেব দেবমূর্তিটির এই আকস্মিক উত্থানে তাঁর মন এক পবিত্র ভাবলোকে বিচরণ করছিল। তাকে বার বার রূঢ় কদর্য আঘাত ক'রে এই অশ্লীল পাপকাহিনীর বর্ণনা তিনি আর শুনতে পারছিলেন না। এই হতভাগ্য অস্পৃশ্য জাতিগুলার জীবনে এ প্রায় নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রতি বৎসরই এমন দু-চারটে ঘটনা ঘটে। অন্তরালে কত ঘটে, সে হিসাব এক ভগবান জানেন। প্রকাশ্যে দু-চারটে যা ঘটে, তাতে শোনা যায়, কোন বাবুর কোন মুসলমান চাপরাসী এদের কোন মেয়েকে নিয়ে চ'লে গিয়েছে। কাটাকাপড়-ফিরিওয়ালারা আসে, দু-এক বৎসর অন্তর তারাও নিয়ে যায় একটা দুটো। স্থানীয় মুসলমানপাড়ার ছোকরাদের সঙ্গেও এদের প্রণয়ের কথা শোনা যায়। চ'লেও যায় দু-একটা মেয়ে। পরীকে আজ তারা ভয় দেখিয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়েছে এইমাত্র ব্যতিক্রম। এর আর তিনি কি করবেন? একটু চিন্তা ক'রে রাধাকান্ত বললেন, এক কাজ কর্। শেখপাড়ায় হাজীকে বল্ গিয়ে সব কথা। আমার নাম করিস। বুঝলি? হাজীসাহেব বার ক'রে দেবে মেয়ে। না হয়, আমার লোককে সঙ্গে নিয়ে যা।

আজ্ঞে বাবু, চন্দ গড়াঞীয়ের তা হ'লে সাজা হবে না?

চন্দ্র গড়াঞী, চন্দ্র গড়াঞী! যত আক্রোশ এদের ওই গড়াঞী-সাহা-গন্ধবণিকদের উপর। আশ্চর্য। গড়াঞী-বণিকদের বিরোধিতা স্বর্ণ তিলি প্রমুখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে। বণিকরা আশ্রয় করছে গোপীচন্দ্রকে। এই হতভাগ্যেরা আশ্রয় চাচ্ছে তাঁদের। গোপীচন্দ্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব চলছে, স্বর্ণ শ্যামাকান্ত বংশলোচন,—শুধু তাঁরাই বা কেন, তিনিও তো রয়েছেন তাঁদের মধ্যে। হ্যাঁ, রয়েছেন। সে সত্য তিনি অস্বীকার করতে পারেন না।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হ'ল, 'পিঠোপিঠি' চার ভায়ের সংসারের দ্বন্দ্ব। বড়র সঙ্গে ঝগড়া মেজোর, মেজোর সঙ্গে সেজোর দ্বন্দ্ব; সেজোতে বড়তে দ্বন্দ্ব নাই; সেজোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব ছোটর; ছোটর সঙ্গে সদ্ভাব মেজোর। বড় ভাই অনেক বড়, তাই ছোটর সঙ্গে তার বিরোধ না থাকলেও ছোট তার কাছে ঘেঁষে না। বড় ভাই সংসারের সেরা জিনিস খায় মাখে পরে, মাছের মুড়ো তারই পাতে পড়ে; মেজো ভাই ঈর্ষা করে, ঘৃণায় উচ্ছিষ্ট খায় না, দয়া ক'রে ভেঙে খানিকটা দিতে গেলেও তা গ্রহণ করে না; সেজো ভাই

সানন্দে ব'সে যায় বড়র পাতে ; ছোটর হাত থেকেও কেড়ে খায় তার ভাগের সামগ্রী দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ; ছোট মেজোর আশ্রয় নেয়, বড় সেজোকে স্নেহ করে ব'লে সে বড়র কাছ ঘেঁষে না। মেজো তাকে উচ্ছিষ্ট দেয়, ছোট তাতেই কৃতজ্ঞ। রামের সঙ্গে লক্ষ্মণের একাত্মতা, ভরতের সঙ্গে শত্রুঘ্নের, রামায়ণে রামে ভরতে, লক্ষ্মণে শত্রুঘ্নে বিরোধ নাই এ কথা সত্য, কিন্তু রামের সঙ্গে ভরতের প্রেম, রাম-লক্ষ্মণের প্রেমের চেয়ে গাঢ় নয়। সংসারের এই বোধ হয় নিয়ম।

সাতন আবার বললে, বাবু!

রাধাকান্ত বললেন, চন্দ্রকে সাজা দিতে হ'লে থানায় যাও, ডায়রি কর, কেস কর। তুমিই বলছ, কীর্তিচন্দ্রের 'পেটাও' লোক চন্দ্র গড়াঞী। আমি লোক পাঠালে সে যদি কীর্তিবাবুর আশকারায় না আসে, না মানে আমাকে ?

তবু তারা গেল না। এবার রাধাকান্ত ধমক দিয়ে উঠলেন, যাও, যাও তোমরা এখান থেকে।

চমকে উঠল সাতন এবং সাতনের মা। আর তাদের থাকতে সাহস হ'ল না। ধীরে ধীরে চ'লে গেল তারা। রাধাকান্ত আবার ডায়েরি লিখতে বসলেন।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহন রায়ের একটি অপ্রকাশিত দলিল

(পূর্বানুবৃত্তি)

৪

And this defendant further answering saith that the said Talook of Nangoorparah was purchased by one Juggomohun Mozendar for and on account of this defendant and out of the monies of this defendant in the Bengal year One thousand two hundred and ten from Manickram Dutt and others and that the said Talook of Beerlook was sometime in the Bengal year One thousand two hundred and fifteen and that the said Talook called Kissonagar was sometime in the Bengal year One thousand two hundred and sixteen respectively purchased by the said Rajiblochun Roy for and on account of this defendant And this defendant further answering denies that the said Juggomohun Roy and this defendant laid out considerable or any sums of money belonging to any joint funds as in the Complainants Bill is untruly alleged either in making into a garden a certain piece of ground which belonged to any joint estate situate at Rogoonauthpore in the Pergunnah Jahanabad and

Zillah of Burdwan aforesaid or in the constructing of a certain house thereon for this defendant positively saith therewhere no joint funds or joint estate in which this defendant and the said Juggomohun Roy were interested after the partition hereinbeforementioned but this defendant further answering saith that he this defendant at various times by his said agent Juggernauth Mozendar did pay lay out and expend various sums of money out of the funds which exclusively belonged to this defendant in making into a garden a certain piece of ground at Rogoonauthpore aforesaid which was the sole and separate property of this defendant and also in building and constructing of a certain house in the last mentioned piece of ground so being separate property of this defendant at Ragoonauthpore aforesaid But this defendant further answering saith that the said last mentioned house was not begun to be built until after the death of the said Juggomohun Roy And this defendant further answering denies that the said Juggomohun Roy and this defendant purchased several pieces or parcels or any piece or parcel of rent free or Barmutter ground situate at Kissenagore and in the said pargunnah Jahanabad in the Zillah of Burdwan aforesaid containing about three hundred Biggahs or any other quantity and of the value of Sicca Rupees Six thousand or of any other value And this defendant further answering denies that the said Juggomohun Roy and this defendant purchased a certain other Putteney Talook called Serampore in purgunnah Boorsut in the Zillah of Burdwan aforesaid of the value of Sicca Rupees Five thousand or thereabouts or of any other value and this defendant further answering saith as the truth is that the said Juggomohun Roy had not at any time any interest whatsoever in the last mentioned Talook and that the same was purchased by the said Juggernauth Mozendar in his own name but with the proper money and for and on the account of this defendant exclusively from one Ramdhun Chatterjee for the price or sum of Sicca Rupees Seven hundred and twenty five and this defendant further answering saith that this defendant either separately or jointly did not at any time purchase any Bremuttar ground whatsoever and that this defendant hath not at any time heretofore been possessed of or entitled to any Bremuttar ground except that which was allotted to him this defendant by his father in and by the aforesaid instrument of partition And this defendant further answering denies that the said Juggomohun Roy and this defendant in the lifetime of the said Juggomohun Roy were seized and possessed to them and their heirs for ever as tenants in Common according to the Laws and usages of the Hindoos or otherwise of and in the several lands Talooks and premises which in and by the Complainants said Bill are untruly alleged to have been

purchased by the said Juggomohun Roy and this defendant out of their joint funds or that the said Juggomohun Roy and this defendant were seized and possessed of the said two several Talooks called Govindpore and Rammissorpore in the Zillah of Burdwan aforesaid also untruly alleged to have been purchased during the lifetime of the said Ramcaunt Roy out of joint funds and this defendant further answering denies that the said Juggomohun Roy in his lifetime at any period subsequent to the said partition was jointly entitled with this defendant to or had any common interest with this defendant in any lands Talooks or premises whatsoever except the Common interest which the said Juggomohun Roy and this defendant continued to have in virtue of the said partition in the aforsaid house at Nangoorparah to the joint possession of which they were entitled but which they did not in fact jointly possess otherwise than as is hereinbefore in that behalf mentioned and this defendant further answering saith that the said Juggomohrn Roy during his lifetime continued to manage for his own sole and separate use such part of the estate which formerly was of the said Ramcaunt Roy as he was by the said instrument of partition entitled unto and also such other estate asd property as the said Juggomohun Roy afterwards gained or acquired by his own separate exertions and dealings and that he the said Juggomohun Roy during his lifetime after the said partition on his own private and separate account and without any connection or communication with this defendant purchased and paid for certain lands which he afterwards held and enjoyed in his own name and for his own benefit and under his own exclusive authority and control in which last mentioned lands this defendant was not at any time or in any manner interested

ক্রমশ

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

কি আশ্চর্য! লোকটা কয়েক সেকেণ্ড সেই রকম কটমট দৃষ্টিতে পরিতোষের দিকে চেয়ে থেকে বললে, আচ্ছা দেখে নেব।

তারপর কোমরে সেই ছোরা-গোঁজা অবস্থাতেই নিজের বিছানায় গিয়ে দড়াম করে শুয়ে পড়ল।

কাপুরুষদের হালচাল সর্বত্রই এক রকম।

বড়ে ভাই শুয়ে পড়তেই আয়নাটা দেওয়ালের গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে আমি পরিতোষের পাশে এসে বসলুম। দেখলুম, লোকটা বার পাঁচ সাত পাশ-বালিশ

জড়িয়ে এপাশ ওপাশ ক'রেই একবার চিত হয়ে স্থির হয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল দেখে আমরা আমাদের বিছানার চাদরটা টেনে-টুনে ঠিক ক'রে পেতে শুয়ে পড়বার আগে দুজনে দুটো বিড়ি ধরিয়ে টানতে আরম্ভ করলুম।

বিড়ি টানছি আর ফিসফিস ক'রে কথা বলছি। পরিতোষ বলতে লাগল, এই মালকে নিয়ে রাত কাটানোর চেয়ে আবার সরাইয়ে ফিরে যাই চল্। বাবা, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

আমি বললুম, কাল দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা ক'রে যা করবার করা যাবে।

পরিতোষ বললে, আমি বিশুদাকে বলব।

আমাদের কথাবার্তা চলছে, এমন সময় বড়কর্তা ঘুমের ঘোরেই চীৎকার ক'রে উঠল, মারুঙ্গা শালেকো বিছুয়া—একদম জান্‌সে মার দুঙ্গা।

চমকে উঠে একটু দূরে স'রে গেলুম। তারপর ছুরি মারব, কাটারি মারব, জ্যান্ত পুঁতে ফেলব প্রভৃতি ভয়ানক ব্যঞ্জনাপূর্ণ হুঙ্কার চলল প্রায় ঘণ্টা দুয়েক। আমরা তো কাঠ হয়ে দেওয়াল ঘেঁষে ব'সে রইলুম।

চীৎকার থেমে গেলে কোনও আওয়াজ না ক'রে সন্তর্পণে লেপ চাপা দিয়ে শুয়ে পড়া গেল। কিন্তু আধ ঘণ্টা যেতে না যেতে বড়কর্তার নাকডাকা শুরু হ'ল। বাপ্ রে! সে কি আওয়াজ! বিছুয়া মারুঙ্গা, জিন্দা গাড় দুঙ্গা প্রভৃতি গর্জন তার কাছে কিছুই নয় বললেই চলে। তাও যদি একটানা নাকডাকা হয় তো সে কোন রকমে সহ্য করা চলে। এ যেন থেকে-থেকে মনে হতে লাগল কে যেন তার গলাটা টিপে দম বন্ধ ক'রে মারছে। এ শ্রেণীর বিপদে এর আগে কখনও পড়ি-নি। ঠায় জেগে ব'সে থাকতে-থাকতে স্রেফ ক্লান্তিতে শেষ রাত্রের দিকে এক সময় কখন ঘুমিয়ে পড়লুম।

ভোর হতে না হতে অন্য দিনের মতন দিদিমণি ঘরের মধ্যে এসে চেঁচামেচি জুড়ে দিলে, কি রে, এখনও ঘুমুচ্ছিস্, ওঠ্, ওঠ্।

সারারাত জেগে মাথা তখনও অসম্ভব ভারী বোধ হচ্ছিল, তবুও দিদিমণির আওয়াজ পেয়ে উঠে বসলুম। দিদিমণি আমাদের বিছানার কাছে এসে বললে, কি রে, এখনও শুয়ে! শরীর ভাল তো?

তারপরে আমাদের লেপের এক ধারটা তুলে বিছানায় বসতে গিয়েই বললে, এ কিসের দাগ রে! এত রক্ত এল কোথা থেকে?

বড় কর্তা কোন্ ভোরে উঠে চ'লে গিয়েছিল, তা আমরা জানতেও পারি নি।

আমরা প্রথমটা কোন কথাই বলতে পারলুম না। দিদিমণি আবার বললে, এ তো রক্তেরই দাগ দেখছি!

পরিতোষ চুপ ক'রে রইল। আমি গত রাত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত আস্তে আস্তে তাকে খুলে বললুম। সে ইতিহাস শুনতে শুনতে দিদিমণির মুখখানা লাল হয়ে উঠল। বোধ হয় মিনিট পাঁচেক চুপ ক'রে থেকে সে বললে, ললিত ও সুদনের পেছনেও ও ওই রকম ক'রে লাগত।

আমরা আর কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে রইলুম। দিদিমণি আমাদের বিছানায় না ব'সে একটু দূরে মেঝের ওপরেই ব'সে পড়ল।

সব চুপচাপ। বাইরের ছাতে কুয়াশা ও সূর্যকিরণের জাল-বোনা চলেছে, সেই দিকে চেয়ে আছি—চোখ দেখছে এক, মন ভাবছে আর। এমন সময় চমক ভাঙিয়ে দিয়ে দিদিমণি অতি করুণস্বরে বললে, আমাকে একবার খবর দিতে পারলি নে?

বললুম, ঘর থেকে বেরুতেই পারলুম না।

দিদিমণি ম্লানমুখে আরও কিছুক্ষণ ব'সে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর চীৎকার ক'রে ডাকতে আরম্ভ করলে, শঙ্কর, ভরত, আহিয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি!

দেখতে দেখতে বাড়িসুদ্ধ ঝি, চাকর, ঠাকুর, পাহারাদার, এমন কি গরুর চাকরেরাও পর্যন্ত এসে দাঁড়াল। দিদিমণি পাগলের মত হিন্দী, উর্দুতে কি সব বলতে লাগল তাদের। তারপরে ছুটতে ছুটতে বিশুদার ঘরে গিয়ে চেঁচাতে আরম্ভ ক'রে দিলে, তার কিছু বুঝলুম, কিন্তু অনেক কথাই বুঝতে পারলুম না। একটা কথা বার বার শুনতে পেলুম, আজ বাবুজী আসুন!

চাকরবাকর সব সন্ত্রস্ত হয়ে চারিদিকে দৌড়ঝাঁপ করতে লাগল, আর আমরা দুটিতে সেই রক্তাক্ত বিছানায় ব'সে ব'সে দুধ আর জিলিপির অপেক্ষা করতে লাগলুম।

ওদিকে রোদ উঠে গেল। ব'সে ব'সে দেখছি, চাকরেরা ছাতের ওপর দিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে, কোথায় বা দুধ আর কোথায় বা গরম জিলিপি!

অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে কিছুই এল না দেখে বিশুদার ছাতে গিয়ে উপস্থিত হওয়া গেল।

আমাদের দেখে বিশুদা বললে, শুনলুম, কাল রাতে আমার বড় ভাইটা এসে খুব হাঙ্গামা মাচিয়েছিল। দিদিমণি তো ক্ষেপে আগুন হয়ে গিয়েছে, সকাল-বেলা এসে আমাকে খুব গালিগালাজ ক'রে গেল।

বিশুদার আড্ডায় লোকসমাগম হতে আরম্ভ হ'ল। সেই বিড়ির শ্রাদ্ধ আর ছোটে সাহেব—ছোটে সাহেব।

সেদিন লক্ষ্য করলুম, বিশুদার অনেক বন্ধুর সঙ্গেই পরিতোষের বেশ ভাব জমেছে। এই কদিনের মধ্যে সে-ও হিন্দী উর্দু বলতে আরম্ভ করেছে। তার উর্দু বলবার ভঙ্গী শুনে আমার হিংসে হতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে আমাদের দুজনের জন্যে দু কাপ চা নিয়ে আহিয়া এসে হাজির হ'ল। চা-পান হওয়া মাত্র আহিয়া বললে, তোমায় ভেতরে ডাকছে।

আহিয়া চ'লে গেল। বিশুদা আমাকে বললে, দিদিমণিকে তোমাদের আলাদা ঘর ক'রে দিতে বলবে। নইলে আমার বড় ভাইটা সুবিধের লোক নয়। নেশার ঝোঁকে হয়তো সত্যি সত্যিই কোন্ দিন বিছুয়া মেরে দেবে। নেশাখোরকে বিশ্বাস নেই।

জিজ্ঞাসা করলুম, বড়দা কি নেশা করেন?

বিশুদা সেলাই থামিয়ে মুখ তুলে বললে, জিজ্ঞাসা কর যে, কি নেশা করেন না! ভোরবেলা থেকে ঠার্রা (দিশী মদ) তো লেগেই আছে। তার ওপরে গাঁজা, আফিম, চরস ও কোকেন তো রোজ চাই। তা ছাড়া বাবুজীর দাওয়া-খানায় আরও কত রকমের নেশার জিনিস আছে, তার সব নাম আমার জানা নেই। ও একটা ভয়ানক লোক, সাঁপের বিষ পেলে চেটে নিতে পারে—

আমাদের কথাবার্তা চলছে, এমন সময় আহিয়া আবার এসে বললে, তোমাদের দুজনকেই ভেতরে ডাকছে।

বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখলুম, দিদিমণির ঘরের সঙ্গে একেবারে লাগা এক-খানা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর থেকে মালপত্র বের ক'রে সেটা ধোয়া পোঁছা হয়েছে। ভরত, শঙ্কর ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। দিদিমণি গাছকোমর বেঁধে এক ধারে দাঁড়িয়ে হুকুম চালাচ্ছে।

ইতিমধ্যে দুখানা খাট পেতে তার ওপরে বিছানা পাতা হয়েছে। একটা

নতুন 'ডিট্‌মারে'র দেওয়ালগিরি ও একখানা বড় চৌকোণা আয়না দেওয়ালে টাঙানো হয়েছে। এক ধারে একটা বেঁটে সুদৃশ্য দেরাজ। দিদিমণি দেরাজটা দেখিয়ে বললে, এর মধ্যে তোমরা কাপড়-চোপড় রাখবে। তারপর বললে, কেমন, ঘর পছন্দ হয়েছে ?

বললুম, চমৎকার ঘর।

দিদিমণি ভরত ও শঙ্করকে বললে, মেঝেতে একটা নতুন দরি পেতে দাও।

তারপরে আমার হাত ধ'রে পরিতোষকে বললে, আয় আমার ঘরে।

নিজের ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে দিদিমণি একটা বড় আলমারি খুললে। দেখলুম, আলমারির মধ্যে থাকে থাকে বোধ হয় পঞ্চাশটা হাতবাক্স সাজানো রয়েছে। দিদিমণি বললে, দেখ্, এগুলোর মধ্যে সব গয়না আছে। আমাদের বাবার ঠাকুরমা থেকে আমার পর্যন্ত এই চার পুরুষের গয়না। দু-তিন মাস অন্তর এই বাক্সগুলো খুলে আমি দেখি, সব ঠিক আছে, না খোয়া গেছে। আজ দুপুর-বেলা আর ঘুমোনো হবে না—এগুলো সব দেখতে হবে। এই কথা বলবার জন্যে ডেকেছি তোদের। দুপুরবেলা না ঘুমিয়ে সোজা চ'লে আসবি এই ঘরে, কারুকে কিছু বলিস নে যেন।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে দিদিমণির ঘরে গিয়ে ঢুকলুম আর প্রায় গুটি পঞ্চাশেক বাক্সের গয়না মিলিয়ে হিসাব ক'রে যখন তোলা হ'ল, তখন বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। সে বোধ হয় তখনকার দিনের হিসেবে প্রায় লক্ষ টাকা দামের গয়না। প্রত্যেকটি হার, বাজু, জশম, রতনচূড় ও কানবালার বিচিত্র ইতিহাস! এক-একটি গয়না এক-একটি ছোট গল্প, আমি অতি অলস তাই সেসব কাহিনীর রূপ দিতে পারলুম না, না হ'লে সেই গয়নার বাক্সগুলোর ওপরেই একটা বড় সাহিত্য রচিত হতে পারত। অতীত দিনের কত হাসি ও অশ্রু যে সেগুলোর সঙ্গে জড়িত, সেদিন হাল্‌কা হাসির সঙ্গে যে রূপকথা শুনেছিলুম, তার কিছু মনে পড়ছে, কিছু পড়ছে না। পরিতোষও বেঁচে নেই যে, তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠক-পাঠিকার মনোরঞ্জন করতে পারি। একটা কাহিনীর কথা আজও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে, সেই কথাই উল্লেখ করছি।

একটা ছোট হাত-বাক্স থেকে একটা হার বের ক'রে দিদিমণি দাঁড়িয়ে উঠে হারছড়া নিজের গলায় ঝুলিয়ে দিলে। দেখলুম, হারগাছা একেবারে তার পা

অবধি লুটিয়ে পড়ল। দিদিমণি ব'সে গলা থেকে হারটা খুলে আমাকে বললে, এটা কতদিনের পুরোনো বলতে পারিস?

গয়না সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত অজ্ঞ ছিলুম, আজও সে অজ্ঞতা কেটেছে এমন কথা বলতে পারি নে। আমার মার কানের ডিম থেকে ডগা অবধি প্রতি কানে পাঁচটা ক'রে ফুটো ছিল, কিন্তু একটা ফুটোতেও কখনও দুল, মাকড়ি কিংবা টাপ কোন দিন দেখি নি, তার কারণ তাঁর জোটে নি। দু হাতে চারগাছা ক'রে চুড়ি আর এক হাতে একটা এক পয়সা দামের লোহা, এই ছিল তাঁর অলঙ্কার। আমরা লায়েক হয়ে মার লোহা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলুম। দু-তিনগাছা হার তৈরি করিয়েছিলেন, কিন্তু তা পরত মেয়েরা। আমার অন্য মা (পিসীমা) ছিলেন বিধবা, তাই গয়নার বালাই তাঁর অঙ্গে ছিল না। আমার বড়দির স্বামী সে যুগে নশো টাকা মাইনে পেতেন, যার দাম আজকের দিনে অন্তত পাঁচ হাজার টাকা। দিদির অঙ্গেও চারগাছা ক'রে চুড়ি, দুগাছা অমৃতি পাকের বালা, গলায় একটা চিক্‌চিকে সরু হার, কানে দুটো টাপ, আর বাঁধানো লোহা, আজকের দিনে সোনার দাম পাঁচ গুণ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও অতি গরিব ঘরেও যা তুচ্ছ ব'লে বিবেচিত হয়, তা ছাড়া আর কোনও গয়না তাঁর অঙ্গে দেখি নি। আমাকে গয়না সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করা বৃথা। সেই হারগাছার রং মলিন হয়ে গেলেও বুঝতে পারলুম, সেটা সোনার বটে, কারণ সোনা ছাড়া যে ভদ্রলোকের মেয়ের গয়না হয় না, সে জ্ঞান ছিল টন্‌টনে।

হারগাছা আমার হাতে দিয়ে দিদিমণি বললে, ওজনটা দেখ্‌।

আমার মনে হ'ল, সেটা প্রায় আধ সের ভারী হবে। কিন্তু দিদিমণি বললে, আধ সেরের চেয়েও বেশি। এটার ওজন পঞ্চাশ ভরিরও কিছু বেশি হবে।

দিদিমণি বলতে লাগল, এই হারগাছা আমার ছোট্‌ঠাকুমার অর্থাৎ বাবুজীর ছোট কাকীর। বাবুজীর ঠাকুরদাদা নিমকির দেওয়ানি, কমিসারিয়েটে চাকরি ও নানা রকম ব্যবসা ক'রে অনেক টাকা রোজগার ক'রে পশ্চিমে বড় জমিদারি করেছিলেন। অবিশ্যি তাঁর বাবাই প্রথমে পশ্চিমে আসেন, ইংরেজ তখনও এ দেশের রাজা হয় নি।

বাবুজীর ঠাকুরদা চারটে নাবালক ছেলে রেখে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর

বয়সেই মারা যান। আমাদের বড়মার বয়স বোধ হয় তখন ত্রিশ হবে। সেই থেকে তিনি নিজের হাতে বিস্তর সম্পত্তি নিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে জমিদারি চালাতে লাগলেন। ছেলেরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একে একে তাদের বিয়ে দিয়ে বউ আনলেন। কিন্তু ছোট ছেলের বিয়ে আর দিতে পারেন না। সবার ছোট হওয়ার ফলে আদর পেয়েছিলেন তিনি বেশি। তাই দাদাদের ও মায়ের আদরে তাঁর দেহ যেমন বাড়ল, বিদ্যে-বুদ্ধি সেই অনুপাতে কিছুই হ'ল না। অনেক ঘটক ঘটকী লোকজন লাগানোর পর বাংলা দেশের এক ব্রাহ্মণের ঘরে ছোট্ঠাকুরদার বিয়ের ঠিক হ'ল। কুলীন তাঁরা, মেয়ের বয়েস প্রায় সতেরো, অতি গরিব, তাই পশ্চিমের বড়লোকের মুখ্যু ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন তাঁরা।

আমার বড়মা সব ছেলেদেরই পাঠিয়ে দিলেন সেখানে, ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে একেবারে বউ নিয়ে যেন চ'লে আসে।

তখনকার দিনে নৌকো ও গাড়ি চ'ড়ে যাতায়াত করতে হ'ত। সেখানে পৌঁছতে প্রায় দু মাস সময় লাগত।

ছোট্ঠাকুমার বাপেরা উচ্চ ও পণ্ডিতের বংশ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গতি ছিল অল্প। তার ওপরে ভদ্রলোক চার-পাঁচটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে এমনিতেই কাত হয়ে পড়েছিলেন। ওদিকে বড়লোকের বাড়িতে মেয়ের সম্বন্ধ হয়েছে। সে বাড়ির গিন্নীর কড়া মেজাজ ও খাণ্ডারবানীত্বের কিছু কিছু সংবাদও তাঁরা শুনতে না পেয়েছিলেন তা নয়। এদিকে কোনও সঙ্গতি নেই, তার ওপরে এর পরেও আর একটি মেয়ে, যদিও সে তখনও নেহাৎ শিশু। ভাবনা-চিন্তায় ভদ্রলোক একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেলেন।

তাঁরা ছিলেন শাক্ত। পুরুষানুক্রমে বাড়িতে সাড়ে তিন হাত উঁচু অষ্টধাতুর এক কালীমূর্তি পূজিতা হতেন। আর কোন উপায় না দেখে তিনি গৃহবিগ্রহের পায়ের ওপর প'ড়ে বললেন, মাগো! বংশপরম্পরা ধ'রে আমরা তোর সেবা ক'রে আসছি, কখনও তোর কাছে কোনও ভিক্ষে চাই নি। এবার আমায় উদ্ধার কর্, নইলে তোর পায়ের তলায় প'ড়ে না খেয়ে মরব।

সেই রাত্রে মা তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, দেখ্, আমার গলায় যে লম্বা হারগাছা আছে, সেইটে ভাঙিয়ে মনোজবার গয়না গড়িয়ে দে। আমার ছোট্ঠাকমার নাম ছিল মনোজবা।

বিয়ের দিন ভদ্রলোক আমার বড়ঠাকুরদা অর্থাৎ আমার বাবার বাবার হাতে এই হারছড়া দিয়ে বললেন, আমার আর সঙ্গতি নেই; আপনারা বড়লোক, যদি ইচ্ছে হয় তো ভাদ্রবউকে এইটি ভেঙে গয়না গড়িয়ে দেবেন, নয়তো নিজেদের গৃহবিগ্রহের গলায় ঝুলিয়ে দেবেন।

আমার ঠাকুরদা ছিলেন ভাল লোক আর ছোট্‌ঠাকুমা ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। মেয়ে দেখে তাঁরা আর কোনও আপত্তি না ক'রে ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে বউ ও তার সঙ্গে এই হারগাছা নিয়ে বাড়ি চ'লে এলেন।

আগেই বলেছি, বড়মার ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ ও বচন ছিল অতি কঠিন। বউরা শাশুড়ীর ভয়ে একেবারে তটস্থ থাকতেন। ছোট্‌ঠাকুমা বাড়িতে পা দিতে না দিতে তাঁর বাপের বাড়ির দারিদ্র্য উল্লেখ ক'রে খোঁটা দিতে শুরু করলেন। অথচ আমরা মায়ের কাছে শুনেছি যে, আমাদের বড়মার বাপেরা এত গরিব ছিল যে, তাঁকে টাকা দিয়ে কিনে আনতে হয়েছিল, সেই ছোটলোকের ঘরের মেয়ে নিয়ে আসার ফলে আমাদের এতবড় বংশ লোপ হয়ে গেল।

যা হোক, ছোট্‌ঠাকুমা ছিলেন খাস বাংলা দেশের মেয়ে। মাস কয়েকের ভেতরেই তিনি বাড়ির বউদের মধ্যে এমন একটা স্বাধীনতার আবহাওয়া এনে ফেললেন যে, তারা শাশুড়ীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটু আধটু প্রতিবাদ করতে শুরু ক'রে দিলে।

আমাদের ছোট্‌ঠাকুরদা ছিলেন অতিশয় ভীরুপ্রকৃতির লোক। তিনি না পারতেন মার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে, না পেরে উঠতেন স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে।

শেষকালে কোন উপায় না দেখে সে বেচারী প্রাণের দায়ে আত্মরক্ষার জন্যে এক সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে গেরুয়া বসন প'রে বাড়ির এক কোণে নিরালা একখানা ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলে। এজন্য বড়মা ছোট্‌ঠাকুমার ওপর আরও চ'টে গেল। দিনরাত ঝগড়াঝাঁটি, বাড়ি একেবারে অশান্তির আগার হয়ে উঠল। সারাদিন ধ'রে বাড়ির গিন্নী ছোট বউয়ের নামে ছেলেদের কাছে নালিশ করেন, ওদিকে সারারাত ধ'রে বউয়েরা নিজেদের স্বামীর কাছে বলতে থাকে, ছোট যা করে ঠিকই করে। অন্য বউ হ'লে তোমাদের মাকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিত। বিষয় তোমাদের, তোমার মায়ের নয়। মাঝে থেকে স্বামীদের জীবন হয়ে উঠল অতিষ্ঠ।

ছোট্‌ঠাকুরদার সঙ্গে কারুর সম্পর্ক নেই। তিনি দিনরাত নিজের ঘরে জপতপ করেন, কিন্তু ছোট্‌ঠাকুমার কাছে তাঁর ওসব বুজরুগি চলত না। তিনি স্বামীকে বলতেন, ওসব ভণ্ডামো তোমার মায়ের সঙ্গে চালিও, সন্ন্যেসী হবার ইচ্ছে ছিল তো বিয়ে করেছিলে কেন?

ছোট্‌ঠাকুমা রোজ রাত্রি দশটার সময় জোর ক'রে ছোটঠাকুরদার ঘরে ঢুকে কোন দিন মাঝরাত্রে আর কোনদিন বা সারারাত্রি ধ'রে তাঁর স্বর্গে যাবার পথ পরিষ্কার ক'রে তবে বেরুতেন।

এই রকম দশ-পনেরো বছর চলবার পর একবার ছোট্‌ঠাকুমার বাপের বাড়ি থেকে দুখানা চিঠি এল—একখানা তাঁর নামে আর একখানা বড়মার নামে। তাঁরা লিখেছেন, ছোট বোনের বিয়ে, যদি আসতে পার তো সুখী হব। তুমি বড় ঘরের বউ হয়েছ, এর চেয়ে বেশি অনুরোধ করা আমাদের শোভা পায় না।

ছোট্‌ঠাকুমা বললেন, বাপের বাড়ি যাব।

বড়মা বললেন, বাপের বাড়ি থেকে চিঠি এলেই কি সেখানে যেতে হবে নাকি? অত আবদার চলবে না।

ছোট্‌ঠাকুমা কোন কথা না ব'লে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

বড়মা বললেন, মরুকৃগে, আমি ছেলের আবার বিয়ে দেব।

ছোট্‌ঠাকুমা সেই যে গিয়ে বিছানায় শুলেন, সাত দিন না খাওয়া না, কিছু।

আমার ছোট্‌ঠাকুরদা উদাসীন। স্ত্রী খেলে কি না-খেলে সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। প্রতিদিন নিজের খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে গিয়ে যথারীতি দরজা দিতে লাগলেন, একবার স্ত্রীর ঘরে উঁকি মেরেও দেখেন না, লোকটা ম'রে গেল কি না!

আমার নিজের ঠাকুরদার নাম ছিল সদাশিব, চরিত্রেও ছিলেন তিনি সদাশিব। বাড়ির ছোট বউ না খেয়ে শুকিয়ে মরছে, বাড়িসুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ মিলে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন লোক সকলেই উদাসীন, শুধু মেজো ঠাকুরদার দুই ছেলে দিনরাত ছোট কাকীর মাথার দু পাশে ব'সে হাওয়া করছে আর কাঁদছে। আর কেউ সেদিকে উঁকি মেরেও দেখে না। বাড়ির গিন্নী তো গৃহ-দেবতার কাছে দু বেলা মানত করছেন, নারায়ণ এই যেন ওর শেষ শোওয়া হয়।

এই রকম চলেছে ; এমন সময় একদিন রাত-দুপুরে আমাদের বড়ঠাকুরদা অর্থাৎ আমার নিজের ঠাকুরদা স্ত্রীর মুখে সব শুনে তখুনি স্ত্রীর সঙ্গে ছুটলেন ছোট বউয়ের ঘরের দিকে। ঘরে ঢুকে ভাদ্দর-বউকে নিজের হাতে বিছানায় বসিয়ে আদর করতে করতে বললেন, মা-লক্ষ্মী! তুমি আমার কুলবধূ। এ রকম ক'রে না খেয়ে মরলে যে আমার অকল্যাণ হবে মা। কি চাই তোমার আমাকে বল।

ছোট্‌ঠাকুমার অবস্থা তখন খারাপ। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমার ছোট বোনের বিয়ে, আমি বাপের বাড়ি যাব।

ঠাকুরদা বললেন, এই কথা! তা আমাকে এতদিন জানাও নি কেন মা? আমি তোমায় নিজে নিয়ে যাব সেখানে ; তুমি খাওয়া-দাওয়া কর।

সেই রাতে একটু একটু ক'রে গরম দুধ খাইয়ে ছোট্‌টাকুমাকে চাঙ্গা ক'রে তিনি নিজে তাকে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে এসে নিজের ঘরের বিছানায় শুইয়ে কয়েকদিন শুশ্রূষা ক'রে তাঁকে সুস্থ ক'রে তুললেন।

এদিকে বাড়িময় ঢিঢি-ছিছি প'ড়ে গেল। ভাশুর হয়ে ভাদ্দর-বউয়ের অঙ্গ স্পর্শ করার জন্যে মেয়ে-মহলে শুরু হ'ল তুমুল আন্দোলন, এই আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন বাড়ির গিন্নী, আমাদের বড়মা।

বড়মা ছোট ছেলের কাছে গিয়ে গিয়ে তার স্ত্রী ও নিজের বড় ছেলের নামে মিলিয়ে বানিয়ে বানিয়ে যা-তা কুৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু ছোট কর্তা নির্বিকার, মুখে ভালমন্দ কোন কথা নেই, নির্দিষ্ট সময়ে স্নান ও আহার সেরে তিনি প্রতিদিন যথাসময়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা দিতে লাগলেন।

দিন কয়েকের মধ্যে ছোট্‌ঠাকুমা বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। নৌকো ঠিক হয়ে গেল। সন্ধ্যাকালে যাত্রার শুভমুহূর্ত।

যাত্রার দিন সকালবেলা স্নান ক'রে ছোট্‌ঠাকুমা গিয়ে ঢুকলেন ছোট্-ঠাকুরদার ঘরে। সেই যে দরজা বন্ধ হ'ল আর সারাদিন খুলল না, সন্ধ্যার প্রাক্কালে ছোট্‌ঠাকুমা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমার নিজের ঠাকুরমা, ঠাকুরদা আর ছোট্‌ঠাকুরমা সন্ধ্যা উৎরে যাবার পরই বেরিয়ে পড়লেন নৌকোয়, সুদূর বাংলা দেশের এক গ্রামের উদ্দেশে, প্রকৃতি অনুকূল হ'লেও যেখানে পৌঁছতে সেকালে অন্তত চল্লিশ দিন লাগত।

যা হোক, ছোট্‌ঠাকুরমা তো বাপের বাড়ি পৌঁছলেন, তখনও তাঁর বোনের

বিয়ের আট-দশ দিন দেরি আছে। ছোট বোনের বিয়ে, তাই সব বোনেরাই বাপের বাড়িতে এসে জুটেছিল, গরিবের ঘরে আনন্দ-উৎসবের আর অন্ত নেই। কথায় বলে, নদীতে নদীতে মিলন হয়, কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবার পর বোনে বোনে আর মিলন হয় না। তাই এতদিন পর সব বোন একত্র হওয়ায় সেই ব্রাহ্মণের ঘরে আনন্দের প্রবাহ ছুটল।

এই সময়, বিয়ের বোধ হয় দিন দুই আগে তাঁদের বাড়িতে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘ'টে গেল। আগেই বলেছি, ছোট্‌ঠাকুরমাদের বাড়িতে পূর্বপুরুষের এক কালীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদিন সকালে তাঁর জেঠামশাই পূজো করতে গিয়ে দেখতে পেলেন, ঠাকুরাণীর গলায় সেই সোনার হারগাছা ঝুলছে, অনেকদিন আগে ছোট্‌ঠাকুরমার বিয়ের জন্যে যেটিকে তাঁর গলা থেকে খুলে নেওয়া হয়েছিল।

সংবাদ পেয়ে দেশসুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ ছুটে এল তাঁদের বাড়িতে। সবাই সে কাণ্ড দেখে অবাক, তারস্বরে সবাই চীৎকার করতে লাগল, জয় মা কালী! এমন জাগ্রত দেবী কালীঘাটেও নেই।

সেদিন গভীর রাত্রে ছোট্‌ঠাকুমার বাবা তাঁকে ঘুম থেকে তুলে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, মনোজবা, এ কাজ তুই কেন করলি মা? তোর শাশুড়ী জানতে পারলে তো আমাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে, আর তোমাকে আস্ত রাখবে না।

ছোট্‌ঠাকুমা ন্যাকা সেজে বললেন, কি করেছি বাবা?

সেই হারগাছা এনে তুই মায়ের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিস!

ছোট্‌ঠাকুমা বললেন, কে বলেছে এ কথা! সে হার তো আমার শাশুড়ীর সিন্দুকে বন্ধ আছে। এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও আমি জানি নে।

আতপচাল আর কাঁচকলা সেদ্ধ-খেকো বামুনের আর কত বুদ্ধি হবে! ছোট্‌ঠাকুমা যা বললেন, তিনি তাই বিশ্বাস করলেন।

এসব গল্প ছোট্‌ঠাকুমা আমার বড়ঠাকুমা অর্থাৎ আমার নিজের ঠাকুমার কাছে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন তাঁর বড় বউকে অর্থাৎ আমার মাকে, মার মুখে আমরা শুনেছি।

যা হোক, বোনের বিয়ে-টিয়ে হয়ে যাবার পর ছোট্‌ঠাকুমা তো শ্বশুরবাড়ি ফিরে এলেন। শাশুড়ীর বিনা হুকুমে বাপের বাড়ি যাওয়ার অপরাধে এখানে

নানাভাবে তাঁর ওপর নির্যাতন শুরু হ'ল। শুধু তিনি নন, তাঁর বড় জা অর্থাৎ আমার নিজের ঠাকুরমাকেও উঠতে বসতে খোঁটা খেতে হতে লাগল। বড়মা এবার একটা নতুন চাল চাললেন। তিনি মেজো ছেলে ও মেজো বউকে বড় ছেলে ও বড় বউয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে আরম্ভ ক'রে দিলেন।

ওদিকে অসম্ভাবিতরূপে হার ফিরে আসার ব্যাপারকে উপলক্ষ্য ক'রে ছোট্‌-ঠাকুরমার বাপের বাড়ির অবস্থার হু-হু ক'রে উন্নতি হতে লাগল। দেখতে দেখতে চারদিকে এই ঘটনার কথা পল্লবিত হয়ে রটতে লাগল। দূর-দুরান্তর থেকে লোক এসে এ-হেন জাগ্রত কালীর পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে পূজো দিতে লাগল। যে দেবী সর্ববসনবিবর্জিতা হয়ে নিজের শিবকে পদদলিত করেছেন, নরকপাল যাঁর গলায়, যিনি কপালকুণ্ডলা—সামান্য দিয়ে দেওয়া সোনার হারের প্রতি যাঁর কখনও কোন লোভই থাকতে পারে না— এ কথা লোকে বুঝতে পারলে না।

মাস ছয়েক এই ভাবে কেটে যাওয়ার পর একদিন এদিকে আসল কালী জাগতা হলেন। মেজ্‌ঠাকুমা ছিলেন বড়মার গুপ্তচর। তিনিই একদিন কার কাছে সন্ধান পেয়ে শাশুড়ীকে গিয়ে লাগিয়ে দিলেন, ছোট বউ বাপের বাড়িতে সেই হারগাছা ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে।

আর যায় কোথা! বাড়িতে একেবারে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। বড়মা ছোট্‌ঠাকুমার মা বাপ তুলে যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগালি আরম্ভ করলে। সেই সঙ্গে আমার নিজের ঠাকুমাকেও গালাগাল দিতে লাগল। ছোট্‌ঠাকুমার দলে রইল বড়্‌ঠাকুমা অর্থাৎ আমার নিজের পিতামহী আর ওদিকে বড়মা আর মেজ্‌ঠাকুমা।

বড়মা ছোট্‌ঠাকুমাকে বলতে লাগল, তোকে জুতিয়ে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেব।

ছোট্‌ঠাকুমা বললে, কার বাপের সাধ্যি আমাকে জুতিয়ে বার করে একবার দেখি! আমি আমার স্বামীর ভাত খাই। কোনও ছোটলোকের মেয়ের ভাত খাই না।

ঝগড়ার সময় বড়মার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মেজ্‌ঠাকুরদা। ছোট্‌-ঠাকুমার মুখে এই কথা শুনে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার মাকে অপমান করলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব, ওসব ভাদ্দরবউ-টউ মানব না।

একটু দূরেই ছিলেন সেজ্‌ঠাকুরদা তিনি বললেন, মেজদা, ওসব মেয়েমানুষের ঝগড়ায় থেকো না, কি দরকার!

মেজ্‌ঠাকুরদা চেঁচিয়ে উঠলেন, চুপ কর্‌ শুয়োরের বাচ্চা!

সেজো কর্তা বললেন, তোর বাপ শুয়োরের বাচ্চা।

দুই ভাইয়ে খুনোখুনি হয় আর কি! মেজ্‌ঠাকুমা মাঝে প'ড়ে তখনকার মতন হাঙ্গামাটা আর হতে দিলেন না।

এদিকে মেজ্‌ঠাকুমার দুটো ছেলে ছিল ছোট্‌ঠাকুমার ন্যাওটো। তিনি এ বাড়িতে যখন বউ হয়ে এসেছিলেন, তখন তাদের একটার বয়স ছিল পাঁচ আর একটার দুই, সেই থেকে ছোট্‌ঠাকুমাই তাদের মানুষ ক'রে তুলেছিলেন, ছোট মাকেই তারা মা ব'লে জানত। এই ব্যাপারের সময় তাদের একজনের আঠারো-উনিশ বছর বয়স, সে কলেজে পড়ে; আর একজনের একটা পাস দেবার সময় হয়েছে। ছোট মায়ের এই লাঞ্ছনা দেখে তারা দুই ভাইয়ের নিজের বাপ ও ঠাকুমার সঙ্গে লাগিয়ে দিলে বচসা। আমার বাবা ও নিজের কাকাদের তখন বেশ বয়স হয়েছে। বাবার বিয়ে পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে, মা তখন কনে-বউ।

মেজ্‌ঠাকুরদা নিজের ছেলেদের ওই রকম ঔদ্ধত্য দেখে তেড়ে এসে তাদের আক্রমণ করলেন। ছোট্‌ঠাকুমা তাদের বাঁচাতে গিয়ে ভাশুরের হাতে দু-চারটে চড়-চাপড়ও খেলেন। বড়মা তারস্বরে চীৎকার ক'রে আমাদের ঠাকুমা ও ছোট্‌ঠাকুমার চোদ্দ পুরুষ তুলে গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন।

আমার নিজের কাকারা এতক্ষণ নিরপেক্ষই ছিলেন। কিন্তু বড়মা যখন তাঁদের মাকেও যাচ্ছেতাই ক'রে গালিগালাজ করতে আরম্ভ করলেন, তখন তাঁরাও ক্ষেপে গিয়ে তাঁদের ঠাকুরমাকে বললেন, খবরদার বুড়ী! আমাদের মাকে গালাগালি করলে জুতো মেরে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেব।

সে এক বীভৎস কাণ্ড!

যাক, তখনকার মতন হাঙ্গামা থেমে গেল বটে, কিন্তু তাঁরা স্থির করলেন, আর এক অন্নে থাকবেন না, বিষয় যে যার আলাদা ক'রে নেবেন।

আদালতে দরখাস্ত পেশ করা হ'ল, বিষয় চার সমান ভাগে বিভক্ত ক'রে দেবার জন্যে। সেই সঙ্গে ছোট্‌ঠাকুমাও দরখাস্ত পেশ করলেন যে, তাঁর স্বামী পাগল, স্বামীর বিষয় তিনি তদারক করবেন।

বড় ও সেজো ভাই সাক্ষ্য দিলেন, ছোট্‌বউ যা বলছেন তা সত্য এবং তাঁদের মতে এ ব্যবস্থা ভালই হবে। ছোটকর্তা কিন্তু নির্বিকার।

মেজ্‌ঠাকুরদা মায়ের প্ররোচনায় ছোট্‌ঠাকুমার দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপত্তি ক'রে এক দরখাস্ত পেশ করলেন। মামলা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠল।

এই রকম ব্যাপার চলেছে, এমন সময় আমার বাবা চাকরি পেয়ে মাকে নিয়ে চ'লে গেলেন ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে।

দেখতে দেখতে মামলা খুবই প্যাঁচালো হয়ে উঠল। হাঁড়ি সব আলাদা হয়ে গেল। বাড়িতে পুষ্যির দল ছিল অগুনতি, তারা কেউ এর দলে, কেউ ওর দলে ভিড়ে পড়ল। নগদ টাকা, সব বউয়ের গয়নাগাঁটি তখনও বাড়ির গিন্নীর কবলে। মেজ্‌ঠাকুরদার উকিলরা এসে গিন্নীর সঙ্গেই পরামর্শ করে। মেজো কর্তার দুই ছেলে তাদের নিজেদের বাপ-ঠাকুমা ছেড়ে তাদের বড়মা, সেজোমা ও ছোটমার—অর্থাৎ আমার ঠাকুমা, ছোট্‌ঠাকুমা ও সেজ্‌ঠাকুমার দলে, সেখানেই তাদের খাওয়াদাওয়া-শোওয়া।

এই রকম জমজমাট ব্যাপার চলেছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন দুপুরবেলায় কোথা থেকে ছোট্‌ঠাকুমার বাবা এসে হাজির হলেন। কি ব্যাপার! কথায় বার্তায় জানতে পারা গেল, এই হারগাছার জন্যে তাঁর বেয়ান যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগালি দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন, তাই তিনি সেটা নিজে নিয়ে এসেছেন ফিরিয়ে দেবার জন্যে।

বড়মাকে হারগাছা ফিরিয়ে দিয়ে তিনি এ বাড়িতে জলগ্রহণ না ক'রে ধুলো-পায়েই বিদেয় নিলেন। যাবার আগে ছোট্‌ঠাকুমার সঙ্গে তাঁর কি কথা হ'ল, তা এ বাড়ির কেউ জানে না।

এদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে শহরের অন্য এক বাঙালী ব্রাহ্মণের বাড়িতে দিন দুই থেকে ফিরে গেলেন নিজের দেশে, যাবার আগে মেয়ের সঙ্গে একবার দেখাও করলেন না।

এই ব্যাপারের বোধ হয় দিন তিনেক বাদে একদিন সকালবেলা উঠে দেখা গেল, ছোট্‌ঠাকুমা বাড়িতে নেই। তিনি দুখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিলেন। একখানা তাঁর বড় জা অর্থাৎ আমার পিতামহীকে আর একখানা তাঁর স্বামীকে।

স্বামীকে লিখেছিলেন, আমাকে এমন অপমান করবার যদি ইচ্ছা ছিল তো

আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন? তোমার মতন অপদার্থকে আমি স্বামী ব'লে স্বীকার করি না, আমি তোমাকে ত্যাগ করলুম।

আমার ঠাকুমাকে লিখেছিলেন, তোমাদের সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। এ বাড়ির মধ্যে তোমাদের স্নেহ-ভালবাসাই আমার মনে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার দুই ছেলে, নরেন আর সুরেন—অর্থাৎ আমার মেজ্ঠাকুরদার দুই ছেলে—তাদের তোমরা দেখো, এই আমার শেষ অনুরোধ। আমাকে ভালবাসে ব'লে তাদের অশেষ দুর্গতি হ'ল। তোমরা দুজনে আমার প্রণাম গ্রহণ কর। আমার বউমা—অর্থাৎ আমার মা—তাকে আমি আশীর্বাদ ক'রে যাচ্ছি, সে সুখী হবে। আমার আশীর্বাদ নিষ্ফল হবে না। আমার খোঁজ ক'রো না। কারণ, তোমাদের মতন ছোটলোকের ঘরে আমি আর পদার্পণ করব না।

দিদিমণি অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলতে লাগলেন, আমার ছোট্ঠাকুমার যখন বিয়ে হয়, তখন তাঁর পনেরো বছর বয়েস ছিল, আর যখন তিনি চ'লে গেলেন তখন তাঁর বয়েস ছত্রিশ। এই একুশ বছর একাধারে স্বামীর অবহেলা ও শাশুড়ীর গঞ্জনা সহ্য করতে করতে শেষকালে অসহ্য হওয়ায় অভিমানে তিনি গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। তিনি সুন্দরী ছিলেন বটে, কিন্তু ছত্রিশ বছর বয়সে সে সৌন্দর্যের ওপর ভরসা ক'রে কুলত্যাগ করা চলে না। একুশ বছর ধ'রে প্রতিদিনের সঞ্চিত অভিমানের সেই দীর্ঘশ্বাস, সতীলক্ষ্মীর সেই নিদারুণ অভিসম্পাতে দেখতে দেখতে এই বিরাট পরিবার পাত হয়ে গেল।

ছোট্ঠাকুমার সেই চিঠি প'ড়ে আমার ঠাকুরমা একেবারে বিছানা নিলেন। ঠাকুরদা তাঁকে আশ্বাস দিতে লাগলেন, তুমি কেন অমন করছ! তোমার কিচ্ছু ভাবনা নেই, মেয়েমানুষ সে, যাবে কোথায়? আমি তাকে ঠিক ধ'রে আনব।

আমার দুই কাকা—মেজ্ঠাকুরদার দুই ছেলে—তারা ছিল ছোটমা-অন্তপ্রাণ। তারা প্রতিজ্ঞা করলে, ছোটমাকে যদি কোন দিন পাই তো ঘরে ফিরব, না হ'লে এই শেষ যাত্রা ব'লে তারা লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে তাদের বড়-মা, অর্থাৎ আমার ঠাকুরমার কাছ থেকে টাকাকড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল, আজও তারা বাড়ি ফেরে নি।

আমার বড়মা বললেন, যে মাগী নিজের ভাশুরের সঙ্গে নষ্ট হতে পারে, সে যে কুলত্যাগ করবে তার আর বড় কথা কি!

তারপরে পনেরো বছরের মধ্যে এই সংসার দেখতে দেখতে শূন্য হয়ে গেল। বাড়িতে প্লেগ আসবার আগে বাড়িময় যেমন এখানে ওখানে মরা ইঁদুর প'ড়ে থাকতে দেখা যায়, ঠিক তেমনই ভাবে এঘরে ওঘরে লোক মরতে লাগল।

আমার ঠাকুমা ছোট্‌ঠাকুমার সেই চিঠিখানাতে প্রতিরাত্রে একটা ক'রে সিঁদুরের টিপ দিয়ে নমস্কার ক'রে তবে শুতে যেতেন। তিনি মারা যাবার সময় চিঠিখানা আমার মাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। মাও তাঁর শাশুড়ীর মতন রোজ সন্ধ্যার সময় সেটাতে সিঁদুরের টিপ দিয়ে পূজো করতেন। আমরা সে চিঠি দেখেছি, কিন্তু সিঁদুরের ছাপে ছাপে তার অক্ষরগুলো এমনই ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল যে, তার কিছুই পড়তে পারা যেত না।

মা যখন মারা যান, তখন আমি শ্বশুরবাড়িতে। মাথার সিঁদুর খুইয়ে বাড়িতে এসে অবধি আর সেখানা দেখতে পাচ্ছি না।

এই অবধি ব'লে দিদিমণি চুপ করলে।

ক্রমশ

"মহাস্থবির"

বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট

সংসারের সং

আমি তো মশাই, প্রায় পাগল হয়ে এলুম—ঝি, চাকর আর বামুন নিয়ে যে ঝঞ্ঝাট প্রতিদিন পোয়াতে হচ্ছে, তা যদি আপনাদের হ'ত, তা হ'লে আপনারা এদ্দিনে হয় কাশী কিংবা কাশ্মীরে গিয়ে ব'সে থাকতেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে এঁরা তো সবাই মিলিটারিতে চ'লে গিয়েছিলেন, তখন তো এঁদের টিকি দেখা যায় নি, তারপর যখন ফিরে এলেন তখন থেকে যে দর বাড়িয়েছেন, তাতে তো সংসারে যুদ্ধ বেধে যাবার উপক্রম হয়েছে দেখছি।

ঝি, চাকর, বামুন একটা-না-একটা প্রায় সব বাড়িতেই দরকার হয়, আমাদের আবার একান্নবর্তী পরিবারে যেখানে একশো একান্ন জন থাকেন তাঁদের তো এই জীবগুলি না থাকলেই অচল; কিন্তু এঁদের ঠেলায় যে আমার জিব বেরিয়ে পড়বার উপক্রম হ'ল। ওঃ! ঝি চাকর বামুন নিয়ে যে এত ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে, তা কস্মিনকালেও কখনও ভাবতে পারি নি—এদের সমস্যা কৃষক প্রজা-মজুর রাজের চেয়েও কঠিন।

আপনারা হয়তো বলবেন, তোমার ঝি চাকর বামুন রাখা কেন? অত বাবুয়ানির

দরকার কি? আমিও তো তাই বলি, তা গিন্নীদের সব এই কথাটা বোঝাতে পারেন কি? নেহাৎ দায়ে না পড়লে এই বাজারে বাড়িতে কেউ সদাব্রত খোলে?

আমার তো বাড়িতে মেয়েদের অভিযোগ শুনে শুনে কান প'চে গেল—আর কত হাঁড়ি ঠেলব? সবাই বামুন পাচ্ছে আর তুমি পাও না? দেখুন দেখি, আজকাল কি চট ক'রে এসব পাওয়া যায়? তার ওপর আবার আমার বাড়ি—এমনই একটা বামুন আনলে চলবে না, সে সত্যি বামুন কি না খোঁজ নাও, গায়ত্রীর মন্তর মুখস্থ আছে কি না দেখ, ইত্যাদি হাজার বায়নাক্কা!

আচ্ছা, আমি সত্যি-মিথ্যে যাচাই করি কোথায় বলুন তো? কলকাতা শহরের বামুন, সে হয়তো আগে নাপিতের ব্যবসা করত, তারপর বামুনের চাহিদা দেখে হয়তো বাজার থেকে দু পয়সার পৈতে কিনে উল্টো দিকেই গলায় লাগিয়ে ঘুরছে, আমি তার সঠিক খোঁজ নিই কি ক'রে? আমার নিজের অত বায়নাক্কা নেই। যে রাঁধতে পারে সে-ই বামুন, কিন্তু আমার বাড়ির ধরনই আলাদা। সত্তেরো জায়গায় খোঁজ নিয়ে, কুষ্ঠি মিলিয়ে তবে তাঁকে আমার গুষ্টির রান্না করতে দেওয়া হবে।

তেমনই ভোগান্তি হয়ও। এক বছর খোঁজাখুঁজির পর হয়তো একটি ভরদ্বাজ গোত্তর মিলল—তেমনই তাঁর বায়নাক্কা! আঠারো টাকা মাইনে, বছরে দুখানা কাপড়, তিনখানা গামছা, এক জোড়া জুতো, রোজ জলখাবারের চারটে ক'রে পয়সা, আধপো সরষের তেল, সকাল বিকেল চা, কাপড়-কাচা সাবান, নয়, ধোপার পয়সা ইত্যাদি। দয়া ক'রে ফুলেল তেল আর দামী এসেন্স-সাবানটা এখনও চাইতে শুরু করে নি এই যা রক্ষে! মানে তাঁর যা দাবি তা একেবারে জামাইষষ্ঠীর ফর্দ! বাপ রে বাপ!—এই ক'রে ঠাকুর এলেন।

সরস্বতী-ঠাকুর এলে ছেলেরা যে ভাবে যত্ন করে, তার চেয়ে বেশি আদর ক'রে এঁকে রাখতে হবে। সকাল আটটার আগে তিনি রান্নাঘরে পদার্পণ করবেন না, রেশনের কাঁকরকম্মি-করা মাল তাঁর হাতে আর্ধেক ঘাল হবে, বেলা বারোটার সময় তিনি নিজের ভাত বেড়ে খেয়ে-দেয়ে বাসায় চ'লে যাবেন, আবার সন্ধ্যে সাতটার আগে তিনি দেখা দেবেন না, যা রাঁধবেন তা তিনি ছাড়া কারুর মুখে দেবার জো থাকবে না, মেয়েরা সেই সমান রান্নাঘরে থাকবেন আর ব'কে ব'কে মাথা গরম করবেন, ঠাকুর শুধু উপকারের মধ্যে হাঁড়িটি উনুনে ওঠানো নামানো এবং মেয়েদের পরিচালনায় রান্নার মসলা তরকারিতে দিয়ে নিজের খুশিমত একটু হাতাখুন্তি নেড়ে চ'লে যাবেন—এই কাজ। হেঁসেল ছোঁবার জো নেই, তা হলেই তাঁর খাওয়া মাটি! তবু মেয়েরা বলবেন না যে, ঠাকুরের আর দরকার নেই, আমরাই রেঁধে-বেড়ে নোব।

অথচ মাসের মধ্যে দু দিন তাঁর জ্বর, ন-দিন তাঁর পেটের অসুখের কামাই লেগেই

আছে। বকবার জো নেই, তা হ'লেই তো চলল! বড় বড় মেজাজওয়ালা বাবুদের দেখছি, কাহিল হয়ে এসেছেন। কারণ, পাচ্ছেন কোথায়?

তার ওপর আপনাদের জ্বালায় তো লোক রাখবারও উপায় নেই। আমার সাতরাজার ধন মানিকটিকে যদি আপনারা পঞ্চাশ দফা পঁচিশ টাকা মাইনে দোব, ভাল লাঞ্চ দোব, ডিনার দোব ব'লে রোজ আড়ালে লোভ দেখান, তা হ'লে আমার কাছে সে থাকেই বা কি ক'রে? আপনারাই তো দফা খেলেন! আপনাদের ঈশ্বরের কৃপায় যুদ্ধের বাজারে বুদ্ধির জোরে দু-পয়সা হয়েছে ব'লে শুধু শুধু গরিবের সংসারে ঝঞ্চাট বাধিয়ে কি লাভটা হচ্ছে বলতে পারেন?

যাক, বামুনের পর্ব গেল, এল চাকর—বেতন বারো টাকা, তা ছাড়া আর সব তো আছেই। তিন বালতি জল তুলতে তিনি হাঁপাবেন, সারাদুপুর ঘুমুবেন, বাজার করার সময় বাবু সঙ্গে গেলে সারাদিন গোসাভরে ব'সে থাকবেন, যেখান থেকে যা মালপত্তর কিনে আনবেন তা যত দামেরই হোক তার ওপর কথা বলার কারুর কণ্ট্রোল থাকবে না, সেইটেই ধ্রুব-সত্য ব'লে মানতে হবে, রাত্তিরে সদর-দরজা বন্ধ করতে ভুলে যাবেন এবং চোরে সর্বস্ব নিয়ে গেলেও তিনি দায়ী থাকবেন না, জিনিসপত্র যথাযথ স্থানে আস্ত থাকে সেটা বরদাস্ত করবেন না, সন্ধ্যে থেকে ঘুমুবেন, দুপুরেও তাই, বকলে তক্ষুনি মাইনে-পত্তর নিয়ে চ'লে যাবেন এবং যে কদিন দয়া ক'রে থাকবেন, সে কদিন এত স্বল্প আহার করবেন যে স্বয়ং সরকার সে ব্যবস্থা না করাতে আমাকে তার বন্দোবস্ত করবার জন্যে চারজন সৎ-ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হতে হবে।

দিব্যি আছি। এর পর আছেন দুটি রাতদিনের ঝি—একটি মেজোবাবুর আর একটি সেজোবাবুর, তাঁদের চীৎকারে আর বউমাদের প্রতিবাদে বাড়িতে একমুহূর্ত যদি টিকতে পারেন! শহরে ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য-আইন থাকলেও, মনে করুন, মাঝে মাঝে সদলবলে যমনের রকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। এর ওপর যখন আবার গিন্নী সালিশী করতে নামেন, তখন মনে হয় যে, অ্যাটম-বম না ফেললে এ ঝঞ্চাটের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই।

মশাই, নীচে একটা বড় তক্তাপোশে শোবার জায়গা ক'রে দিয়েছি, রাত দেড়টায় সব হৈ-হৈ কাণ্ড! কি, ব্যাপার কি?—না মেজোবাবুর ঝি পদী, সেজোবাবুর ঝি ক্ষুদীকে ঘুমের ঘোরে ল্যাং মেরেছে। তার ফলে ক্ষুদী খেপে গিয়ে দুমদুম ক'রে তার পায়ে দুটো কিল বসিয়ে দিয়েছে, পদী চীৎকার শুরু করেছে। তখুনি উভয়ের মনিব নীচে নেমে ঝিদের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু ক'রে দিয়েছেন, ঘুমের দফা গয়া, আমি গিয়েও কাউকে থামাতে পারি না, সে এক বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড!

ইনি বলেন, আমার ঝিয়ের একটা আলাদা ঘর দাও। উনি বলেন, ওরও আলাদা

ব্যবস্থা করা চাই। এর কি উপায় করি বলুন তো? এঁদের এক একটা ঘর দিতে হ'লে তো আমায় নিজের ঘর ছেড়ে দিয়ে ছাতে ম্যারাপ বেঁধে শুয়ে থাকতে হয়, তা না হ'লে এ বাজারে বোধ হয় ঝি-চাকর রাখা অসম্ভব।

নিরুপায় হয়ে শেষে তক্তাপোশে একটা খড়ির দাগ টেনে দিয়ে ব'লে দিলুম, অত ঝগড়াঝাঁটির দরকার নেই; কেউ এই সীমানার বাইরে ঠ্যাং সরাবে না।

তাতেও কি ঝঞ্ঝাটের রেহাই আছে? পরশু রাত দুটোর সময় আমার দরজায় দমাদ্দম আওয়াজ। ধড়মড় ক'রে উঠে জিজ্ঞাসা করলুম, কে?

আওয়াজ এল পদীর।

গিন্নী উঠে বাইরে গেলেন, পদী তাঁকে ডাকছে নীচে। কারণ?—ক্ষুদী নাকি খড়ির দাগ পেরিয়ে আড়াই হাত বেঁকে পদীর বর্ডার-লাইন ক্রস ক'রে গেছে। সে চীৎকার ক'রে বলছে, বউমা, তুমি দেখবে এস ক্ষুদীর কাণ্ড! বাবু যা দাগ দিয়ে গেছে তার থেকে কোথায় স'রে এসেছে, দেখবে এস। আমি যদি এখুনি মারি, তা হ'লে আমার দুষ? ক'রো না বাপু, তুমি একবার বাবুকে ডাক, নিজে এসে তিনি লাইন দেখে যান।

গিন্নী ঝাঁঝিয়ে ব'লে উঠলেন, বকিস নি। বাবু এখন ঝিয়েদের শোয়া দেখতে যাবে? দূর হ! কাল সকালে সে আমি দেখব'খন।

পদী রাগতভাবে দুমদুম পদবিক্ষেপে প্রস্থান করলে গিন্নীর সব ঝাল এসে পড়ল আমার ওপর, তোমার যেমন আক্কেল, কোথাও কিছু নেই, উনি খড়ি দিয়ে দাগ কেটে এলেন, একটা যদি কিছু গোছ-বন্দোবস্ত থাকে! চিরটা কাল হাড় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে!

আচ্ছা, আমি কি করব বলতে পারেন? ঝি-চাকর নিজের নিজের জায়গায় শুয়ে আছে, তারা যদি লাথালাথি শুরু করে, তা হ'লে কি সেটাও আমায় দেখতে হবে? তা হ'লে তো আপিস থেকে সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এদের সব ঠ্যাং ধ'রে ব'সে থাকতে হয়! কি আপদ বুঝুন!

এদের খাওয়া পছন্দ নয়, কাজ পছন্দ নয়, শোওয়া পছন্দ নয়, মাইনে পছন্দ নয়—এদের যে কি হ'লে সব-কিছু পছন্দ হয় তা তো বুঝে উঠতে পারি না।

আপিসে কর্তাদের এত ভাল বন্দোবস্ত ক'রে আমাদের মত কেরানীদের রাখতে হ'লে বোধ হয় আপিস তুলে দিতেন, কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে এবং লোকজনকে নিয়ে যে ঝঞ্ঝাট আমায় পোয়াতে হচ্ছে, তাতে আমায় না পটল তুলতে হয়, তাই ভাবছি।

"শ্রীবিরূপাক্ষ"

পঞ্চকন্যা

না, আমি পুরাণখ্যাতা চিরস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার কাহিনী লেখবার উদ্দেশ্যে কলম ধরি নি। এ পঞ্চকন্যা আমাদের মধ্যেই বিরাজমানা। ঘরে ঘরে। বালিগঞ্জের ব্যারিষ্টার মিষ্টার জগদীশ রায়ের বিশাল একতলা বাড়ির পাশের ছোট টালির বাংলোখানা আমার। আমি থাকি সেখানে দুটি কুকুর, একটি দারোয়ান এবং পুরাতন আমাকে নিয়ে। আমার পেশা? সাহিত্য। হ্যাঁ, আজকাল এ দেশেও বিদেশের নজিরে মেয়েরা সাহিত্যকে পেশা ব'লে গ্রহণ করেছে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমার কথা বেশি বলতে ইচ্ছা করছে না। আজ আমার গল্পের নায়িকা আমি নই, জগদীশ রায়ের একমাত্র মেয়ে সুলেখা ও সুলেখার চার বান্ধবী। মিষ্টার রায় এবং আমার বাংলোর মাঝখানে একটা প্রাচীর আছে, তার গায়ে কালচে-সবুজ শ্যাওলার আস্তর, তার মাথায় মাধবীলতার গোলাপী-সাদা রঙের মেলা। সেই প্রাচীরের গায়ে সুলেখার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রকাণ্ড ঢালু বারান্দা, বেতের আসবাবে সাজানো। সুলেখার পার্লার। গ্রীষ্মকালে, বিশেষত চাঁদনী রাত্রে, সুলেখা অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেখানে বন্ধুদের নিয়ে গল্প করে। তাদের উচ্চ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাই, তাদের কথা আমি বুঝি। ওই প্রাচীরের পাশেই আমারও বসবার পোর্টিকো, লতাজালে ঢাকা। চারপাশে অজস্র পুষ্পিত গাছের বাক্স সাজানো। সেই কুঞ্জবনের আড়ালে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি বসি নিঃশব্দে, হাতে কোন সেলাইয়ের কাজ নিয়ে। প্রবাসী ভ্রাতাদের জন্য নানা উলে জাম্পার বুনি প্রতীক্ষারতা পীনেলোপীর ধৈর্যে। কান থাকে সুলেখা রায়ের বারান্দায়। দোষ মনে করি না। আমার নিঃসঙ্গতার সঙ্গী তারা। সুতরাং আমিও বন্ধু।

সুলেখা রায় যেন একটি মহাসাগরের তীর, সেখানে কত যাত্রী আসে, কত জাহাজ নোঙর ফেলে। আবার তারা চ'লে যায়, নূতন দল দেখা দেয়। সে যেন নিজেই ওই ছায়াময় কাননকুন্তলা বাড়িটির সত্তা। কত পাখি বসে, গান গেয়ে যায়। পুরুষদের কথা কিছু বলতে চাই না, কারণ বহুদিন ধ'রে পুরুষ অশ্রান্তভাবে নিজেদের কথা ব'লে ব'লে লাইব্রেরি ভরিয়েছে। তাদের সে ক্ষমতা আছে। মেয়েদের কথাই এখন বলা দরকার। আমি তাই সুলেখার মেয়ে-বন্ধুদের কথাই বলব। যারা তার বিশেষ বন্ধু তাদেরই কথা। তারা চারজন ও সুলেখা রায় আমার এই বক্তব্য কাহিনীর পঞ্চকন্যা।

নীল আকাশের ইন্দ্রনীলের সেটিং-এ শুভ্র মুক্তার ঝালর বোনা চাঁদ। আধুনিক ব্রুচ একটি। রায়-বাংলোর তৃণে মরকত, বৃক্ষের গোলাপে চুনি। এক পার্শ্বে ছোট হৌজের জল মুক্তার দ্যুতির পাশে হীরক-দীপ্তি ধরেছে। মালী ফোয়ারা বন্ধ ক'রে চ'লে গেছে। অস্থির বাতাস মাধবীর দল ঝরিয়ে ফেলছে। পঞ্চকন্যার পশ্চাৎপটে অসংখ্য

সীজন্ ফ্লাওয়ার। আমার বাক্সে বোনা রজনীগন্ধা আর গোলাপী কারনেশন সুবাস-বিহ্বল ক'রে তুলেছে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা। সুলেখার বাগানে চাঁদ, আমার পোর্টিকোতে অন্ধকার লতার চাঁদোয়ার তলায়। সেই অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে ব'সে প্রতিটি কথা আমি শুনছি তাদের, হাতে রয়েছে মস্ত রঙের উল হাতির দাঁতের কাঁটায় গাঁথা। মনে হচ্ছে, নির্লিপ্ত শান্ত ভঙ্গীতে আমি অবসর যাপন করছি নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় সেলাই হাতে। কিন্তু সেলাই আমার ভান মাত্র, ওদের কথা এমনই চুরি ক'রে শোনা আমার নেশা।

পঞ্চকন্যা অবিবাহিতা। কেন যে, এ কৌতূহল মনে জেগেছে বহুবার। কিছু কিছু কথাও শুনেছি। সম্পূর্ণ কাহিনী আজ উপহার দেব। জানি, আজ এই মদির বাতাসে, দিবা ও রাত্রির এই মিলনের শুভক্ষণে তারা মন খুলবে।

নিত্যকার মত দারোয়ান হাতের কাছে বাদামের শরবত ও বিকালের ডাক রেখে গেল। ব্যাঙ্কের শেয়ারে এবার কত ডিভিডেণ্ট পাওয়া যাবে জানবার কৌতূহল নেই এখন। আমার পঞ্চকন্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তারা সমবয়স্কা, চব্বিশ থেকে আটাশের মধ্যে।

গৃহের অধিবাসিনী সুলেখা স্বনামধন্য পিতার আদরিণী কন্যা। বি. এ. পড়া পর্যন্ত কলেজে সময় কাটিয়ে অসুস্থ শরীরের অজুহাতে পরীক্ষা দেয় নি। এই নিদারুণ গরমেও বেতের ঈজিচেয়ারের হাতল ও তার পায়ের ওপর দিয়ে একখানা সূক্ষ্ম রেশমের নীলাভ চাদর ঢাকা রয়েছে। পীড়া তার বাতব্যাধি। প্রকৃতির জহরতকে ম্লান করে দিয়ে তার দীর্ঘাকার আঙুলগুলিতে একটির পর একটি হীরা চাঁদের আলোয় জ্ব'লে উঠছে।

সুলেখার পাশে বেতের সোফায় অর্ধশায়িতা কুমারী মাধবী নন্দী। সুগায়িকা ও কবি। দরিদ্র মাতাপিতার ষষ্ঠ সন্তান।

সুলেখার অন্য পাশের চেয়ারে কুমারী রমলা বসু, বিদেশী শিক্ষার ছাপ-মারা। অত্যাধুনিক পরিবারের অত্যাধুনিকী কন্যা।

রেলিঙে হেলান দিয়ে ব'সে কুমারী অচলা মজুমদার। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপিকা।

আরও একটু ওপাশে বসেছে কুমারী বকুল সোম। গুণের তালিকা তার দীর্ঘ নয়। কিন্তু নির্মল চাঁদের আলোয় সে যেন ছবি আঁকা রয়েছে। বকুল অপরূপ সুন্দরী।

রমলা বসু হঠাৎ স্বভাবোচিত উচ্চ হাসির সঙ্গে ব'লে উঠল, আচ্ছা সুলেখা, আমরা একটা চিরকুমারী সভা খুলি না কেন রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে?

সুলেখা ধীরে ধীরে একটু ন'ড়ে ব'সে অভ্যস্ত বক্রহাস্যে তার অভিজাতসুলভ মার্জিত নীচু সুরে উত্তর দিলে, সভ্য কিন্তু পাব না। নিজেদের নিয়ে মেতে থাকতে হবে।

অচলা মজুমদার কালো ফ্রেমের চশমার ঝিলিক হেনে যোগ দিলে, রাইটো।

আমাদের আর বাইরের সভ্য দিয়ে কি দরকার? আমরা নিজেরা নিজেতেই সম্পূর্ণ। ছেলেবেলার বন্ধুত্ব এতদিন টিকে আছে, সভাও টিকে যাবে।

বকুল সোম মলিন মুখে বললে, আচ্ছা, একটা অদ্ভুত কথা কি কখনও তোমাদের মনে হয় না? আমাদের বিয়ে হচ্ছে না কেন?

হচ্ছেনা অ্যাট অল। ঠিক ধরেছ তুমি বকুল। অথচ অন্য মেয়েদের চেয়ে, অর্থাৎ যাদের রোজ রোজ বিয়ে হচ্ছে, তাদের চেয়ে আমরা কিছু মন্দ নয়!—অচলা মজুমদার সায় দিলে।

রমলা বসু চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল,—আহাঃ অচলা, বল না কেন আমরা অনেক ভাল। গুণ আছে আমাদের সকলের। রূপ? হ্যাঁ, সবাই বকুল না হ'লেও কেউই শূর্পণখা নই।

মাধবী নন্দী চাঁদের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে,—আমার অবস্থা খারাপ হ'লেও তোমাদের সকলের টাকাকড়ি আছে। টাকার অভাবে বিয়ে না হওয়ারও কারণ নেই।

আর আমাদের চরিত্র,—অলস ভঙ্গীতে সুলেখা রায় উঠে বসল,—হ্যাঁ, chaste as Diana না হ'লেও আমরা চরিত্রশালিনী। অন্তত, আমার চরিত্র যে ভাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অসুখ নিয়ে এত ব্যস্ত যে চরিত্র হারাবার অবকাশ হ'ল না!

আমাদের স্বভাব-ব্যবহারও ভাল। কেউ আমাদের নিন্দা করে না। লোকে আমাদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। আমরা হাসিখুশি, আমরা চমৎকার মেয়ে!—বকুল আবার আশ্চর্য হ'ল।

এদিকে স্বাস্থ্যও আমাদের ভাল। এক সুলেখার শৌখিন অসুখ ছাড়া সকলেই অত্যন্ত সুস্থ। না সুলেখা, I must be frank। তোমার অসুখ মানসিক বিলাস, যেমন ভিয়েনাতে আমার কলেজ-বন্ধু অল্‌গার ছিল।—রমলা বসু অকারণে রেলিঙের লতানো গোলাপ গাছ থেকে একটি গোলাপ বিখণ্ড ক'রে ফেললে।

Oh yes, come on Sulekha, be a sport. স্বীকার কর কাজের অভাবে অসুখ তোমার অকাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।—নশ্বর-রমণীর হাতের করেখা জ্যোৎস্নায় ধ'রে অচলা মজুমদার বললে, নাঃ, আমার হাতে বিয়ে নেই।

বকুল সোম ব্যথিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, বিয়ে আমি করতে চাই। মাঝে মাঝে জীবনটা বড় একঘেয়ে লাগে। আর, তোমরা কেউ বিয়ে-পাগলা না হ'লেও একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ক'রে বস নি। আচ্ছা, আমাদের বিয়ে হচ্ছে না কেন?

অথবা আমরা বিয়ে করছি না কেন?—সুলেখা সংশোধন করলে।

চাঁদের ওপর একখানা হাল্কা মেঘ শৌখিন আঁচলের মত বিছিয়ে গেল। চাঁদের রুচে কোন বিলাসিনীর শাড়ি বিদ্ধ হ'ল যেন। চাঁদের আলোয় সুলেখার বাগানের

নুড়ির পথ, লাইলাক ঝোপের তলার মাটি কটকী রূপোর কাজের মত ঝকমক ক'রে উঠল। হাস্নু ও-হানার গন্ধে এসে মিশল সোনার-গড়া দেশী চাঁপার তুলনাহীন সুবাস। আবার দক্ষিণের ব্যাকুল বাতাস ব'য়ে গেল ঝাউগাছের জালী-কাটা পাতার গুচ্ছে দোলা দিয়ে। প্যান্সি, জিনিয়ার বেডের পাশে লম্বা সবুজ ফড়িং লাফাতে লাগল। পঞ্চকন্যা আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকে একবার মনে মনে বললে, এমন কেন হয়!

ধীরে ধীরে তারা প্রত্যেকের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। ধীরে ধীরে তারা নিজেদের কথা পরস্পরের কাছে মন খুলে বলতে লাগল। সেই সব কথা আমিও বলব।

রমলা বসু। এই যে চঞ্চলা লাবণ্যময়ী তরুণী, কে জানে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে এর প্রেম-জীবন শেষ হয়ে গেছে। রমলা মণীন্দ্র তালুকদারের বাগ্‌দত্তা ছিল, মণীন্দ্র গেল বিদেশে। ফিরে এল মণীন্দ্র জার্মান নারী সঙ্গে করে। সেই বছরই রমলা বসু সাগর পার হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্যে।

বহু পুরুষের কামনা-কুটিল বাহু রমলা বসুর ক্ষীণ কটি-বেষ্টন করেছে। বহু পুরুষের রুক্ষ অধর তার নরম অধরকে লাঞ্ছনা করেছে। কিন্তু ওই পর্যন্ত। বিবাহ রমলা করতে পারছে কই? যখন নিরালা রাত্রে নয়নে নিদ্রা আসে না, রমলা ঊর্ধ্বে নেটের মশারির কারুকার্যখচিত চালের দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে ব'লে ওঠে, মণি, তোমাকে ভুলতে পারি না কেন?

অচলার ও বালাই নেই। ছেলেবেলা থেকে পরীক্ষার ফল ভাল করবার দুরূহ প্রয়াসে অন্য দিকে মাথা তার যায় নি। একেবারে অধ্যাপিকা হয়ে ব'সে অচলা বিবাহের কথা ভাববার সময় পেল। কিন্তু বাধা দেখলে অনেক। সে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে রোজগার করছে, সে সং কটা পাস ক'রে কলেজে পড়ায়। সুতরাং অভিভাবকেরা তাকে তাঁদের তথাকথিত সুকুমারমতি তরুণবয়স্ক স্নেহাস্পদ, যারা সাতঘাটের জল খেয়ে চল্লিশ বছরেও কুমার নাম ঘুচোয় নি, তাদের অনুপযুক্তা মনে করেন। অচলার প্রকৃত বয়স ছাব্বিশ শুনে স্থির করেন আসলে ছত্রিশ।

পাত্রদের মতও তাই। চশম'-চোখো টিচারনী চায় না তারা। তারা চায় অনাঘ্রাত কুসুম-কলিকা। কর্মভীরু এবং সুবিধাবাদীর দল চায় অচলাকে রোজগারের যন্ত্র হিসাবে, কিন্তু অচলা চায় না তাদের। ক্ষোভের সঙ্গে একদিন অচলা বলেছিল আমি শুনেছি, জানো, শৈলেন দেব বিয়ে করতে চায় আমাকে। শৈলেন দেব দুবারের বার বি. এ. পাস করেছে। সে বন্ধুদের ব'লে বেড়াচ্ছে, বিয়ে তো আমি ভাই অচলা মজুমদারকে বিনা কারণে করতে চাচ্ছি না, জমিদারি কিনতে চাচ্ছি।

বকুলের অবস্থা আরও সঙ্গিন। রূপ দেখে তাকে পুরুষ লুব্ধ পতঙ্গের মত বেষ্টন

ক'রে ধরে। বিয়ে খুব কম লোক করতে চায়। তার কারণ বকুল সোম নাচগান জানে না, আধুনিক শিক্ষার অভাবে পুরুষমহলে সে জড়পদার্থ ব'নে যায়। তাকে স্পর্শ ক'রে সুখ আছে, তার সঙ্গে কথায় সুখ কই? ক্ষণভুঞ্জন উৎসবে তার কোমল দেহ বক্ষে নিপীড়ন ক'রে ধর, তার পল্লব-মসৃণ অধরে জ্বালাময় প্রদাহ এনে দাও। কিন্তু বিবাহ? ওই লাজুক কুনো মেয়েকে নিয়ে সারা জীবন কাটানো? অসম্ভব।

বৃদ্ধেরা অবশ্য তরুণীভার্যারূপে বকুল সোমকে কামনা করে, কিন্তু বিদ্যুৎবহ্নির মত নিজের রূপকে বকুল বৃদ্ধের উপভোগ-বস্তু ক'রে দিতে চায় না। বিশেষ শ্রেণীর যুবকেরা আসে লুব্ধ হয়ে, বিবাহ-প্রস্তাবও দু-একজন করে। কিন্তু তাদের লম্পট দৃষ্টি নাকি বকুলের দেহে উষ্ণ সলিল সিঞ্চন করে। দুঃখের জীবন বকুল সোমের।

তারপর সুলেখা। এই রহস্যময়ী ক্ষীণাঙ্গী মেয়েটি নিজের দোষে এবং নিজের ইচ্ছায় আজও কুমারী। দেহে তার রোগ আছে। বিদ্যা বা গুণ বাহুল্য নেই তার। দেখতে সে ভাল নয়। তবু তার যা আছে, বন্ধুদের কারও নেই তা। তার আছে ব্যক্তিত্ব।

কাউকে পছন্দ হয় না সুলেখা রায়ের। পুরুষকে সে খেলার সামগ্রী মনে করে। নেড়ে-চেড়ে দেখে খেলায় অরুচি হ'লে দূরে ফেলে দেয়। কিন্তু দেউল তার খালি থাকে না, নব পূজারী আসে।

পুরুষের ক্ষৌরিত কঠিন গণ্ড তার কথার বাণে কেমন রক্তাভা ধরে, পুরুষের সবল মন তার হাসির ছোঁয়ায় কেমন ক'রে কাঁপে—সেই দেখা, সেই খেলা সুলেখার নেশা। নেশাখোর মেয়ের বিয়ে হওয়া দায়।

এদের মধ্যে মাধবী নন্দী কিছু পরিমাণে স্থৈর্য লাভ করেছে। বিয়ে তার ঠিক হয়ে আছে পাড়ারই ছেলের সঙ্গে। সে ছেলে ভাল চাকরি পেয়ে কিছু টাকা জমাতে পারলেই বিয়ে হবে। তার আগে মাধবী রাজি নয়। অভাবে বর্ধিত হয়ে মাধবীর অভাবকে বড় ভয়। মাধবীর মনের মানুষ তার দ্বারে আসে পায়ে হেঁটে নয়, মোটরে চ'ড়ে। মাধবীর প্রেমে আর মাধবীর আদর্শে মিল হয় নি। তাই দুঃখ মাধবীর দীর্ঘ প্রতীক্ষা। রাত্রে যখন প্রিয়-বাহু-বল্লরী তাকে নিবিড় ক'রে জড়িয়ে অতি কাছে টেনে নেবে, তখন মলিন শয্যা মেঝেতে বিছিয়ে সূতিকাগ্রস্তা জননীর পাশে শুতে হয়। যখন ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা তাকে আকুল ক'রে তোলে, তখন চাঁদের দিকে চেয়ে গান গাওয়া বা খাতা-পেন্সিলে উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করা ভিন্ন মাধবীর আটাশ বছরের জীবনে কিছুই করবার থাকে না। বিমন মাধবীর। তার প্রয়োজন একটি প্রেমিককে, যার গৃহে সে গৃহলক্ষ্মী হবে, যার রক্তধারায় সে সন্তান রচনা করবে।

সুলেখার বাগানের ঝাউগাছে একটানা সুরে পাখি গান গেয়ে উঠল। ছোট ছোট

আমাকে না জানিয়া এবং হিন্দুঘরের বধূ হইয়াও আমাকে অসঙ্কোচে পত্র লিখিয়াছেন। ইহা সকলে পারে না সত্য। কিন্তু তাই বলিয়া আমিও যে আপনাকে অসঙ্কোচে পত্র লিখিতে পারি প্রশ্ন করিতে পারি, এ আশঙ্কা আপনার মনের মধ্যে ছিল না বলিয়াই লিখিতে পারিয়াছিলেন, থাকিলে পারিতেন না। এতটুকু বিশ্বাস আমার প্রতি আপনার ছিলই। না হইলে এতগুলা বই লেখা আমার বৃথাই হইয়াছে।

বেশ, ছোট বোনের মত তুমি যখন খুসি আমাকে চিঠি লিখো। আমার সত্যকার শিষ্যা এবং সহোদরার অধিক একজন আছে, তাহার নাম নিরুপমা। আজ সাহিত্যের সংসারে সে আপনার বোধ করি অপরিচিত নয়, 'দিদি' 'অন্নপূর্ণার মন্দির' 'বিধিলিপি' ইত্যাদি তাহারই লেখা। অথচ, এই মেয়েটিই একদিন যখন তাহার ষোল বৎসর বয়সে অকস্মাৎ বিধবা হইয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল, তখন আমি তাহাকে বার বার করিয়া এই কথাটাই বুঝাইয়াছিলাম, "বুড়ি, বিধবা হওয়াটাই যে নারীজন্মের চরম দুর্গতি এবং সধবা থাকাটাই সর্ব্বোত্তম সার্থকতা ইহার কোনটাই সত্য নয়।" তখন হইতে সমস্ত চিত্ত তাহার সাহিত্যে নিযুক্ত করিয়া দিই, তাহার সমস্ত রচনা সংশোধন করি এবং হাতে ধরিয়া লিখিতে শিখাই—তাই আজ সে মানুষ হইয়াছে, শুধু মেয়ে-মানুষ হইয়াই নাই।

এইটি আমার বড় গর্ব্বের জিনিস।

তুমি লিখিয়াছ, যে, স্বামীকে জানিল না চিনিল না তেমন বালবিধবার আবার বিবাহ দিতে দোষ কি? তোমার মুখে এই কথাটার অনেক দাম। এবং আমার লেখা যদি একটিও বালবিধবার প্রতি তোমার এই করুণা জাগাইতে পারিয়া থাকে ত আমারও বড় পুরস্কার পাওয়া হইয়াছে।

এইবার তোমার লেখার সম্বন্ধে কিছু বলিব। আজকাল রাশি রাশি বাঙলা উপন্যাস বাহির হইতেছে। ইহাতে দু'টা জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি। প্রথম, পুরুষদের লেখা বইগুলা প্রায়ই যে অন্তঃসারহীন অপাঠ্য বই হইতেছে,—শুধু এই নয়, ইহাদের পোনর আনাই অন্য লোকের চুরি। এবং ইহাতে তাহারা লজ্জা পর্য্যন্ত অনুভব করে না। বই বিক্রী হইলেই তাহারা যথেষ্ট মনে করে।

দ্বিতীয় এই দেখিয়াছি মেয়েদের লেখা বইগুলা আর যাহাই হোক, সেগুলা অন্ততঃ কাহারো চুরি নয়। তাহারা যাহা কিছু ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে দেখিয়াছে, নিজের জীবনে যথার্থ অনুভব করিয়াছে তাহাই কল্পনা দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং তাহাতে কৃত্রিমতাও বেশি থাকে না।

তোমার লেখায় যে সৎসাহস ও সরলতা আছে তাহা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। রচনা হিসাবে খুব ভাল না হইলেও ইহার অকৃত্রিমতাই ইহাকে সুন্দর করিয়াছে। আমার

পরিশিষ্ট লিখিতে গিয়া আর সময় নষ্ট করিয়ো না,—স্বাধীনভাবে বই লিখিয়ো, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি কাহারো চেয়ে হীন হইবে না।

এইখানে তোমাকে আর একটা উপদেশ দিয়া রাখি। নারীর স্বামী পরম পূজনীয় ব্যক্তি, সকলের বড় গুরুজন। কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীও দাসী নয়। এই সংস্কার নারীকে যত ছোট, যত ক্ষুদ্র যত তুচ্ছ করে এমন আর কিছু নয়।

যখনই বই লিখিবে এই কথাটাই সকলের বেশি মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

স্বামীর বিরুদ্ধে কদাচ বিদ্রোহের সুর মনে আনিতে নাই, কিন্তু স্বামীও মানুষ, মানুষকে ভগবান বলিয়া পূজা করিতে যাওয়া কেবল নিষ্ফল নয়, ইহাতে নিজেকে এবং স্বামীকে উভয়কেই ছোট করিয়া তোলা হয়।

তোমাকে আর একটা প্রশ্ন করিব। "যে বিধবা স্বামীকে জানে নাই চিনে নাই…"

কিন্তু যে একবার জানিয়াছে চিনিয়াছে—অর্থাৎ যে ষোল সতর বছর বয়সে বিধবা হইয়াছে, তাহার সুদীর্ঘ জীবনে আর কাহাকেও ভাল বাসিবার বা বিবাহ করিবার অধিকার নাই? নাই কিসের জন্য? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে ইহার মধ্যে শুধু এই সংস্কারটাই গোপন আছে যে স্ত্রী স্বামীর জিনিস। স্ত্রীর নারী বলিয়া আর কোন স্বাধীন সত্তা নাই।

"হেম সংশয়ের মধ্যেই দিন কাটাইতেছিল। যাহার দৃঢ়তা নাই তাহার কি বন্ধনই ভাল নয়?"

বন্ধন কেবল তখনই ভাল যখন এই প্রশ্নটার শেষ মীমাংসা হইয়া যাইবে যে বিবাহই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয়ঃ।

অথচ, আমি কোথাও বিধবার বিবাহ দিই নাই। এইটি তোমার কাছে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতে পারে।

তার উত্তর এই যে সংসারে অনেক আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে, এবং চেষ্টা করিয়াও তাহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো।—

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাজে শিবপুর। হাওড়া। ১৪. ৮. ১৯

পরম কল্যাণীয়াসু,—কাল এবং আজ তোমার বড় এবং ছোট্ট দুখানি চিঠিই পেলাম। প্রথমেই নিজের খবরটা দিই। আমি চিরকালই সমস্ত দোর জানালা খুলে শুই। সেদিন রাত্রি চারটের সময় ঘুম ভেঙে দেখি বিছানা বালিশ গায়ের জামা কাপড় সমস্ত বৃষ্টির ছাটে এমনি ভিজেচে যে শীত করচে। দুর্ভাগ্য আবার এমন যে সেদিন বিকেল বেলাতেও বার হয়ে পথে কম ভিজিনি,—দুটোতে জড়িয়ে একটু জ্বরের মত হল কিন্তু একদিনেই সামলে

না,—বাড়্‌তেই লাগল। এখন ওটা সেরেছে। দ্বিতীয় দফায় আরও চমৎকার। ক'দিন থেকে ডান পায়ের হাঁটুর খানিকটে নীচের এত জ্বালা আর চুলকোতে লাগ্‌ল যে অস্থির হয়ে উঠ্‌লাম। দিন চারেক পূর্ব্বে একদিন সকালে উঠে দেখি খানিকটে যায়গা লাল হয়ে ঠিক যেন একজিমার ভাব হয়েছে। একটু একটু ফুলেও আছে। কিছুদিন থেকে শুন্‌ছিলাম এদিকে খুব বেরি-বেরি হচ্ছে। ওটা যে কি পদার্থ তা আজও দেখবার সুযোগ পাইনি, ভাবলাম বুঝি, আমাকেই ধরেচে। ভয়ে যাই আর কি। ক'সে টিনচার আইডিন লাগাতে সুরু করে দিলাম,—কিন্তু বার কয়েক ঘন-ঘন লাগাবার পরে সে এমন মূর্ত্তি ধারণ করলে যে, তার চেয়ে বুঝি সত্যিকারের বেরি-বেরি হওয়াই ছিল ভাল। ডাক্তার এসে ভয়ানক বকৃতে লাগলেন,—আপনার কি এতটুকু কোন বিষয়ে সবুর নেই? এবার না হয় কষ্টিক কিম্বা এ্যাসিড-ট্যাসিড লাগিয়ে যা পারেন করুন আমি চল্‌লাম। যাই হোক পরে ঠাণ্ডা হয়ে ঔষুধ আর মালিসের ব্যবস্থা করে হুকুম করে গেলেন, পা দুটো একটা তাকিয়ায় তুলে দিয়ে যেন চুপ করে শুয়ে থাকি। কি করি দিদি, তাই আছি। তৃতীয় দফায়,—কোন কালে আমি অম্বলের রুগি নই। এত কম খাই যে অম্বল পর্য্যন্ত আমার কাছে ঘেঁসে না পাছে তাকেও বা অনাহারে শুকিয়ে মরতে হয়। কি যে সেদিন জোর করে ছাই পাঁশ কতকগুলো ঘরের তৈরি করা সন্দেশ খাইয়ে দিলে যে আজও যেন তার ঢেঁকুর উঠ্‌চে। আমি এদেশের একটি বিখ্যাত কুড়ে। চিবোবার ভয়ে কোন জিনিষ সহজে মুখে দিতে চাইনে,—আমার ধাতে ও অত্যাচার সইবে কেন? কি বল দিদি, ঠিক না? কিন্তু বাড়ীর লোকে বোঝে না, তারা ভাবে আমি কেবল না খেয়ে খেয়েই রোগা। সুতরাং খেলেই বেশ ওদেরই মত হাতি হয়ে উঠ্‌ব। স্বর্গীয় গিরীশবাবু তাঁর আবু হোসেনে লাখ কথায় একটা কথা বলে গিয়েছেন যে "অবলার বড় নোলা, তারা মলেও খায়।" মেয়েমানুষ জাতটাকে তিনি চিনেছিলেন! আজ বিশ বছর আমরা কেবল খাওয়া নিয়েই লাঠালাঠি করে আস্‌চি। ঐ খেলে না, খেলে না—রোগা হয়ে গেল—ঘর সংসার রান্না-বান্না কিসের জন্যে—যেখানে দুচোখ যায় বিবাগী হয়ে যাবো—ইত্যাদি কত কি! আমি বলি, ওরে বাপু, বিবাগী হবে ত শীগ্‌গীর হও,—এ যে শুধু আমাকে ভয় দেখিয়ে দেখিয়েই কাঁটা করে তুল্‌লে! বাস্তবিক, আমার দুঃখটা আর কেউ দেখলে না দিদি! আমি প্রায়ই ভাবি, সত্যিকার স্বর্গ যদি কোথাও থাকে ত সেখানে বোধ হয় এমন করে একজন আর একজনকে খাবার জন্যে জবরদস্তি করে না! আর তা যদি হয় ত আমি যেন বরঞ্চ নরকেই যাই!

হাঁ, আরও একটা আছে। দিন কুড়ি আগে কুকুরের ঝগড়া থামাতে গিয়ে কোথাকার একটা ঘেয়ো কুকুর আমার হাতের তেলোতে আচ্ছা করে দাঁত ফুটিয়ে দিয়ে পালাল। হতভাগা কুকুরটা কি অকৃতজ্ঞ! তাকেই আমি আমার 'ভেলু'র কবল থেকে বাঁচাতে

গিয়েছিলাম। ভয়ে কাউকে এ কথা বলিনি, শুকিয়েও গিয়েছিল কিন্তু কাল থেকে আবার যেন মনে হচ্চে ব্যথা হচ্চে।

কিন্তু আর নয়, আপাততঃ এইখানেই আমার শারীরিক কুশলের তালিকাটা মোটামুটি সম্পূর্ণ করলাম। তবে একটা সুখ এই যে বুড়ো হয়েচি। এখন থেকে এমনি একটা-না-একটা উপলক্ষ করে ত চল্‌তে হবে। কত রকম-বেরকমের দুঃখ দৈন্য আপদ বিপদের মাঝখান দিয়ে ত আজ চল্লিশের কোটা পার হোলাম—শুনি আমাদের বংশে আজও কেউ চল্লিশ পৌঁছোন নি। সে হিসেবে ত অন্ততঃ পিতৃ-পিতামহদের হারিয়েছি! আর কি চাই!

যাকৃগে। বুড়ো মানুষের বাঁচা-মরা নিয়ে আর তোমাদের উদ্বিগ্ন করতে চাইনে, কিন্তু তুমি ত দিদি তেমন ভাল নেই? শরীরে যত্ন কোরো,—এখন পরিশ্রম করার দরকার নেই, ভাল হয়ে বাড়ী ফিরে এসো তার পরে সব হবে। তোমার খাতার লেখাগুলো ত মন দিয়েই পড়লাম,—সমস্তই আছে তাতে, নেই শুধু একটু শিক্ষা। সাহিত্য রচনা করবার কৌশলটাও ত আয়ত্ত করা চাই, ভাই, নইলে শুধু শুধু ত নিজের অনুভূতি মাত্র সম্বল করেই কাজ হবে না। কিন্তু আমি এই ব্যবসাই ত করি, ঠিক জানি এটুকু শিখিয়ে নিতে আমার বেশি দেরি লাগবে না। কতটুকু লিখতে হয়, কোন্‌টা বাদ দিতে হয়, কোন্‌টা চেপে যেতে হয় "ঘটে যা তা সব সত্য নয়,

কবি তব মনোভূমি, রামের জনমস্থান
অযোধ্যার চেয়ে ঢের সত্য জেনো।"

এতবড় সত্য কথা আর নেই। দিদি, যত ঘটনা ঘটে তার সবটুকু ত লিখতে নেই—কতক পরিস্ফুট করে বলা, কতক ইঙ্গিতে সারা, কতক পাঠকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া। অবশ্য, যতটুকু তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম, কেবল চিঠি লিখে কেটেকুটে দিয়ে দূর থেকে বসে ততটুকু হবে না, তবুও চেষ্টা করতে হবে বৈ কি। আর যদি এবারেও শীতের পূর্ব্বে বেরিয়ে পড়তে পারি ত, তোমাদের ঐ খোট্টার দেশেও না হয় ১০।১৫ দিনের জন্যে কাছাকাছি কোথাও একটা বাড়ী নিয়ে একটু সাহায্য করবার চেষ্টা করব। আর আমার সনাতন কুড়েমিই যদি সে সময়ে পেয়ে বসে ত বাস্ এই পর্য্যন্তই।

···মহিলারা? তাঁরা নিরাপদে থাকুন, তাঁদের অনেকের কাছেই তোমাকে বার করতে বোধ কারি আমার প্রবৃত্তি হয় না। একটা কথা খুলে বলি। ঐ দূর থেকে শুন্‌তেই······মহিলারা! উচ্চ শিক্ষিতা! দু'চারজন ছাড়া আমাকে তাঁরা মনে মনে ভারি ভয় করেন; তাঁদের কেবলই মনে হয় আমি তাঁদের ভিতরটা বুঝি খুঁটিয়ে দেখে নিচ্চি—তাই তাঁরা আমার সাম্‌নে কিছুতে স্বস্তি পান না,—অন্তরটা তাঁদের এমনি কৃত্রিম, এমনি সঙ্কীর্ণতায় ভরা! বস্তুতঃ এদের মত সঙ্কীর্ণ চিত্তের স্ত্রীলোক বাঙলা দেশে

আর নেই! দিদি, আমি কোন কালে খাওয়া-ছোঁয়ার বাচবিচার করিনে, কিন্তু… মেয়েদের হাতে আমি কোন দিন কিছু খাইনে। শুধু খাই তাঁদের হাতে যাঁদের বাপ-মা দুজনেই ব্রাহ্মণ এবং বিয়েও হয়েচে ব্রাহ্মণের সঙ্গে। ……সমাজ-ভুক্ত হোন্ তাতে আসে যায় না, কিন্তু ঐ রকম মেশানো-জাত হলে আমি তাদের ছোঁয়া খাইনে। তারা বলে শরৎবাবু শুধু লেখেন বড়-বড় কথা, কিন্তু বাস্তবিক তিনি ভারি গোঁড়া। আমি গোঁড়া নই লীলা, কিন্তু শুধু রাগ করেই এদের হাতে খাইনে। আর এটাও দেখেছ বোধ হয় ……মেয়েদের মধ্যে সাড়ে পোনর আনাই কুরূপা। কেবল সাবান পাউডার আর জামা কাপড়ের দ্বারা আর নাকি খোনা গলায় কথা কয়ে যত দূর চলে! কেবল ৪।৫টি মেয়েকে দেখেচি তাঁরা সত্যিই শ্রদ্ধার পাত্রী। তাঁদের বি. এ. পাশ করা সত্ত্বেও আমাদের বোনেদের সঙ্গে প্রভেদ করা যায় না। এতই ভাল, মনে হয় যেন তাঁরা হিন্দুর মেয়ে হয়ে আজও আছেন। ”

এই মেয়েদের নিন্দে করচি বলে হয়ত তোমার খুব রাগ হচ্চে, কিন্তু জানই ত দিদি, ভেতরে ভেতরে তোমাদের প্রতি আমার কত শ্রদ্ধা কত স্নেহ। শুধু তাদের ন্যাকামি, বিদ্যের জাঁক আর কুসংস্কার-বর্জ্জিত আলোর দম্ভ,—এবং যা সত্য নয় তার ভান—এই দেখেই আমার এত অরুচি।

তাদের কাছে তুমি হাসির পাত্রী হবে? কি বোল্‌ব, এদের ডজনখানেক গাড়ী বোঝাই করে যদি তোমাদের কানপুরে একবার চালান দিতে পারতাম! আর কিছু না হোক ভায়ার কাজে লাগ্‌তে পারত।

“দাদার মর্য্যাদা?” কি করে জান্‌বে তোমার ত দাদা নেই!

তোমার স্বামীর উদার মতের কথা শুনে ভারি খুসি হলাম। আমি তাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করচি। কিন্তু দিদি, একটি কথা তাঁকে বল্‌তে ইচ্ছে করে। আমি নিজে একবার ছেলেবেলায় ৬।৭ সাত শত বাঙালী কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম। অনেক দিন, অনেক মেহন্নত, অনেক টাকা তাতে নষ্ট হয়, কিন্তু একটা আশ্চর্য্য শিক্ষাও আমার হয়েছিল। দুর্নামে দেশ ভরে গেল সত্যি, কিন্তু এই কথাটা নিঃসংশয়ে জানতে পারলাম যারা কুলত্যাগ করে আসে তাদের শতকরা প্রায় আশি জন সধবা! বিধবা খুব কম! স্বামী বেঁচে থাকলেই বা কি, আর কড়া পাহারা দিয়ে রাখলেই বা কি! আর বিধবা হলেই বা কি! দিদি, অনেক দুঃখেই মেয়েমানুষে নিজের ধর্ম্ম নষ্ট করতে রাজী হয়, আর যে জন্যে হয় সেটা পরপুরুষের রূপও নয়, একটা বীভৎস প্রবৃত্তির লোভও নয়। তারা এতবড় জিনিসটা যখন নিজের নষ্ট করে তখন বাইরে গিয়ে কিছু একটা আশ্চর্য্য বস্তু পাবার লোভে নয়, কেবল কিছু একটা থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্যেই এ দুঃখ মাথায় তুলে নেয়। এ সকল কথা হয়ত তুমি সব বুঝবে

না, আমার বলাও হয়ত সাজে না, কিন্তু,—সব চেয়ে বড় কথা এই যে তুমি ত শুধু মেয়েমানুষই নও,—আমার ছোট বোন কি না! আর এ জিনিসটা সংসারে নিতান্ত তুচ্ছ জিনিসও নয়।

"কাহিনী"র ভেতরে কতটা সত্যি আর কতটা কল্পনা আছে জানি নে, কিন্তু কল্পনা যদি হয় ত বাহাদুরী আছে বটে! সাহসের ত অন্ত নেই দেখি! কে উনি? এখন পবিত্রর কথা একটু বলা চাই। তাকে আমি বেশি দিন জানিনে বটে, কিন্তু এটা জানি সে নির্মলচরিত্র এবং সত্যিই খুব সৎ ছেলে! তোমাকে দিদি হয়ত বলতেও পারে। কারণ বয়সে হয়ত তোমার চেয়ে ২।৪ মাসের ছোটই হবে। তার কাছে কখনো কোন নারীর অমর্য্যাদা হবে না এই ত আমার বিশ্বাস। তাকে তুমি চিঠি লিখতে পারো কোন ক্ষতি নেই। আর তা ছাড়া তুমি নিজেও ত খাঁটি সোনা। কার কেমন সম্মান কেমন মর্য্যাদা সমস্ত তোমার কাছে বজায় থাকবে এই আমার দৃঢ় ধারণা। শুনতে পাই সে না কি এরি মধ্যে চারি দিকে রাষ্ট্র করে বেড়াচ্চে যে অল্প দিনের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যে আর একজন লেখিকার লেখা দেখ্‌তে পাওয়া যাবে যে কারও চেয়ে ছোট যায়গায় দাঁড়াবে না। কাল একটা লোক ওই মিলনটা ছাপাবার জন্যে আমার খোসামোদ করতে এসেছিল। আমি দিই নি। বলি, কাগজের উপযুক্ত নয়। তাড়াতাড়ি দরকার ত নেই। অনেকে খুব ভাল বল্‌বে জানি, কিন্তু নিন্দে করবারও লোকের অভাব হবে না তাও জানি। আমি ধৈর্য্য ধরে এক বৎসর অপেক্ষা করে যখন মাসিক পত্রে ছাপতে দেব, তখন এই সন্দেহটা থাক্‌বে না।

আমি ত তোমাকে শিষ্যা করতে সম্মত হয়েচি, কিন্তু দেখো বোন্, শেষকালে বুড়ির মত যেন গুরু-মারা বিদ্যে পেয়ে বোসো না। সে তো আমার চেয়ে বড় হয়ে গেছেই, হয়ত বা শেষকালে তুমিও তাই হবে। সংসারে বিচিত্র কিছুই নয়,—কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু এতে স্বীকার কোরব যখন তুমি লিখে জানাবে যে তুমি ভাল হয়ে গেছ, আর কোন অসুখ নেই। নইলে হার্ট ডিজিজের লোককে আমি সাকরেদ কোরব না। আগে তাকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেশ করতে হবে, তা কিন্তু জানিয়ে রাখচি। আমি কষ্ট করে শেখাবো আর তুমি হঠাৎ সরে পড়ে আমাকে পণ্ডশ্রম করাবে সে হবে না।

তুমি একবার লিখেছিলে "আপনার জানিত শ্রীরামপুর!" আর জয়রামপুরটা বুঝি অজানিত? তার ম্যালেরিয়া আর বোলতার মত মশার ঝাঁক সহজে ভুলতে পারে এমন মানুষ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। গত বোশেখ মাসে এর ভয়েই বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ রাখতে পারি নি। জয়রামপুরের আর একটি মেয়ে আমাকে বলে দাদা, আর আমি বলি ছোড়্‌দি'।

ডিহরীতে যাচ্ছো? যখন তোমাদের জন্মও হয়নি তখন আমি ওই ডিহরীর

ক্যানালের পাড়ে পাড়ে পাকা খিরনী কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়াতাম আর ঘাস করে গিরগিটি ধরতাম। উঃ সে কত কালের কথা! তখন রেল হয়নি ছোট ষ্টিমারে চড়ে আরা থেকে যেতে হোতো। তোমাদের বাঙলোটাও আমি যেন চোখে দেখতে পাচ্চি। আচ্ছা, তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে ডানহাতি সূর্য্য উঠে না? তখনকার কালে ওদেশে একটা ঘাট ছিল সতীচওড়া না এমনি একটা কি নাম। বোধ করি তোমাদের ওখান থেকে মাইল দুই হবে। কিছুকাল ঐখানে বসেচি কি জানি সে ঘাটের অস্তিত্ব আজও আছে কি না।

"ভবঘুরে"র ত কোথাও যেতে আসতে বাধে না কি না! আচ্ছা, বর্ম্মার অত কথা জান্‌লে কি করে? ম্যাজিষ্ট্রেট (ডেপুটি) যে ওখানে 'মিউক' এ খবর কে দিলে? ম্যাণ্ডলে থেকে যে ল্যাঞ্চে যাতায়াতের পথ আছে সেই বা কে বল্‌লে? যদি যথার্থই বর্ম্মায় থেকে থাকো সে কোন যায়গায়? ও দেশটায় হেন স্থান তো নেই যেখানে এ দুটি পা একদিন না একদিন ঘুরে বেড়িয়েচে! অথচ আমার মত বাদশা-কুড়ে দুনিয়ায় কমই আছে।

'রাজলক্ষ্মী'কে কোথায় পাবে? ওসব বানানো মিছে গল্প। শ্রীকান্ত একটা উপন্যাস বই ত নয়! ওসব মিছে জনরবে কান দিতে নেই। 'কাহিনী'টি কি সত্যি? কার কাহিনী? তুমি বেঁচে থাকো দীর্ঘজীবী হও, মানুষ হও বার বার এই আশীর্ব্বাদ করি। আমার আদেশেও কখনো ভুলেও শরীর অযত্ন কোরো না। তোমাকে দেখিনি তবুও কেন জানিনে তোমার উপর আমার বড় স্নেহ জন্মেচে। ঐটে বোধ হয় তোমার কপালের লেখা। আমার এমন মনে হচ্চে যদি না এত কুড়ে হতুম ত হয়ত শীতকালে শুধু তোমাকেই দেখবার জন্যে কানপুরে যেতাম। কিন্তু সে যে কখনো হবে না তাও বুঝি।

তোমার ছেলে দুটিকে অনেক আশীর্ব্বাদ করচি। তারা মা-বাপের গুণ যদি পায় ত সংসারে সার্থক হবে। কিন্তু তোমার নিজের বেঁচে থেকে মানুষ করা চাই। মরে গেলে কিছুতে চলবে না। তা হলে আমারও বোধ হয় সত্যিই ভারি কষ্ট হবে। দাদা

সত্যি বলচি তোমার ঐ গোছানো চিঠি লেখার কাছে আমার এই এলোমেলো চিঠি পাঠাতে যেন লজ্জাই করে।

আজকের গল্পর প্রথম অধ্যায়ের কথা পরের চিঠিতে জানাবো।

বাজে শিবপুর ৭ই ভাদ্র ১৩২৬

পরম কল্যাণীয়াসু,—তোমার চিঠি পেয়েছি। কয়েকটা দরকারী কথা আছে: বুড়ির ওপর আমার ভারি আশা ছিল, কিন্তু সে ঐ একটা 'দিদি' ছাড়া আর কিছুই লিখতে পারলে না। কেন জানো? বার-ব্রত জপ তপ ইত্যাদি জ্যাঠামির আগুনে ভিতরে

তার যা' কিছু মধু ছিল সব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল। অবশ্য আতিশয্যের জন্যেই না হলে আমাদের ঘরের কোন্ মেয়ে আর এ সব ব্যাপার কিছু কিছু না করে? যাক্। তোমার উপর আমার দ্বিতীয় আশা। তোমার যে বয়স এই বয়সই মানুষের রওনা হবার বয়স। তাই তোমাকে আমি শিখিয়ে নিতে চাই। আর এই জন্যেই তোমার কোন্ লেখা কোথাও ছাপাতে সম্মত হইনি। আমি নিশ্চয় জানি প্রথমে নিজের লেখা ছাপা অক্ষরে নিজের নামে দেখবার সাধ অনেকেরই হয়, কিন্তু এও জানি এক বছর তোমার সবুর সইবে।

কিন্তু শেখানোর সে সুবিধে নেই, থাকাও সম্ভব নয়। তবু একবার ওদিকে বোধ হয় যাবো, যেখানেই থাকি তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়াই সম্ভব। তোমার হয়ত একবার মনেও হ'তে পারে এই ত এঁদেরই বই পড়ি তা পড়েও যদি শিখতে না পারি, ইনি দুদিনে এমন কি শিখিয়ে আমাকে রাজা করবেন। এ কথা খুব সত্যি, বাস্তবিকই এ শেখবার জিনিষ নয়। তবু,—এই ধর না "তুলসী মৃত্যুকালে যখন তার···ইত্যাদি ইত্যাদি" আমি কিন্তু উপস্থিত থাকলে লেখবার আগে তোমাকে এই কথাটা বলে দিতাম, যে তুলসী মরেছে, যে সমস্ত গল্পের মধ্যে আর আসবে না তার সম্বন্ধে পাঠকের বেশি কৌতূহলও থাকে না, সেটা আর্টের দিক্ দিয়েও অপলক্ষ্য। সুতরাং তার সম্বন্ধে প্রথমেই ছ'পাতা ইতিহাস পাঠককে ক্লান্ত করে; আমি হ'লে কোথায় আরম্ভ কোরতাম বলবার পূর্ব্বে এই কথাটা বলতে চাই, আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত, এইটার উপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর করে।

ধরো যদি এমনি কোরে সুরু হতো—একদিন তুলসীর মৃতদেহ শ্মশানে ভস্মশেষে পরিণত হইয়া আসিতেছিল। তাহার তেরো বছরের মেয়ে মঞ্জরী অদূরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখের উপর নির্ব্বাণোন্মুখ চিতার দীপ্ত রশ্মি কতক্ষণ ধরিয়া যে বিচিত্র রেখায় খেলা করিতেছিল কেহ নজর করে নাই, হঠাৎ এক সময় তাহারই প্রতি তারা ঠাকুরাণীর চোখ পড়ায় তিনি যেন চমকিয়া গেলেন। মনে হইল ওই যাহার নশ্বর দেহের এইমাত্র সমাপ্তি হইল, সেই যেন অকস্মাৎ তাহার ছেলেবেলার মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তেমনি তুলনাহীন রূপ, তেমনি শান্ত মাধুর্য্য, মুখের উপর ঠিক যেন তেমনি বিষাদের গাঢ় ছায়া মাখানো। এবং এই সদ্য মাতৃহীনার মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার চিন্তার সূত্র অতীত দিনের অনেক সুখ দুঃখের কাহিনীর ভিতর দিয়া ছায়াবাজীর মতো সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাঁহার মনে পড়িল সেই যে দিন তুলসী স্বামী হারাইয়া একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহার বাড়ীতে প্রথম পা দিয়াছিল, তাহার পরে কেমন করিয়া সে তাহার পূর্ণবিকশিত রূপের লাবণ্য লোকচক্ষু হইতে একান্ত গোপনে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের সহিত একেবারে মিশাইয়া দিয়া ইত্যাদি···

এই অতীত দিনের ইতিহাসটা যতটা সংক্ষেপে সারিতে পারা যায় সারা আবশ্যক, কারণ এ কথা মনে রাখিতেই হইবে বইয়ের মধ্যে আর সে আসিবে না, সুতরাং তাহার চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার খুব বেশি প্রয়োজন হয় না।

তার পরে গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দেবার দরকার নাই। যে যে লোক তোমার বইয়ে থাকিবে প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। এই ধরো যাঁকে খুব জানো, তোমার বাবা কিম্বা তোমার স্বামী। তার পরে এই দুটি চরিত্র তাঁদের দোষগুণ লইয়া কোন্ কোন্ ব্যাপারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারেন তাহাই ঠিক করিয়া লইতে হয়। ধরো তোমার বাবা তাঁর কাজের মধ্যে, তাঁর মামলা মোকদ্দমার মধ্যে তোমার স্বামী তাঁর বন্ধুর চাকরির মধ্যে, উদারতার মধ্যে বা ত্যাগের মধ্যে ভালো করিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারেন,—তখনই কেবল গল্প বাঁধিবার চেষ্টা করা উচিত। নইলে প্রথমেই গল্পের প্লট লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না। যাহার হয় তাহার গল্প ব্যর্থ হইয়া যায়।

আরও অনেক ছোটখাটো জিনিস আছে যেগুলো লেখার সঙ্গে সঙ্গে মুখে বলিয়া না দিলে চিঠিতে লিখিয়া জানানো শক্ত। এইগুলোই একদিন তোমাকে বলিয়া দিয়া আসিব। কিন্তু সেদিন যে কবে হবে সে আমার বিধাতা পুরুষই জানেন।......তুমি আমার অসংখ্য আশীর্ব্বাদ জানিও।

তোমার দাদা
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নেলীর বাবার ডায়েরি

ভূমিকা

নেলীর বাবাকে আমি অনেককাল হইতেই জানি। ভদ্রলোক আমাদের অফিসেই কাজ করেন। ভাল মানুষ বলিয়া লোকে তাঁহাকে সাধুবাবু বলে। নীতিদীর্ঘ আকৃতি, মুখমণ্ডলটা ডিমের আকার। নাকটা ঈষৎ চেপ্টা। অনেক পাস করিয়াও আমাদের অফিসেই কেরানী। অল্প মাহিনায় চাকুরি আরম্ভ করিয়া বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কিন্তু সাহেব তাঁহাকে মানেন।

আমি তাঁহার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী। অতএব তাঁহার গৃহের খবর আমি রাখি। তাঁহার একটা বাতিক আছে নিত্যকার ডায়েরি লেখার। একটা বাঁধানো খাতায় প্রতিদিনকার বিশেষ খবর লিখিয়া, একটি ঘটনার শেষে দাঁড়ি টানিয়া দেন। ঘটনা যেদিনই আরম্ভ হউক না কেন, যেদিন উহা পরিসমাপ্ত হইল সেদিনই পরিণতিসহকারে খাতার পাতায় উঠিল। চেষ্টা করিয়াও আমি এরূপ লিখিতে পারি নাই। লোভ

সংবরণ করিতে না পারিয়া তাঁহার কয়েকটি পাতা চুরি করিয়াছিলাম। চোরাই মাল একাকী ভোগ করায় বিপদ আছে। তাই কয়েকটি লেখা আপনাদের পড়িতে দিলাম। তারিখগুলি কোথাও বাংলা, কোথাও ইংরেজী ও যথেষ্ট গোল থাকায় বর্জন করিলাম।

কর্তন

আজ মাসের শেষদিন, মাহিনা পেলাম।

পঁচানব্বুই টাকা বারো আনা আমার বুকপকেটে।

মেয়েদের মত চুপিচুপি তাকিয়ে দেখি, টাকাগুলো যেন ফুলের পাপড়ির মত দেখায়, কি যেন বলতেও চায়।

ভাবছিলুম অনেক কথা :—

সিনেমাতে কয়েকটা টিকিট বুক করতে পারি—নাঃ, ঢুকব না।

সাড়ে পাঁচ টাকায় দু হপ্তার তেল হবে।

যদি এক সের মাংস কিনে নিই ?—না থাক্।

দোকানটায় ঢুকে নিশ্চয় বলব, দাও তো এক সের সন্দেশ।

আঃ, খুব সামলে গেছি। দোকানদার যেমন ক'রে ঠেসে ধরেছিল, টাকাটা মোটেই রক্ষে পেত না।

অমু আর মিমুর চুড়ি, কথা দিয়েছিলুম—নাঃ, ভেঙে ফেলবে।

ছোট খুকুর জন্তে চামড়ার জুতো—নেব না, না, না।

এক টিন সিগারেট আজকাল এক মাসের খরচা। থাক্ গে।

চায়ের সঙ্গে ভাল বিস্কিট—দরকার নেই।

তাকিয়ে দেখি টাকাগুলো যেন হাসছে।

বাসায় ফিরে রেশন কার্ড পরীক্ষা করতে লাগলুম।

আপিসের পত্রিকাটার ওপর চোখ বোলাচ্ছি, নেলী এসে বললে, বাবা, ইংরেজী রচনাটা ব'লে দাও তো।

নেলীর মা জিজ্ঞেস করেন, আর দু টাকা চার আনা কি করলে ?

তীব্র চাহনিতে সন্দেহ কেন ? আপিসের চা ও খাবার কমিয়ে দিয়েছি। বললুম, মাসে তিন টাকা তো তোমারই বরাদ্দ রয়েছে।

বারো আনা বাঁচালে কেন ?—জিজ্ঞেস করলেন।

কি মুশকিল, গভর্ণ্মেণ্টের আপিসের মত, পয়সা বাঁচালেও হিসেব চাই !

নেলীর রচনাতে মন দিলুম—

"কাট ইওর ক্লথ একর্ডিং টু ইওর কোট।"

কেটে তো দিয়েছি সবই, দেহটা বাকি, তাই ভাবলুম—
"ভালো কাটার হবার আর কতকাল বাকি? হাউ লং হাউ লং ও লর্ড!

স্টাণ্ডার্ড অব লিভিং

আজ ঘুম থেকে উঠে শুনি, নেলী মায়ের কাছে বলছে, মাছ না খেয়ে ইস্কুলে যাব না মা।

আমিও বললুম, তাই তো, আমিও ঢেকুর তুলতে তুলতে আপিসে যাব।

নেলীর মাতা কিন্তু পয়সা দিলেন হিসেব ক'রে, আলু, কুমড়ো, ঝিঙে নিয়ে বাকি বারো পয়সার মাছ আনবে।

খরচা আমি করতে পারি, কিন্তু কি দরকার অশান্তির কারণ ঘটিয়ে?

ভাবলুম, বড় পুঁটিমাছ কিনে আনব, ভাল দেখে।

ছাব্বিশ পয়সা হ'ল পুঁটিমাছের মূল্য, দরকার নেই তা হ'লে, কি আর করব?

বারোটা পয়সা যেন ভারী হয়ে পকেটে প'ড়ে প'ড়ে হাসতে লাগল। পয়সা পকেট ভালবাসে, পকেটও তাকে চায়।

তামাক নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম, যা খেয়ে গোষ্ঠীকে বাঁচাতে পারব।

ব'সে ভাবলুম, সে অনেক দিনের কথা। পয়সা যখন পকেটে ছিল বেশ। বাজারে বিস্তর পুঁটিমাছ ছিল। চার পয়সায় কিনেছিলুম। চচ্চড়িটা যৌবনের ভুলে-যাওয়া প্রেমের মত আজও মনে প'ড়ে যায়।

অমুকে সঙ্গে নিয়ে এসে নেলী বললে, বাবা, মাছ পেলে না?

নেলীর বড় সহানুভূতি। তখন মাছের-আকৃতি একটা বিমান আকাশে উড়ে যাচ্ছে। রান্নাঘরে নেলীর মা কাকে ব'কে চলছেন।

আমি বললুম, লজেঞ্চুস এনেছি, এই নাও।

নেলী, খোকা, অমুর ভিড় হ'ল। বিলিয়ে দিলুম। ওরা মাছের-আকৃতি লজেঞ্চুস মহা আনন্দে চুষে খাচ্ছে।

মোড়ক-করা কাগজের টুকরোটা আমার হাতে রইল, তাতে পড়তে লাগলুম, বিলেতের কোন সায়েব ভারতবর্ষের দুঃখে দুঃখিত হয়ে বলছেন—

"ষ্টাণ্ডার্ড অব লিভিং বাড়াও, তবেই স্বাধীনতা পাবে।"

গ্লুকোজ ডি

ভোরবেলা একটা কবিতা লিখব ভেবেছিলাম—
মনের যত ব্যর্থতা নিয়ে একটা প্রেমের কবিতা।
নেলীর মাতৃদেবী চা নিয়ে এসে বললেন, অমুর ভারি জ্বর এসেছে।

বললুম, হঠাৎ আজ কি ক'রে এল ?

কয়েকদিন সে আসছিল চুপিচুপি। আজ যেন যুদ্ধসাজে, কাঁপিয়ে, পেটের নাড়ী বিগড়ে দিয়ে এসেছে।

ভাবলুম, অতর্কিত আক্রমণের আগে নিশ্চয় ফিফ্‌থ কলাম পাঠিয়েছিল, ওঁরা বুঝতে পারেন নি।

যাক গে, হোমিওপ্যাথির বাক্সটা নিয়ে বসলুম।

নেলীর মা বললে, ওসব চলবে না, ডাক্তার নিয়ে এস।

বললুম, কেন, তোমার অসুখ হ'লে তো আমার ওষুধেই চলে।

ডাক্তার এসে বললেন, গ্লুকোজ ডি এক্ষনি কিনে আনুন।

কাগজ নিয়ে ছুটছি বাজার থেকে বাজারে—দোকান থেকে দোকানে।

মনে পড়ল, সেদিন একটা পারমিট পেয়েও ফিরিয়ে দিলুম।

বর্ষার ব্যাঙাচির মত দোকানে ক্রেতার দল ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমি শুনি, নেই স্যার, এইমাত্র ষ্টক শেষ হয়ে গেল।

অন্য এক দোকানদার বললে, বিলেতে মাল বুক হয়েছে।

বুঝতে পারলুম না, অন্নকে বিলেত পাঠাব, না টেলিগ্রাম করব, না জাহাজ-ঘাটে গিয়ে অপেক্ষা করব। এদিকে আপিসের সময় হয়ে গেছে।

ইচ্ছে হচ্ছিল, 'ওরে আমার গ্লুকোজ ডি !' ব'লে চীৎকার ক'রে কাঁদি।

রেষ্টুরেন্টে ঢুকে বসলুম। রেডিওটা বলছে, খাদ্য, ওষুধ ও পথ্য নিয়ে আমেরিকার জাহাজ— ধুত্তোর ! হাসি পাচ্ছিল।

একটা লোক বললে, আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন ?

অবশেষে গ্লুকোজ ডি পাওয়া গেল লোকটার কাছে, ভগবান মিলিয়ে দিলেন। ভগবান আছেন। কেমন ক'রে, কত পয়সা দিয়ে—তা খাতায় লিখব না।

গ্লুকোজ ডি আমার একদিনের আপিস-কামাই-করা কাব্য। এখনি সে কাব্য লিখব।

ফলাহার

ঘুম থেকে জেগেই শুনি, কাকের চীৎকার।

খুকুর রুটি নিয়ে হানাহানি লেগেছে, নেলীর মা নেলীকে বকছেন।

অনেক রাত্রি অবধি উপন্যাস পড়েছি, কাজেই অলস দেহ।

গ্রাম থেকে পিসী ছোট ছেলে নিয়ে এলেন।

চক্ষুরোগের চিকিৎসা করতে হবে। আমার মাহিনা আর রেশনের যে অবস্থাই হোক,

পিসীর চোখ মানবে কেন ? নেলীর মা মুখটি গম্ভীর ক'রে এঘর ওঘর করতে লাগলেন। পিসী আমাকে এসে বললেন, ও মা, তোর শরীর এত খারাপ ?

হাঁ-হাঁ ক'রে নেলীর মা-ও এল, বললে, এ বিষয়টাতে তোমার মোটেই লক্ষ্য নেই। আজই ডাক্তারের কাছে যাও।

ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলুম সেদিন সন্ধ্যেবেলা, বললেন, ও কিছু নয়, কিছু নয়। ভিটামিন সি আর ফলাহারের ব্যবস্থা করুন।

নিশ্চিন্তে সেদিন বাড়ি ফিরলুম, মনের মেঘটা কেটে গেল।

আপিসে একজন আমেরিকান আসতেন। ওঁর সঙ্গে খুব খাতির হ'ল, কথাটা ব'লে ফেললুম। তারপর একদিন ভিটামিন সি উনি এনে দিলেন অমনই। ওরা বড্ড ভাল লোক। কিন্তু, ফল খাব কোথা থেকে ?

স্ত্রী আজ জিজ্ঞেস করলেন, আপিসে ফল খাচ্ছ তো রোজ ?

হাঁ, খাচ্ছি। দেখছ না আমার শরীরটা কত ভাল হয়েছে।

আজ পিসীমার চিঠি পেলুম, বাবা, তোমার ফলের টাকাটা পথে আমাকে ধার দিয়েছিলে, তা কি আর কখনও ভুলব ? তোমার মত সাধুলোকে সংসারে বিরল। গরিব পিসীমাতাকে কত শ্রদ্ধা কর, তা সংসারের কে বুঝবে ? ভেবেছিলুম, কয়েকটা কলা আর আম পাঠাব, কিন্তু লোক পাওয়া যায় না। এখানে এগুলো অনেক দামে বিক্রি হয়। তোমার টাকা কবে যে পাঠাতে পারব, বলতে পারছি নে। অলঙ্কার বিক্রি করতে ইচ্ছে আছে। ইত্যাদি।

আজ চিঠি লিখে দিলুম, অলঙ্কার বিক্রির দরকার নেই। ফল আমি খাচ্ছি।

রাত্রি জেগে কাব্য পড়লুম :— আজি মোর দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।

নেলীর নৃত্যে প্রথম পর্ব

বাবা, আমি নাচতে শিখব।

অবাক হয়ে বললুম, নাচতে ? ভাবলুম, ইচ্ছেটা স্বাভাবিক। জেরা করলুম, হঠাৎ কেন তোর এ ইচ্ছে হ'ল ?

ফিগারটা ভাল হবে বাবা, স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, নাম হবে অনেক, তোমাকে সবাই চিনবে—ইত্যাদি।

আমাকে বিখ্যাত করবার বাসনা নেলীর মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়েছে।

ভেবে বললুম, তোর মা-ই যে নৃত্যকলার একমাত্র অধিকারী।

বাইজী পেয়েছ? ঘরের বউ নাচবে? ছড় দিয়ে এসরাজের চার তারে কে যেন জোরে ঘা দিলে। নেলীর মায়ের কণ্ঠের শব্দ।

বললুম, বিয়ের আগে শুনেছিলুম কি মিথ্যে যে, তোমার দেহে ও কণ্ঠে সরস্বতী ছিলেন?

সরোষে বললে, মিথ্যে পরখ করবার মুরোদ চাই, টাকা চাই। সবই হয়েছে আমার বরাতে, এখন নাচনেওয়ালী সাজাই বাকি।

রাগটা যে কোথায়, বোঝা দুষ্কর নয়। মেয়েকে বললুম, ভাবিস নে আমার এক বন্ধু সব জানেন, তাঁকে নিয়ে আসব একদিন।

তারপর একদিন বাড়িতে কীর্তন লাগিয়ে দিলুম। বন্ধু এসে গান করলেন, নাচলেন। ওস্তাদ লোক। স্ত্রী কিন্তু পছন্দ করলেন না। বন্ধুকে সেধে এনেও বিদেয় ক'রে দিতে হ'ল।

আজ আপিস থেকে ফিরে দেখি, আমার স্ত্রীর মাসতুতো ভায়ের ছেলে এসে ব'সে আছে। চা-টা খেয়ে অপেক্ষা করছে। আমি এলেই স্ত্রী বললেন, চিনতে পার নি? সমীর— প্রসিদ্ধ নাচিয়ে গাইয়ে। কত ছেলে মেয়েকে ওর—

সমীর চট ক'রে প্রণাম ক'রে বললে, নেলীর মুখে একটা ভক্তি ও দেবারাধনার শ্রী রয়েছে। ধরুন, 'আরতি নৃত্য', 'উমার তপস্যা', 'গৌরীর—' এসব চমৎকার হবে। আপনার নাম রাখবে।

হাঁ-না বলবার সময় হ'ল না। আমার নাম নৃত্যে? আমার নয়, ওর মাতৃদেবীর। ভক্তি তপস্যা এসব তো ভালই। মৌনতাকে সম্মতির কারণ ভেবে নেলীকে সমীরের সঙ্গে জোর ক'রেই পাঠালেন মাতৃদেবী।

চেয়ে দেখলুম, সামনে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে অস্তগামী সূর্য, মেঘ পতঙ্গের মত ওড়না উড়িয়ে ছুটে আসছে। মেয়ের বিচ্ছেদ-দুঃখ তবু দূর হল না।

ভাবছি, গুণহীন বাপের আজকাল বিখ্যাত হওয়া কত সহজ ব্যাপার!

নেলীর নৃত্যে দ্বিতীয় পর্ব

মেয়েকে আর ধ'রে রাখতে পারব না ভাবছিলুম। নৃত্যের কণ্ট্রাক্ট ক'রে একশো টাকা এনে দিয়েছে মাকে।

কি বলব মেয়ের এই উপার্জনে? আমার এক মাস ওর একদিন। ভেতরকার সনাতন বাপটা গুমরে উঠল। যাবৎ বিয়ে না হবে, তাবৎ বাপেরই পূর্ণ অধিকার—এই না ছিল রীতি!

নেলী বললে, বাবা, সন্দেশ দুটো খাও।

মেয়েকে অবহেলা করতে পারলুম না। বাপ তা পারে না।

নৃত্যশিক্ষা ও নাচের কথা কখনও জিজ্ঞেস করি নি, মায়ের কাছেই হিসেব-নিকেশ চলে। নেলীও এড়িয়ে যায়।

নেলী বললে, বাবা, তুমি একদিনও আমাকে জিজ্ঞেস কর না।

কি জিজ্ঞেস করব মা ?

কোথায় যাচ্ছি, কি করি, কেমন করে চলি, কোথায় টাকা পেয়েছি !

আমার ভেতরকার বাপটা ভীত হয়ে বললে, জিজ্ঞেস কি করব ? তুমি তো আমারই মেয়ে, নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে জান। তুমি নিজের সম্বন্ধে বড্ড হুঁশিয়ার। হুঁশিয়ার হয়েই মেয়েরা যুগের সঙ্গে তাল ফেলে চলবে। পথ বড্ড পিচ্ছিল মা, বড্ড খারাপ।

পেছন থেকে হুঙ্কার দিয়ে নেলীর মা বলেন, কি হচ্ছে ? খুকুকে একবার ধরবি নে ? কি পরামর্শ চলছে ? সমীর ভাল ছেলে, ওর ভার নিয়েছে, এতে ভাবনার কি আছে ?

আজ আপিসের এক ভদ্রলোক পত্রিকায় আমার মেয়ের ছবি দেখালেন, দেখুন মশাই, ভাল নাচছে আজকাল।

তাকিয়ে দেখলুম, তাই তো। মনটা খুশি হ'ল, কি দুঃখিত হ'ল ? একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম, আমারই মেয়ে বটে। ভঙ্গীটা বোধ হয় কোন ভক্তিভাবেরই হবে। না, নৃত্যে তো আমার অধিকার নেই।

আমার নেলী কি সবাকার নেলী ? ভয় হ'ল।

লজ্জা করছে কি ? না। ভয় হচ্ছে কেন ?

আমাকে বিখ্যাত করেছে আমার নেলী।

আদর্শ জন্মদাতার খ্যাতি কি না বুঝতে পারছি না। নৃত্য তো আমার পূর্বপুরুষও জানতেন না। আমি কি জন্মদাতা ?

নেলীর নৃত্যে তৃতীয় পর্ব

সন্ধ্যায় অন্ধকারে ব'সে তামাক খাচ্ছি, অনু-মিনু অদূরে পড়ছে।

আজকাল সময় থাকে না নেলীর, আমাকেই পড়াতে হয়।

এমনই ক'রে ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে কতকাল কাটবে ?

হঠাৎ অসময়ে নেলী বাড়ি ফিরে এল খোকাকে নিয়ে।

গৃহিণী বললেন, এ কি, হঠাৎ ফিরে এলি ?

সংক্ষেপে জবাব দিলে, ফিরে এলুম বাবা।

মা বললেন, যাস নি তুই ? যাবি নে আজ ?

নিরুত্তর।

মাতা বললেন, আজকের কণ্ট্রাক্ট কি হ'ল? ওরা নেয় নি?

নেলী আমার পাশে ব'সে বললে, ফিরে এলুম।

ফিরিয়ে দিলে ওরা? ওগো, কেস কর ওদের নামে।

নেলী বললে, কি হবে টাকা দিয়ে? বাবার মাইনেতেই চলবে।

আমি বললুম, কেন ফিরে এলে বল তো?

তোমার কাছে ব'সে ওদের পড়াব ব'লে এসেছি।

মাতা বললেন, কি বললি? পড়াবি ব'লে এসেছিস? আবার উদ্ধত কণ্ঠে বললেন, নিশ্চয় তোমারই উপদেশ।

নেলী ওদের সমুখে গিয়ে চুপ ক'রে বসল। আমি রেগে বললুম, হ্যাঁ, আমারই উপদেশ। আশ্চর্য এদের প্রকৃতি!

মেয়ে বললে, আর আমি যাব না, সমীরদার সঙ্গে কক্ষনো না।

নেলীর মা বললেন, সমীরের মতন এমন পরোপকারী ছেলেকে আমি আর কি বলব?

সহসা সমীর এসে নেলীর মাকে ডেকে নিয়ে গেল। ঘর থেকে কি কথা ব'লে বেরিয়ে এসে বললে, নেলী, চল আজকের কণ্ট্রাক্টটা শুধু। চল।

নেলী বললে, দয়া ক'রে চ'লে যান আপনি, আমি যাব না।

নেলীর মাতা স্তব্ধ নির্বাক হয়ে রইল। সমীর বেরিয়ে গেল।

নেলী আমার পাশে বসল, পিঠে হাত বুলিয়ে দিলুম। আস্তে আমার কানের কাছে বললে, বাবা, ওর দোষ নেই। সংসারের নিরানব্বই জন লোকের মন সমীরদা হয়ে ব'সে আছে।

বেঁচে থাক্ ওর ভেতরকার অগ্নি। এর নামই 'ভারতী' দিয়েছিলুম।

আমিই নেলীর বাবা।

খাদ্য জন্মাবার কাজে

আরও খাদ্য জন্মাবার প্ল্যান ক'রে সিমেণ্ট-করা উঠোনে দাঁড়িয়ে ছেলে-মেয়েদের কাছে বক্তৃতা করলুম। নেলী, খোকা, অনু, মিনু সব বড় খুশি হয়ে গেল। বললুম, সদ্য ভিটামিন জন্মাতে হবে।

নেলীর মা আমাকে বললে, এখানে মানুষের বাচ্চাই জন্মায় ভাল, আর জন্মায় টিকটিকি, আরশোলা, ছারপোকা এসব।

মাহিনার টাকা পেয়ে কিনলুম মাটি আর টব। বাচ্চারা সব খুশি হ'ল, নেলীর মাতা নিঃশব্দ বোমা হয়ে রইলেন। ফাটবার ব্যাপারটা আপাতত মুলতবি রইল। অবুঝ স্ত্রী নিয়ে সংসার বড় বিষময় ব্যাপার।

দুটো টমাটোর গাছ সবুজ পাতা নিয়ে জন্মাল। একটাতে রইলুম আমি, অনু আর মিনু। আর একটাতে বড় খোকা আর নেলী।

স্নিগ্ধ সবুজ ডগায় বুঝি খাদ্য জন্মাতে আরম্ভ হ'ল।

একদিন ঘুমের ঘোরে ভীষণ চীৎকার শুনছি। খোকা আর নেলীর গাছে কুঁড়ি ধরেছে দুটো। ফলও হবে। তাই গাছ ওরা দেওয়ালের ওপর উঠিয়ে রেখে দিলে যেন ধরতে না পারে কেউ। মিনু জিজ্ঞেস করছে বারে বারে, বাবা, আমাদের গাছে কবে ফল ধরবে ?

আপিস থেকে এসে দেখি, কুরুক্ষেত্র। নেলী আর খোকার গাছের ফল উধাও হয়ে গেছে। মিনুর মা হাসছেন। খোকা আর নেলীর গাচের কচি ডগায় ক্ষত দেখা যাচ্ছে।

মিনুকে জিজ্ঞেস করি, কি হ'ল রে ওদের ফল ?

কানে কানে বললে অনু, বাবা, আমরা ফেলে দিয়েছি ছিঁড়ে।

বছর ঘুরে গেল, অনু আর মিনু নিরন্তর জিজ্ঞেস করছে, বাবা, আমাদের গাছে ফল জন্মাবে কবে ?

দুষ্ট খোকা ওদের ঘাবড়ে দেয়। নেলী সস্নেহে বলে, হবে, হবে।

আমি আশ্বাস দিচ্ছিলুম, নিশ্চয় হবে ফল। পরিশ্রমের মূল্য আছেই আছে : শুনিস নে, খোকা পড়ে অধ্যবসায় ইত্যাদি। অবুঝ ওরা।

অদ্য শনিবার ইং ঘণ্টা ৬।৪৭।২১ গতে সূর্যোদয়ারম্ভে, চিত্রানক্ষত্রে কন্যারাশিতে শূদ্রবর্ণে নেলীর মাতা এক কন্যার জন্ম দিলেন।

সম্পত্তি

ঘুষ যাঁরা খান, তাঁদের আন্তরিক ঘৃণা করি। আপিসে সকলেই ঠাট্টা করে। "সাধুবাবু" ব'লে ডাকে। বলুক ওরা। স্ত্রী মাঝে মাঝে এটা ওটা ব'লে উপদেশ দেন, সংসারে সবাই এক রকম চলবে, তুমি অন্য রকম হবে এ তো হতে পারে না। তা হ'লে বে'থা না ক'রে সন্ন্যাসী হ'লেই পারতে। চুপ ক'রে শুনি আর ভাবি।

কণ্ট্রাক্টর হরেন মুখুজ্জের বিলটা বড় সাহেবকে দিয়ে পাস করিয়ে দিলে পাঁচিশ টাকা দেবে। বিনে পয়সায় ক'রে দিই। সায়েব আমাকে সম্মান করেন, ভয়ও করেন।

হরেন মুখুজ্জে এবারে একটা কণ্ট্রাক্টে একশো টাকা দিতে চাইলেন। তাড়িয়ে দিলুম, আস্কারা পেয়েছে। নিধুবাবু লোকটা ভাল, ব'লে-ক'য়ে কাজটা ওঁকেই দিলুম।

বাড়ি ফিরে শুনি নেলীর মা বলছেন, হরেন মুখুজ্জের কাজটা হ'ল না বুঝি ?

তুমি কি ক'রে জানলে ?

ওরা যে খবর দিয়ে গেল।

তুমি ওঁদের চেন কি ক'রে ?

হরেন মুখুজ্জের স্ত্রী এসেছিলেন, বড় ভালমানুষ। দুবার নেমন্তন্ন খেয়েছি।

আমি কোথায় ছিলুম ?

তুমি আপিসে। নেমন্তন্ন না গ্রহণ করা অভদ্রতা। তাই গিয়েছিলুম।

এসব কি ভাল ?

মন্দটা কি শুনি ? এর পরের কাজটা ওকে দিতেই হবে কিন্তু।

আমি কেরানী মাত্র। কি ক'রে বলতে পারি ?

আজ আপিসের আর একটা কাজ বিলি হবে। হরেন মুখুজ্জের জন্যেই বলব ভাবছি। নিধুবাবু এসে ঢিপ ক'রে প্রণাম ক'রে বললে, সাধুবাবু, কাজটা আমিই পেলুম।

বললুম, তা কি ক'রে হবে ? হরেন মুখুজ্জের রেট কম রয়েছে।

নিধুবাবু নমস্কার জানিয়ে ব'লে গেল, আপনাকে বলতে কি, এজন্যে দু হাজার খরচ হ'ল।

নিধুবাবু চ'লে গেল। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়েছে। ভাবলুম, ওকে কায়দা ক'রে ধরব। বড় সায়েবকে ঘুষ দেওয়ার ফল ওকে ভোগ করতেই হবে।

স্ত্রী বললেন, হরেন মুখুজ্জেকে কাজটা তো দিতে পারলে না ? নিধুবাবু দু হাজার টাকা ঠুকেছে। অথচ— থেমে বললে, ওরা আমার কাছে চারশো টাকা রেখে গেছে।

মাথার শিরাগুলো দব্ দব্ ক'রে উঠল, তুমি টাকা নিয়েছ ? এ পাপ আমার ঘরে ?

বললে, কি বললে ? পাপ ! আর পাগলামো ক'রো না। এ টাকা ওরা ফিরিয়ে নেবে না।

নেবে না ? তুমি রাখবে ?

নিশ্চয় রাখব। কি করবে তুমি ? বরং পরের কাজটা ওকেই দেবার জন্যে চেষ্টা করবে তুমি।

স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হলুম। নিধুর সর্বনাশচিন্তা মন থেকে দূর হয়ে গেল। জগৎটা যেন আমার মনের সম্পত্তিটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। নেলীর মা আবার এসে নরম সুরে চা ও খাবার খেতে অনুরোধ ক'রে গেল। হরেন মুখুজ্জে হয়তো এবার সায়েবকেই ধরবে। খোকাটা ইস্কুলের পড়া শিখছে, অনেষ্টি ইজ দি বেষ্ট পলিসি।

ধমকে বললুম, পড়িস নে, চ'লে যা এখান থেকে। আমার বাড়িতে আর 'অনেষ্টি' কেন ?

খোকা অবাক হয়ে গেল। নেলীর মা এসে বললেন, ও কি ছেলেমানুষি করছ ? রাগ করবে জানি। কিন্তু আমি আমার সম্পত্তি ছাড়ব না। খোকা আবার পড়তে আরম্ভ করল।

মদ

মদ খাওয়া বড় দোষ।

খোকা জিজ্ঞেস করলে, বাবা, মদ কি ?

বললুম, মদ একপ্রকারের ওষুধ। ও তোমার মা খান।

ওষুধ খেলে দোষ কেন হবে বাবা ?

ওষুধ খেতে দোষ নেই, এমনি খেলে দোষ আছে।

লোকে এমনি খায় কেন বাবা ?

খেতে খুব ইচ্ছে করে, তাই।

ইচ্ছে করে কেন ?

নেলী দূরে ব'সে 'লজিক' পড়ছিল, হঠাৎ ভেংচে দিল, অ্যাঁ, তুমি কচি খোকা আর কি ? দেখতে পাও না রাস্তায় লোকগুলো ঢুলতে ঢুলতে মুখ থুবড়ে প'ড়ে যায়।

বললুম, আহা বকিস নে, জিজ্ঞেস করতে দে।

নেলী নীরব হ'ল। খোকা বললে, খেয়ে লোকটা প'ড়ে যায়, তবু খায় কেন বাবা ? খেতে কেমন লাগে ?

খোকার জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। একটি মাত্র ছেলে, ওকে মানুষ ক'রে তুলতে আমার সাধনা করতে হবে। বললে, বাবা, তুমি খেয়েছ কখনও ?

দেখলুম, নেলী তীব্র দৃষ্টি বর্ষণ করল। আমি সত্য বললুম, খেয়েছিলুম, যখন খুব পড়াশুনো করতুম। কতকটা বানিয়ে বললুম, মাথাটা ঝিমঝিম করত, তাই দুধের সঙ্গে মিলিয়ে খেতুম অল্প ক'রে। দেখ নি, শিশিটা থেকে তোমার মা আজকাল খান। ওষুধটা তেতো।

খোকা কতক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, আমারও খেতে ইচ্ছে করে বাবা।

নিষেধ করাই পিতার কর্তব্য। কিন্তু শিশুর ঔৎসুক্যকে উপযুক্তভাবে পরিচালনা করতে হবে, আশ্বাস দিতে হবে, বুঝিয়ে দিলেই শান্তি। বললুম, ইচ্ছে হ'লেই কি সব করতে হয় ? আমার তো ইচ্ছে করে, মাইনের টাকা দিয়ে খুব ক'রে মেঠাই কিনে খাই। কিন্তু ইচ্ছেকে দমন করি। দমন না করলে রঙবেরঙের ইচ্ছে হবে। ওর নামই লোভ। যত বাড়াও, তত বাড়বে।

আজ আপিস থেকে ফিরে ভাবছি বিশ্রাম করব।

বাড়িতে ঢুকে দেখি, খোকা কাতরে কাতরে কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলুম, কি হয়েছে ?

নেলী বললে, বাবা, খোকা মদ খেয়েছে।

অ্যাঁ !

শিশিটা হাতে নিয়ে আবার বেরুতেই হ'ল। শ্রীসুকুমার রায়

সংবাদ-সাহিত্য

কলিকাতায় সম্প্রতি-আরব্ধ সাম্প্রদায়িক নরমেধযজ্ঞের কথা ভাবিতেছিলাম। হোমানল এখন তেমন দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে না, মানবীয় আহুতির পরিমাণও তেমন বিপুল নয়; কিন্তু অগ্নি এখনও নির্বাপিত হয় নাই, তুষানলে পর্যবসিত হইয়া ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। শ্রাবণের শেষে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, আজ আশ্বিনের দশ তারিখ হইতে চলিল, এখনও নিশীথনীরবতা বিঘ্নিত করিয়া "জয়হিন্দ" "আল্লাহো আকবর" মন্ত্র অন্তরিতে মুহুর্মুহু ধ্বনিত হইতেছে, ছুরি ছোরা লাঠি ইষ্টকখণ্ডের ইন্ধন উৎসাহীরা আজিও যোগাইয়া চলিয়াছে; শ্মশান-যজ্ঞের ধূম সমস্ত জনপদ আচ্ছন্ন করিয়াছে, পূতিগন্ধ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে।... এইভাবে বক্কমী ভাবায় নেশায় দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে পারিতাম, সহসা সামনের বাড়ির রেডিও হইতে সুমধুর সুরলহরী কানে আসিয়া বাজিল। চকিত হইয়া উঠিলাম। রাত্রির অন্ধকার বেশ ঘোরালো হইয়া আসিয়াছে, সান্ধ্য-আইন-মহিমায় পথে জনমানব নাই। নিবিড় নীরবতার মাঝখানে গানের সুর কানে আসিয়া মুহূর্তমধ্যে কলিকাতার বর্তমান পরিবেশ ভুলাইয়া দিল। সুরের লহরী-লীলায় দুশ্চিন্তাভারাক্রান্ত মন ক্রমশ ভারমুক্ত হইয়া কখন যে অসাম্প্রদায়িক মুক্ত আকাশে বিহার করিতে লাগিল, হঠাৎ চমক ভাঙিল ঘোষকের ঘোষণায়—খাঁ সাহেব আর একটি গান গাহিবেন। খাঁ সাহেব? মুসলমান? কিন্তু মনকে বিবিধ চাবুক করিয়াও কিছুতে সাম্প্রদায়িকক্ষেত্রে নামাইতে পারিলাম না। খাঁ সাহেবও নিশ্চয়ই আত্মবিস্মৃত ছিলেন, তিনি শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণবিরহের কাহিনী সুরে প্রচার করিতেছিলেন, সুর যেন কান্নায় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছিল। মিঃ জিন্না, লিয়াকৎ আলি, ডক্টর মুঞ্জে, আশু লাহিড়ী সকলের সর্ববিধ সতর্কবাণীকে অতিক্রম করিয়া ওই অজ্ঞাত অপরিচিত, হয়তো দীর্ঘশ্মশ্রুগুম্ফসমাচ্ছন্ন লুঙ্গি-পরিহিত খাঁ সাহেবের সহিত প্রগাঢ় আত্মীয়তা অনুভব করিলাম। লজ্জা বোধ হইল কি?

*　　　　*　　　　*

ভাবিতে বসিলাম, মনের কোন্ অবস্থাটা সত্য! শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে জাতিধর্মের গণ্ডী কেন টানিতে পারি না, অথচ, রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষেত্রে সেই গণ্ডীই এমন নিরেট এবং বিরাট হইয়া দেখা দেয় কেন? জয়নুল আবেদিন আঙ্কিত তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তরের ছবি যখন দেখি, তখন কল্পনাই করিতে পারি না, শিল্পী কোন্ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত! নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের দুঃখে তাঁহার বেদনা ও সহানুভূতি রেখায় রেখায় বিগলিত হইয়া মনকে স্পর্শ করিয়া যায়। কাজি নজরুল ইসলাম রচিত সঙ্গীত যখন শুনি, তখনই অনুভব করি, জীবন-সমুদ্রে পাড়ি দিতে গিয়া তরঙ্গ-তুফান-তাড়িত মানুষ শুধু ডুবিতেছে, মানুষ যদি কেহ থাক, তাহাকে বাঁচাও, হিন্দু কি মুসলমান সে হিসাব তুলিও না। মীর

মশারৃরফ হোসেন সাহেবের 'বিষাদ-সিন্ধু' যখন পড়ি, তখন এক মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করি না, এ কারবালা আমার কারবালা নয়; কিছুতেই মনে রাখিতে পারি না যে, এই মহরমকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষ বার বার রক্তস্রোতে রঞ্জিত হইয়াছে।

* * * *

আসলে এই শিল্প ও সাহিত্যই হইতেছে মানুষের মিলন-সেতু। রাষ্ট্র বা সমাজ একই জাতির অথবা সম্প্রদায়ের মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলে বটে; কিন্তু জাতি বা সম্প্রদায়ের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে না। ধর্মের প্রসঙ্গ তুলিলাম না, কারণ ধর্ম বলিতে আমরা সচরাচর যাহা বুঝি তাহা ধর্ম নয়, বিভেদসৃষ্টির একটা কল মাত্র। সত্যকার ধার্মিক ব্যক্তি যে-ধর্মেরই লোক হউন, ভিন্নধর্মীর প্রতি তাঁহার কোনই আক্রোশ থাকিতে পারে না। যে ধর্মের কথা তুলিয়া মানুষে-মানুষে মাথা-ফাটাফাটি করে, তাহা বৃহত্তর নামের আড়ালে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা মাত্র। শুধু শিল্প ও সাহিত্যই মানুষের মনের মুক্তি আনিতে পারে। একজন সুরাবর্দী, একজন কিরণশঙ্কর রায়ের বুকে প্রয়োজন হইলে অবাধে ছুরি বসাইতে পারেন, একজন বিড়লা ইচ্ছা করিলে একজন ইস্পাহানিকে ইস্পাহান পাঠাইতে পারেন; কিন্তু আমাদের খাঁ সাহেব কখনই তাঁহার সঙ্গতকারী ভট্টাচার্য মহাশয়কে ভালকাটা ছাড়া অন্য কোনও কারণে লগুড়াঘাত করিতে পারিবেন না, শিল্পী জয়নুল আবেদিনের হাতে শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর কোনও অবস্থাতেই বিপদের সম্ভাবনা নাই। ব্যাপক ভাবে বলিতে গেলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রই সত্যকার মিলনের ক্ষেত্র। শিল্প ও সাহিত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে বাংলা দেশে যে প্রাথমিক শিক্ষার উপর শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভিত্তি, তাহা প্রধানত সাম্প্রদায়িক, নূর ও টিকি-মাহাত্ম্য প্রচারই ইহার গোড়ার কথা। সে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে আমরা প্রধান ও ব্যাপক স্থান দিতেছি না। যে শিক্ষায় মানুষের মনের মলিনতা দূর হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়, যে সংস্কৃতি মানুষকে মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিবার অবকাশ দেয়, সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির কথাই বলিতেছি। বাংলা দেশে কখনও লীগ, কখনও হিন্দুমহাসভার আওতায় সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতি বারংবার কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছে। ফলে এখানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এমন প্রবল আকারে দেখা দিতেছে।

* * *

শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করিয়া অসাম্প্রদায়িক শিক্ষার ফলে সমস্ত জাতিকে একজাতীয়ত্বে গড়িয়া তোলা বর্তমানে অতিশয় কঠিন এবং তাহা বহু রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও অর্থব্যয় সাপেক্ষ। বাংলা দেশে, বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গে, গ্রামে ও শহরে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এমন ভীষণ আকারে দেখা দেয়, তাহার কারণ জনসাধারণের শিক্ষার ভার এখনও মূর্খ পণ্ডিত ও মোল্লাদের হাতে। পণ্ডিতেরা অন্ধ গোঁড়ামির বশে এক পক্ষকে দিবে

দিনে পঙ্গু ও দুর্বল করিয়া দিতেছে, মোল্লারা অন্য পক্ষকে শাস্ত্রের ও ধর্মের দোহাইয়ে উত্তেজিত করিয়া খুন জখম নারীহরণে প্রবৃত্ত করাইতেছে। ফল বর্তমানে সর্বত্র দেখিতেছি। মোল্লা ও পণ্ডিতদের তাড়াইয়া যতদিন সত্যকার বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতির ব্যাপক প্রবর্তন না হইতেছে, ততদিন এই যন্ত্রণা আমাদিগকে সহিতেই হইবে। লীগের বা হিন্দুমহাসভার হাতে শাসনভার থাকিলে তাঁহারা নিজেদের স্বার্থের জন্যই গুণ্ডামি ও গোঁড়ামিরই প্রশ্রয় দিবেন, এবং দিতেছেনও তাই। শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন না ঘটিলে শিক্ষার দিক দিয়া আমরা কিছুই করিতে পারিব না।

সুতরাং আপাতত শিল্পী ও সাহিত্যিকদের হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এই দাঙ্গা-দলাদলি ও খুনাখুনির আবহাওয়ার মধ্যে খাঁ সাহেবের গান এই নির্দেশই দিল। শুধু ধর্ম বা সম্প্রদায়ের নামে মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ কখনই চিরন্তন হইতে পারে না। এই বিদ্বেষভাবকে স্বার্থসন্ধী ব্যক্তিরা নানা কৌশলে জীয়াইয়া রাখিয়া নিজেদের স্বার্থ হাঁসিল করেন। শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা এই কাজে লোভের বশে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশের সর্বনাশ করিতে পারেন; দুঃখের বিষয়, নানা সাময়িক পত্রের আশ্রয়ে বর্তমানে অনেকেই দেশের এই সর্বনাশ সাধন করিতেছেন। একমাত্র 'আজাদে'র দ্বারা বাংলা দেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কের যে ক্ষতি হইয়াছে, একজন নাদিরশাহ বা সুরাবর্দী ততখানি ক্ষতি করিতে পারেন নাই। হিন্দু ও মুসলমান মৈত্রীর জন্য আমাদের প্রথম আবেদন এই কারণেই সাহিত্যিক ও শিল্পী গোষ্ঠীর নিকট। মানসিক খুন জখম ও বোমাবর্ষণের কালে তাঁহারাই ব্লাড-ব্যাঙ্ক। সকলেই জানেন, সঞ্জীবনী রক্তসঞ্চার কখনই সাম্প্রদায়িকভাবে হয় না, তাহার জন্য অন্য গ্রুপিংয়ের বিচার আবশ্যক। একমাত্র শিল্পী ও সাহিত্যিকেরাই সেই বিচার করিতে পারেন।

—

সাহিত্যিকের অভিমানবশে মনকে খুব উচ্চস্তরেই লইয়া গিয়াছিলাম, সাময়িকভাবে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পীড়া ভুলিয়া ভবিষ্যৎমিলনের রঙিন ছবি দেখিয়া প্রায় মশগুল হইয়াই উঠিয়াছিলাম, হঠাৎ পাড়ার তিনকড়ি ব্যস্তভাবে আসিয়া খবর দিল, হ্যারিসন রোড হইতে লালবাজার থানার মধ্যে চিৎপুর রোডের মাঝখানে মুসলমান যোদ্ধারা ট্রাম-বাসের যাত্রীদের উপর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম জুড়িয়া দিয়াছে। প্রায় ধপ করিয়া মাটিতে পড়িলাম। সাধারণ নাগরিকদের জীবন যদি এখনও ১৬ই আগস্টের প্রায় দেড় মাস পরেও এভাবে বিপন্ন-বিপর্যস্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে স্বভাবতই জীবধর্ম প্রবল হইয়া উঠে, উচ্চচিন্তার অবকাশ থাকে না। যে সাহিত্য ও শিল্পের আশ্রয়ে আমরা ধরার মলিনতা হইতে ঊর্ধ্বে উঠিতে পারি, বর্তমান অবস্থায় তাহার চর্চা মোটেই সম্ভব নয়। দাঙ্গার পরে প্রকাশিত সাময়িক-পত্রগুলি দেখিলেই বুঝা যায়, আত্মরক্ষার আর্তনাদ ছাড়া সেগুলিতে আর কিছুই নাই। সাহিত্যিক ও শিল্পীরা স্তম্ভিত হইয়া আছেন। অবস্থা

যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে তাঁহারা কবে যে আবার আত্মস্থ হইতে পারিবেন, তাহার ঠিকানা নাই। বাংলা দেশ শ্মশান হইয়া গেলে এবং বর্তমান নায়কদের মহাপ্রস্থানের পর নব জন্মেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে হয়তো ভবিষ্যতের বেদব্যাস নবমহাভারত শুনাইতে পারিবেন, আপাতত আমাদিগকে হাড়গোড় রক্তমাংস জাতীয় তুচ্ছ বস্তুর চিন্তাতেই ব্যাপৃত থাকিতে হইবে।

কিন্তু এ হইতেছে কি? বিংশ শতাব্দীর যাবতীয় মারণ-অস্ত্রের দ্বারা শক্তিশালী ইংরেজ-শাসন লাঠিছোরাসজ্জিত দুষ্কৃতদের গুণ্ডামি চেষ্টা করিয়াও প্রশমিত করিতে পারিতেছে না, ইহা হইতেই পারে না। এক দিনের এক ঘণ্টার সক্ষম শাসনে যাহাদের শায়েস্তা করা যায়, তাহারা অবাধে দিনের পর দিন দলে দলে সমবেত হইয়া কলিকাতার রাজপথে তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছে, নগরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করিয়া সাধারণের অন্নসংস্থানে বিঘ্ন ঘটাইতেছে, অথচ বর্তমান গবর্মেণ্ট গদিতে নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতেছেন! পৃথিবীর কোনও সভ্যদেশেই এইরূপ সম্ভব হইত না। গবর্মেণ্টই এখনও ইচ্ছা করিয়া ইহা ঘটাইতেছেন, স্বভাবতই ইহা মনে হইতে পারে। মনে হইতে পারে যে, ইউরোপীয়দের ইহাতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রশ্রয় আছে। কোনও ইউরোপীয় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের অথবা ইংরেজ নরনারীর ক্ষতি বা রক্তপাত হইলে কবে অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিত।

"শান্তি শান্তি" করিয়া তথাকথিত "পীস"-কমিটিগুলি ছেলেখেলা করিয়া বেড়াইতেছেন, বাংলার প্রধান মন্ত্রী মাঝে মাঝে বেতারে ও সংবাদপত্র মারফৎ রসিকতা করিতেছেন, অথচ ওদিকে যাবতীয় মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দুরা প্রয়োজনবশত গেলেই প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হইতেছে অথবা সম্পূর্ণ গুম হইয়া যাইতেছে, ইহার কোনও প্রতিকারের চেষ্টা নাই। শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরাইয়া আনিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হইতেছে, অথচ ট্রাম-বাসের যাত্রীদের জীবন নিরাপদে রাখিবার কোনই ব্যবস্থা নাই, লোকে কোন্ ভরসায় আর কাজে বাহির হইবে? গুণ্ডারা সকল আইন সত্ত্বেও অবাধে লাঠি-ছোরা-বন্দুক হাতে দল বাঁধিয়া মাতামাতি করিতেছে, কেহই তাহাদের বাধা দিবার নাই, অথচ বিপন্ন নাগরিকেরা আত্মরক্ষার জন্য লাঠি সঙ্গে লইলেই তাহাদিগকে থানায় ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, উহাকে স্রেফ বদমাইসী ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

"প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" কাহারা আরম্ভ করিয়াছিল তাহার বিচার হইবে, হউক। সাবজুডিস মামলা সম্বন্ধে মন্তব্যের অধিকার আমাদের নাই, কিন্তু এখন কাহারা এই নরমেধযজ্ঞকে জীয়াইয়া রাখিয়াছে তাহা বুঝিবার জন্য এনকোয়ারি কমিশন বসাইবার প্রয়োজন আছে কি? কোথায় কোথায় হাঙ্গামা ঘটিতেছে, এক নজর তাহা দেখিলেই এখনকার দৈনন্দিন হাঙ্গামার নায়কদের চিনিতে বিলম্ব হইবে না। হিন্দু অঞ্চলে মুসলমানেরা

নির্ভয়ে যাইতে পারিতেছে, কিন্তু মুসলমান-অঞ্চলে হিন্দুদের যাইবার পথ নাই। হিন্দু-পরিত্যক্ত বাড়ি ও দোকানগুলির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বত্ব ছাড়িতে লীগের বীরদের আপত্তি হইতেছে। তাহারা চোখ রাঙাইয়া অথবা বন্ধু সাজিয়া হুকুম কিংবা অনুরোধ করিতেছে তফাতে থাকিতে। মগের মুল্লুকের কথা শুনিয়াছি, মগের মুল্লুকেও সম্ভবত এরূপ হয় না। লালাবাগান রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে সেদিন দিনে-দুপুরে পঞ্চাশ-ষাট জন সশস্ত্র মুসলমান একটি বাড়ির উপর চড়াও হইয়া অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে, ইহাই বা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? সুরাবর্দী-বারোজশাসিত বাংলা দেশে, শুধু কলিকাতায় নয়, সর্বত্র দুঃশাসনদেরই প্রবল প্রতাপ। আমাদের হাত-পা বাঁধা, পড়িয়া পড়িয়া মার খাইতেছি।

এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের একটি মাত্র পথ আছে, অনশন অভ্যাস করা। শুধু উদরের দায়েই আমাদিগকে ঘরের বাহির হইয়া বেপাড়ায় যাইতে হয়, এবং বেপাড়ায় ছুরির আঘাত হইতে আমাদের রক্ষা করিবার কেহ নাই। সুতরাং আমরা যদি সমবেতভাবে প্রতিজ্ঞা করি, ঘরের বাহির হইব না, বাড়িতেই বরং অনশনে মরিব, আততায়ীর হাতে মরিব না, তবে অন্তত কিছুদিন শান্তিতে থাকিতে পারিব। সরকারী অফিস অথবা ইউরোপীয় সওদাগরী অফিস হইতে যদি কয়েক দিনের জন্যও কেরানী সম্প্রদায় অন্তর্ধান করে, তাহা হইলে অবস্থার পরিবর্তন হইলেও হইতে পারে। এই একটিমাত্র পথ, আর পথ নাই। গবর্মেণ্টকে এবং সওদাগরী অফিসের মালিকদের জানাইয়া আপাতত পনেরো দিনের জন্য আমরা অফিস কামাই করিব। ইহার মধ্যে যাঁহারা না খাইয়া মরিবেন, তাঁহাদিগকে শহিদজ্ঞানে চিরকাল তর্পণ করিব।

দাঙ্গা-কমিশন বসিয়াছে, ১৪ই অক্টোবর হইতে ইহার অধিবেশন বসিবে। ইতিমধ্যে বিবৃতিগ্রহণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। অথচ দাঙ্গা থামে নাই। গত দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ লোক মরিয়া ভূত হইয়া যাইবার পর কমিশন কাজ আরম্ভ করিয়াছিল। এইরূপই নিয়ম। যে ব্যাপারে কমিশন নিযুক্ত হয়, তাহার জের নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত কমিশন বসিবার রেওয়াজ নাই। কলিকাতার লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নরহত্যার জের চলিতে চলিতেই কমিশন বসাইয়া বাংলা সরকার চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম করিতেছেন। যাঁহারা সাক্ষ্য দিতে যাইবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাদের নিরাপদে চলাফেরা করার অধিকার না জন্মিতেছে, ততক্ষণ কমিশনের কাজ আরম্ভ হইতে পারে না। এ বিষয়ে গবর্মেণ্ট পুনর্বিবেচনা করিবেন কি?

পুলিস হিন্দু-মহল্লা হইতে আত্মরক্ষাকারী এবং পাড়ারক্ষী যুবকদের অবাধে বিনা কারণে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে বলিয়া দেশীয় সাময়িক-পত্রসমূহে বার বার প্রতিবাদ জানানো হইতেছে। এইরূপ অরণ্যে রোদনের কোনই সার্থকতা নাই। আমরা কোন্ মগের মুল্লুকে বাস করিতেছি, অ্যাসেম্ব্লি ও কাউনসিলে অনাস্থা প্রস্তাবের অবস্থা

দেখিয়াও কি তাহা বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হইতেছে? বিড়াল রাজ্যে ইঁদুর-লাঞ্ছনা হইবেই। আর এই ট্যাক্‌টিক্‌স্ কি তাঁহারা আজ ধরিয়াছেন? ঢাকায় দাঙ্গার সময় সক্ষম হিন্দু যুবকদের জেলে পুরিয়া পুলিস-পাহারায় অবাধ লুঠতরাজ-খুনজখমের অধিকার দেওয়া হয় নাই কি? কলিকাতাতেই বা ভিন্ন আইন চলিবে কেন? সুতরাং হিন্দু যুবকেরা ধরা পড়িবেই। যাঁহারা ধরা পড়িবেন না, তাঁহারাই আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইবেন। যতদিন না আমরা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইতেছি, ততদিন এইরূপই হইতে থাকুক; কান্নাকাটি করিয়া আর লজ্জা বাড়াইবেন না।

—

নিরপেক্ষ কৃষ্ণপন্থী কমিউনিষ্টদের মহিমা আমরা চিরদিন স্মরণ রাখিব। ১৯২৬ সালের দাঙ্গার সময় ইঁহারা এভাবে সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়াও অনুরূপ তৎপরতা দেখাইয়াছিলেন মনে পড়িতেছে। হিন্দু নামধারী কমিউনিষ্টরা গত নরমেধযজ্ঞে কোন্ চিহ্নের বলে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, জানিতে ইচ্ছা হয়। শ্রীযুক্ত পি. সি. জোশীর শাসন কি আর চলিতেছে না? তিনি তো উচ্চকণ্ঠে লীগের স্বরূপ ঘোষণা করিয়াছেন—লীগ ব্রিটিশবিরোধী নয়, কংগ্রেসবিরোধী। যাহারা ব্রিটিশবিরোধী নয়, কমিউনিষ্টরা স্বভাবতই তাহার বিরোধী। সেই স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল কেন?

—

কলিকাতা করপোরেশনে মেয়র মিঃ ওসমানের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগের মামলা যে ভাবে পরিচালিত হইয়াছে, তাহাতে কয়েকটি দৈনিক পত্র উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন—প্রহসন, কেহ বলিয়াছেন—রীতিমত নাটক। ভুল বলিয়াছেন। নাটক ইহা মোটেই নয়; অত্যন্ত সুচিন্তিত প্রবন্ধ, ব্যক্তি ও দলগত স্বার্থের প্রবন্ধ! কলিকাতার করপোরেশনের করদাতারা ক্লোরিন-মিশ্রিত জল খাইয়া খাইয়া প্রত্যেকেই ব্লিচিং পাউডার বনিয়া গিয়াছে, এই বিশ্বাসে মুখুজ্জে ও রায় চৌধুরী মহাশয়েরা এতখানি নোংরামি করিবার ভরসা করিয়াছেন, মহামারীর আশঙ্কা তাঁহারা করেন নাই। এই দুর্জয় সাহস তাঁহাদিগকে আমরাই দিয়াছি। যে সকল অভিযোগের মূলসুদ্ধ মেয়র মহাশয়ের মুখের ফুৎকারে হাওয়া হইয়া গেল, সে সকল অভিযোগ যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ঘুস খাইয়াছেন, না গাঁজা খাইয়াছেন, এই চিন্তাতেই আমরা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছি। যে পুস্তিকার উল্লেখ করা হইয়াছিল তাহা যে দাখিলীকৃত ও পঠিত হওয়া উচিত ছিল, ইহাও কাহারও মনে হয় নাই; কয়লা ও রেশন রহস্য করপোরেশনের কর্মচারীরাই উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিতেন, তাঁহাদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হয় নাই। অথচ ঘটা করিয়া পৌর-প্রধানদের সভা বসিয়াছিল! পাঁচ হাজারের অধিক নগরবাসীর নৃশংস হত্যা যাহাদের স্বার্থবুদ্ধি এতটুকু টলাইতে পারে নাই, তাহারা যে কত উচ্চশ্রেণীর পিশাচ তাহা কি কলিকাতাবাসীরা কোনদিনই বুঝিতে পারিবে না!

এই গেল কলিকাতার হত্যালীলার গম্ভীর দিক, লঘু দিকও একটা আছে। অবিমিশ্র-পাড়ার সান্ধ্য আড্ডায় নানা গুজব গল্পের আকারে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিয়াছে। কোনও উৎসাহী ব্যক্তি এগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিলে ভবিষ্যতে শান্ত আবহাওয়ায় একটা নতুন ধরনের সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে। কিন্তু বর্তমানে ইহার অধিকাংশই প্রকাশ-যোগ্য নহে। দুইটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক কাহিনী আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।

দাঙ্গার চতুর্থ দিনে প্রবল আশঙ্কা উত্তেজনার মধ্যেই আসর জমিয়াছিল, গুজববাহী দুর্মুখ-সুমুখদের ভিড় কম হয় নাই; অনেকেই দশহাজারী পাঁচহাজারী মনসবদার। শুনিতে শুনিতে রক্ত কখনও গরম কখনও ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছিল। খুব যখন জমিয়া উঠিয়াছে শ্রীমান জহর গাঙ্গুলী উত্তেজিতভাবে ঘর্মাক্ত কলেবরে প্রবেশ করিলেন। নানা কারণে তাঁহার একটু দমিয়া থাকিবারই কথা। আমরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি রুমাল সহযোগে মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার গুজবীদের দেখিয়া লইলেন, বসিবার আসন না থাকাতে মুখে একটু অপ্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিল, ভাবখানা এই, যত সব বাজে লোক এসে জুটেছে! যিনি সদ্যসদ্য মোমিনপুরের কাহিনী বলিতেছিলেন, তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া গাঙ্গুলী মশায় বলিলেন, থামলেন কেন মশাই, চলুক না, চলুক, চলুক। ক হাজার মারলেন আজ? ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত ভাবে প্রসঙ্গটা ঘুরাইবার জন্য বলিলেন, বাইরে থেকে আসছেন মনে হচ্ছে, কদ্দুর গিয়েছিলেন? জহরলাল দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিলেন, বেহালা, বেহালা। প্রশ্নকর্তা সোৎসাহে বলিলেন, দেখলেন কিছু? জহরবাবুর গরম তৎক্ষণে ঠাণ্ডা হইয়াছে। মুখে আতঙ্ক-বিস্ময়ের ছায়া ফেলিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, সাংঘাতিক কাণ্ড মশাই, সাংঘাতিক কাণ্ড! ব্লাইণ্ড স্কুলের ছেলেরা সব ক্ষেপে বেরিয়ে পড়েছে। যাকে সামনে দেখছে তাকেই কচাকচ কাটছে, সাতশো তেরো জন গুনে এলুম।

প্রশ্নকর্তার হাসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল।

কয়েকদিন পরের কথা। কলিকাতার অবস্থা অনেকটা শান্ত হইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার মুখে আড্ডায় বসিয়া তরিতরকারি-মাছের বাজারদর সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলাম, হঠাৎ একটা হল্লার আওয়াজ কানে আসিল। মনে হইল, ওই রে, আবার লাগিল বুঝি! তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় আতঙ্কগ্রস্ত লোক ছুটাছুটি করিতেছে। দোকানপাটের দরজা ঝপাঝপ বন্ধ হইতেছে। ব্যাপার কি? দ্রুত ধাবমান এক পুলিসপুঙ্গব সংবাদ দিলেন, হল্লা আ গিয়া! সর্বনাশ! কি করিব ভাবিতেছি। ঘাড়ে দুই হাত চাপিয়া ঘাড় নোয়াইয়া এক ভদ্রলোককে ছুটিয়া আসিতে দেখিলাম। আমরা স্থানীয় রিলিফ-সেণ্টারের লোক, সুতরাং আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে থামাইতে হইল। চারিদিক হইতে প্রশ্ন হইল, কোথায় লেগেছে মশাই? লাঠি, না ছুরি? শম্ভু-জগু

বেন্‌জিন্‌-টিংচারআইডিন আনিতে ছুটিল। ভদ্রলোক প্রথমটা পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়া ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আরে মশাই, দেখুন না বেটারা করেছে কি! তিনি ঘাড় হইতে হাত নামাইলেন।—সেলুনে ব'সে চুল কাটাচ্ছিলাম, কোথাও কিছু নেই, হল্লা উঠল। দোকান বন্ধ করবে ব'লে আমার তাড়িয়ে দিলে মশাই। দেখিলাম, ভদ্রলোকের ঘাড়ের চুলের একটা দিক ক্লিপের সাহায্যে নির্মূল হইয়াছে, অন্যদিকে ঘনঃসন্নিবিষ্ট কেশরাজি অপূর্ব দেখাইতেছে। আমরা সেই অবস্থাতেও হাসিবার খোরাক পাইয়া কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিলাম।

—

কলিকাতার বাহিরে অবাধ হত্যার সংস্পর্শ হইতে যাঁহারা দূরে বাস করিতেছেন, তাঁহারা কলিকাতাবাসীর অবস্থা কল্পনাই করিতে পারিবেন না। গত ৮ই জুলাই হইতে আজ পর্যন্ত কলিকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য মার খাইয়া চলিয়াছে। ডাক ধর্মঘটের জের এখনও চলিতেছে, অর্থাৎ চিঠিপত্র ভি.পি. মনিঅর্ডার টেলিগ্রাম এখন পর্যন্ত স্বাভাবিক হয় নাই। নানা দিক দিয়া আক্রান্ত হইয়া আমরা প্রায় চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছি—মনের এমন দশা হইয়াছে যে, ডাকে কবিতা ও গল্পের আমদানি অসহ্য ঠেকিতেছে; পরশুরামের "লম্বকর্ণ" গল্পের লাটুকোম্পানির মত বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, আমরা মরছি টাকার শোকে, আর আপনি বলছেন জোলাপ খেতে! চিঠির জবাব এবং পত্রিকা যথাসময়ে না পাইয়া অনেকে গালি দিতেছেন, অনেকে রসিকতা করিতেছেন। তাঁহারা হয়তো জানেনই না যে, আগষ্ট মাসের গোড়ার চিঠি সেপ্টেম্বর মাসের শেষে আসিয়া পৌঁছিতেছে। দিনের আলোকে সমস্ত কাজ নিষ্পন্ন করিতে হইতেছে, সন্ধ্যার পর আপন চৌহদ্দির বাহির হওয়া অসম্ভব। মেশিনম্যান ও দপ্তরীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এখনও কঠিন গাড়ি ও রিক্‌শাগুলি এপাড়া ওপাড়া করিতে ভয় পায় বলিয়া মাল আনয়ন ও প্রেরণ প্রায় বন্ধ। একটু হল্লা উঠিলেই বাজার-হাট বন্ধ হইয়া যায়। আর হল্লারও বিরাম নাই। এইরূপ অবস্থায় মফস্বলের পৃষ্ঠপোষকেরা আমাদের প্রতি কৃপা না করিলে আমরা মারা যাই। অবস্থা যে কবে স্বাভাবিক হইবে, স্বয়ং লর্ড ওয়াভেলও বলিতে পারেন না। যদি পূজার পর পর্যন্ত টিকিয়া থাকি, তাহা হইলে আশা করিতেছি, কার্তিকের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই কার্তিকের পত্রিকা বাহির করিতে পারিব। যাঁহাদের চাঁদা এই আশ্বিনে ফুরাইল, তাঁহারা দয়া করিয়া মনিঅর্ডারযোগে আমাদের টাকা পাঠাইলে এই দুর্দিনে অনেক হাঙ্গামার হাত হইতে আমরা বাঁচিব। বর্তমানে ভি. পি.র অনেক গোলযোগ।